ইমাম আবু জাফর তহাবী (৩২১ হি.) রচিত

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদার নির্ভরযোগ্য ও জগদ্বিখ্যাত সূত্রগ্রন্থ

আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ

সালাফ ও খালাফের ব্যাখ্যার আলোকে

মীযান হারুন

ইমাম আবু জাফর তহাবি (৩২১ হি.) রচিত

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদার নির্ভরযোগ্য ও জগদ্‌বিখ্যাত সূত্রগ্রন্থ

আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ

(সালাফ ও খালাফের ব্যাখ্যার আলোকে)

মীযান হারুন

(দাওরা হাদিস) জামিআ মুহাম্মাদিয়া ইসলামিয়া, বনানী, ঢাকা

(আরবি ভাষা ও সাহিত্য) জামিআ ইসলামিয়া দারুল উলুম ঢাকা (আকবর কমপ্লেক্স)

(অনার্স, মাস্টার্স) আকিদা ও সমকালীন মতবাদ

কিং সউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ, সৌদি আরব

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ

গ্রন্থনা : মীযান হারুন
ভাষা ও বানানরীতি : রাহনুমা সম্পাদনা পর্ষদ
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০২২
প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না
মুদ্রণ : জনপ্রিয় কালার প্রিন্টার্স, প্যারিদাস লেন, ঢাকা-১১০০।
পরিবেশক : **রাহনুমা প্রকাশনী**, ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
শোরুম ২ : কওমী মার্কেট, ১ম তলা, ৬৫ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ১৪০০/- (এক হাজার চারশ টাকা মাত্র)

AKIDAH TAHABIYAH
by: Mizan Harun. Published by: Rahnuma Prokashoni, Dhaka.
Price: Tk. 1400.00, US $ 15.00 only.

ISBN 978-984-93987-2-4
www.rahnumabd.com, E-mail: rahnumaprokashoni@gmail.com

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ঈমান একজন মুমিনের ইহকাল ও পরকালের মূল পুঁজি। আকিদা একজন মুসলিমের জীবনে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। ঈমান-আকিদা বিশুদ্ধ থাকার পরে দৈনন্দিন আমল কিংবা আচার-আচরণে সামান্য ভুল-ত্রুটি ইসলামে মার্জনীয়, তাওবার মাধ্যমে ক্ষমাযোগ্য। বিপরীতে ঈমান বিশুদ্ধ না হলে, তাওহিদ নির্ভুল ও স্বচ্ছ না হলে বাকি সবকিছু অর্থহীন। ফলে ঈমান দেহের আত্মাস্বরূপ। আকিদা সুরম্য প্রাসাদের ভিত্তিস্বরূপ। এগুলো বিশুদ্ধ না হলে সকল ভালো কাজ, ভালো আচরণ, নৈতিকতা ও মানবিকতা, সুশিক্ষা ও সুসংস্কৃতি, উত্তম চরিত্র-মাধুর্য সব অর্থহীন। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا۟ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـٰهُ هَبَآءً مَّنثُورًا অর্থ: ‘আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব’। [ফুরকান: ২৩] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কারণে ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে সর্বপ্রথম ঈমানের কথা এনেছেন। তিনি বলেছেন, ‘ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল—এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়া। নামাজ কায়েম করা। জাকাত আদায় করা। হজ করা। রমজানের রোজা রাখা’।[১] এখানে ইসলামের পাঁচটি ভিত্তির মাঝে তাওহিদ ও রিসালাতের ওপর ঈমানকে প্রথমে রাখা হয়েছে। ফলে এটার অস্তিত্ব না থাকলে বাকিগুলোর ওপর ইসলাম দাঁড়াতে পারবে না।

বাংলাদেশে ইসলামের নানান শাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনার বিস্তৃত সুযোগ থাকলেও আকিদার ক্ষেত্রে একাডেমিক পড়াশোনার পরিসর খুবই সীমিত। এই উপলব্ধি থেকেই বিদেশে আকিদা নিয়ে উচ্চতর পড়ালেখার পরিকল্পনা

---

১. সহিহ বুখারি (কিতাবুল ঈমান: ৮)। সহিহ মুসলিম (কিতাবুল ঈমান: ১৬)

করি। একাডেমিক পাঠ গ্রহণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত নিরবচ্ছিন্ন ও নির্মোহ অধ্যয়ন অব্যাহত রাখি। এক পর্যায়ে মনে হয়, বাংলা ভাষায় আকিদাকেন্দ্রিক কাজের পরিমাণ অন্যান্য ভাষা বিশেষত আরবির তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। উপরন্তু কুরআন-সুন্নাহ-ভিত্তিক, গভীর গবেষণা-নির্ভর, নিষ্ঠা ও ভারসাম্যপূর্ণ মানহাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত, গোষ্ঠী ও দলীয় প্রভাবমুক্ত, আহলুস সুন্নাহর নানান শাখাগত মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে থেকে পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য নিবেদিত আকিদার বইয়ের সংখ্যা বাংলায় হাতেগোনা কয়েকটি কিংবা নেই বললেই চলে। যুগপৎ হতাশার এই দীর্ঘশ্বাস এবং বঞ্চনার করুণ অনুভূতি থেকেই হাতে কলম তুলে নিই। বাংলাতে আহলুস সুন্নাহর বিশুদ্ধ ও ভারসাম্যপূর্ণ আকিদার কিছু কাজ করার পরিকল্পনা করি, যা বিভ্রান্তির অন্ধকারের মাঝে আলোর প্রদীপ হয়ে পথ দেখাবে, মতাদর্শিক আকিদা চর্চার সংকীর্ণ খাঁচার বাইরে ভারসাম্য ও ঐক্যের পাঞ্জেরি হয়ে আকাশে উড়বে। এই মোবারক উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রথমে বেছে নিই আকিদার মোবারক গ্রন্থ আহলুস সুন্নাহর ইমাম আবু জাফর ত্বহাবি (র.) রচিত *আত-ত্বহাবিয়্যাহ*কে।

আজ থেকে প্রায় ১১শ বছর আগে লেখা প্রাচীন এই গ্রন্থটি যুগে যুগে কত মানুষ ব্যাখ্যা করেছেন, কতভাবে এর পেছনে সময় ও শ্রম দিয়েছেন, কতরূপে এটাকে ছাপিয়েছেন, প্রকাশ করেছেন, পড়িয়েছেন ও পড়েছেন—আজ সেটার সঠিক হিসাব পাওয়া অসম্ভব। বস্তুত ইসলামের ইতিহাসে যে ক'টি মূল্যবান গ্রন্থ গোটা উম্মাহকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে, যুগে যুগে তাদের কাছে গুরুত্ব ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে থেকেছে, ইমাম তহাবির আকিদা সেসব অমর গ্রন্থের প্রথম সারিতে।

এই ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও কবুলিয়্যাতের পেছনে অনেকগুলো রহস্য রয়েছে, যা আমরা মূল গ্রন্থের ভেতরে আলোচনা করেছি। এখানে যেটুকু বলা উদ্দেশ্য, সেটুকু হলো, ইমাম তহাবির গভীর দূরদর্শিতা, বিস্তৃত দৃষ্টি, প্রশস্ত হৃদয়, দ্বীনের প্রতি নিষ্ঠা ও উম্মাহর প্রতি পরম মমতা গ্রন্থটির কবুলিয়্যাতের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ফলে আজও পৃথিবীর নানান মতাদর্শ, নানান মাসলাক-মাশরাবের সংখ্যাগুরু মুসলমান তাদের অভ্যন্তরীণ নানা বিবাদ ও বিভেদ সত্ত্বেও ইমাম তহাবির ভালোবাসা

এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে একমত। এমন লোকের সংখ্যা নেই বললেই চলে, যারা ইমাম তহাবির সঙ্গে শত্রুতা রাখে, তাকে অন্যায্যভাবে আক্রমণ করে, তার নামে মন্দ প্রচার করে। এর কারণ ইমাম তহাবির উম্মাহমুখী ব্যক্তিত্ব, আকিদার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীর পরিবর্তে গোটা উম্মাহর জন্য কাজ করা। সমগ্র আহলুস সুন্নাহর প্রতিনিধিত্ব করা।

প্রশ্ন হতে পারে, *আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহর* ওপর যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষায় অগণিত-অসংখ্য ব্যাখ্যা রচিত হবার পরেও নতুন করে ব্যাখ্যা রচনার কী প্রয়োজন ছিল? বিদ্যমান ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোই কি উম্মাহর জন্য যথেষ্ট ছিল না? নানা দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রশ্নের যুৎসই উত্তর দেয়া যায়। কিন্তু সবচেয়ে জরুরি উত্তর হল, ইমাম তহাবির উম্মাহমুখী দৃষ্টিভঙ্গি, নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীর পরিবর্তে গোটা আহলুস সুন্নাহর প্রতিনিধিত্ব এবং *আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহর* সর্বজনীনতাই এর বড় জটিলতার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইমাম তহাবি যে আকিদা লিখেছেন সমগ্র আহলুস সুন্নাহর জন্য, ত্বহাবির সে আকিদার ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য। ইমাম তহাবি যে আকিদার মাধ্যমে গোটা আহলুস সুন্নাহর প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তাকে সেই আকিদার ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে দেখানো হয়েছে। কখনো তাকে জোর করে পক্ষের লোক দাবি করা হয়েছে, আবার কখনো দূরে ঠেলে দিয়ে বিপরীত শিবিরে দেখানো হয়েছে। এভাবে ইমাম তহাবি কারুরই থাকেননি। এভাবে *আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহর* মতো একটি গ্রন্থের সর্বজনীনতা ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে মোটেই অবশিষ্ট থাকেনি। এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ত্বহাবি অসংখ্য ত্বহাবিতে পরিণত হয়েছেন। নানান রূপ ও বর্ণের ত্বহাবি হিসেবে উম্মাহর মাঝে আবির্ভূত হয়েছেন। ত্বহাবির আকিদাগ্রন্থ এর সর্বজনীনতা ও উম্মাহমুখী স্বকীয়তা হারিয়ে আকিদার একটি জটিল-কুটিল, একটি রহস্যপূর্ণ ও বিতর্কিত গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।

এই তিক্ত ও দুঃখজনক বাস্তবতা আমাদেরকে *আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ* নিয়ে কাজে প্রেরণা জুগিয়েছে। আমাদের ওপর এমন একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনার কাজ অনিবার্য করে দিয়েছে, যা হবে ইমাম তহাবি ও তাঁর আকিদাগ্রন্থের প্রতি এক অমূল্য সংযোজন। একদিকে যা হবে ইমাম তহাবির উম্মাহমুখী ব্যক্তিত্বের নির্ভুল চিত্রায়ণ, অপরদিকে যা হবে তার আকিদার

বিশ্বস্ত ভাষ্য। যে গ্রন্থে ইমাম তহাবির আকিদাগুলো ঠিক সেভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হবে, যেভাবে তিনি নিজে বিশ্বাস ও চর্চা করতেন। যেমনটা তিনি তাঁর ছাত্র ও অনুসারীদেরকে শিক্ষা দিতেন। সর্বোপরি যা তিনি তাকর *আকীদাহ* গ্রন্থে লিখে গিয়েছেন।

এই মোবারক ও কল্যাণকর সুচিন্তা থেকেই আমরা *আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহর* ব্যাখ্যার কাজ শুরু করি। কাজের উদ্দেশ্যের প্রতি নিবেদিত ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে আমরা *আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহর* মাসআলাগুলো যুগে যুগে লেখা নানান গোষ্ঠী ও মাজহাব-মাসলাকের আলেমদের ব্যাখ্যার আলোকে বোঝার চেষ্টা করি। *ত্বহাবিয়্যাহর* সাধারণ মাসআলাগুলো ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘরানার আলেমদের ব্যাখ্যাগুলো ব্যাপকভাবে গ্রহণ করি, তুলে ধরি। উপরন্তু যেসব জায়গায় তাদের নিজেদের মাঝে বৈসাদৃশ্য, মতপার্থক্য কিংবা বিরোধ বিদ্যমান, যেখানে বস্তুনিষ্ঠতার পরিবর্তে গোষ্ঠীগত প্রভাবের ছাপ সুস্পষ্ট, সেখানে ইমাম তহাবি ঠিক কী বলতে চেয়েছেন, বোঝাতে চেয়েছেন, কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফের বক্তব্যের আলোকে সেটা বোঝার চেষ্টা করি। পরবর্তী আলেমদের ব্যাখ্যার পরিবর্তে সালাফে সালেহিনের সম্মিলিত কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের আলোকে ব্যাখ্যা করি।

এসব কারণে আমরা প্রত্যাশা করি, গত হাজার বছরে *আকীদা ত্বহাবিয়্যাহর* ওপর যতগুলো ভাষ্যগ্রন্থ লেখা হয়েছে, ইলমের প্রতি নিষ্ঠা, নির্মোহ গবেষণা, মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যমপন্থা গ্রহণ, ইমাম তহাবির আকিদার বিশ্বস্ত চিত্রায়ণ, বিশেষ কোনো দল কিংবা সম্প্রদায়ের পরিবর্তে গোটা আহলুস সুন্নাহর মুখপাত্রের ভূমিকা পালন—এসব মানদণ্ডে আমাদের ভাষ্যগ্রন্থ সামনের সারিতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ। কিংবা না থাকুক, তবে আমরা চেষ্টা করেছি আলহাদুলিল্লাহ। সুতরাং যারা আহলুল বিদআহর বিপরীতে আহলুস সুন্নাহর আকিদা শিখতে চান, আহলুস সুন্নাহর অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলাগুলোতে নির্মোহ সমাধান ও প্রকৃত অর্থেই অগ্রগণ্য সিদ্ধান্ত জানতে চান, সর্বোপরি *আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহর* ব্যাখ্যায় ইমাম তহাবির আকিদার বিশ্বস্ত চিত্ররূপ দেখতে চান, তাদের জন্য বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি অমূল্য পাথেয় হবে, ইনশাআল্লাহ।

বইটির কাজ সম্পন্ন হয়েছিল বহু দিন আগেই। কিন্তু করোনার প্রকোপসহ নানা কারণে প্রকাশনা কাজ পিছিয়ে গিয়েছে। তবে আল্লাহর অনুগ্রহ যে, শত বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে প্রতীক্ষিত সময় এসেছে। গ্রন্থটি শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে। এজন্য রাহনুমা প্রকাশনীর কর্ণধার দেওয়ান মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম (তুষার ভাই), রাহনুমার প্রিয় নেসারুদ্দীন রুম্মান ভাইয়ের কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। বিশেষত রুম্মান ভাইয়ের ঐকান্তিক আগ্রহ, পরিশ্রম, প্রচেষ্টা ও সমন্বয় ছাড়া এটি সম্ভব ছিল না। গ্রন্থটি প্রথমে মাকতাবাতুল আসলাফ থেকে আসার কথা থাকলেও নানা কারণে সম্ভব হয়নি। তবে আসলাফের স্বত্বাধিকারী প্রিয় আব্দুর রহমান মুআজ ভাই-ই রাহনুমা থেকে বইটি আনার জোর পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের পরামর্শ ও সহযোগিতার প্রতি আমি ঋণী। আল্লাহ তাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দিন।

আমরা বইটি সুন্দর ও নির্ভুল করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। কিন্তু আল্লাহর কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ ছাড়া আর কোনো কিছু ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। সেই মূলনীতিতে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থেও কিছু ভুল-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। বিজ্ঞ পাঠক সেগুলো আমাদের গোচরীভূত করলে আমরা সংশোধনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে যদি এমন কোনো বিষয় চোখে পড়ে, যেটা কোনো বিশেষ মতাদর্শিক দৃষ্টিতে ভুল মনে হয় অথচ অন্যদের কাছে ঠিকই সঠিক, সেগুলো পাঠক গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে স্বাধীন। সেগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ কোনো বক্তব্য বা প্রতিশ্রুতি নেই। বরং উক্ত বিষয়টির প্রতি লক্ষ রেখে আমরা বিভিন্ন মাসলাকের একাধিক দেশবরেণ্য আলেম ও মুহাক্কিকের কাছে বইয়ের পাণ্ডুলিপি পেশ করেছিলাম, তাদের মন্তব্য কিংবা পর্যবেক্ষণের জন্য দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করেছিলাম, গ্রন্থটি প্রকাশে বিলম্ব হবার ক্ষেত্রে যা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। শেষ পর্যন্ত বিশেষ কোনো পর্যবেক্ষণ না পাওয়াতে বিদ্যমান রূপেই আমরা বইটি পাঠকের কাছে পেশ করছি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য ইমাম তহাবির আকিদা পেশ করা; আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত কোনো শাখাগোষ্ঠীর আকিদা পেশ করা উদ্দেশ্য নয়। ফলে পাঠক সেভাবেই গ্রন্থটিকে মূল্যায়ন করবেন বলে আমরা আশাবাদী।

এখন রাত ঠিক তিনটা। এই লাইনগুলো যখন লিখছি, তখন আমি পবিত্র রওজাতে। আমার বাম পাশে এই কয়েক হাত দূরেই শুয়ে আছেন দোজাহানের বাদশাহ সাইয়েদুল মুরসালিন। হে আল্লাহ, আপনার পবিত্র নাম ও গুণাবলির উসিলায়, আপনার হাবিবের মহব্বত ও ইত্তিবার উসিলায় আপনি এই গ্রন্থটি কবুল করুন। আমার ভুলগুলো ক্ষমা করুন। উম্মাহর জন্য গ্রন্থটি উপকারী করুন। আপনি তাওফিকদাতা।

মীযান হারুন
রিয়াজুল জান্নাহ, মদিনা মুনাওয়ারা
১১ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৩ হি.

নিবেদন...

প্রাণপ্রিয় শাইখ মুহাক্কিকুল আসর

মাওলানা আব্দুল মালেক (হাফিজাহুল্লাহ)

আমার মুহসিন মুরব্বি শাইখুল হাদিস

মুফতি দিলাওয়ার হুসাইন (হাফিজাহুল্লাহু)

বরেণ্য দাঈয়ে ইসলাম শাইখ

ডাক্তার জাকির নায়েক (হাফিজাহুল্লাহ)

আমার আত্মার আত্মীয় শাইখ

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহিমাহুল্লাহ)

উম্মাহর এই চার মহান মনীষীর প্রতি গ্রন্থের পুণ্য ইহদা করছি।
আল্লাহ তাআলা প্রথম তিনজনের ছায়া আমাদের
ওপর দীর্ঘায়িত করুন।
চতুর্থজনকে জান্নাতুল ফিরদাউসে আপন সান্নিধ্যে স্থান দিন।

সূচিপত্র

সাহাবাবিষয়ক আকিদা

ইমাম তহাবি ও 'আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ' গ্রন্থ

[ইসলামি আকিদার উপর একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকা]

সিরাতে মুস্তাকিম: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মুসলিম উম্মাহর সুরক্ষাপ্রাচীর, ঐক্যের প্রতীক। ফলে তাঁর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম তথা সকল মুসলমান এক দেহ ও এক আত্মায় লীন ছিলেন। তাদের মাঝে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ ছিল না। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন। ফলে কোনো বিষয়ে দ্বিমত দেখা দিলে আসমান থেকে সরাসরি ফয়সালা চলে আসত। সকল দ্বিমতের অবসান ঘটত। অতঃপর যখন তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে স্বীয় পালনকর্তার কাছে চলে যান, তখনও সাহাবায়ে কেরাম তাঁর রেখে যাওয়া দ্বীন, কুরআন ও সুন্নাহকে শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরেন এবং সত্য ও সরল পথে অবিচল থাকেন। হ্যাঁ, রাসুলের চলে যাওয়ার পর থেকে তাদের মাঝে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। যেমন: তাঁর দাফন কোথায় হবে সেটা নিয়ে মতপার্থক্য দেখা যায়।[১] খেলাফতের প্রশ্নে সাহাবাদের মাঝে মতবিরোধ ঘটে।[২] রাসুলুল্লাহর মিরাস তথা উত্তরাধিকারের প্রশ্নে মতদ্বৈততা দেখা দেয়।[৩] জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে কি না, সেটা নিয়ে মতের অমিল দেখা যায়।[৪] আবু বকর রাজি. কর্তৃক উমর রাজি.-কে খলিফা নির্ধারণ করে গেলে কারও কারও পক্ষ থেকে দ্বিমত প্রকাশ পায়।[৫] বরং আলি রাজি.-এর যুগে এসে ইজতিহাদ-ঘটিত ভুলের কারণে সাহাবায়ে কেরাম পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন।[৬]

---

১. জামে তিরমিজি (১০১৮); সুনানে ইবনে মাজা (১৬২৮)।

২. সহিহ বুখারি (৩৬৬৭); মুসনাদে আহমদ (৩৯৮)।

৩. বুখারি (৩০৯২); সহিহ মুসলিম (১৭৫৯); সুনানে আবু দাউদ (২৯৬৮)।

৪. বুখারি (৭২৮৪); মুসলিম (২০); তিরমিজি (২৬০৭)।

৫. বুখারি (৩৭০০); সহিহ ইবনে হিব্বান (৬৯১৭); সুনানে কুবরা, বাইহাকি (১৬৬৭৬)।

৬. এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী দেখুন: ইবনে হিব্বান (৬৭৩৫); আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন, হাকেম (৫৭৪০); আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসির (৭/২৮১); এই কিতাবের শেষাংশে বিস্তারিত দেখুন।

আকিদার কিছু বিষয় নিয়েও সাহাবায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য দেখা যায়। যেমন: মেরাজের রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে দেখেছেন কি না, সেটা নিয়ে তারা মতভেদ করেছেন। আয়েশা রাজি. মনে করতেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে দেখেননি। তিনি বলতেন, যে দাবি করবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে দেখেছেন, তার দাবি ভুল।[১] বিপরীতে ইবনে আব্বাস রাজি. ও তাঁর শাগরিদরা মনে করতেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে দেখেছেন।[২] একইভাবে জীবিতদের কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয় কি না, সেটা নিয়ে সামান্য মতভেদ হয়েছে। উমর ও তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে উমর মনে করতেন, জীবিতরা কাঁদলে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয়।[৩] কিন্তু আয়েশা রাজি. মনে করতেন, রাসুলুল্লাহর উদ্দেশ্য এটা নয়। কারণ, মৃতের জন্য আত্মীয়দের স্বাভাবিক কান্নার কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হয় না।[৪]

কিন্তু এসব মতপার্থক্যের সবগুলোই ছিল রাজনীতি, ফিকহ কিংবা আকিদার শাখাগত বিষয়ে মতভিন্নতা (ইখতিলাফ)। দ্বীন ও আকিদার মৌলিক বিষয় নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে কোনো বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা, দলাদলি-হানাহানি (ইফতিরাক) ছিল না। আর প্রথমটি বৈধ, পরেরটি অবৈধ। প্রথমটি রহমত, পরেরটি গজব। ফলে সকল সাহাবা একটি এক ও অভিন্ন আকিদার উপর ছিলেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ

অর্থ: ‘তোমাদের এই উম্মত এক উম্মত। আর আমি তোমাদের রব। অতএব, তোমরা আমার ইবাদত করো।’ [আম্বিয়া: ৯২]

বিচ্যুতির সূচনা ও বিচ্যুত সম্প্রদায়: এভাবেই সাহাবায়ে কেরামের প্রথম যুগ শেষ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে অন্যান্য লোক ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে, যাদের মাঝে অনেক রুগ্ন ও অসুস্থ হৃদয়ের মানুষ ছিল, যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবত ও হিদায়াত এবং সাহাবায়ে কেরামের মানহাজ ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত ছিল। ফলে অনিবার্যভাবেই ভ্রান্তির সূচনা হয়। আকিদার অনেক মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুসলমানদের মাঝে বিভেদ তৈরি হয়। অগণিত গোমরাহ ফিরকার

---

১. বুখারি (৪৮৫৫); মুসনাদে আবু ইয়ালা (৪৯০০)।
২. মুসতাদরাকে হাকেম (৩২৫৩); ফাতহুল বারি (৮/৬০৮)।
৩. বুখারি (১২৮৬, ১২৭৮); মুসলিম (৯২৯)।
৪. বুখারি (১২৮৮); মুসলিম (৯৩২)।

আত্মপ্রকাশ ঘটে, যারা ঈমান ও আকিদার বিভিন্ন বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। ইসলামে বিভিন্ন আকিদাগত বিদআতের উদ্ভাবন ঘটায়। এভাবে তারা 'ফিরাকে বাতিলা' বা ভ্রান্ত সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ভ্রান্ত ফিরকা হিসেবে খারেজি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর আসে রাফেজি-শিয়া সম্প্রদায়। সাহাবায়ে কেরামের শেষ যুগে প্রাদুর্ভাব ঘটে মুরজিয়া ও কাদারিয়্যাহ (মুতাজিলা), নামে আরও দুটো সম্প্রদায়ের। সাহাবাদের পরে তাবেয়িদের যুগে আবির্ভাট ঘটে জাহমিয়্যাহ (জাবরিয়্যাহ), মুআত্তিলাহ, মুশাববিহাহ, মুজাসসিমাহ নামে অসংখ্য ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের।[১] ইবনুল জাওজি লিখেন, 'ভ্রান্ত ফিরকাগুলোর মূল হলো ছয়টি: খারেজি, কাদারিয়্যাহ, জাহমিয়্যাহ, মুরজিয়া, রাফেজা ও জাবরিয়্যাহ'।[২]

বস্তুত এগুলো ছিল রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ভবিষ্যদ্বাণীর অনিবার্য বাস্তবায়ন, যাতে তিনি বলেছিলেন, 'ইহুদিরা একাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়েছে। খ্রিষ্টানরা বাহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়েছে। আমার উম্মত তিয়াত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে। সবগুলো ফিরকা জাহান্নামে যাবে। কেবল একটি জান্নাতে যাবে।' জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তারা কারা, হে আল্লাহর রাসুল?' তিনি বললেন, **'যারা আমি ও আমার সাহাবাদের পথে থাকবে'**।[৩] অন্য হাদিসে তিনি বলেন, 'বনু ইসরাইলের যা হয়েছিল, আমার উম্মতের মাঝেও ঠিক তা-ই হবে। এমনকি তাদের কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকে, তবে আমার উম্মতেরও কেউ কেউ তাতে লিপ্ত হবে। বনু ইসরাইলরা বাহাত্তর সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েছে আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে তিয়াত্তর সম্প্রদায়ে। এদের একটি মিল্লাত ছাড়া সবাই হবে জাহান্নামি।' সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারা কারা?' তিনি বললেন, 'যারা আমার এবং আমার সাহাবাদের পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে'।[৪] সুতরাং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের পথে না চললে বিচ্যুতি অনিবার্য।

বিচ্যুতির কারণ: প্রশ্ন হতে পারে, একই কুরআন ও সুন্নাহ, এক আল্লাহ, এক কিবলা ও এক রাসুলকে মানার পরেও মুসলিম উম্মাহ এতগুলো ভাগে কেন বিভক্ত হলো?

---

১. মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন, আশআরি (৫)।
২. তালবিসু ইবলিস, ইবনুল জাওজি (১৯)।
৩. তিরমিজি (২৬৪০); ইবনে মাজা (৩৯৯২); আবু দাউদ (৪৫৯৬)।
৪. তিরমিজি (২৬৪১); হাকেম (৪৪৩); আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (১৪৬৪৬)।

সংক্ষেপে এর উত্তর দেওয়া জটিল। তবে কিছু মৌলিক কারণে মুসলিম উম্মাহ শতধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছে। এসব মৌলিক কারণগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো:

এক. প্রবৃত্তির অনুসরণ। যেসব ফিরকা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে, তাদের বিচ্যুতির অন্যতম কারণ ছিল প্রবৃত্তির অনুসরণ। ফলে কুরআন-সুন্নাহ তাদের বিচ্যুতি প্রতিহত করেনি। কারণ তারা কুরআন-সুন্নাহকে হিদায়াতের উৎস হিসেবে গ্রহণ করেনি; বরং বিচ্যুতির হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা নিজেরা মনগড়া মতবাদ (বিদআত) বানিয়ে কুরআন-সুন্নাহকে সেগুলোর মাঝে খাপ খাওয়াতে চেয়েছে, নিজেদের কুরআন-সুন্নাহর আলোকে গড়তে চায়নি। ফলে বিচ্যুতির শিকার হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে বলেন, 'অতি শীঘ্রই আমার উম্মতের মাঝে এমন সম্প্রদায় বের হবে, প্রবৃত্তি তাদের সেভাবে তাড়িয়ে বেড়াবে যেভাবে জলাতঙ্ক রোগ মানুষকে তাড়িয়ে বেড়ায়'।[১] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজি. বলে গিয়েছেন, 'তোমরা (দ্বীনের) অনুসরণ করো। বিদআত উদ্ভাবন করো না। কারণ, প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহি'।[২] সুফিয়ান সাওরি রাহি. বলেছেন, 'শয়তানের কাছে গুনাহের চেয়ে বিদআত প্রিয়। কারণ, গুনাহগার ব্যক্তি তাওবা করে, কিন্তু বিদআতি তাওবা করে না'।[৩]

দুই. অন্যান্য ভ্রান্ত ধর্ম ও মতবাদের অনুসরণ। ইসলামের বাইরে অন্যান্য ধর্ম যেমন ইহুদিবাদ, খ্রিষ্টবাদ ও বিভিন্ন পৌত্তলিক ধর্ম ও মতাদর্শের অনুসরণ বিভিন্ন ইসলামি ফিরকার আকিদাগত বিচ্যুতির অন্যতম কারণ ছিল। তারা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে দ্বীনকে বুঝতে না চেয়ে অন্যান্য ধর্মের আলোকে বুঝতে চেয়েছে। কাদারিয়্যাহ, জাবরিয়্যাহ, রাফেজি ও অনেক ভ্রান্ত সুফিবাদী তাদের ভ্রান্ত মূলনীতিগুলো অন্যান্য ধর্ম থেকে ধার করে ইসলামে ঢুকিয়েছে। ফলে পদস্খলন ঘটেছে। এটাও একটা হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে যান: 'আল্লাহর শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! অতি শীঘ্রই তোমরা পূর্ববর্তী জাতিদের রীতিনীতি অনুসরণ করা শুরু করবে। পদে পদে তাদের অনুকরণ করবে। বরং তারা যদি 'দব্ব' (সান্ডাজাতীয় প্রাণী)-এর গর্তে প্রবেশ করে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে।' সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, (পূর্ববর্তী জাতি বলতে) তারা কি ইহুদি ও খ্রিষ্টান?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

১. আবু দাউদ (৪৫৯৭)।
২. আল-ইবানা, ইবনে বাত্তা (১/৩২৭)।
৩. হিলইয়াতুল আউলিয়া (৭/২৬); শুআবুল ঈমান, বাইহাকি (১২/৫৩)।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তারা ছাড়া আর কারা?'[১] অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ না আমার উম্মত পূর্ববর্তীদের পথে হাঁটা শুরু করবে; পায়ে পায়ে তাদের অনুসরণ করবে।' বলা হলো, 'রোমান ও পারস্যরা?' তিনি বললেন, 'তারা ছাড়া আর কারা?'[২] আজও মুসলিম উম্মাহর দিকে তাকালে রাসুলুল্লাহর হাদিসের সত্যতা সুস্পষ্টভাবে ধরা দেয়।

তিন. সালাফে সালেহিন তথা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িদের মানহাজের আলোকে কুরআন ও সুন্নাহ না বোঝা। বরং কুরআন-সুন্নাহ বোঝার জন্য নিজেদের মনগড়া মূলনীতি উদ্ভাবন ও সেগুলোর অনুসরণ করা। এ কারণেই জাহমিয়্যাহ, মুতাজিলা-সহ অসংখ্য ফিরকা বিচ্যুতির শিকার হয়েছে। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গিয়েছেন, 'তোমরা আমার সুন্নাহ এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরো'।[৩] অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এক আলোকিত পথের উপর আমি তোমাদের রেখে যাচ্ছি, যেখানে রাত দিনের মতোই সুস্পষ্ট। আমার পরে কেবল দুর্ভাগারাই বিচ্যুত হবে। তোমাদের মধ্যে যে বেঁচে থাকবে, সে অচিরেই অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। অতএব, তোমরা তোমাদের কাছে আমার সুপরিচিত সুন্নাহ ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরবে'।[৪] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজি. বলেন, 'তোমাদের ভিতর যে-কেউ অনুসরণ করতে চায়, সে যেন রাসুলুল্লাহর সাহাবাদের অনুসরণ করে। কারণ, তারা এই উম্মতের সবচেয়ে পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী, সর্বাপেক্ষা গভীর জ্ঞানের অধিকারী। লৌকিকতা থেকে সবচেয়ে দূরে। সবচেয়ে বেশি হিদায়াতপ্রাপ্ত। সর্বাপেক্ষা ভালো অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা সেই সম্প্রদায়, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবির সোহবতের জন্য যাদের মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা মনে রেখো। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো। কারণ, তারা সিরাতে মুস্তাকিমের উপর অটল ছিলেন।[৫]

চার. জ্ঞানগত গরিমা ও বিতর্ক: বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ তৈরি হওয়া এবং আকিদার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির অন্যতম কারণ ছিল এমন সব বিষয়ে কথা বলতে

---

১. মুসলিম (২৬৬৯); সহিহ ইবনে হিব্বান (৬৭০৩); মুসনাদে আহমদ (৮৪৫৫)।

২. বুখারি (৭৩১৯)।

৩. সুনানে আবু দাউদ (৩৯৯১); সুনানে তিরমিজি (২৬০০); সুনানে ইবনে মাজা (৪২)।

৪. সুনানে ইবনে মাজা (৪৩); মুসনাদে আহমদ (১৭৪১৬); হাকেম (৩৩০)

৫. জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহি, ইবনে আবদুল বার (২/১৯৮)।

শুরু করা, সালাফ যে বিষয়ে কথা বলতে কঠোরভাবে নিষেধ করে গিয়েছেন। ইসলামে আল্লাহ, তাকদির-সহ ঈমানের জটিল ও নিগূঢ় (মুতাশাবিহাত) বিষয় নিয়ে বিতর্ক করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। একটি হাদিস দ্বারাও মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলো আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের কাছে সঁপে দেওয়ার নির্দেশনা বোঝা যায়। আমর ইবনে শুআইব তাঁর বাবা তাঁর দাদা (আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস) থেকে বর্ণনা করেন, একদিন রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সাহাবি কুরআনের একটি আয়াত নিয়ে বিতর্ক করছিলেন। তারা রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরজার কাছেই বসা ছিলেন। একপর্যায়ে তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এলেন। তাঁর মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তিম ছিল। তিনি তাদের প্রতি কিছু মাটি ছুড়ে বললেন, 'থামো! এভাবেই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগুলো ধ্বংস হয়েছে। তারা নবিদের ব্যাপারে মতভেদ করেছে। কিতাবের একটা আয়াতকে অপরটার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে। কুরআনের এক আয়াত তো অন্য আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না। বরং এক আয়াত অন্য আয়াতকে সত্যায়ন করে। সুতরাং যা জানো সেটার উপর আমল করো। আর যা জানো না, তা যিনি জানেন তাঁর কাছে সঁপে দাও'।[১] আবু হুরাইরা রাজি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদের মাঝে বের হলেন। তখন আমরা তাকদির নিয়ে বিবাদ করছিলাম। তিনি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। তাঁর মুখ লাল হয়ে যায়। মনে হচ্ছিল সেখানে ডালিম নিংড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, 'তোমাদের কি এটা করতে বলা হয়েছে? আমি কি এটা নিয়ে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি? তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা তখনই ধ্বংস হয়েছিল, যখন এটা নিয়ে তারা বিতর্ক শুরু করেছিল। তাই আমি তোমাদের কঠোরভাবে এ ব্যাপারে বিতর্ক করতে নিষেধ করে দিচ্ছি'।[২] আরেক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি তিনটি বিষয় আমার উম্মতের ব্যাপারে ভয় করি—তারকার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা, শাসকদের অত্যাচার এবং তাকদির অস্বীকার করা'।[৩] পরবর্তীকালে তা-ই ঘটেছে, যা তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। সাহাবাদের শেষ যুগেই তাকদির অস্বীকারকারী কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে!

উমর ইবনুল খাত্তাব রাজি. বলেন, 'অতি শীঘ্রই এমন একটি দলের আবির্ভাব ঘটবে, যারা তোমাদের সঙ্গে কুরআনের বিভিন্ন সন্দেহপূর্ণ ও অস্পষ্ট বিষয়

---

১. মুসনাদে আহমদ (৬৮১৭); খালকু আফআলিল ইবাদ, বুখারি (৬৩)।
২. তিরমিজি (২১৩৩); মুসানদে আবু ইয়ালা (৬০৪৫); বাজ্জার (১০০৬৩); মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক (৯৭৩৭)।
৩. মুসনাদে আহমদ (২১১৮৫); বাজ্জার (৪২৮৮); মুসনাদে আবু ইয়ালা (৭৪৬২)।

(মুতাশাবিহাত) নিয়ে বিরোধ করবে। তখন তোমাদের কর্তব্য হবে সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা'।[১] ইবনে আব্বাস রাজি.-এর সূত্রে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে, 'তোমরা সবকিছু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করো, কিন্তু আল্লাহর সত্তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করো না'।[২] ইবনে মাসউদ রাজি. বলেন, 'অতি শীঘ্রই অনেক অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য বিষয় নিয়ে বিতর্ক হবে। তখন তোমরা স্থিরভাবে কাজ করবে। পথভ্রষ্টদের ইমাম হওয়ার চেয়ে হকের মুক্তাদি হওয়া উত্তম'।[৩] ফুজাইল ইবনে ইয়াজ রাহি. বলেন, 'দ্বীন নিয়ে যারা বিবাদ করে, তোমরা তাদের সঙ্গে বসো না। কারণ, তারা আল্লাহর আয়াত নিয়ে (কুরআনে নিষিদ্ধ) বিতর্কে লিপ্ত হয়'।[৪] ইমাম বাগাবি রাহি. বলেন, 'আহলে সুন্নাতের সালাফের সকল আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে বিতর্ক করা যাবে না'।[৫]

কিন্তু সালাফের এই নিষেধাজ্ঞায় কান না দিয়ে তারা আল্লাহকে নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে। আজও সেই বিতর্ক চলছে। ইমাম আওজায়ি বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো সম্প্রদায়ের অনিষ্ট চান, তখন তাদের বিতর্কে লিপ্ত করে দেন আর আমল থেকে বঞ্চিত করেন'![৬] আজ উম্মাহর দিকে তাকিয়ে দেখুন তাদের অধিকাংশ বিতর্ক আমলকেন্দ্রিক, নাকি বিতর্কের জন্যই বিতর্ক! আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলি, যেগুলো আমাদের শিক্ষা দেওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহকে ডাকা, তাঁর নিকটবর্তী হওয়া, আজ সেগুলো উম্মাহকে শতধাবিভক্ত করার হাতিয়ার বানানো হয়েছে। অথচ সাহাবাগণ এসব বিষয়ে নীরব থেকেছেন। ইমাম মালেক রাহি. বলেন, 'তোমরা বিদআত থেকে বিরত থাকো।' তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'বিদআত কী?' তিনি বললেন, **'আহলে বিদআত হলো, যারা আল্লাহর আসমা (নাম), সিফাত (গুণাবলি), তাঁর কালাম, তাঁর ইলম ও কুদরত নিয়ে কথা বলে। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িরা যেসব বিষয়ে নীরব থেকেছেন, সেসব বিষয়ে নীরব থাকে না'**।[৭] মুসলমানদের ঈমান ও ইসলামের সুরক্ষার জন্য এটা এক বিশাল মূলনীতি।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত: ভ্রান্ত ফিরকাগুলো ও যারা তাদের মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তারা আহলে বিদআত। বিপরীতে যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১. মুসনাদে দারেমি (১২১)।
২. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বাইহাকি (২/৪৬)।
৩. আল-ইবানা (১/৩২৮)।
৪. তাফসিরে তাবারি (৯/৩১৪)।
৫. শরহুস সুন্নাহ, বাগাবি (১/২১৬)।
৬. জাম্মুল কালাম, হারাভি (৫/১২৩); শরহুস সুন্নাহ, লালাকায়ি (১/১৬৪)।
৭. জাম্মুল কালাম, হারাভি (৫/৭০); সাওনুল মানতিক, সুয়ুতি (৯৬); শরহুস সুন্নাহ (১/২১৭)।

ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত, সালাফে সালেহিনের পথে অবিচল, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত নামে পরিচিত।[১] আল্লাহর অনুগ্রহে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানই (সাওয়াদে আজম) বিশুদ্ধ দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত, সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়িন ও তাবে-তাবেয়িন তথা সালাফে সালেহিনের অনুসারী। চার ইমাম তথা ইমাম আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি ও আহমদ-সহ সকল মুহাদ্দিস ও ফকিহ এবং তাদের অনুসারী আলিম-উলামা ও সাধারণ মুসলমানদের সকলে উক্ত মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত। শাখাগত বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য, চিন্তাগত বৈচিত্র্য, কুরআন-সুন্নাহর বিস্তারিত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মতের অমিল থাকলেও মৌলিক বিষয়গুলোতে তারা সবাই এক ও অভিন্ন। সামগ্রিক অর্থে তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহিনের মতের অনুসারী ও তাদের পথের উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা সকলে আহলে সুন্নাত, 'ফিরকায়ে নাজিয়াহ' তথা মুক্তিপ্রাপ্ত দল।

এ কারণে কেবল নামে মুসলিম হলেই যথেষ্ট নয়। কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণের দাবিদার হলেই শেষ নয়। বরং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী মুসলিম হতে হবে। সালাফে সালেহিনের মানহাজের আলোকে কুরআন ও সুন্নাহ বুঝতে হবে। কারণ, প্রত্যেক ভ্রান্ত সম্প্রদায়ই কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণের দাবি করে। প্রত্যেক ফিরকাই নিজেদের ইসলামের প্রকৃত ও খাঁটি প্রতিনিধি মনে করে। অথচ সবাই তা নয়। ফলে বিশুদ্ধ দ্বীন মানতে হলে সালাফের মানহাজে মানতে হবে। সহিহ আকিদার অনুসারী হতে হলে সালাফ ও খালাফের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমামদের অনুসরণ করতে হবে। তাদের মূলনীতির আলোকে কুরআন-সুন্নাহ থেকে উৎসারিত আকিদা গ্রহণ করতে হবে। এটাই মুক্তির পথ। এ কারণেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে 'মুক্তিপ্রাপ্ত' দল বলা হয়। কারণ সালাফে সালেহিনের ইমামগণ কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের দেখানো পথে বাস্তবায়ন করেছেন। দ্বীন ও ঈমানকে তারা সাহাবাদের মানহাজের আলোকে বুঝেছেন। উপরন্তু তারা রাসুলুল্লাহর রেখে যাওয়া দ্বীনকে যুগে যুগে ধেয়ে আসা ভ্রান্তির তুফানের সামনে সুরক্ষিত রেখে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাদের কুরবানির বদৌলতেই আজ চৌদ্দশো বছর পরেও ইসলাম আমাদের কাছে সেভাবেই রয়েছে, যেভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে

---

১. দেখুন: আল ইতিসাম, শাতেবি (২/২৬১-২৬৫); গজনবি (২৬)।

এসেছিলেন। দ্বীন ও ঈমান আমাদের কাছে সেভাবেই সুরক্ষিত ও অক্ষত রয়েছে, যেমন ছিল সাহাবায়ে কেরামের কাছে। আজ দেড় হাজার বছর পরে মুসলিম উম্মাহ এত বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও, যুগে যুগে এত ভ্রান্ত ফিরকার প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও আহলে সুন্নাতের অনুসারী একজন মুসলিম বলতে পারছে, 'আমি ঠিক সেই আকিদা রাখি, যে আকিদা রাখতেন আবু বকর ও উমর রাজি.। আমি কুরআন ও সুন্নাহকে ঠিক সেই মানহাজে বুঝি, যেই মানহাজে বুঝতেন আশারায়ে মুবাশশারা, সকল মুহাজির ও আনসার। আমি সেই দ্বীনের অনুসারী, যেই দ্বীনের অনুসারী ছিলেন সকল সাহাবি, তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িন ও সালাফে সালেহিন।' এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের এমন এক বৈশিষ্ট্য, যা কেবল ইসলামে নয়; বরং গোটা মানবজাতির ধর্মীয় ইতিহাসে বিরল।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সংক্ষিপ্ত আকিদা: এই গ্রন্থটির পুরোটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা বিষয়ে। কিন্তু এখানে সংক্ষেপে আমরা সালাফের আকিদা তুলে ধরছি। যাতে পাঠকের সামনে আহলে সুন্নাতের মৌলিক আকিদার একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা থাকে। বিস্তারিত ব্যাখ্যা সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ। সংক্ষেপে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হলো:

- মহান আল্লাহ তায়ালা, ফেরেশতা, নবি-রাসুল, আসমানি কিতাব, মৃত্যুপরবর্তী পুনরুত্থান, জান্নাত-জাহান্নাম, তাকদিরের ভালো-মন্দ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত—এই বিষয়গুলোতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। সর্বক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা। দ্বীনের ক্ষেত্রে বিদআত পরিত্যাগ করা।

- আল্লাহর ব্যাপারে বিশ্বাস রাখা: তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। সৃষ্টির কোনোকিছু তাঁর মতো নয়। তিনিও কারও মতো নন। তাঁর সত্তা, তাঁর সকল নাম, গুণ ও কর্মে তিনি অনন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই। আল্লাহ চিরঞ্জীব। তিনি অনাদি, তাঁর কোনো শুরু নেই। তিনি অনন্ত, তাঁর কোনো শেষ নেই। তাঁর সকল নাম ও গুণ তাঁর মতো চিরন্তন। তিনিই আমাদের আশা ও ভরসার স্থল। তিনিই আমাদের সর্বোচ্চ ভালোবাসা পাবার উপযুক্ত।

- আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন। তবে তাঁর কোনো কাজ আমাদের কাজের মতো নয়। তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। সবার রিজিকদাতা। তিনি দৃশ্যমান ও অদৃশ্য

সবকিছু (গায়েব) জানেন। তিনি ছাড়া কেউ গায়েব জানে না। তিনিই ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত। ফলে তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করা যাবে না। তিনিই একমাত্র প্রার্থনা কবুলকারী, প্রয়োজন পূর্ণকারী। ফলে তিনি ছাড়া আর কারও কাছে প্রার্থনা করা যাবে না। আর কারও কাছে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার আশা করা যাবে না।

- আমরা আল্লাহর জন্য তা-ই সাব্যস্ত করি, যা-কিছু কুরআন ও সুন্নাহ তাঁর জন্য সাব্যস্ত করেছে। আমরা আল্লাহকে সেসব থেকে মুক্ত ঘোষণা করি, যা-কিছু থেকে কুরআন ও সুন্নাহ তাঁকে মুক্ত ঘোষণা করেছে। ফলে কুরআন ও সুন্নাহে আল্লাহর যে গুণাবলি রয়েছে, আমরা সেগুলো স্বরূপ ও ধরন নির্ধারণ ব্যতীত সাব্যস্ত করি। কুরআন ও সুন্নাহে যেসব বিষয়কে আল্লাহর জন্য শোভনীয় মনে করা হয়নি, আমরাও সেগুলোকে আল্লাহর জন্য শোভনীয় মনে করি না। কুরআন-সুন্নাহ যেসব বিষয়ে যতটুকু বলে নীরব থেকেছে, আমরাও সেসব বিষয়ে ততটুকু বলে নীরব থাকি। নিজেদের মনগড়া কোনো ধারণা, অনুমান, কল্পনা আল্লাহর উপর আরোপ করি না। ফলে আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ দেখেন, শোনেন ও কথা বলেন। কিন্তু তাঁর দেখা, শোনা ও কথা বলা আমাদের মতো নয়। আল্লাহর হাত (ইয়াদ), চেহারা (ওয়াজহ), আত্মা (নফস) রয়েছে যেমনটা তিনি বলেছেন। তবে এগুলো তাঁর গুণাবলি (সিফাত); অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয়। কারণ, তিনি সকল সৃষ্টি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৃষ্টিকর্তা। তিনি সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হন—যেভাবে তাঁর জন্য শোভনীয়। আমরা এগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবে সাব্যস্ত করি। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা অর্থ নিয়েছেন, সে অর্থ-সহ বিশ্বাস করি। এগুলোকে নাকচ করি না, আবার সৃষ্টির মতোও ভাবি না। এগুলোর নিগূঢ় মর্ম ও স্বরূপ আল্লাহর কাছে সঁপে দিই। কারণ, তাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাঁর মতো কিছু নেই।

- আমরা বিশ্বাস করি, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ বাণী। এটা পৃথিবীর একমাত্র আসমানি গ্রন্থ, যা কিয়ামত পর্যন্ত সুরক্ষিত থাকবে। কোনো বিকৃতি কিংবা বিচ্যুতি একে স্পর্শ করতে পারে না। কুরআন আল্লাহর কালাম। তাঁর গুণ; সৃষ্টি নয়। এগুলো নিয়ে আমরা বিবাদ করি না। কুরআনের পাশাপাশি বিশুদ্ধ সুন্নাহকেও আমরা শরিয়তের মৌলিক উৎস মনে করি। সুন্নাহ অস্বীকারকারীদের আমরা পথভ্রষ্ট মনে করি।

- আল্লাহ তায়ালা সকল সৃষ্টিকে সজ্ঞানে সৃষ্টি করেছেন। তাদের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। ফলে পৃথিবীতে ভালো-মন্দ যা-কিছু ঘটে থাকে, সবকিছু আল্লাহর লেখা, নির্ধারণ ও সৃষ্টি। এক বিন্দু এদিক-সেদিক হবে না। কারণ, তিনি অতীতের সবকিছু জানেন। বর্তমান জানেন। ভবিষ্যত জানেন। বরং যা-কিছু হয়নি, যদি হতো, কীভাবে হতো, তাও তিনি জানেন। এই জানা অনুযায়ীই আল্লাহ সবকিছু লিখেছেন ও নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ মানুষকে ভালো-মন্দ গ্রহণের স্বাধীনতা দিয়েছেন। তবে মানুষের ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে। তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে জগতের কিছু নেই। মানুষ যা-কিছু করে, সব আল্লাহর সৃষ্টি। কিন্তু মানুষের হাতের কামাই। ফলে তাকে তার কর্মফলের জবাবদিহি করতে হবে। তাকদিরের ক্ষেত্রে আল্লাহর উপর আপত্তি তোলা যাবে না। কেন, কীভাবে এমন প্রশ্ন করা যাবে না।

- আমরা বিশ্বাস রাখি, পরকালে সকল মুমিন আল্লাহ তায়ালার দিদারের সৌভাগ্য লাভ করবে। এর স্বরূপ কী হবে আল্লাহ ভালো জানেন। বোধগম্য না হলেও আমরা এগুলো মেনে নিই। এটা নিয়ে বিতর্ক করি না। কারণ, তাকদির ও পরকালে আল্লাহর দিদার সম্পর্কে বিতর্ক নিষিদ্ধ।

- আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ মানুষের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। তাদের শরিয়তের বিধি-বিধান ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকলের দ্বীন ও রিসালাত এক ও অভিন্ন ছিল; আর তা হলো ইসলাম। আমরা আরও বিশ্বাস করি, নবি-রাসুলগণ সগিরা-কবিরা সব ধরনের গুনাহ থেকে পবিত্র। সব ধরনের চারিত্রিক স্খলন থেকে মুক্ত। ফলে তারা সকল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। একজন সাধারণ মানুষ (ওলি) যত আমলই করুক, কোনো নবির মর্যাদায় পৌঁছতে পারবে না।

- মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল। তিনি আল্লাহর খলিল তথা পরম প্রিয় বন্ধু। তিনি সর্বশেষ নবি। তাঁর পরে কোনো নবি নেই। আমরা রাসুলুল্লাহকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। তাঁকে ততটা সম্মান করি, যতটা কুরআন ও সুন্নাহে এসেছে। তাঁর ভক্তি ও শ্রদ্ধার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে শরিয়তের সীমা লঙ্ঘন করি না। আল্লাহ ছাড়া কোনো নবি-রাসুল বা ফেরেশতা গায়েব জানেন মনে করি না।

- রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরে উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হচ্ছেন চার খলিফা। তারা হচ্ছেন যথাক্রমে আবু বকর, উমর, উসমান ও আলি রাজি.।

তাদের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন আশারায়ে মুবাশশারা (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জন) তথা উপরের চার জন এবং তালহা, জুবাইর, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, সাদ, সাইদ ও আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাজি.। অতঃপর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাগণ। অতঃপর হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারী সাহাবাগণ। অতঃপর অন্য সাহাবাগণ। আমরা রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের কেবল উত্তমরূপে স্মরণ করি। তাদের নিজেদের মাঝে যেসব মতপার্থক্য ও জটিলতা তৈরি হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে কথা বলা থেকে বিরত থাকি। কোনো সাহাবির ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করি না। কোনো সাহাবির সমালোচনা করি না। তাদের কারও প্রতি বিদ্বেষ রাখি না। বরং আমরা বিশ্বাস রাখি, রাসুলের কনিষ্ঠ একজন সাহাবিও গোটা উম্মতের সকল বড় বড় ওলি-আউলিয়া থেকে উত্তম।

- আমরা রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবার (আহলে বাইতকে) মহব্বত করি। রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মীয় ও পরিজন হিসেবে আমরা তাদের সম্মান করি, তাদের জন্য দোয়া করি, হকের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করি। তাদের কারও প্রতি বিদ্বেষ রাখি না।

- রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো সাহাবির প্রতি বিদ্বেষ রাখা, তাদের সমালোচনা করাকে আমরা মুনাফিকি মনে করি। কেউ যদি এগুলো করে, তাকে আমরা বিদআতি বলি।

- আমরা আহলে কিবলার সবাইকে মুসলিম গণ্য করি। কোনো আমলের কারণে নির্ধারিত কোনো মুসলিমের ব্যাপারে আমরা জান্নাত কিংবা জাহান্নামের সাক্ষ্য দিই না। বরং আমরা সকলের পিছনে নামাজ পড়ি। কেউ মারা গেলে তার জানাজা আদায় করি। তার জন্য ইস্তিগফার করি। হালাল মনে না করলে গুনাহের কারণে কোনো মুসলমানকে আমরা কাফের বলি না। তবে গুনাহ ঈমানের কোনো ক্ষতি করে না—আমরা এটাও বলি না। বরং আমরা বলি, গুনাহ ঈমানের ক্ষতি করে। তাওবা ছাড়া মারা গেলে কবিরা গুনাহকারী আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে থাকবে—চাইলে তিনি তাকে শাস্তি দেবেন, চাইলে ক্ষমা করে দেবেন। তবে গুনাহগার মুসলিম জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না। নির্ধারিত শাস্তি শেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

- আমরা আমাদের শাসকদের—চাই তারা সৎ হোক কিংবা অসৎ—আনুগত্য অপরিহার্য মনে করি। হ্যাঁ, অন্যায় নির্দেশের আনুগত্য বৈধ মনে করি না। আমরা

শাসকদের সঙ্গে হজ ও জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে বিশ্বাস করি। আমরা তাদের সৎ-অসৎ সকলের পিছনে নামাজ আদায় করি। জালিম শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কিংবা বিদ্রোহ আমরা সঠিক মনে করি না। যদি কেউ এমন করে, তাকে আমরা বিদআতি মনে করি।

- আমরা মোজার উপর মাসাহ করা, রমজানে তারাবি আদায় করাকে শরিয়তসম্মত মনে করি। আমরা ওল-আউলিয়ার কারামতে বিশ্বাস রাখি।

- আমরা বিশ্বাস করি, ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাসের নাম, আর ইসলাম হলো বাহ্যিক আমলের নাম। একটি ছাড়া অন্যটি সম্ভব নয়। ফলে ঈমান ছাড়া ইসলাম সম্ভব নয়, আবার ইসলাম ছাড়া ঈমান সম্ভব নয়। এ দুটো মানুষের পেট ও পিঠের মতো। তাকওয়া, ইবাদত ইত্যাদির মাধ্যমে ঈমানের শক্তি বাড়ে ও কমে। আর দ্বীন হলো এই সবকিছুর সমষ্টি।

- আমরা কবরের আজাবে বিশ্বাস করি। কবরে মুনকার-নাকিরের প্রশ্নে ঈমান রাখি। কিয়ামতের দিনের হিসাব-নিকাশ, আমল মাপার মিজান (দাঁড়িপাল্লা), আল্লাহ কর্তৃক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রদত্ত হাউজ (কাউসার), শাফায়াত ও পুলসিরাতে ঈমান রাখি। জান্নাত ও জাহান্নামকে আমরা বর্তমানে বিদ্যমান ও চিরস্থায়ী দুটি সৃষ্টি বিশ্বাস করি।

- আমরা কিয়ামতের আলামতে বিশ্বাস করি। আমরা মানি, একদিন এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে তার আগে বেশ কিছু আলামত প্রকাশিত হবে। যেমন: দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে, তার দুই চোখের মাঝে লেখা থাকবে 'কাফের'। ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাদুর্ভাব ঘটবে। ঈসা আলাইহিস সালাম পুনরাগমন করবেন। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে। কুরআন-সুন্নাহে এগুলো যেভাবে এসেছে, আমরা সেভাবে বিশ্বাস রাখি। এগুলোর ব্যাপারে আমরা বাড়াবাড়ি করি না।

উপরের আকিদাগুলো ইমাম আবু হানিফা রাহি.-এর 'আল-ফিকহুল আকবার' ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহি.-এর 'উসুলুস সুন্নাহ' গ্রন্থদ্বয়ের চুম্বকাংশ। এগুলোই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মৌলিক আকিদা। এগুলোই সকল সাহাবি, তাবেয়ি, তাবে-তাবেয়ি, চার ইমাম, সকল মুহাদ্দিস ও ফকিহের আকিদা। আমাদের ইমামদের লিখিত আকিদার কিতাবগুলোর নির্যাস এগুলোই। ইমাম তহাবি রাহি. তার আকিদা গ্রন্থে—যা আমরা সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরব—এগুলোই লিখেছেন।

ইমাম আবু মনসুর আল মাতুরিদি, আবুল হাসান আল-আশআরি, তকিউদ্দিন সুবকি, আবু হামেদ গাজালি, ফখরুদ্দিন রাজি, ইবনে তাইমিয়া, মুঈনুদ্দিন চিশতি, আহমদ সারহিন্দি মুজাদ্দিদে আলফে সানি, শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভি, মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব, সাইয়েদ আহমদ শহিদ, কারামত আলি জৌনপুরি, আকাবির ও মাশায়েখে দেওবন্দ সকলেই উপরের আকিদাগুলোতে **সামগ্রিকভাবে** বিশ্বাস করেন। তাই তারা এবং তাদের প্রকৃত অনুসারীরা বিভিন্ন নামে পরিচিত থাকলেও শিয়া এবং ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারী (আহলে বিদআতের) বিপরীতে **সার্বিকভাবে সকলেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত।**

হ্যাঁ, উপরের বিশ্বাসগুলো থেকে যদি তাদের কেউ সামগ্রিকভাবে বিচ্যুত হয়, তা হলে তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত থেকেও খারিজ হয়ে সামগ্রিক বিচ্যুতির শিকার হবে। আর যদি কেউ কিছু মাসআলায় বিচ্যুতির শিকার হয়, তবে সেসব মাসআলা ছাড়া অন্যান্য মাসআলায় আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এভাবে কেউ পূর্ণাঙ্গ আহলে সুন্নাতের অনুসারী হবে, আবার কেউ আংশিক অনুসারী হবে; কেউ আহলে সুন্নাতের একেবারে কাছাকাছি থাকবে, কেউ একটু দূরে চলে যাবে। আবার কেউ আহলে সুন্নাত থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আহলে বিদআত হিসেবে গণ্য হবে। ফলে মুসলমানদের প্রত্যেকের উপর অবস্থা অনুযায়ী বিধান আরোপ করতে হবে। একবাক্যে কোনো হুকুম দেওয়া যাবে না।

বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি বর্জন: উপরে আমরা উল্লেখ করেছি যে, কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণের দাবি করা হলেও সকল মুসলমান কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত অনুসারী নয়। বরং তাদের কেউ কেউ মুসলমান দাবি করা সত্ত্বেও ঈমানের এক বা একাধিক মৌলিক বিষয় লঙ্ঘনের ফলে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে। যেমন বাতেনি, চরমপন্থি রাফেজি, চরমপন্থি খারেজি, চরমপন্থি জাহমিয়্যাহ, কাদিয়ানি সম্প্রদায় ইত্যাদি। আবার অনেকে মৌলিক বিষয় লঙ্ঘনের কারণে নয়, বরং অতিরঞ্জন/অপব্যাখ্যা/স্খলনের দরুন ভ্রান্ত সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য হবে। তারা মুসলিম থাকবে; কিন্তু আহলে বিদআত তথা বিদআতপন্থি ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারী বিবেচিত হবে। যেমন সাধারণ খারেজি, সাধারণ কাদারিয়্যাহ, ভ্রান্ত সুফি, মুতাজিলা, শিয়া সম্প্রদায় ইত্যাদি। আর যারা প্রকৃত অর্থে কুরআন-সুন্নাহর বিশুদ্ধ অনুসারী, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহিনের মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে তারাও সকলে সমপর্যায়ের আহলে সুন্নাত নয়, যেমনটা উপরে বলা হয়েছে। কেউ

শতভাগ আহলে সুন্নাতের অনুসারী হবে, কেউ সামান্য বিচ্যুতির শিকার হবে। কেউ গড়পড়তায় আহলে সুন্নাত হিসেবে গণ্য হবে। এভাবে মুসলমানরা ঈমান ও আকিদার ক্ষেত্রে একাধিক স্তরে বিভক্ত। ফলে সবাইকে সমানভাবে যেমন ভালোবাসা সম্ভব নয়, তেমনই সবাইকে সমানভাবে ঘৃণা করাও সম্ভব নয়। বরং প্রত্যেকের প্রতি ভালোবাসা ও বিদ্বেষ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদার সঙ্গে তার সম্পর্কের নৈকট্য ও দূরত্বের উপর নির্ভর করবে। প্রত্যেকে তার ঈমান ও আকিদা, সুন্নাহর অনুসরণ অনুযায়ী ভালোবাসার অধিকারী হবে। প্রত্যেকের সঙ্গে তার বিদআতের পরিমাণ হিসেবে শত্রুতা রাখা হবে। সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে এ ব্যাপারে আমরা আরও বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, মুসলিম উম্মাহ সেগুলো পারেনি। আকিদার ক্ষেত্রে যেমন উম্মাহ বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ির শিকার হয়েছে, তেমনই মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অতিরঞ্জনের শিকার হয়েছে। কেউ ছাড়াছাড়ি করতে গিয়ে কুফর-শিরককে বিদআত বা মাকরুহের মতো লঘু বানিয়ে দিয়েছে। অনেকে আবার বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে সহনীয় পর্যায়ের ভুল বা স্খলনকে কুফর-শিরকের মতো জঘন্য বানিয়ে দিয়েছে। কেউ শিয়া-সুন্নি-কাদিয়ানি-বাতেনি-কবরপূজারী সবাই ভাই ভাই হয়ে যাওয়ার দিবাস্বপ্নে নিজেদের জীবন শেষ করেছে। আবার কেউ খোদ আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন ধারাকে কাফের-মুশরিকদের মতো শত্রু মনে করেছে। এভাবে একসময় মুসলিম উম্মাহ শত্রুকে ভুলে নিজেরা মারামারিতে লিপ্ত হয়েছে। যেসব বিষয় ঈমানের জন্য মৌলিক নয়, যেগুলো ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী নয়, যেগুলো দুনিয়া, কবর ও হাশরে কোথাও জিজ্ঞাসিত হবার নয়, সেগুলোকে ঈমানের মৌলিক বিষয় বানিয়ে হানাহানিতে লিপ্ত হয়েছে মুসলিম উম্মাহ। একে অপরকে হত্যা করেছে। বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। কাফেরদের চেয়েও সামগ্রিকভাবে আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত মুসলমানরা একে অপরকে বেশি ঘৃণা করা শুরু করেছে। আর এভাবেই মুসলিম উম্মাহর দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গিয়েছে। এক উম্মাহ শতধাবিভক্ত উম্মাহে পরিণত হয়েছে। সময় যত গড়িয়েছে, মুসলিম উম্মাহর বিভেদ ও বিভক্তি ততই বেড়েছে। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করেছে। শহর-নগর ধ্বংস করেছে। মসজিদ-মাদরাসা বিরান করে ফেলেছে। আজ অবস্থা এসে এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে, মুসলমানদের জন্য মুসলমানদের চেয়ে বড় কোনো শত্রু নেই! অথচ সামগ্রিকভাবে আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত সকল মুসলিম

ভাই-ভাই হয়ে থাকতে পারত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের মাঝেও ইসলামি ভ্রাতৃত্বের সুরক্ষা ও ঈমানি ঐক্যের ঝান্ডা বুলন্দ রাখতে পারত।

সুতরাং একদিকে নিজের ঈমান সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখতে, নিজেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন ও তাবে-তাবেয়িন তথা সালাফের পথে রাখতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা শেখা যেমন আবশ্যক, তেমনইভাবে অন্যান্য মুসলিমের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, অন্যদের সঙ্গে কর্মপন্থা কী হবে, সেটা নির্ধারণ করতেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা, (গুরুত্ব ও সংবেদনশীলতার দিক থেকে) আকিদার বিভিন্ন মাসআলার অবস্থান, কোনটা কতটুকু শেখা জরুরি, কোন ক্ষেত্রে স্খলনের ভয়াবহতা কতটা বেশি ইত্যাদি বিষয় শেখা আবশ্যক। সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা ইমাম তহাবি রাহি.-এর লেখা আকিদার ভিত্তিতে সালাফ ও খালাফের মানহাজের আলোকে সেগুলোই ব্যাখ্যা করব, ইনশাআল্লাহ।

ইমাম আবু জাফর তহাবি (২৩৯-৩২১ হি.): তাঁর পুরো নাম আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সালামাহ আত-তহাবি আল-হানাফি আল-মিসরি। তিনি মিশরের ফকিহ ও মুহাদ্দিস। মুসলিম ইতিহাসের বিখ্যাত আলিম ও ইমাম। ২৩৯ হিজরিতে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহি.-এর যুগে মিশরের 'তহা' নামক এলাকায় এক সম্ভ্রান্ত ও ইলমি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সে দিকে সম্বন্ধ করেই তিনি 'তহাবি' নামে পরিচিত হয়েছেন। তার পিতা ও মাতা দুজনই শাফেয়ি মাজহাবের বড় আলিম ছিলেন। বর্ণিত আছে, তাঁর সম্মানিতা মাতা ইমাম শাফেয়ি রাহি.-এর ইলমি মজলিসগুলোতে উপস্থিত হতেন। তাঁর মামা মুজানি রাহি. শাফেয়ির ছাত্র এবং শাফেয়ি মাজহাবের বিখ্যাত ফকিহ হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।[১]

ইমাম তহাবি রাহি. যে যুগে বসবাস করেছেন সেটা ইসলামের ইতিহাসে ইলম চর্চার অন্যতম স্বর্ণযুগ হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলে তাঁর সমকালীন আলিমদের মাঝে অসংখ্য বড় বড় ইমাম, মুহাদ্দিস, মুফতি ও ফকিহ রয়েছেন। তা ছাড়া তিনি ইলমের জন্য মিশরের বাইরে শামের দামেশক, বাইতুল মাকদিস, গাজা, আসকালান-সহ বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেছেন। ফলে তাঁর শিক্ষকদের অনেকেই ইমাম ছিলেন। পরবর্তীকালে

---

১. লিসানুল মিজান, ইবনে হাজার আসকালানি (১/৬২০)।

তাঁর ছাত্রদেরও অনেকে মুসলিম উম্মাহর ইমামে পরিণত হয়েছেন। তহাবি রাহি.-এর শাইখদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন কাজি আবু জাফর আহমদ ইবনে আবু ইমরান বাগদাদি (২৮৫ হি.); তাঁর সূত্রেই তিনি হানাফি মাজহাব ও ইমাম আবু হানিফা রাহি.-এর আকিদার জ্ঞান লাভ করেন; প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও সুনান প্রণেতা ইমাম নাসায়ি (৩০৩ হি.), শাফেয়ির প্রসিদ্ধ শাগরিদ রবি ইবনে সুলাইমান আল-মুরাদি (২৭০ হি.), তাঁর মামা ইমাম ইসমাইল মুজানি (২৬৪ হি.); তিনি লম্বা সময় তাঁর মামা মুজানির সান্নিধ্যে থেকে ইলমি গভীরতা লাভ করেন। আর তাঁর ছাত্রদের মাঝে প্রসিদ্ধ হচ্ছেন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম তাবারানি (৩৬০ হি.), হাফেজ ইবনে আদি (৩৬৫ হি.)।[১]

শাফেয়ি পরিবারে জন্ম এবং শাফেয়ি মাজহাবের শিক্ষকদের কাছে ইলম অর্জন করলেও পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কারণে হানাফি মাজহাব তাঁর কাছে ভালো লাগে এবং অগ্রগণ্য মনে হয়। ফলে তিনি শাফেয়ি মাজহাব ত্যাগ করে হানাফি মাজহাব গ্রহণ করেন। কেবল হানাফি পরিচয়ই নয়; বরং তিনি হানাফি মাজহাবের আলোকে তাফসির, হাদিস, ফিকহ, আকিদা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এত বিস্তৃত খিদমত আঞ্জাম দেন যে, মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে একজন সম্মানিত ইমাম হিসেবে চিরস্থায়ী জায়গা করে নেন। হাদিস ও ফিকহে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান হচ্ছে 'শরহু মাআনিল আসার', 'শরহু মুশকিলিল আসার', 'মুখতাসারুত তহাবি ফিল ফিকহ' ইত্যাদি গ্রন্থ।[২]

অসংখ্য বড় বড় ইমাম ইমাম তহাবি রাহি.-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। মাসলামা ইবনুল কাসিম আল-কুরতুবি রাহি. লিখেছেন, তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য, সম্মানিত, বড় মাপের ফকিহ; বিভিন্ন মাজহাব সম্পর্কে অভিজ্ঞ; উচুঁ মানের লেখক। ইবনে আবদুল বার রাহি. বলেন, আহলে কুফা তথা হানাফি মাজহাব, এই মাজহাবের ইমামগণ এবং তাদের বক্তব্য সম্পর্কে আবু জাফর তহাবির চেয়ে অধিকতর জ্ঞানী কেউ ছিল না। পাশাপাশি সকল মাজহাবের ব্যাপারে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ আলিমদের একজন। ইবনে নাদিম লিখেন, ইলম ও জুহদের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর যুগের অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন।[৩] ৩২১ হিজরিতে ইমাম তহাবি ওফাত লাভ করেন।[৪]

---

১. তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা, সুবকি (২/১৩৩); সিয়ারু আলামিন নুবালা, জাহাবি (১১/৩৬২)।
২. ওয়াফায়াতুল আইয়ান, ইবনে খাল্লিকান (১/৭১)।
৩. আল-ফিহরিস্ত, ইবনে নাদিম (২৫৭); লিসানুল মিজান (১/৬২০)।
৪. ইমাম তহাবি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে শাইখ জাহেদ কাওসারি রচিত 'আল-হাবি ফি সিরাতিল ইমাম আবি জাফর তহাবি' দেখা যেতে পারে।

'আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ' গ্রন্থ: পিছনে আমরা উল্লেখ করেছি, যুগে যুগে আহলে সুন্নাতের ইমামগণ বিশুদ্ধ আকিদার সংরক্ষণ ও ভ্রান্ত মতাদর্শগুলোর খণ্ডনে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে ইমাম তহাবি রাহি.-এর 'আকিদাহ' গ্রন্থ। এটা 'আকিদাহ', 'আকাইদ', 'ইতিকাদ', 'বায়ানু আহলিস সুন্নাহ'-সহ বিভিন্ন নামে পরিচিতি পেয়েছে। গ্রন্থটি সুনিশ্চিতভাবেই ইমাম তহাবির লিখিত গ্রন্থ হিসেবে প্রমাণিত। কেউ কেউ এটাকে ইমাম তহাবির গ্রন্থ কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন। কিন্তু এমন সন্দেহ নিতান্তই মনগড়া, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। কারণ, শতাব্দীর পর শতাব্দী গ্রন্থটি ইমাম তহাবির গ্রন্থ হিসেবেই প্রসিদ্ধ, অন্য কারও নয়। এ কারণে ইমাম তহাবির যুগ থেকেই বিভিন্ন শতকে রচিত গ্রন্থাবলিতে এটার উল্লেখ দেখা যায়। যেমন: ইবনে নাদিম (মৃ. ৪৩৮ হি.) তাঁর প্রসিদ্ধ 'ফিহরিসত' গ্রন্থে উক্ত কিতাবের কথা উল্লেখ করেছেন।[১] ইমাম আবুল মুইন নাসাফি (মৃ. ৫০৮ হি.) তাঁর 'তাবসিরাহ' গ্রন্থে এটাকে 'আকাইদ' নামে উল্লেখ করেছেন এবং সরাসরি এটা থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা করেছেন।[২] কাজি ইসমাইল শাইবানি (৬২৯ হি.) 'শরহুল আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ' নামে ব্যখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। নাজমুদ্দিন মানকুবারস (মৃ. ৬৫২ হি.) এটার উপর 'আন নুরুল লামি' নামে বিস্তৃত ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। ইমাম সুবকি (মৃ. ৭৭১ হি.) উক্ত গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করেছেন এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।[৩] হাজি খলিফা (মৃ. ১০৬৭ হি.) এটাকে 'আকাইদ' নামে উল্লেখ করেছেন এবং এর উপর প্রাচীন কিছু ব্যাখ্যাগ্রন্থের কথাও তুলে ধরেছেন।[৪]

আল্লাহ তায়ালা ছোট্ট ও সংক্ষিপ্ত এই পুস্তিকাটিকে এতটা গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন, যা রীতিমতো বিস্ময়কর ও ঈর্ষণীয়। আহলে সুন্নাতের সকল ধারার সকল মুসলমানের কাছে এটা আকিদার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বহুলপঠিত গ্রন্থ। স্কুল, মাদরাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, মসজিদের হালাকাহ-সহ আরব-অনারবের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উক্ত গ্রন্থটি কমবেশি পড়ানো হয়। এভাবে 'আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ' গ্রন্থটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদার মুখপাত্রে পরিণত হয়েছে। ইমাম তহাবি

---

১. আল-ফিহরিসত (২৫৭)।
২. তাবসিরাতুল আদিল্লাহ, নাসাফি (১/৫৫১-৫৫২)।
৩. তাবাকাতুশ শাফেইয়্যাহ আল-কুবরা, সুবকি (৩/৩৭৮)
৪. কাশফুজ জুনুন, হাজি খলিফা (২/১১৪৩)।

রাহি.-এর ইখলাস, ইলমি মাকাম ও তাকওয়ার পাশাপাশি উক্ত গ্রন্থটির ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার কয়েকটি কারণ আছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

এক. ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর প্রধান দুই শাগরিদ তথা কাজি আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রাহি.-এর বরকত। ইমাম তহাবি রাহি. তার আকিদা গ্রন্থটিকে উপরের তিন ইমামের আকিদার সংকলন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর ওস্তাদদের সিলসিলা ও ইমাম আজমের কিতাবগুলো থেকে তিনি এই আকিদা সংকলন করে থাকবেন। মুসলিম উম্মাহর মাঝে হানাফি মাজহাব এবং ইমাম আবু হানিফা ও সাহেবাইনের উচ্চ মাকামের কারণে হানাফি মাজহাবের অনুসারীদের মাঝে বইটির ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া স্বাভাবিক ছিল। অপরদিকে—যেমনটা আমরা পিছনে বর্ণনা করে এসেছি—ইমাম আবু হানিফা রাহি. একজন তাবেয়ি ও সালাফে সালেহিনের অন্তর্ভুক্ত। ফলে তাঁর আকিদা সালাফেরই আকিদা। আর আকিদার ক্ষেত্রে সালাফের সকল ইমাম এক মানহাজ তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপর অবিচল ছিলেন। ফলে 'আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ' গ্রন্থটি সালাফের আকিদার সংকলন হিসেবে হানাফি মাজহাবের বাইরেও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সকল মাজহাব ও মাসলাকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

তহাবি থেকে ইমাম আজম পর্যন্ত আকিদা (ও ফিকহের) সনদ:
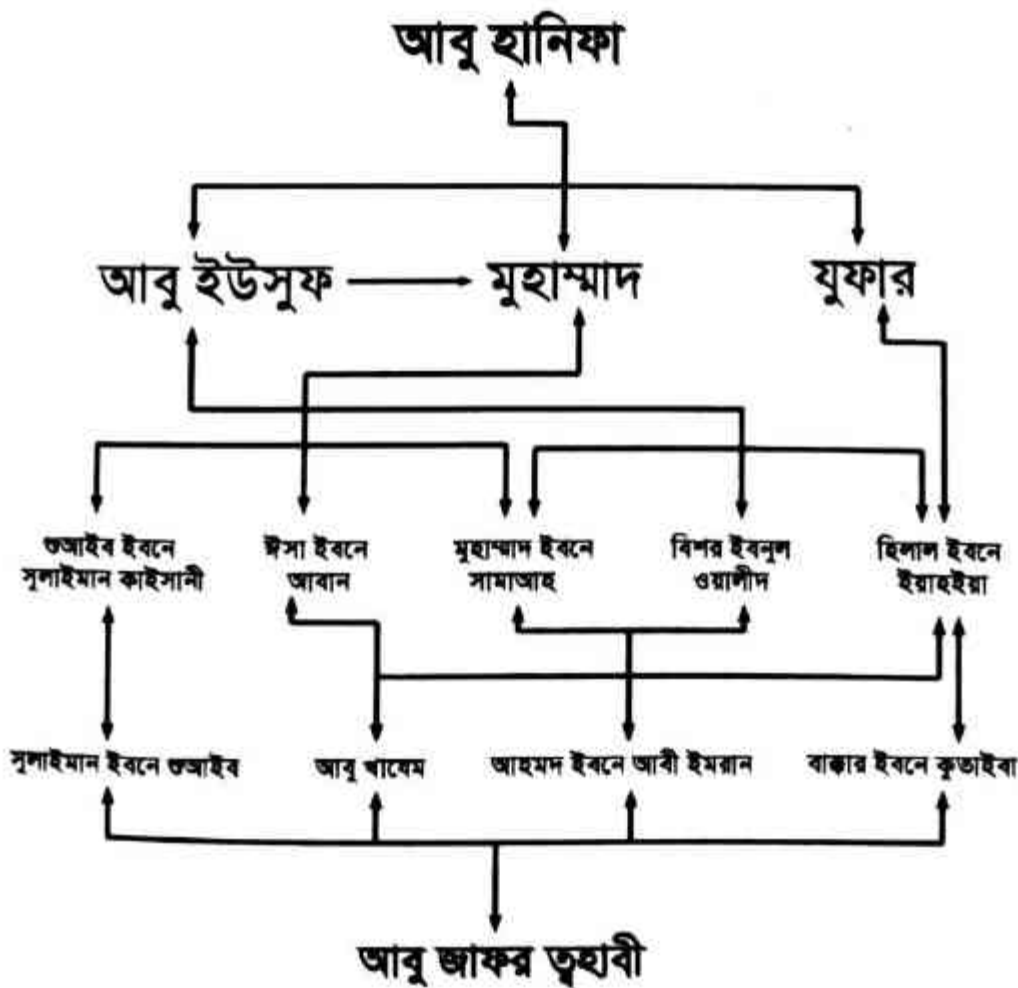
দুই. আহলে সুন্নাতের শাখাগত কিংবা মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া। ফলে ইমাম তহাবির গ্রন্থে আমরা সেসব আকিদা দেখতে পাই না, যেগুলো সাধারণত আহলে সুন্নাতের অন্তর্গত বিভিন্ন ধারার পরিচয়-নির্দেশক। যেমন আল্লাহর জন্য 'হাত', 'চেহারা', 'ইস্তিওয়া', 'নুজুল' ইত্যাদি সাব্যস্ত করা; 'আল্লাহকে সরাসরি উপরের দিকে দেখা', 'অক্ষর ও আওয়াজ-সহ কথা বলা' ইত্যাদি। ইমাম তহাবি রাহি. এসব মাসআলার কিছু কিছু বিষয় উল্লেখ করলেও কোনো বিশেষ মতাদর্শের পরিচয়-নির্দেশক শব্দ ব্যবহার করেননি। একইভাবে তিনি 'আকলি দলিলের ভিত্তিতে আল্লাহর মারিফাত', 'জাওহার ও আরজ', 'তাকউইন', 'কালাম নফসি' ইত্যাদি পরিভাষাগুলোও এড়িয়ে গিয়েছেন। এভাবে ইমাম তহাবি রাহি. আহলে সুন্নাতের নিজেদের মাঝের মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। অথচ তিনি খারেজি, মুতাজিলা, মুরজিয়া, মুশাববিহাহ, ভ্রান্ত সুফি ও শিয়া-সহ অনেক সম্প্রদায়কেই খণ্ডন করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি যেন ইসলামি ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের ডাক দিয়েছেন। নিজেদের শাখাগত মতভেদ পরিত্যাগ করে প্রকৃত অর্থেই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান করেছেন।

তিন. পাশাপাশি কলেবরের দিক থেকে ছোট ও সংক্ষিপ্ত, সহজ শব্দ ও বাক্য, মৌলিক বিষয়গুলোর মাঝেই সীমাবদ্ধতা, জটিল বিষয়গুলোকেও সংক্ষেপে সহজ করে উপস্থাপন ইত্যাদি নানা কারণে বইটি মুসলমানদের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

যুগে যুগে বিভিন্ন ঘরানার আলিম আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সেগুলো প্রত্যেক ধারার নিজস্ব মহলে বহুলপঠিত। আশআরি-মাতুরিদি ধারার মাঝে অন্যতম প্রসিদ্ধ কিছু ব্যাখ্যাগ্রন্থ হচ্ছে: কাজি ইসমাইল শাইবানির (৬২৯ হি.) 'শরহুল আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ', নাজমুদ্দিন মানকুবারস (মৃ. ৬৫২ হি.)-এর 'আন নুরুল লামি ওয়াল বুরহানুস সাতি', হিবাতুল্লাহ তুর্কিস্তানির (মৃ. ৭৩৬ হি.) 'শরহুল আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ', মাহমুদ কওনভির (মৃ. ৭৭০ হি.) 'আল-কালাইদ ফি শরহিল আকাইদ', সিরাজুদ্দিন উমর গজনবির (মৃ. ৭৭৩ হি.) 'শরহু আকিদাতিল ইমাম তহাবি', হাসান কাফি আকহাসারির (মৃ. ১০২৫ হি.) 'নুরুল ইয়াকিন ফি উসুলিদ্দিন', আবদুল গনি

গুনাইমি ময়দানির (মৃ. ১২৯৮ হি.) 'শরহুল আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ', কারি মুহাম্মাদ তৈয়বের (১৪০৩ হি.) 'হাশিয়া', আবদুল্লাহ হাররির 'ইজহারুল আকিদাহ আস সুন্নিয়্যাহ', সাইদ ফুদা'র 'আশ শরহুল কাবির আলাত তহাবিয়্যাহ'। এ ছাড়াও সমকালীন ড. উমর কামেল, আহমদ জাবের জুবরান প্রমুখ তহাবিয়্যাহর ব্যাখ্যা করেছেন। হাসান সাক্কাফও তহাবিয়্যার ব্যাখ্যার নামে একটি গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু সেটা আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহর ব্যাখ্যাগ্রন্থ বিবেচিত হতে পারে না; বরং বিকৃতি বলা যায়। বিপরীতে সালাফি ধারার কিছু প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ হচ্ছে: ইবনে আবুল ইজ (মৃ. ৭৯২ হি.) রচিত 'শরহুল আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ'। সালাফি ধারার পরবর্তী ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো এটাকে কেন্দ্র করেই রচনা করা হয়েছে। সমকালীন সালাফি মাশাইখদের মাঝে শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে মানে', আবদুল আজিজ ইবনে বাজ, আবদুর রহমান আল-বাররাক, নাসিরুদ্দিন আলবানি, আবদুল্লাহ গুনাইমান, সালেহ আল-শাইখ, আবদুল আজিজ রাজেহি, সালেহ ফাওজান প্রমুখ উক্ত গ্রন্থটির ব্যাখ্যা করেছেন।

কিন্তু সর্বমহলে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা, চর্চা ও ব্যাখ্যা লেখার কারণে কিছু জটিলতাও তৈরি হয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় জটিলতা হলো, প্রত্যেক ধারার আলিমগণ নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে ইমাম তহাবি রাহি.-এর বক্তব্যের চেয়েও তারা নিজস্ব ধারার বক্তব্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ইমাম তহাবির বক্তব্য বোঝা ও গ্রহণের পরিবর্তে ইমাম তহাবির মুখ থেকে সেটা বলানোর চেষ্টা করেছেন যা তারা নিজেরা বিশ্বাস ও লালন করেন। ফলে অনেক সময় একই মাসআলায় তহাবিয়্যাহর ব্যাখ্যাতাগণ সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ও বিপরীতমুখী সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, যা আমরা সামনে দেখব। প্রত্যেকে দাবি করেছেন, ইমাম তহাবির গ্রন্থ তাদের মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে। ফলে বিপরীত মতাদর্শের লোকেরা তার গ্রন্থকে বিকৃত করেছে। এভাবে প্রত্যেক ধারার আলিমগণ অন্য ধারার সমালোচনা করেছেন। অথচ প্রত্যেকেই ঘুরেফিরে সমান অভিযোগে অভিযুক্ত। কারণ, তাদের সবার উচিত ছিল গ্রন্থটি নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করা। নিজেদের ব্যাখ্যা ইমাম তহাবির উপর চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে তাঁর বর্ণিত আকিদা অনুযায়ী নিজেদের গড়া। আর কেবল এটা করতে পারলেই আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহর এত বিস্তৃত পঠন-পাঠন ও চর্চা সার্থক হবে; সালাফের আকিদা বোঝা ও গ্রহণ করা সম্ভব হবে। কিন্তু এটার গ্রহণযোগ্যতা ও প্রসিদ্ধির কারণে এটাকে যদি স্রেফ নিজেদের মতাদর্শ

চর্চা ও প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তবে সেটা নিতান্তই দুঃখজনক। অথচ তা-ই হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে।

এ কারণেই অধমের মনে হয়েছে, ইমাম তহাবি রাহি. রচিত জগদ্বিখ্যাত এই সূত্রগ্রন্থটির প্রতি ইনসাফ করা হোক; কোনো সংকীর্ণ ধারায় সীমাবদ্ধ না থেকে, ঘরানার উর্ধ্বে উঠে বরং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিস্তৃত পরিসরে সালাফের মানহাজের আলোকে এই অমূল্য গ্রন্থটিকে ব্যাখ্যা করা হোক; যাতে একদিকে সালাফের আকিদার এই প্রাচীন সংকলনটির স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকে, অপরদিকে সাধারণ পাঠক এটার মূল সংক্ষিপ্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা দুটোর সমন্বয় করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা লাভ করে। আল্লাহর অনুগ্রহে উক্ত পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণই এই গ্রন্থ।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

هَذَا ذِكْرُ بَيَانِ عَقِيدَةِ أَهلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ عَلَى مَذْهَبِ فُقَهَاءِ الـمِلَّةِ: أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ الكُوفِيِّ، وَأَبِي يُوسُف يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ الـحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ، رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَمَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ، وَيَدِينُونَ بِهِ لِرَبِّ العَالَمِينَ.

এই গ্রন্থ মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ তিন ফকিহ ইমাম আবু হানিফা নুমান ইবনে সাবেত আল-কুফি, আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইবরাহিম আল-আনসারি ও আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ শাইবানির মাজহাবের আলোকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদার সংকলন। তারা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোতে যেসব আকিদা পোষণ করতেন এবং যেসব আকিদার আলোকে তারা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ মনোনীত জীবনবিধান অনুসরণ করতেন এখানে সেগুলো বর্ণনা করা হবে।

ব্যাখ্যা

আকিদা ও আহলে সুন্নাতের পরিচয়

আকিদার পরিচয়: আকিদা আরবি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ হলো বিশ্বাস। ইসলামের মূলনীতিগুলোর ব্যাপারে অন্তরের দৃঢ় এবং অনড় বিশ্বাসকে আকিদা বলা হয়।[১] তবে এটা কেবল বিশুদ্ধ আকিদার সঙ্গেই নির্দিষ্ট নয়; বরং যেকোনো বিষয়ে অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসকে আকিদা বলা হয়। সুতরাং আকিদা সত্য-মিথ্যা ও হক-বাতিল দুই রকমই হতে পারে। মুসলমানদের বিশ্বাসের বিষয়গুলোকে যেমন ইসলামি আকিদা বলা হয়, তেমনই অমুসলিমদের বিশ্বাসগুলোকে অমুসলিমদের আকিদা বলা হয়। যেমন: খ্রিষ্টানরা তিন

১. দেখুন: আল-মাওয়াকিফ, আজুদুদ্দিন ইজি (১/৩১); শরহু আকিদাতিল ইমাম আত তহাবি, সিরাজুদ্দিন গজনবি (২৫)।

খোদায় বিশ্বাসী। ফলে সেটা খ্রিষ্টানদের আকিদা। আবার মুসলমানদের আকিদাও বিশুদ্ধ ও অশুদ্ধ দুটোই হতে পারে। যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী, তারা সহিহ তথা বিশুদ্ধ আকিদার অধিকারী। আর যারা কবরপূজা-সহ বিভিন্ন কুফর, শিরক ও বিদআতের মাঝে নিমজ্জিত, তারা বাতিল তথা ভ্রান্ত আকিদার অনুসারী।

অনেকে মনে করেন, 'আকিদা' শব্দটি বিদআত। কারণ, কুরআন-সুন্নাহে এটি আসেনি, পরবর্তী লোকেরা উদ্ভাবন করেছেন। কিন্তু উক্ত ধারণা সঠিক নয়। হ্যাঁ, কুরআনে 'আকিদা' শব্দটি সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি। তবে হাদিসে এর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে মুসলিমের হৃদয়ে তিনটি বিষয় **দৃঢ়ভাবে গেঁথে যাবে,** সে জান্নাতে প্রবেশ করবে: আমলে নিষ্ঠা, শাসকদের জন্য কল্যাণকামনা এবং মুসলিম জামাতের সঙ্গে থাকা।'[১] পরবর্তীকালে আহলে সুন্নাতের ইমামগণ উক্ত নামটি ঈমানের সমার্থক হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং তাদের গ্রন্থাবলিতে ব্যবহার করেছেন। হ্যাঁ, এটার পাশাপাশি যুগে যুগে ইসলামি আকিদা বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল এবং সেসব নামে ইমামগণ একাধিক গ্রন্থ লিখেছেন। তন্মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য নাম ও সেসব নামের গ্রন্থ হচ্ছে:

এক. 'তাওহিদ'। উক্ত নামে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে: ইমাম আবু মানসুর আল-মাতুরিদির 'কিতাবুত তাওহিদ', ইজ ইবনে আবদুস সালামের 'রাসাইল ফিত তাওহিদ', ইবনে মানদাহর 'কিতাবুত তাওহিদ', ইবনে রজবের 'কিতাবুত তাওহিদ' এবং মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাবের 'কিতাবুত তাওহিদ' ইত্যাদি।

দুই. 'আল-ফিকহুল আকবার'। ইমাম আবু হানিফা রাহি.-এর 'আল-ফিকহুল আকবার'।

তিন. 'সুন্নাহ'। যেমন: ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহি.-এর 'উসুলুস সুন্নাহ' এবং আবু বকর খাল্লালের 'আস-সুন্নাহ'।

চার. 'শরিয়াহ'। আজুররির 'আশ শরিয়াহ'।

পাঁচ. 'ঈমান'। যেমন: আবু উবাইদ কাসেম ইবনে সাল্লামের 'কিতাবুল ঈমান', ইবনে মানদাহর 'আল-ঈমান' এবং ইবনে তাইমিয়ার 'আল-ঈমান'।

---

১. মুসনাদে দারেমি (২৩৫)।

ছয়. 'উসুলুদ্দিন'। যেমন: ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরির 'আল-ইবানা আন উসুলিদ দিয়ানা', আবদুল কাহের বাগদাদির 'উসুলুদ্দিন'। ফখরুদ্দিন রাজির 'মাআলিমু উসুলিদ্দিন', আবুল ইউসর বাজদাবির 'উসুলুদ্দিন' এবং নাসাফির 'তাবসিরাতুল আদিল্লাহ ফি উসুলিদ্দিন'।

সাত. 'আকিদাহ'। যেমন: ইমাম তহাবির এই গ্রন্থ 'আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ', নাসাফির 'উমদাতু আকিদাতি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ', তাফতাজানির 'শরহুল আকাইদ আন নাসাফিয়্যাহ', সাবুনির 'আকিদাতুস সালাফ আসহাবিল হাদিস', সানুসির 'আকিদাহ সানুসিয়্যাহ', শারানির 'আল ইওয়াকিত ওয়াল জাওয়াহির ফি বায়ানি আকায়িদিল আকাবির' এবং' ইবনে তাইমিয়ার 'আল-আকিদাহ আল-ওয়াসিতিয়্যাহ'।

আট. 'ইতিকাদ'। যেমন: বাইহাকির 'আল-ইতিকাদ ওয়াল হিদায়াহ ইলা সাবীলির রাশাদ', গাজালির 'আল-ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ, বাকিল্লানির 'আল-ইনসাফ ফি মা ইয়াজিবু ইতিকাদুহু ওয়ালা ইয়াজুজুল জাহলু বিহি' এবং লালাকায়ির 'শরহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'।

নয়. ইলমুল কালাম।[১] যেমন: শাহরাস্তানির 'নিহায়াতুল ইকদাম ফি ইলমিল কালাম', আবুল কাসেম আনসারির 'আল-গুনইয়াহ ফি ইলমিল কালাম', আজুদুদ্দিন ইজির 'আল-মাওয়াকিফ ফি ইলমিল কালাম'।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচয়: 'সুন্নাহ' শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো পথ ও পদ্ধতি। মোটা দাগে দ্বীনের পথকেই সুন্নাহ বলা হয়। অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের পথই সুন্নাহর পথ। হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা আমার সুন্নাহ এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত

---

১. আকিদাকে ইলমুল কালাম সাব্যস্ত করা আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত মতামত নয়। বিশেষত আশআরি-মাতুরিদি ধারার উলামায়ে কেরাম 'আকিদা'কে 'কালাম' আখ্যা দেন। এখানে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। কারণ, ইমাম তহাবি তাঁর গ্রন্থে 'আকিদা' এবং 'উসুলুদ্দিন' পরিভাষা দুটো ব্যবহার করেছেন; কালাম পরিভাষাটি কোথাও ব্যবহার করেননি, কিংবা এটা নিয়ে কোনো কথা বলেননি। তাই যে সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণের মাঝে আমরা সীমাবদ্ধ থাকতে চাচ্ছি সেটা হলো, ইলমুল কালামকে ঘিরে অধিকাংশ মানুষ দুই ধরনের প্রান্তিকতার শিকার। একদল কালামের মাধ্যমেই আকিদা বুঝতে চান; আরেক দল কালামকে সর্বোতভাবে বর্জনীয় ও নিন্দাযোগ্য মনে করেন। কিন্তু মুহাক্কিক ও মুতাদিল আহলে সুন্নাতের অবস্থান দুই প্রান্তিকতার মাঝামাঝি। আকিদার ভিত্তি ও বিচরণক্ষেত্র (মাসদার ও মারজি) হবে কুরআন ও সুন্নাহ। প্রয়োজনে কালামকে সহায়ক ইলম হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে, ঠিক যে উদ্দেশ্যে এর প্রকাশ ঘটেছিল।

খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরো'।[১] 'জামাত' শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো দল ও গোষ্ঠী। এখানে 'জামাত' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম এবং তাদের সত্য অনুসারীগণ।[২] সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা বলতে বোঝানো হয়: কুরআন-সুন্নাহ থেকে উৎসারিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, সালাফে সালেহিন এবং প্রত্যেক যুগে উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ হকপন্থি ইমাম ও আলিমদের অনুসৃত আকিদা, যা সকল বিভ্রান্তি-বিচ্যুতি, সকল বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়িমুক্ত মধ্যপন্থি বিশ্বাস।[৩]

এ ব্যাপারটি ইমামদের বানানো নয়; বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত; বিশেষত 'উম্মতের তিয়াত্তর ফিরকায় বিভক্ত'-বিষয়ক হাদিসটি। সেখানে কেবল একটি সম্প্রদায়কে নাজাতপ্রাপ্ত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আর তারা হলো রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহর উপর অবিচল 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত'।[৪] সুতরাং যেসব ফিরকা তাদের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে, তারা গোমরা ও বিদআতি ফিরকা হিসেবে গণ্য হবে। যেমন: খারেজি, মুরজিয়া, শিয়া, কাদারিয়্যাহ, জাবরিয়্যাহ, মুতাজিলা ও সকল বাতেনি সম্প্রদায়। পিছনে আমরা আহলে সুন্নাতের আকিদা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। সামনে এগুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনা আসবে, ইনশাআল্লাহ।

ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ: মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে ইমাম তহাবির আগে অসংখ্য বড় বড় ফকিহ গত হয়েছেন। তাদের মাঝে ইমাম আবু হানিফা এবং তাঁর শিষ্যদ্বয়ের নাম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো আলো ছড়াচ্ছে।

---

১. সুনানে আবু দাউদ (৩৯৯১); সুনানে তিরমিজি (২৬০০); সুনানে ইবনে মাজা (৪২); জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, ইবনে রজব (২/১২০)।

২. দেখুন: আল ইতিসাম, শাতেবি (২/২৬১-২৬৫); গজনবি (২৬)।

৩. দেখুন: শরহুল আকিদাহ আত তহাবিয়্যাহ, আবদুল গনি আল-গুনাইমি (৪৪); নুরুল ইয়াকিন ফি উসুলিদ্দিন ফি শরহি আকায়িদিত তহাবি, হাসান কাফি আকহাসারি (১০৬)।

৪. হাদিসটি আবু হুরাইরা, মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান, আনাস ইবনে মালিক রাজি.-এর সূত্রে আবু দাউদ (৪৫৮৬), তিরমিজি (২৭৭৮), ইবনে মাজা (৩৯৯১) মুসনাদে আহমদ (৮৩৭৭)-সহ অসংখ্য গ্রন্থে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। তবে এর শেষাংশ 'একটি দল ব্যতীত সবাই জাহান্নামে যাবে' এটার উপর ইবনে হাজাম, ইবনুল উজির-সহ কিছু আলিম আপত্তি করেছেন। কিন্তু তাদের আপত্তি শক্তিশালী নয়। তিয়াত্তর দলের একটি দল ব্যতীত বাকি সবাই কাফের কিংবা চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে হাদিসে এমন বলা হয়নি। বরং তারা একাধিক ভাগে বিভক্ত। তাদের মাঝে যারা কুফর ও সুস্পষ্ট শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করবে, তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামি। আর যারা বিদআতপন্থি ও গোমরাহ, কিন্তু ঈমানের গণ্ডিভুক্ত, তারা সাময়িকভাবে জাহান্নামে যাবে কিংবা আল্লাহ তাদের গুনাহ ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। দেখুন: আকহাসারি (৯৯-১০০), গুনাইমি (৪৪-৪৫), আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম, (১/১৮৬)। আরও দেখুন আবদুল্লাহ জুদাই'কৃত আজওয়া আলা হাদিসি ইফতিরাকিল উম্মাহ।

ইমাম আবু হানিফা (৭০-১৫০হি.): 'ইমাম আজম' তথা সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। নাজর ইবনে শুমাইল বলেন, 'মানুষ ফিকহ সম্পর্কে নিদ্রামগ্ন ছিল। আবু হানিফা এসে তাদের জাগ্রত করেছেন।' ইমাম শাফেয়ি বলেন, 'ফিকহের ক্ষেত্রে মানুষ আবু হানিফার উপর নির্ভরশীল।' শাফেয়ি ইমাম মালেককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি আবু হানিফাকে দেখেছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি দেখেছি এমন এক ব্যক্তিকে, চাইলে তিনি কাঠের খুঁটিকেও স্বর্ণ বানিয়ে ফেলতে পারেন'।[১] ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'কে বড় ফকিহ? মালেক নাকি আবু হানিফা?' তিনি বললেন, 'আবু হানিফা।' মক্কি ইবনে ইবরাহিম বলেন, 'আবু হানিফা তার যুগের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী ছিলেন।' আলি ইবনে আসেম বলেন, 'আবু হানিফার ইলমকে যদি তার যুগের সবার ইলমের সঙ্গে তুলনা করা হতো, তবে তার ইলম ভারী হতো'![২]

ইমাম আবু হানিফা রাহি. সাহাবাদের শেষ যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাদের কয়েকজনকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন বিখ্যাত সাহাবি আনাস ইবনে মালেক রাজি.। তিনি তাবেয়িদের হাতে বড় হয়েছেন এবং তাদের কাছ থেকে ইলম শিখেছেন, মুনাজারা করেছেন। ফলে তিনি সেই শ্রেষ্ঠ তিন প্রজন্মের অন্তর্ভুক্ত, যাদের ব্যাপারে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষ্য দিয়েছেন, 'তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম হচ্ছে আমার সঙ্গে বিদ্যমান প্রজন্ম। এরপর যারা তাদের পরে আসবে। এরপর যারা তাদের পরে আসবে'।[৩]

ফলে কেবল ইলম নয়, আমলের ময়দানেও তিনি ছিলেন প্রথম সারিতে। আলি ইবনে ইয়াজিদ বলেন, 'আমি আবু হানিফাকে এক রমজানে ষাটবার কুরআন কারিম খতম করতে দেখেছি; ত্রিশ খতম দিনে, ত্রিশ খতম রাতে।' হাফস ইবনে গিয়াস বলেন, 'আবু হানিফা চল্লিশ বছর ইশার ওজু দ্বারা ফজরের নামাজ পড়েছেন'।[৪] খলিফা হারুনুর রশিদ আবু ইউসুফ রাহি.-কে আবু হানিফা রাহি. সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু থেকে তিনি ছিলেন অনেক দূরে। দুনিয়াদারকে তিনি এড়িয়ে চলতেন। অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন। গভীর চিন্তার মাঝে ডুবে রইতেন। তিনি বেশি কথা বলতেন না। যদি কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করত এবং তিনি সেটা জানতেন, তবে জবাব

---

১. দেখুন: তারিখে বাগদাদসূত্রে গজনবি (২৮)।
২. মানাকিবু আবি হানিফা, জাহাবি (৩২); দেখুন: ইলাউস সুনান (১৯/৩০৭-৩৩৮)।
৩. বুখারি (২৪৫৭); মুসলিম (৪৫৯৯); তিরমিজি (২১৪৭)।
৪. দেখুন: তারিখে বাগদাদসূত্রে গজনবি (২৮)।

দিতেন। আমিরুল মুমিনিন, আমি তাকে সর্বদা তার নিজেকে ও নিজের দ্বীনকে সুরক্ষিত রাখতে দেখেছি। তিনি মানুষের পিছনে পড়তেন না। কারও মন্দ আলোচনা করতেন না!' হারুনুর রশিদ বললেন, 'এটাই সালেহদের চরিত্র!' আবু আসেম নাবিল বলেন, 'অত্যধিক নামাজের কারণে আবু হানিফা রাহি.-কে 'আওতাদ' নামে ডাকা হতো।' আবু ইউসুফ রাহি. বলেন, 'আবু হানিফা রাহি. প্রত্যেক রাতে নামাজে কুরআন খতম করতেন।' আবু ইউসুফ আরও বলেন, 'একদিন আমি ইমামের সঙ্গে হাঁটছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বলল, তিনি আবু হানিফা। তিনি রাতে ঘুমান না। তখন ইমাম বললেন, তারা আমার ব্যাপারে কেন এমন কথা বলে যা আমি করি না? (এভাবে তিনি লুকোতে চাইলেন)। বাস্তবে তিনি সারা রাত নামাজ, দোয়া ও মুনাজাত করে কাটাতেন'![১] তিনি ছিলেন উম্মাহর শ্রেষ্ঠ জাহেদদের অন্তর্ভুক্ত। শাসকদের দরবার থেকে অনেক দূরে। তাদের বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতি সম্পর্কে সরব সংগ্রামী মুজাহিদ।

আকিদার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রাহি. সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িদের আকিদার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিভিন্ন ভ্রান্ত দল তথা নাস্তিক (মুলহিদ), জিন্দিক, খারেজি, কাদারিয়্যাহ, মুরজিয়া, শিয়া, জাহমিয়্যাহ-সহ বিভিন্ন ফিরকার বিরুদ্ধে কঠোর ছিলেন। প্রায় সময়ই তাদের খণ্ডন করতেন। কুরআন-সুন্নাহ ও যুক্তি দিয়ে ইসলামবিরোধীদের পরাভূত করার ক্ষেত্রে সে যুগে ইমাম আবু হানিফা রাহি.-এর মতো ব্যক্তিত্ব বিরল ছিল।[২] এ কারণে তার একাধিক শাগরিদ তাঁর আকিদাকে 'আল-ফিকহুল আকবার', 'আল ফিকহুল আবসাত', 'আর-রিসালাহ', 'আল-ওসিয়্যাহ'-সহ বিভিন্ন কিতাবে সংরক্ষণ করেছেন। ইমাম তহাবি রাহি. সেই ধারাবাহিকতাকে পূর্ণতা দান করেছেন। এভাবে ইমাম আবু হানিফা রাহি.-কেবল ফিকহের নয়; বরং সহিহ আকিদার ইমাম হিসেবেও প্রথম সারিতে রয়েছেন।

হাদিসের ময়দানেও তিনি ছিলেন অগ্রগামী অশ্বারোহী। হাদিসের প্রতি তিনি ছিলেন পরম শ্রদ্ধাশীল। হ্যাঁ, তিনি অনেক প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসদের মতো কেবল হাদিস বর্ণনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন না; বরং হাদিস থেকে ফিকহ ইসতিমবাতের কাজেই অধিক সময় ব্যয় করতেন। এ কারণে তাঁর হাদিসের রেওয়ায়াত তুলনামূলক কম। কিন্তু এতে অনেকের ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে যে, তিনি মুহাদ্দিস ছিলেন না। অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এত বড় মাপের একজন ফকিহ ইমাম মুহাদ্দিস হন না কী করে? এ কারণে

---

১. মানাকিবু আবি হানিফা, জাহাবি (২০-২১)।

২. দেখুন: কামালুদ্দিন বসনবি কৃত 'ইশারাতুল মারাম'।

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন-সহ অনেক বড় বড় মুহাদ্দিস তাকে 'সিকাহ' বলেছেন। ইমাম আবু দাউদ বলেছেন, 'আল্লাহ মালেককে রহম করুন। তিনি ইমাম ছিলেন। আল্লাহ আবু হানিফাকে রহম করুন। তিনি ইমাম ছিলেন'![1] তাঁর থেকে বর্ণিত হাদিসগুলো 'মাসানিদ' আকারে একাধিক মুহাক্কিক আলিম সংকলন করেছেন। তাতেই হাদিসশাস্ত্রে তার অবস্থান নির্ণয় করা যায়। ইমাম ইয়াহইয়া আল-কাত্তান, ইবনে আবদুল বার, নববি, ইবনে কাসির, ইবনে হাজার সবাই তাকে 'তাওসিক' করেছেন। তিনি হাদিসের হাফেজ ও নাকেদ ছিলেন। জারহ ও তাদিলের অধিকারী ছিলেন। হ্যাঁ, অনেক মানুষ হিংসা ও বিভিন্ন কারণে তাঁর উপর আক্রমণ করেছেন। অতীত ও সমকালের কেউ কেউ হাদিসের ক্ষেত্রে তাকে জয়িফ বলেছেন। এগুলো গ্রহণযোগ্য বক্তব্য নয়।[2] বিভিন্ন মুহাদ্দিস কর্তৃক তাঁর সমালোচনাকে ইমাম ইবনে আবদুল বার 'বাড়াবাড়ি' ও 'সীমালঙ্ঘন' আখ্যা দিয়েছেন।[3]

ইমাম কাজি আবু ইউসুফ (মৃ. ১৮২ হি.): তিনি ইমাম আবু হানিফা রাহি.-এর শীর্ষ শাগরিদ। দীর্ঘ প্রায় সতেরো বছর তাঁর সোহবত ও সান্নিধ্যে কাটান। ফলে কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয়ে ওঠেন। তিনি একাধারে ফকিহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন বলতেন, 'ফকিহদের মাঝে আবু ইউসুফের চেয়ে বড় কোনো ফকিহ আমি দেখিনি।' মুজানি বলেন, 'তিনি হাদিসের অনুসরণে সবার অগ্রগামী ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু দুনিয়ার লালসা ও ব্যস্ততা থেকে সারা জীবন দূরে ছিলেন।' মুহাম্মাদ ইবনে সামাআহ বলেন, 'কাজির দায়িত্ব গ্রহণের পরেও আবু ইউসুফ প্রতিদিন দুই শত রাকাত নামাজ পড়তেন।' স্বীয় ওস্তাদের মতো তিনিও আকিদার ক্ষেত্রে সালাফের মানহাজে অবিচল ছিলেন। কাদারিয়্যাহ, জাহমিয়্যাহ, মুরজিয়া-সহ ভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলোর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর ও সরব ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের পিছনে নামাজ পড়তেও নিষেধ করতেন। কাদারিয়্যাহদের মাঝে যারা গুলু করত, তাওবা না করলে হত্যার ফতোয়া দিয়েছিলেন। অতিরিক্ত তাকওয়ার কারণে মৃত্যুর সময় বলে যান, 'আমি জীবনে যত ফতোয়া দিয়েছি, তাতে কুরআন ও মুসলমানদের ইজমাবিরোধী কিছু থাকলে,

---

১. মানাকিবু আবি হানিফাহ, জাহাবি (৪৫-৪৬)।
২. বিস্তারিত দেখুন: ইমাম ইবনে আবদুল বার কৃত 'আল-ইনতিকা'; ইলাউস সুনান, জফর আহমদ উসমানি (২১/৩০-৩৬); শাইখ আবদুর রশিদ নুমানিকৃত 'মাকানাতুল ইমাম আবি হানিফা ফিল হাদিস'; ড. কাসেম হারেসিকৃত 'মাকানাতুল ইমাম আবি হানিফা বাইনাল মুহাদ্দিসিন'।
৩. জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহি (২/২৮৯)।

সেগুলো প্রত্যাহার করে নিলাম![১] ফিকহের ক্ষেত্রে তাঁর কিতাব 'আল-খারাজ' আজও বিখ্যাত ও বহুলপঠিত।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানি (মৃ. ১৮৯ হি.): কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহ তিন শাস্ত্রের ইমাম ও মুজাদ্দিদ ছিলেন। আবু উবাইদ বলেন, 'আমি মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের চেয়ে আল্লাহর কালাম সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী কাউকে দেখিনি!' ইমাম শাফেয়ি বলেন, 'তিনি এমনভাবে কুরআন পড়তেন, মনে হতো আল্লাহ তাঁর ভাষায় কুরআন নাজিল করেছেন।' শাফেয়ি আরও বলেন, 'আমি মুহাম্মাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী, বড় ফকিহ, বড় জাহেদ, অধিকতর মুত্তাকি আর কাউকে দেখিনি।' আমলের ক্ষেত্রেও তিনি তার সালাফদের মতো অগ্রগামী ছিলেন। তহাবি বর্ণনা করেন, 'মুহাম্মাদ রাহি. প্রত্যেক দিন কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করতেন।' ফিকহের ক্ষেত্রে তার একাধিক কিতাব দ্বারা আজও ফুকাহা ও উলামায়ে কেরাম প্রতিনিয়ত উপকৃত হয়ে চলেছেন।[২]

দ্বীনের ক্ষেত্রে এই ইমামত্রয়ের বিপুল খেদমত, অন্য সকল ইমামের মাঝে তাদের শীর্ষ অবস্থান এবং তাদের আকিদার বিশুদ্ধতার ফলেই ইমাম তহাবি নিজে একজন যুগশ্রেষ্ঠ আলিম, ফকিহ ও ইমাম হওয়া সত্ত্বেও এবং আবু হানিফা ও তাঁদের সঙ্গীদ্বয়ের যুগ না পাওয়া সত্ত্বেও বিশুদ্ধ পন্থায় সংরক্ষিত তাদের বিশুদ্ধ আকিদা গ্রহণ করেছেন, প্রচার করেছেন এবং যুগ যুগ ধরে সেগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। এই গ্রন্থটি সেই ধারাবাহিকতারই ফলাফল।[৩]

তবে যেমনটা পূর্বে বলা হয়েছে, এখানে কেবল এই তিন ইমামের নাম আনার অর্থ এটা নয় যে, এগুলো কেবল তাদেরই আকিদা। বরং উক্ত তিন ইমামের আকিদা মূলত আহলে সুন্নাতের অনুসারী সকল ইমামের আকিদা। শাখাগত কিছু মাসআলাতে মতানৈক্য থাকলেও ইমাম আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি, আহমদ, বুখারি, মুসলিম-সহ উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের সবার আকিদা এক ও অভিন্ন—আকিদায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত।[৪]

---

১. আখবারু আবি হানিফা ওয়া আসহাবিহি, সাইমারি (৯৯-১১০); মানাকিবু আবি হানিফা, জাহাবি (৬২-৬৭, ৭৩)।
২. আখবারু আবি হানিফা ওয়া আসহাবিহি, সাইমারি (১২৭-১২৮); মানাকিবু আবি হানিফা, জাহাবি (৮০, ৮৭, ৯৪)।
৩. দেখুন: গজনবি (২৯)।
৪. দেখুন: আত-তালিকাতুল মুখতাসারাহ আলা মাতনিল আকিদাহ আত তহাবিয়্যাহ, সালেহ ফাওজান (২০); আত-তাওজিহাতুল জালিয়্যাহ আলা শরহিল আকিদাহ আত তহাবিয়্যাহ, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আল-খুমাইয়িস

ইবনে তাইমিয়া লিখেন: 'শাফেয়ি, মালেক, সাওরি, আওজায়ি, ইবনুল মুবারক, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ সবার আকিদা ছিল এক ও অভিন্ন। এই একই আকিদা লালন করতেন ফুজাইল ইবনে ইয়াজ, আবু সুলাইমান দারানি, সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুসতরি প্রমুখ মাশায়েখে কেরাম। দ্বীনের মৌলিক আকিদার ক্ষেত্রে এসব ইমাম মতভেদ করেননি। একই আকিদা পোষণ করতেন ইমাম আবু হানিফা। তাওহিদ, তাকদির ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর থেকে বর্ণিত আকিদা অন্যান্য ইমামের আকিদার মতোই। আর এটাই সাহাবি ও তাবেয়িদের আকিদা, কুরআন ও সুন্নাহর আকিদা'।[১]

(৩০-৩১); আশ শারহুল কাবির আলাল আকিদাহ আত তহাবিয়্যাহ, সাইদ ফুদাহ (২৯-৩০)। আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহর একজন সমকালীন ব্যাখ্যাকার হাসান সাক্কাফ দাবি করেছেন, তহাবির আকিদা কেবল তহাবিরই প্রতিনিধিত্ব করে, আবু হানিফা-সহ অন্যান্য ইমামের আকিদার প্রতিনিধিত্ব করে না। এটা ভিত্তিহীন দাবি। দেখুন: সহিহু শারহিল আকিদাহ আত তহাবিয়্যাহ, হাসান ইবনে আলি আস সাক্কাফ (২১)।

১. মাজমুউল ফাতাওয়া ৫/২৫৬।

قَالَ الإِمَامُ أبو حَنِيْفَةَ وبه قَالَ الإِمَامَانِ الْمَذْكُوْرَانِ رضي الله عنهم: نَقُولُ فِي تَوحِيدِ اللهِ مُعْتَقِدِينَ بِتَوفِيقِ اللهِ: إِنَّ اللهَ وَاحِدٌ لا شَرِيكَ لَهُ، وَلا شَيءَ مِثلُهُ، وَلا شَيءَ يُعْجِزُهُ، وَلا إِلَهَ غَيْرُهُ.

ইমাম আবু হানিফা এবং তাঁর দুই শাগরিদ ইমাম রাজি. বলেন: আল্লাহর তাওফিকে আমরা পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে তাওহিদের এই ঘোষণা দিচ্ছি: নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এক। তাঁর কোনো শরিক নেই। তাঁর মতো কিছু নেই। কোনোকিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।

ব্যাখ্যা
তাওহিদ ও শিরক

তাওহিদের পরিচয়: একজন মুসলিমের জীবনের মূলধন হলো তাওহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদ। এটার মাধ্যমেই জীবনের পথচলা শুরু। এটার উপরই জীবনের সকল কাজ-কর্ম নির্ভরশীল। আবার এটাই পরকালে মুক্তির একমাত্র মানদণ্ড। পৃথিবীর সকল নবি-রাসুল তাওহিদ প্রচারের জন্য এসেছেন। তাওরাত, জাবুর, ইনজিল, কুরআন-সহ সকল আসমানি গ্রন্থ নাজিল হয়েছে তাওহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ.

অর্থ: 'আমি আপনার পূর্বে যত রাসুল পাঠিয়েছি, সবাইকে এই প্রত্যাদেশ করেছি যে, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো' [সুরা আম্বিয়া: ২৫]। বরং কুরআনের সূচনা হয়েছে তাওহিদের মাধ্যমেই :

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ.

অর্থ: 'সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার জন্য।' তাওহিদের এই গুরুত্বের ফলে ইমাম তহাবি তাঁর বইয়ে সর্বপ্রথম তাওহিদের আলোচনাই এনেছেন।[১]

তাওহিদের শাব্দিক অর্থ হলো এক সাব্যস্ত করা, একত্ববাদে বিশ্বাস করা। পরিভাষায় তাওহিদ বলা হয়: আল্লাহর সত্তা, তাঁর সকল নাম, গুণ ও কর্মে তাকে একক ও অদ্বিতীয় বলে ঘোষণা করা। তাকে একমাত্র প্রতিপালক ও বিধানদাতা হিসেবে বিশ্বাস করা। একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা।[২]

তাওহিদের প্রকারভেদ: কুরআন-সুন্নাহ এবং সালাফের গ্রন্থাবলিতে তাওহিদের সুস্পষ্ট কোনো প্রকারভেদ দেখা যায় না। অর্থাৎ তাওহিদ মানে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দেওয়া—চাই সেটা বিশ্ব সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে হোক, আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে হোক, কিংবা তাঁর সত্তা, কর্ম, নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে হোক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কিছু আলেম তাওহিদকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে তাওহিদের তিনটি ভাগ: **এক.** রবুবিয়্যাহ তথা আল্লাহর সকল কাজের (যেমন সৃষ্টি করা, রিজিক, জীবন ও মৃত্যু দেওয়া ইত্যাদি) ক্ষেত্রে একমাত্র তাকেই প্রভু হিসেবে মেনে নেওয়া। **দুই.** উলুহিয়্যাহ তথা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। **তিন.** তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত অর্থাৎ আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে অন্য কাউকে শরিক না করা। এ ব্যাপারে কিছু কিছু ইশারা-ইঙ্গিত পাওয়া যায় ইবনে বাত্তার লেখায়।[৩] ইমাম ইবনে তাইমিয়া এই চিন্তাকে আরও সামনে এগিয়ে নেন ও প্রতিষ্ঠিত করেন।[৪] পরবর্তীকালে তাঁর চিন্তাধারা ও আকিদার অনুসারীদের মাঝে এটা প্রশ্নাতীত ও অকাট্য বিষয়ে পরিণত হয়।

বস্তুত তাওহিদের উক্ত প্রকারভেদ কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কিছু নয়; বরং এটাকে মানুষের আকিদা শেখা ও বোঝার সহজ পদ্ধতি বলা চলে। ফলে ইজতিহাদ হিসেবে এটাতে সমস্যা ছিল না। এ কারণে দেখতে পাই, অন্যান্য ধারার আলিমগণও এর কাছাকাছি বক্তব্য দিয়েছেন, যেমন তহাবিয়্যার ব্যাখ্যাকার সিরজুদ্দিন গজনবি,[৫] আল-

---

১. দেখুন: শরহুল আকিদাহ আত তহাবিয়্যাহ, শুজাউদ্দিন হিবাতুল্লাহ তুর্কিস্তানি, পৃ. ৪৮; গজনবি (৩২)।

২. গজনবি (৩২)।

৩. আল-ইবানাতুল কুবরা, ইবনে বাত্তা (৬/১৪৯)। এখানে তিন প্রকারের প্রাথমিক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হুবহু তিন প্রকার নয়, যা পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

৪. মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া (১০/২৪৯)

৫. দেখুন: গজনবি (৩৩)।

ফিকহুল আকবারের ব্যাখ্যাকার মোল্লা আলি কারি।[১] কিন্তু সমস্যা হলো, আগের যুগের আলিমদের কাছ থেকে তাওহিদের এই প্রকারভেদ পাওয়া গেলেও তারা এক্ষেত্রে বিচ্যুতির শিকার হননি, যার শিকার পরবর্তী লোকেরা হয়েছেন। তারা তাওহিদুল উলুহিয়্যাহকে রবুবিয়্যাহ থেকে আলাদা করে এই দ্বিতীয় প্রকারের তাওহিদকেই মূল তাওহিদ ধরে প্রথমটাকে গৌণ মনে করেন। বরং সময় যত অতিক্রান্ত হয়েছে, তাওহিদুর রবুবিয়্যাহ তাদের কাছে তত গৌণ হয়ে গিয়েছে। তাদের ধারণা, দুনিয়ার সকল লোক প্রথম প্রকারের তাওহিদে বিশ্বাসী। কিছু নগণ্য লোক বাদে কেউ তাওহিদুর রবুবিয়্যাহকে অস্বীকার করেনি! আরবের মুশরিকরাও প্রথম প্রকারের তাওহিদে বিশ্বাসী ছিল! কেবল প্রথম প্রকার নয়, বরং তারা তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাতেও বিশ্বাসী ছিল! ফলে তাদের মতে, 'নবিগণ এই তাওহিদ শেখাতে আসেননি; তারা এসেছেন তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ শেখাতে।' উপরন্তু তারা তাদের মানহাজের আলোকে তাওহিদকে ভাগ না করার ফলে অন্যদের সমালোচনাও করেন।

এমন ধারণার সূত্রপাত মূলত রবুবিয়্যাহ বোঝার ক্ষেত্রে জটিলতা থেকে। তারা রবুবিয়্যাহ বলতে কেবল বুঝেছেন পৃথিবী ও পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি এবং পরিচালনা। কুরআনে এ ব্যাপারে কাফেরদের বিশ্বাস সম্পর্কে বলা হয়েছে:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ ۚ فَأَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ

অর্থ: 'আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, কে সৃষ্টি করেছে আকাশ ও মাটি, আর কার হাতে রয়েছে সূর্য ও চন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ, তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! সুতরাং তারা কোথায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে?' [সুরা আনকাবুত: ৬১]

এ থেকে তারা বুঝেছেন, মক্কার মুশরিকরা তাওহিদুর রবুবিয়্যাহতে বিশ্বাস ছিল। বরং সকল মানুষ প্রাকৃতিকভাবে এই তাওহিদে বিশ্বাসী। সুতরাং এটা মূল তাওহিদ নয়; মূল তাওহিদ আল্লাহর উলুহিয়্যাহ প্রতিষ্ঠা।

এ কথা কতটুকু সঠিক? আমরা যদি কুরআন ও সুন্নাহে সামগ্রিক দৃষ্টি দিই, তা হলে দেখতে পাই যে, তাওহিদুর রবুবিয়্যাহ মোটেই গৌণ নয় এবং সকল মানুষ তো দূরের কথা, মক্কার কাফের ও আগেকার বিভিন্ন নবির উম্মতরা আল্লাহর রবুবিয়্যাহর কিছু অংশের আংশিক স্বীকৃতি দিলেও সেটা কখনোই তাওহিদ ছিল না। বরং এ স্বীকৃতি জগতের সকল কাফের-মুশরিক দেয়। 'সৃষ্টির সার্বিক নিয়ন্ত্রণ' যা তাওহিদুর রবুবিয়্যাহর

---

১. দেখুন: মিনাহুর রাওজিল আজহার ফি শরহিল ফিকহিল আকবার, মোল্লা আলি কারি (৪৭)।

মর্ম, কাফেররা সেটা অস্বীকার করত। প্রাচীন মিশর, গ্রিস, রোম, ইউরোপ, ভারত ও চীন-সহ অসংখ্য জাতির ইতিহাস রবুবিয়্যাহ অস্বীকৃতির ইতিহাসে ভরপুর।[১] হ্যাঁ, তারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করত। কিন্তু সেগুলো মোটেই তাওহিদ নয়। অসংখ্য সৃষ্টিকর্তা, অসংখ্য রিজিকদাতা, অসংখ্য পালনকর্তায় বিশ্বাস করত তারা। আবার অনেক জাতি আল্লাহ বলতে কিছুতে বিশ্বাসই করত না। যেমন: গ্রিস ও ভারতে অসংখ্য সম্প্রদায় সরাসরি নাস্তিক ছিল। আবার যারা নামকাওয়াস্তে একজন সৃষ্টিকর্তা মানত, তারা রবুবিয়্যাহর সবকিছু অস্বীকার করত। বৌদ্ধ, জৈন, কনফুসীয় ধর্মে তাওহিদ তো দূরের কথা, সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে তেমন কিছুই নেই। ফলে সেগুলো এক প্রকারের নাস্তিক্যবাদী ধর্ম-দর্শন।[২] কোটি কোটি মানুষ প্রাচীন কাল থেকে এসব ধর্ম-দর্শনে বিশ্বাসী। ফলে অধিকাংশ জাতিই তাওহিদুর রবুবিয়্যাহ অস্বীকারকারী ছিল। 'জগতের অধিকাংশ মানুষ তাওহিদুর রবুবিয়্যাহতে বিশ্বাস রাখে'—এমন বক্তব্য তাওহিদের সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে বলেন,

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ.

অর্থ: 'নিষ্ঠাপূর্ণ দ্বীন কেবল আল্লাহরই জন্য। যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে এবং বলে, আমরা তাদের উপাসনা এ জন্য করি, যেন তারা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফেরকে হিদায়াত দান করেন না।' [জুমার: ৩] উক্ত আয়াতে প্রতিমাপূজা কেবল উলুহিয়্যাহর লঙ্ঘন নয়; বরং রবুবিয়্যাহরও লঙ্ঘন। কারণ, তারা মনে করত এসব প্রতিমার তাদের উপকার করার ক্ষমতা আছে। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ.

অর্থ: 'তা ছাড়া তার পক্ষে তোমাদের এমন নির্দেশ দেওয়াও সম্ভব নয় যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবিগণকে নিজেদের রব হিসেবে গ্রহণ করে নাও। তোমাদের

---

১. দেখুন: Battling the Gods: Atheism in the Ancient World, Tim Whitmarsh.

২. দেখুন: History and Literature of Buddhism, Thomas Rhys Davids. Exploring Buddhism, Christmas Humphreys. An Introduction to Indian Philosophy, Satischandra Chatterjee. Confucianism And Taoism, Robert Kennaway Douglas.

মুসলমান হওয়ার পরে তিনি কি তোমাদের কুফরি শেখাবেন?' [আলে ইমরান: ৮০] এখানে ফেরেশতা ও নবিদের রব অভিহিত করার কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা আরেক জায়গায় ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে বলেন,

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

অর্থ: 'তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের ধর্মীয় পণ্ডিত এবং পাদরিদের তাদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে আর গ্রহণ করেছে মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র ইলাহের ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তারা তাঁর ব্যাপারে যা শরিক করে তা থেকে তিনি পবিত্র।' [তাওবা: ৩১]

এসব আয়াতে দেখা যাচ্ছে, তারা রবুবিয়্যাহকে কেবল আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করত না; অন্যদেরও তারা তাদের 'রব' হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

হুদ আলাইহিস সালাম যখন আদ সম্প্রদায়ের কাছে দাওয়াত নিয়ে গেলেন, তারা বলল,

قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ. اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ۗ قَالَ اِنِّيْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ

অর্থ: 'তারা বলল, হুদ, তুমি আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নিয়ে আসোনি, আমরা তোমার কথায় আমাদের ইলাহদের বর্জন করতে পারি না। আর আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীও নই। বরং আমরাও তো বলি যে, আমাদের কোনো ইলাহ তোমার উপরে মন্দ কিছু চাপিয়ে দিয়েছে। হুদ বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী করেছি আর তোমরাও সাক্ষী থাকো যে, তোমরা যা-কিছু শিরক করছ, আমি তা থেকে মুক্ত।' [হুদ: ৫৩-৫৪]

উক্ত আয়াতে স্পষ্ট যে, আদ সম্প্রদায় তাদের দেব-দেবীদের কেবল ইবাদতই করত না; বরং তাদের ব্যাপারে আল্লাহর অনেক গুণে বিশ্বাস রাখত। যেমন: তারা বিশ্বাস করত যে, দেব-দেবীরা উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে। আর এটাই তো স্বাভাবিক। দেব-দেবীদের ব্যাপারে এমন আকিদা না রাখলে তাদের পুজো করেই-বা কী লাভ? বরং তারা তাওহিদুর রবুবিয়্যাহতে বিশ্বাসী ছিল না বলেই তো তাওহিদুল

উলুহিয়্যাহর ক্ষেত্রেও বিচ্যুতির শিকার হয়েছে। ফলে নবিগণ তাওহিদুর রবুবিয়্যাহর জন্য আসেননি; বরং স্রেফ উলুহিয়্যাহর জন্য এসেছেন—এমন কথা সুস্পষ্ট ভুল।

ইহুদিরা বিশ্বাস করে, আল্লাহ জগৎ সৃষ্টি করার পর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে তিনি সৃষ্টির সপ্তম দিন বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন।[১] তারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ দুঃখিত হন, মনে কষ্ট পান, কাঁদেন।[২] আল্লাহর দুই হাত বাঁধা [মায়িদা: ৬৪], আল্লাহ ফকির [আলে ইমরান: ১৮১] ইত্যাদি। অথচ তারা রবুবিয়্যাহতে বিশ্বাসী হলে আল্লাহর ব্যাপারে কখনোই এই ধারণা করতে পারত না। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۖ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ.

অর্থ: 'আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনো ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।' [কাফ: ৩৮]

খ্রিষ্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর ছেলে হিসেবে বিশ্বাস করে।[৩] অথচ তারা আল্লাহর রবুবিয়্যাহতে বিশ্বাস করলে বুঝত, আল্লাহর স্ত্রী-সন্তান নেই; তাঁর জন্য স্ত্রী-সন্তান শোভনীয় নয়। [মারইয়াম: ৩৫, আনআম: ১০১]

মক্কার কাফেররা কি তাওহিদুর রবুবিয়্যাহতে বিশ্বাসী ছিল? মক্কার কাফের-মুশরিকরা তাদের জীবনে তারকার প্রভাবকে বিশ্বাস করত।[৪] তাবিজ-কবচ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে মনে করত।[৫] অথচ আল্লাহ সকল ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ছাড়া পৃথিবীতে কারও কিছু করার ক্ষমতা নেই। ফলে এটা রবুবিয়্যাহর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। তারা পরকাল অস্বীকার করত [রা'দ: ২-৫, নাহল: ৩৮-৪০, ইয়াসিন: ৭৮-৭৯]। অথচ আল্লাহর রবুবিয়্যাহ স্বীকার করলে পরকাল অস্বীকার করা অসম্ভব। তারা ফেরেশতাদের আল্লাহর মেয়ে মনে করত [ইসরা: ৪০, নাহল: ৫৭, জুখরুফ: ১৯, নাজম: ৫৩]। অথচ এটা রবুবিয়্যাহর বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। তারা আল্লাহর 'রহমান-রাহিম' নাম অস্বীকার করত। হুদাইবিয়ার সন্ধিতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লিখলে তারা সেটা প্রত্যাখ্যান করে। বলে, আমরা রহমান ও রহিমকে চিনি না।[৬] তারা তাকদিরও অস্বীকার করত [আনআম: ১৪৮]।

---

১. বাইবেল (পুরাতন নিয়ম): পয়দায়েশ (২:২-৩); হিজরত (৩১:১৭)।
২. বাইবেল (পুরাতন নিয়ম): ইয়ারমিয়া (১৩:১৭)।
৩. বাইবেল (নতুন নিয়ম): মথি (৩:১৭), লূক (৩:২২)।
৪. মুসলিম (৭১); আবু দাউদ (৩৯০৬)।
৫. আবু দাউদ (৩৮৮৩); হাকেম (৭৬০৮); ইবনে মাজা (৩৫৩০)।
৬. সহিহ ইবনে হিব্বান (৪৮৭০); সুনানে কুবরা, বাইহাকি (১৮৮৯৭); মুসনাদে আবু ইয়ালা (৩৩২৩)।

এমন অসংখ্য দলিলের মাধ্যমে বোঝা যায় **(এক.)** মক্কার কাফের, ইহুদি-নাসারা-সহ আগেকার নবিদের উম্মতগুলো মোটেই তাওহিদে রবুবিয়্যাহতে বিশ্বাসী ছিল না। হ্যাঁ, রবুবিয়্যাহর কিছু কিছু বিষয় তারা স্বীকার করত। কিন্তু এ কারণে তাদের কস্মিনকালেও তাওহিদে বিশ্বাসকারী বলা যায় না। **(দুই.)** এর মাধ্যমে আরও একটা ভুল ধারণার অবসান ঘটে। তা হলো, **রবুবিয়্যাহ এবং উলুহিয়্যাহ তাওহিদের অবিচ্ছেদ্য আরকান। দুটোকে আলাদা করা ভুল।** কারণ, একজনকে রব মেনে অন্য জনের উপাসনা করা যায় না। মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপাসনা তখনই করে, যখন সে তার ব্যাপারে আল্লাহর কোনো গুণের বিশ্বাস রাখে। ফলে রবুবিয়্যাহ এবং উলুহিয়্যাহ একটি অপরটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রবুবিয়্যাহ প্রকৃত অর্থে স্বীকার করলে উলুহিয়্যাহ অস্বীকারের সুযোগ নেই। কেবল 'আল্লাহ আছেন' কিংবা 'আল্লাহ আকাশ ও মাটি সৃষ্টি করেছেন' এটাই তাওহিদুর রবুবিয়্যাহ নয়, যেমনটা তারা বুঝেছেন। হিন্দুরাও সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে, 'উপরওয়ালা'য় বিশ্বাস করে, তাই বলে তারা তাওহিদুর রবুবিয়্যাহতে বিশ্বাসী একত্ববাদী? বরং যে ব্যক্তি উলুহিয়্যাহর ক্ষেত্রে শিরক করে, সে মূলত রবুবিয়্যাহর ক্ষেত্রেও শিরক করে। আর যে রবুবিয়্যাহর ক্ষেত্রে শিরক করে, সে উলুহিয়্যাহর ক্ষেত্রে একত্ববাদী হতে পারে না। একটা অপরটার জন্য অত্যাবশ্যক।

কুরআনে মুসা আলাইহিস সালাম এবং ফেরাউনের কথাবার্তার মাধ্যমেও স্পষ্ট হয়, রব এবং ইলাহ অবিচ্ছেদ্য বিষয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ. قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ. قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ. قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ.

অর্থ: 'মুসা বললেন, 'তিনি তোমাদের **রব** এবং তোমাদের পূর্ববর্তী মানুষদেরও **রব**। ফেরাউন বলল, তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসুল নিশ্চয়ই বদ্ধপাগল। মুসা বললেন, তিনি পূর্ব-পশ্চিম ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব, যদি তোমরা বুঝতে। ফেরাউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্য কাউকে 'ইলাহ'রূপে গ্রহণ করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব।' [শুআরা: ২৬-২৯]

রুহের জগতে আল্লাহ সবার কাছ থেকে রব হিসেবে মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, ইলাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেননি। আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ۖ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ
قَالُوا۟ بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَآ ۛ أَن تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَٰفِلِينَ.

অর্থ: 'আর যখন আপনার রব বনি আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদের বের করলেন এবং নিজের উপর তাদের প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি কি তোমাদের **রব** নই? তারা বলল, অবশ্যই আমরা অঙ্গীকার করছি। আবার না কিয়ামতের দিন বলতে শুরু করো যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না।' [আরাফ: ১৭২]

একইভাবে মানুষকে কবরে রাখার পরে তাকে তিনটি প্রশ্ন করা হবে। তন্মধ্যে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, 'তোমার **রব** কে?'[১] ওখানেও 'তোমার ইলাহ কে?'—এমন প্রশ্ন করা হবে না। একইভাবে তাওহিদুল উলুহিয়্যাহ মানে কিছু ইবাদত ও নামাজ-রোজা নয়; আল্লাহর প্রতি সামগ্রিক আত্মসমর্পণ, জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর বশ্যতা, অধীনতা ও দাসত্বের নাম ইবাদত। সুতরাং তাওহিদুর রবুবিয়্যাহকে গৌণ মনে করে এটা বলা যে, পৃথিবীর অধিকাংশ কাফের রবুবিয়্যাহতে বিশ্বাস করে, নবিগণ রবুবিয়্যাহ প্রতিষ্ঠার জন্য আসেননি, কিংবা এটাকে উলুহিয়্যাহ থেকে বিচ্ছিন্ন ভেবে মুক্তির জন্য যথেষ্ট মনে না করা ভুল বিশ্বাস। **বরং সঠিক বিশ্বাস হলো, রবুবিয়্যাহ এবং উলুহিয়্যাহ একটি অপরটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। নবিগণ রবুবিয়্যাহ ও উলুহিয়্যাহ-সহ পূর্ণাঙ্গ তাওহিদ বাস্তবায়নের জন্য এসেছেন। কাফের সম্প্রদায় কোনো তাওহিদেই বিশ্বাসী ছিল না।**[২]

হ্যাঁ সহজের জন্য বিভাজন করা যেতে পারে এবং সেটা দূষণীয় নয়। কিন্তু নিজেদের বানানো বিভাজনকে গোটা উম্মাহর উপর চাপিয়ে দেওয়া, এটাকে দ্ব্যর্থহীন ও প্রশ্নাতীত আকিদা মনে করা এবং যারা এই প্রকারভেদের বিরোধিতা করবে তাদের গোমরাহ ভাবা অবশ্যই বিচ্যুতি এবং বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে আমরা আল-ফিকহুল আবসাতে ইমাম আবু হানিফা রাহি.-কে তাওহিদুর রবুবিয়্যাহ ও উলুহিয়্যাহ একত্রে উল্লেখ করতে দেখতে পাই।[৩] ইমাম তহাবির বক্তব্যে দেখব তাওহিদের এমন কোনো বিভাজন নেই। বরং তিনি আল্লাহর ব্যাপারে যা উল্লেখ করেছেন, তাতে জাত-

---

১. হাদিসটি প্রসিদ্ধ। অসংখ্য গ্রন্থে এসেছে। দেখুন: বুখারি (১৩৬৯, ৪৬৯৯); মুসলিম (২৮৭১); আবু দাউদ (৪৭৫৩); তিরমিজি (৩১২০)।

২. এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন: মুখতাসারু শারহিল আকীদাহ আত ত্বহাবিয়্যাহ, উমর কামেল (২১-২৪); সাইদ ফুদাহ (১০৯-১২৭)।

৩. আল-ফিকহুল আবসাত (১৩৫)।

আসমা-সিফাত-আফআল, রবুবিয়্যাহ, উলুহিয়্যাহ, হাকিমিয়্যাহ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত। এটাই নিরাপদ পথ। এটাই সালাফের মানহাজ।[১] একারণে ইমাম তাবারি রাহি. তাঁর তাফসিরে যেসব জায়গায় আল্লাহর 'ইলাহ' হওয়ার কথা বলেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি রবুবিয়্যাহ ও উলুহিয়্যাহ দুটোকেই উল্লেখ করেছেন।[২] ইবনে কাসিরও তার তাফসিরের বিভিন্ন জায়গায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর ব্যাখ্যায় রবুবিয়্যাহ ও উলুহিয়্যাহ দুটোই উল্লেখ করেছেন।[৩] মোল্লা আলি কারিও আল-ফিকহুল আকবার-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাওহিদুল উলুহিয়্যাহর জন্য রবুবিয়্যাহ অপরিহার্য। কুরআনের অধিকাংশ আয়াত ও সুরা এই দুই প্রকারের তাওহিদের আলোচনায় ভরপুর। কারণ দুটো অবিচ্ছেদ্য। ফলে নবিগণ কেবল উলুহিয়্যাহর জন্য এসেছেন, দুনিয়ার সকল মানুষ রবুবিয়্যাহতে বিশ্বাস করে বলা সুস্পষ্ট ভুল বক্তব্য।

একইভাবে উলুহিয়্যাহকে গৌন করে কেবল রবুবিয়্যাহর উপর গুরুত্বারোপ করাও ভুল। বরং **দুটোকেই সমান গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। ইজতিহাদি প্রকারভেদের ক্ষেত্রে ভিন্নমত ও বৈচিত্র্যকে উদার দৃষ্টিতে দেখতে হবে। নিজেরটা সঠিক আর অন্যেরটা ভুল এমন মানসিকতা পরিহার করতে হবে।**

আল্লাহ এক। তাঁর কোনো শরিক নেই: 'আল্লাহ' (الله) আরবি শব্দের শাব্দিক অর্থ: 'মাবুদ', 'ইলাহ'। বাংলায় বলা হয় উপাস্য, ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত। এটা বিশ্বজগতের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, উপাস্য ও মালিকের সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রধান পরিচয়বাহী নাম। তিনি ছাড়া জগতের আর কারও জন্য এ নাম ব্যবহৃত হয় না। আল্লাহ অদ্বিতীয়। তাঁর মতো তাঁর এ নামটিও অদ্বিতীয়।

আল্লাহ তায়ালা গোটা বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা, তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষাকর্তা। তিনি এক ও অদ্বিতীয় সত্তা। ফলে কোনোকিছুতে তাঁর কোনো শরিক বা অংশীদার থাকতে পারে না। কারণ তিনি সৃষ্টিকর্তা। বাকি সবকিছু তাঁর সৃষ্টি। সৃষ্টি কীভাবে স্রষ্টার অংশীদার হতে পারে? পৃথিবীর সবকিছু তাঁর হাতে ও কুদরতে গড়া। সবগুলোর শুরু ও শেষ আছে। তাঁর শুরু ও শেষ নেই। সবকিছু তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কোনোকিছুর মুখাপেক্ষী নন। তা হলে এমন অস্থায়ী ও মুখাপেক্ষী সৃষ্টি কীভাবে তাঁর সঙ্গে কিছুর ভাগের দাবিদার হতে পারে? আল্লাহর কোনো স্ত্রী নেই, সন্তান নেই,

---

১. দেখুন: শারহুল জাওহারাহ, বাইজুরি (১৮৮)।
২. দেখুন: তাফসিরে তাবারি (৩/৯৯, ১৮/১৩৫, ২১/২৩৫)।
৩. দেখুন: তাফসিরে ইবনে কাসির (৪/৩৯৬)।

পিতা-মাতা নেই, ভাই-বোন নেই। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু নেই। এসব তাঁর জন্য প্রযোজ্য নয়। তাঁর শান ও মানের উপযুক্ত নয়। তাঁকে নিয়ে এসব কথা বলা কিংবা এ ব্যাপারে চিন্তা করাও সমীচীন নয়। কারণ তিনি এসবের উর্ধ্বে। তিনি একক স্রষ্টা। অদ্বিতীয় উপাস্য। সদা বিদ্যমান; সদা জাগ্রত; সদা রক্ষাকর্তা। সকল ক্ষেত্রে তিনি এক ও অদ্বিতীয়, অতুলনীয়, লা-শরিক সত্তা। ফলে কোনো বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র হিস্সাদার নেই।

পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা যত নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন, সকলের দাওয়াহর মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল আল্লাহর তাওহিদ তথা লা-শরিক হওয়ার ঘোষণা। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা নবিদের দাওয়াতের যেসব দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন সবকিছুর আগে সেগুলোর মূল বক্তব্য হলো তাওহিদ। পৃথিবীর সর্বপ্রথম রাসুল নুহ আলাইহিস সালামের দাওয়াতের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰی قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ.

অর্থ: ‘আর আমি নিশ্চয়ই নুহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছি। তিনি বললেন, ‘হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি।’ [আরাফ: ৫৯]

একইভাবে হুদ আলাইহিস সালামের দাওয়াতের ব্যাপারে কুরআন ঘোষণা করছে:

وَاِلٰی عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ

অর্থ: ‘আর আদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হুদকে। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ নেই।’ [আরাফ: ৬৫]

সালেহ আলাইহিস সালামের দাওয়াত সম্পর্কে কুরআন বলছে:

وَاِلٰی ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ

অর্থ: ‘সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহকে। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ নেই’। [আরাফ: ৭৩]

শুআইব আলাইহিস সালামের দাওয়াত সম্পর্কে আল্লাহ জানিয়েছেন:

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ

অর্থ: 'আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শুআইবকে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ নেই।' [আরাফ: ৮৫]

বরং সকল নবি-রাসুলের দাওয়াত সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা অভিন্ন মূলনীতি ঘোষণা করেছেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ

অর্থ: 'আমি প্রত্যেক জাতির মাঝেই রাসুল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত বর্জন করো।' [নাহল: ৩৬]

সুরা ইখলাস কুরআনের ছোট্ট একটি সুরা। কিন্তু তাওহিদের বার্তাবাহী হিসেবে এই সুরার মূল্য অনেক বেশি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ .

অর্থ: 'বলুন, তিনি আল্লাহ এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। এবং তার সমকক্ষ কেউ নেই।' [ইখলাস: ১-৪]

মারিফাহ ও শাহাদাহ: আকীদাহ ত্বহাবিয়্যার বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থে এখানে একটি বিষয় বেশ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। সেটা হলো أول واجب على العبد তথা বান্দার সর্বপ্রথম দায়িত্ব কী? সহজ কথায়, একজন মানুষের সর্বপ্রথম দায়িত্ব কি 'নজর' ও 'মারিফাহ' তথা আল্লাহকে নিয়ে (কালামি মানহাজে মুকাদ্দিমাত-সহ) চিন্তা-ভাবনা করা এবং তাঁকে জানা, নাকি 'শাক্ক' তথা সন্দেহ করা এবং সন্দেহ থেকে ঈমানের দিকে আসা, নাকি সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে 'শাহাদাহ' তথা ঈমানের সাক্ষ্য দেওয়া? প্রথম মতটি আশআরি-মাতুরিদি ধারার কিছু আলিমের।[১] দ্বিতীয় মতটি মুতাজিলাদের। তৃতীয় মতটি জমহুর আলিমের।[২] কুরআন-সুন্নাহর অসংখ্য আয়াত ও হাদিস জমহুরের দলিল। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি মানুষের সঙ্গে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ

---

১. (দেখুন: গজনবি (৩৩); বিস্তারিত দেখুন: ইনসাফ, বাকিল্লানি (১); তুহফাতুল মুরিদ, বাইজুরি (৫৫)।
২. ইবনে আবিল ইজ (২৭); খুমাইয়িস (১১৫)।

ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল; আর নামাজ আদায় করে, জাকাত প্রদান করে। যখন তারা এগুলো করবে, তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। তবে ইসলামের কোনো হক থাকলে ভিন্ন কথা। আর তাদের অন্তরের হিসাব থাকবে আল্লাহর উপর।'।[১] এখানে মানুষকে কেবল শাহাদাহ দিতে বলা হচ্ছে। কোনো চিন্তা-ভাবনা, দলিল চাওয়া হয়নি। একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুআজ বিন জাবালকে ইয়ামানে পাঠান, তখন মানুষকে সর্বপ্রথম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তথা শাহাদাহর দাওয়াত দিতে বলেন। দলিল-প্রমাণ চাইতে বলেননি।[২]

তা হলে যারা নজর ও মারিফাহর শর্ত জুড়ে দেন, তাদের বক্তব্যের ভিত্তি কী? প্রথম কথা হলো, আশআরিরা এক্ষেত্রে নিজেরা একমত হতে পারেননি। ফলে বিভিন্ন ইমাম বিভিন্ন মত দিয়েছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের প্রতি গভীর দৃষ্টি বুলিয়ে অধমের মনে হয়েছে, জমহুরের সঙ্গে তাদের মতপার্থক্য এখানে তাত্ত্বিক ও শাব্দিক, হাকিকি নয়। কারণ, তারা ঈমান শুদ্ধ হওয়ার জন্য মারিফাহ ও দৃঢ় আকিদার শর্ত করেছেন। আর এটা শাহাদাহতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যমান থাকে। **কারণ 'শাহাদাহ'র জন্য মারিফাহ দরকার হয়। আল্লাহ সম্পর্কে যদি ন্যূনতম পরিচয় না থাকে, তবে শাহাদাহ কীসের ভিত্তিতে হবে? আর এই ন্যূনতম পরিচয় শাহাদাহ দানের সময়ে অর্জিত হয়ে যায়, বরং তাওহিদ মানেই তো আল্লাহর মারিফাত। তা ছাড়া, যে ব্যক্তি সরাসরি শাহাদাহ পড়তে চায় না, তাকে তো দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে বুঝিয়ে আল্লাহর মারিফাহ লাভ করিয়েই শাহাদাহ পড়তে বলা হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের বক্তব্যকে ভুল বলার সুযোগ নেই।**[৩]

তবে যুগে যুগে এটা নিয়ে বেশ অতিরঞ্জন হয়েছে। অনেকে দাবি করেছেন, মুকাল্লিদের ঈমানই বিশুদ্ধ হবে না! অর্থাৎ কেউ যদি কালামি মানহাজের আলোকে আল্লাহকে না চেনে ও না জানে, তবে সে কালিমায়ে শাহাদাহ পড়লেও মুমিন হতে পারবে না; বরং কাফের থেকে যাবে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে![৪] এটা গলদ

---

১. বুখারি (২৫); মুসলিম (২২); দারাকুতনি (৮৯৮)।

২. বুখারি (৭৩৭২); দারাকুতনি (২০৫৯)।

৩. দেখুন: ফয়জুল বারি (১/১২৮)।

৪. উসুলুদ্দিন, বাগদাদি (২৬৯); হাশিয়াতুদ দুসুকি আলা উম্মিল বারাহিন (৫৭); উম্মুল বারাহিন মাআ শরহিত তিলিমসানি (৫৬/৫৭); তাফতাজানি লিখেন, কিয়ামতের দিন এমন ব্যক্তিকে কাফেরের সাজা দেয়া হবে! (শরহুল মাকাসিদ, তাফতাজানি ২/২৬৭); উপরে যেমন বলা হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে স্বয়ং আশআরিরাই মতপার্থক্যে লিপ্ত।

কথা। এ কারণে ইমাম গাজালি লিখেছেন, 'একটি দল সীমালঙ্ঘন করেছে। তারা সাধারণ মুসলমানদের কাফের সাব্যস্ত করেছে। তারা মনে করেছে, যে ব্যক্তি আকিদাকে তাদের লেখা দলিল-সহ জানবে না, সে কাফের! এভাবে তারা আল্লাহর প্রশস্ত রহমতকে সংকীর্ণ করে ফেলেছে। আর আল্লাহর জান্নাতকে কেবল মুতাকাল্লিমিনদের ক্ষুদ্র একটি দলের জন্য বরাদ্দ করে ফেলেছে![১] ইমাম কাজি আবু জাফর সিমনানি বলতেন, 'এটা মুতাজিলাদের ইস্যু, আমাদের মাজহাবে রয়ে গেছে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।' ইবনে হাজার আসকালানি মনে করেন, কুরআন ও সুন্নাহর ফিতরাত সম্পর্কিত নসগুলো প্রমাণ করে, আল্লাহর মারিফাহ মানুষের হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রোথিত থাকে, আলাদা নজর নিষ্প্রয়োজন।[২] ইমাম কুরতুবি ঈমানের জন্য এই ধরনের শর্ত জুড়ে দেওয়ায় তাদের প্রচণ্ড সমালোচনা করেছেন।[৩]

অধিকন্তু ফলাফলের দিকে তাকালেও জমহুরের সঙ্গে তাদের সমতাবিধান সম্ভব। আশআরিগণ তাওহিদ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য 'নজর'-এর শর্ত জুড়ে দিলেও অনেক আলিমের মতে, সাধারণ মানুষের জন্য এই শর্ত প্রযোজ্য নয়। ফলে তারা যদি স্বাভাবিকভাবে (অন্য কথায় তাকলিদান) ঈমান আনে, তবে সে ঈমান গ্রহণযোগ্য।[৪] ফলে এটা নিয়ে অতিরঞ্জন বর্জনীয়। ইমাম নববি রাহি. লিখেন, "আল্লাহর রাসুলের বাণী 'আমি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং আমার আমার উপর এবং আমি যা-কিছু নিয়ে এসেছি সেগুলোর উপর ইমান আনে'-এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, কেবল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললেই যথেষ্ট। এটাই সালাফ এবং খালাফের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুকাক্কিকের মাজহাব। তা হলো, যে ব্যক্তি কোনো রকম সন্দেহ ব্যতিরেকে ইসলামে দৃঢ় বিশ্বাস করবে, এটুকুই তার জন্য যথেষ্ট এবং সে মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তার উপর কালামি দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে আল্লাহকে জানা জরুরি নয়। যারা এটাকে জরুরি

ইমাম নববি যেখানে নজরকে কিছু আলিমের মাজহাব বলেছেন। সানুসি বিপরীতে এটাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মাজহাব বলেন। আর নজরের শর্ত না করাকে সংখ্যালঘুদের মাজহাব বলেন! বরং সানুসি নজরকে ঈমান বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত ধরেন! কিন্তু উম্মুল বারাহিনের শারেহ দুসুকি এটাকে মারজুহ মনে করেন এবং 'শর্তে সিহহাত' নয় বরং 'শর্তে কামাল' সাব্যস্ত করেন। দেখুন: হাশিয়াতুদ দুসুকি আলা উম্মিল বারাহিন (৫৭)। তবে বোঝা যায়, সানুসিও পরবর্তী সময়ে তার মত পরিবর্তন করেন (শরহুল মুকাদ্দিমাত পৃ. ১১৫; তুহফাতুল মুরিদ, বাইজুরি পৃ. ৫৬)।

১. ফাতহুল বারি (১৩/৩৪৯)।
২. দেখুন: ফাতহুল বারি, ইবনে হাজার আসকালানি (১/৭০-৭১)।
৩. প্রাগুক্ত (১৩/৩৫০)।
৪. তুহফাতুল মুরিদ, বাইজুরি (৫৬)।

বলেন এবং ঈমান বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত ধরেন, তারা মূলত মুতাজিলা। **পাশাপাশি আমাদের মুতাকাল্লিমিনদের কিছু লোক** (নববির কথায় স্পষ্ট এটা আশআরিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের মতামত নয়)। **কিন্তু এটা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি**। কারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে, দৃঢ় বিশ্বাস। আর সেটা (শাহাদাহর মাধ্যমেই) অর্জিত হয়ে যাচ্ছে। রাসুলুল্লাহ এমন কোনো শর্ত করেননি। ফলে যারা সরাসরি সত্যায়ন করেছে, তাদের সত্যায়নকে গ্রহণ করেছেন এবং এটুকু যথেষ্ট মনে করেছেন। এ ব্যাপারে সহিহাইনে যেসব বর্ণনা এসেছে, তাতে এই বাস্তবতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত"।[১]

তা ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে থাকা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান 'নজর' দর্শন সম্পর্কে অণু পরিমাণ ধারণা রাখে না। ফলে তাদের উপর এই নজরের শর্ত করা সেই বোঝা চাপিয়ে দেওয়া যা আল্লাহ চাপাননি। তা ছাড়া আল্লাহ তায়ালা আমাদের রাসুলের অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা হলে মুকাল্লিদের (অনুসরণকারীর) ঈমান বিশুদ্ধ নয় এটা কিভাবে বলা যেতে পারে কিংবা দলিলের শর্ত কীভাবে করা যেতে পারে? এটাই স্বীকার করেছেন ইমাম জুয়াইনি রাহি. তার জীবনের শেষ দিকে। তিনি লিখেন, 'আহলে সুন্নাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ঈমান বিশুদ্ধ। অথচ তাদের কাছে মারিফাহ, দলিল কিছুই নেই। সাধারণ মানুষ দূরের কথা, ইমাম লকবধারীদেরও পরীক্ষা করা হলে একটি মাসআলার দলিল দিতে গিয়ে হয়রান হয়ে যাবে। **ফলে সাধারণ মানুষের আকিদা মারিফাহ কিংবা দলিলভিত্তিক নয়; বরং হৃদয়ের গভীর তলদেশে প্রোথিত বিশুদ্ধ ও অবিচল আকিদা**। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর হাকিকত জানার নির্দেশ দেননি। এ কারণেই **আমাদের পূর্ববর্তী মানুষেরা দলিলের জন্য আদিষ্ট ছিলেন না। বরং দৃঢ় বিশ্বাস, শাহাদাহ ও আমলের জন্য আদিষ্ট ছিলেন। আর এই আকিদার উপর অটল থাকলেই মানুষ মুক্তি পাবে, সফল হবে**। যেমনটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার সর্বশেষ কথা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কারণ, পৃথিবীতে মারিফাহর অধিকারী মানুষ কম। আকিদার অধিকারী মানুষ বেশি'।[২] সানুসি রাহি. লিখেন, 'উসুলুদ্দিনের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমামদের তাকলিদ বৈধ কি না বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। তবে অসংখ্য মুহাক্কিকের মাজহাব হলো, দৃঢ় বিশ্বাস থাকাই যথেষ্ট' (অর্থাৎ দলিল নিষ্প্রয়োজন)।[৩]

---

১. শরহে মুসলিম, নববি (১/২১০-২১১)।
২. আল-আকীদাহ নিজামিয়্যাহ, জুয়াইনি (২৬৭-২৬৮)।
৩. শরহুল মুকাদ্দিমাত, সানুসি (১১৫)।

শিরকের পরিচয় ও উৎপত্তি: আল্লাহ তায়ালা মানুষকে প্রাকৃতিকভাবে (ফিতরাতান) তাঁর একত্ববাদের প্রতি অনুরাগী করে সৃষ্টি করেছেন। এই কারণে কুরআনে বলা হয়েছে:

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ؕ

অর্থ: 'এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।' [রুম: ৩০]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশুদ্ধ হাদিসে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, 'প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার বাবা-মা তাকে ইহুদি, খ্রিষ্টান কিংবা অগিপূজক বানায়'।[১] এ কারণে মানব সৃষ্টির পর থেকে প্রায় এক হাজার বছর কিংবা দশ প্রজন্ম তথা সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত মানুষ বিশুদ্ধ তাওহিদের উপর ছিল। পৃথিবীতে কেউ আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক (অংশীদার) সাব্যস্ত করত না। এরপর নুহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের মাঝে সর্বপ্রথম শিরকের সূচনা ঘটে। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে রাসুল হিসেবে পাঠান। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন:

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۫ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۪

অর্থ: 'সকল মানুষ একই উম্মত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা নবিগণকে পাঠান সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে।' [বাকারা: ২১৩]

ইবনে আব্বাস রাজি. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আদম এবং নুহ আলাইহিমাস সালামের মাঝে দশ শতাব্দ কিংবা দশ প্রজন্মের ব্যবধান ছিল। এই পুরোটা সময় মানুষ ইসলামি শরিয়াহর উপর ছিল। এরপর মতানৈক্য শুরু হয়। তখন আল্লাহ রাসুল পাঠানো শুরু করেন।' ইবনে কাসির লিখেন, 'মানবজাতি এই পুরো সময়টা মিল্লাতে আদমের উপর ছিল। এরপর মূর্তিপূজা শুরু হয়। তখন আল্লাহ তায়ালা নুহ আলাইহিস সালামকে রাসুল হিসেবে পাঠান। আর এভাবে তিনি হয়ে যান পৃথিবীর সর্বপ্রথম রাসুল'।[২]

এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয়, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শিরকের সূচনা সরাসরি শয়তানের উপাসনা কিংবা আল্লাহকে ছেড়ে মানুষ পূজার মাধ্যমে শুরু হয়নি; বরং

---

১. বুখারি (১৩৫৮); মুসলিম (২৬৫৮); আবু দাউদ (৪৭১৪); ইবনে হিব্বান (১২৮)।
২. দেখুন: তাফসিরে ইবনে কাসির (১/৪২৫)।

শুরু হয়েছিল ভালো কাজের মোড়কে, সৎকর্মশীল মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনের মাধ্যমে। নুহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের লোকেরা সে জাতির কিছু মৃত ভালো মানুষের সম্মানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে। ধীরে ধীরে তাদের কবরের পাশে অবস্থান শুরু করে। এরপর তাদের প্রতিমা ও ভাস্কর্য নির্মাণ করে। সবশেষে সেগুলোর পুজো দিতে শুরু করে। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে বলেন,

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

অর্থ: 'তারা বলল, তোমরা তোমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওদ্দ, সুয়া', ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসরকে।' [নুহ: ২৩]

ইবনে আব্বাস রাজি. বলেন, 'এগুলো নুহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের কিছু বুজুর্গ মানুষের নাম। মৃত্যুর পরে শয়তান তাদের সম্প্রদায়ের কাছে এসে তাদের নামে স্মৃতিচিহ্ন বানাতে কুমন্ত্রণা দিলো, তারা বানাল। কিন্তু তখনও তাদের ইবাদত করা হতো না। এরপর যখন সেই প্রজন্ম মৃত্যুবরণ করল, নতুন মূর্খ প্রজন্ম এলো। তারা সেগুলোর ইবাদত শুরু করে দিলো।' মুহাম্মাদ ইবনে কায়স বলেন, 'এসব মূর্তি মূলত কিছু নেককার মানুষের মূর্তি। তারা জীবদ্দশায় সৎকর্মশীল ছিল। তাদের অনেক অনুসারী ছিল। মৃত্যুর পরে তারা তাদের প্রতিমা বানিয়ে ইবাদত করা শুরু করল'।[১]

খ্রিষ্টান সম্প্রদায়েরও ভ্রান্তির মূল কারণ ছিল ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি। তাঁর ব্যাপারে অতিরঞ্জন করতে করতে একপর্যায়ে তারা তাঁকে খোদা বানিয়ে ফেলল। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের সম্মান ও ভক্তির ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করতে নিষেধ করেছেন, চাই তিনি রাসুল হোন কিংবা অন্য কোনো বুজুর্গ, পির-আউলিয়া হোন। কারও ভক্তির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা যাবে না, হোক সেটা জীবদ্দশায় কিংবা মৃত্যুর পরে। যেমনটা ঘটেছিল নুহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের মাঝে। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরসংশ্লিষ্ট শিরক থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে উম্মতকে সতর্ক করেছেন। ওফাতের পাঁচ দিন আগেও অসুস্থ অবস্থায় তিনি বলেন, 'সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা তাদের নবি ও সালেহিনদের কবরকে সিজদার জায়গায় পরিণত করেছে। সাবধান! তোমরা কবরকে সিজদার জায়গা বানিয়ো না।

---

১. দেখুন: প্রাগুক্ত (৮/২৪৮)।

আমি তোমাদের নিষেধ করছি।'[১] দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, এত এত দুর্ঘটনার দৃষ্টান্ত এবং এত এত নিষেধ থাকা সত্ত্বেও নবিজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের একটা বড় অংশ আজ ওলি-আউলিয়াদের নিয়ে বাড়াবাড়ি ও তাদের কবরপূজায় লিপ্ত, জীবিত ও মৃত পির-পূজায় মগ্ন। এসব জায়েজ করার জন্য তারা কুরআন-হাদিস থেকে যেসব খণ্ডিত দলিল পেশ করে, সেগুলো শরিয়াহর বিকৃতি বৈ কিছু নয়। তাদের সতর্ক করা বিশুদ্ধ তাওহিদপন্থি আলিম-উলামা ও সাধারণ মুসলমানদের ঈমানি দায়িত্ব।

শিরকের ভয়াবহতা ও প্রকারভেদ: শিরক হলো আল্লাহর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা; আকাশের নিচে ও মাটির উপরে আল্লাহর সবচেয়ে বড় অবাধ্যতা, সবচেয়ে বড় গুনাহ। কুরআনে এটাকে সবচেয়ে বড় জুলুম বলা হয়েছে:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

[লুকমান: ১৩]। কারণ, আল্লাহ আপনাকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, আপনার জীবনের সকল প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন। আপনি তাঁর দেওয়া জীবন, তাঁর দেওয়া সকল নিয়ামত ভোগ করে অন্য কাউকে রব বানাবেন, অন্য কারও পূজা করবেন, এটা কখনোই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই এটা তাওহিদের সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। কেউ শিরকে লিপ্ত হলে তার ঈমান বাতিল হয়ে যায়, ইসলামের গণ্ডি থেকে সে খারিজ হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা সাধারণ কবিরা গুনাহ চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু কেউ যদি শিরক করার পরে তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করে, তবে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে যাবে। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

অর্থ: 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে শরিক করে। এতদ্ব্যতীত সকল পাপ তিনি ক্ষমা করে দেন, যার জন্য ইচ্ছা করেন। আর যে লোক আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করল, সে যেন (তাঁর উপর) ভয়ংকর অপবাদ আরোপ করল।' [নিসা: ৪৮]

সুরা নিসার অপর একটি আয়াতে আল্লাহ বলেন,

---

১. মুসলিম (৫৩২); ইবনে হিব্বান (৬৪২৫); হাকেম (৪০৪০)।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا

অর্থ: 'নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরিক করে। এ ছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরিক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়।' [নিসা: ১১৬]

কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَ لَقَدْ اُوْحِیَ اِلَیْکَ وَ اِلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکَ ۚ لَئِنْ اَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَ لَتَکُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ.

অর্থ: 'আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তী নবিদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আপনি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার স্থির করেন, তবে আপনার আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।' [জুমার: ৬৫]

আল্লাহ তায়ালা আরেক জায়গায় বলেন,

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ۚ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ.

অর্থ: 'নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। আর অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।' [মায়িদা: ৭২]

শাইখ শুজাউদ্দিন তুর্কিস্তানি শিরককে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। ১. আল্লাহর সত্তার ক্ষেত্রে শিরক। যেমন: অগ্নিপূজারীদের শিরক। তারা দুজন সৃষ্টিকর্তা সাব্যস্ত করেছে, একজন ভালোর আরেকজন মন্দের স্রষ্টা। ২. ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক। যেমন: মক্কার মুশরিকদের শিরক। তারা আল্লাহর অস্তিত্বে এবং অন্যান্য কিছু গুণে বিশ্বাস করলেও আল্লাহর সঙ্গে অন্যান্য মূর্তির পূজা করত। ৩. আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে শিরক। যেমন: ইহুদিরা আল্লাহকে মানুষের মতো কল্পনা করত। মুসলিম উম্মাহর মাঝে মুজাসসিমাহ, মুশাববিহাহ, জাদিয়্যাহ, কাররামিয়্যাহ-সহ বিভিন্ন দল-উপদল এই শিরকে আক্রান্ত হয়েছে।[১]

---

১. শুজাউদ্দিন হিবাতুল্লাহ তুর্কিস্তানি (৪৯-৫০)।

এটা এক ধরনের প্রকারভেদ; একমাত্র নয়। এর বাইরেও শিরককে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। যেমন: বড় ও ছোট শিরক। কিছু হচ্ছে **'শিরকে আকবর'** বা বড় শিরক, যা মানুষকে ঈমান থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয়। যেমন: আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কাউকে রব হিসেবে স্বীকার করা, কিংবা নিজেকে খোদা দাবি করা। তিনি ব্যতীত জীবিত কিংবা মৃত (ব্যক্তি বা মূর্তি কিংবা যেকোনো কিছুর) উপাসনা করা, এমন জিনিস অন্য কারও কাছে চাওয়া, যা তিনি ছাড়া অন্য কেউ দিতে সক্ষম নয়, কিংবা কারও ব্যাপারে এমন কোনো বিশ্বাস রাখা, যা তিনি ছাড়া কারও ব্যাপারে রাখা যায় না। যেমন, কেউ অদৃশ্যের কিছু জানে, এমন বিশ্বাস রাখা। বিপদে-আপদে আল্লাহর পরিবর্তে কোনো ওলি-আউলিয়া কিংবা পিরকে ডাকা। মৃত ব্যক্তি কোনো উপকার কিংবা অপকার করতে পারবে বলে বিশ্বাস রাখা। আবার কিছু শিরক রয়েছে, যাকে বলা হয় **'শিরকে আসগর'** তথা ছোট শিরক। যেমন: আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে কসম খাওয়া।[১] রিয়া-লৌকিকতা ইত্যাদি।[২] এগুলো মানুষকে ঈমান থেকে বের করে না, কিন্তু বড় গুনাহের কারণ। তাই মুসলমানদের সব ধরনের শিরকের উর্ধ্বে উঠে বিশুদ্ধভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে হবে।

শিরকের ক্ষেত্রে প্রান্তিকতা বর্জন: নিঃসন্দেহে শিরক পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ। কিন্তু শিরকের ক্ষেত্রে একদল লোক প্রান্তিকতার শিকার হয়েছে। তারা দ্বীনের ক্ষেত্রে ভীষণ বাড়াবাড়ি করে উম্মতের মাকরুহ কিংবা মুবাহ (বৈধ) আমলকেও শিরক বানিয়ে দিয়েছে। ফলে মুসলমানদের তারা পাইকারি হারে মুশরিক আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। তাদের নারী ও সম্পদ লুণ্ঠন করেছে। উদাহরণস্বরূপ মাজহাব মানাকে তারা শিরক ঘোষণা করেছে! ওলি-আউলিয়াদের মাজারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে স্রেফ সফরকে শিরকে আকবর বানিয়ে দিয়েছে। অথচ কবর জিয়ারত সুন্নাহ ও মুস্তাহাব আমল।[৩] স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর জিয়ারত করতে বলেছেন।[৪] হ্যাঁ, কেউ যদি কবর জিয়ারতের নাম দিয়ে সেখানে শিরকি কর্মকাণ্ড করে, তবে এর জন্য সে দায়ী। তাতে কবর জিয়ারত শিরক হবে না। যেকোনো প্রকারের তাবিজ-কবচ ঝোলানোকে তারা শিরক আখ্যা দিয়েছে। অথচ সব ধরনের তাবিজ ঝোলানো শিরক নয়। কেউ যদি আল্লাহর কালাম লিখে একমাত্র আল্লাহর প্রতি

---

১. তিরমিজি (১৫৩৫); আবু দাউদ (৩২৫১)।
২. ইবনে মাজা (৪২০৪); মুসতাদরাকে হাকেম (৮০৩১)।
৩. শরহুল মুহাজ্জাব, নববি (৫/৩১০)।
৪. মুসলিম (১৯৭৭); তিরমিজি (১০৫৪); ইবনে মাজা (১৫৬৯)।

বিশ্বাস রেখে তাবিজ হিসেবে ঝোলায়, তবে সেটা অবৈধও নয়; বরং বৈধ কাজ। নবি-রাসুল ও ওলি-আউলিয়াদের উসিলা দিয়ে দোয়া করাকে তারা শিরকে আকবর বানিয়ে দিয়েছে। এগুলো যারা করে, তাদের মুশরিক আখ্যা দিয়েছে। অথচ এটা বৈধ আমল। বরং বাড়াবাড়ির সর্বনিম্ন সীমায় পৌঁছে তাদের কেউ কেউ তাহাজ্জুদের সময় নিদ্রামগ্ন থাকাকে শিরক বলেছে, স্বামী-স্ত্রীর প্রতি পরস্পরের ভালোবাসাকেও শিরক আখ্যা দিয়েছে। অথচ এগুলো সর্বোতভাবে প্রত্যাখ্যাত বক্তব্য।

তাই মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রান্তিকতা বর্জন করা। একদিকে যেমন প্রকৃত শিরকের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেওয়া যাবে না, ন্যূনতম নমনীয়তা প্রদর্শন করা যাবে না, শিরককে হারাম কিংবা মাকরুহের মতো ছোট গুনাহ মনে করা যাবে না, বরং সামর্থ্য অনুযায়ী কঠোরভাব প্রতিবাদ ও প্রতিহত করতে হবে; অপরদিকে শিরক শিরক স্লোগানে আকাশ-বাতাস ভারি করা যাবে না। উম্মাহর যেকোনো কাজ নিজেদের মনোমতো না হলেই সেটাকে শিরক আখ্যা দেওয়া যাবে না। মুসলমানদের পাইকারি হারে মুশরিক বলার মাঝে তৃপ্তি খোঁজা যাবে না।

আল্লাহর পরিচয়

আল্লাহর মতো কিছু নেই: আল্লাহ তায়ালা গোটা বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছাড়া সমস্ত চরাচরে আর কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই; বরং সবকিছু তাঁর সৃষ্টি। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে কেউ সৃষ্টি করেনি। তিনি সবার রিজিকদাতা; তাঁর কোনো রিজিকের প্রয়োজন নেই। তিনি সবার অনুগ্রহকারী; তাঁকে কেউ অনুগ্রহ করার শক্তি রাখে না। তিনি সবার রক্ষাকর্তা; তাঁকে কারও রক্ষার প্রয়োজন নেই। তিনি সবার জীবন ও মৃত্যুদাতা; তাঁকে কেউ জীবন ও মৃত্যু দেওয়ার সামর্থ্য রাখে না। কারণ, তিনি চিরঞ্জীব; তাঁর কোনো মৃত্যু নেই। তিনি শুরু; তিনিই শেষ। ফলে আল্লাহ ও বাকি সবার মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট। এ কারণে গোটা বিশ্বজগতে আল্লাহর মতো কিছু নেই। কোনো দিক থেকে কেউ তাঁর সদৃশ হতে পারে না। তিনি এক ও অদ্বিতীয়; তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনিই একমাত্র ক্ষমতাশালী; বাকি সবকিছু দুর্বল। কেবল তিনিই সুন্দর; সকল সুন্দরের আধার। জগতের সব সৌন্দর্য তাঁর সৌন্দর্যের উদ্ভাসমাত্র। তিনিই মহান; বাকি সবকিছু তাঁর মহানুভবতার ভিখারি। তিনি সকল সর্বোত্তম নাম, গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি অনন্য।

কুরআনের একাধিক আয়াতে আল্লাহ তায়ালার মতো কিছু না থাকার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। যেমন: আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

অর্থ: 'তাঁর মতো কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।' [শুরা: ১১]

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ

অর্থ: 'তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই'। [ইখলাস: 8]

আরেক জায়গায় আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ: 'অতএব, তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করো না।' [বাকারা: ২২]

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

অর্থ: 'আপনি কি তাঁর সমনাম কাউকে জানেন?' [মারইয়াম: ৬৫]

এসব আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, আল্লাহর মতো কেউ নেই। সুতরাং আল্লাহর নাম ও সিফাত তথা গুণাবলির ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকতে হবে। অসংখ্য ফিরকা এসব ব্যাপারে বিচ্যুতির শিকার হয়েছে। কোনো কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর বিশেষণ সম্পর্কিত আয়াতগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে এতটা বাড়াবাড়ি করেছে যে, তারা আল্লাহকে সৃষ্টির মতো বানিয়ে ফেলেছে। এরা ইতিহাসে 'মুজাসসিমাহ' (দেহবাদী) ও 'মুশাব্বিহাহ' (সাদৃশ্যবাদী) নামে পরিচিত। আবার কোনো কোনো সম্প্রদায় তাদের ধারণা অনুযায়ী স্রষ্টাকে সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা থেকে বাঁচতে কুরআন-হাদিসে বর্ণিত আল্লাহর সিফাতগুলোকে অস্বীকার করেছে। তাদের ধারণা, আল্লাহ জানেন মানুষ জানে, আল্লাহ দেখেন মানুষও দেখে। সুতরাং আল্লাহ মানুষের মতো হয়ে যাচ্ছেন। তাই তারা আল্লাহর সকল গুণাবলিকে অস্বীকার করেছে। তারা 'মুআত্তিলাহ' নামে পরিচিত।[১] আহলে সুন্নাতের মাজহাব হলো এই বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ির মাঝে। তারা কুরআন-হাদিসে বর্ণিত সিফাতগুলোর ক্ষেত্রে সালাফে সালেহিনের কর্মপন্থা অনুসরণ করেন। আল্লাহর জীবন আছে, কিন্তু আমাদের মতো জীবন নয়। আল্লাহ দেখেন, শোনেন ও কথা বলেন। এভাবে তিনি অন্যান্য অনেক বিশেষণের অধিকারী। কিন্তু নামে একরকম হলেও আল্লাহর বিশেষণ কখনোই মানুষের বিশেষণের মতো নয়।[২] সামনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে, ইনশাআল্লাহ।

কোনোকিছু আল্লাহকে অক্ষম করতে পারে না: কারণ, আল্লাহই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং সৃষ্টি স্রষ্টার উপর বলীয়ান হবে এবং তাকে অক্ষম করবে, সেটা সম্ভব নয়। তিনি সর্বশক্তিমান, সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তা ছাড়া অক্ষমতা হলো ত্রুটি। আর আল্লাহ তায়ালা সকল ত্রুটির উর্ধ্বে। কুরআনে একাধিক আয়াতে তিনি এর তাগিদ দিয়েছেন। যেমন: আল্লাহ তায়ালা বলেন,

---

১. দেখুন: গজনবি (৪৪); তুর্কিস্তানি (৫২-৫৩); ইবনে আবিল ইজ (৫৩-৫৪); সালেহ ফাওজান (২৫-২৬)।
২. আকহাসারি (১১২)।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَیْءٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَلِیْمًا قَدِیْرًا.

অর্থ: 'আকাশ ও পৃথিবীতে কোনোকিছুই আল্লাহকে অপারগ করতে পারে না। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান' [ফাতির: ৪৪]।

আয়াতুল কুরসিতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ

অর্থ: 'তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান' [বাকারা: ২৫৫]।

আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই: এখানে আরবি (لا إله إلا الله) বাক্যটির শাব্দিক অনুবাদ হলো: 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই।' কিন্তু কোনো কোনো আলিম মনে করেন, এমন অনুবাদ সঠিক নয়। তাদের বক্তব্য: এটার সঠিক অনুবাদ হলো, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রকৃত/সত্য উপাস্য নেই। ফলে যদি স্রেফ বলা হয় 'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই', তবে কথাটি গলদ। কারণ, আল্লাহ ছাড়া জগতে অসংখ্য উপাস্যের উপাসনা করা হয়। ফলে 'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই' কথাটির অর্থ দাঁড়াবে, জগতে যেসব মূর্তি-প্রতিমা এবং যা-কিছুর উপাসনা করা হয়, সবই আল্লাহ! ফলে এটা ওয়াহদাতুল উজুদ-এর মতো বিভ্রান্ত আকিদার পর্যায়ে চয়ে যাবে। তাই এটার অনুবাদ করতে হবে, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই।' তাদের মতে, কুরআনেও বিষয়টির প্রমাণ মেলে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِیُّ الْكَبِیْرُ

অর্থ: 'কারণ নিঃসন্দেহে আল্লাহই সত্য। আর তাঁর পরিবর্তে তারা যা ডাকে, তা অসত্য এবং আল্লাহই সবার উর্ধ্বে, তিনি মহান।'[১] [হজ: ৬২]

তবে উপরের বক্তব্য সঠিক নয়। কেবল 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই' এটুকু বলাই যথেষ্ট। কারণ, আল্লাহ ছাড়া অন্য অনেক উপাস্যের উপাসনা করা হলেও তারা সব মিথ্যা উপাস্য। আল্লাহর সঙ্গে তাদের কোনো সাদৃশ্য নেই। আল্লাহ স্রষ্টা, তারা সৃষ্টি। তা ছাড়া আল্লাহর উলুহিয়্যাহ চিরন্তন। বিশ্ব সৃষ্টির আগে যখন কেউ ছিল না, তখনও আল্লাহ উপাস্য ছিলেন। আবার যখন কেউ থাকবে না, তিনি উপাস্য থাকবেন। অর্থাৎ আল্লাহর উপাস্য হওয়ার জন্য উপাসনাকারী দরকার নেই। অথচ পৃথিবীতে যেসব মিথ্যা উপাস্য

---

১. সালেহ ফাওজান (২৭)।

বিদ্যমান, তাদের ততক্ষণ পর্যন্ত উপাস্য বলা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কেউ উপাসনা করে। ফলে 'আল্লাহ ছাড়া সত্য উপাস্য নেই' কিংবা 'আল্লাহ ছাড়া উপাসনার উপযুক্ত কেউ নেই'-এর চেয়ে বরং কেবল 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই' এটা বলাই উত্তম। কারণ, আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করা হয়, তাদের উপাস্য হওয়ার কোনো যোগ্যতাই নেই। ফলে তারা থেকেও না থাকার মতোই। কুরআনের আয়াতগুলোর বাহ্যিক অর্থও তা-ই। সেখানে 'প্রকৃত' এমন শব্দ যোগ করা হয়নি । তারা যে আয়াতটি দিয়ে দলিল দিয়েছেন, সেটা এই শাহাদাহর সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই ঘোষণা ইসলামের মূল ভিত্তি। পিছনে আমরা কুরআনের বেশ কিছু আয়াত উপস্থাপন করেছি, যেগুলোতে বিভিন্ন নবির মুখে তাওহিদের এই কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলো ছাড়াও কুরআনের অসংখ্য আয়াতে এই ঘোষণা রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ

অর্থ: 'আর তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি পরম করুণাময়, দয়ালু।' [বাকারা: ১৬৩] তিনি আরও বলেন,

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

অর্থ: 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি চির জীবিত, তিনি সদা বিদ্যমান রক্ষাকর্তা।' [আলে ইমরান: ২] আল্লাহ আরও বলেন,

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

অর্থ: 'তিনি তোমাদের মায়ের গর্ভে যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' [আলে ইমরান: ৬] অন্য আয়াতে আল্লাহ নিজে এই তাওহিদের সাক্ষ্য দিচ্ছেন,

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

অর্থ: 'ন্যায়নিষ্ঠভাবে আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আরও সাক্ষ্য দিয়েছে ফেরেশতারা এবং জ্ঞানীগণ। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' [আলে ইমরান: ১৮] সুরা নিসাতে আল্লাহ বলেন,

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا

অর্থ: 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি অবশ্যই তোমাদের কিয়ামতের দিন সমবেত করবেন যাতে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহর চেয়ে কে আছে সত্যভাষী?' [নিসা: ৮৭] অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

اِتَّبِعۡ مَاۤ اُوۡحِیَ اِلَیۡکَ مِنۡ رَّبِّکَ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَاَعۡرِضۡ عَنِ الۡمُشۡرِکِیۡنَ

অর্থ: 'আপনার কাছে যা প্রত্যাদেশ করা হয়েছে, তা অনুসরণ করুন। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আর মুশরিকদের উপেক্ষা করুন।' [আনআম: ১০৬] আল্লাহ আরও বলেন,

فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَقُلۡ حَسۡبِیَ اللّٰهُ ۫ۖ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَیۡهِ تَوَکَّلۡتُ وَهُوَ رَبُّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡمِ

অর্থ: 'যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তাঁর উপর নির্ভর করলাম। তিনি মহান আরশের প্রতিপালক।' [তাওবা: ১২৯] সুরা ত্বহাতে আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

اِنَّنِیۡۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدۡنِیۡ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِذِکۡرِیۡ

অর্থ: 'নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাই আপনি আমার ইবাদত করুন। আমার স্মরণে নামাজ আদায় করুন।' [ত্বহা: ১৪]

প্রসিদ্ধ হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

অর্থ: 'আমি মানুষের সঙ্গে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল; আর নামাজ আদায় করে, জাকাত প্রদান করে। যখন তারা এগুলো করবে, তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার কাছ থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। তবে ইসলামের কোনো হক থাকলে ভিন্ন কথা। আর তাদের অন্তরের হিসাব থাকবে আল্লাহর দায়িত্বে।'[১]

---

১. বুখারি (২৫); মুসলিম (২২); দারাকুতনি (৮৯৮)।

قَدِيمٌ بِلا ابْتِدَاءٍ، دَائِمٌ بِلا انْتِهَاءٍ، لا يَفْنَى وَلا يَبِيدُ

তিনি (কাদিম) সর্বদাই ছিলেন, তাঁর কোনো শুরু নেই। তিনি (দায়িম) সর্বদাই থাকবেন, তাঁর কোনো শেষ নেই। তাঁর কোনো ক্ষয় নেই, লয় নেই।

ব্যাখ্যা

আল্লাহ 'কাদিম' ও 'দায়িম': শব্দ দুটোর কাছাকাছি বাংলা প্রতিশব্দ হলো অনাদি ও অনন্ত। অর্থাৎ যার কোনো শুরু নেই, শেষ নেই। আল্লাহ তায়ালা সর্বদাই ছিলেন, এমন কোনো সময় ছিল না যখন তিনি ছিলেন না। আবার তিনি সর্বদাই থাকবেন, এমন কোনো সময় আসবে না যখন তিনি থাকবেন না। ফলে তাঁর শুরু ও শেষ নেই, তাঁর লয় নেই, ক্ষয় নেই; বরং তিনিই শুরু তিনিই শেষ। তিনি সময় ও কালের উর্ধ্বে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো **'কাদিম' ও 'দায়িম' কি আল্লাহর নাম**? এই দুটো শব্দ কি শরয়ি পরিভাষা? আল্লাহর ক্ষেত্রে এসব শব্দ কুরআন ও সুন্নাহে ব্যবহৃত হয়েছে? একদল উলামায়ে কেরাম মনে করেন 'কাদিম' ও 'দায়িম' আল্লাহর নাম নয়। কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহে এই নাম দুটো উল্লেখ করা হয়নি। যেহেতু আল্লাহ তায়ালার নাম 'তাওকিফি' তথা কুরআন-সুন্নাহ-নির্ভর আর এই নাম দুটো কুরআন-সুন্নাহে নেই, সুতরাং এই দুটোকে আল্লাহর নাম হিসেবে আখ্যা দেওয়া যাবে না। কিন্তু তারা আল্লাহর ক্ষেত্রে এই শব্দদুটো ব্যবহার অবৈধ কিংবা গলদ মনে করেন না। এক্ষেত্রে তাদের মূলনীতি হলো, যদি কোনো শব্দের অর্থ অসুন্দর না হয় এবং সেটা আল্লাহর নাম না হলেও তাঁর সম্পর্কে 'ইখবার' তথা কোনো বক্তব্য কিংবা বর্ণনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তবে এ ধরনের শব্দ আল্লাহর শানে ব্যবহার করা হারাম নয়। যেমন 'শাইউন' (বস্তু), 'মাওজুদ' (বিদ্যমান), 'জাত' (সত্তা), 'আজালি' (অনাদি), 'আবাদি' (অনন্ত), 'মুরিদ' (ইচ্ছাকারী), 'মুতাকাল্লিম' (কথক/বক্তা) ইত্যাদি। 'কাদিম' ও 'দায়িম'-এর ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। কারণ, এ দুটোর অর্থ হলো, যার কোনো শুরু নেই এবং

যার কোনো শেষ নেই। এ ধরনের বিশেষণ যেহেতু আল্লাহ তায়ালার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সুতরাং শব্দদুটো আল্লাহর শানে ব্যবহার করা যাবে। তবে না করাই উত্তম।[১]

কিন্তু ইমাম বাইহাকি, গাজালি-সহ অসংখ্য মুহাক্কিক আলেম মনে করেন, 'কাদিম' ও 'দায়িম' আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা কেবল বৈধই নয়; বরং এগুলো আল্লাহর নাম। যারা এ দুটোকে আল্লাহর নাম হিসেবে নাকচ করেছেন, তারা রাসুলুল্লাহর সুন্নাহকে সামগ্রিকভাবে দেখার (ইসতিকরা) আগেই অনুমান এবং অনুসরণভিত্তিক নাকচ করেছেন।[২] এক্ষেত্রে তারা যেসব দলিল পেশ করেন, আমরা উদাহরণস্বরূপ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উল্লেখ করব:

এক. সুনানে আবু দাউদে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাজি.-এর হাদিস, যেখানে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশের সময় এই দোয়া পড়তেন: أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ। অর্থ: 'আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে মহান আল্লাহর, তাঁর পবিত্র চেহারার এবং অনাদি রাজত্বের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[৩] হাদিসটি বিশুদ্ধ। কিন্তু জটিলতা হলো উক্ত হাদিসটি তাদের পক্ষের শক্তিশালী দলিল নয়। কারণ, এখানে 'কাদিম' আল্লাহর নাম কিংবা বিশেষণ নয়, বরং তাঁর রাজত্ব কিংবা ক্ষমতার বিশেষণ। ফলে এ হাদিসের ভিত্তিতে এটাকে আল্লাহর নাম সাব্যস্ত করা যায় না। হ্যাঁ, এটুকু অবশ্যই বলা যায় যে, আল্লাহর রাজত্ব কাদিম হলে তাঁর কাদিম হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত।

দুই. মুসতাদরাকে হাকেমে আবু হুরাইরা রাজি.-এর সূত্রে বর্ণিত লম্বা হাদিস, যাতে আল্লাহর অনেকগুলো নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে 'আল-কাদিম' এবং 'আদ দায়িম' নামদুটোও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু জটিলতা হলো, হাদিসটির একজন বর্ণনাকারীকে (আবদুল আজিজ ইবনুল হুসাইন) বড় বড় ইমামগণ দুর্বল বলেছেন। যদিও হাকেম তাকে সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) বলেছেন।[৪]

তিন. সুনানে ইবনে মাজাতে আবু হুরাইরা রাজি. থেকে দ্বিতীয় আরেক সূত্রে বর্ণিত একটি হাদিস। সেখানেও আল্লাহ তায়ালার নাম হিসেবে 'কাদিম' এবং 'দায়িম'

---

১. মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়াহ (৬/১৪২); বাদায়েউল ফাওয়ায়িদ, ইবনুল কাইয়িম (১/১৬২); ইবনে আবিল ইজ (৬৭); সালেহ ফাওজান (২৮); ইবনে বাজ (৮)।

২. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বাইহাকি (১/৩৬); তুর্কিস্তানি (৫৫); আকহাসারি (১১৩)।

৩. সুনানে আবু দাউদ (৪৬৬)।

৪. মুসতাদরাকে হাকেম (৪২)।

উল্লেখ করা হয়েছে।[১] আকহাসারি এটার উপর নির্ভর করে এ দুটোকে আল্লাহর নাম হিসেবে গণ্য করেছেন।[২] কিন্তু সিন্ধি-সহ অনেকের মতে এ হাদিসটিও জয়িফ। ইমাম বাইহাকি রাহি. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-আসমা ওয়াস-সিফাত'-এ 'কাদিম' আল্লাহর নাম হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় মত দিয়েছেন। কিন্তু সেটাও সমালোচিত বর্ণনাকারী আবদুল আজিজ ইবনুল হুসাইন সূত্রে।[৩] ফলে বর্ণনার দুর্বলতা প্রশ্নাতীত নয়।

দেখা যাচ্ছে, যারা বলেছেন এ দুটো আল্লাহর নাম নয়; কারণ সুন্নাহে এগুলো বর্ণিতই হয়নি, তাদের বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ, আলোচ্য হাদিসগুলোর সনদের বিশুদ্ধতা যদিও প্রশ্নাতীত নয়, তথাপি এগুলোর মাধ্যমে নামদুটোর 'আসল' তথা মূল অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ফলে এ দুটো যেমন আল্লাহর নাম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে, একইভাবে অর্থের বিশুদ্ধতার দিকে তাকিয়ে 'বিশেষণ' হিসেবেও আল্লাহর উপর এগুলো প্রয়োগ করা যাবে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উভয় ধারার আলিমগণই একমত। কারণ, এ দুটোর অর্থের মাঝে অসুন্দর কিংবা নিষিদ্ধ কিছু নেই। আরবিতে সাধারণভাবে 'কাদিম' অর্থ পুরোনো। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে এটার অর্থ হবে: 'পুরোনো' নয়, বরং **যিনি সর্বদাই ছিলেন, কখনও ছিলেন না এমন নয়।**

তবে বৈধতা এবং উত্তম দুটোর মাঝে পার্থক্য আছে। যদিও 'কাদিম' এবং 'দায়িম' শব্দ দুটো আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহার বৈধ এবং দুর্বল সূত্রে সেগুলো আল্লাহর নাম বলেও প্রতীয়মান হয়, কিন্তু কুরআন-সুন্নাহে আমরা একই অর্থে আরও উত্তম নাম পাই, যেগুলো আল্লাহর নাম হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুপরিমাণ সন্দেহ নেই। কুরআনের একাধিক আয়াতে সেসব নাম বর্ণিত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসব নামের মাধ্যমে আল্লাহকে সর্বদা ডাকতেন। পাশাপাশি সেগুলো মর্ম ও তাৎপর্যের ক্ষেত্রেও এই দুটো শব্দের চেয়ে অনেক উত্তম। তন্মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'আল-আউয়াল' (শুরু/প্রথম) এবং 'আল-আখির' (শেষ)। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

অর্থ: 'তিনিই শুরু, তিনিই শেষ, তিনিই প্রকাশ্য (উর্ধ্বে), তিনিই গোপন, তিনি সব বিষয় সম্পর্কে জানেন।' [হাদিদ: ৩]

---

১. সুনানে ইবনে মাজা (৩৮৬১)
২. আকহাসারি (১১৫)
৩. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বাইহাকি (১/৩৬)

কুরআনে উক্ত আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ তায়ালার প্রথম চারটি নামের রাসুলুল্লাহ কৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় আবু হুরাইরার সূত্রে বর্ণিত প্রসিদ্ধ একটি হাদিসে, যা মুসলিম সহ কুতুবে সিত্তার বিভিন্ন গ্রন্থে এসেছে। হাদিসটির একটি অংশ হচ্ছে:

اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ

অর্থ: 'হে আল্লাহ, আপনি শুরু, আপনার আগে কিছুই নেই। আপনি শেষ, আপনার পরে কিছুই নেই। আপনি উর্ধ্বে, আপনার উপরে কিছুই নেই। আপনি কাছে (বা গোপনে) আপনার সামনে (কিংবা পরে) আর কিছু নেই।'[১] তাই দোয়া এবং জিকিরের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত নামকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।[২]

আল্লাহর জন্য 'খোদা' বা 'গড' শব্দের ব্যবহার: একই কথা অন্যান্য ভাষায় আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন নামের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। যেমন: ইংরেজি 'গড', বাংলা 'ঈশ্বর', ফারসি 'খোদা' ইত্যাদি। আল্লাহকে বোঝাতে প্রয়োজনে শর্তসাপেক্ষে এসব শব্দ ব্যবহার করা যাবে। কারণ, আল্লাহ পৃথিবীর সকল গোত্রের কাছে নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই অনুমিত যে, প্রত্যেক জাতি আল্লাহর বিভিন্ন নাম তাদের ভাষাতেই উচ্চারণ করত। আসমানি গ্রন্থগুলো সেসব ভাষাতেই অবতীর্ণ হয়েছিল। 'সালাত', 'সাওম', 'জাকাত'-সহ ইসলামের বিভিন্ন ইবাদত, আল্লাহর বিভিন্ন গুণবাচক নাম প্রত্যেক উম্মাহ নিজস্ব ভাষাতেই চর্চা করত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡ

অর্থ: 'আমি সকল রাসুলকে তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদের পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পারেন।' [ইবরাহিম: ৪]

ফলে প্রত্যেক ভাষার মানুষ সে ভাষাতেই আল্লাহকে ডাকতেন, আল্লাহর ইবাদত করতেন এটা সুস্পষ্ট ও সতঃসিদ্ধ বিষয়।

যেহেতু শরিয়তে মুহাম্মাদির ভাষা হিসেবে আল্লাহ আরবিকে মনোনীত করেছেন, ফলে এ শরিয়াহর কিছু নির্দিষ্ট মৌলিক ইবাদত আরবিতেই করতে হবে। তবে এর বাইরে

---

১. মুসলিম (২৭১৩)। আবু দাউদ (৫০৫১)। তিরমিজি (৩৪০০)। তবে হাদিসে বর্ণিত 'যাহির' এবং 'বাতিন' নামের অর্থের ব্যাপারে আলিমদের একাধিক মতামত পাওয়া যায়। বিস্তারিত দেখুন: আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বাইহাকি (১/৯৮)

২. আল-আকিদাহ আত-ত্বহাবিয়্যাহ, কারি মুহাম্মাদ তৈয়ব (৩৪)

যেকোনো ভাষায় শরয়ি পরিভাষাগুলোর আরবি প্রতিশব্দের ব্যবহার বৈধ হবে (যেমন নামাজ, রোজা) এবং সেসব ভাষায় আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত নামে তাঁকে বোঝানো (যেমন খোদা হাফেজ) এবং সেসব নামে কসম খাওয়াও জায়েজ হবে (যেমন খোদার কসম)।[১] ইমাম আহমদ রাহি. আল্লাহকে 'হে পেরেশানদের পথপ্রদর্শনকারী' (يا دليل الحيارى) বলে ডাকার নির্দেশ দিয়েছেন, অথচ এটা আল্লাহর নাম নয়; বরং তাঁর গুণ এবং তাঁর শানে শোভনীয় বিশেষণ।[২] সুতরাং ফারসিতে 'হে খোদা', ইংরেজিতে 'ও গড' কিংবা বাংলাতে 'হে প্রভু' এমনকি 'ঈশ্বর' নামে আল্লাহকে ডাকাও বৈধ হবে। কারণ, 'খোদা', 'গড', 'ঈশ্বর' কিংবা 'প্রভু' নামের মাঝে ইসলামের আকিদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো অর্থ নেই, কিংবা এগুলো অন্য কোনো বিশেষ ধর্মের বিশেষ উপাস্যের নাম হিসেবে নির্ধারিতও নয়। শাইখ ইবনে তাইমিয়া প্রয়োজনে অন্য ভাষায় আল্লাহর নাম ব্যবহারকে মুস্তাহাব এবং ক্ষেত্রবিশেষে ওয়াজিব বলেছেন এবং এটাকে আলিমদের 'সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।[৩]

এটাই স্বাভাবিক ও যৌক্তিক। জগতের সকল ভাষা আল্লাহরই সৃষ্টি, তাঁর নিদর্শন। ফলে আরবি বাদ দিয়ে অন্য কোনো ভাষায় তাঁকে ডাকলে, তাঁর আরবি নামগুলো অন্য ভাষায় অনুবাদ করে ব্যবহার করলে তিনি শুনবেন না, তিনি অসন্তুষ্ট হবেন এটা হতে পারে না। যেমন 'খোদা', 'গড', 'ঈশ্বর' এসব শব্দ আরবি 'রব', 'খালিক', 'মালিক' এ-জাতীয় নামের সমার্থক কিংবা কাছাকাছি অর্থবোধক। ফলে এসব শব্দে আল্লাহকে ডাকা নিষিদ্ধ নয়। বরং পৃথিবীর অনেক ভূখণ্ডের অনেক মানুষ আল্লাহর আরবি নামগুলো যথাযথভাবে উচ্চারণও করতে পারবে না। নিজস্ব ভাষাই তাদের কাছে সহজ হবে। মাতৃভাষাতে আল্লাহকে ডাকতেই তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। এ কারণে এগুলো ব্যবহারের বৈধতার ব্যাপারে সকল ধারার প্রাজ্ঞ আলিমগণ একমত, যেমনটা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। কেবল সাম্প্রতিক সময়ে কিছু মানুষ এগুলো নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে এবং আল্লাহকে 'খোদা', 'গড' ইত্যাদি নামে ডাকাকে 'নাজায়েজ' প্রমাণ করতে চাচ্ছে। তাদের কথা অসঠিক, অনুমাননির্ভর এবং দলিলবিহীন।

---

১. দেখুন: আল-মুহাল্লা, ইবনে হাজাম (৬/২৮১); ফাতহুল কাদির, ইবনুল হুমাম (৫/৭৫); ফাতাওয়া কুবরা, ইবনে তাইমিয়া (৬/৫৬৮)।

২. দেখুন: শরহুস সুন্নাহ, লালাকায়ি (৯/২৭১)।

৩. দেখুন: বায়ানু তালবিসিল জাহমিয়্যাহ (৪/৩৮৯-৩৯০)।

হ্যাঁ, আল্লাহর জন্য কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত আরবি নামগুলো ব্যবহার করাই উত্তম। আল্লাহ বলেছেন,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

অর্থ: 'আর আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম, তোমরা সেসব নামে তাকে ডাকো।' [আরাফ: ১৮০]

এটাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সালাফের সুন্নাহ। পাশাপাশি সমকালীন বিভিন্ন ফিতনারও খণ্ডন। ইদানীং তথাকথিত অনেক প্রগতিশীল মুসলিম 'আল্লাহ' নাম উচ্চারণ করতে লজ্জা পায়। ফলে তারা আল্লাহকে 'সৃষ্টিকর্তা', 'উপরওয়ালা' ইত্যাদি বিশেষণে বোঝায়। শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ হলেও এমন আচরণ এক ভয়ংকর বিচ্যুতির নির্দেশক। আত্মপরিচয় সংকট ও হীনম্মন্যতাবোধের পরিচায়ক। আর ইসলাম ও আরবি নিয়ে হীনম্মন্যতাবোধ একজন মুসলিমকে সময়ের ব্যবধানে দ্বীন থেকে দূরে ঠেলে দিতে পারে। ফলে এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহকে তাঁর আরবি নামগুলোতেই ডাকার উপর জোর দেওয়া উচিত।

আল্লাহর কোনো ক্ষয় নেই, লয় নেই: অর্থাৎ আল্লাহ কোনো দিন শেষ হয়ে যাবেন না। কোনো দিন তাঁর শক্তিতে অণু পরিমাণ কমতি আসবে না। তিনি সর্বদা যেমন ছিলেন সর্বদাই তেমন থাকবেন। কুরআনের একটি আয়াতে উপরের বাক্যের মর্ম তুলে ধরা হয়েছে এভাবে:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

অর্থ: 'ভূপৃষ্ঠে বিদ্যমান সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশিষ্ট থাকবেন কেবল আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তা।' [আর-রহমান: ২৬-২৭] কুরআনে আরও এসেছে:

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا

অর্থ: 'আপনি নির্ভর করুন সেই চিরঞ্জীব সত্তার উপর, যিনি কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না।' [ফুরকান: ৫৮] আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ

অর্থ: 'তিনি ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল।' [কাসাস: ৮৮]

وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ

তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না

ব্যাখ্যা

আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না: কারণ তিনিই জগতের সবকিছু নিজ ইচ্ছায় যেভাবে চেয়েছেন, সৃষ্টি করেছেন। ফলে গোটা সৃষ্টি তাঁর অনুগত থাকবে, তাঁর সৃষ্টি করা জগতে তাঁর ইচ্ছার বাইরে কোনোকিছু হবে না এটাই স্বাভাবিক। এটা ঈমানের ছয়টি মৌলিক রুকনের একটি তাকদিরের উপর ঈমানের অংশ। কুরআনের একাধিক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এ কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন,

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

অর্থ: 'তিনি যখন কোনোকিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, 'হও', তখনই তা হয়ে যায়।' [ইয়াসিন: ৮২] আরও বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

অর্থ: 'আল্লাহ যা ইচ্ছা আদেশ দেন।' [মায়িদা: ১] অন্যত্র বলেন,

كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ

অর্থ: 'এভাবেই আল্লাহ যা চান, করেন।' [আলে ইমরান: ৪০] মানুষের হিদায়াত প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَمَن يُرِدِ اللّٰهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ۚ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.

অর্থ: 'অতঃপর আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে অত্যধিক

সংকীর্ণ করে দেন, যেন সে আকাশে আরোহণ করছে। এমনইভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ তাদের উপর আজাব বর্ষণ করেন।' [আনআম: ১২৫] নুহ আলাইহিস সালামের ভাষায় আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ؕ هُوَ رَبُّكُمْ ۫ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

অর্থ: 'আর আমি তোমাদের নসিহত করতে চাইলেও তা তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যদি আল্লাহ তোমাদের গোমরাহ করতে চান; তিনিই তোমাদের পালনকর্তা এবং তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।' [হুদ: ৩৪] আল্লাহ আরও বলেন,

وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ

অর্থ: 'আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন।' [ইবরাহিম: ২৭] মানুষের ইচ্ছাকে আল্লাহ তাঁর ইচ্ছার অধীন ঘোষণা করে বলেন,

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ

অর্থ: 'আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে তোমরা কোনো ইচ্ছা করতে পারো না।' [ইনসান: ৩০] একই কথা আরেক জায়গায় তাগিদ করেন,

وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থ: 'বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে তোমাদের কোনো ইচ্ছা নেই।' [তাকভির: ২৯]

উল্লিখিত প্রত্যেকটি আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, পৃথিবীতে যা-কিছু হচ্ছে, সব আল্লাহর ইচ্ছায় হচ্ছে। আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না। কিন্তু কয়েকটি ফিরকা এই বিষয়ে বিভ্রান্তি ও গোমরাহির শিকার হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কাদারিয়্যাহ, কাররামিয়্যাহ ও মুতাজিলাহ ফিরকা। কাদারিয়্যাহ ফিরকা তাকদিরকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছে। তাদের ধারণা, মানুষ যার ইচ্ছা মুমিন হয়, আবার যার ইচ্ছা কাফের হয়; তাতে আল্লাহর কোনো ইচ্ছা নেই। বরং আল্লাহ সবার জন্য ঈমান চেয়েছেন, কিন্তু কাফেররা ঈমান আনেনি। আর মুতাজিলারা বলেছে, আল্লাহর প্রকৃত অর্থে ইচ্ছা নেই; রূপক ইচ্ছা রয়েছে। কারণ, ইচ্ছার অন্য নাম—তাদের ধারণামতে—

'শাহওয়াহ' বা প্রবৃত্তি। আর আল্লাহ তায়ালা সব ধরনের প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত। তাই আল্লাহর উপর হাকিকি অর্থে ইচ্ছা শব্দ প্রয়োগ করা যায় না, রূপক অর্থে যেতে পারে। এটা তাদের অজ্ঞতা। কারণ, ইচ্ছা (ইরাদা) মানেই প্রবৃত্তি (শাহওয়াহ) নয়; বরং ইচ্ছা হলো, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বিষয় ঘটানোর প্রক্রিয়া। সৃষ্টির শৃঙ্খলা ও বিন্যাসের জন্য ইচ্ছা আবশ্যক।[১]

একটি সন্দেহের অপনোদন: প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ তায়ালা যদি পৃথিবীর সবার জন্য ঈমান কামনা করেন, তবে আবু বকর রাজি.-এর কপালে ঈমান লিখে থাকলে আবু লাহাবের কপালে কেন লিখলেন না? আবু বকর রাজি.-কে ঈমান গ্রহণে সহায়তা করেছেন, আবু লাহাবকে কেন করলেন না? উত্তর হলো:

এক. আল্লাহ তায়ালা তাঁর গায়েবি ইলমের মাধ্যমে প্রথমেই জেনেছেন যে, আবু লাহাবের ঈমান তার কোনো উপকারে আসবে না। অর্থাৎ সে গোমরাহির পথেই চলবে, ফলে তাকে মুমিন বানিয়ে সৃষ্টি করেননি, কিংবা তাকে ঈমান গ্রহণে সাহায্য করেননি।

দুই. আবু বকর রাজি.-কে আল্লাহ ঈমান গ্রহণে সহায়তা করে অনুগ্রহ করেছেন। কারণ, তিনি নিজের পুণ্য, উত্তম চরিত্র, হৃদয়ের স্বচ্ছতা ও পবিত্রতার ফলে সেই অনুগ্রহ লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। অপরদিকে আবু লাহাব তার মন্দ গুণ ও মন্দ চরিত্র, হৃদয়ের অস্বচ্ছতার ফলে অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

তিন. আল্লাহ তায়ালা হক ও বাতিল তৈরি করেছেন। মানুষকে এই দুটো থেকে যেকোনো একটা গ্রহণের স্বাধীনতা দিয়েছেন। কিন্তু স্বাধীনতা দিয়েই ছেড়ে দেননি। বরং নিজ অনুগ্রহে তাদের হক ও বাতিল চিনিয়ে দিয়েছেন। হক গ্রহণ করতে এবং বাতিল বর্জন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সতর্ক করার জন্য নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন, গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। এর পরেও আবু লাহাব কুফর করলে সেটার দায়ভার আল্লাহর উপর হতে পারে?[২]

এ কারণে একটি বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবাদের বললেন, সকল মানুষের জন্মের আগেই জান্নাত কিংবা জাহান্নামে তার জন্য জায়গা নির্ধারিত হয়ে যায়। সে সৌভাগ্যবান হবে, নাকি দুর্ভাগা

---

১. দেখুন: গজনবি (৪৮-৪৯); আকহাসারি (১১৬); শাইবানি (১০); ইবনে আবিল ইজ্জ (৬৮)।
২. খুমাইয়িস (২১০-২১১)।

হবে, লেখা হয়ে যায়। তখন এক সাহাবি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, তা হলে তাকদিরের উপর নির্ভর করে বসে থাকলেই তো হয়। আমল করার কী দরকার? কারণ, যে সৌভাগ্যবান হওয়ার, সে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সৌভাগ্যের আমল করবে। আর যে দুর্ভাগা হওয়ার, সে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সে পথে অগ্রসর হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বরং তোমরা কাজ করত থাকো। প্রত্যেককে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজ তার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। যাকে সৌভাগ্যের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সেসব কাজ তার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। আর যাকে দুর্ভাগ্যের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সেসব কাজ তার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। এরপর তিনি কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন,

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَ اتَّقٰى ۙ وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۙ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ؕ وَ اَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَ اسْتَغْنٰى ۙ وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۙ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى.

অর্থ: 'অতএব, যে দান করে, আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্যায়ন করে, তার জন্য সুখের বিষয় সহজ করে দেবো। আর যে কৃপণতা করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং উত্তম বিষয়কে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য দুঃখের পথ সহজ করে দেবো।'[১] [লাইল: ৫-১০]

দেখা যাচ্ছে, সৃষ্টির আগেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইলমের মাধ্যমে কে জান্নাতি হবে এবং কে জাহান্নামি হবে সেটা লিখে রাখলেও মানুষকে তিনি স্বাধীনতা দিয়েছেন। ভালো ও মন্দ এখতিয়ার করার সুযোগ দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকদিরের উপর নির্ভর করে বসে থাকতে নিষেধ করেছেন। কারণ, কেউই জানে না যে, তার তাকদিরে কী আছে। তা ছাড়া পার্থিব বিষয়ে মানুষ তাকদিরের উপর বসে না থেকে ক্যারিয়ার গড়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে সে তাকদিরে যা আছে তা-ই হবে বলে বসে থাকে না। আখিরাতের ক্ষেত্রেও আমাদের তা-ই করতে হবে। হিদায়াতের জন্য চেষ্টা ব্যয় করলে আল্লাহ জান্নাতের পথ খুলে দেবেন বলেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বরং পার্থিব ব্যাপারেও তাকদির মানুষের সুখের অবলম্বন। বিপদ-আপদে মুমিন তাকদিরের কথা বলে প্রবোধ ও সান্ত্বনা লাভ করে। কারণ, সে জানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

---

১. বুখারি (৪৯৪৯); মুসলিম (২৬৪৭)।

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ. لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَآ اٰتٰكُمْ ۗ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.

অর্থ: 'পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের উপর যা-কিছু বিপদ আসে, তা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এ জন্য, যাতে তোমরা যা হারাও তার জন্য দুঃখিত না হও, আর তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তার জন্য উল্লসিত না হও। আল্লাহ উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।' [হাদিদ: ২২-২৩]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যা তুমি পেয়েছ, তা কখনও হারানোরই ছিল না। আর যা হারিয়েছ, তা কখনও পাওয়ারই ছিল না।'[১] বিপরীতে নাস্তিক ও কাফেরের কাছে সান্ত্বনার এই দুর্গটা নেই। ফলে তাকে নিজের উপরই নিজের নির্ভর করতে হয়। যখন সে নিজের বোঝা আর বইতে পারে না, নিরাশার অন্ধকারে আত্মহননের পথে এগিয়ে যায়।

---

১. এটা রাসুলুল্লাহর প্রসিদ্ধ হাদিস। তিরমিজি (২১৪৪); মুসনাদে আহমদ (২১৮৩৫); বাজ্জার (৪১০৭)-সহ বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

لا تَبْلُغُهُ الأَوْهَامُ وَلا تُدْرِكُهُ الأَفْهَامُ، وَلا يُشْبِهُ الأَنَامَ

কোনো কল্পনাশক্তি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারে না। বোধ-বুদ্ধি তাঁকে পরিব্যাপ্ত করতে পারে না। সৃষ্টির কোনোকিছুই তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে না।

ব্যাখ্যা

আল্লাহ সম্যক উপলব্ধির ঊর্ধ্বে: উপরের আরবি বাক্য অনুমান, ধারণা, কল্পনাশক্তি, মনে করা সবকিছুকে নাকচ করে দেয়। কারণ, আল্লাহ তায়ালা মানুষের কল্পনাশক্তি তৈরি করেছেন। সকল ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সকল উপলব্ধি এবং উপলব্ধির উপকরণের স্রষ্টা। ফলে তাঁর সৃষ্টি করা কোনো উপায়-উপকরণের মাধ্যমে তাঁকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তিনি সবকিছুর উর্ধ্বে, সবকিছুর চেয়ে বড় ও মহান। সৃষ্টির ছোট্ট বোধ-বুদ্ধি, সীমিত জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁকে সমাকীর্ণ করা সম্ভব নয়। মানুষ আল্লাহর ব্যাপারে যতই এবং যেভাবেই ভাবুক, তাঁকে সম্যকভাবে এবং স্বরূপে উপলব্ধি করতে পারবে না। এ জন্য এক্ষেত্রে মানুষের বিনয়ী হওয়া উচিত। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

অর্থ: 'তিনি জানেন যা কিছু তাদের সামনে ও পশ্চাতে আছে এবং তারা তাকে জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করতে পারে না।' [ত্বহা: ১১০] অর্থাৎ তাঁর ব্যাপারে জানা সম্ভব, কিন্তু তাঁর সত্তা ও গুণাবলি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তিনি সকল অনুমান, ধ্যান-ধারণা ও কল্পনা-জল্পনার উর্ধ্বে। সৃষ্টিকে সেসব উপকরণ দেওয়াই হয়নি। ফলে আল্লাহ নিজের ব্যাপারে যা বলেছেন, এর বাইরে কিছু বলা বৈধ নয়।[১]

এ কারণেই মানুষকে আল্লাহর ব্যাপারে চিন্তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে: 'রাসুল সাল্লাল্লাহু

---

১. দেখুন: গজনবি (৪৯-৫০); গুনাইমি (৫৪); সালেহ ফাওজান (২৯)।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোককে দেখে বললেন, তোমরা কী করছ? তারা বলল, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছি। তিনি বললেন, তাঁর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করো, স্রষ্টাকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করো না। তোমরা তাঁর হক আদায় করতে পারবে না'।[১] ইবনে উমর রাজি.-এর সূত্রেও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।[২] হাদিসটির বিশুদ্ধতা নিয়ে ইমামগণ কথা বললেও সাখাবি বলেন, হাদিসটি একাধিক দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে। ফলে একটি আরেকটিকে শক্তিশালী করে এবং এটার অর্থ সঠিক।[৩] এটা বাদ দিলেও ইবনে আব্বাস রাজি.-এর সূত্রে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে: تَفَكَّرُوا فِي كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِ اللهِ অর্থ: 'তোমরা সবকিছু নিয়ে চিন্তাভাবনা করো, কিন্তু আল্লাহর সত্তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করো না।'[৪] দেখা যাচ্ছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাগণ থেকেই আল্লাহকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। সাহাবাগণ হলেন এ উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে জ্ঞানী প্রজন্ম। আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বেশি আদব রক্ষাকারী জামাত। তাদেরই যদি আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে নিষেধ করা হয়, আজকের মুসলমানদের ব্যাপারে কী বলা যায়? অথচ আজকের মুসলিম উম্মাহ সহিহ/সুফি বিভিন্ন ব্যানারে আল্লাহকে নিয়ে বিতর্কের ক্ষেত্রে চরম দ্বন্দ্বে লিপ্ত।

সৃষ্টির কোনোকিছুই আল্লাহর সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে না: পিছনে 'তাঁর মতো কিছুই নেই' শিরোনামে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান বাক্যটি সেই কথাকেই তাগিদ দেওয়ার জন্য আনা হয়েছে। আল্লাহ সৃষ্টির সঙ্গে সব ধরনের সাদৃশ্য থেকে মুক্ত। তাঁর সত্তা ও সিফাত (গুণাবলি) সকল ক্ষেত্রে তিনি সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে পবিত্র। কিন্তু যুগে যুগে বিভিন্ন কওম এ ব্যাপারে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। তারা আল্লাহকে মানুষের মতো কল্পনা করেছে। আসমানি শরিয়তধারীদের মাঝে সর্বপ্রথম এই বিচ্যুতির শিকার হয়েছে ইহুদিরা। ফলে তারা মুজাসসিমাহ (দেহবাদী) হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছে।[৫] এর পর পথভ্রষ্ট হয়েছে খ্রিষ্টানরা। তারা ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র কল্পনা করেছে। আর পুত্র তো পিতার মতোই হয়, এটাই স্বাভাবিক। এভাবে আল্লাহ তায়ালাকে মানুষের মতো কল্পনা করে তারা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। সবশেষে গোমরাহ হয়েছে

১. আত-তারগিব ওয়াত তারহিব (হাদিস নং ৬৭০, ৬৭২)।
২. শুআবুল ঈমান, বাইহাকি (হাদিস নং ১১৯)।
৩. আল-মাকাসিদুল হাসানাহ (২৬১)।
৪. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বাইহাকি (২/৪৬)।
৫. দেখুন: আকহাসারি (১১৮)।

মুসলিম উম্মাহর মুশাববিহাহ ও মুজাসসিমাহ সম্প্রদায়। তারাও আগের কওমগুলোর মতো আল্লাহকে মানুষরূপে কল্পনা করেছে।[১]

কিন্তু এই সাদৃশ্যের ভয়ে কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত আল্লাহর সিফাতগুলো অস্বীকার করা যাবে না; যেহেতু সেগুলো কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত হয়েছে, তাই অর্থহীন নয়। ফলে এগুলোকে সালাফের মানহাজের আলোকে স্বীকার করতে হবে। কারণ, আল্লাহর সত্তা বান্দার সত্তার মতো নয়। তাঁর গুণাবলি বান্দার গুণাবলির মতো নয়। হ্যাঁ, সাদৃশ্য রয়েছে কেবল শব্দ ও নামের ক্ষেত্রে। যেমন: জীবন, জানা, শোনা, দেখা ইত্যাদি; কিন্তু এগুলো স্রষ্টা ও সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য বোঝানোর জন্য নয়; বরং মানুষ যেন এসব বিশেষণ বুঝতে পারে সেজন্য বলা হয়েছে। নতুবা আল্লাহর জীবন, তাঁর জ্ঞান, তাঁর দর্শন ও শ্রবণ সবকিছু সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।[২]

---

১. দেখুন: গজনবি (৫০); শাইবানি (১১)।
২. ইবনে আবিল ইজ (৭৩); সালেহ ফাওজান (৩০)।

حَيٌّ لاَ يَمُوتُ، قَيُّومٌ لا يَنَامُ

তিনি সদা জীবিত, তাঁর মৃত্যু নেই। তিনি সদা বিদ্যমান রক্ষাকর্তা, নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না।

ব্যাখ্যা

আল্লাহ চিরঞ্জীব ও চির বিদ্যমান রক্ষাকর্তা: আল্লাহ তায়ালা সর্বদাই ছিলেন, সর্বদাই থাকবেন। তাঁর শুরু নেই, শেষ নেই। তাঁর জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। তাঁর ঘুম নেই, নিদ্রা নেই। এগুলো সৃষ্টি এবং সৃষ্টির গুণাবলি। আর আল্লাহ তায়ালা জন্ম-মৃত্যুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি ঘুম ও জাগরণের সৃষ্টিকর্তা। তিনি পৃথিবীর রক্ষাকর্তা। ফলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন না। তিনি নিদ্রামগ্ন হন না। বরং তন্দ্রাও তাঁকে স্পর্শ করে না। তিনি সবকিছুর অমুখাপেক্ষী। কুরআনের বিখ্যাত আয়াত 'আয়াতুল কুরসিতে' আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَۃٌ وَّ لَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ مَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَ لَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ.

অর্থ: 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি সদা জীবিত, সবকিছুর রক্ষাকর্তা। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও জমিনে যা-কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছে এমন যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তাদের দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা-কিছু রয়েছে, সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনোকিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরসি সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোর সুরক্ষা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।' [বাকারা: ২৫৫] অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ

অর্থ: 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি সদা জীবিত, সদা বিদ্যমান রক্ষাকর্তা।' [আলে ইমরান: ২]

আরবি 'আল-হাইয়ু' শব্দের অর্থ চির জীবিত। যিনি সর্বদা ছিলেন সর্বদা থাকবেন। মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী আর আল্লাহর জীবন চিরস্থায়ী যার কোনো শেষ নেই। 'আল-কাইয়ুম'-এর বেশ কিছু অর্থ বর্ণনা করা হয়। তবে সবগুলোই কাছাকাছি। যেমন: রক্ষাকর্তা। যিনি নিজে বিদ্যমান থাকেন অন্যকে বিদ্যমান রাখেন। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, যিনি পৃথিবীর সবকিছু পরিচালনা ও দেখাশোনা করেন। সবগুলো অর্থই আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য।[১] কারণ, আল্লাহ পৃথিবীর রক্ষাকর্তা, তিনি সবকিছু পরিচালনা করেন। গোটা সৃষ্টির সবকিছু তিনি সুরক্ষিত রাখেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

অর্থ: 'নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও জমিনকে ধরে রাখেন, যাতে এগুলো সরে না যায়! যদি সরে যায়, তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে?' [ফাতির: ৪১] সুবহানাল্লাহ! মানুষ সাধারণ দৃষ্টিতে তাকালে মনে করে সৃষ্টির সবকিছু প্রাকৃতিকভাবেই স্বাভাবিক নিয়মে চলছে। অথচ আল্লাহ বলছেন তিনি ধরে না রাখলে এগুলো ধ্বংস হয়ে যেত! আধুনিক বিজ্ঞানও পৃথিবীর এমন সূক্ষ্ম শৃঙ্খলার কথা বলছে যা সামান্য এদিক-সেদিক হয়ে গেলেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। তা হলে কে এগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেন? আল্লাহ তায়ালা! আর যেই সত্তা এতকিছু করেন, তিনি এক মুহূর্তের জন্য নিদ্রা যেতে পারেন না, তন্দ্রা তাঁকে ছুঁতে পারে না।[২] তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা ঘুমান না। ঘুমানো তাকে শোভা পায় না।'[৩]

এত তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ ধারণ করার ফলেই 'আল-হাইয়ু' ও 'আল-কাইয়ুম' নামদুটো আল্লাহর নামগুলোর মাঝে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী এবং আল্লাহর শ্রেষ্ঠ দুটো নাম। বরং কেউ কেউ এই দুটো নামকে 'ইসমে আজম'ও বলেছেন। কারণ,

---

১. গজনবি (৫৪)।
২. আকহাসারি (১১৯)।
৩. মুসলিম (১৭৯); ইবনে হিব্বান (২৬৬)।

আল্লাহর অন্যান্য নাম ও অন্যান্য গুণ এই দুটোর উপরই নির্ভরশীল। কেননা জীবনের অনুপস্থিতিতে জ্ঞান, জানা, শোনা ইত্যাদি গুণ অপ্রাসঙ্গিক। ফলে এগুলোর চিরন্তনতা জীবনের চিরন্তনতার উপর নির্ভরশীল। একইভাবে সৃষ্টি, রিজিক, ক্ষমতা, পর্যবেক্ষণ, পরিচালনা-সহ সবকিছু 'কাইয়ুমিয়্যাত'-এর উপর নির্ভরশীল। আর এই নামদুটো যেহেতু আল্লাহ তায়ালার এসব গুণের সাক্ষী ও পরিচায়ক, তাই এ দুটোর এত মর্যাদা। এসব নাম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উপর প্রয়োগ করা অনুচিত।[১]

এর মাধ্যমে আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয়; তা হলো, আল্লাহর মতো কিছু নেই। আল্লাহর গুণাবলির সঙ্গে সৃষ্টির গুণাবলির সাদৃশ্য নেই। আল্লাহর ক্ষেত্রে যেটা পূর্ণতা হিসেবে বিবেচিত হয়, বান্দার ক্ষেত্রেও সেটা পূর্ণতা হিসেবে বিবেচিত হবে এমন আবশ্যক নয়। যেমন ঘুম ও নিদ্রা। এটা আল্লাহর ক্ষেত্রে অপূর্ণতা ও নেতিবাচক গুণ। কারণ তিনি গোটা জগতের স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তা। ফলে তিনি ঘুমাতে পারেন না। অপরদিকে মানুষের ক্ষেত্রে ঘুম পূর্ণতা ও ইতিবাচক গুণ। যে মানুষ ঘুমায় না, সে শারীরিকভাবে অসুস্থ হিসেবে গণ্য হয়। ফলে আল্লাহর কোনো গুণকে সৃষ্টির গুণাবলির উপর মাপা যাবে না।[২]

---

১. ইবনে আবিল ইজ (৭৭-৭৮)।
২. সালেহ ফাওজান (৩১)।

خَالِقٌ بِلَا حَاجَةٍ، رَازِقٌ بِلَا مُؤْنَةٍ، مُمِيتٌ بِلَا مَخَافَةٍ، بَاعِثٌ بِلَا مَشَقَّةٍ

তিনি সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টি থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি রিজিকদাতা, রিজিকদানে কোনো কষ্ট-ক্লান্তি নেই তাঁর। তিনি মৃত্যু দানকারী, নির্ভয়ে মৃত্যু দান করেন। তিনি পুনরুত্থানকারী, বিনাক্লেশে পুনরুত্থিত করেন।

ব্যাখ্যা

এসব গুণাবলি আল্লাহ তায়ালার সর্বোচ্চ ক্ষমতা, মর্যাদা ও বড়ত্বের বহিঃপ্রকাশ। সকল দিক থেকে সৃষ্টির সকলের উর্ধ্বে হওয়ার প্রমাণ। কারণ, পৃথিবীতেও অনেক সৃষ্টিকর্তা আছে। কেউ ঘর তৈরি করে, কেউ বাড়ি তৈরি করে, কেউ প্রতিষ্ঠান তৈরি করে। কিন্তু এই তৈরি করার পিছনে নিজের উদ্দেশ্য থাকে। অপরদিকে আল্লাহ তায়ালা গোটা জগৎ সৃষ্টি করেছেন নিজের কোনো প্রয়োজন ছাড়াই। তিনি মহান 'খালিক' (সৃষ্টিকর্তা)। এ কারণে প্রাচীন ভাষা-বিশেষজ্ঞ আজহারি মনে করেন, 'খালিক' নামটি আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপর প্রয়োগ করা বৈধ নয়। কারণ, 'খালক' হলো সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সৃষ্টি। মানুষ যেভাবে পাঁচটা বস্তু মিশ্রিত করে নতুন একটা বস্তু তৈরি করে তেমন নয়।[১]

পৃথিবীর মানুষ নিজ পরিবারের ভরণ-পোষণ যোগাতে ক্লান্ত হয়ে ওঠে, কিংবা ভরণপোষণে টান পড়ে। আল্লাহ তায়ালা গোটা পৃথিবীর সবার সব ধরনের প্রয়োজন পূর্ণ করেন, এটা তাঁর জন্য কষ্টকর নয় কিংবা তাঁর ভান্ডার হ্রাস করে না; বরং আল্লাহ তো কোনো জিনিস 'হও' বললেই হয়ে যায়। [ইয়াসিন: ৮২]

মানুষ নিজেকে বাঁচাতে কিংবা নিজের স্বার্থ উদ্ধারে একজন আরেকজনকে মেরে ফেলে। অনেক সময় নিজের বানানো সৃষ্টিকেও গুঁড়িয়ে দেয়, যখন সেটা তার আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। আল্লাহ তায়ালাও নিজের বানানো সৃষ্টিকে মৃত্যু দান করেন, কিন্তু ভয়ে মৃত্যু দেন না।

---

১. তাহজিবুল লুগাহ, আজহারি (৭/১৬)।

পৃথিবীর কোনো সৃষ্টি সহস্র বছর পরিশ্রমেও একটা ক্ষুদ্র মৃত বস্তুও জীবিত করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা সৃষ্টিকে কোনো কষ্ট ছাড়াই মুহূর্তে পুনরুত্থিত করবেন।

আল্লাহ অমুখাপেক্ষী সৃষ্টিকর্তা, ক্লান্তিহীন রিজিকদাতা: এ কারণেই কুরআন-সুন্নাহে আল্লাহর এসব গুণের দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট ঘোষণা এসেছে। আল্লাহ বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ. مَآ أُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ أُرِيْدُ أَنْ يُّطْعِمُوْنِ.
إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ.

অর্থ: 'আর আমি মানুষ ও জিনকে আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না। আমি চাই না তারা আমার আহার্য জোগাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহই হলেন জীবিকাদাতা, শক্তির আধার, পরাক্রমশালী।' [জারিয়াত: ৫৬-৫৮] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يَآيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللهِ ۚ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ

অর্থ: 'হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ তিনি অভাবমুক্ত প্রশংসিত।' [ফাতির: ১৫] আরেক জায়গায় আল্লাহ বলেন,

قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّيْٓ أُمِرْتُ أَنْ
أَكُوْنَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

অর্থ: 'আপনি বলে দিন, আমি কি আল্লাহ ব্যতীত, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা এবং যিনি সবাইকে আহার্য দান করেন এবং তাঁকে কেউ আহার্য দান করে না, অপরকে সাহায্যকারী স্থির করব? আপনি বলে দিন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, সর্বাগ্রে আমিই আজ্ঞাবহ হব। আপনি কখনোই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।' [আনআম: ১৪] অপর একটি আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَقَالَ مُوْسٰىٓ إِنْ تَكْفُرُوْٓا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَإِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ

অর্থ: 'মুসা বললেন, তোমরা এবং পৃথিবীর সবাই যদি কুফরি করো, তথাপি আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত। [ইবরাহিম: ৮]

সহিহ মুসলিমে একটি মহাগুরুত্বপূর্ণ হাদিসে কুদসিতে এসেছে, 'হে আমার বান্দাগণ, নিশ্চয় আমি আমার উপর জুলুম হারাম করেছি, আমি তোমাদের মাঝেও তা

হারাম করেছি। অতএব, তোমরা জুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ, তোমাদের প্রত্যেকেই পথচ্যুত, কেবল সে ছাড়া যাকে আমি পথ দেখাই। অতএব, তোমরা আমার কাছে পথের সন্ধান চাও, আমি তোমাদের (হিদায়াতের) সন্ধান দেবো। হে আমার বান্দাগণ, তোমরা সকলে ক্ষুধার্ত। তবে আমি যাকে আহার দান করি সে ছাড়া। অতএব, তোমরা আমার নিকট আহার প্রার্থনা করো, তোমাদের আহার দেবো। হে আমার বান্দাগণ, তোমরা সকলে বিবস্ত্র, তবে আমি যাকে বস্ত্র দান করি সে ছাড়া। অতএব, তোমরা আমার নিকট বস্ত্র চাও, আমি তোমাদের বস্ত্র দেবো। হে আমার বান্দাগণ, তোমরা রাত-দিনই ভুল করতে থাকো, আমি তোমাদের সকল পাপ মোচন করতে থাকি। অতএব, আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করব। হে আমার বান্দাগণ, তোমরা আমার ক্ষতি পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না যে আমার ক্ষতি করবে। আর না তোমরা আমার উপকার পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে যে আমার উপকার করবে। যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানুষ-সহ জগতের সকল মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো মানুষটির মতো হয়ে যাও, সেটা আমার রাজত্ব সামান্য বৃদ্ধি করবে না। হে আমার বান্দাগণ, যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানুষ-সহ জগতের সকল মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ লোকটির মতো হয়ে যাও, সেটা আমার রাজত্ব সামান্য হ্রাস করবে না। হে আমার বান্দাগণ, যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানুষ-সহ জগতের সকল মানুষ ও জিন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার নিকট প্রার্থনা করো, অতঃপর আমি প্রত্যেককে তার প্রার্থিত বস্তু প্রদান করি, তবে আমার কাছে যা আছে তা থেকে ততটুকু হ্রাস পাবে, যতটুকু একটা সুঁই সুমদ্র থেকে পানি নিলে হ্রাস পায়! হে আমার বান্দাগণ, এ তো তোমাদের আমল, যা আমি তোমাদের জন্য সংরক্ষণ করি, অতঃপর তোমাদের তা পূর্ণ করে দেবো। অতএব, যে ভালো কিছু পেল, সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে, যে অন্যকিছু পেল, সে যেন কেবল নিজেকেই দোষারোপ করে।'[১]

আল্লাহ নির্ভয়ে মৃত্যুদানকারী, বিনাক্লেশে পুনরুত্থানকারী: এই দুটো গুণ আল্লাহ তায়ালার অসীম ক্ষমতার নির্দেশক। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাদের ভয়ে মৃত্যু দান করেন না। কারণ, মানুষ জীবিত থাকলে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আবার জীবিত থেকে যদি সবাই মিলে আল্লাহর কুফরি করতে থাকে, তাতেও আল্লাহর কিছু আসবে-যাবে না, নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, পিছনের হাদিসে যা স্পষ্ট হয়েছে। তা ছাড়া ভয় এক ধরনের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা। আর আল্লাহ সব ধরনের ত্রুটি থেকে পবিত্র।

---

১. মুসলিম (২৫৭৭); মুসতাদরাকে হাকেম (৭৭০১)।

তবে যেহেতু আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর জীবনকে চিরস্থায়ী বানাননি; বরং পরকালকে চিরস্থায়ী বানিয়েছেন, তাই নিয়ম অনুযায়ীই সকল সৃষ্টিকে মৃত্যুর স্বাদ নিতে হয়। বাকি থাকবেন একমাত্র তিনি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা।[১]

পুনরুত্থান আল্লাহ তায়ালার এমন একটি গুণ, যা মানুষের সঙ্গে বাহ্যিকভাবে কিংবা নামের ক্ষেত্রেও সাদৃশ্য রাখে না। কারণ, এটা কেবল আল্লাহ তায়ালারই গুণ। বরং আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ একটি গুণ। জগতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব মানুষ, জিন, পশু-পাখি যখন মরে, পচে, গলে নিঃশেষ হয়ে যাবে, আল্লাহ তায়ালা বিনা ক্লেশে তাদের সবাইকে পুনরায় জীবিত করবেন! এটা আল্লাহর জন্য খুব সহজ ব্যাপার। কুরআনের একাধিক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এই চিরসত্যের তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ

অর্থ: 'তোমাদের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান তো কেবল একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের মতোই।' [লুকমান: ২৮] আরেক জায়গায় তিনি বলেন,

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ

অর্থ: 'তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্য সহজ।' [রুম: ২৭] সুরা ইয়াসিনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ؕ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ . قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُ . الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ . اَوَلَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ بَلٰى وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ . اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ .

অর্থ: "সে আমার ব্যাপারে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পচে-গলে যাবে? বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপন্ন করেন। তখন তোমরা তা থেকে প্রজ্বলিত করো। যিনি আকাশসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, বরং তিনি

১. তুর্কিস্তানি (৬৬); সালেহ ফাওজান (৩২); সাইদ ফুদাহ (২১২)।

মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তিনি যখন কোনোকিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, 'হও', তখনই তা হয়ে যায়"। [ইয়াসিন: ৭৮-৮২]

এখানে আল্লাহ তায়ালা মানুষের বিবেককে নাড়া দিয়েছেন। যিনি সবুজ গাছ থেকে আগুন বের করতে পারেন, তিনি কেন মৃতকে জীবিত করতে পারবেন না? যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, মানুষের মতো ক্ষুদ্র জীবকে একবার সৃষ্টির পর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর কাছে কোনো ব্যাপার? আল্লাহ তায়ালা আরেক জায়গায় বলেন,

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ؕ بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰۤى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ .

অর্থ: 'মানুষ কি মনে করে যে আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করব না? অবশ্যই। বরং আমি তার আঙুলগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম।' [কিয়ামাহ: ৩-৪]

আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে শরীরের বড় বড় ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাদ দিয়ে 'আঙুল'-এর কথা কেন বলেছেন? অনেক আলিমের মতে, এটার মাধ্যমে আল্লাহর কুদরত এবং কুরআনের সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে। আজ আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের আঙুলের ছাপ (fingerprint) আবিষ্কার করেছে, যার মাধ্যমে জগতের প্রত্যেক মানুষকে আলাদা করা যায়। একজনের আঙুলের ছাপ অন্য জনের সঙ্গে মেলে না। আল্লাহ তায়ালা সেটা ১৪০০ বছর আগে পুনরুত্থান অস্বীকারকারী কাফেরদের খণ্ডনে বলে দিয়েছেন যে, তিনি আঙুলগুলোকে বিন্যস্ত করতে সক্ষম এবং এর মাধ্যমে প্রত্যেকটা সৃষ্টিকে পুনরুত্থিত করতে সক্ষম!

একটি প্রশ্ন ও উত্তর: মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

اِنَّمَاۤ اَمْرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

অর্থ: "তিনি যখন কোনোকিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, 'হও', তখনই তা হয়ে যায়।" [ইয়াসিন: ৮২] এখানে মূল আয়াতে ব্যবহৃত আরবি শব্দটি হচ্ছে 'কুন' (كُنْ - ك+ن)। পবিত্র কুরআনের আট জায়গায় আল্লাহ তায়ালা শব্দটি ব্যবহার করেছেন। প্রশ্ন হলো, এই কথার অর্থ কী? এটা কি শাব্দিকভাবে গ্রহণ করব, নাকি রূপক অর্থে? অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো কাজের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর 'কুন' শব্দটি বলতে হয় এবং এটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ হয়ে

যায়, নাকি এটা দ্বারা বলার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ যখনই কিছু করতে চান মুহূর্তে সেটা হয়ে যায়। এর জন্য আলাদা করে তাঁর 'কুন' বলতে হয় না?

উলামায়ে কেরাম বিভিন্নভাবে কথাটি ব্যাখ্যা করেছেন। একদল উলামায়ে কেরাম আয়াতের বাহ্যিক শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করেন এবং বলেন, আল্লাহ কোনো কাজ করতে চাইলে 'কুন' বলেন, ফলে তা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়। তাদের কাছে বিষয়টি এতই প্রসিদ্ধ যে, তারা নিয়মিতই বলে থাকেন, يا من أمره بين الكاف والنون/ بعد الكاف والنون অর্থাৎ হে ওই সত্তা, যার নির্দেশ 'কাফ ও নুন'-এর মাঝে। তাদের কেউ কেউ এটাকে বলেন, কাফ ও নুনের পরে। অর্থাৎ আল্লাহর সকল কাজ 'কুন' শব্দের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এটাকে তারা 'আল্লাহর কালাম' সাব্যস্তের দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন। অনেক হানাফি ইমামও উক্ত মতের প্রবক্তা। যেমন: ইমাম সারাখসি রাহি. বলেন, 'এখানে উদ্দেশ্য হাকিকি কালিমা; রূপক নয়'।[১]

বিপরীতে উম্মাহর অন্য একদল আলিম মনে করেন, এটার শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করা বিশুদ্ধ নয়; বরং রূপক অর্থ গ্রহণ করতে হবে। কারণ, শাব্দিক অর্থ দ্বারা মনে হয়, আল্লাহর যেকোনো ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য 'কুন' শব্দ উচ্চারণ করা জরুরি। 'কুন' না বললে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয় না। অন্য কথায়, এটা জরুরি হয় যে, 'কুন' শব্দ বলার উপর তাঁর ইচ্ছার বাস্তবায়ন নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছা করলেই বাস্তবায়িত হয় না। অথচ এটা ভুল কথা। কারণ, তাতে আল্লাহর অক্ষমতা ও মুখাপেক্ষিতা বোঝায়। বরং আল্লাহ কোনোকিছু ইচ্ছা করলেই সেটা সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবায়িত হয়ে যায়। কোনো শব্দ উচ্চারণ কিংবা নির্দেশ দেওয়ার উপর সেটা নির্ভরশীল নয়। এখানে 'কুন' শব্দটি উদাহরণ হিসেবে আনা হয়েছে। কারণ, এটিই আরবিতে উক্ত উদ্দেশ্য বোঝানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য শব্দ।[২]

আর—তাদের মতে—এর মাধ্যমে আল্লাহর 'কালাম' অস্বীকার করা হয় না, যেমনটা প্রথম দলের আলিমগণ মনে করে থাকেন; বরং আল্লাহর 'কালাম' কুরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত, সামনে যেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

---

১. উসুলুস সারাখসি (১/১৮)।
২. তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ (৮/৫৪১-৫৪২); তাফসিরে নাসাফি (২১৩); তাফসিরে কাবির (৬/৪৯৬-৪৯৭); তাফসিরে বাইজাবি (৩/২২৭)।

আরেকটি সন্দেহের অপনোদন: মৃত্যু কি কোনো অস্তিত্বশীল স্বতন্ত্র (শরীরী/মূর্ত) বস্তু, নাকি অস্তিত্বহীন (অশরীরী/বিমূর্ত) বিষয়? দার্শনিকরা মনে করেন, মৃত্যু অস্তিত্বহীন বিষয়। অর্থাৎ জীবন একটি বিশেষণ। এই জীবনের অনুপস্থিতিই মৃত্যু। আলাদা করে মৃত্যুর স্বতন্ত্র উপস্থিতি নেই। মুতাজিলা ও আহলে সুন্নাতের কোনো কোনো আলিমও উক্ত আকিদা রাখেন। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের মতে, মৃত্যু অস্তিত্বহীন সৃষ্টি নয়; বরং অস্তিত্বধারী সৃষ্টি। এটা জীবনের অনুপস্থিতি নয়; বরং এটা এমন একটি বিশেষণ যা জীবনের বিপরীত। মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ শেষ হয়ে যায় না। বরং এক জীবন থেকে আরেক জীবনে স্থানান্তরিত হয়। মৃত্যু সেই স্থানান্তরের মাধ্যম মাত্র।[১] কুরআন ও হাদিসে এর প্রমাণ রয়েছে। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ

অর্থ: 'যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ।' [মুলক: ২]

বুখারি ও মুসলিমের একটি বিশুদ্ধ হাদিসে বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে একটি ধূসর রঙের মেষের আকৃতিতে আনা হবে। তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসী! তখন তারা মাথা উঁচু করে তাকাবে। ঘোষক বলবে, তোমরা কি একে চেনো? তারা বলবে, হ্যাঁ, এ তো মৃত্যু। কেননা প্রত্যেকেই তাকে দেখেছে। তারপর ঘোষক আবার ঘোষণা করবে, হে জাহান্নামবাসী! জাহান্নামিরা মাথা উঁচু করে তাকাবে। তখন ঘোষক বলবে, তোমরা কি একে চেনো? তারা বলবে, হ্যাঁ, এ তো মৃত্যু। কেননা প্রত্যেকেই তাকে দেখেছে। তারপর (সেটি) জবেহ করা হবে। এরপর ঘোষক বলবে, 'হে জান্নাতবাসী, চিরদিন এখানে থাকো। তোমাদের আর মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামবাসী, চিরস্থায়ীভাবে এখানে থাকো। তোমাদের আর মৃত্যু নেই।' এই হাদিস দ্বারা মৃত্যুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকার বিষয়টি সুস্পষ্ট।[২]

মৃত্যুর স্বতন্ত্র বিষয়টি নিয়ে অবাক হওয়ার কিছু নেই, অবিশ্বাস করার সুযোগ নেই। বিশুদ্ধ হাদিসে পাওয়া গেলে আত্মসমর্পণই একজন প্রকৃত মুমিনের ঈমানের নিদর্শন।

---

১. আল-বাহরুর রায়েক (১/১১৬); ইবনে আবিল ইজ (৭৯); সাইদ ফুদাহ (২১৩)।
২. বুখারি (৪৭৩০); মুসলিম (২৮৪৯)।

অস্বীকার করতে থাকলে অস্বীকারের সীমা নেই। মানুষের বোধ-বুদ্ধির উর্ধ্বের এমন বক্তব্য কেবল মৃত্যুর ক্ষেত্রে নয়, আরও অনেক বিষয়ের ক্ষেত্রেই এসেছে। যেমন: বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, কিয়ামতের দিন আমলকে দাঁড়িপাল্লায় মাপা হবে। অথচ আমল আমাদের কাছে ওজনযোগ্য শরীরী বস্তু নয়। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'দুটি বাক্য এমন, যা মুখে উচ্চারণ অতি সহজ, কিন্তু মিজানের পাল্লায় অনেক ভারী, আর আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়। তা হলো: সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আজিম।'[১] একইভাবে আরেকটি হাদিসে এসেছে, 'তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করো। কারণ কিয়ামতের দিন তা তিলাওয়াতকারীদের জন্য সুপারিশকারীরূপে উপস্থিত হবে। তোমরা দুই আলোকিত সুরা বাকারা ও আলে ইমরান তিলাওয়াত করো। কারণ, এ দুটি কিয়ামতের দিন ছায়া বিস্তারকারী মেঘ কিংবা ডানামেলা পাখির মতো এসে উপস্থিত হবে এবং তাদের তিলাওয়াতকারীদের পক্ষে সাহায্যকারী হবে।'[২] এভাবে প্রত্যেকটা বিষয় কুরআন-সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত। ফলে অস্বীকারের সুযোগ নেই। তা ছাড়া সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্য এগুলো কঠিন কিছুই নয়। তিনি যা ইচ্ছা, শুধু বলেন 'হয়ে যাও', ফলে তা হয়ে যায়।

---

১. বুখারি (৭৫৬৩)।

২. মুসলিম (৮০৪); ইবনে হিব্বান (১১৬)।

مَازَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيماً قَبْلَ خَلْقِهِ، لَمْ يَزْدَدْ بِكَوْنِهِمْ شَيْئاً لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ صِفَتِهِ، وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا، كَذَلِكَ لا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا، لَيْسَ بَعْدَ خَلْقِ الْخَلْقِ اسْتَفَادَ اسْمَ الْخَالِقِ، وَلا بِإِحْدَاثِهِ الْبَرِيَّةَ اسْتَفَادَ اسْمَ الْبَارِئِ.

সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার আগ থেকেই তিনি সকল গুণের অধিকারী। সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর মাঝে এমন কোনো গুণের সংযোজন ঘটেনি, যা আগে ছিল না। তিনি সর্বদাই নিজের গুণাবলি নিয়ে ছিলেন, সর্বদাই তেমন থাকবেন। তাই সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার পর থেকে তাঁর নাম 'খালিক' হয়নি, জগৎকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনায় তাঁর নাম 'বারী' হয়নি।

ব্যাখ্যা

আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি দুটোই 'কাদিম': অর্থাৎ আল্লাহর সত্তার যেমন কোনো শুরু ও শেষ নেই, তেমনইভাবে তাঁর গুণাবলিরও শুরু নেই, শেষও নেই; হ্রাস-বৃদ্ধি নেই, পরিবর্তন-পরিবর্ধন নেই। এমন কোনো সময় ছিল না, যখন আল্লাহর কোনো গুণ অবিদ্যমান ছিল, পরে তা অস্তিত্বে এসেছে। বরং তাঁর গুণ তাঁর সত্তার মতোই সর্বদাই ছিল, সর্বদাই থাকবে। যখন সৃষ্টির কিছুই ছিল না, তখনও আল্লাহ তায়ালা তাঁর সকল গুণ-সহ বিদ্যমান ছিলেন। সৃষ্টির মতো তাঁর কোনো গুণ নতুন করে তৈরি হয় না। কারণ, তাঁর গুণগুলো তাঁর পূর্ণতা (কামাল)। ফলে নতুন কোনো গুণ অস্তিত্বে এলে এর অর্থ দাঁড়াবে, পূর্ণতার আগে তিনি অপূর্ণ ছিলেন যা অসম্ভব।[১]এখানে আল্লাহর নামের ক্ষেত্রে 'খালিক' এবং 'বারী' দুটো নাম ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম আবু মানসুর আল-মাতুরিদি মনে করেন, এই দুটো সমার্থক শব্দ।[২]

এটুকু পর্যন্ত সকল আলিম একমত পোষণ করেন। অর্থাৎ আল্লাহর সিফাতগুলোও তাঁর মতো শুরু থেকেই রয়েছে। কিন্তু এর পরে তারা দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে যান। এক

---

১. গজনবি (৫৮); ইবনে আবিল ইজ (৭১); সালেহ ফাওজান (৩৪)।
২. তুর্কিস্তানি (৭০)।

ধারা মনে করেন, আল্লাহ তায়ালা ক্রিয়ামূলক বিশেষণগুলো প্রকারের দিক থেকে 'কাদিম' (অনাদি) হলেও প্রকাশের দিক থেকে 'হাদেস (তথা নতুন)! অপরদিকে দ্বিতীয় ধারার আলিমগণ মনে করেন, আল্লাহর সব ধরনের বিশেষণই তাঁর সত্তার মতো অনাদি এবং অনন্ত। কোনো ধরনের বিশেষণ এমন নয়, যা আগে ছিল না, পরে তৈরি হয়েছে। তারা মনে করেন, এই জায়গায় প্রথম ধারা বিচ্যুতির শিকার হয়েছে। ইমাম তহাবি-বর্ণিত আহলে সুন্নাতের আকিদা থেকে সরে গেছে। কিন্তু প্রথম পক্ষের যুক্তি, কোনো ফে'ল তথা ক্রিয়া নতুন (হাদেস) হওয়ার দ্বারা ফায়েল তথা আল্লাহর হাদেস হওয়া আবশ্যক নয়। এ কারণে তারা আল্লাহর ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম (আফআল) যেমন 'মাজি' (আসা), 'নুজুল' (অবতরণ করা), 'জাহিক' (হাসা), 'গাজাব' (ক্রুদ্ধ হওয়া) ইত্যাদির বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে থাকেন। তাদের বক্তব্য, এসব গুণ আল্লাহর মাঝে সর্বদাই বিদ্যমান ছিল, পরে যুক্ত হয়নি। হ্যাঁ, বান্দাদের কাজের ভিত্তিতে কিংবা অন্যান্য কারণে সেগুলো বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ পেয়ে থাকে

(تحدث في وقت دون وقت/ أما أفعاله سبحانه فهي قديمة النوع وحادثة الآحاد) [১]

কিন্তু দ্বিতীয় ধারার আলিমগণ আল্লাহ তায়ালার সকল গুণকে তাঁর সত্তার মতো 'কাদিম' মনে করেন। অর্থাৎ আল্লাহর সকল গুণ চিরন্তন। আগে ছিল না, পরে হয়েছে—এমন সম্ভব নয়। ফলে আগমন, অবতরণ, হাসা, ক্রুদ্ধ হওয়া ইত্যাদি গুণের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে সেগুলো আল্লাহর সত্তার মতো চিরন্তন হয় না; বরং নবসৃষ্ট (হাদেস) হয়। অথচ আল্লাহর জাত ও সিফাত সব ধরনের হাদেস থেকে পবিত্র। কারণ, আল্লাহর গুণাবলিতে কোনো নবসৃষ্ট ক্রিয়া যুক্ত হলে সেটা তাঁর সত্তাকে (যুক্ত হওয়ার আগে) অসম্পূর্ণ প্রমাণ করে। একইভাবে সেই গুণটি কিছুক্ষণ পরে আল্লাহর কাছ থেকে চলে যাওয়াও তাঁর অসম্পূর্ণতাকে নির্দেশ করে। অথচ আল্লাহ সব ধরনের অসম্পূর্ণতা থেকে পবিত্র। তাদের মতে, একইভাবে 'উলূ' (আল্লাহর উর্ধ্বত্বের) কথাও প্রযোজ্য। কারণ, তারা যেভাবে উলূকে বাহ্যিক অর্থ ধরে ব্যাখ্যা করেন, তাতে বোঝা যায়, সেটাও সৃষ্টির কারণে 'হাদেস' হয়েছে। কারণ, আল্লাহ সকল দিক থেকে পবিত্র। সুতরাং সৃষ্টি যদি না থাকে, তবে তিনি কোনো দিকে ছিলেন না। এর পর যেন সৃষ্টিকে

১ ইবনে আবিল ইজ (৮০); শরহুল আকিদাহ আল-ওয়াসিতিয়্যাহ, ইবনে উসাইমিন (১/৭৯-৮০); সালেহ ফাওজান (৩৪)।

তাঁর নিচে তৈরি করার মাধ্যমে তিনি 'উলূ'-তে অবস্থান নিয়েছেন। তা হলে 'উলূ' সিফাতটিও আল্লাহ সৃষ্টির মাধ্যমে অর্জন করেছেন। অথচ এটা অসম্ভব। ফলে তাদের মতে, প্রথম ধারা 'উলূ'-কে যে অর্থে বোঝেন, ইমাম তহাবির বক্তব্য সেটার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। একইভাবে আরশের উপর আল্লাহর 'ইস্তিওয়া'ও প্রথম দলের কাছে 'কামাল' তথা পরিপূর্ণতা। আর এই পরিপূর্ণতা আল্লাহর অর্জিত হয়েছে সৃষ্টি (আরশের) মাধ্যমে। প্রথম আকাশে আল্লাহর নুজুল (অবতরণ) পরিপূর্ণতা। তাহলে তো বোঝা যায়, এই পরিপূর্ণতা অর্জিত হয়েছে আকাশ সৃষ্টির মাধ্যমে। এভাবে তাদের কথা দ্বারা বোঝা যায়, প্রত্যেকটা সিফাতের কামাল অর্জিত হয়েছে সৃষ্টির মাধ্যমে। অথচ—দ্বিতীয় ধারা মনে করেন—ইমাম তহাবি সুস্পষ্টভাবে এমন বক্তব্য নাকচ করে দিয়েছেন। তা ছাড়া এই দলের আলিমদের মতে, 'উলূ' এবং 'ইস্তিওয়া'র বাহ্যিক অর্থ সাব্যস্ত করলে আল্লাহ তায়ালার জন্য 'মাকান' নামে আরেকটি সিফাত নতুন করে তৈরি হওয়া লাগে। কারণ, আরশ ও সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার আগে আল্লাহ তায়ালা ছিলেন। তিনি তখন ছিলেন জায়গাহীন (بلا مكان), এখন আরশ ও সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার পরে যদি তাকে বলা হয় তিনি আরশের উপর, তাহলে আল্লাহর যেই সিফাত আগে ছিল না (অর্থাৎ মাকান তথা স্থান), সেটা তার জন্য সাব্যস্ত করা জরুরি হয়ে যায়। অথচ আহলে সুন্নাতের মতে আল্লাহর জন্য নতুন কোনো সিফাত সাব্যস্ত করা যাবে না।[১] তাই—দ্বিতীয় ধারার মতে—এসব শব্দের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা যাবে না; বরং এমন অর্থ গ্রহণ করতে হবে, যা আল্লাহর শানের উপযোগী। এটা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করা নয়; বরং আয়াতের জন্য উপযুক্ত অর্থ গ্রহণ করা[২]। একইভাবে এসব উলামায়ে কেরাম মনে করেন, সিফাতের প্রকারভেদের নামে আল্লাহর সিফাতের বিভিন্ন নাম আবিষ্কার (যেমন সিফাতে তারিআহ ইত্যাদি) কুরআন-সুন্নাহে আসেনি। ফলে এটা কুরআন-সুন্নাহর উপর অনধিকারচর্চা।[৩]

উভয় ধারার বক্তব্য উল্লেখ করার পরে যদি প্রশ্ন করা হয়, আসলে উভয় ধারার কোন ধারা ইমাম তহাবির আকিদার সঠিক প্রতিনিধিত্ব করে? সংক্ষেপে সিদ্ধান্ত দেওয়া কঠিন। কারণ, উভয় ধারাই ইমাম তহাবির বক্তব্যকে নিজেদের বলে বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন; বরং দ্বিতীয় ধারার আলিমগণ নিজেরা এ ব্যাপারে

---

১. বিস্তারিত দেখুন: সাইদ ফুদাহ (২৬১-২৬২, ২৬৮)।
২. সাইদ ফুদাহ (২২৬); হারারি (৩৮); উমর কামেল (৩৮-৩৯)।
৩. সাইদ ফুদাহ (২২৯-২৩০)।

বিভক্ত।[১] ফলে তারা যে ভিত্তিতে প্রথম ধারার আলিমদের বক্তব্য নাকচ করে দিচ্ছেন, সেটা তর্কসাপেক্ষ। কারণ, প্রথম ধারার আলিমগণও বিশ্বাস করেন, আল্লাহর কোনো সিফাত পরবর্তীকালে প্রকাশ পায়নি; বরং তিনি তাঁর সকল সিফাত-সহ শুরু থেকেই রয়েছেন। পরবর্তীকালে যেটা প্রকাশ পেয়েছে, সেটা হলো সৃষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে যাকে তারা (حدوث/تجدد) দ্বারা ব্যাখ্যা করেন। এখানেই জটিলতা। তারা এই শব্দগুলো ব্যবহার না করলে মূল বিষয়ে দুই দলের মাঝে বিরোধ নেই। তবে বিষয়টি এত সহজও নয়। কারণ, দ্বিতীয় ধারার আলিমগণ এটার বিরোধিতা করেন যাতে (صفات ذاتية خبرية) হিসেবে পরিচিত সিফাতগুলোর জাহেরি অর্থ গ্রহণ না করতে হয়।[২] তারা যেভাবে সকল সিফাতকে 'কুদরত'-এর উপর নির্ভরশীল ধরেন, সে হিসেবে সেগুলোও 'হাদেস'-এর আওতায় পড়ে।[৩]

এসব আলোচনা সাধারণ পাঠকের জন্য নিষ্প্রয়োজন এবং সহজে বোধগম্যও নয়। ফলে যতটুকু বলা হলো, ততটুকুতেই ক্ষান্তি দেওয়া সঠিক মনে করছি। যেটুকু স্বস্তিজনক সেটা হলো, শাখাগত তাফরিআতের ক্ষেত্রে মতভেদ থাকলেও, আল্লাহ তায়ালার কোনো সিফাত আগে ছিল না পরে হয়েছে—এটা অসম্ভব এবং এ ব্যাপারে সবাই একমত। ইস্তিওয়া ও নুজুল-সহ আল্লাহর সিফাত-সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

আরেকটি প্রশ্ন ও উত্তর: এখানে কিছু কিছু ব্যাখ্যাগ্রন্থে একটি মাসআলা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তাই সে সম্পর্কে কিছু বলা মুনাসিব মনে করছি। বিষয়টি হলো: 'আল্লাহর সিফাত কি তাঁর সত্তা, নাকি সত্তার উপর অতিরিক্ত কিছু গুণ?' অন্যকথায় 'আল্লাহর সিফাত কি আল্লাহ, নাকি আল্লাহ থেকে ভিন্ন?' আহলে সুন্নাতের উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে এক কথায় সিদ্ধান্ত দেন না। আল্লাহর কোনো সিফাতের ক্ষেত্রে বলেন না, 'এটাই আল্লাহ', আবার 'এটাই আল্লাহ নন', সেটাও বলেন না। কারণ, সত্তা ও বিশেষণ (জাত ও সিফাত) আলাদা। তবে সিফাত জাতের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত, যাকে আলাদা করা যায় না। ফলে কেউ যদি বলে أعوذ بالله সেটা যেমন আল্লাহর কাছে আশ্রয় নেওয়া হবে, একইভাবে কেউ যদি বলে أعوذ بعزة الله তখনও আল্লাহর কাছেই আশ্রয় নেওয়া উদ্দেশ্য হবে। ফলে সিফাতকে আল্লাহ থেকে যেমন বিচ্ছিন্ন

১. গুনাইমি (৫৭); তুর্কিস্তানি টীকা (৬৯); ইজহারুল আকিদাহ আস সুন্নিয়্যাহ, আবদুল্লাহ হারারি (৩১); গজনবি (৬১)।
২. সাইদ ফুদাহ (২৩৪)।
৩. গুনাইমি (৫৭)।

করা সঠিক নয়, আবার এগুলোই আল্লাহ—এমনও নয়।[1] গজনবি বলেন, 'আল্লাহর সিফাতকে 'গাইরুল্লাহ' (আল্লাহ নন) বলা জায়েজ নেই। কারণ, 'গাইরিয়্যাত' বোঝা যায় যখন একটা না রেখেও অন্যটা থাকে। অথচ আল্লাহর জাত ও সিফাতের মাঝ থেকে কোনোটা শেষ হয়ে যাওয়া অসম্ভব। তাই সিফাতকে গাইরুল্লাহ মনে করাও বৈধ নয়। তুর্কিস্তানি বলেন, আবার সিফাতকে 'আল্লাহ'ও মনে করা যাবে না। কারণ তাতে তাঁর 'জাত'-কে নিষ্প্রয়োজন করে ফেলা হয়। তাই আল্লাহর জাত ও সিফাত দুটোতেই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন তিনি।[2]

---

১. দেখুন: ইবনে আবিল ইজ (৮১-৮২)।
২. দেখুন: তুর্কিস্তানি (৭১)।

لَهُ مَعْنَى الرُّبُوبِيَّةِ وَلا مَرْبُوبَ، وَمَعْنَى الـخَالِقِ وَلا مَخْلُوقَ، وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الـمَوْتَى بَعْدَمَا أَحْيَا، اسْتَحَقَّ هَذَا الاسْمَ قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ ، كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ اسْمَ الـخَالِقِ قَبْلَ إِنْشَائِهِمْ، ذَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ، وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيرٌ، لاَ يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}

প্রতিপালিত (সৃষ্টি) ছাড়াই তিনি প্রতিপালক, সৃষ্টিজগৎ ছাড়াই তিনি সৃষ্টিকর্তা। তিনি মৃতকে জীবনদানকারী, জীবনদানের আগেই তিনি এই নামের অধিকারী ছিলেন। তদ্রূপ সৃষ্টি করার আগেই তিনি সৃষ্টিকর্তা নামের অধিকারী ছিলেন। কারণ তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাশালী। সবকিছু তাঁর মুখাপেক্ষী। সব বিষয় তাঁর জন্য সহজ। তাঁর কিছু প্রয়োজন নেই। 'তাঁর মতো কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন এবং সবকিছু দেখেন'।

ব্যাখ্যা

আল্লাহ শাশ্বত সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও পুনরুত্থানকারী: আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি এবং পালনের গুণ অন্যান্য গুণের মতোই সৃষ্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। সৃষ্টির অস্তিত্বে আসার মাধ্যমে এই গুণ অস্তিত্বে এসেছে এমন নয়। বরং তিনি সর্বদাই এ গুণের অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা এখন গোটা সৃষ্টির প্রতিপালক। কিন্তু যখন প্রতিপালনের মতো কোনো সৃষ্টি ছিল না, তখনও তিনি ছিলেন এবং তাঁর প্রতিপালন গুণ ছিল। একইভাবে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টির মাঝে 'সৃষ্টিকর্তা' নাম হয়েছে তাঁর। কিন্তু সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি এই নামের অধিকারী হয়েছেন, কিংবা সৃষ্টিজগৎ তাঁকে এই নাম এনে দিয়েছে এমন নয়। বরং কোনোকিছু সৃষ্টির আগেই তিনি 'সৃষ্টিকর্তা' নামের অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ.

অর্থ: 'তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। অতএব, তোমরা তাঁরই ইবাদত করো। তিনি প্রত্যেক বস্তুর কার্যনির্বাহী।' [আনআম: ১০২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ অর্থাৎ 'আল্লাহ ছিলেন, তিনি ছাড়া আর কেউ ছিল না। তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে।'[১] ফলে আরশও আল্লাহ তায়ালার মাখলুক। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর স্রষ্টা। যখন কিছু ছিল না, তখনও তিনি ছিলেন এবং খালেক গুণের অধিকারী ছিলেন। একইভাবে আল্লাহ তায়ালা মৃতকে জীবিতকারী। কিন্তু এটার জন্য কাউকে জীবিত করে এই নাম পেতে হয়েছে এমন নয়। বরং কাউকে জীবিত করার আগেই তিনি এই নামের অধিকারী। এসবের কারণ তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও রিজিকদাতা। তিনি সর্বশক্তিমান। ফলে এগুলোর মতোই তাঁর কোনো গুণ সৃষ্টির বিদ্যমান থাকার উপর নির্ভরশীল নয়, কিংবা সৃষ্টি অস্তিত্বে আসার পরে তাঁর কোনো গুণ অস্তিত্বে আসেনি; বরং তিনি শুরু থেকেই সকল গুণের অধিকারী।

আল্লাহ সর্বশক্তিমান: সবকিছুর উপর ক্ষমতাশালী। এটাও আল্লাহ তায়ালার চিরন্তন গুণ। সৃষ্টিজগৎকে সৃষ্টি করার পরে তাঁর মাঝে এই গুণ এসেছে এবং তাঁর ক্ষমতা ও শক্তি প্রকাশ পেয়েছে—এমন নয়। বরং গোটা সৃষ্টির উপর ক্ষমতার গুণ তাঁর মাঝে সর্বদাই ছিল।[২] পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে বিষয়টির তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

অর্থ: 'বিজলির আলোতে যখন সামান্য আলোকিত হয়, তখন তারা কিছুটা পথ চলে। আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তা হলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ের উপর সর্বময় ক্ষমতাশীল।' [বাকারাহ: ২০] আল্লাহ বলেন,

---

১. বুখারি (৩১৯০, ৩১৯১); ইবনে হিব্বান (৬১৪০); মুসনাদে আহমদ (২০১৩৬); আরশ সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

২. সালেহ ফাওজান (৩৬)।

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

অর্থ: 'যা-কিছু আকাশসমূহে রয়েছে এবং যা-কিছু জমিনে আছে, সব আল্লাহরই। যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ করো কিংবা গোপন করো, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।' [বাকারা: ২৮৪] আরেক জায়গায় বলেন,

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۖ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থ: 'বলুন, হে আল্লাহ, আপনিই সকল রাজ্যের অধিকারী। আপনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করেন, যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নেন এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করেন, যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত করেন। আপনারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।' [আলে ইমরান: ২৬] অন্যত্র বলেন,

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۗ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থ: 'আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে তিনি যদি তোমার মঙ্গল করেন, তবে তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।' [আনআম: ১৭]

খলিফা হারুনুর রশিদের যুগে একজন ভারতীয় প্রশ্ন তুলল, আল্লাহ তায়ালা যদি সর্বশক্তিমান হন, তবে কি তিনি নিজের মতো কাউকে সৃষ্টি করতে পারেন? এক তরুণ জবাব দিলেন, প্রশ্নটিই ঠিক নয়। প্রথমত: কারণ আল্লাহ যাকে সৃষ্টি করবেন, সে হবে সৃষ্টি। আর সৃষ্টি কোনো দিন স্রষ্টার সমকক্ষ হতে পারে না। দ্বিতীয়ত: এটা সামর্থ্যের প্রশ্নই নয়। 'আল্লাহ কি আল্লাহর মতো কাউকে সৃষ্টি করতে পারেন?'—কথাটি অনেকটা এমন, যেমন কোনো সক্ষম ও জ্ঞানীকে বলা হলো: সে কি অক্ষম ও মূর্খ হতে পারবে?[১]

---

১. ফাতহুল বারি, ইবনে হাজার (১৩/২৭৪)।

সবকিছু আল্লাহর মুখাপেক্ষী: নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় বস্তু, মানুষ, জিন ও ফেরেশতা, জন্তু-জানোয়ার, বৃক্ষ-লতা-পাতা, নদী ও সমুদ্র, নির্জীব পাথর ও পদার্থ—সৃষ্টির সবকিছু আল্লাহর মুখাপেক্ষী। কোনোকিছু তাঁর মুখাপেক্ষিতার উর্ধ্বে নয়। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে লক্ষ করে বলেছেন,

يَآيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ.

অর্থ: 'হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ তিনি অভাবমুক্ত প্রশংসিত।' [ফাতির: ১৫] তিনি আরও বলেন,

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا.

অর্থ: 'আর যা-কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও জমিনে, সবই আল্লাহর। আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের অধিকারীদের এবং তোমাদের—তোমরা সবাই আল্লাহকে ভয় করো। যদি তোমরা তা না মানো, তবে জেনে রাখো, সে সবকিছুই আল্লাহ তায়ালার, যা-কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও জমিনে। আর আল্লাহ হচ্ছেন অমুখাপেক্ষী, সকল প্রশংসার অধিকারী।' [নিসা: ১৩১]

সবকিছু আল্লাহর জন্য সহজ: কারণ তিনি সৃষ্টিকর্তা ও সবকিছুর মালিক, সকল ক্ষমতার অধিকারী। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

অর্থ: 'তিনি যখন কোনোকিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, 'হও', তখনই তা হয়ে যায়।' [ইয়াসিন: ৮২]

ফলে সৃষ্টি করা, প্রতিপালন করা, রিজিক দেওয়া, মৃত্যু দেওয়া, পুনরায় জীবিত করা, সবকিছু আল্লাহর জন্য সহজ। তিনি বলেন,

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ

অর্থ: 'তোমাদের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান তো কেবল একটিমাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের মতোই।' [লুকমান: ২৮]

আল্লাহর কিছু প্রয়োজন নেই: কারণ তিনি পরিপূর্ণ সত্তা। আর প্রয়োজন হয় তাদেরই, যাদের ভিতরে অপূর্ণতা রয়েছে। ফলে আল্লাহ সকল প্রয়োজনের উর্ধ্বে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِينَ.

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ গোটা জগৎবাসী থেকে অমুখাপেক্ষী।' [আলে ইমরান: ৯৭]

ফলে আল্লাহকে মানুষের মতো কল্পনা করে আল্লাহর জন্য দেহ ও শরীর সাব্যস্ত করা, তাঁর আরশে **বসার** কথা বলা ভয়ংকর ব্যাপার, যা কোনো কোনো সম্প্রদায় 'সিফাত' সাব্যস্তের নামে করে থাকে। অথচ সিফাত সাব্যস্ত করার সঙ্গে দেহবাদিতার কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের জন্য সিফাত সাব্যস্ত করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর জন্য সিফাত সাব্যস্ত করেছেন, কিন্তু কেউ দেহ সাব্যস্ত করেননি। ফলে সিফাত সাব্যস্ত করার নামে আল্লাহকে মানুষের মতো ভেবে তাঁর জন্য দেহ কিংবা মানুষের মতো যেকোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করা গোমরাহি। কারণ, আল্লাহর কিছুর প্রয়োজন নেই। মানুষের কথা বলতে, চলতে, শুনতে, ধরতে, দেখতে ও ভাবতে যা দরকার হয়, আল্লাহর এমন কিছুরই প্রয়োজন নেই।[১] সামনে এ নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা আসবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

অর্থ: 'অতএব, তোমরা আল্লাহর কোনো সদৃশ সাব্যস্ত করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।' [নাহল: ৭৪]

---

১. তাফসিরে ইবনে কাসির (৩/৩৮৩)।

خَلَقَ الـخَلْقَ بِعِلْمِهِ، وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا، وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالاً، وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ.

তিনি নিজ পূর্ণজ্ঞানে সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। সবার জন্য সবকিছু সুষ্ঠুরূপে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সবার জীবনকাল সুনির্দিষ্ট করেছেন। সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টি করার আগে তাদের কোনোকিছুই তাঁর কাছে গোপন ছিল না। সৃষ্টির আগেই তিনি জানতেন তারা কী করবে। তিনি তাদের তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর অবাধ্য হতে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা

তাকদির (সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের লিখন)

আল্লাহ নিজ পূর্ণজ্ঞানে সবাইকে সৃষ্টি করেছেন: কারণ যিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনিই সৃষ্টি সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানবেন—এটাই স্বাভাবিক। এমনকি সৃষ্টিজগতেও মানুষের বানানো একটা যান কিংবা যন্ত্র সম্পর্কে সেটার উদ্ভাবকেরই সবচেয়ে বেশি ধারণা থাকে। কারণ, সে-ই চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা করে এটাকে বাস্তব রূপ দান করেছে। কারও যদি কোনো জিনিস সম্পর্কে জ্ঞানই না থাকে, তবে সে ওই বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহর ক্ষেত্রে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট। তিনি সবকিছু জানেন, সবার খবর রাখেন। তিনি যখন সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, পূর্ণাঙ্গরূপে জেনেই সৃষ্টি করেছেন। আকহাসারি লিখেছেন, 'জানা ব্যতীত কোনো জিনিস সৃষ্টি করা যায় না। কারণ, সৃষ্টি করতে হলে প্রথমে সৃষ্টির ইচ্ছা ও পরিকল্পনা করতে হয়। আর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা করতে হলে জানতে হয়, বুঝতে হয়। গোটা জগৎ সেই জানা ও পরিকল্পনা সহকারেই সৃষ্টি করা হয়েছে।'[১]

---

১. আকহাসারি (৯৯); ইবনে আবিল ইজ (৯৯)।

ইমাম তহাবির উক্ত বক্তব্য দার্শনিকদের বক্তব্যের খণ্ডন, যারা মনে করেন, আল্লাহ তায়ালা ছোট-ছোট বিষয়ের জ্ঞান রাখেন না! অথচ এটা কুফরি ধারণা।[১] আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

অর্থ: 'যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কী করে জানবেন না? বরং তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক অবগত।' [মুলক: ১৪] অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

অর্থ: 'তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে গাছের পাতা ঝরে না। কোনো শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোনো আর্দ্র ও শুষ্ক (জীবিত ও মৃত) দ্রব্য নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে (লাওহে মাহফুজে) লিখিত নেই। তিনিই রাত্রিবেলা তোমাদের করায়ত্ত করে নেন এবং যা-কিছু তোমরা দিনের বেলায় করো, তা জানেন।' [আনআম: ৫৯-৬০] অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

অর্থ: 'আর পৃথিবীতে যত বিচরণশীল প্রাণী রয়েছে, সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন। তিনি জানেন, তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমর্পিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে। [হুদ: ৬] অন্যত্র ইরশাদ করেন,

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ.

অর্থ: 'কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র তাঁরই জানা। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোনো ফল আবরণমুক্ত হয় না এবং কোনো নারী গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করে না।' [ফুসসিলাত: ৪৭] অতীতের সবকিছু জানার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

---

১. হারারি (৪০)।

فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَآئِبِيْنَ

অর্থ: 'অতএব, আমি অবশ্যই তাদের জিজ্ঞেস করব, যাদের কাছে রাসুল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব রাসুলগণকে। আমি স্বজ্ঞানে তাদের কাছে (তাদের) সকল অবস্থা বর্ণনা করব। কারণ, আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না।' [আরাফ: ৬-৭] কুরআনের প্রসিদ্ধ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সকল ভবিষ্যৎ জানার ব্যাপারে বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌۢ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

অর্থ: 'নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জানেন গর্ভাশয়ে যা থাকে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন মাটিতে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।' [লুকমান: ৩৪]

তা হলে দেখা যাচ্ছে—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পৃথিবীর কোনোকিছুই আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে নয়।

আল্লাহ সবকিছু সুষ্ঠুভাবে নির্ধারণ করেছেন: কারণ পৃথিবীর সবকিছুতে যে বিরল শৃঙ্খলা চোখে পড়ে, তা একজন মহাশক্তিশালী জ্ঞানী সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা ছাড়া অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়। একটা ছোট অণু-পরমাণু হতে শুরু করে বিশাল গ্রহ-নক্ষত্র, ছায়াপথ-সৌরজগৎ, ক্ষুদ্র পিপীলিকা থেকে শুরু করে হাতি ও তিমি, সকল জীব-জগতে বিদ্যমান শৃঙ্খলা আল্লাহর তৈরি। এমনকি মানুষের শরীরের সৌন্দর্য, কোন অঙ্গ কোথায় থাকবে, কয়টা থাকবে, মানুষের বোধ ও বিবেক কতটুকু থাকবে, কবে থেকে শুরু হবে, কতদিন থাকবে—সবকিছু আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই সুষ্ঠু নির্ধারণ ও বন্টনের ফলে পৃথিবী স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলেছে। মানুষ পৃথিবীতে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ ۗ وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ

অর্থ: 'আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা অবতরণ করি।' [হিজর: ২১] আল্লাহ আরও বলেন,

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۗ وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ

অর্থ: 'আল্লাহ জানেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা সংকুচিত ও বর্ধিত হয়। এবং তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ রয়েছে।' [রাদ: ৮] অন্য আয়াতে বলেন,

الَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ یَكُنْ لَّهٗ شَرِیْكٌ فِی الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِیْرًا

অর্থ: 'তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে শোধিত করেছেন পরিমিতভাবে।' [ফুরকান: ২] আল্লাহ বলেন,

اِنَّا كُلَّ شَیْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ

অর্থ: 'আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি।' [কমার : ৪৯] অন্যত্র বলেন,

وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا

অর্থ: 'আল্লাহর আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত।' [আহজাব: ৩৮] আরেকটি আয়াতে আল্লাহ সৃষ্টি ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে বলেন,

الَّذِیْ خَلَقَ فَسَوّٰی ۪ۙ وَ الَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰی ۪ۙ

অর্থ: 'যিনি সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন, এবং যিনি সুপরিমিত করেছেন ও পথ প্রদর্শন করেছেন।' [আ'লা: ২-৩]

সহিহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাজি.-এর হাদিসে এসেছে: 'আল্লাহ তায়ালা আকাশসমূহ ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সকল সৃষ্টির তাকদির লিখেছেন।'[১] জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তাকদিরের ভালো-মন্দের উপর ঈমান আনে। যতক্ষণ না সে এই বিশ্বাস রাখে যে, সে যা পেয়েছে তা কখনও হারানোর ছিল না, আর যা সে হারিয়েছে, তা কখনও পাওয়ারই ছিল না।'[২]

সবার জীবৎকাল সুনির্দিষ্ট করেছেন: কারণ আল্লাহ ছাড়া সবাই মরণশীল। পবিত্র কুরআনে তিনি ঘোষণা করেছেন,

---

১. মুসলিম (২৬৫৩)।
২. তিরমিজি (২১৪৪)।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ . وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ .

অর্থ: 'ভূপৃষ্ঠের উপর বিদ্যমান সকল প্রাণী ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তাই অবশিষ্ট থাকবেন।' [আর-রাহমান: ২৬-২৭] আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন,

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ

অর্থ: 'আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল।' [কাসাস: ৮৮]

আল্লাহ সবার জীবনক্ষণ সুনির্ধারিত করে দিয়েছেন। ফলে যখন মৃত্যুর সময় এসে যায়, এক মহূর্তও অগ্রে-পশ্চাতে হয় না। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ

অর্থ: 'প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি মেয়াদ রয়েছে। যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছনে যেতে পারবে, আর না এগিয়ে আসতে পারবে।' [আরাফ: ৩৪] আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ.

অর্থ: 'যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের অন্যায় কাজের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে চলমান কোনোকিছুকেই ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুত সময় পর্যন্ত তাদের অবকাশ দেন। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের মৃত্যু এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তও বিলম্বিত কিংবা তরান্বিত করতে পারবে না।' [নাহল: ৬১]

আল্লাহ আরেক জায়গায় বলেন,

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا

অর্থ: 'আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মৃত্যুবরণ করে না। সবার মৃত্যুর জন্য রয়েছে একটা নির্ধারিত সময়।' [আলে ইমরান: ১৪৫]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজি. থেকে বর্ণিত, নবিজির স্ত্রী উম্মে হাবিবা রাজি. দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি আমার স্বামী রাসুলুল্লাহ, আমার পিতা আবু সুফিয়ান ও আমার ভাই মুয়াবিয়ার দীর্ঘ হায়াত দান করুন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: তুমি তো আল্লাহর কাছে নির্ধারিত বয়স, সীমাবদ্ধ সময় এবং বন্টিত জীবিকার প্রার্থনা করলে, যার কিছুই তিনি তার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কিংবা নির্ধারিত সময়ের পরে করবেন না। যদি তুমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে যেন তিনি তোমাকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে এবং কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি দান করেন, তা হলে তা তোমার জন্য খুবই কল্যাণকর ও উত্তম হতো।'[১]

এসব আয়াত ও হাদিস দ্বারা বোঝা গেল, পৃথিবীর সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। এমনকি কোন ব্যক্তি কীভাবে মারা যাবে, জলে নাকি ডাঙায় মারা যাবে, বিছানায় নাকি ময়দানে মারা যাবে, বাড়িতে নাকি বিদেশে মারা যাবে, স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবে নাকি পুড়ে বা পড়ে মরবে, আল্লাহ সবকিছু লিখে রেখেছেন।

একটি সন্দেহের অপনোদন: উপরে বর্ণিত কথাগুলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা। অপরদিকে তাকদির অস্বীকারকারী মুতাজিলাদের বিশ্বাস হলো, যদি কোনো ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, তবে সে মৃত্যু আসার আগেই চলে যায়। যদি এভাবে নিহত না হতো, তবে তাঁর জীবনকাল পুরা করে মরত! এর ভিত্তিতে নিহত ব্যক্তির জন্য তারা দুটি জীবনকাল নির্ধারণ করে। একটি নিহত হওয়া পর্যন্ত, অন্যটি (তাদের ধারণায়) যখন স্বাভাবিক মৃত্যু লেখা ছিল![২] কিন্তু এটা সম্পূর্ণ বাতিল ও ভিত্তিহীন কথা। এটা সর্বজ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ তায়ালার ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। এটা প্রযোজ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে, যারা ভবিষ্যৎ-জ্ঞান রাখে না। অথবা এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যে জানে না ভবিষ্যতে কী হবে। ফলে দুটি মৃত্যুর সময় লিখে রাখে। কারণ নিহত ব্যক্তি সময়ের আগেই মৃত্যুবরণ করেছে বলার অর্থ হলো, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য এমন জীবন নির্ধারণ করে রেখেছেন, যে পর্যন্ত সে বাঁচলই না, অন্য একজন আল্লাহর নির্ধারিত সেই সময় আসার আগেই মৃত্যু দিয়ে দিলো। এভাবে তারা পৃথিবীতে স্রষ্টা ও সৃষ্টি দুজন খোদা নির্ধারণ করে। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকদির অস্বীকারকারীদের এ উম্মতের 'অগ্নিপূজক' বলেছেন।[৩]

তাকদির বদলায় কি? একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা মানুষের জীবন বৃদ্ধি করে।'[৪] যদি মানুষের জন্ম ও

---

১. মুসলিম (২৬৬৩)।
২. আকহ্যাসারি (১২৮); হারারি (৪৩)।
৩. আবু দাউদ (৪৬৯১); মুসতাদরাকে হাকেম (২৮৫)।
৪. আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি (৯৪৩); মুসনাদে আবু ইয়ালা (৪১০৪)।

মৃত্যু সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে সূক্ষ্মভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে, তবে আত্মীয়তার সম্পর্ক মানুষের জীবন কীভাবে বৃদ্ধি করবে? উলামায়ে কেরাম বিভিন্নভাবে উত্তর দিয়েছেন। সবচেয়ে উত্তম উত্তর হলো: আত্মীয়তার সম্পর্ক মানুষের জীবন বৃদ্ধির কারণ; স্বতন্ত্রভাবে এটা জীবন বৃদ্ধি করে এমন নয়। কারণ, জীবন বৃদ্ধির মালিক আল্লাহ তায়ালা। ফলে তিনি প্রত্যেকের তাকদিরে লিখেই দিয়েছেন কে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে জীবন বৃদ্ধি করবে এবং কতটুকু করবে আর কে করবে না। ফলে আর আপত্তির সুযোগ নেই।[১] এভাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি হাদিস বুঝতে হবে, যেখানে তিনি বলেছেন, 'কেবল দোয়াই তাকদিরকে ফেরাতে পারে। সৎকর্ম হায়াত বৃদ্ধি করে। গুনাহ রিজিক হ্রাস করে ফেলে।'[২] যেহেতু কে দোয়া করবে এবং কী দুআ করবে, কে সৎকর্ম করবে কে করবে না, কে গুনাহ করবে, কী গুনাহ করবে এবং কখন করবে, সবকিছু আল্লাহ তায়ালা জানেন, ফলে তিনি সেভাবেই তার জন্ম-মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছেন। আরও একটি হাদিস আছে, যেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি তার রিজিক বৃদ্ধি করতে চায় এবং মৃত্যু পেছাতে চায়, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।'[৩] আরেকটি হাদিসে বলেছেন, 'সদকা অপমৃত্যুকে দূর করে।'[৪] সবগুলো ক্ষেত্রে উপরের মূলনীতি প্রযোজ্য হবে।

একটি প্রশ্ন ও উত্তর: প্রশ্ন হলো, একটু আগে উম্মে হাবিবা রাজি. যখন তাঁর জীবনসঙ্গী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বাবা ও ভাইয়ের দীর্ঘ জীবনের জন্য দোয়া চেয়েছেন, তখন তিনি তাঁকে বলেছেন, এসব নির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয় বিষয়। এখন আবার বলছেন, দোয়া তাকদিরকে ফেরাতে পারে। দুটোর মাঝে সমতাবিধান কীভাবে?

প্রথম কথা হলো, জীবন বৃদ্ধির জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হাবিবার ব্যাপারে আপত্তি করলেও অবৈধ ঘোষণা করেননি। তিনি কেবল তাকে আখিরাত সংক্রান্ত দোয়ায় উৎসাহিত করেছেন। তাই দুই হাদিসের মাঝে বৈপরীত্য নেই। যদিও সালাফের কোনো কোনো ইমাম থেকে জীবন বৃদ্ধির দোয়া অপছন্দ করার কথা এসেছে। যেমন: ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের জন্য কেউ দীর্ঘ হায়াতের দোয়া

১. ইবনে আবিল ইজ (১০১); আকহাসারি (১২৯)।
২. তিরমিজি (২১৩৯); মুসনাদে বাজ্জার (২৫৪০)।
৩. বুখারি (৫৯৮৬); মুসলিম (২৫৫৭); ইবনে হিব্বান (৪৩৯); বাজ্জার (৬৩১৬)।
৪. তিরমিজি (৬৬৪); ইবনে হিব্বান (৩৩০৯)।

করত, তিনি বলতেন, 'এটা আগ থেকেই নির্ধারিত।'[১] কিন্তু এটা অবৈধ কিংবা নিষিদ্ধ নয়। ফলে জীবন বৃদ্ধির জন্য দোয়া করা যাবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কুরআন-সুন্নাহে মানুষের জীবন নির্ধারিত হওয়ার ব্যাপারে বারবার নিশ্চিত করা হয়েছে। তা হলে দোয়া কীভাবে মানুষের জীবন বৃদ্ধি করে?

এটার উত্তর ইমামগণ বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। সবচেয়ে শক্তিশালী ও সুন্দর মতামত হলো (যার অংশবিশেষ উপরেও বলা হয়েছে), দোয়ার মাধ্যমে যে তাকদিরের পরিবর্তন ঘটবে, সেটাও আল্লাহ তায়ালা জানেন এবং সে হিসেবেই তার তাকদির লিখেছেন। অর্থাৎ যদি সে দোয়া করে, তবে এটা হবে; আর দোয়া না করলে ওটা হবে—লাওহে মাহফুজে সব লিখিত। ফলে বান্দার কাছে দোয়ার মাধ্যমে তাকদিরের পরিবর্তন ঘটলেও মূল তাকদিরে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। এ কারণেই উলামায়ে কেরাম তাকদিরকে দুইভাবে ভাগ করেছেন। যথা: তাকদিরে মুবরাম (তথা সুনির্ধারিত) এবং মুআললাক (তথা ঝুলন্ত)। প্রথমটা আল্লাহর কাছে লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত। তাতে কোনো পরিবর্তন নেই। আর দ্বিতীয়টা মানুষ ও ফেরেশতাদের দৃষ্টিকোণ থেকে। অর্থাৎ দোয়া, সৎকর্ম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার মাধ্যমে জীবন বৃদ্ধি পায়, গুনাহের মাধ্যমে জীবন কমে যায়; ঔষধ খেলে মানুষ সুস্থ হয় এবং বেঁচে থাকে, না খেলে মারা যায়। এক জায়গায় থাকলে মানুষ মৃত্যুবরণ করে, অন্য জায়গায় চলে গেলে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়—এই একাধিক সম্ভাবনাগুলো দ্বিতীয় তাকদিরে থাকে, প্রথম তাকদিরে চূড়ান্তটাই নির্ধারিত থাকে, যা পরিবর্তনীয় নয়। এ জন্যই উমর রাজি. বলেছেন, 'আমরা আল্লাহর এক তাকদির থেকে পালিয়ে আরেক তাকদিরের কাছে যাচ্ছি!'[২]

কুরআনে এই দ্বিতীয় প্রকারের তাকদির সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ . يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۚ وَعِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ.

অর্থ: 'প্রত্যেকটি নির্ধারিত সময় লিখিত আছে। আল্লাহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন এবং মূলগ্রন্থ তাঁর কাছেই রয়েছে।' [রাদ: ৩৮-৩৯]

অর্থাৎ ফেরেশতাদের কাছে থাকা দ্বিতীয় প্রকারের তাকদিরে বান্দার কাজের ভিন্নতায় পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু এসব পরিবর্তন ঘটা-সহ চূড়ান্তভাবে কী হবে, সেটা

১. ইবনে আবিল ইজ (১০৩)।
২. বুখারি (৫৭২৯); মুসলিম (২২১৯)।

লেখা হয়েছে প্রথম প্রকারের তাকদির 'মূলগ্রন্থ' আল্লাহর কাছে। ওখানে কোনো পরিবর্তন নেই। অপর একটি আয়াতেও তাকদিরের এই প্রকারভেদের দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖۤ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

অর্থ: 'কোনো বয়স্ক ব্যক্তি বয়স পায় না এবং তার বয়স হ্রাস পায় না; কিন্তু তা লিখিত আছে কিতাবে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।' [ফাতির: ১১]

অর্থাৎ দোয়া, চিকিৎসা, সতর্কতা, সৎকর্ম, গুনাহ-সহ কুরআন-হাদিসে বর্ণিত বিভিন্ন কারণে মানুষের বয়স কম-বেশি হতে পারে, সেটা দ্বিতীয় প্রকারের তাকদিরে রয়েছে। কিন্তু এই পরিবর্তন-সহ সবকিছু লেখা রয়েছে প্রথম তাকদিরে, যেটাকে আল্লাহ 'কিতাব' নামে ব্যক্ত করেছেন। ফলে ওখানে কার বয়স বাড়বে কিংবা কমবে এবং কীভাবে বাড়বে-কমবে, সবকিছু লেখা আছে।[১] ইবনে তাইমিয়া রাহি. লিখেছেন, '(মানুষের তাকদির দুটো)। পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটে ফেরেশতাদের হাতে থাকা তাকদিরে। যদি পরিবর্তনের মতো কোনো কাজ করে, তবে সেটাতে পরিবর্তন ঘটে। কারণ, ফেরেশতাদের কাছে চূড়ান্ত জ্ঞান নেই। অপরদিকে আল্লাহর কাছে রয়েছে চূড়ান্ত জ্ঞান। ফলে তাঁর কাছে লিখিত তাকদিরে কোনো পরিবর্তন নেই। কারণ, ফেরেশতাদের তাকদিরে লেখা পরিবর্তন-পরিবর্ধনের বিষয়টিও তিনি আগে থেকেই জানেন, ফলে চূড়ান্ত কথাই লিখেছেন।'[২]

সৃষ্টির আগেই তিনি সবার কর্ম সম্পর্কে জানতেন: কারণ তাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপী। এ জন্য সালাফের উলামায়ে কেরাম বলেছেন, 'আল্লাহ অতীতে কী হয়েছে, জানেন; বর্তমানে কী হচ্ছে, জানেন; ভবিষ্যতে কী হবে, জানেন। আর তিনি জানেন, যা হয়নি, যদি হতো কীভাবে হতো!' ভ্রান্ত কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায় মনে করে, আল্লাহ সৃষ্টির আগে কিছুই জানেন না।[৩] এটা তাদের গোমরাহি। কারণ, আল্লাহ অগ্র-পশ্চাৎ সব জানেন। মানুষ সৃষ্টির আগে, যখন ফেরেশতাদের সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা পরামর্শ করেছিলেন,

---

১. বিস্তারিত দেখুন: ফয়জুল বারি, কাশ্মীরি (৩/৪০৭); তুহফাতুল আহওয়াজি (৬/২৮৯-২৯০); শরহে মিশকাত, ত্বিবি (৫/১৭১০); ইবনে আবিল ইজ (১০২)।

২. মাজমুউল ফাতওয়া, ইবনে তাইমিয়া (১৪/৪৯০-৪৯২); আরও দেখুন: তাফসিরে ইবনে আতিয়্যাহ (৩/৩১৭)।

৩. ইবনে আবিল ইজ (১০৩); আকহাসারি (১২৯); হাররি (৪৪)। কেউ কেউ মুতাজিলাদের ব্যাপারেও এমন ধারণা রাখে। কিন্তু আল্লামা জামাখশারির তাফসির দেখলে বোঝা যায়, মুতাজিলারা 'কোনোকিছু অস্তিত্বে আসার আগে আল্লাহ সে ব্যাপারে জ্ঞান রাখেন'—এটা অস্বীকার করে না। দেখুন: কাশশাফ (৪/৪৪১)।

তখন তারা বলেছিল 'আপনি এমন কোনো সৃষ্টি তৈরি করবেন, যারা পৃথিবীতে রক্তপাত করবে? আমরা তো আপনার তাসবিহ পাঠের জন্য রয়েছি।' তখন আল্লাহ বললেন, 'আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।' [বাকারা: ৩০]

এই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, মানুষ সৃষ্টির আগেই আল্লাহ তায়ালা তাদের সবকিছু জানতেন। কুরআনের অপর একটি আয়াতে আল্লাহ বলেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

অর্থ: 'তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। হতে পারে তোমাদের কাছে কোনো একটা বিষয় পছন্দনীয় নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয়, অথচ তোমাদের জন্য তা অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না।' [বাকারা: ২১৬]

এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায়, প্রত্যেক ভালো-মন্দ ঘটার আগেই আল্লাহ তায়ালা জানেন। কুরআনে আল্লাহ জাহান্নামবাসীদের সম্পর্কে বলেন,

وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.

অর্থ: 'যদি তাদের আবারও (দুনিয়ায়) পাঠানো হয়, তবুও তা-ই করবে, যা তাদের নিষেধ করা হয়েছিল। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।' [আনআম: ২৮]

কাফেরদের দ্বীন থেকে বঞ্চনা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ.

অর্থ: 'আল্লাহ যদি জানতেন তাদের মধ্যে কল্যাণ হবে, তবে তাদের শুনিয়ে দিতেন। এর পরেও যদি তাদের শুনিয়ে দেন, তবে তারা মুখ ঘুরিয়ে পালিয়ে যাবে।' [আনফাল: ২৩]

মানুষের সৃষ্টি ইবাদতের জন্য: এটাকেই ইমাম তহাবি 'তিনি তাদের তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর অবাধ্য হতে নিষেধ করেছেন' বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট করেছেন। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

অর্থ: 'আমি মানুষ ও জিনকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।' [জারিয়াত: ৫৬]

তিনি আরও বলেন,

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ

অর্থ: 'যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ।' [মুলক: ২]

প্রশ্ন উঠতে পারে, আল্লাহ যদি সৃষ্টির আগেই সবার পরিণতি সম্পর্কে জানেন, তবে কাফেরদের ইবাদতের নির্দেশ দেওয়ার কী রহস্য? উত্তর হলো: আল্লাহ তায়ালা কারও প্রতি সামান্য জুলুম করেন না। ফলে তিনি কাউকে স্রেফ জানার ভিত্তিতে শাস্তি দেন না। কারণ, তাতে সে যুক্তি দিতে পারে, তাকে সুযোগ ও স্বাধীনতা দেওয়া হলে সে কুফরি করত না। বরং সুযোগ দেওয়ার পরেও কাফেররা মৃত্যুর সময় বলে,

حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ. لَعَلِّیْۤ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ؕ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ

অর্থ: 'যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে পুনরায় (পৃথিবীতে) প্রেরণ করুন, যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি। (আল্লাহ বলেন) কখনোই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।' [মুমিনুন: ৯৯-১০০]

তাই আল্লাহ প্রত্যেককে সুযোগ দেন। অতঃপর সে কুফরি করে নিজেকে শাস্তির যোগ্য করে নেয়। ফলে প্রতিদানটা আল্লাহর জ্ঞান কিংবা তাকদিরের উপর নির্ভরশীল নয়, মানুষের কর্মের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ সবাইকে সৎ কাজের আদেশ দিয়েছেন। যে সেগুলো মান্য করবে, সে জান্নাত দ্বারা সম্মানিত হবে। যে অমান্য করবে, সে শাস্তি পাবে।[১]

---

১. সালেহ ফাওজান (৪১)।

وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ، وَمَشِيئَتِهِ، وَمَشِيئَتُهُ تَنْفُذُ، لاَ مَشِيئَةَ لِلعِبَادِ إِلاَّ مَا شَاءَ لَهُمْ، فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ.

সবকিছু তাঁর নির্ধারণ ও ইচ্ছা অনুযায়ীই হয়ে থাকে। তাঁর ইচ্ছাই কার্যকর হয়। তাঁর ইচ্ছার বাইরে সৃষ্টির ইচ্ছার কোনো মূল্য নেই। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা-ই হয়। যা ইচ্ছা করেন না, তা হয় না।

ব্যাখ্যা

আল্লাহর ইচ্ছা চূড়ান্ত। সৃষ্টির ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে: এ ব্যাপারে কুরআনে অসংখ্য আয়াত এসেছে। নিচে আমরা কয়েকটি তুলে ধরছি: আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

অর্থ: 'আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে তোমরা কোনো ইচ্ছা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' [ইনসান: ৩০]

তিনি আরও বলেন,

وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থ: 'বিশ্বজগতের পালনকর্তার ইচ্ছা ব্যতিরেকে তোমরা কোনো ইচ্ছা করো না।' [তাকভির: ২৯]

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র বলেন,

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا إِلَّآ أَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ.

অর্থ: 'আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশতাদের অবতারণ করতাম, তাদের সাথে মৃতরা কথাবার্তা বলত এবং আমি সব বস্তুকে তাদের সামনে জীবিত করে পেশ

করতাম, তবুও তারা কখনও বিশ্বাস স্থাপনকারী হতো না, যদি না আল্লাহ চান। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ।' [আনআম: ১১১]

আরও বলেন,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ.

অর্থ: 'আর আপনার রব যদি চাইতেন, তবে পৃথিবীর বুকে যারা রয়েছে, তাদের সবাই সমবেতভাবে ঈমান গ্রহণ করত। অতএব, আপনি কি মানুষকে ঈমান আনতে বাধ্য করবেন?' [ইউনুস: ৯৯]

আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.

অর্থ: 'আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষ অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন, যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। এমনইভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ তাদের উপর আজাব বর্ষণ করেন।' [আনআম: ১২৫]

নুহ আলাইহিস সালাম তাঁর সম্প্রদায়কে লক্ষ করে বলেন,

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

অর্থ: 'আর আমি তোমাদের নসিহত করতে চাইলেও তা তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যদি আল্লাহ তোমাদের গোমরাহ করতে চান; তিনিই তোমাদের পালনকর্তা এবং তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।' [হুদ: ৩৪]

আল্লাহ আরও বলেন,

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

অর্থ: 'যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তারা অন্ধকারের মাঝে মূক ও বধির। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন, আর যাকে ইচ্ছা সরল পথে অটল রাখেন।' [আনআম: ৩৯]

আরেকটি সন্দেহের অপনোদন: প্রশ্ন আসতে পারে, যদি সবই আল্লাহর ইচ্ছাতে হয়ে থাকে এবং বান্দার ইচ্ছা কেবল আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে হয়ে থাকে, তা হলে কাফেরদের কী দোষ? তাদের কুফর তো আল্লাহর ইচ্ছাতেই হচ্ছে। আল্লাহ না চাইলে কাফেররা কুফর করত না; আল্লাহ না চাইলে মুশরিকরা শিরক করত না; বরং তিনি চাইলে দুনিয়ার সকল মানুষ মুমিন হয়ে যেত! কুরআনেও এমন প্রশ্নের অবতারণা দেখা যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا

অর্থ: 'আর আপনার রব যদি চাইতেন, তবে পৃথিবীর বুকে যারা রয়েছে, তাদের সবাই সমবেতভাবে মুমিন হয়ে যেত।' [ইউনুস: ৯৯]

আরও বলেন,

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ.

অর্থ: 'আর আপনার পালনকর্তা যদি ইচ্ছা করতেন, তবে সব মানুষকে একই জাতিসত্তায় পরিণত করতে পারতেন, আর তারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হতো না।' [হুদ: ১১৮]

মুশরিকদের যুক্তি তুলে ধরে কুরআনে আল্লাহ বলেন,

سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَاْسَنَا ؕ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ؕ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ.

অর্থ: 'মুশরিকরা বলবে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে আমরা কিংবা আমাদের বাপ-দাদারা শিরক করতাম না, কোনো বস্তুকে আমরা হারাম করতাম না। এমনইভাবে তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা মিথ্যারোপ করেছে, এমন কি তারা আমার শাস্তি আস্বাদন

করেছে। আপনি বলুন, তোমাদের কাছে কি কোনো প্রমাণ আছে, যা আমাদের দেখাতে পারো? তোমরা শুধু আন্দাজের অনুসরণ করো এবং কেবল অনুমান করে কথা বলো।' [আনআম: ১৪৮]

আরও বলেন,

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

অর্থ: 'মুশরিকরা বলে, যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে আমরা এবং আমাদের পূর্বপুরুষরা তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদত করতাম না এবং তাঁর নির্দেশ ছাড়া কোনো বস্তুই আমরা হারাম করতাম না। তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এমনই করেছে। রাসুলের দায়িত্ব তো শুধু সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া।' [নাহল: ৩৫]

আরও বলেন,

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ۗ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ.

অর্থ: 'তারা বলে, রহমান আল্লাহ ইচ্ছা না করলে আমরা তাদের পূজা করতাম না। এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমাননির্ভর কথা বলে।' [জুখরুফ: ২০]

যেহেতু কাফেররা আল্লাহর ইচ্ছাতেই কুফরি করছে, তবুও তাদের শাস্তি দেওয়া হবে কেন? উলামায়ে কেরাম বিভিন্নভাবে এই সন্দেহের জবাব দিয়েছেন। সবচেয়ে সুন্দর ও শক্তিশালী জবাব দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। উপরের আয়াতগুলোর শেষের দিকেই তিনি সেটা ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ 'তারা অনুমাননির্ভর ও ধারণাভিত্তিক কথা বলে', 'এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই' ইত্যাদি। অর্থাৎ তারা যে যুক্তিটা দিচ্ছে, সে যুক্তিটা জ্ঞানভিত্তিক নয়; বরং ধারণা ও অনুমানভিত্তিক। কারণ, এগুলো যেহেতু গায়েবি বিষয়, কাফের কীভাবে জানলো যে, আল্লাহ তার জন্য কুফরি লিখে রেখেছেন আর তার ভাইয়ের জন্য ঈমান?

কেউ বলতে পারে, সে কুফরির উপর আছে, এটা কি প্রমাণ নয় যে, আল্লাহ তার জন্য কুফর লিখেছেন? আমরা বলব, এটা অজ্ঞতার কথা। কারণ, আল্লাহ তাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। সে চাইলেই ঈমান আনতে পারে, কিন্তু না এনে আল্লাহর দায়

দিচ্ছে। অনেক মুমিন প্রথম জীবনে কাফের থাকে, পরে আল্লাহর উপর ঈমান আনে। তা হলে কেউ ঈমান না এনে যদি বলে, আল্লাহ আমার উপর কুফর লিখেছেন, এটা অযৌক্তিক কথা হবে। তা ছাড়া ঈমানের ক্ষেত্রে কাফেররা এমন যুক্তি দিলেও দুনিয়ার ক্ষেত্রে দেয় না; কেউ বলে না, আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন, তা তো ঘরে আসবেই; সুতরাং চাকুরি, ব্যাবসা ও পরিশ্রমের দরকার নেই; বরং দুনিয়ার জন্য মানুষ প্রতিযোগিতা করে, হানাহানি করে; অথচ আখিরাতের বেলায় তাকদিরের দোহাই দেয়! এটাই প্রমাণ করে তাদের দ্বিচারিতা।

উপরের প্রশ্নের আরও একটি সুন্দর জবাব হচ্ছে (যা অনেকেই বুঝতে ভুল করে), আল্লাহ তায়ালা তাঁর সামগ্রিক জ্ঞানের মাধ্যমে শুরুতেই জেনেছেন কে হিদায়াতের পথে হাঁটবে আর কে গোমরাহির পথে হাঁটবে। ফলে তিনি তাদের জন্য সেটাই ইচ্ছা করেছেন এবং লিখেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ যেহেতু তাদের ভবিষ্যৎ জানেন, তাই সেগুলো লিখে রেখেছেন এবং ইচ্ছা করেছেন। এমন নয় যে, মানুষকে কোনো রকমের স্বাধীনতা বা সুযোগ না দিয়ে আগে আগেই তিনি কারও ব্যাপারে হিদায়াত আর কারও ব্যাপারে গোমরাহি লিখে রেখেছেন। ফলে মানুষ পৃথিবীতে এসে তা-ই করছে (علم الله كاشف لا موجب)। কারণ, এমন হলে নবি-রাসুল পাঠানো, গ্রন্থ অবতীর্ণ করা, হিদায়াতের পথে চলতে বলার তাৎপর্য থাকে না।[১]

অন্যায় করে তাকদিরের উপর চাপিয়ে দেওয়ার কাজটা সর্বপ্রথম শুরু করেছিল ইবলিস। সে আল্লাহকে বলেছিল,

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ.

অর্থ: 'হে আমার পালনকর্তা, আপনি যেহেতু আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেবো।' [হিজর: ৩৯]

ইবলিসের কাছ থেকেই কাফেররা এই যুক্তি শেখে এবং যুগে যুগে পেশ করে। এমনকি পরকালেও পেশ করবে! অথচ আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বারবার বলেছেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর জুলুম করেন না। যদি আল্লাহর ইচ্ছা মানুষের ঈমানের ইচ্ছার পথে প্রতিবন্ধক হয়, আল্লাহ মানুষের ইচ্ছাকে ঈমান থেকে

---

১. দেখুন: শিফাউল আলিল (১৬৪); কারি মুহাম্মাদ তৈয়ব (১২৫); সাইদ ফুদাহ (৪২৩)।

ঘুরিয়ে কুফরের দিকে নিয়ে যান; এরপর তাদের জাহান্নামের মাধ্যমে শাস্তি দেন, তবে তো সেটা জুলুম। আল্লাহ তায়ালা নিজেকে এমন জুলুম থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

অর্থ: 'যে সৎকর্ম করে, সে নিজের ভালোর জন্য করে, আর যে অসৎকর্ম করে, তার দায়ভার তার নিজের উপরই। আপনার পালনকর্তা বান্দাদের প্রতি মোটেই জুলুম করেন না।' [ফুসসিলাত: ৪৬]

অপর একটি আয়াতে বলেছেন,

فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ

অর্থ: 'অতএব, যার ইচ্ছা ঈমান আনবে, আর যার ইচ্ছা কুফরি করবে।' [কাহাফ: ২৯]

এর দ্বারা বোঝা যায়, মানুষের ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে হলেও আল্লাহ মানুষকে স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। ফলে মানুষ নিজের ইচ্ছাতেই ঈমান ও কুফর অবলম্বন করতে পারে। তাই এর দায়ভার মানুষেরই। তা ছাড়া আল্লাহ মানুষকে ফিতরাতের উপর তৈরি করেছেন। যার ফলে ভালোর প্রতি মানুষ প্রাকৃতিকভাবেই আগ্রহী। আল্লাহ মানুষকে ভালো-মন্দ বোঝার বিবেক দিয়েছেন; নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন, কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। এর পরেও কেউ কুফর করলে এর দায়ভার আল্লাহ নেবেন কেন?

মানুষ কোনো ভালো কাজ করলে তাকদিরের কারণে হয়েছে বলে না। বরং বলে, নিজের চেষ্টা ও আল্লাহর অনুগ্রহে এটা সম্ভব হয়েছে। কারণ, সে বসে থাকলে এটা সম্ভব হতো না, আল্লাহ তাকে জোর করে করাতেন না। একইভাবে আপনাকে কেউ পেটালে আপনি তাকদিরে ছিল তাই পিটুনি খেয়েছেন বলে চুপ থাকবেন না; বরং প্রতিবাদ করবেন, নিজেকে রক্ষার চেষ্টা করবেন। তাই কেবল আখিরাতের বিষয়ে নয়, দুনিয়াতেও যদি তাকদিরকে অন্যায়ের ঢাল হিসেবে বানানো হয়, তবে কোনো শৃঙ্খলা থাকবে না; সর্বত্র অশান্তি ও নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়বে। মানুষ মানুষকে খুন করে বলবে তাকদিরে লেখা ছিল। জুলুম করে তাকদিরের দোহাই দেবে। একজন আরেকজনের সম্পদ দখল করে ভাগ্যের উপর দোষ চাপাবে। অথচ এগুলো মানুষের কৃতকর্ম। এ

কারণে যখন উমর রাজি.-এর সামনে এক চোর তাকদিরের দোহাই দিয়ে বলেছিল, আমার তাকদিরে লেখা ছিল বলে চুরি করেছি; তখন উমর রাজি. বললেন, তাকদিরে লেখা ছিল বলেই এখন তোমার হাত কাটা যাবে। বোঝা গেল, তাকদিরে লেখা ছিল বলেই চুরি করেনি। বরং আল্লাহ তাকে চুরি করা এবং বিরত থাকা দুটোর স্বাধীনতাই দিয়েছেন। কিন্তু সে নিজ ইচ্ছাতেই চুরিটাকে বেছে নিয়েছে, ফলে দায়ভারও তার।[১]

কেউ কেউ এখানে আদম আলাইহিস সালাম এবং মুসা আলাইহিস সালামের কথোপকথনের হাদিসটি পেশ করতে পারে, যেখানে আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশ ভঙ্গ এবং জান্নাতে নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণের ক্ষেত্রে তাকদিরকে দায়ী সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ মুসা আলাইহিস সালাম যখন আদমকে বললেন, 'আপনি আমাদের পিতা, আপনি আমাদের জান্নাত থেকে বের করেছেন', তখন আদম আলাইহিস সালাম বললেন, 'হে মুসা, তুমি কি আমাকে এমন এক বিষয়ের জন্য দায়ী করছ, যা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর আগে আমার তাকদিরে লিখে রাখা হয়েছে?'[২] উলামায়ে কেরাম হাদিসটি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কারও মতে, এটা অপরাধের ক্ষেত্রে তাকদিরের দোহাই নয়; বরং মুসিবতের ক্ষেত্রে তাকদিরের দোহাই, যা বৈধ। কারণ, জান্নাত থেকে বের হওয়া নিঃসন্দেহে বড় মুসিবত। কারও মতে, যদি ধরেও নেওয়া হয়, আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তাকদিরের দোহাই দিয়েছেন, তবুও তা এখানে বৈধ। কারণ, তাওবা করে ফেলার পরে গুনাহের ক্ষেত্রে তাকদিরের দোহাই দেওয়া যাবে। আপনি যখন তাওবা করছেন, এর অর্থ প্রথমে আপনি তাকদিরকে দায়ী করছেন না; বরং নিজেকে প্রথমে দায়ী করছেন। ফলে আপনি আসলে তাকদিরের মাধ্যমে আপনার অপরাধকে ঢাকতে চাচ্ছেন না, বরং মুসিবতটা বোঝাচ্ছেন। আপনি স্বীকার করছেন যে, গুনাহের জন্য আপনিই দায়ী। কিন্তু আল্লাহ আপনার জন্য এই মুসিবত লিখে রেখেছেন বলে আপনি তখন বের হতে পারেননি। আবার আপনি স্বাধীন বিধায় তাওবা করতে পেরেছেন।[৩]

এ কারণেই তাকদির সম্পর্কে বলার পরে সাহাবারা যখন রাসুলকে বললেন, 'তা হলে আমল করে কী লাভ (যদি সবকিছু লেখাই থাকে)?' রাসুলুল্লাহ বললেন, 'বরং

---

১. ইবনে আবিল ইজ (১০৫)।
২. বুখারি (৬৬১৪); মুসলিম (২৬৫২); আবু দাউদ (৪৭০১)।
৩. বিস্তারিত দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া (৮/৩০৩); শিফাউল আলিল, ইবনুল কাইয়িম (১৮); ইবনুল কাইয়িম রাহি.-এর উক্ত গ্রন্থ পুরোটাই তাকদির বিষয়ে। ফলে আগ্রহী পাঠকগণ উপকৃত হতে পারেন। ইবনে আবিল ইজ (১০৫)।

তোমরা কাজ করত থাকো। প্রত্যেককে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজ তার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। যাকে সৌভাগ্যের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সেসব কাজ তার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। আর যাকে দুর্ভাগ্যের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সেসব কাজ তার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে।' এরপর তিনি কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন,

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى. فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى. وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى. فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى.

অর্থ: 'অতএব, যে দান করে, আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তার জন্য সুখের বিষয় সহজ করে দেবো। আর যে কৃপণতা করে, মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং উত্তম বিষয়কে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য দুঃখের পথ সহজ করে দেবো।'[১] [লাইল: ৫-১০]

তবে ইসলামের সৌন্দর্য এবং মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের একটি বিশাল প্রকাশ হলো, **গুনাহের কাজে তাকদিরের দোহাই দেওয়া না গেলেও মুসিবতের ক্ষেত্রে তাকদিরের দোহাই দেওয়া যাবে।** অর্থাৎ গুনাহ বা অপরাধ করে বলা যাবে না, 'তাকদিরে ছিল, তাই করেছি।' কারণ, সেটা মানুষ নিজের ইচ্ছাতে করে। কিন্তু বিপদে আক্রান্ত হলে বলা যাবে, 'আল্লাহ লিখেছেন, তাই বিপদ এসেছে।' কারণ, এটা মানুষের ইচ্ছার বাইরে। আর এভাবেই ইসলামের ভারসাম্য ও আল্লাহর ইনসাফ সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। এটা মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রশান্তির ক্ষেত্রে বিপুল ভূমিকা পালন করে। হাদিসে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন: কল্যাণকর কাজ করার চেষ্টা করো। আল্লাহর উপর ভরসা করো। ভেঙে পড়ো না। এর পরেও যদি মুসিবত চলে আসে এটা বলো না, 'আমি এমন করলে এমন হতো, অমন করলে অমন হতো।' বরং বলো, 'আল্লাহ তায়ালা কপালে লিখে রেখেছেন, তাই এমন হয়েছে'![২]

তাকদিরের ক্ষেত্রে জরুরি কিছু কথা লিখে এখানে একটি বিষয়ে সতর্ক করা হচ্ছে, সেটা হলো, মুসলিম উম্মাহর সম্মানিত ইমামদের মতে, তাকদিরের বিষয়টি সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর গোপন রহস্য, যা সম্পূর্ণরূপে উদঘাটন করা কখনোই সম্ভব নয়। তাই এ ব্যাপারে অতিরিক্ত ঘাঁটাঘাঁটি করা উচিত নয়। এটা যদি সহজে বোঝা যেত, তা হলে

---

১. বুখারি (৪৯৪৯); মুসলিম (২৬৪৭)।
২. মুসলিম (২৬৬৪); ইবনে মাজা (৭৯); মুসনাদে আহমদ (৮১৩)।

সকলে এটাকে রহস্য বলতেন না। তা ছাড়া তাকদির বোঝা যদি এত সরল হতো, তা হলে এটাকে কেন্দ্র করে ইসলামের ইতিহাসে কাদারিয়্যাহ, জাবরিয়্যাহ-সহ এতগুলো গোমরাহ ফিরকার আবির্ভাব ঘটত না। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এটা পুরোপুরি বোঝার ক্ষমতাই দেননি, তারা সেই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে নিজেদের আকল দিয়ে সেটা বুঝতে চেয়েছে আর বিভ্রান্ত হয়েছে। তাই তাকদির নিয়ে যে যত কম চিন্তা-ভাবনা করবে, সে তত নিরাপদ থাকবে, আর যে যত বেশি চিন্তা-ভাবনা করবে, তত তার কাছে এলোমেলো লাগবে। এ কারণে ওয়াহব ইবনে মুনাব্বিহ বলেন, 'আমি তাকদির নিয়ে যত বেশি চিন্তা-ভাবনা করেছি, এ ব্যাপারে ততই আমার পেরেশানি বেড়েছে। শেষে আমি উপলব্ধি করেছি, তাকদির সম্পর্কে সে-ই সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী, যে এটা নিয়ে চিন্তাভাবনা থেকে সবচেয়ে দূরে। আর তাকদির সম্পর্কে সে সবচেয়ে বড় মূর্খ, যে এটা নিয়ে বেশি মশগুল।'[১]

১. ইবনে আবিল ইজ্জ (১০৬)।

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَيَعْصِمُ وَيُعَافِي فَضْلاً، وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ، وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِي عَدْلاً. وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيئَتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ. وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الأَضْدَادِ وَالأَنْدَادِ. لاَ رَادَّ لِقَضَائِهِ، وَلاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَلاَ غَالِبَ لِأَمْرِهِ، آمَنَّا بِذَلِكَ كُلِّهِ، وَأَيْقَنَّا أَنَّ كُلًّا مِنْ عِنْدِهِ.

তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহে সঠিক পথে পরিচালিত করেন, সুরক্ষিত রাখেন, সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করেন। আবার যাকে ইচ্ছা ইনসাফপূর্বক তার নিজের উপর ছেড়ে দেন, বিপথগামী করেন, পরীক্ষায় ফেলেন। সকলেই তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর অনুগ্রহ ও ইনসাফের মাঝে আবর্তিত হয়। তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, সমকক্ষ নেই। তিনি এসব থাকার ঊর্ধ্বে। তাঁর ফয়সালা ফেরানোর কেউ নেই, তাঁর হুকুম স্থগিত করার কেউ নেই। তাঁর সিদ্ধান্তের ব্যত্যয় ঘটানোর কেউ নেই। আমরা এই সবকিছুর উপর ঈমান এনেছি। আর আমরা ইয়াকিন রাখি, (এ সবকিছু) তাঁরই পক্ষ থেকে (সৃষ্ট ও নির্ধারিত)।

ব্যাখ্যা

হিদায়াত ও গোমরাহির মালিক আল্লাহ: এটা মুতাজিলা সম্প্রদায়ের খণ্ডন। তাদের ধারণা, আল্লাহ নিজে কাউকে হিদায়াত দান করেন না কিংবা গোমরাহও করেন না; বরং তাদের হিদায়াতের অর্থ কেবল সঠিক পথের কথা বলে দেওয়া; তাওফিক দেওয়া নয়। গোমরাহ করার অর্থ বান্দাকে কেবল গোমরাহ হিসেবে আখ্যা দেওয়া। অর্থাৎ তিনি নিজে কাউকে সৎপথে পরিচালিত করেন না, আবার কাউকে বিপথগামীও করেন না। তবে তিনি মানুষ কেবল সৎপথে চলুক সেটা চান; অসৎপথে চলুক এটা চান না। এবং এটাকে তারা আল্লাহর উপর কর্তব্য বলে মনে করে। মুতাজিলাদের এমন বক্তব্য মূলত তাকদির অস্বীকার থেকে উদ্ভূত। পিছনে আমরা বলেছি, তারা তাকদির অস্বীকার করে। ফলে মানুষকেই তার সকল কাজের স্রষ্টা এবং

দায়ী মনে করে। তাদের বিশ্বাস, আল্লাহ যেহেতু অন্যায় কাজের নির্দেশ দেন না, ফলে অন্যায় কাজ মানুষ নিজের ইচ্ছাতে করে, আল্লাহর ইচ্ছায় নয়! অথচ এমন বিশ্বাস কুরআনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।[১]

কুরআন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে,

فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ

অর্থ: 'আল্লাহ যাকে চান হিদায়াত দেন, আর যাকে চান বিপথগামী করেন।' [ইবরাহিম: ৪]

অন্যত্র বলেন,

يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ

অর্থ: 'আল্লাহ যাকে চান হিদায়াত দেন, আর যাকে চান বিপথগামী করেন।'[মুদ্দাস্‌সির: ৩১]

যদি হিদায়াত দান করার অর্থ কেবল পথ দেখিয়ে দেওয়া হতো, তা হলে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ করে বলতেন না,

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ

অর্থ: 'আপনি যাকে ভালোবাসেন, তাকে হিদায়াত দিতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান, তাকে হিদায়াত দেন।' [কাসাস: ৫৬]

উল্লেখ্য, হিদায়াতের একাধিক অর্থ রয়েছে। যেমন: সঠিক পথ বলে দেওয়া; ডাকা ও আহ্বান করা; সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার তাওফিক দেওয়া। প্রথম দুটি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। তৃতীয়টি কেবল আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু মুতাজিলারা শেষ প্রকারের হিদায়াতকে অস্বীকার করে।[২]

আহলে সুন্নাতের মতে, 'আল্লাহ কাউকে গোমরাহ করেন'-এর অর্থ হলো: কেউ যদি গোমরাহ হতে চায়, আল্লাহ তার জন্য পথ খুলে দেন। কিন্তু তিনি কাউকে গোমরাহ হতে নির্দেশ দেন, কিংবা গোমরাহি পছন্দ করেন—এমন নয়। মুতাজিলারা এটাকেও

---

১. গাজনবি (৬৬); ইবনে আবিল ইজ (১০৬-১০৭); তুর্কিস্তানি (৭৮-৮১); আকহাসারি (১৩২); গুনাইমি (৬২); হারারি (৪৫)।

২. তুর্কিস্তানি (৮২); আকহাসারি (১৩২); গুনাইমি (৬২)।

ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে। তারা মনে করে, আল্লাহ কাউকে গোমরাহ করেন না; বরং তিনি সবাইকে হিদায়াত দিয়েছেন। কিন্তু কাফের তার জন্য কুফর বেছে নিয়েছে (আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে)।[১]

সংশয় নিরসন: কেউ প্রশ্ন করতে পারে, আল্লাহ তায়ালা কেন একজনকে হিদায়াত দান করেন, অন্যজনকে গোমরাহ করেন? এর উত্তর ইমাম তহাবি রাহি. নিজে দিয়েছেন: 'তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে নিজ অনুগ্রহে সঠিক পথে পরিচালিত করেন, সুরক্ষিত রাখেন, সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করেন। আবার যাকে ইচ্ছা ইনসাফপূর্বক তার নিজের উপর ছেড়ে দেন, বিপথগামী করেন, পরীক্ষায় ফেলেন। সকলেই তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর অনুগ্রহ ও ইনসাফের মাঝে আবর্তিত হয়।' অর্থাৎ হিদায়াত দান তাঁর অনুগ্রহ, আর পথচ্যুতকরণ তাঁর ইনসাফ। সুতরাং পথচ্যুত ব্যক্তিকে আল্লাহ জুলুম করেছেন এই অজুহাত দেওয়ার সুযোগ নেই। কেউ বলতে পারে, একজনকে অনুগ্রহ করে হিদায়াত দেওয়া, আরেকজনকে পথচ্যুত করা হোক সেটা ইনসাফভিত্তিক, সেটাও কি এক ধরনের পক্ষপাতিত্ব কিংবা জুলুমের পর্যায়ে পড়ে না? যদি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কিংবা পক্ষপাতমূলক হয়, তবে জুলুম না হলেও এমন আচরণ তো ইতিবাচক নয়। আমরা জবাবে বলব, আল্লাহর ক্ষেত্রে এমন অভিযোগ উত্থাপিত হয় না। কারণ, আল্লাহ সবার সৃষ্টিকর্তা, সবার জন্ম ও মৃত্যুদাতা, সবার রিজিকদাতা। সুতরাং তিনি কারও পক্ষপাতিত্ব করবেন এটা কল্পনাও করা যায় না। নেতিবাচকভাবে কারও প্রতি অনুগ্রহ করবেন, আর কারও প্রতি করবেন না, এটা হতেই পারে না। কারণ, সৃষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মানুষ তাঁর কাছে সমান।

তা হলে কেন তিনি একজনের প্রতি অনুগ্রহ করেন অন্যজনের প্রতি করেন না? এর উত্তর তিনি নিজেই কুরআনের একটি সুরায় দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى. فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى. وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى.
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى. فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى.

অর্থ: 'অতএব, যে দান করে, আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্যায়ন করে, আমি তার জন্য সুখের বিষয় সহজ করে দেবো। আর যে কৃপণতা করে, মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং উত্তম বিষয়কে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য দুঃখের পথ সহজ করে দেবো।'[২] [লাইল: ৫-১০]

---

১. শাইবানি (১৫)।
২. বুখারি (৪৯৪৯); মুসলিম (২৬৪৭)।

দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ মানুষের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করবেন, এটা অনেকখানি মানুষের নিজের কর্মের উপর নির্ভর করে। কেউ নিজেকে সংশোধনের মাধ্যমে, নিজের প্রচেষ্টা ব্যয়ের মাধ্যমে, নিষ্ঠা ও আশা নিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ও মিনতির মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহের পাত্র হতে পারে, হিদায়াত পেতে পারে। আবার মানুষ চাইলে নিজের আলস্য ও গাফিলতির মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে কেবল ইনসাফের পাত্র হয়। তখন তার পথচ্যুত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

অর্থ: 'আল্লাহ তায়ালা জালেম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।' [আলে ইমরান: ৮৬]

তা ছাড়া কাউকে হিদায়াত দান করলে আল্লাহর কোনো ক্ষতি নেই; কাউকে পথচ্যুত করলে আল্লাহর লাভ নেই। সুতরাং লাভ-ক্ষতি পুরোটাই বান্দার। ফলে আল্লাহ তায়ালা কারও প্রতি জুলুম করবেন সে প্রশ্নই ওঠে না। বরং তিনি বান্দাদের কর্মের ভিত্তিতে কাউকে অনুগ্রহ করে হিদায়াত দেন, আর কাউকে ইনসাফপূর্বক হিদায়াত থেকে বঞ্চিত করেন।[১] আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

'আল্লাহ তাদের জুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করেছে।' [নাহল: ৩৩]

মুমিন ও কাফের এবং সৎ ও অসতের মাঝে পার্থক্য দেখিয়ে আল্লাহ বলেন,

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ.

অর্থ: 'যারা অসৎকর্ম করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের সে লোকদের মতো মনে করব, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু কি সমান হবে? তাদের দাবি কত মন্দ!' [জাসিয়াহ: ২১]

১. সালেহ ফাওজান (৪৩)।

আরও বলেন,

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۖ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ

অর্থ: 'আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মীদের পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাফেরদের সমকক্ষ করে দেবো, না খোদাভীরুদের পাপাচারীদের সমান করে দেবো? [সাদ: ২৮]

আরেক জায়গায় একই অর্থের তাগিদ করেন,

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ . مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ

অর্থ: 'আমি কি আজ্ঞাবহদের অপরাধীদের মতো গণ্য করব? তোমাদের কী হলো? তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ? [কলম: ৩৫-৩৬]

আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী-সমকক্ষ নেই: কুরআনে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে,

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

অর্থ: 'তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।' [ইখলাস: ৪]

আরেক জায়গায় আল্লাহ তায়ালা বলেন,

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۪ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

অর্থ: 'অতএব, তোমরা কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করো না।' [বাকারা: ২২]

অন্যত্র বলেন,

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

অর্থ: 'আল্লাহ মানুষের জন্য অনুগ্রহের মধ্য থেকে যা খুলে দেন, তা ফেরাবার কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন, তা কেউ প্রেরণ করতে পারে না তিনি ব্যতীত। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।' [ফাতির: ২]

এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে বলতেন, اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ অর্থ: 'হে আল্লাহ, আপনি

যা দান করবেন তা ফেরানোর সাধ্য কারও নেই; আপনি যা দান করবেন না তা দেওয়ার সাধ্য কারও নেই।'[১]

উপরে ইমাম তহাবির বক্তব্য মূলত তাকদিরের ক্ষেত্রে মুতাজিলাদের মতাদর্শের খণ্ডন। মুতাজিলারা তাকদিরের ক্ষেত্রে মানুষকে আল্লাহর সমকক্ষ/প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করায়। কারণ তাদের ধারণা, মানুষের সকল কাজের সৃষ্টিকর্তা মানুষ নিজে। ফলে এভাবে তারা দুইজন সৃষ্টিকর্তা সাব্যস্ত করে: এক. আল্লাহ তায়ালা, দুই. মানুষ নিজেই। তাই ইমাম তহাবি তাদের বক্তব্য নাকচ করে দিয়ে বলেন, আল্লাহই সবার ও সবার সকল কর্মের স্রষ্টা। ভাগ্যের নিয়ন্তা।[২]

তাঁর নির্দেশের ব্যত্যয় নেই: কুরআনে আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেন,

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ.

অর্থ: "তিনি যখন কোনোকিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, 'হও', তখনই তা হয়ে যায়।" [ইয়াসিন: ৮২]

আরেক জায়গায় আল্লাহ বলেন,

وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِۦ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

অর্থ: 'আর আল্লাহ নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ স্থগিত করার মতো কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাবগ্রহণকারী।' [রাদ: ৪১] আরেক আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেন,

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمْرِهِۦ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

অর্থ: 'আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্তে প্রবল। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।' [ইউসুফ: ২১]

তাকদিরের ভালো-মন্দ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে: এ ব্যাপারে কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا۟ هَٰذِهِۦ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا۟ هَٰذِهِۦ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ

১. ইবনে আবিল ইজ্জ (১০৭)।
২. বুখারি (৮৪৪, ৭২৯২); মুসলিম (৪৭১)।

অর্থ: 'তাদের কোনো কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোনো অকল্যাণ হয়, তখন বলে, এটা হয়েছে আপনার পক্ষ থেকে। বলুন, এ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে।' [নিসা: ৭৮]

প্রসিদ্ধ হাদিসে জিবরিলে এসেছে, জিবরিল আলাইহিস সালাম যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি উত্তরে বললেন, 'আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ, শেষ দিবস এবং তাকদিরের ভালো-মন্দে বিশ্বাস করা।'[১]

ইমাম তহাবি রাহি. এখানে 'ঈমান' এবং 'ইয়াকিন' দুটো শব্দ ব্যবহার করেছেন। দুটোর অর্থ কাছাকাছিই। ইমাম আবু মানসুর মাতুরিদি রাহি. মনে করেন, 'ঈমান' হলো ওহি এবং কুরআন-সুন্নাহ সত্যায়নের নাম। আর 'ইয়াকিন' হলো মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও গবেষণা-প্রসূত বিশ্বাসের নাম। কারণ, কুরআনে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জগৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয়েছিল 'ইয়াকিন।'[২] [আনআম: ৭৫]

---

১. মুসলিম (৮); তিরমিজি (২৬১০); আবু দাউদ (৪৬৯৫)।
২. গাজনবি (৬৮); তুর্কিস্তানি (৮৬)।

وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ الـمُصْطَفَى، وَنَبِيُّهُ الـمُجْتَبَى، وَرَسُولُهُ الـمُرْتَضَى، وَإِنَّهُ خَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِمَامُ الأَتْقِيَاءِ، وَسَيِّدُ الـمُرْسَلِينَ، وَحَبِيبُ رَبِّ العَالَمِينَ، وَكُلُّ دَعْوَةِ نُبُوَّةٍ بَعْدَ نُبُوَّتِهِ فَغَيٌّ وَهَوًى، وَهُوَ الـمَبْعُوثُ إِلَى عَامَّةِ الـجِنِّ وَكَافَّةِ الوَرَى بِالـحَقِّ وَالـهُدَى وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ.

আমরা বিশ্বাস রাখি, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নির্বাচিত বান্দা, মনোনীত নবি এবং প্রিয় রাসুল। আমরা আরও বিশ্বাস রাখি, তিনি সর্বশেষ নবি। মুত্তাকিদের ইমাম। রাসুলদের নেতা। বিশ্বজগতের পালনকর্তার পরম বন্ধু। তাঁর পরে নবুওতের যেকোনো দাবি ভ্রষ্টতা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ। তিনি মানুষ ও জিন-সহ গোটা জগদ্‌বাসীর জন্য সত্য ও হিদায়াত, জ্যোতি ও আলো নিয়ে এসেছেন।

ব্যাখ্যা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত আকিদা

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল: আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেকগুলো নাম ও লকব রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ। কুরআনে একাধিকবার নামটি এসেছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنۡ رِّجَالِكُمۡ وَلٰكِنۡ رَّسُوۡلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمًا

অর্থ: 'মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো লোকের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল।' [আহজাব: ৪০] আরেক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ.

অর্থ: 'যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আর বিশ্বাস করে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মাদের উপর অবতীর্ণ সত্যে, তিনি তাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করবেন।' [মুহাম্মাদ: ২] অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ

অর্থ: 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল...।' [ফাতহ: ২৯]

কুরআনের একটি সুরাও রয়েছে এই নামে, যেমনটা আমরা উল্লেখ করেছি। মুহাম্মাদ নামের পাশাপাশি কুরআনে রাসুলের আরও একটি নাম উল্লেখ করা হয়েছে; আর তা হচ্ছে আহমদ। আল্লাহ তায়ালা ঈসা আলাইহিস সালামের ভাষ্যে বলেন,

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ

অর্থ: "যখন ঈসা ইবনে মারইয়াম বললেন, হে বনু ইসরাইল, আমি তোমাদের কাছে রাসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। আমি আমার পূর্বের কিতাব তাওরাতকে সত্যায়ন করছি। আর সুসংবাদ দিচ্ছি একজন রাসুলের, যিনি আমার পরে আসবেন; তাঁর নাম 'আহমদ'।" [সফ: ৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলমানের উপর ওয়াজিব। কবরেও তাঁর সম্পর্কে প্রত্যেকটি মানুষকে প্রশ্ন করা হবে।[১]

দাসত্বের মহিমা: মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় হচ্ছে সে আল্লাহর বান্দা (দাস)। সাধারণ মানুষ হোক, ওলি-আউলিয়া হোন, নবি-রাসুল কিংবা ফেরেশতা হোন, সকলের জন্য সর্বোচ্চ সম্মানের বিষয় হচ্ছে আল্লাহর দাসত্ব। যে আল্লাহর দাসত্বের ক্ষেত্রে যত অগ্রসর হবে, সে আল্লাহর তত কাছাকাছি পৌঁছতে পারবে।[২] আল্লাহ তায়ালা বলেন,

---

১. আবু দাউদ (৪৭৫৩); তিরমিজি (৩১২০)।
২. কারি মুহাম্মাদ তৈয়ব (৪৮); গুনাইমি (৬৪)।

اِنۡ كُلُّ مَنۡ فِى السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ اِلَّاۤ اٰتِى الرَّحۡمٰنِ عَبۡدًا.

অর্থ: 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা রয়েছে, সবাই রহমান আল্লাহর দাস হিসেবে আসবে।' [মারইয়াম: ৯৩]

এ জন্য পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও নবি-রাসুলদের সর্বপ্রথম পরিচয় হচ্ছে তারা আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা (দাস)। এর দ্বারা বোঝা যায়, যারা মনে করে ইবাদত করতে করতে এক পর্যায়ে আর ইবাদতের দরকার হয় না, তারা পথচ্যুত। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতা ও নবি-রাসুলগণকে তাঁর বান্দা ও দাস হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। যখন কাফেররা ফেরেশতাদের আল্লাহর মেয়ে মনে করল, আল্লাহ তাদের খণ্ডনে বললেন,

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحۡمٰنُ وَلَدًا سُبۡحٰنَهٗ ؕ بَلۡ عِبَادٌ مُّكۡرَمُوۡنَ.

অর্থ: 'তারা বলে আল্লাহর সন্তান রয়েছে। বরং তারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা।' [আম্বিয়া: ২৬]

নুহ আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّهٗ كَانَ عَبۡدًا شَكُوۡرًا

অর্থ: 'আর সে ছিল আমার কৃতজ্ঞ বান্দা।' [ইসরা:৩]

দাউদ আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاذۡكُرۡ عَبۡدَنَا دَاوٗدَ ذَا الۡاَيۡدِ

অর্থ: 'আর স্মরণ করুন আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদকে...।' [সাদ: ১৭]

সুলাইমান আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বলেন,

نِعۡمَ الۡعَبۡدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ

অর্থ: 'কতই না উত্তম বান্দা তিনি।' [সাদ: ৩০]

আইয়ুব আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বলেন,

وَاذۡكُرۡ عَبۡدَنَاۤ اَيُّوۡبَ

অর্থ: 'আর স্মরণ করুন আমার বান্দা আইয়ুবকে।' [সাদ: ৪১]

ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে বলেন,

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَٰهُ مَثَلًا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

অর্থ: 'তিনি তো কেবল আমার একজন বান্দা, যার উপর আমি অনুগ্রহ করেছি। আর তাকে বনি ইসরাইলের জন্য আদর্শ বানিয়েছি।' [জুখরুফ: ৫৯]

অন্য নবিদের মতো আমাদের রাসুলের ব্যাপারেও আল্লাহ একাধিক জায়গায় 'দাস' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ইসরার মতো সম্মানজনক জায়গায় আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বান্দা আখ্যা দিয়ে বলেন,

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا

অর্থ: 'পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলা ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত।' [ইসরা: ১]

একই রাতে মিরাজের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ যখন উর্ধ্বজগতে গমন করেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি ওহি অবতরণ প্রসঙ্গে বলেন,

فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ

অর্থ: 'অতঃপর তিনি প্রত্যাদেশ করলেন তাঁর বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করার।' [নাজম: ১০]

কুরআন নিয়ে কাফেরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا۟ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِۦ

অর্থ: 'আমি আমার বান্দার উপর যা অবতীর্ণ করেছি যদি এটা নিয়ে তোমরা সন্দেহে থাকো, তবে পারলে এমন একটি সুরা বানিয়ে নিয়ে আসো।' [বাকারা: ২৩]

দেখা যাচ্ছে, এসব আয়াতের প্রত্যেকটি জায়গাতে রাসুলুল্লাহকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দা ও দাস হিসেবে পরিচিত করাচ্ছেন। কারণ, এটাতেই সম্মান ও মর্যাদা। ফলে এর মাধ্যমে সেসব সম্প্রদায়ের ভ্রান্তি উন্মোচিত হয়, যারা আল্লাহর রাসুলের ব্যাপারে চরম বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়ে তাঁকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। তাঁর ব্যাপারে এমন সব আকিদা রাখে, যা কেবল আল্লাহর জন্য রাখা যায়। আল্লাহর মতো তাঁকেও ডাকে। তাঁর ব্যাপারে এমন সব ক্ষমতা ও গুণাবলিতে বিশ্বাস করে, যা কেবল আল্লাহর গুণ। অথচ

আল্লাহ স্রষ্টা, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টি। আল্লাহর জন্য নির্ধারিত বিশেষ গুণগুলো (যেমন সৃষ্টি করা, জীবিত করা, গায়েব জানা, ইচ্ছা পূর্ণ করা ইত্যাদি) অন্যের ব্যাপারে বিশ্বাস করা—চাই তিনি রাসুলই হোন না কেন—সুস্পষ্ট কুফর। এটা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত জীবনবিধান ইসলাম নয়। এটা ঈসা আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত খ্রিষ্টধর্ম ও খ্রিষ্টানদের রীতি।[১] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন, 'তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না যেমনটা খ্রিষ্টানরা করেছে ঈসা ইবনে মারইয়ামের ক্ষেত্রে। আমি তো কেবল আল্লাহর বান্দা। তাই তোমরা (আমার ব্যাপারে) বলো, 'আল্লাহর বান্দা ও রাসুল!'[২]

নবি ও রাসুলের মাঝে পার্থক্য: প্রথমত নবি এবং রাসুল দুজনের প্রতিই ওহি অবতীর্ণ হয়। এদিক থেকে তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু অন্যান্য দিক থেকে নবি ও রাসুলের মাঝে পার্থক্য আছে। কুরআনে কারও কারও ব্যাপারে কেবল নবি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, আর কারও ব্যাপারে নবি ও রাসুল দুটোই ব্যবহার করা হয়েছে [মারইয়াম: ৫১]। কুরআনের আরও কিছু আয়াত দ্বারা নবি-রাসুলের পার্থক্য বোঝা যায় [হজ: ৫২]। একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নবিদের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। আর রাসুলদের সংখ্যা তিনশো তেরো বা চৌদ্দ জন।[৩] ফলে যারা বলে নবি ও রাসুলের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই, তাদের কথার উপর আপত্তি থাকে।[৪] তা হলে তাদের মাঝে পার্থক্য কী? কীভাবে নবি ও রাসুল নির্ণীত হবে?

এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহে সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই। ফলে উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত কোনো মত নেই। বরং বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে সমাধানের চেষ্টা করেছেন। নিচে আমরা উল্লেখযোগ্য মতামতগুলো উল্লেখ করব। তবে প্রথমে একটি সর্বসম্মত মূলনীতি মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক রাসুলই নবি। কিন্তু প্রত্যেক নবি রাসুল নন। যেমন নুহ, ইবরাহিম, মুসা, ঈসা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—তারা সবাই নবি ও রাসুল। কিন্তু আদম, হুদ, সালেহ, শুআইব, হারুন—তারা কেবল নবি; রাসুল নন।

---

১. সালেহ ফাওজান (৪৭)।
২. বুখারি (৩৪৪৫); মুসনাদে দারেমি (২৮২৬); মুসনাদে হুমাইদি (২৭)।
৩. মুসতাদরাকে হাকেম (৪১৮৮); সুনানে বাইহাকি কুবরা (১৭৭৮৪)।
৪. দেখুন: মিনাহুর রাওজিল আজহার, মোল্লা আলি কারি (৫৫)।

নবি রাসুলের পার্থক্য নিয়ে একদল আলিম মনে করেন, যিনি ওহি লাভ করেন এবং প্রচারের জন্য আদিষ্ট হন, তিনি নবি ও রাসুল দুটোই। আর যিনি প্রচারের (তাবলিগ) জন্য আদিষ্ট নন, তিনি কেবল নবি; রাসুল নন।[1] কিন্তু এ কথা সঠিক হতে পারে না। কারণ, নবুওত ও রিসালাতের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাবলিগ, নিজেকে সংশোধন নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ

অর্থ: 'সকল মানুষ এক জাতি ছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা নবিদের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করলেন।' [বাকারা: ২১৩]

সহিহ বুখারি ও মুসলিমে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন এমন অনেক নবি আসবেন, যার সঙ্গে একদল উম্মাহ থাকবে। কোনো নবির সঙ্গে এক-দুইজন থাকবে। আবার এমন নবিও আসবেন, যার সঙ্গে কেউ থাকবে না।'[2] এসব আয়াত ও হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, সকল নবি দাওয়াহ ও তাবলিগের কাজের জন্য আদিষ্ট এবং সেগুলো করেন।

আরেক দল আলিম মনে করেন, রাসুল হচ্ছেন যিনি নতুন শরিয়তের বা কিতাবের অধিকারী হন; আর নবি হচ্ছেন যিনি পূর্ববর্তী রাসুলের শরিয়তের বা কিতাবের অনুসরণ করেন;[3] আলাদা কোনো কিতাব বা শরিয়ত নিয়ে আসেন না। যেমন মুসা-পরবর্তী বনি ইসরাইলের নবিগণ। তারা সকলেই মানুষকে তাওরাতের দিকে দাওয়াত দিতেন এবং তাওরাতের আইন সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন হয়, দাউদ আলাইহিস সালাম তো জাবুর কিতাবের অধিকারী। তা হলে তো তিনি রাসুল হওয়ার কথা ছিল। তাই তারা বলেন, রাসুল হলেন যিনি আলাদা শরিয়তের অধিকারী; কিতাব এখানে মুখ্য নয়। ফলে যিনি আলাদা শরিয়ত নিয়ে আসবেন তিনি রাসুল, আর যিনি পূর্ববর্তী শরিয়তের অনুসরণ করবেন তিনি নবি; চাই তাঁর উপর আলাদা কিতাব নাজিল হোক বা না হোক। কারণ, সকল নবির উপরই ওহি অবতীর্ণ হয়, যা পূর্বে বলা হয়েছে। আর দাউদ আলাইহিস সালামের জাবুর কেবল আল্লাহর প্রশংসা ও দোয়া-মুনাজাত সংবলিত। তাতে আলাদা শরিয়ত ছিল না। যে কারণে তিনিও মুসা আলাইহিস

১. আল-মিনহাজ, হালিমি (১/২৩৯); ইবনে আবিল ইজ (১১৭); আকহাসারি (১৩৫-১৩৬); সালেহ ফাওজান (৪৮)।
২. বুখারি (৫৭৫২); (মুসলিম ২২০)।
৩. দেখুন: রুহুল মাআনি, আলুসি (৯/১৬৫); হারারি (৪৭)।

সালামের শরিয়তের অনুসরণ করতেন। ফলে কিতাবের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি নবি; রাসুল নন।[১]

তৃতীয় আরেক দল আলিম মনে করেন, নবি হচ্ছেন যিনি আগের রাসুলের উম্মাহর মাঝে (অথবা মুমিনদের মাঝে) প্রেরিত হন এবং দাওয়াতি কাজ করেন। আর রাসুল হচ্ছেন যিনি নতুন বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায়ের মাঝে (বা কাফের সম্প্রদায়ের মাঝে) দাওয়াতি কাজ করেন। কিতাব ও শরিয়ত এখানে মুখ্য নয়। নবি কিতাবের অধিকারী হতে পারেন, আবার রাসুলও আগের শরিয়তের অনুসারী হতে পারেন। ফলে দাউদ আলাইহিস সালাম নতুন কিতাবের অনুসারী হয়েও নবি। কারণ তিনি মুসা আলাইহিস সালামের উম্মাহর মাঝে (বা মুমিনদের মাঝে) কাজ করেছেন। অপর দিকে ইউসুফ আলাইহিস সালাম কিতাব ও শরিয়ত না থাকার পরও রাসুল। কারণ তিনি নতুন মুশরিক কওমের মাঝে দাওয়াতি কাজ করেছেন।[২]

অধমের কথা হলো, এগুলোর প্রত্যেকটিই ইজতিহাদি আলোচনা। দাউদ ও ইউসুফ আলাইহিস সালামের নবুওত বা রিসালাতের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে, সেগুলোও ইজতিহাদি। তা ছাড়া কুরআনে মাত্র কয়েকজন নবি-রাসুলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শত শত রাসুল ও হাজার হাজার নবির নাম উল্লেখ করা হয়নি। তাদের নবুওত, রিসালাত ও দাওয়াতের হালত কোনোকিছুই আমাদের জানানো হয়নি; এ কারণে নবি ও রাসুলের মাঝে চূড়ান্ত ও সন্দেহাতীত পার্থক্য টানাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমাদের এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকতে হবে। অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহে যার রাসুল হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাবে, তাঁকে আমরা রাসুল বলব; আর যার রাসুল হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাবে না, তাঁকে আমরা নবি বলব। সামগ্রিকভাবে নবি-রাসুলদের উপর নিজেদের মানদণ্ডে বানানো কোনো হুকুম আরোপ করব না।

নবি-রাসুলদের চেনার পদ্ধতি: অনেক সময়ই সংশয়বাদী ও নাস্তিকরা নবি-রাসুলদের ব্যাপারে মুসলমানদের সন্দেহে ফেলে দেয়। তাদের বক্তব্য হলো, আগেকার কালে কেউ নবি-রাসুল দাবি করলেই তো হয়ে যেত। সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার মানদণ্ড ছিল না। ফলে নবুওত কোনো চূড়ান্ত মাকাম হতে পারে না। তাদের এমন বক্তব্য অজ্ঞতাপ্রসূত। নতুবা নবুওতের দাবি তো এমন ব্যাপার, পৃথিবীতে যে-ই

১. দেখুন: তাফসিরে বাইজাবি (৪/৭৫)।
২. দেখুন: নবুওত, ইবনে তাইমিয়া (২/৭১৪)।

মিথ্যা নবুওতের দাবি করেছে, আল্লাহ তার প্রকৃত চেহারা মানুষের সামনে উন্মোচিত করে দিয়েছেন। কারণ, মানুষের মাঝেই আল্লাহ তায়ালা কিছু স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন যদ্দ্বারা মানুষ সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করতে পারে। পার্থিব জগতে মানুষ সাধারণ একটা মিথ্যা বললেও আজ হোক কাল হোক ধরা পড়ে যায়। সেখানে কেউ একজন নবি দাবি করে বছরের পর বছর আল্লাহর ব্যাপারে মানুষকে মিথ্যাচার করে যাবে আর ধরা পড়বে না, এটা সম্ভব? এ কারণে আমরা দেখতে পাই, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের লোকেরাই তাঁর প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান এনেছেন। কারণ, তারা সবাই তাঁর সততা, সত্যবাদিতা, আমানত ও নিষ্ঠা সম্পর্কে জানতেন। এ কারণে প্রথমবার ওহি আসার পরে যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঘরে ফিরে বলেন, 'আমার নিজের উপর ভয় হচ্ছে', তখন স্ত্রী খাদিজা রাজি. তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা কখনোই আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, সত্য কথা বলেন, দুর্বলকে সাহায্য করেন, মেহমানকে সম্মান করেন, নিঃস্বকে দান করেন, মানুষকে বিপদে-আপদে সহায়তা করেন।'[১]

উক্ত বক্তব্যে স্পষ্ট, খাদিজা রাজি. তাঁর ব্যাপারে একটুও পেরেশান ছিলেন না, বরং পর্বতসম আস্থা ছিল মঙ্গলজনক কিছু হবে। একইভাবে হাবশার বাদশাহ নাজাশির কাছে যখন কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই এটা সেই বাণী যা ঈসা আলাইহিস সালাম নিয়ে এসেছিলেন, একই উৎস থেকে উৎসারিত।'[২] ওয়ারাকা ইবনে নওফলকে যখন আল্লাহর রাসুলের কাছে ওহি আসার বিষয়গুলো জানানো হয়, তিনি বলেন, 'এ তো সেই ফেরেশতা যিনি মুসা আলাইহিস সালামের কাছেও এসেছিলেন।'[৩] রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে ইসলাম গ্রহণের আগে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অনেক কথা জিজ্ঞেস করেন, সবকিছু সঠিক উত্তর দেওয়ার পরে সম্রাট সুনিশ্চিত হন তিনি আল্লাহর রাসুল[৪] ফলে কারও নবি-রাসুল হওয়ার জন্য আশপাশের মানুষের আস্থাভরসা ও সত্যায়নই অনেক বড় প্রমাণ।

---

১. বুখারি (৩); মুসলিম (১৬০); মুসনাদে আহমদ (২৬৫০৫)।
২. সিরাতে ইবনে হিশাম (২/১৮০)।
৩. বুখারি (৩); মুসলিম (১৬০)।
৪. বুখারি (৭); মুসলিম (১৭৭৩); ইবনে হিব্বান (৬৫৫৫)।

এছাড়াও নবি-রাসুলের মুজিজা (অলৌকিক কর্মগুলো) তারা ছাড়া আর কেউ করতে পারে না। ফলে মুজিজাও নবুওতের একটি প্রমাণ এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ; এ কারণে কালামি ধারার আলিমগণ অমুসলিম এবং নাস্তিকদের বিপরীতে মুজিজার গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। কিন্তু বলা যায়, একপর্যায়ে এতে অতিরঞ্জন তৈরি হয়। তারা (যেমন ইমামুল হারামাইন জুয়াইনি) শুধু মুজিজাকেই নবুওতের প্রমাণ হিসেবে গণ্য করেন এবং এর জন্য অন্য প্রকারের প্রমাণগুলোও জোর করে মুজিজার অন্তর্ভুক্ত করেন।[১] বরং তাদের কেউ কেউ আরও আগে বেড়ে বলেন, মুজিজা ছাড়া রাসুলদের দাওয়াত উম্মতের উপর গ্রহণ করা আবশ্যক নয়।[২] এটা সঠিক কথা নয়; বরং কেবল দাওয়াত পৌঁছলেই তা গ্রহণ করা আবশ্যক; মুজিজা প্রকাশ আবশ্যক নয়। অনেক সাহাবি মুজিজা ছাড়াই ঈমান এনেছেন। অধিকাংশ কাফের মুজিজা দেখার পরেও ঈমান আনেনি।[৩]

খাতামুন নাবিয়্যিন বা সর্বশেষ নবি: আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সকল নবি ও রাসুলের দাওয়াতি মিশন ছিল ও সীমাবদ্ধ ও সাময়িক। অর্থাৎ প্রত্যেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হতেন। সেই সময় শেষ হলে নতুন যুগ ও নতুন সম্প্রদায়ের উপযোগী করে অন্য রাসুল পাঠানো হতো। আর অন্য রাসুল এলে আগের শরিয়ত রহিত হয়ে যেত। নতুন শরিয়ত অনুযায়ী মানুষ পথ চলত। কুরআনে তা এভাবে বলা হয়েছে:

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

অর্থ: 'আমি তোমাদের প্রত্যেককে শরিয়ত ও জীবনব্যবস্থা দিয়েছি।' [মায়িদা: ৪৮]

কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতি মিশন হলো স্থায়ী, কাল ও পাত্রের উর্ধ্বে। তাঁর দ্বীন ও রিসালাত ততদিন থাকবে, যতদিন পৃথিবী ও মানুষ থাকবে। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে ইসলামের অন্যতম একটি মৌলিক আকিদা হচ্ছে 'তিনি সর্বশেষ নবি' এ কথায় দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। কুরআন ও সুন্নাহর একাধিক জায়গায় এটা সুস্পষ্ট করা হয়েছে। ফলে এ নিয়ে কোনো ধরনের সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

---

১. সাইদ ফুদাহ (৪৬৯)।
২. গজনবি (৬৯); তুর্কিস্তানি (৮৭-৮৮); কওনবি (৪২); হারারি (৪৯)।
৩. ইবনে আবিল ইজ (১০৯-S১১৪)।

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ

অর্থ: 'মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো লোকের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবি।' [আহজাব: ৪০]

পাঠক, উক্ত আয়াতের প্রতি লক্ষ করলে কুরআনের অতি বিস্ময়কর অলংকারের এক উদাহরণ দেখতে পাবেন। খেয়াল করে দেখুন, আয়াতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবি বলা হয়েছে, শেষ রাসুল বলা হয়নি। কারণ, শেষ রাসুল বলা হলে অনেকের জন্য নবুওতের দাবি করার সুযোগ থেকে যেত। বলত, আমি রাসুল নই; নবি। কিন্তু যখন শেষ নবি বলা হলো, তখন রাসুলের দরজাও বন্ধ হয়ে গেল। কারণ রাসুল হওয়ার জন্য নবি হতে হয়। নবির ধারাবাহিকতা শেষ হওয়ার অর্থ রাসুলের ধারাবাহিকতাও শেষ!

হাদিসেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবি হওয়ার ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা এসেছে। একটি হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার ও আমার পূর্বের নবিদের উদাহরণ হচ্ছে একটি ঘরের মতো, যা খুব সুন্দর এবং পরিপূর্ণ করে বানানো হয়েছে। কিন্তু এক কোণে একটি ইট ফাঁকা রাখা হয়েছে। মানুষ ওই শূন্য জায়গাটা ছাড়া পুরো ঘরের সৌন্দর্য দেখে বিস্মিত হয় এবং বলে, 'যদি এখানের ইটটি থাকত!' আমিই হলাম সেই ইট। আমিই সর্বশেষ নবি।'[১] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য একটি হাদিসে বলেন, 'আমার অনেকগুলো নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মাদ; আমি আহমদ; আমি 'মাহি'; কুফর ধূলিসাৎকারী। আমি 'হাশির'—মানুষ আমার পরে/অনুসরণে হাশরে সমবেত হবে। আমি 'আকিব'—সর্বশেষ নবি; আমার পরে কোনো নবি নেই।'[২] আরেকটি বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার পরে আমার উম্মতের মাঝে ত্রিশজন মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের প্রত্যেকে দাবি করবে সে নবি; অথচ আমিই শেষ নবি। আমার পরে কোনো নবি নেই।'[৩] আরেকটি হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ছয়টি বিষয়ের মাধ্যমে আমাকে অন্যান্য নবির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে—আমাকে 'জাওয়ামিউল কালিম' তথা সংক্ষিপ্ত শব্দে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কথার শক্তি দেওয়া

---

১. বুখারি (৩৫৩৪); মুসলিম (২২৮৬); তিরমিজি (২৮৬২)।
২. বুখারি (৩৫৩২); মুসলিম (২৩৫৪); তিরমিজি (২৮৪০)।
৩. বুখারি (৩৬০৯, ৭১২১); মুসলিম (১৫৭)।

হয়েছে (অথবা কুরআন দেওয়া হয়েছে); দুশমনের হৃদয়ে আমার ভয় গেঁথে দেওয়া হয়েছে; আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনিমত) হালাল করা হয়েছে; ভূপৃষ্ঠের সকল জায়গা আমার জন্য পবিত্র ও সিজদার স্থানে পরিণত করা হয়েছে। আমাকে গোটা সৃষ্টিজগতের কাছে পাঠানো হয়েছে; আর আমার মাধ্যমে নবিদের ধারাবাহিকতা সম্পন্ন করা হয়েছ।'[১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ কুরআন ও সুন্নাহ কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। তাঁর আনীত দ্বীন ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক দেশ ও সময়ের জন্য উপযোগী। নতুন আর কোনো নবি কিংবা শরিয়তের দরকার নেই। ফলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে নবুওতের সকল দাবি বাতিল ও মিথ্যা পরিগণিত হবে। যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষ নবি হিসেবে বিশ্বাস করবে না, কিংবা তাঁর পরে অন্য কোনো ব্যক্তি নবুওত দাবি করবে, কিংবা কারও দাবি সত্যায়ন করবে, সে কাফের গণ্য হবে; ইসলাম থেকে চূড়ান্তরূপে বের হয়ে যাবে। এ জন্যই বর্তমানের কাদিয়ানি/আহমদিয়া সম্প্রদায় কাফের ও মুরতাদ। কারণ, নবুওতের মিথ্যা দাবিদার গোলাম আহমদ কাদিয়ানি কাফের। ফলে তাকে যে নবি হিসেবে বিশ্বাস করবে, তাঁর মূলনীতি অনুসরণ করবে, তাঁর দিকে নিজেকে সম্পৃক্ত করবে, তারাও কাফের (ব্যক্তিবিশেষের হুকুম ভিন্ন যা আমরা পরে আলোচনা করব)। মুসলমানদের কর্তব্য হবে এ কাফেরদের যথাসম্ভব প্রতিহত করা। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম থেকে শুরু করে যুগে যুগে মুসলমানগণ নবুওতের দাবিদার কাফের ও তাদের অনুসারীদের প্রতিহত করেছেন। প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে নেমেছেন। কাদিয়ানিদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত পৃথিবীর সকল মাজহাব-মানহাজের উলামায়ে কেরাম একমত।[২]

কারও মনে সন্দেহ হতে পারে, কিয়ামতের আগমুহূর্তে ঈসা আলাইহিস সালাম পুনরায় দুনিয়ায় আগমন করবেন; আর তিনি যেহেতু একজন নবি ও রাসুল, তা হলে রাসুলুল্লাহ শেষ নবি হলেন কী করে? তাঁর পরে তো ঈসা আলাইহিস সালাম আসছেন। এর উত্তর হলো, ঈসা আলাইহিস সালাম নবি ও রাসুল হিসেবেই একবার আগমন করেছেন। কিন্তু কিয়ামতের আগে তাঁর পুনরাগমন নবি-রাসুল হিসেবে হবে না, নতুন

১. মুসলিম (৫২৩); তিরমিজি (১৫৫৩) (৩/২১৩); ইবনে হিব্বান (২৩১৩); শরহু মুশকিলিল আসার (১০২৫)।
২. কাদিয়ানিদের ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন: ইকফারুল মুলহিদিন, আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি। 'আল-কাদিয়ানি ওয়াল কাদিয়ানিয়্যাহ, আবুল হাসান নদভি।

কোনো শরিয়ত নিয়েও আসবেন না। বরং তিনি নবি হওয়া সত্ত্বেও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের একজন মুজাদ্দিদ হিসেবে আগমন করবেন।[১]

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুত্তাকিদের ইমাম: কারণ জগতের সকল মুত্তাকি তাঁর অনুসরণ করেন, তাঁর দেখানো পথে চলেন, তাঁকে ইমাম মানেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে প্রেরিতই হয়েছেন যাতে মানুষ তাঁকে অনুসরণ করে। আর যে তাঁকে অনুসরণ করবে, সে মুত্তাকি হিসেবে গণ্য হবে। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

অর্থ: 'আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন; আল্লাহ মার্জনাকারী মহানুভব।' [আলে-ইমরান: ৩১]

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসুলদের নেতা: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সকল নবি ও রাসুলের সর্দার। কুরআনে এ ব্যাপারে সরাসরি এবং সুস্পষ্ট বক্তব্য না থাকলেও ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন: আল্লাহ তায়ালা কুরআনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকার ক্ষেত্রে অন্য সকল নবি থেকে আলাদা করেছেন। যেখানে অতীতের সকল নবিকে তিনি নাম ধরে ডেকেছেন, যেমন: 'হে নুহ' [হুদ: ৪৮], 'হে ইবরাহিম' [হুদ: ৭৬], 'হে মুসা' [ত্বহা: ১৭], 'হে ঈসা' [মায়িদা: ১১০] সেখানে রাসুলুল্লাহকে কুরআনে 'হে মুহাম্মাদ' কিংবা 'হে আহমদ' নামে ডাকেননি; বরং তাঁকে ডেকেছেন 'হে নবি' [তাওবা: ৭৩, তাহরীম: ৯, আহজাব: ৫৯], 'হে রাসুল' [মায়িদা: ৬৭] সম্বোধনে।[2] একইভাবে আল্লাহ তায়ালা যখন কুরআনে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পাঁচজন রাসুলের প্রসঙ্গ একসঙ্গে এনেছেন, বাকি চার জনের নামের ক্ষেত্রে সময়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেও রাসুলুল্লাহকে

---

১. সালেহ ফাওজান (৫১)।

২. এখানে অধম একটি বিষয়ে আলিম ও লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হলো, কুরআনে আল্লাহ কর্তৃক রাসুলুল্লাহকে সম্বোধন এবং তাঁর সম্পর্কিত আয়াতগুলো অনেককে 'তুমি', 'সে' ইত্যাদির মাধ্যমে অনুবাদ করতে দেখা যায়। যেমন قل এর অনুবাদ দেখা যায়, 'তুমি বলো', عبس এর অনুবাদ করতে দেখা যায় 'সে ভ্রু কুঁচকাল'; অথচ অনুবাদ হওয়া দরকার ছিল 'আপনি বলুন', 'তিনি ভ্রু কুঁচকালেন'। কারণ উপরের আয়াতগুলোতে আমরা দেখেছি, আল্লাহ তায়ালা কুরআনে রাসুলুল্লাহকে নাম ধরে ডাক না দিয়ে 'হে নবি', 'হে রাসুল' ইত্যাদি বলে ডাক দিয়েছেন। আর আল্লাহই আদবের সবচেয়ে বড় উপযুক্ত। সুতরাং এসব আয়াত অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাদেরও আদব প্রদর্শন করা উচিত।

উল্লেখ করেছেন সবার আগে, অথচ সময়ের হিসেবে তাঁর অবস্থান সবার পরে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

অর্থ: 'যখন আমি নবিদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম, আপনার কাছ থেকে এবং নুহ, ইবরাহিম, মুসা ও মরিয়ম তনয় ঈসার কাছ থেকে।' [আহজাব: ৭] এর মাধ্যমে অন্য সকল নবি-রাসুলের উপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়।[১]

একটি হাদিসে তিনি নিজেই বলেন, 'আমি কিয়ামতের দিন সকল আদম সন্তানের নেতা। সর্বপ্রথম আমার কবরই বিদীর্ণ হবে। আমি সর্বপ্রথম সুপারিশকারী, সর্বপ্রথম আমার সুপরিশ গ্রহণ করা হবে।'[২] শাফায়াত-সংক্রান্ত লম্বা হাদিসেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি কিয়ামতের দিন সকল মানুষের নেতা হব।'[৩] আরেকটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা ইসমাইল আলাইহিস সালামের সন্তানদের মাঝ থেকে কিনানাকে বাছাই করেছেন। কিনানা থেকে কুরাইশকে নির্বাচিত করেছেন। আর কুরাইশ থেকে বনু হাশিমকে বেছে নিয়েছেন। আর বনু হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন।'[৪]

সংশয় নিরসন: প্রশ্ন আসতে পারে, উপরের হাদিসগুলোতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে গোটা মানবজাতির নেতা ও সর্দার বলছেন, অথচ অন্য কিছু হাদিসে তিনি নিজেই তাঁকে অন্য নবিদের উপর শ্রেষ্ঠ বলতে নিষেধ করেছেন! যেমন: বুখারি ও মুসলিমের একটি বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, 'তোমরা আমাকে মুসার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলো না। কারণ, কিয়ামতের দিন যখন সকল মানুষ বেহুঁশ হয়ে যাবে, সর্বপ্রথম আমারই হুঁশ ফিরবে। কিন্তু হুঁশ আসার পরে আমি মুসা আলাইহিস সালামকে শক্তভাবে আরশ ধরে বসে থাকতে দেখতে পাব। আমার জানা নেই, তাঁর কি আমার আগে হুঁশ ফিরেছে, নাকি তিনি বেহুঁশই হননি!'[৫]

উলামায়ে কেরাম বিভিন্নভাবে এসব হাদিসের মাঝে সমন্বয় করেছেন:

---

১. তুর্কিস্তানি (৯১); আকহাসারি (১৩৬-১৩৭)।
২. মুসলিম (২২৭৮); তিরমিজি (৩১৪৮); ইবনে মাজা (৪৩০৮)।
৩. বুখারি (৪৭১২); মুসলিম (১৯৪); মুসনাদে আহমদ (৯৭৫৪)।
৪. মুসলিম (২২৭৬); তিরমিজি (৩৬০৬); তয়ালিসি (১১৪৫)।
৫. বুখারি (২৪৪১); মুসলিম (২৩৭৩); আবু দাউদ (৪৬৭১)।

এক. মুসা আলাইহিস সালামের উপরে তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলতে নিষেধ করার ভিন্ন কারণ রয়েছে। ঘটনার প্রেক্ষাপট মূলত এক ইহুদি ও মুসলিমের বিবাদ, যা হাদিসের প্রথমাংশেই রয়েছে। ইহুদি লোকটি বলেছিল, 'আল্লাহর শপথ, যিনি মুসাকে গোটা জগতের মাঝ থেকে মনোনীত করেছেন।' তখন মুসলিম ব্যক্তিটি তাকে থাপ্পড় দিয়ে বলে, 'আল্লাহর রাসুল জীবিত থাকতে এত বড় কথা আমাদের সামনে বলার সাহস কোথায় পেলে?' ইহুদি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিচার নিয়ে যায়। তখন তিনি রাগান্বিত হন এবং বলেন, নবিদের মাঝে একজনকে আরেকজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলো না।[১] কারণ, এখানে একজন নবিকে আরেকজন নবির উপর শরয়ি দলিলের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠ বলা হচ্ছিল না, বরং নিজের আবেগকে জয়ী করতে বলা হচ্ছিল। ফলে রাসুলুল্লাহ নিষেধ করেছেন। এটা শুধু এক্ষেত্রে নয়; জিহাদ-সহ অন্যান্য মূল্যবান ইবাদতও মানুষ যদি অবৈধ উদ্দেশ্যে কিংবা নেতিবাচক পদ্ধতিতে করে, তবে সেটা বিশুদ্ধ নয়। নতুবা মৌলিকভাবে এক নবির উপর অন্য নবির শ্রেষ্ঠত্ব বাস্তবসম্মত এবং সেটা বলাও জায়েজ। স্বয়ং কুরআনে আল্লাহ তায়ালা নবিদের মর্যাদার পার্থক্যের ঘোষণা করে বলেছেন,

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

অর্থ: 'এই রাসুলগণ আমি তাদের অনেককে অনেকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।' [বাকারা: ২৫৩] অন্যত্র বলেছেন,

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ

অর্থ: 'আমি কতক নবিকে কতক নবির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।' [ইসরা: ৫৫] সুতরাং অহংকারের ভিত্তিতে একজনকে আরেকজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলা বৈধ নয়; কিন্তু অহংকার ছাড়া বললে বৈধ।

দুই. অনেক আলিমের মতে, নির্দিষ্ট কোনো একজনকে নির্দিষ্ট আরেকজনের উপর শ্রেষ্ঠ বলা জায়েজ নয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে একজনকে একটি দলের উপর শ্রেষ্ঠ বলা যাবে, যেমনটা হাদিসে এসেছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে গোটা আদম সন্তানের মাঝে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। অপরদিকে মুসা আলাইহিস সালামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলতে নিষেধ করেছেন। এর রহস্য হচ্ছে, ব্যক্তিবিশেষকে অন্য ব্যক্তিবিশেষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বললে দ্বিতীয় জনকে ছোট করা হয়, কিন্তু সামগ্রিকভাবে

---

১. বুখারি (৩৪১৪); মুসলিম (২৩৭৩); মুসনাদে আহমাদ (১১৫৪১)।

শ্রেষ্ঠ বললে কাউকে ছোট করা হয় না। একটা বাস্তব উদাহরণ দেওয়া যাক! আপনি যদি আপনার জেলার কোনো লোককে বলেন, সে পুরো জেলার শ্রেষ্ঠ লেখক বা শিক্ষক। এটা অন্যদের খুব একটা গায়ে লাগবে না। কিন্তু আপনি যদি নির্দিষ্ট কাউকে বলেন, সে তোমার চেয়ে কিংবা অমুকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবে গায়ে লাগবে, মানুষ অপছন্দ করবে। কষ্ট পাবে। তাই হাদিসে সুনির্দিষ্টভাবে একজন নবিকে অন্য নবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলতে নিষেধ করা হয়েছে। এভাবেই বুঝতে হবে রাসুলুল্লাহর আরেকটি হাদিস, যেখানে তিনি তাঁকে এবং সকল মানুষকে ইউনুস আলাইহিস সালামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলতে নিষেধ করেছেন।[১] অথচ প্রকৃত পক্ষেই তিনি ইউনুস আলাইহিস সালামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

তিন. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের ব্যাপারে এসব কথা বলে গেছেন, কারণ তিনি সর্বশেষ নবি, তাঁর পরে কোনো নবি আসবে না, ওহি অবতীর্ণ হবে না। অন্যান্য নবির ব্যাপারে পরবর্তী নবিরা এসে প্রশংসা করেছেন, তাদের কথা বলেছেন, যেমনটা কুরআনে অতীতের বিভিন্ন নবি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু রাসুলের পরে যেহেতু আর কোনো নবি নেই, সুতরাং তিনি না বললে এগুলো আমাদের জানার উপায়ও নেই। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ব্যাপারে এসব বলে গেছেন। এ কারণেই তিনি এগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, 'এতে অহংকারের কিছু নেই।'[২] কারণ, তিনি গোটা সৃষ্টিজগতের মাঝে সবচেয়ে অহংকারমুক্ত মানুষ।[৩]

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বজগতের পালনকর্তার পরম বন্ধু: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পরম বন্ধু (হাবিব)। এটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই জানিয়েছেন। তিরমিজির একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ইবরাহিম খলিলুল্লাহ (আল্লাহর খলিল), মুসা নাজিয়্যুল্লাহ (আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথনকারী), ঈসা রুহুল্লাহ (আল্লাহর পক্ষ থেকে রুহ) আর আমি হাবিবুল্লাহ (আল্লাহর হাবিব)। এতে অহংকারের কিছু নেই।' হাদিসটিকে যদিও ইমাম তিরমিজি রাহি. 'গরিব' বলেছেন,[৪] ইবনে আবিল ইজ এটাকে

---

১. বুখারি (৩৩৯৫); মুসলিম (২৩৭৩)।
২. তিরমিজি (৩১৪৮); ইবনে মাজা (৪৩০৮)।
৩. ইবনে আবিল ইজ (১১৯-১২২)।
৪. তিরমিজি (৩৬১৬)।

'অপ্রমাণিত' বলেছেন।[১] সমকালীন কেউ কেউ এটাকে জয়িফ বলেছেন।[২] কিন্তু তিরমিজি ছাড়াও দারেমি[৩], মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা-সহ[৪] বিভিন্ন গ্রন্থে[৫] ভিন্ন ভিন্ন সনদে হাদিসটি এসেছে। ফলে এটাকে অপ্রমাণিত বলা যায় না। ইবনে আবিল ইজ এটাকে মূলত এক শ্রেণির সুফিদের বক্তব্য (ইবরাহিম আলাইহিস সালাম খলিলুল্লাহ আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাবিবুল্লাহ) বাতিল করার জন্য অপ্রমাণিত বলেছেন। এ কারণে এ ধারার সমকালীন আলিমগণও ইমাম তহাবির 'হাবিব' শব্দ চয়নের উপর আপত্তি করেন।[৬] কিন্তু এমন আপত্তি নিষ্প্রয়োজন। কারণ, দুটি শব্দের অর্থই বন্ধু। হ্যাঁ, 'খলিল'-এর গভীরতা ও মর্যাদা 'হাবিব'-এর চেয়ে উঁচু। কিন্তু ইমাম তহাবি তো 'খলিল' নয় বলেননি।[৭] তাই দুটোর মাঝে কোনো বিরোধ নেই। বিখ্যাত তাবেয়ি মাসরুক যখনই আয়েশা রাজি. থেকে কোনো হাদিস বর্ণনা করতেন তখন তাঁকে حبيبة حبيب الله তথা 'আল্লাহর প্রিয়ের প্রিয়তমা' হিসেবে আখ্যায়িত করতেন।[৮] সুতরাং রাসুলুল্লাহকে 'হাবিব' বলার উপর আপত্তি করা যৌক্তিক নয়। হাবিব-সংক্রান্ত হাদিস উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। আর খলিল-সম্পর্কিত হাদিস সিরাত ও সুন্নাহর গ্রন্থগুলোতে প্রসিদ্ধ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা যেভাবে ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে খলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সেভাবে আমাকেও তিনি খলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাই জগতের কারও সঙ্গে আমার 'খলিল'-এর সম্পর্ক নেই। যদি আমি কাউকে 'খলিল' হিসেবে গ্রহণ করতাম, তা হলে আবু বকরকে গ্রহণ করতাম।'[৯]

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বনবি: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল আরবদের জন্য নন, গোটা বিশ্বের কাছে নবি হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। ফলে আরব-অনারব, সাদা-কালো, এশিয়ান-আফ্রিকান পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য তাঁর উপর ঈমান আবশ্যক। এটা কুরআন-সুন্নাহে সুস্পষ্টভাবে লিখিত

---

১. ইবনে আবিল ইজ (১২৩)।
২. জয়িফু সুনানিত তিরমিজি, আলবানি (৪৮৩)।
৩. মুসনাদে দারেমি (৪৮, ৫৫)।
৪. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩২৪৬২)।
৫. আল-মাতালিবুল আলিয়াহ (৪১৭৯); বাহরুল ফাওয়ায়িদ, কালাবাজি (২৭৬)।
৬. সালেহ ফাওজান (৫১)।
৭. তুর্কিস্তানি (৯২); আকহাসারি (১৩৭)।
৮. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (২৭৫); (মুসনাদে আহমদ ২৬৬৮৪)।
৯. মুসলিম (৫৩২); ইবনে হিব্বান (৬৪২৫); আল-মুজামুল কাবির (১৬৮৬)।

ইসলামের মৌলিক আকিদাগুলোর একটি। যে ব্যক্তি এর উপর ঈমান আনবে না, সে মুমিন থাকবে না। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা অস্বীকারকারী হিসেবে ঈমানের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَمَآ اَرۡسَلۡنٰکَ اِلَّا کَآفَّۃً لِّلنَّاسِ بَشِیۡرًا وَّ نَذِیۡرًا وَّ لٰکِنَّ اَکۡثَرَ النَّاسِ لَا یَعۡلَمُوۡنَ.

অর্থ: 'আমি আপনাকে গোটা মানবজাতির কাছে সুসংবাদদানকারী এবং সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।' [সাবা: ২৮] অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلۡ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنِّیۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ اِلَیۡکُمۡ جَمِیۡعًا

অর্থ: 'আপনি বলে দিন, হে লোকসকল, আমি তোমাদের সকলের কাছে রাসুল হিসেবে এসেছি।' [আরাফ: ১৫৮] অন্যত্র বলেন,

وَ اُوۡحِیَ اِلَیَّ هٰذَا الۡقُرۡاٰنُ لِاُنۡذِرَکُمۡ بِهٖ وَمَنۡۢ بَلَغَ

অর্থ: '(আপনি বলুন) এই কুরআন আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে আমি তোমাদের এবং যাদের কাছে (এই পয়গাম) পৌঁছায়, তাদের সবাইকে সতর্ক করি।' [আনআম: ১৯] অন্য এক আয়াতে বলেন,

وَ اَرۡسَلۡنٰکَ لِلنَّاسِ رَسُوۡلًا ؕ وَ کَفٰی بِاللّٰهِ شَهِیۡدًا

অর্থ: 'আমি মানবজাতির কাছে আপনাকে রাসুল হিসেবে পাঠিয়েছি। আল্লাহই এ ব্যাপারে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।' [নিসা: ৭৯] আরেক আয়াতে তিনি বলেন,

تَبٰرَکَ الَّذِیۡ نَزَّلَ الۡفُرۡقَانَ عَلٰی عَبۡدِهٖ لِیَکُوۡنَ لِلۡعٰلَمِیۡنَ نَذِیۡرَا

অর্থ: 'বরকতময় সেই সত্তা, যিনি তাঁর বান্দার উপর ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তা গোটা জগদ্বাসীর জন্য সতর্ককারী হয়।' [ফুরকান:১]

কুরআনের এসব আয়াতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে গোটা মানবজাতির কাছে প্রেরিত হয়েছেন, তা সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও স্পষ্টভাবে বারবার তাঁর বিশ্বব্যাপী রিসালাতের কথা তুলে ধরেছেন, যেমনটা একটু আগে আমরা বুখারি ও মুসলিমের হাদিস উল্লেখ করেছি। সেখানে তিনি বলেছেন, 'আমার আগে সকল নবি-রাসুলকে স্বীয় গোত্রের নিকট পাঠানো হতো, আর আমাকে পাঠানো হয়েছে সকল

মানুষের নিকট।'[১] সহিহ মুসলিমে আরও একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যেকোনো ইহুদি কিংবা খ্রিষ্টান যদি আমার কথা শুনতে পায়, তদুপরি আমার উপর ঈমান না আনে, তবে সে জাহান্নামে যাবে।'[২] তা ছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাজেও বিশ্বনবি হওয়ার প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি কেবল আরবদের কাছে নন; মিশরের শাসক (মুকাওকিস), আবিসিনিয়ার রাজা (নাজাশি), রোম সম্রাট (কায়সার) ও পারস্য সম্রাট (কিসরার) কাছে দাওয়াতি পত্র প্রেরণ করেছেন, তাদের সবাইকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছেন। যদি তিনি কেবল আরবদের নবি হতেন, রোম কিংবা পারস্য সম্রাটদের কেন ইসলাম গ্রহণ করতে বলবেন?[৩]

বরং কেবল মানবজাতি নয়; তিনি জিনদের কাছেও নবি হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। কুরআনে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ তায়ালা সেটা উল্লেখ করেছেন। জিনদের কাছে রাসুলের দাওয়াত পৌঁছানোর ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ . قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ . يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ .

অর্থ: 'যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কুরআন পাঠ শুনছিল। তারা যখন কুরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হলো, তখন পরস্পর বলল, চুপ থাকো। অতঃপর যখন পাঠ সমাপ্ত হলো, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল। তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মুসার পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের সত্যায়ন করে, সত্য ধর্ম ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি তোমাদের গুনাহ মার্জনা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক আজাব থেকে মুক্তি দিবেন।' [আহকাফ: ২৯-৩১]

---

১. মুসলিম (৫২৩); তিরমিজি (১৫৫৩) (৩/২১৩); শরহু মুশকিলিল আসার (১০২৫)।
২. মুসলিম (১৫৩); সুনানে সাঈদ ইবনে মানসুর (১০৮৪); বাজ্জার (৩০৫০); তয়ালিসি (৫১১)।
৩. এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন: বুখারি (৬৪, ২৯৩৬, ২৯৩৮, ২৯৪০); মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩৭৭৮৩); ইবনে হিব্বান (৬৫৫৫); ইবনে আবিল ইজ (১২৬)।

এখানে 'আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী' বলতে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝিয়েছে। অপর একটি আয়াতে এসেছে,

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا.

অর্থ: 'বলুন, আমার প্রতি ওহি নাজিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কুরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছে, আমরা বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি, যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরিক করব না। [জিন: ১-২]

তা ছাড়া সুরা আর রহমানে আল্লাহ তায়ালা বারবার মানুষ ও জিন উভয় জাতিকেই সম্বোধন করেছেন। এর মাধ্যমেও রাসুলের রিসালাত মানব-দানব সবার জন্য বোঝা যায়।[১]

অতীতে ইহুদি-খ্রিষ্টানরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশ্বনবি হওয়ার কথা অস্বীকার করত। তারা বলত, তিনি কেবল আরবদের নবি; সবার নন। কুরআন-সুন্নাহে নবিজির রিসালাত বিশ্বব্যাপী হওয়ার এত সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ থাকার পরেও তারা এগুলো মূলত অস্বীকার করত যাতে তাঁকে নবি হিসেবে মেনে নিতে না হয়। অপরদিকে তাঁর নবুওতকে পুরোপুরি অস্বীকারও করত না। কারণ, তারা তখন ইসলামি সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। ফলে নবুওতকে পুরোপুরি অস্বীকার করা ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তাই অস্বীকার না করে নিজেদের পিঠ রক্ষার জন্য এমন কৌশল অবলম্বন করে।[২] আজ পৃথিবীর অবস্থা আরও ভয়াবহ। এখন অনেক ইসলামি নামধারী সেকুলারই রাসুলের প্রতি বিদ্বেষ রাখে, তাঁর আনীত জীবন-ব্যবস্থাকে তাদের স্থানীয় শিরকি কৃষ্টি-কালচার, চেতনা ও সংস্কৃতির জন্য বিপজ্জনক মনে করে। এ কারণে তারা কথায় কথায় 'আরবের নবি' 'আরবদের সংস্কৃতি' এসব শব্দ ব্যবহার করে। তারা বলতে চায়, তিনি আরব জাতির মানুষ, আরবদের কাছে প্রেরিত হয়েছেন, তাঁর আনীত ধর্ম আরবদের জন্য প্রযোজ্য, আরবদের সংস্কৃতির উপযোগী। বাঙালি জাতির মন ও বাঙালি আবহমান সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলাম যায় না! প্রবৃত্তিপূজারী এসব লোক এই কুফরি কথাগুলো স্পষ্টভাবে বলতে সাহস পায় না। সুযোগ পেলে বলে দিত। তাই মুসলমানদের এসব

---

১. তুর্কিস্তানি (৯৪); আকহাসারি (১৩৮)।
২. হারারি (৫৪)।

ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোটা মানবজাতির নবি ও রাসুল। তাঁর আনীত দ্বীন ইসলাম ছাড়া পৃথিবীতে কোনো সত্য ও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ধর্ম নেই। বাঙালি সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, কালচার, ঐতিহ্য—যা-কিছু আছে, ইসলামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে সেগুলো আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য, আর যা ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, সেগুলো আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামই আমাদের দ্বীন। ইসলাম আমাদের সভ্যতা। ইসলামের সংস্কৃতিই আমাদের সংস্কৃতি। কারণ, আমরা মুসলিম (আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী)।

নুর-নবি নন, নুর নিয়ে এসেছেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা হিদায়াতের আলোকবর্তিকা-স্বরূপ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। যে গ্রন্থ, দ্বীন ও পয়গাম তিনি নিয়ে এসেছেন, তা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যায়, গোমরাহি থেকে হিদায়াতের রাজপথের সন্ধান দেয়। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا . وَّدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

অর্থ: 'হে নবি, আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। [আহজাব: ৪৫-৪৬]

দেখা যাচ্ছে ইমাম তহাবি রাহি. এখানে কুরআনের অনুসরণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন ও হিদায়াতের আলো, শরিয়ত নিয়ে এসেছেন সেটা বুঝিয়েছেন।[১] ফলে এখান থেকে 'নুর-নবি' কিংবা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুরের তৈরি—এমন কোনো ভ্রান্ত মতবাদ বোঝার সুযোগ নেই। কুরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۬ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ.

অর্থ: 'হে আহলে কিতাব, তোমাদের কাছে আমার রাসুল আগমন করেছেন! কিতাবের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করতে তিনি তার মধ্য থেকে অনেক বিষয়

১. গজনবি (৭৩)।

প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় মার্জনা করেন। তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নুর ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে।' [মায়িদা: ১৫]

কুরআনের এই আয়াতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নুর হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ফলে অনেকে ভুল বুঝে রাসুলুল্লাহকে 'নুরে মুজাসসাম' তথা দৈহিকভাবে নুরের তৈরি মনে করেছে। অথচ এটা গলদ আকিদা। সালাফের কোনো যুগে কেউ এমন আকিদার কথা ভাবেননি। ইমাম তহাবির সমকালীন বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম তাবারি (মৃ. ৩১০ হি.) বলেন, 'এখানে নুর দ্বারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্দেশ্য। আল্লাহ তার মাধ্যমে হককে আলোকিত করেছেন; ইসলামকে বিজয়ী করেছেন; শিরকের অন্ধকার দূরীভূত করেছেন। ফলে যে ব্যক্তি তার মাধ্যমে হকের আলো গ্রহণ করতে চায়, তার জন্য তিনি নুর। তার আলোতেই হকের আলো...।'[১]

বরং কুরআনের ভাষ্যমতে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মতোই রক্ত-মাংস-অস্থির একজন মানুষ। একজন সাধারণ মানুষের মতোই তিনি পিতার ঔরসে মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। সবাই যেভাবে জন্ম নেয়, সেভাবে জন্ম নিয়েছেন। অন্য সকল মানুষের মতো তারও শারীরিক চাহিদা, জটিলতা ছিল। তিনি অসুস্থ হতেন, ব্যথা অনুভব করতেন। জন্মের মতো তিনি মৃত্যুর স্বাদও গ্রহণ করেছেন। ফলে মানুষ হিসেবে তিনি সবার চেয়ে আলাদা নয়। হ্যাঁ, তাঁর ঘাম, থুতু ইত্যাদি নির্মল, পবিত্র ও বরকতপূর্ণ ছিল। কিন্তু সেগুলো সুন্নাহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সত্য এবং তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেমন: নবুওত, রিসালাত, বেলায়াত ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যেও তিনি আমাদের চেয়ে আলাদা, গোটা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।[২] কিন্তু তাই বলে তাঁকে 'মনুষ্য'-এর উর্ধ্বে কল্পনা করা যাবে না। কুরআনে এসেছে,

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

অর্থ: 'আপনি বলুন, আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। তবে আমার কাছে ওহি আসে যে, একমাত্র তোমাদের ইলাহই একক ইলাহ।' [কাহাফ: ১১০]

---

১. তাফসিরে তাবারি (১০/১৪৩)।
২. ইমদাদুল আহকাম (১/১৩২)।

অন্য আয়াতে এসেছে,

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ.

অর্থ: 'আপনি বলুন, আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ; আমার কাছে ওহি আসে যে, তোমাদের ইলাহ হলেন একজন ইলাহ।' [ফুসসিলাত: ৬]

কিন্তু কিছু মানুষ এটুকুতে সন্তুষ্ট থাকেনি। বৌদ্ধরা বুদ্ধকে নিয়ে যা করেছে, ইহুদিরা উজাইর এবং খ্রিষ্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামকে নিয়ে যা করেছে, তারাও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে সে পথে হেঁটেছে। খ্রিষ্টানরা যেমন মানব নবি ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র কল্পনা করেছে, তিন খোদার একজন সাব্যস্ত করেছে, হিন্দুরা যেমন রাম, কৃষ্ণ-সহ বিভিন্ন ব্যক্তিকে পৃথিবীতে তাদের ঈশ্বরের অবতার কল্পনা করেছে, তারাও রাসুলকে মানুষের পর্যায়ে না রেখে সেভাবে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়েছে। কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে রাসুলুল্লাহর বাশারিয়্যাত সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতকে অপব্যাখ্যার মাধ্যমে, জাল ও বানোয়াট হাদিসের দোহাই দিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে রাসুলুল্লাহকে অতিমানব বানানোর চেষ্টা করেছে। তারা তাকে বাশার (মানুষ) নন, নুরের তৈরি বলেছে; তাঁর ছায়া নেই বলেছে। অথচ রাসুলুল্লাহর সেগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি রক্ত-মাংসের মানুষ হয়েই গোটা সৃষ্টির সর্বোত্তম। নুরের সৃষ্টি হওয়ার মাঝে আলাদা বিশেষত্ব নেই। রাসুলুল্লাহ মাটির মানুষ হয়েই নুরের ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম। ফলে তাকে জোর করে নুর বানাতে হবে কেন? বরং কেবল রাসুল নন; অন্যান্য নবি ও পুণ্যবান মানুষও নুরের তৈরি অনেক ফেরেশতার চেয়ে উত্তম। হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে ফেরেশতারা আল্লাহর মর্যাদাবান সৃষ্টি। কিন্তু আল্লাহ তাদের মানুষের সেবায় নিযুক্ত করেছেন। মানুষের সুরক্ষায় নিয়োজিত করেছেন। ফলে শ্রেষ্ঠ হওয়ার মাপকাঠি কীসের তৈরি তা নয়; ছায়া না থাকার মাঝেও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং সেগুলো প্রমাণিতও নয়। বরং তাকওয়া ও আল্লাহর আনুগত্যই শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড। হ্যাঁ যদি কেউ রাসুলুল্লাহকে নুরের তৈরি বলে, তাঁকে ছায়াহীন বলে, আমরা তাকে কাফের বলি না; কিন্তু এসব অতিরঞ্জন এখানেই শেষ হয় না; বরং অতিরঞ্জনের শুরুটা এখান থেকেই। এগুলোই পরবর্তী সময়ে রাসুলুল্লাহকে 'হাজির-নাজির' মনে করা, তাঁর গায়েব জানা, তাঁর কবরে বসেও প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারার

সক্ষমতার আকিদা রাখা, আল্লাহকে বাদ দিয়ে রাসুলুল্লাহর ইবাদত এবং সবশেষে মানুষকে কবরপূজা-সহ বিভিন্ন কুফরি আকিদা ও কুফরি কাজে নিমজ্জিত করে।[১]

এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক হাদিসে উম্মতকে তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। এক হাদিসে তিনি বলেন, 'হে লোকসকল, তোমাদের শয়তান যেন ধোঁকায় না ফেলে। আমি আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদ। আল্লাহর শপথ! আমি চাই না যে, আল্লাহ আমাকে যতটুকু উঁচু মর্যাদা দিয়েছেন, তোমরা আমাকে তারচেয়ে উপরে ওঠাবে!'[২] অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে গেছেন, 'তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না, যেমনটা খ্রিষ্টানরা করেছে ঈসা ইবনে মারইয়ামের ক্ষেত্রে। আমি তো কেবল আল্লাহর বান্দা। তাই তোমরা (আমার ব্যাপারে) বলো, 'আল্লাহর বান্দা ও রাসুল!'[৩]

তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে সমাজের একদল লোক যেমন বাড়াবাড়িতে লিপ্ত, তেমনই আরেক দল লোক বেয়াদবিতে লিপ্ত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে তাদের শব্দচয়ন ও মুখের ভাষা শোভনীয় নয়; যেন সাধারণ কোনো মানুষ কিংবা মনীষীর ব্যাপারে তারা কথা বলছেন। তাকে নিজেদের মতো সাধারণ মানুষ কল্পনা করে তাঁর শানে অমূলক শব্দ ব্যবহার করছেন। এটা সাহাবা এবং সালাফের আদর্শ নয়। সালাফের আদর্শ দুই প্রান্তিকতার মাঝামাঝি মধ্যমপন্থা গ্রহণ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ ছিলেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু আমাদের মতো মানুষ নন, তিনি মহামানব।

---

১. বিস্তারিত দেখতে ফাতাওয়ায়ে রশিদিয়া (২৪১); কিফায়াতুল মুফতি (১/৮০-৮২, ৮৫-৮৬); ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া (১/৫১৩-৫১৭); আহসানুল ফাতাওয়া (১/৫৬-৫৭)।
২. সুনানে কুবরা, নাসায়ি (১০০০৬); মুসনাদে আহমদ (১২৭৪৬)।
৩. বুখারি (৩৪৪৫); মুসনাদে দারেমি (২৮২৬); মুসনাদে হুমাইদি (২৭)।

وَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللهِ، مِنْهُ بَدَا بِلاَ كَيْفِيَّةٍ قَوْلاً، وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا، وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا، وَأَيْقَنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ، فَمَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ، وَقَدْ ذَمَّهُ اللهُ وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ بِسَقَرَ، حَيْثُ قَالَ تَعَالَى: {سَأُصۡلِيهِ سَقَرَ ٢٦} فَلَمَّا أَوْعَدَ اللهُ بِسَقَرَ لِمَنْ قَالَ: {إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا قَوۡلُ ٱلۡبَشَرِ ٢٥} عَلِمْنَا وَأَيْقَنَّا أَنَّهُ قَوْلُ خَالِقِ الْبَشَرِ، وَلاَ يُشْبِهُ قَوْلَ الْبَشَرِ، وَمَنْ وَصَفَ اللهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ، فَمَنْ أَبْصَرَ هَذَا اعْتَبَرَ، وَعَنْ مِثْلِ قَوْلِ الْكُفَّارِ انْزَجَرَ، وَعَلِمَ أَنَّهُ بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ.

আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি, কুরআন আল্লাহর কালাম। এর উৎস আল্লাহ তায়ালার ধরনহীন 'কথা'। এটা তিনি তাঁর রাসুলের উপর ওহি হিসেবে পাঠিয়েছেন। মুমিনগণ এটা হক হিসেবে সত্যায়ন করেছে। এটাকে প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর কথা হিসেবে দৃঢ় বিশ্বাস করেছে। এটা সৃষ্টির কথার মতো সৃষ্ট নয়। সুতরাং যদি কেউ মনে করে কুরআন মানুষের কথা, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা এমন ব্যক্তির নিন্দা-ভর্ৎসনা করেছেন। তাকে জাহান্নামের হুমকি দিয়েছেন, যেমনটি কুরআনে তিনি বলেছেন, 'আমি তাকে সাকারে (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করব।' সুতরাং কুরআনকে 'এটা তো কেবল মানুষের কথা' সাব্যস্তকারীকে আল্লাহ তায়ালা যখন জাহান্নামে নিক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, আমরা নিশ্চিতরূপে জানতে পারলাম, কুরআন মানুষের স্রষ্টার কথা, মানুষের কথার সঙ্গে এর সাদৃশ্য নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর মানবীয় কোনো গুণ বা বিশেষত্ব আরোপ করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। সুতরাং চক্ষুষ্মান ব্যক্তির কর্তব্য হলো এটা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা। আল্লাহর ব্যাপারে কাফেরদের মতো বক্তব্য দেওয়া থেকে বিরত থাকা। নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা, আল্লাহ তায়ালা তাঁর গুণাবলিতে মানুষের মতো নন।

ব্যাখ্যা

কুরআন-সম্পর্কিত আকিদা

কুরআন আল্লাহর কালাম: কুরআন আল্লাহ তায়ালার কালাম তথা বাণী। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ.

অর্থ: 'আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে **আল্লাহর কালাম** শুনতে পায়। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। এটি এ জন্য যে, এরা জ্ঞান রাখে না।' [তাওবা: ৬]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ

অর্থ: 'তারা আল্লাহর কথাকে পালটে দিতে চায়।' [ফাতহ: ১৫]

কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ। আল্লাহ তায়ালা লাওহে মাহফুজ থেকে ফেরেশতা জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই গ্রন্থ দীর্ঘ ২৩ বছরে ধীরে ধীরে প্রয়োজন অনুপাতে নাজিল করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ.

অর্থ: 'এটা আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে রুহুল কুদুস (জিবরাইল) সত্য-সহ নাজিল করেছেন।' [নাহল: ১০২]

আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত এটাকে সুরক্ষিত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

অর্থ: 'নিশ্চয় আমিই এই উপদেশগ্রন্থ নাজিল করেছি, আর নিশ্চয় আমিই এর সংরক্ষণকারী।' [হিজর: ৯]

এতে মানবজীবনের সকল প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান ও দিকনির্দেশনার মূলনীতি বলে দেওয়া হয়েছে:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

অর্থ: 'আমি আপনার প্রতি প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনাস্বরূপ গ্রন্থ নাজিল করেছি'। [নাহল: ৮৯]

ফলে প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জাতির জন্য উপযোগী ও শ্রেষ্ঠ জীবন-সংবিধান এই কুরআন। পৃথিবীতে একমাত্র গ্রন্থ এটিই, যা সরাসরি আল্লাহ তায়ালার বাণী, যেভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি হিসেবে রাসুলুল্লাহর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, হুবহু সেভাবে আজও সংরক্ষিত আছে এবং চিরকাল থাকবে।

পাঠক, খেয়াল করলে দেখবেন, উপরে আমরা কুরআন-কেন্দ্রিক যে আকিদা উল্লেখ করেছি, এটাই সকল মুসলমানের আকিদা এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রায়োগিক আকিদা। অপরদিকে ইমাম তহাবি কুরআন-বিষয়ে যেসব আকিদার আলোচনা করেছেন, সেটা অনেকটা তাত্ত্বিক আলোচনা, যা বর্তমান সময়ের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট নয়। এ কারণে অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, এসব আলোচনার প্রয়োজন কী? 'কুরআন সৃষ্টি নয়, কিংবা সৃষ্টির কথার মতো নয়' এসব আলোচনার উপকারিতা কী?

কুরআন নিয়ে বিতর্ক: এটা বোঝার জন্য আমাদের একটু পিছনে যেতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িদের প্রথম যুগ পর্যন্ত কুরআন-কেন্দ্রিক মুসলমানদের আকিদা ছিল এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ কুরআন ওহি এবং আল্লাহর কালাম। কিন্তু এর পর অন্যান্য সভ্যতা ও দর্শনের সঙ্গে মুসলমানদের সংস্পর্শের ফলে অনেক বহিরাগত চিন্তাধারা মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে। কুরআন-কেন্দ্রিক আকিদার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি দেখা যায়। এটা শুরু হয় মূলত জাদ ইবনে দিরহাম, জাহম ইবনে সফওয়ান, বিশর মারিসি প্রমুখ জাহমিয়্যাদের হাতে। তারা কুরআনকে 'আল্লাহর কালাম' মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং একে 'মাখলুক' (তথা সৃষ্ট) আখ্যা দেয়। ইমামগণ এটার খণ্ডনে বক্তব্য দেন, মানুষকে সতর্ক করেন। কিন্তু এই মুসিবত অব্যাহত থাকে। বিশেষত হিজরি তৃতীয় শতকে মুতাজিলাদের হাতে কুরআন-কেন্দ্রিক বিভ্রান্তি তুঙ্গে পৌঁছে যায়। এবারও আহলে সুন্নাতের ইমামগণ প্রতিবাদ করেন। কিন্তু মুতাজিলারা দমে যায় না। ধীরে ধীরে একপর্যায়ে মুসলিম জাহানের শাসক খলিফাকেও এই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে ফেলে। তাকে

তাদের ভ্রান্ত আকিদার অনুসারী ও প্রচারকে পরিণত করে। এভাবে একদিকে মুতাজিলা ও শাসক সম্প্রদায়, অপরদিকে হকপন্থি উলামায়ে কেরামের মাঝে কুরআন নিয়ে ভীষণ মতভেদ তৈরি হয়। প্রশাসনের চাপে উলামায়ে কেরামের কণ্ঠরোধ করা হয়। অনেকে চাপের মুখে পিছু হটেন, অনেকে জেল-জুলুমের সামনেও হকের আওয়াজ বুলন্দ রাখেন, যা ইতিহাসে 'মিহনায়ে খালকে কুরআন' নামে প্রসিদ্ধ। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহি. ছিলেন তখন কুরআন-সুরক্ষা আন্দোলনের মধ্যমণি। ফলে ইতিহাসে তিনি 'আহলে সুন্নাতের ইমাম' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সে সময়ে কুরআন-কেন্দ্রিক আরও অনেক ধারা-উপধারা তৈরি হয়। কখনও ভয়ে কখনও লোভে, কিংবা কখনও অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কুরআন-কেন্দ্রিক বিভিন্ন বক্তব্য ও মতাদর্শ সামনে আসতে থাকে। অবশেষে খলিফা মামুন, মুতাসিম ও ওয়াসিক এবং মুতাজিলাদের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের বিদায়ের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এই ফিতনার আগুন কমতে থাকে। বিজয় হয় সত্যের, মিথ্যার হয় পরাজয়। 'কুরআন আল্লাহর কালাম, সৃষ্ট নয়' এই আকিদাই মুসলিম উম্মাহর একমাত্র ও প্রশ্নাতীত আকিদায় পরিণত হয়।

ইমাম তহাবি রাহি. ছিলেন সেই তৃতীয় শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মানুষ। ফলে তাঁর যুগেও কুরআন-কেন্দ্রিক বিতর্ক কম-বেশি অব্যাহত ছিল। এ কারণে তিনি এ ব্যাপারে তুলনামূলক একটু খুলেই কথা বলেছেন। শুধু ইমাম তহাবি কিংবা আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ নয়; আকিদার উপর লেখা সকল গ্রন্থে এই বিষয়ে কম-বেশ আলোচনা করা হয়েছে। এর কারণ কুরআনি আকিদাকেন্দ্রিক এবং আল্লাহর 'সিফাতে কালাম'-কেন্দ্রিক সেই প্রাচীন তাত্ত্বিক বিচ্যুতি। তবে বর্তমানে যেহেতু সাধারণ মুসলমান এবং উলামায়ে কেরামের সকল মানহাজ ও ধারা নির্বিশেষে কুরআনকে আল্লাহর কালাম হিসেবে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করে, ফলে কুরআন-কেন্দ্রিক এই তাত্ত্বিক আলোচনা ততটা প্রয়োজনীয় নয়। তথাপি আকিদাগত এই বিচ্যুতির কথা যেহেতু একজন সচেতন মুসলিমের জানা উচিত এবং নতুনভাবে কখনও এ ধরনের বিচ্যুতি আবারও প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব নয়, তাই এ বিষয়ে আমরা সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করব; যাতে অপ্রয়োজনীয় ও অতিরঞ্জিত তাত্ত্বিক আলোচনায় সময় নষ্ট না হয়, অপরদিকে প্রয়োজনীয় আলোচনা থেকেও বঞ্চিত না থাকা হয়।

আল্লাহ তায়ালার 'কালাম' বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিভিন্ন যুগে একাধিক ধারা-উপধারার আবির্ভাব ঘটেছে। জরুরি নয় যে, তারা সবাই আহলে সুন্নাতের বাইরে। বরং আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত ধারাগুলোতেও একাধিক বক্তব্য লক্ষ করা যায়।

দার্শনিকদের মতে, কালাম আল্লাহ তায়ালার সত্তা থেকে উৎসারিত একধরনের 'ফয়েজ'। জাহমিয়্যাহ ও মুতাজিলারা মনে করে, এটা আল্লাহর সত্তা থেকে ভিন্ন, আলাদা সৃষ্টি। আশআরি ও মাতুরিদিদের মতে, এটা আল্লাহ তায়ালার সত্তার সঙ্গে সংশিষ্ট একটি বিমূর্ত ব্যাপার (معنى قائم بذات الله)। একদল মুহাদ্দিস মনে করেন, আল্লাহর কালাম হলো অক্ষর ও আওয়াজের সমষ্টি (মূর্ত ব্যাপার), যা শুরু থেকেই তাঁর সঙ্গে বিদ্যমান। কিন্তু অধিকাংশ আসহাবুল হাদিস এবং সমকালীন সালাফি ধারার আলিমদের মতে, আল্লাহ তায়ালা যখন ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা কথা বলেন। তিনি কথা বলেন অক্ষর ও আওয়াজ সহকারে, যা শোনা যায়। আল্লাহ তায়ালার কালাম অনাদি, কিন্তু বিশেষ কোনো আওয়াজ অনাদি নয়।[১]

ইমাম তহাবির বক্তব্য এসব বক্তব্যের ঠিক কোনটার প্রতিনিধিত্ব করে? ত্বহাবিয়্যার বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্যাতাগণ সবাই নিজ ধারা অনুযায়ী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন ইবনে আবিল ইজ সালাফি ধারায় ব্যাখ্যা করেছে।[২] গজনবি ও সমকালীন হারারি, সাইদ ফুদাহ কালামি ধারায় করেছেন।[৩] অধমের কথা হলো: **ইমাম তহাবির বক্তব্য সালাফের বক্তব্য**। তিনি অন্যান্য সিফাতের মতো (যা আমরা সামনে দেখব) আল্লাহর 'কালাম' সিফাতকেও তাবিল করেননি; বরং সুস্পষ্ট ভাষায় **কুরআন আল্লাহর 'হাকিকি কালাম' এবং 'মাখলুক নয়' বলেছেন। অর্থাৎ কুরআন হাকিকি অর্থেই আল্লাহর কালাম। তবে তাঁর কালাম কাইফিয়্যাত তথা স্বরূপ ও ধরনবিহীন**। এভাবে একদিকে তিনি আল্লাহর কালামকে হাকিকি অর্থে সাব্যস্ত করে মুতাজিলাদের খণ্ডন করেছেন। ফলে ইমামের কথা একদিকে যেমন কালামি ধারার কথা থেকে ভিন্ন, আবার মুতাআখখিরিন সালাফি ধারার বক্তব্য (অক্ষর ও আওয়াজ-সহ কথা) থেকেও ভিন্ন। কিন্তু এই ভিন্নতা কাউকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত থেকে খারিজ করে দেওয়ার ভিন্নতা নয়।

ইমাম তহাবিও সেজন্য মূল বিষয়টি নিয়েই কথা বলেছেন, বাকি বিষয় নিয়ে কথা বলেননি।[৪] অথচ কুরআন নিয়ে এই বিতর্ক যখন সবচেয়ে তুঙ্গে ছিল, তিনি ছিলেন

---

১. দেখুন: ইবনে আবিল ইজ (১২৮-১২৯); তুর্কিস্তানি (৯৬); শাইবানি (১৬-১৭); আকহাসারি (১৪০)।

২. ইবনে আবিল ইজ (১৩৮,১৪৪, ১৪৬)।

৩. গজনবি (৭৪); হারারি (৫৯); সাইদ ফুদাহ (৫৮৫)।

৪. আমাদের হাতে বিদ্যমান আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহর একটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিতে এখানে 'কুরআনের অক্ষর ও আওয়াজ-সহ' হওয়াকে নাকচ করা হয়েছে, যা সালাফি ধারার আকিদার খণ্ডন। কিন্তু আমরা যদি ইমাম তহাবির গ্রন্থরচনার পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি দিই, তবে দেখব, এখানে ইমাম তহাবির এ ধরনের বাক্য লেখার কথা নয়। তা ছাড়া তিনি যদি সত্যিই এটা লিখতেন, তবে গুরুত্বের কথা বিবেচনায় নিলে অন্য সকল পাণ্ডুলিপিতে উক্ত বক্তব্য থাকার

সেগুলোর চাক্ষুষ সাক্ষী। ফলে এটা নিয়ে লম্বা আলোচনা করা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তিনি করেননি। কারণ, তিনি নিজেদের ভিতরকার বিতর্ক নিয়ে আলোচনায় যেতেই চাননি। যেহেতু এসব বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা ইমাম তহাবি ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গিয়েছেন, তাই বর্তমানেও আলিম-সমাজের উচিত হবে এসব বিতর্ক এড়িয়ে যাওয়া। ফলে এক্ষেত্রে কেবল এটুকুই বিশ্বাস রাখা যথেষ্ট হবে: **'কুরআন আল্লাহর হাকিকি কালাম। কুরআনের অর্থ ও শব্দ দুটোই আল্লাহর বাণী; স্রেফ কলবের কল্পনা নয়। আল্লাহ কুরআনের শব্দগুলো দিয়ে কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি কীভাবে কথা বলেছেন সেটা আমাদের জানা নেই। তাঁর কথা বলা আমাদের কথা বলার মতো নয়, যেভাবে তাঁর শোনা ও দেখা আমাদের শোনা ও দেখার মতো নয়।'**[১] এটা দারুল উলূম দেওবন্দের সাবেক প্রিন্সিপাল কারি তৈয়ব সাহেবের বক্তব্যের নির্যাস। পাঠক খেয়াল করলে দেখবেন, এই বক্তব্য ইসবাত ও তাবিল অন্য কথায় (অতিরঞ্জিত পরিস্থিতিতে) তাশবিহ কিংবা তাতিল দুটো খতরা থেকেই নিরাপদ দূরত্বে। মতাদর্শগত অনুসরণের উর্ধ্বে উঠে সালাফের কাছাকাছি থাকার প্রচেষ্টা। এটাই ইমাম তহাবি রাহি.-এর কথার প্রকৃত ব্যাখ্যা। ফলে এটাই এ ব্যাপারে ভারসাম্যপূর্ণ বক্তব্য।

কুরআন মানুষের কথা নয়; মানুষের কথার সদৃশও নয়: ফলে কেউ যদি কুরআনকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা অন্য কোনো মানুষের কথা মনে করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ, কুরআন আল্লাহর বাণী। আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে এটা মানুষের কথা হওয়াকে নাকচ করে দিয়েছেন। মক্কার কাফেররা বলত, কুরআন মুহাম্মাদের নিজের রচনা। কখনও বলত, তিনি অন্যদের কাছ থেকে এটা শিখেছেন ইত্যাদি।[২] তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের খণ্ডনে অবতীর্ণ করলেন,

إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ . سَأُصْلِيهِ سَقَرَ

অর্থ: 'সে বলল, এটা তো নিছক মানুষের কথা। আমি শীঘ্রই তাকে সাকার (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করব।' [মুদ্দাস্‌সির: ২৫-২৬]

কথা; না থাকার কোনো যুক্তি নেই। যদিও ধরে নিই কোনো কারণে অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে উক্ত বক্তব্য নেই, তবে কমপক্ষে আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহর প্রাচীন বা সমকালীন ভাষ্যগ্রন্থগুলোতে এটা থাকা দরকার ছিল। বিশেষত গজনবি, শাইবানি ও গুনাইমি প্রমুখ কালামি ধারার আলিমদের ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোতেও উক্ত বক্তব্য নিয়ে কোনো কথা নেই। অথচ ইমাম তহাবি এমন কথা বলে থাকলে সেটা তারা জোরেশোরেই উল্লেখ করতেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, আলোচিত পাণ্ডুলিপিতে উক্ত বক্তব্য ইমাম তহাবির নয়; বরং পরবর্তী সময়ে সংযোজিত হয়েছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

১. কারি মুহাম্মাদ তৈয়ব (৫৩)।
২. তাফসিরে ইবনে কাসির (৮/২৭৬, ৪/৫১৮)।

কুরআন যেহেতু আল্লাহর কথা, মানুষের কথা নয়। সুতরাং মানুষের কথার সঙ্গে কুরআনের কোনো সাদৃশ্য হতে পারে না। কারণ আল্লাহর কথা মানুষের কথার মতো নয়। এ কারণেই কুরআনের পক্ষ থেকে বারবার চ্যালেঞ্জ ছোড়ার পরেও কাফেররা কুরআনের মতো কিছু তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। আল্লাহ তায়ালা প্রথমে তাদের কুরআনের মতো একটি গ্রন্থ নিয়ে আসতে বলেন। তিনি বলেন,

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰٓ اَنْ يَّأْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا.

অর্থ: 'আপনি বলুন, যদি সকল মানুষ ও জিন এই কুরআনের মতো একটি গ্রন্থ আনার জন্য একত্র হয়, তবুও তারা এর মতো আনতে পারবে না, যদিও তারা একে অপরের সহযোগী হয় [ইসরা: ৮৮]।

এর পর তাদের কুরআনের সুরার মতো দশটি সুরা নিয়ে আসতে বলেন:

قُلْ فَأْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

'আপনি বলুন, তোমরা এর মতো দশটি সুরা নিয়ে আসো। আর আল্লাহ ছাড়া যাকে মনে চায় সাহায্যের জন্য ডাকো।' [হুদ: ১৩]

সবশেষে তাদের কুরআনের মতো একটি সুরা নিয়ে আসতে বলেন:

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ قُلْ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

'যদি তোমরা আমার বান্দার উপর যা অবতীর্ণ করেছি, এ ব্যাপারে সন্দেহে থাকো, তবে এর মতো একটি সুরা নিয়ে আসো। আল্লাহ ছাড়া যাদের মনে চায় সাহায্যের জন্য ডাকো; যদি তোমদের দাবি সত্য হয়।' [ইউনুস: ৩৮]

তারা কোনোটাতেই সক্ষম হয়নি। অথচ সে সময়ের আরবজাতি ছিল আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে অলংকারভাষী এবং তাদের যুগ ছিল আরবি ভাষার স্বর্ণযুগ। কুরআন অবতরণের পর থেকে আজ ১৪০০ বছর অতিক্রান্ত হতে চলল, অদ্যাবধি পৃথিবীর কোনো মানুষ কুরআনের আয়াতের মতো একটি মৌলিক আয়াত তৈরি করে দেখাতে পারেনি।

কুরআনকে মাখলুক বললে কী সমস্যা? প্রশ্ন আসতে পারে, জাহমিয়্যাহ ও মুতাজিলাদের বক্তব্য অনুযায়ী আল্লাহর কালাম (কুরআন)-কে মাখলুক তথা সৃষ্ট বললে সমস্যা কী? ঈমানের জন্য এটা কোন দিক থেকে ক্ষতিকর? উত্তর হলো: কুরআন আল্লাহর কালাম, যা আল্লাহ তায়ালা বারবার তাগিদ দিয়েছেন। আর আল্লাহর কালাম তাঁর সিফাত (গুণ)। আর আল্লাহর সিফাত তাঁর সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ, আল্লাহর সিফাত সৃষ্টি হলে তাঁরও সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক হয়। অথচ আল্লাহ তায়ালা সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। এ কারণে ইমাম তহাবি রাহি. সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, '**যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর মানবীয় কোনো গুণ বা বিশেষত্ব আরোপ করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। সুতরাং চক্ষুষ্মান ব্যক্তির কর্তব্য হলো এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। আল্লাহর ব্যাপারে কাফেরদের মতো বক্তব্য দেওয়া থেকে বিরত থাকা। নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা, আল্লাহ তায়ালা তাঁর গুণাবলিতে মানুষের মতো নন।**' তা হলে বোঝা যাচ্ছে, কুরআনকে মাখলুক বলা 'কুফর'। কারণ, এর মাধ্যমে কুরআনের হাকিকতকে অস্বীকার করা হয়, কুরআনের মর্যাদাহানি হয়, আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে নিষিদ্ধ 'ইলহাদ' সংঘটিত হয়।

এ কারণেই অনেক উলামায়ে কেরাম জাহমিয়্যাহদের (যারা এই বিদআতের সর্বপ্রথম উদ্ভাবক) কাফের বলেছেন। মুতাজিলারা এসে তাদের বক্তব্যকেই সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে ইদরিস বলতেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনকে মাখলুক বলল, সে আল্লাহর মাঝ থেকে একটা বিষয়কে মেরে ফেলল!'[১] আহমদ বিন হাম্বল রাহি. মনে করতেন, যারা কুরআনকে মাখলুক বলে, তারা মূলত আল্লাহর সকল নাম ও গুণকেও মাখলুক বলে, যদিও সেটা প্রকাশ করে না। ফলে তারা কাফের।[২] এ কারণে ইবনে তাইমিয়া লিখেন, 'যারা বলে, আল্লাহর কুরআন মাখলুক, তাদের বক্তব্য মূলত এটা যে, আল্লাহ কথা বলেন না, তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায় না। এতে করে আল্লাহর একটি সিফাতের মাধ্যমে অন্যান্য সিফাতও বাতিল হয়ে যায়।[৩] তৃতীয় শতাব্দে খলিফা মামুনের যুগে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আহমদ ইবনে নসর, নুআইম ইবনে হাম্মাদ, বুওয়াইতি, মুহাম্মাদ ইবনে নুহ-এর মতো ইমামগণ জীবন বাজি রেখে এই বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। ওয়াকি ইবনুল জাররাহ বলেন, 'কুরআন মাখলুক বলাকে

---

১. ইবানাহ, ইবনে বাত্তাহ (৬/৪৩; নং ২৩৬)।
২. আত-তিসইনিয়্যাহ, ইবনে তাইমিয়া (২/৫৮১)।
৩. বায়ানু তালবিসিল জাহমিয়্যাহ, ইবনে তাইমিয়া (৩/৫১৮)।

হালকা মনে করো না। কারণ, এটা তাদের সবচেয়ে মন্দ কথার একটা। এটা মানুষকে আল্লাহর সিফাতের তাতিল (বাতিলকরণ)-এর দিকে নিয়ে যায়।'[১]

বিপরীতে অন্য একদল আলিম মনে করেন, কুরআন নিয়ে জাহমিয়্যাহ ও মুতাজিলাদের মৌলিক বিভ্রান্তির মোকাবিলা সঠিক ছিল। কিন্তু তাত্ত্বিক একটা ব্যাপার নিয়ে যতটা অতিরঞ্জন করা হয়েছে, যতটা ভয়াবহ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে (বিশেষত নিজেদের মতভেদকে), ততটা দরকার ছিল না। ইমাম ইবনে কুতাইবা (মৃ. ২৭৬ হি.) মনের পীড়ায় এটাকে মুহাদ্দিসদের জন্য 'শয়তানের ষড়যন্ত্র' হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, 'শয়তান তাদের এমন একটি মাসআলায় জড়িয়ে ফেলে, আল্লাহ তায়ালা যেটাকে দ্বীনের উসুল (মূল) কিংবা ফুরু (শাখা) কোনেটাই বানাননি। তা জানলে ভালো, না জানলে কিছু নেই। ফলে ধীরে ধীরে এর কুফল বাড়তেই থাকে। তাদের ঐক্য ছিন্নভিন্ন করে দেয়। তাদের হিংসুকদের হাসায়। তাদের থেকে শত্রুদের নিরাপদ করে দেয়। কারণ, তারা নিজেরাই একে অপরকে কাফের বানাতে ও অভিসম্পাত দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।'[২] ইমাম শাওকানি রাহি. বলেন, 'এই মাসআলাতে উম্মাহ শতধাবিভক্ত হয়েছে, উলামায়ে কেরাম মুসিবতের শিকার হয়েছেন। অনেকে মনে করেছে, এটা দ্বীনের মৌলিক উসুলগুলোর একটি; অথচ ব্যাপারটা তেমন নয়। এটার মাঝে খুব বড় কল্যাণকর কিছু ছিল না। এটা দ্বীনের মৌলিক কোনো বিষয় নয়; বরং একটা অপ্রয়োজনীয় বিষয় (فضول العلم)। আর এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন ও তাবে-তাবেয়িদের এটা থেকে রক্ষা করেছেন।'[৩]

এই বিতর্কের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ছিল মুসলিম বিশ্বে। কিন্তু অন্যতম ভয়াবহ প্রভাব পড়েছিল হাদিস ও রিজালশাস্ত্রে। কারণ, এই বিবাদকে কেন্দ্র করে উলামায়ে কেরামের অনেক পক্ষ-বিপক্ষ দল তৈরি হয়। একদল আরেকদলকে নিজেদের মানদণ্ডে মাপতে থাকে। একটু এদিক-সেদিক হলেও নির্ভরযোগ্য রাবিদের ছুড়ে ফেলা হতে থাকে । বরং ইমামদের ব্যাপারে সমালোচনা ও তাদের নিয়ে টানা-হেঁচড়া চলতে থাকে। অন্যদিকে অনেকে এটাকে প্রতিশোধ নেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে। প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে তাকে উক্ত

---

১. খালকু আফআলিল ইবাদ, বুখারি (৩৭)।
২. আল ইখতিলাফ ফিল লাফজ, ইবনে কুতাইবা (২০)। উল্লেখ্য, ইবনে কুতাইবা রাহি. এই যুগের চাক্ষুষ সাক্ষী। তার চোখের সামনেই এসব ঘটেছে।
৩. ইরশাদুল ফুহুল, শাওকানি (১/৩৯)।

মাসআলাতে বিভ্রান্ত আখ্যা দিতে থাকে।[১] এর ভিত্তিতেই আলি ইবনুল মাদিনি এবং ইমাম বুখারির মতো ইমামকেও দুর্বল ও অগ্রণযোগ্য আখ্যা দেওয়া হয়[২]। বরং ইমাম আবু হানিফাকেও অপবাদ দেওয়া হয় যে, তিনি কুরআন মাখলুক বলতেন।[৩]

শুধু এটাই নয়। বড় বড় ইমামদের নিজেদের মাঝেও এটা নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং (শাফেয়ির ছাত্র) হুসাইন ইবনে আলি আল-কারাবিসির মাঝে ছিল গভীর বন্ধুত্ব। কিন্তু এই মাসআলাতে কারাবিসি ইমাম আহমদের কঠোরতার বিরোধিতা করেন। কারণ, ইমাম আহমদ এই মাসআলাতে কোনো ব্যাখ্যা গ্রহণ করতেন না। তিনি বলতেন, 'যে বলবে কুরআন মাখলুক সে জাহমি, যে কুরআন আল্লাহর কালাম বলে চুপ হয়ে যাবে, সে সুবিধাবাদী (ওয়াকিফি), যে বলবে আমার উচ্চারণে কুরআন মাখলুক, সে বিদআতি।' কারাবিসি তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বলতেন, 'জানি না এই লোকটাকে নিয়ে কী করব। মাখলুক বললেও বিদআতি বলে, গাইরে মাখুলক বললেও বিদআতি বলে।' কারণ, কারাবিসি এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করতেন। তিনি বলতেন, কুরআন মাখলুক নয়, কিন্তু আমার উচ্চারণে মাখলুক। ইমাম আহমদ রাহি. যখন এ কথা শুনতে পান, তখন থেকেই তাদের মাঝে দূরত্ব তৈরি হয়। একপর্যায়ে তা দুশমনিতে রূপ নেয়। ফলে একজন আরেকজনের সমালোচনা করতে থাকেন। ইমাম আহমদের অনুসারীরা কারাবিসিকে পরিত্যাগ করে এবং তাকে বিদআতি আখ্যা দেয় সামান্য এই ব্যাখ্যার কারণে! অথচ কারাবিসি ছাড়াও আবদুল্লাহ ইবনে কুল্লাব, আবু সাওর, দাউদ ইবনে আলি-সহ এই তবকার লোকেরা এক্ষেত্রে ব্যাখ্যার পক্ষপাতী ছিলেন।[৪] বরং বাড়াবাড়ি এই পর্যন্ত চলে গিয়েছিল যে, মুহাদ্দিসদের কেউ কেউ অন্যদের ব্যাপারে বলতেন, তিনি দুই কুরআনে বিশ্বাস করেন।[৫]

বাস্তব কথা হলো, সংঘাতের মূল জায়গাটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ 'মিহনায়ে খালকে কুরআন' মূলত সে যুগে ওহি ও আকল, সুন্নাহ ও প্রগতিশীলতা, উলামা ও সুশীল দুই শ্রেণীর মাঝে সংগ্রাম হয়ে দেখা দিয়েছিল। ফলে আলিমদের কর্তব্য ছিল আকল ও কথিত যুক্তিবাদিতার বিপরীতে ওহিকে প্রতিষ্ঠিত করা; প্রগতিশীলতার বিপরীতে সুন্নাহ প্রতিষ্ঠিত করা; সুশীলদের পরিবর্তে ইসলামি রাষ্ট্রে ও মুসলিম মননে

---

১. ফাতহুল বারি, ইবনে হাজার (১/৪৯০)।
২. আল-জারহ ওয়াত তাদিল, ইবনে আবি হাতেম (৬/১৯৪, ৭/১৯১)।
৩. শরহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ, লালাকায়ি (২/২৯৮)।
৪. আল-ইনতিকা, ইবনে আবদুল বার (১০৬)। তাহজিবুত তাহজিব, ইবনে হাজার (২/৩৬১)।
৫. তাহজিবুত তাহজিব, ইবনে হাজার (১০/৪৬২)।

আলিমদের জায়গা তৈরি করা; আলিমদের দ্বীনের মুখপাত্র হিসেবে ধরে রাখা, যা সালাফের যুগ থেকেই চলে আসছিল, মুতাজিলারা যা শেষ করে দিতে চাচ্ছিল। ফলে ইমাম আহমদ-সহ আলিমগণ এক্ষেত্রে যে সুদৃঢ় ভূমিকা পালন করেছেন, সেটা সময় ও দ্বীন দুটোরই চাহিদা ছিল। মুতাজিলাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা বিজয়ী হলেন। ওহি ও সুন্নাহর বিজয় হলো। আলিমদের বিজয় হলো।

কিন্তু এটুকুতেই বিষয়টি সীমিত রাখা দরকার ছিল। কেবল মুতাজিলা ও জাহমিয়্যাহদের বিরোধিতা অর্থাৎ 'কুরআন মাখলুক' সুস্পষ্টভাবে এতটুকুর বিরোধিতা করলেই হতো। কারণ, এক্ষেত্রে সকল আলিম একমত ছিলেন।[১] ফলে যারা এক্ষেত্রে ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন কিংবা অন্যভাবে বুঝেছেন, তাদের ওভাবে থাকতে দিলেই হতো। কিন্তু সেটা হয়নি। ফলে মুতাজিলাদের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় মুহাদ্দিসদের ঘরোয়া বিবাদে। একপর্যায়ে প্রতিপক্ষকে বাদ দিয়ে নিজেরা বিতর্ক ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়েন। মুতাজিলারা চলে যায়, ইমামগণও চলে যান। কিন্তু উম্মাহর অন্তর্দ্বন্দ্ব রয়ে যায়। সেটা পরিণত হয় আশআরি-মাতুরিদি আর সালাফি বিসংবাদে, যে বোঝা আজও বয়ে চলেছে অসহায় উম্মাহ।

---

১. আল ইখতিলাফ ফিল লাফজ (১/৫৭)।

وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلاَ كَيْفِيَّةٍ كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ رَبِّنَا وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ . إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ، وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَهُ اللهُ تَعَالَى وَعَلِمَهُ، وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ، لاَ نَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مُتَأَوِّلِينَ بِآرَائِنَا وَلاَ مُتَوَهِّمِينَ بِأَهْوَائِنَا، فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلاَّ مَنْ سَلَّمَ للهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَى عَالِمِهِ.

জান্নাতবাসীর জন্য আল্লাহর দর্শন সত্য। কিন্তু তাঁকে সম্যকভাবে পরিব্যপ্ত করা সম্ভব নয় এবং এর স্বরূপ তিনিই ভালো জানেন। কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সেদিন কতক চেহারা হবে আলোকোজ্জ্বল। তাকিয়ে থাকবে তাদের পালনকর্তার দিকে।' এটার ব্যাখ্যা আল্লাহ তায়ালা যা উদ্দেশ্য করেছেন সেটাই এবং তিনিই এ ব্যাপারে সম্যক অবগত। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদিসে যেসব বিষয় এসেছে, সেগুলোর ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন এবং যা উদ্দেশ্য করেছেন, সেগুলো-সহই আমরা ঈমান আনি। এ ব্যাপারে আমরা নিজেদের মতামত ঢুকিয়ে অপব্যাখ্যা করব না কিংবা প্রবৃত্তির অনুসরণপূর্বক অনুমানমূলক কথা বলব না। কারণ, দ্বীনের ক্ষেত্রে সে ব্যক্তিই নিরাপদে থাকে, যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি আত্মসমর্পণ করে এবং যা জানে না (সে ব্যাপারে কথা বলা পরিত্যাগপূর্বক) যিনি জানেন তাঁর কাছে সঁপে দেয়।

ব্যাখ্যা

আল্লাহর দিদার-সম্পর্কিত আকিদা

পরকালে আল্লাহর দিদার: আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, পালনকর্তা, আমাদের জন্ম ও মৃত্যুদাতা। দুনিয়ার সকল মুমিন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস

রাখে, তাঁর সামনে মাথা অবনত করে, তাঁকে ভালোবাসে, তাঁকে ভয় করে, তাঁর কাছ থেকে আশা করে, তাঁর জন্য কাঁদে। অথচ পৃথিবীর কোনো মানুষ আজ পর্যন্ত আল্লাহকে দেখেনি। কারণ, আল্লাহ শক্তিশালী, মানুষ দুর্বল। আল্লাহকে দেখার মতো চোখ মানুষকে দেওয়া হয়নি। আল্লাহকে উপলব্ধি করার মতো ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হয়নি। কিন্তু তাঁর দিদারের আশার প্রদীপ প্রত্যেকটা মুমিনের অন্তরে জাজ্বল্যমান। সকল মুসলমান তাঁকে একবার দেখার জন্য উদগ্র। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের নিরাশ করেননি। এ কালে না হলেও পরকালে তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের ওয়াদা দিয়েছেন। আর তাই পরকালে মুমিনরা আল্লাহকে সরাসরি দেখতে পাবে। আর আল্লাহর দর্শনই হবে জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত।

জান্নাতে মুমিনদের আল্লাহর সাক্ষাৎলাভ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সর্বসম্মত আকিদা, যেমনটা ইমাম তহাবি রাহি. বলেছেন। কিছু বিভ্রান্ত ফিরকা যথা জাহমিয়্যাহ, মুতাজিলা, ফালাসিফাহ (দার্শনিক), খারেজি ও ইমামিয়্যাহ, মুরজিয়া ইত্যাদি[১] সম্প্রদায় ছাড়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সকল ধারার মুসলমানরা এতে ঈমান রাখে। কারণ, কুরআনের একাধিক আয়াত এবং একাধিক বিশুদ্ধ হাদিসে বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। পরকালে আল্লাহর সাক্ষাতই প্রকৃত প্রাপ্তি। আর এর থেকে বঞ্চনাই প্রকৃত বঞ্চনা।

কুরআনের যেসব আয়াত আল্লাহর সাক্ষাতের দলিল, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যা গ্রন্থকার তহাবি রাহি. উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ . إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.

অর্থ: সেদিন কতক চেহারা হবে আলোকোজ্জ্বল। তাকিয়ে থাকবে তাদের পালনকর্তার দিকে। [কিয়ামাহ: ২২-২৩]

ইকরিমা ও হাসান বসরি-সহ সালাফের অনেকে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর দর্শন.[২] এ ব্যাপারে কুরআনের আরেকটি দলিল হচ্ছে জান্নাতিদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার বাণী:

لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

---

১. শাইবানি (১৮); ইবনে আবিল ইজ (১৫৩); আকহাসারি (১৪৪, ১৪৮)।
২. তাফসিরে তাবারি (২৪/৭২)।

অর্থ: ‘তারা সেখানে যা চাইবে তা-ই পাবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক।’ [কাফ: ৩৫]

আলি ইবনে আবি তালিব এবং আনাস বিন মালিক রাজি. থেকে বর্ণিত, ‘আরও অধিক’ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ‘আল্লাহ তায়ালার দর্শন।’[১]

কুরআনের তৃতীয় আরেকটি আয়াত দ্বারা আল্লাহর দিদার লাভের বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

অর্থ: ‘যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারচেয়েও অধিক কিছু।’ [ইউনুস: ২৬]

এখানে ‘অধিক কিছু’ বলতে আল্লাহর দর্শন বোঝানো হয়েছে। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতের এই ব্যাখ্যা করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন, ‘জান্নাতিগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের বলবেন, ‘তোমরা আরও কিছু চাও?’ তারা বলবে, ‘আপনি কি আমাদের চেহারা আলোকিত করেননি? আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি?’ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা পর্দা তুলে নেবেন। তখন তাদের কাছে আল্লাহর দিকে তাকানো অপেক্ষা কিছুই অধিকতর প্রিয় হবে না।’[২] একইভাবে আবু বকর সিদ্দিক, আলি ইবনে আবি তালিব, ইবনে আব্বাস, আবু মুসা আশআরি, হুজাইফা, কাব ইবনে উজরাহ রাজি. থেকেও আয়াতের এমন তাফসির বর্ণিত আছে।[৩]

ইমাম শাফেয়ি রাহি. কুরআনের অন্য একটি আয়াত দ্বারাও আখিরাতে মুমিনদের আল্লাহর দিদার লাভের বিষয়টি প্রমাণ করেন। আয়াতটি হচ্ছে আল্লাহর বাণী:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ.

অর্থ: ‘কখনও নয়; তারা সেদিন তাদের পালনকর্তা থেকে আড়ালে থাকবে।’ [মুতাফফিফিন: ১৫]

---

১. তাফসিরে তাবারি (২২/৩৬৭-৩৭০); তাফসিরে ইবনে কাসির (৭/৩৮০)।
২. মুসলিম (১৮১); তিরমিজি (২৫৫২); ইবনে মাজা (১৮৭)।
৩. দেখুন: তাফসিরে তাবারি (১৫/৬৩-৬৪); তাফসিরে কুরতুবি (৮/৩৩০)।

শাফেয়ি বলেন, 'যেহেতু কাফেররা আল্লাহর অসন্তোষের ফলে পর্দার আড়ালে থাকবে, এর দ্বারা বোঝা যায় মুমিনরা সন্তোষ অর্জনের কারণে তাঁকে দেখতে পাবে।'[১]

হাদিসে আল্লাহর দর্শনের বিষয়টি আরও স্পষ্ট এবং মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে।[২] হাদিসের অধিকাংশ গ্রন্থেই এ ব্যাপারে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ হচ্ছে আবু হুরাইরা রাজি.-এর হাদিস। তিনি বলেন, 'কিছু লোক রাসুলুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের পালনকর্তাকে দেখতে পাব? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পূর্ণিমা রাতে চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোনো কষ্ট হয়? মেঘহীন সূর্য দেখতে কি তোমাদের কোনো কষ্ট হয়? তারা বললেন, না, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি বললেন, তাঁকেও তোমরা এভাবেই দেখবে...' উক্ত হাদিসের শেষের দিকে এসেছে, এই দর্শন কেবল মুমিনদের জন্যই হবে। এর আগে কাফের, মুশরিক ও আহলে কিতাব সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। বাকি থাকবে কেবল মুসলমান, পুণ্যবান ও গুনাহগার সবাই। ফলে যে ব্যক্তিই শিরক থেকে বেঁচে থেকে মৃত্যুবরণ করবে সে-ই আল্লাহকে দেখতে পাবে।[৩] আরও একটি হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তোমাদের রবকে সামনাসামনি দেখতে পাবে।'[৪] আরেকটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই শীঘ্রই তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে। তখন প্রতিপালক ও তার মাঝে কোনো অনুবাদক ও পর্দা থাকবে না।'[৫] ইবনে আবিল ইজ লিখেন, পরকালে আল্লাহর দর্শন লাভের ব্যাপারে প্রায় ত্রিশজন সাহাবি হাদিস বর্ণনা করেছেন। ফলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো বলেছেন।[৬]

কুরআন-সুন্নাহর আরও অনেক আয়াত ও হাদিস দ্বারা আখিরাতে আল্লাহর দর্শন প্রমাণিত। কিন্তু গ্রন্থের কলেবর বড় হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আমরা সেগুলো উল্লেখ করছি না। কুরআন-সুন্নাহর বাইরে মানুষের বিবেকও বলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে দেখতে পাওয়া উচিত। ইমাম আবুল হাসান আশআরি রাহি. লিখেন, 'আল্লাহকে চোখে

---

১. আল-আওয়াসিম ওয়াল কাওয়াসিম, ইবনুল উজির (৫/২০২); শরহুস সুন্নাহ, লালাকায়ি (৩/৫৬০)।
২. হাদিল আরওয়াহ ইলা বিলাদিল আফরাহ, ইবনুল কাইয়িম (২৮৩)।
৩. বুখারি (৪৫৮১); মুসলিম (৮৩); আবু দাউদ (৪৭৩০); তিরমিজি (২৫৪৯)।
৪. বুখারি (৭৪৩৫); আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি (৮০৫৭)।
৫. বুখারি (১৪১৩); বাজ্জার (৪৪৪৪)।
৬. ইবনে আবিল ইজ (১৫৯)।

দেখতে পাওয়ার আরেকটি (বুদ্ধিবৃত্তিক) দলিল হচ্ছে, আল্লাহ নিজে সবাইকে দেখেন। আর যিনি সবাইকে দেখেন, তিনি নিজেকেও দেখেন। আর যিনি সবাইকে ও নিজেকে দেখেন, তাকেও দেখা যায়। যেমন: আল্লাহ তায়ালা জানেন, ফলে তাঁকেও জানা সম্ভব। আল্লাহ তায়ালা শোনেন। ফলে তাঁর কথাও শোনা সম্ভব। একইভাবে আল্লাহ তায়ালা দেখেন, ফলে তাঁকেও দেখা সম্ভব। এ কারণে আল্লাহর দর্শনকে অস্বীকার করার অর্থ হলো আল্লাহ দেখেন, শোনেন ও জানেন এই সবকিছু অস্বীকার করা।'[১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি মিরাজের রাতে আল্লাহকে দেখেছেন?
উপরের আলোচনাতে স্পষ্ট হলো যে, মুমিনগণ জান্নাতে আল্লাহকে দেখতে পাবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখার বিষয়টি নিয়ে যদিও কোনো কোনো আলিম দ্বিমত পোষণ করেছেন, কিন্তু পিছনের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের দিনও মুমিনগণ আল্লাহকে দেখতে পাবে।[২] বাকি রইল দুনিয়ায় আল্লাহকে দেখা সম্ভব কি না?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিসে বলেছেন, 'তোমাদের কেউ মৃত্যুর আগে আল্লাহকে দেখতে পাবে না।'[৩] এর মাধ্যমে দুনিয়াতে কোনো মানুষের পক্ষে সরাসরি আল্লাহকে দেখা যাবে না প্রমাণিত হলো। এটা এ কারণে নয় যে, আল্লাহকে দেখা যায় না। বরং দুনিয়াতে মানুষের তাকে দেখার শক্তি ও সামর্থ্য নেই। ফলে একমাত্র রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া দুনিয়ার কেউ আল্লাহকে দেখেননি, এটা সর্বসম্মত মত।

প্রশ্ন হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আল্লাহকে দেখেছেন? বিশেষত মিরাজের রাতে? বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। বরং খোদ সাহাবায়ে কেরাম রাজি. বিষয়টি নিয়ে মতভেদ করেছেন। ফলে পরবর্তী উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত হবে সেটা কল্পনাতীত ব্যাপার। আয়েশা রাজি. মনে করতেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে দেখননি। তিনি বলতেন, 'যে দাবি করবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে দেখেছেন, তার দাবি ভুল।'[৪] ইবনে মাসউদ ও আবু হুরাইরাও এই মত পোষণ করতেন। কিন্তু এর বিপরীতে ইবনে আব্বাস রাজি. ও তাঁর শাগরিদরা মনে করতেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে

১. আল-ইবানাহ, আবুল হাসান আশআরি (৫৩)।
২. ইবনে আবিল ইজ (১৬২); আকহাসারি (১৪৪)।
৩. মুসলিম (২৯৩১)।
৪. বুখারি (৪৮৫৫); মুসনাদে আবু ইয়ালা (৪৯০০)।

দেখেছেন।[১] তিরমিজির বর্ণনায় এসেছে, ইবনে আব্বাস রাজি. বলেন, 'মুহাম্মাদ (সা.) দুইবার তাঁর প্রভুকে দেখেছেন।'[২] তবে কিছু বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, ইবনে আব্বাস রাজি. চোখের দেখা নয়; অন্তরের দেখা বুঝিয়েছেন।[৩]

আবু জর রাজি.-এর বর্ণনাও অস্পষ্ট। । সহিহ মুসলিমে আবু জর রাজি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি আপনার প্রভুকে দেখেছেন? তিনি বললেন, نورٌ أنّى أراه 'নুর আমি কীভাবে দেখব?'[৪]উক্ত হাদিস দ্বারা যদিও বাহ্যিকভাবে বোঝা যায় তিনি তাকে দেখেননি, তবে জটিলতা হলো, অনেকে হাদিসের শব্দগুলোকে অন্যভাবে পাঠ করেছেন। ফলে বক্তব্য সম্পূর্ণ উলটে গিয়ে অর্থ দাঁড়িয়েছে, نورانيٌ أراه 'আমি নুর হিসেবে (নুরানি) তাঁকে দেখেছি।'[৫] উক্ত ব্যাখ্যাকে যদিও অনেক আলিম 'বিকৃতি' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু এমন ব্যাখ্যা সর্বোতভাবে ফেলে দেবার মতো নয়। কারণ, আবু জর থেকেই অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, رأيتُ نورا 'আমি নুর দেখেছি।'[৬] ফলে প্রথম বর্ণনা অনুযায়ী হাদিসটির বাহ্যিক অর্থ ধরলে পরের বর্ণনার সঙ্গে তা সংঘৃষ্ট হয়। অথচ দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ধরলে দুটোই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

মোটকথা, এমন মতভেদপূর্ণ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। যদিও দারেমি বলেছেন, আহলে সুন্নাতের ঐকমত্যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে দেখেননি।[৭] কিন্তু এমন 'ইজমা' বর্ণনা আপত্তির উর্ধ্বে নয়। বাইহাকিও ইবনে আব্বাস রাজি.-এর হাদিসকে 'স্বপ্নযোগে দেখা'র মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন।[৮] ইমাম কুরতুবি রাহি. উক্ত মাসআলাতে 'নিরপেক্ষ' থাকা অগ্রাধিকার দিয়েছেন। দেখে থাকতেও পারেন, নাও দেখতে পারেন।[৯] তবে ইবনে খুজাইমা এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহি. দেখার পক্ষে। বরং ইমাম আহমদ রাহি. বলেন, আয়েশা রাজি.-এর

---

১. মুসতাদরাকে হাকেম (৩২৫৩); ফাতহুল বারি (৮/৬০৮)।
২. তিরমিজি (৩২৭৯)।
৩. মুসলিম (১৭৭); মুসনাদে আহমদ (২৬৬৮০); দেখুন: শিফা, কাজি ইয়াজ (১/১৯৫/১৯৭); ইবনে আবিল ইজ (১৬২-১৬৩)।
৪. মুসলিম (১৭৮); তিরমিজি (৩২৮২); মুসনাদে আহমদ (২১৭৮৮)।
৫. শিফা, কাজি ইয়াজ (১/২০১); শরহে মুসলিম, নববি (৩/১২)।
৬. মুসলিম (১৭৮); ইবনে হিব্বান (৫৮)।
৭. আর রাদ্দু আলা বিশর আল-মারিসি (১৬৬)।
৮. আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/৩৬৮)।
৯. আল-মুফহিম, কুরতুবি (১/৪০২)।

কথার চেয়ে রাসুলুল্লাহর কথা (আমি আল্লাহকে দেখেছি) শক্তিশালী![1] কাশ্মীরি রাহি. বলেন, আমাদের কাছে সঠিক কথা হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের রাতে তাঁর প্রভুকে দেখেছেন![2] অধমের বক্তব্য হলো, বিষয়টি মতভেদপূর্ণই থাকবে। সুনিশ্চিত কিছু বলা সম্ভব নয়। তাই নিরপেক্ষ থাকতে হবে। তবে খুব সম্ভব রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের রাতে আল্লাহর নুরের পর্দা দেখেছেন। পর্দা ছাড়া সরাসরি যেভাবে জান্নাতে দেখা যাবে, সেভাবে দেখেননি! আবু জর-এর হাদিসের সুস্পষ্ট অর্থও তা-ই। আল্লাহ ভালো জানেন। এ ব্যাপারে আমাদের জন্য সুনিশ্চিত কিছু জানা জরুরিও নয়। কারণ, এই মাসআলার উপর কোনো মুসলিমের দুনিয়া-আখিরাতের কোনো বিষয় নির্ভরশীল নয়।

আল্লাহকে কি স্বপ্নে দেখা সম্ভব? উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। একদল আলিম মনে করেন, আল্লাহকে স্বপ্নে দেখা সম্ভব নয়। যেমন: ইমাম আবু মানসুর আল মাতুরিদি থেকে বর্ণিত আছে, 'কেউ যদি দাবি করে আমি আল্লাহকে স্বপ্নে দেখেছি, তবে সে মূর্তিপূজকের চেয়েও নিকৃষ্ট।' অপরদিকে অনেক আলিম মনে করেন, আল্লাহকে স্বপ্নে দেখা সম্ভব। ইমাম আবু হানিফা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহকে ৯৯বার স্বপ্নে দেখেছেন। ইমাম আহমদ থেকেও আল্লাহকে স্বপ্নে দেখার কথা বর্ণিত আছে। তা হলে উভয় বক্তব্যের মাঝে সমন্বয় কী করে? বস্তুত নির্ভরযোগ্য কথা হলো, আল্লাহকে স্বপ্নে দেখা সম্ভব। তবে স্বপ্নে আল্লাহকে যেরূপে দেখা যাবে, সেটাকে তার প্রকৃত রূপ মনে করা যাবে না। কারণ, স্বপ্নে মানুষ সাধারণত জাগ্রত অবস্থায় দেখা বিষয়গুলোর সদৃশ বস্তু দেখে থাকে। আর আল্লাহ তায়ালা মানুষের সৃষ্টির সাদৃশ্য তো দূরের কথা, সকল কল্পনার অনেক উর্ধ্বে। ফলে ইমাম মাতুরিদি-সহ যেসব আলিম স্বপ্নে আল্লাহকে দেখার কঠোর সমালোচনা করেছেন, তারা মূলত এ কারণেই করেছেন। অর্থাৎ তাঁর প্রকৃত স্বরূপ (হাকিকত) দেখা ও অনুধাবন করা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণ ব্যতিরেকে কেউ যদি স্বপ্ন দেখার কথা বলে, সেটা অসম্ভব নয়। কিন্তু এটা নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি কাম্য নয়।[3]

---

১. উসূলুস সুন্নাহ (২); ফাতহুল বারি, ইবনে হাজার (৮/৬০৮)।
২. ফয়জুল বারি (১/৯২, ৫/৪০৩)।
৩. মিরকাতুল মাফাতিহ, আলি কারি (৭/২৯১৫-২৯১৬); কিফায়াতুল মুফতি (৭৭-৭৮)।

কেউ কেউ এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন। তারা এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস বর্ণনা করেন যে, তিনি আল্লাহ তায়ালাকে যুবকের আকৃতিতে দেখেছেন।[১] কিন্তু হাদিসটি বিতর্কিত। বরং ইবনুল জাওজি, সুবকি-সহ অনেকে এটাকে অপ্রমাণিত বলেছেন।[২] আরেকটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আজ রাতে স্বপ্নে আমার প্রভু সবচেয়ে সুন্দর **সুরতে** এসেছেন . . . ।' উক্ত হাদিসটি বিভিন্ন কিতাবে একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে।[৩] তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে কী সুরতে দেখেছেন সে ব্যাপারে তিনি কিছুই বলেননি। কারণ, **আল্লাহ সকল সুরত তথা আকার-আকৃতির উর্ধ্বে**। ফলে আমরা যে আল্লাহকে স্বপ্নে দেখা বৈধ বলেছি সেটা এই মূলনীতিতেই বুঝতে হবে। কিছু লোক এই জায়গাতে ভুল করে। তারা উক্ত হাদিসের বাহ্যিক অর্থ ভুল বুঝে আল্লাহর জন্য আকার-আকৃতি সাব্যস্ত করে। অথচ হাদিসে আল্লাহর জন্য আকার-আকৃতি সাব্যস্ত করা হয়নি। বরং স্রেফ বান্দার দেখার প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ স্বপ্নে আল্লাহকে মানুষ যেভাবে দেখবে, সেটা মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে, মানুষের অবস্থার প্রেক্ষিতে। স্বপ্নে দেখা সুরতের সঙ্গে আল্লাহর স্বরূপের কোনো সম্পর্ক নেই। সপ্নে দেখা সুরতটাই আল্লাহ তায়ালা—এমন কথা সালাফের কেউ বলেননি এবং এটা শরিয়ত ও যুক্তি উভয় মানদণ্ডে প্রত্যাখ্যাত আকিদা। তাই আল্লাহর জন্য আকার-আকৃতি সাব্যস্তকরণেরও সুযোগ নেই।

একটি প্রশ্ন ও উত্তর: জাহমিয়্যাহ, মুতাজিলা-সহ যেসব ফিরকা[৪] আখিরাতে আল্লাহর চাক্ষুষ সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে তাদের মতে, আল্লাহকে কখনোই দেখা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে তারা কুরআন থেকে কিছু দলিল পেশ করার চেষ্টা করে, যা বাস্তবিক পক্ষে তাদের বক্তব্যের দলিল নয়; বরং তারা সেসব আয়াত ভুল বোঝে কিংবা অপব্যাখ্যা করে। সালাফের আলিমগণ তাদের গ্রন্থাবলিতে এ-সকল অপব্যাখ্যা

---

১. আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/৩৬৩, ৩৬৮); বায়ানু তালবিসিল জাহমিয়্যাহ (৭/১৯২)।
২. সুবকি বলেন, এটা মিথ্যা ও বানোয়াট হাদিস। তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা (২/৩১২); আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ, ইবনুল জাওজি (১/৩৫); আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বাইহাকি (২/৩৬৮); হারারি (১২০)।
৩. তিরমিজি (৩২৩৩); মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদ (৬৮২); এটার সনদের উপরও মুহাক্কিকগণ আপত্তি করেছেন। ফলে নিশ্চিন্তে ও সন্দেহাতীতভাবে মেনে নেওয়ার সুযোগ সীমিত।
৪. মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন, আবুল হাসান আশআরি (১/১৩১)।

চূড়ান্তভাবে খণ্ডন করেছেন।[1] যেমন: তারা কুরআনের আয়াত দিয়ে দলিল দেয়, যখন মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন, তখন আল্লাহ বলেছেন,

قَالَ لَن تَرَىٰنِي

অর্থ: 'আমাকে তুমি কখনোই দেখবে না।' [আরাফ: ১৪৩] অথচ এটা ব্যাকরণিকভাবে কিংবা শরয়িভাবে আল্লাহকে কখনোই না দেখার দলিল নয়; বরং দুনিয়াতে না দেখার দলিল। কারণ, মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর নবি এবং তাঁর সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি এমন জিনিস আল্লাহর কাছে চাইবেন না যা কখনোই সম্ভব নয়। একইভাবে তারা কুরআনের আরেকটি আয়াত:

لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ

অর্থ: 'তাকে চোখ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে না' [আনআম: ১০৩] দিয়ে দলিল দেয়; অথচ এটা তাদের দলিল নয়। কারণ, এখানে দেখাকে নাকচ করা হয়নি, পূর্ণরূপে উপলব্ধি নাকচ করা হয়েছে। আর দেখা ও উপলব্ধির মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট। আমরা চাঁদ ও সূর্যকে দেখি, কিন্তু পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারি না।[2]

প্রশ্ন হলো, অনেককে দেখা যায় কুল্লাবিয়্যাহ ও আশআরিদের আল্লাহর সাক্ষাৎ অস্বীকারকারী হিসেবে উপস্থাপন করেন। কিংবা তাদের কথার 'লাজিম' হিসেবে বলেন, তারাও আল্লাহর সাক্ষাৎকে একপ্রকারের অস্বীকার করে। তাদের মতে, আশআরিরা সরাসরি অস্বীকার না করলেও ভিতরে ভিতরে অস্বীকার করে। কারণ, তারা আল্লাহকে দেখার ক্ষেত্রে দিক অস্বীকার করে! আর এটা—তাদের মতে—সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতা। কারণ তাদের মতে, দিক ছাড়া কোনো বস্তু দেখা সম্ভব নয়। ফলে আল্লাহকে একটি দিকে (উপরে) দেখা যাবে!

অপরদিকে আশআরি আলিমগণ এটাকে স্ববিরোধিতা নয়, বরং দেহবাদ ও মুতাজিলাদের মাঝে মধ্যমপন্থা মনে করেন। তারা বলেন, আমরা আল্লাহর সাক্ষাৎ সাব্যস্ত করেছি, মুতাজিলাদের মতো অস্বীকার করিনি। আবার দেহবাদীদের মতো

---

১. এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র গ্রন্থ দেখুন: ইমাম দারাকুতনির 'রু'ইয়াতুল্লাহ'। আজুররির 'আত-তাসদিক বিন নাজারি ইলাল্লাহি ফিল আখিরাহ। আবু শামা মাকদিসির 'জাওউস সারি ইলা মারিফাতি রু'ইয়াতিল বারী। ইমাম সুয়ুতির 'তুহফাতুল জুলাসা বিরু'ইয়াতিল্লাহি লিন নিসা, শাওকানির 'আল-বুগইয়াহ ফি মাসআলাতির রু'ইয়াহ'।

২. তাফসিরে বাইজাবি (২/১৭৬); তাফসিরে ইবনে আতিয়্যাহ (২/৩৩০); শাইবানি (১৮-১৯); ইবনে আবিল ইজ (১৫৬-১৫৮); আকহাসারি (১৪৮-১৪৯); সালেহ ফাওজান (৬২-৬৩)।

দিক-সহও সাব্যস্ত করিনি। বরং আমরা বলি, 'যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেছেন সেভাবে'।[১] তাদের মতে, বরং যারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে সৃষ্টিজীবের সাক্ষাতের মতো করে বলে, তারা ভ্রান্ত। কারণ, ইমাম তহাবি রাহি. **'এ ব্যাপারে আমরা নিজেদের মতামত ঢুকিয়ে অপব্যাখ্যা করব না কিংবা প্রবৃত্তির অনুসরণপূর্বক অনুমানমূলক কথা বলব না'** এই বক্তব্যের মাধ্যমে নিজেদের অনুমানমূলক কথা বলতে নিষেধ করেছেন। আর তারা দেখার ক্ষেত্রে যেসব 'লাওয়াজিম' নির্ধারণ করেন, সেগুলো কুরআন-হাদিসে নেই; বরং অনুমানমূলক বক্তব্য।[২] গজনবি লিখেন, 'ইমাম তহাবির বক্তব্যও সেদিকেই ইঙ্গিত করে। তিনি বলেছেন, 'স্বরূপ নির্ধারণ' ও 'পরিবেষ্টন' (বা সম্যক উপলব্ধি) ব্যতীত আমরা আল্লাহর সাক্ষাতে ঈমান রাখি। এখন যদি আল্লাহর ক্ষেত্রেও দিক, স্থান, আলো, দূরত্ব সবকিছু সাব্যস্ত করি, তবে আর 'স্বরূপ নির্ধারণ' এবং 'পরিবেষ্টন'-এর বাকি থাকল কী? তাই আমরা মূল বিষয় 'সাক্ষাৎ' সাব্যস্ত করব। বাকি বিষয় নিয়ে বিতর্ক থেকে বিরত থাকব।[৩] তুর্কিস্তানি বলেন, 'কুরআন ও সুন্নাহে যেভাবে এসেছে, আমরা সেগুলোকে হাকিকি অর্থে বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ যেভাবে উদ্দেশ্য নিয়েছেন, সেটার সামনে আত্মসমর্পণ করি। এ ব্যাপারে আমরা সৃষ্টির উপর স্রষ্টাকে কিয়াস করি না। আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির সকল সাদৃশ্য থেকে পবিত্র।'[৪] গুনাইমি বলেন, যে বস্তু কোনো স্থান ও দিকে সীমাবদ্ধ, সেটা স্থান ও দিক ছাড়া দেখা যায় না। কিন্তু যে সত্তা স্থান ও দিকে সীমাবদ্ধ নন; তাঁকে দেখতে দিক ও স্থান দরকার হয় না।[৫]

আল্লাহর দিদার বিষয়ে আমাদের করণীয়: আমরা যদি গভীরে যাই, দেখব, এটাও একটা শাখাগত তাত্ত্বিক আলোচনা, যে পর্যন্ত যাওয়া নিষ্প্রয়োজন ছিল। কারণ, মূল মাসআলা তথা আল্লাহর দিদার লাভের বিষয়ে উভয় দলই একমত। কুরআন ও সুন্নাহর এ-সম্পর্কিত বর্ণনাগুলোর ক্ষেত্রেও উভয়ে একমত। মতবিরোধ হচ্ছে আল্লাহকে কোনো দিকে দেখা যাবে, নাকি দিক ছাড়া। একদল আলিম আল্লাহর জন্য দিক সাব্যস্ত করেন এবং তারা বলেন আল্লাহকে উপরে দেখা যাবে। আরেক দল আল্লাহকে দিক থেকে মুক্ত মনে করেন (যেমনটা ইমাম তহাবিও মনে করেন যা একটু পরেই বিস্তারিত আসবে), তাই আল্লাহর সাক্ষাতের মাসআলাটাও তারা দিকমুক্ত মনে করেন।[৬]

---

১. দেখুন: তাশনিফুল মাসামি', জারকাশি (৪/৭১১); সাইদ ফুদাহ (৬০৪-৬০৫)।
২. তুর্কিস্তানি (১০৬)।
৩. গজনবি (৭৮)।
৪. তুর্কিস্তানি (৯৯-১০০)।
৫. গুনাইমি (৬৯)।
৬. আকহাসারি (১৪৪)।

এতে স্ববিরোধিতার কিছু নেই। কারণ আল্লাহ সৃষ্টির মতো নন। ফলে সৃষ্টিকে দিক ছাড়া দেখা যায় না, তাই আল্লাহকেও দিক ছাড়া দেখা যাবে না—এটা বলা মূলত আল্লাহর সঙ্গে সৃষ্টির সাদৃশ্য তৈরি করা। কারণ, আল্লাহকে দেখতে দিক লাগলে আকার-আকৃতি, দূরত্ব অনেক প্রশ্নই উদিত হয়। কিন্তু সব-রকমের কাইফিয়্যাত আল্লাহর কাছে সঁপে দিলে কেনো প্রশ্নই উদিত হয় না। বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিছনের দিকেও দেখেন।[১] তা হলে বোঝা গেল, আমরা দেখার ক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতি স্বাভাবিক ভাবি, এর বাইরেও অনেক পদ্ধতি আছে। এই সাদৃশ্য থেকে বাঁচতেই সম্ভবত ইমাম তহাবি বলেছেন, **'জান্নাতবাসীর জন্য আল্লাহর দর্শন সত্য; কিন্তু তাঁকে সম্যকভাবে পরিব্যপ্ত করা সম্ভব নয় এবং এর স্বরূপ তিনিই ভালো জানেন।'** ফলে 'জান্নাতে আল্লাহকে দেখা যাবে'—এটুকু বিশ্বাসই যথেষ্ট এবং উত্তম। দিক-সহ নাকি দিক ছাড়া—এমন বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন। বরং কুরআনের আয়াতগুলো দেখলেও বোঝা যায়, আল্লাহকে দেখতে দিক লাগার শর্ত দেওয়া অসমীচীন। কারণ, আল্লাহ সৃষ্টির মতো নন। সৃষ্টি যা-কিছুর মুখাপেক্ষী, তিনি সেগুলোর মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ

অর্থ: 'তাকে চোখ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে না।' [আনআম: ১০৩] অন্য আয়াতে বলেন,

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

অর্থ: 'তাদের জ্ঞান তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না।' [ত্বহা: ১১০]

তা ছাড়া যারা আল্লাহর ইস্তিওয়া, নুজুল সবকিছুর বাহ্যিক অর্থ সাব্যস্ত করে 'বিলা কাইফিন' বলাকে সঠিক মনে করেন, আল্লাহকে দেখার ক্ষেত্রে তারাই অদ্ভুতভাবে 'দিক' শর্ত জুড়ে দেন, অথচ তা একধরনের 'কাইফিয়্যাত' সাব্যস্তকরণ! তাই ইমাম তহাবির বক্তব্যও তাদের বিপরীতে; বরং তাদের এই বক্তব্য তাদের মানহাজেরও বিপরীতে।[২]

---

১. সহিহ ইবনে খুজাইমা (১৬০২); মুসনাদে আহমদ (৯০৪৯); মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক (২৪২৭)।
২. বিস্তারিত দেখুন: সাইদ ফুদাহ (৬৭১)।

ইমাম আবু হানিফা রাহি. আল্লাহকে দেখার ক্ষেত্রে 'দিক'-এর শর্ত সঠিক মনে করেন না। ফলে তিনি পরকালে আল্লাহর দিদারকে দিক ছাড়াই বিশ্বাস করেন। তিনি মানেন, আল্লাহকে দেখতে দিকের প্রয়োজন হবে না।[১] অন্য হানাফি মুহাক্কিকদের মতামতও তা-ই। ইমাম সারাখসি (৪৮৩ হি.) লিখেন, 'আল্লাহর জন্য দিক (জিহাহ) সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। কারণ, তাঁর কোনো দিক (জিহাহ) নেই।'[২] ইমাম বাজদাবিও আল্লাহর জন্য 'দিক' (জিহাহ) সাব্যস্ত করা অসম্ভব বলেছেন।[৩] তাই দিক সাব্যস্ত না করার ফলে কাউকে সালাফের নামে 'আল্লাহর দিদার অস্বীকারকারী' বলা এবং আহলে সুন্নাত থেকে বের করে দেওয়া অত্যন্ত ভয়ংকর ব্যাপার। হ্যাঁ, যদি কেউ 'দিক' নাকচ করাকে ঢাল বানিয়ে আল্লাহর 'ইস্তিওয়া', 'নুজুল' এ-জাতীয় সিফাতগুলো নাকচ করে সেটাও সঠিক নয়।

সারকথা হলো, আমরা আল্লাহর দিদারের স্বরূপ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের হাতে সঁপে দেবো, যেমনটা ইমাম তহাবি বলেছেন, **এটার ব্যাখ্যা আল্লাহ তায়ালা যা উদ্দেশ্য করেছেন সেটাই এবং তিনিই এ ব্যাপারে সম্যক অবগত। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদিসে যেসব বিষয় এসেছে, সেগুলোর ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন এবং যা উদ্দেশ্য করেছেন, সেগুলো-সহই আমরা ঈমান আনি। এ ব্যাপারে আমরা নিজেদের মতামত ঢুকিয়ে অপব্যাখ্যা করব না কিংবা প্রবৃত্তির অনুসরণপূর্বক অনুমানমূলক কথা বলব না। কারণ, দ্বীনের ক্ষেত্রে সে ব্যক্তিই নিরাপদে থাকে, যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি আত্মসমর্পণ করে এবং যা জানে না (সে ব্যাপারে কথা বলা পরিত্যাগপূর্বক) যিনি জানেন তাঁর জন্য ছেড়ে দেয়।** বোঝা গেল, দিক-সহ দর্শন নাকি দিক ছাড়া সেই বিতর্ক বাদ দিয়ে মৌলিক আকিদায় ঈমান আনা এবং এর ব্যাখ্যা আল্লাহ ও রাসুলের কাছে সমর্পণ করাই একজন মুমিনের দায়িত্ব। তহাবির বক্তব্য দেখে মনে হয়—তিনি এসব বিতর্ক নিজ চোখে দেখেছেন, ফলে বারবার এ ব্যাপারে সতর্ক করছেন। কখনও বলছেন, এর স্বরূপ সাব্যস্ত করা যাবে না, আবার কখনও বলছেন, আমরা মনগড়া ব্যাখ্যা দেবো না, আরেকবার বলছেন, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল যা বুঝিয়েছেন সেটার উপরই আমরা ঈমান আনব। আর স্বরূপ (কাইয়্যিাত) তাফবিজ করব (আল্লাহ ও

১. আল-ওয়াসিয়্যাহ, আবু হানিফা (৫৯)।
২. উসুলুস সারাখসি (১/১৭০)।
৩. উসুলুল বাজদাবি (১০)।

রাসুলের কাছে সঁপে দেবো)। শেষে বলছেন, এই তাফবিজের মাঝেই নিরাপত্তা। গজনবি লিখেন, 'দুটি সম্প্রদায় এক্ষেত্রে প্রান্তিকতার শিকার হয়েছে—একটি (মুতাজিলা) এক্ষেত্রে মনগড়া ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছে, যার ফলে আল্লাহর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছে। আরেকদল (দেহবাদী) বাহ্যিক অর্থ সাব্যস্তের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছে, ফলে আল্লাহর সাক্ষাৎকে সৃষ্টির সাক্ষাতের মতো বানিয়ে ফেলেছে।'[১]

একটি হাদিস দ্বারাও মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলো আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের কাছে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশনা বোঝা যায়। আমর ইবনে শুআইব তাঁর বাবা তাঁর দাদা (আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস) থেকে বর্ণনা করেন, একদিন রাসুলের কিছু সাহাবি কুরআনের একটি আয়াত নিয়ে বিতর্ক করছিলেন। তারা রাসুলুল্লাহর দরজার কাছেই বসা ছিলেন। একপর্যায়ে তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। রাসুলুল্লাহ বের হয়ে এলেন। তাঁর মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তিম ছিল। তিনি তাদের প্রতি কিছু মাটি ছুড়ে বললেন, থামো তো তোমরা! এভাবেই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগুলো ধ্বংস হয়েছে। তারা নবিদের ব্যাপারে মতভেদ করেছে। কিতাবের একটি আয়াতকে অপরটির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে; কুরআনের এক আয়াত তো অন্য আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না; বরং এক আয়াত অন্য আয়াতকে সত্যায়ন করে। সুতরাং যা জানো সেটার উপর আমল করো। আর যা জানো না, তা যিনি জানেন তাঁর কাছে সঁপে দাও।'[২] কুরআনেও এ ব্যাপারে বলা হয়েছে,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.

অর্থ: 'যে ব্যাপারে তোমার জ্ঞান নেই সেটার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও হৃদয় এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।' [ইসরা: ৩৬]

---

১. গজনবি (৮১)।
২. মুসনাদে আহমদ (৬৮১৭); খালকু আফআলিল ইবাদ, বুখারি (৬৩)।

وَلاَ تَثْبُتُ قَدَمُ فِي الإِسْلامِ إِلاَّ عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالاسْتِسْلَامِ. فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُظِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ، حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيدِ، وَصَافِي الـمَعْرِفَةِ، وَصَحِيحِ الإِيمَانِ، فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ الكُفْرِ وَالإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ، وَالإِقْرَارِ وَالإِنْكَارِ، مُوَسوِسًا تَائِهًا شَاكًّا، لاَ مُؤْمِنًا مُصَدِّقًا، وَلاَ جَاحِداً مُكَذِّبًا.

وَلاَ يَصِحُّ الإِيمَانُ بِالرُّؤْيَةِ لأَهْلِ دَارِ السَّلاَمِ لِمَنْ اعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ بِوَهْمٍ أَوْ تَأَوَّلَهَا بِفَهْمٍ إِذْ كَانَ تَأْوِيلُ الرُّؤْيَةِ وَتَأْوِيلُ كُلِّ مَعْنًى يُضَافُ إِلَى الرُّبُوبِيَّةِ بِتَرْكِ التَّأْوِيلِ وَلُزُومِ التَّسْلِيمِ، وَعَلَيهِ دِينُ الـمُسْلِمِينَ.

আত্মসমর্পণ এবং বশ্যতা স্বীকার ব্যতীত ইসলামে কারও অবস্থান অবিচল হতে পারে না। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন বিষয় জানতে যাবে যেগুলো জানা তার পক্ষে সম্ভব নয় এবং এক্ষেত্রে আত্মসমর্পণ করে তুষ্ট থাকবে না, সে নির্ভেজাল তাওহিদ, নির্মল জ্ঞান এবং বিশুদ্ধ ঈমান থেকে বঞ্চিত হবে; কুফর ও ঈমান, সত্যায়ন ও মিথ্যাপ্রতিপন্নীকরণ, স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির দোলাচলে দোদুল্যমান থাকবে। সন্দেহ নিয়ে পথভ্রষ্টের মতো উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকবে, না হবে সত্যায়নকারী মুমিন, না মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী কাফের।

জান্নাতবাসীদের আল্লাহর সাক্ষাৎলাভের ব্যাপারে সে ব্যক্তির ঈমান বিশুদ্ধ হবে না, যে এটাকে নিজের কল্পনার আলোকে বুঝতে চাইবে কিংবা নিজের বুঝ-বুদ্ধিমতো এটার ভুল ব্যাখ্যা দেবে। কারণ, আল্লাহর সাক্ষাৎ-সহ আল্লাহর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয় বোঝার একমাত্র বিশুদ্ধ পন্থা হচ্ছে, অপব্যাখ্যা বর্জন এবং আত্মসমর্পণ। এর উপরই দাঁড়িয়ে আছে মুসলমানদের দ্বীন।

ব্যাখ্যা

ইসলামের সার কথা আত্মসমর্পণ: আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বিবেক ও বুদ্ধি দিয়েছেন। কিন্তু মানুষের মতো মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও সীমিত। ফলে এটা সীমানার বাইরে চিন্তা করতে পারে না, কিংবা চিন্তা করতে গেলে হোঁচট খায়, খেই হারিয়ে ফেলে, উদভ্রান্ত হয়, যা নাস্তিক, সন্দেহবাদী ও অজ্ঞেয়বাদীদের মাঝে দেখা যায়। মুসলিম ঘরে ও মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী অনেকের মাঝেও কখনো কখনো প্রকাশ পায়। এর মূল কারণ, নিজের করণীয় সম্পর্কে উদাসীন হওয়া এবং অকর্মে ব্যস্ত হওয়া। মানুষ যত নিজের মনের ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণার লাগাম খুলে দেয়, ততই হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। এটা এ কারণে নয় যে, ইসলামের মাঝে কোনো বিচ্যুতি আছে, ফলে এগুলো নিয়ে চিন্তা করলে সেসব বিচ্যুতি প্রকাশ পেয়ে যায়, আর তখন সত্যটা জানতে পেরে মানুষ এটা ত্যাগ করে। বরং মানুষ যখন নিজের সামর্থ্যের পরিধির বাইরে গিয়ে চিন্তা করে, তখন তার চিন্তার ফলাফল ভুল আসে। বাস্তবতাকে অস্বীকার করে। সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। ফলে ইসলামের উপর সে-ই অটল থাকতে পারে, যে যত বেশি বিনয়ী হতে পারে, যত বেশি আত্মসমর্পণ করতে পারে। কুরআনের শুরুতেই আল্লাহ বলেছেন,

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

অর্থ: 'এটা তাদের জন্য হিদায়াত, যারা আল্লাহকে ভয় করে, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে।' [বাকারা: ২-৩]

ফলে যারা আল্লাহকে ভয় করে না এবং অদৃশ্যে বিশ্বাস করে না, তারা এর মাধ্যমে হিদায়াত পাবে না। এই অদৃশ্যে বিশ্বাসের নাম অন্ধবিশ্বাস নয়; বরং নিজের সীমাবদ্ধতার সরল স্বীকারোক্তি। নিজের সৃষ্টিকর্তার সামনে আত্মসমর্পণ। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

অর্থ: 'তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব

এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবিকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, সে সবকিছুর উপর। আমরা তাদের কারও মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আজ্ঞাবহ।' [বাকারা: ১৩৬]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিসে বলেছেন, 'কেউ যখন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করতে থাকে, তখন একপর্যায়ে তাঁর প্রশ্ন হয়, 'সবকিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তা হলে আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?' তোমাদের কারও যদি এমন হয়, তবে যেন সে বলে, 'আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম।'[১] উক্ত হাদিসের মাধ্যমে মানুষের সীমাবদ্ধতা সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। সুতরাং যে মানুষ নিজের দেহের ভিতরের জিনিসগুলো জানে না, দেওয়ালের ওপারে কী আছে দেখে না, এমন দুর্বল মানুষের আল্লাহর উপর বাহাদুরি দেখানো উচিত নয়। নিজেকে নিয়ে অহংকার করা উচিত নয়। বরং আত্মসমর্পণের মাঝেই মুক্তি। এ কারণে ইবনে শিহাব জুহরি রাহি. বলেন, 'আল্লাহ রিসালাত পাঠিয়েছেন, রাসুল পৌঁছে দিয়েছেন। আমাদের দায়িত্ব হলো আত্মসমর্পণ।'[২] ইমাম তহাবি রাহি. উপরে এ কথাগুলোই বলেছেন।

কুরআন মানুষের এই সীমাবদ্ধতাকে এবং আত্মসমর্পণের আবশ্যকতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা অনেকগুলো আয়াতে মানুষকে এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। যেমন: আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

অর্থ: 'যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সেটার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয় এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।' [ইসরা: ৩৬] অন্যত্র বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ.

অর্থ: 'কতক মানুষ না জেনে আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে। শয়তান সম্পর্কে লিখে দেওয়া হয়েছে যে, যে তার সাথি হবে, সে তাকে বিভ্রান্ত করবে এবং জাহান্নামের আজাবের দিকে নিয়ে যাবে।' [হজ: ৩-৪]

---

১. বুখারি (৭২৯৬); মুসলিম (১৩৪)।
২. বুখারি (৭৫৩০); ইবনে হিব্বান (১৮৬)।

কিছু আয়াত পরেই আল্লাহ হতভাগা মানুষের উদাহরণ দিয়ে বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ. ثَانِيَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهٗ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّنُذِيْقُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ. ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدٰكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ

অর্থ: 'কতক মানুষ জ্ঞান, প্রমাণ ও আলোকিত কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে। সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে বিতর্ক করে, যাতে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দেয়। তার জন্য দুনিয়াতে লাঞ্ছনা আছে এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে দহন-যন্ত্রণা আস্বাদন করাবো। এটা তোমার দুই হাতের কর্মের কারণে, নতুবা আল্লাহ বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।' [হজ: ৮-১০] আল্লাহ তায়ালা আরেক জায়গায় বলেন,

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ؕ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

অর্থ: 'তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আর আল্লাহর হিদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট কে আছে? নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।' [কাসাস: ৫০]

অন্যত্র বলেন,

اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى.

অর্থ: 'তারা কেবল অনুমান এবং প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে; অথচ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে পথ-নির্দেশ এসেছে।' [নাজম: ২৩]

হাদিসেও দ্বীন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে অনেকগুলো হাদিস আমরা পিছনে উল্লেখ করেছি। এখানেও কয়েকটা তুলে ধরা হচ্ছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'হিদায়াতপ্রাপ্তির পরে কোনো সম্প্রদায় ততক্ষণ পর্যন্ত গোমরাহ হয় না, যতক্ষণ না বিবাদ-বিতর্কে জড়ায়।' এরপর তিনি কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ.

অর্থ: 'তারা আপনার সামনে যে উদাহরণ উপস্থাপন করে, তা কেবল বিতর্কের জন্যই করে।'[১] [জুখরুফ: ৫৮]

অন্য একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি হচ্ছে কলহপরায়ণ ঝগড়াটে।'[২]

আত্মসমর্পণের আরেকটা দিক হচ্ছে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ মেনে নেওয়া; একটা মেনে অন্যটা বর্জন আত্মসমর্পণ নয়; যেমন সেকুলার প্রগতিশীল মানুষের ধর্মচর্চা। সেখানে টুকটাক নামাজ-রোজা ও সুন্নতে সমস্যা নেই। কিন্তু রাষ্ট্র ও সামাজিক জীবনে ইসলাম, লেখাপড়া, অধ্যয়ন, গবেষণা, ব্যাবসা-বাণিজ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ক্রীড়া, বিনোদন ইত্যাদিতে ইসলামের প্রতি আত্মসমর্পণ দূরের কথা, এগুলোতে ইসলাম তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ও অপাঙক্তেয়। এসব জায়গায় ইসলাম নিয়ে আসা যেন অমার্জনীয় অপরাধ; অথচ জীবনের সর্বক্ষেত্রে আত্মসমর্পণের নামই ইসলাম। ফলে এসব ব্যক্তি নিজেদের অজ্ঞাতসারেই ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْىٌ فِى الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

অর্থ: 'তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান আনো আর কিছু অংশ পরিত্যাগ করো? তোমাদের মাঝে যে এমন করে, তার জন্য তো কেবল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাই রয়েছে। আর পরকালে তাদের নেওয়া হবে কঠিনতম শাস্তির জায়গাতে। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা থেকে গাফিল নন।' [বাকারা: ৮৫] অন্য আয়াতে বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَٰتِ الشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

অর্থ: 'হে মুমিনগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের মাঝে প্রবেশ করো। আর তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' [বাকারা: ২০৮]

ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা: আরবি "التأويل" শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলিমদের মতে, মোটামুটি তিনটি অর্থে প্রসিদ্ধ।

---

১. তিরমিজি (৩২৫৩); ইবনে মাজা (৪৮); মুসনাদে আহমদ (২২৫৯৪)।
২. বুখারি (২৪৫৭); মুসলিম (২৬৬৮); তিরমিজি (২৯৭৬)।

এক. 'তাফসির' বা ব্যাখ্যা, হোক সেটা কুরআনের ব্যাখ্যা কিংবা স্বপ্নের ব্যাখ্যা। কুরআন ও সুন্নাহর একাধিক জায়গাতে শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: কুরআনে ইউসুফ আলাইহিস সালামের সঙ্গে তাঁর দুই কারাসঙ্গীর বক্তব্য এসেছে,

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ۖ قَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّيٓ اَرٰىنِيٓ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيٓ اَرٰىنِيٓ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ.

অর্থ: 'তাঁর সাথে কারাগারে দুজন যুবক প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি মদ নিংড়াচ্ছি। অপরজন বলল, আমি দেখেছি, নিজ মাথায় রুটি বহন করছি, তা থেকে পাখি ঠুকরে খাচ্ছে। **আমাদের এর ব্যাখ্যা বলুন**। আমরা আপনাকে সৎকর্মশীল দেখতে পাচ্ছি।' [ইউসুফ: ৩৬]

এইকভাবে ইবনে আব্বাস রাজি.-এর জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া, اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ অর্থ: 'হে আল্লাহ, আপনি তাকে দ্বীনের ফিকহ দান করুন আর তাকে কুরআনের ব্যাখ্যার ইলম দান করুন।'[১] এই দোয়ার বরকতেই ইবনে আব্বাস রাজি. মুফাসসিরদের ইমাম হয়ে যান। বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম তাবারি-সহ অনেকেই তাদের তাফসিরগ্রন্থে আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বলেন, تأويل قوله تعالى এখানে তাদের উদ্দেশ্য, 'আয়াতের তাফসির'।

দুই. বাস্তবায়িত হওয়া, বাস্তবায়ন করা। এই অর্থে কোনো একটা বিষয়ের তাবিল হচ্ছে সেই বিষয়টা বাস্তবায়িত হওয়া বা করা। সুতরাং ভবিষ্যতের কোনো ব্যাপারে সংবাদ দিলে সেটার অর্থ হবে ভবিষ্যতে যা ঘটবে বা বাস্তবায়িত হবে। যেমন কুরআনের বাণী,

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ ۚ يَوْمَ يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوْا لَنَآ اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ

অর্থ: 'তারা কি এখন এ অপেক্ষাতেই আছে যে, এটা **ঘটে যাক? যেদিন ঘটে যাবে**, সেদিন পূর্বে যারা একে ভুলে গিয়েছিল, তারা বলবে, বাস্তবিকই আমাদের প্রতিপালকের রাসুলগণ সত্য-সহ আগমন করেছিলেন। অতএব, আমাদের জন্য কোনো

---

১. ইবনে হিব্বান (৭০৫৫); মুসনাদে আহমদ (২৪৩৪)।

সুপারিশকারী আছে কি, যে সুপারিশ করবে অথবা আমাদের পুনরায় পাঠানো হলে আমরা পূর্বে যা করতাম তার বিপরীত কাজ করে আসতাম? নিশ্চয় তারা নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা মনগড়া যা বলত, তা উধাও হয়ে যাবে। [আরাফ: ৫৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আয়েশা রাজি. বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي " يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ

অর্থাৎ 'নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু ও সিজদাতে খুব বেশি করে বলতেন, 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিক। আল্লাহুম্মাগ ফিরলি।' এভাবে তিনি কুরআনের নির্দেশ **বাস্তবায়ন** করতেন।'[১] এই দুটি ব্যাখ্যাই ইমাম তাবারি রাহি. তাঁর তাফসিরে উল্লেখ করেছেন। বোঝা গেল, প্রথম যুগে তাবিলের এই দুটো অর্থই অধিক প্রচলিত ছিল।[২]

তিন. বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ না করে অন্য একটি অর্থ গ্রহণ করা; অন্য কথায় রূপক অর্থ গ্রহণ করা। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত বিভিন্ন আয়াত বা হাদিসের বাহ্যিক অর্থ না নিয়ে ভিন্নভাবে সেটাকে ব্যাখ্যা করা। মুতাআখখিরিন তথা পরবর্তী যুগের আলিমদের মাঝে (বিশেষত উসুলুল ফিকহ ও আকিদার ক্ষেত্রে) বহুল ব্যবহৃত 'তাবিল' পরিভাষাটির মাধ্যমে এই তৃতীয় প্রকারই উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন হলো, এই প্রকারের তাবিল কি বৈধ না অবৈধ? এক কথায় উত্তর দেওয়া যাবে না। যদি কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতি অনুযায়ী হয়, তবে বৈধ এবং সেক্ষেত্রে এটাও প্রথম প্রকার তথা ব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য হবে। কারণ, এখানে শাব্দিক ও বাহ্যিক অর্থ বর্জনের কারণ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা সেটার বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্যই নেননি। ফলে এই প্রকারের তাবিল কেবল বৈধই নয়, বরং আবশ্যক। কারণ, এক্ষেত্রে বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; ফলে বাহ্যিক অর্থ নিলে বিভ্রাট ঘটবে, অর্থ ও উদ্দেশ্য বিকৃত হবে। আর যদি কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতি অনুযায়ী না হয়, তবে সেটা অবৈধ এবং 'অপব্যাখ্যা' হিসেবে গণ্য হবে। কারণ, এক্ষেত্রে যে অর্থটা নির্ধারণ করা হচ্ছে, সেটা আল্লাহ

---

১. বুখারি (৮১৭); মুসলিম (৪৮৪)। এখানে কুরআনের নির্দেশ বলতে তাঁকে তাসবিহ ও ইস্তিগফারের নির্দেশ দিয়ে অবতীর্ণ সুরা 'নাসর'; (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: ২৮৭৮)।
২. তাফসিরে তাবারি (৬/২০৪)।

তায়ালার উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু উদ্দেশ্য নয়, তাই সেটা মনগড়া ব্যাখ্যা তথা অপব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য হবে।

বৈধ তাবিলের কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক! কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

اَتٰۤى اَمۡرُ اللّٰهِ فَلَا تَسۡتَعۡجِلُوۡهُ

অর্থ: 'আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে। অতএব, এর জন্য তাড়াহুড়া করো না।' [নাহল: ১] এখানে সকল মুফাসসিরের মতে যদিও আয়াতের বাহ্যিক অর্থ: 'নির্দেশ এসে গেছে' (অতীত); কিন্তু এর অর্থ হলো 'শীঘ্রই আসছে' (ভবিষ্যৎ)। বাহ্যিক অর্থ বর্জনের কারণ হলো, আল্লাহর পরবর্তী বক্তব্য 'তাড়াহুড়া করো না'। একইভাবে আল্লাহর বাণী,

فَاِذَا قَرَاۡتَ الۡقُرۡاٰنَ فَاسۡتَعِذۡ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ.

অর্থ: 'অতএব, যখন আপনি কুরআন পাঠ করেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন।' [নাহল:৯৮]

এখানে বাহ্যিক অর্থ হলো, কুরআন পড়া শেষ হলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান। কিন্তু সকল মুফাসসিরের মতে উদ্দেশ্য হলো, কুরআন পড়ার আগে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে (আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বলে), শেষে নয়।

এবার হাদিস থেকে (বৈধ) তাবিলের কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা মানুষকে লক্ষ্য করে বলবেন, 'হে আদম সন্তান, **আমি অসুস্থ ছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে আসোনি। আমি খাবার চেয়েছি, কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি। আমি পিপাসার্ত ছিলাম, কিন্তু তুমি আমার পিপাসা নিবারণ করোনি।'** এখানে হাদিসের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কারণ, আল্লাহ তায়ালা অসুস্থ, ক্ষুধার্ত কিংবা তৃষ্ণার্ত হন না। বরং হাদিসেই ব্যাপারটা স্পষ্ট করা হয়েছে। হাদিসে এসেছে, মানুষ তখন বলবে, হে আল্লাহ, আপনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা। আপনি কীভাবে অসুস্থ, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হবেন? তখন আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল, যদি তুমি তাকে দেখতে যেতে; অমুক বান্দা ক্ষুধার্ত ছিল, যদি তুমি তাকে খাওয়াতে; অমুক বান্দা তৃষ্ণার্ত ছিল, যদি তুমি তাকে পান করাতে, তবে সেখানে আমাকেই পেতে (কিংবা আমার কাছে এর বিনিময় পেতে)।'[১]

---

১. মুসলিম (২৫৬৯); ইবনে হিব্বান (২৬৯)।

আরেকটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলির সঙ্গে শত্রুতা করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। ফরজের চেয়ে আর কোনো বিষয়ের মাধ্যমে বান্দা আমার অধিক নিকটবর্তী হতে পারে না। আর বান্দা নফলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, এমনকি একপর্যায়ে আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। সুতরাং আমি যখন তাকে ভালোবেসে ফেলি, **তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শোনে; তার চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে; তার হাত হয়ে যাই, যা দ্বারা সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে।'**[১] আহলে সুন্নাতের আলিমদের সর্বসম্মত মতানুযায়ী, এখানে হাদিসের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। ফলে বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করাই যাবে না। কারণ, তাতে বান্দার মাঝে আল্লাহর 'হুলুল' আবশ্যক হয় এবং বিভ্রান্ত আকিদা ঢুকে যায়, যা রাসুলুল্লাহর উদ্দেশ্য নয়। তাই বাহ্যিক অর্থের তাবিল (ব্যাখ্যা) করতে হবে। এর অর্থ হবে, বান্দা তার চোখ, মুখ, কান, হাত-পা আমার সন্তোষ অনুযায়ী পরিচালিত করে। এসব অঙ্গ দিয়ে এমন কোনো কাজ করে না, যা আমার নির্দেশের লঙ্ঘন। তুফি বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে সাহায্য-সহযোগিতা। খাত্তাবি বলেন, উদ্দেশ্য দ্রুত দোয়া কবুল হওয়া ও প্রয়োজন মেটা।[২]

এগুলো হলো তৃতীয় প্রকারের তাবিলের কিছু সরল উদাহরণ। কিন্তু বিষয়টি এত সহজ ও সরল নয়। কারণ, আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, তৃতীয় প্রকারের তাবিল দুই ধরনের: একটি বৈধ ব্যখ্যা আরেকটি বিকৃতি বা অপব্যাখ্যা। ফলে ভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলোর তাবিল যে দ্বিতীয় ধরনের (তথা অপব্যাখ্যা) সেটা তো প্রমাণিত। কিন্তু স্বয়ং আহলে সুন্নাতের অনুসারী আলিমগণও এক্ষেত্রে প্রচণ্ড মতবিরোধ করেছেন। ফলে এক্ষেত্রে কোন জায়গাতে তাবিল করা যাবে, আর কোথায় করা যাবে না, কতটুকু করা যাবে, কতটুকু করা যাবে না, কোনটা বৈধ ব্যাখ্যা আর কোনটা অপব্যাখ্যা, এসব নির্ধারণে উম্মাহর আলিমগণ বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। এক ধারার আলিমগণ কোনো আয়াত বা হাদিসকে তাবিল করছেন, অন্য ধারার আলিমগণ সেটাকে 'অপব্যাখ্যা' বলছেন। বিশেষত আল্লাহর সিফাত (তথা গুণাবলি) ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। তাই এ ব্যাপারে প্রথম যুগের সালাফের মানহাজ অনুসরণ করাই শ্রেয়। তাদের মানহাজের মূল কথা হলো: এগুলো সত্য হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ ঈমান রাখা, এগুলোর বাহ্যিক অর্থ (যা মুশাববিহাহদের মস্তিষ্কে বিদ্যমান) বর্জন করা।

---

১. বুখারি (৬৫০২); বাইহাকি (সুনানে কুবরা) (৬৪৮৬); মুসনাদে আবু ইয়ালা (৭০৮৭)।
২. এ ব্যাপারে আলিমদের বিস্তারিত বক্তব্য দেখুন: ফাতহুল বারি, ইবনে হাজার (১১/৩৪৪)।

অন্য কথায়, এগুলোর উপর ইজমালি ঈমান এনে এগুলোর গভীর মর্ম, স্বরূপ ও ধরন (কাইফিয়্যাত) আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া। সামনে এটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

অপব্যাখ্যা বর্জন আবশ্যক: দ্বীনের ক্ষেত্রে অপব্যাখ্যা কতটা ভয়াবহ হতে পারে এ ব্যাপারে স্বয়ং ইমাম তহাবিই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি আত্মসমর্পণের উপর তাগিদ দেওয়ার পরে বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাক্ষাৎ-সহ আল্লাহ সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি বিষয় বোঝার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে (তৃতীয় প্রকারের) তাবিল তথা অপব্যাখ্যা বর্জ।[১]কারণ, তাবিল করা হলে এসবের প্রতি মানুষ বিশুদ্ধ ঈমান আনতে পারে না। বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে দ্বীনি আকিদা ও আমলকে বরবাদ করে দেয়। যেমন, আল্লাহর সাক্ষাৎ বিষয়ে একটি অপব্যাখ্যা উল্লেখ করা যাক! আল্লাহ তায়ালা মুমিনগণ কর্তৃক তাঁকে দেখার বিষয়ে কুরআনে বলেছেন,

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.

অর্থ: সেদিন কতক চেহারা হবে আলোকোজ্জ্বল, তাকিয়ে থাকবে তাদের পালনকর্তার দিকে। [কিয়ামাহ: ২২-২৩]

ইকরিমা ও হাসান বসরি-সহ সালাফের অনেকে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন 'আল্লাহর দর্শন'। কিন্তু ভ্রান্ত ফিরকাগুলো আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এবং এসব ব্যক্তির বক্তব্য বাদ দিয়ে মুজাহিদ রাহি.-এর ব্যাখ্যা প্রচারের চেষ্টা করে। কারণ, মুজাহিদ রাহি. থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে 'তাঁর সাওয়াব কিংবা নির্দেশের প্রতীক্ষায় থাকা'।[২] কিন্তু এটা তাঁর ইজতিহাদ, যা সঠিক নয়। তবে ভুল সত্ত্বেও তাঁর জন্য এটা ক্ষতিকর নয়, কারণ তিনি ইজতিহাদ করেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত বরং তারা, যারা তার অনুসরণের নামে জেনে-বুঝে আল্লাহর আয়াতের অপব্যাখ্যা করবে। কারণ, একদিকে এই আয়াত ছাড়াও আল্লাহকে দেখার প্রমাণে অন্যান্য আয়াত রয়েছে। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক বক্তব্য রয়েছে। ফলে সেগুলো ছেড়ে দিয়ে কেবল এই আয়াতটির উপর ভিত্তি করে আল্লাহর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করা কোন পর্যায়ের ইনসাফ? তা ছাড়া মুজাহিদ রাহি. আল্লাহর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করতেন না। হ্যাঁ, উক্ত আয়াত দিয়ে তিনি হয়তো আল্লাহর সাক্ষাতের দলিল দিতেন

---

১. আকহাসারি (১৫৫)।
২. তাফসিরে তাবারি (২৪/৭২)।

না, কিন্তু তিনি ভ্রান্ত জাহমিয়্যাহ-মুতাজিলাদের মতো আল্লাহর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করতেন না। ফলে এখানে তার ব্যাখ্যা মেনে নেওয়া আর আল্লাহর সাক্ষাতের ব্যাপারে তাঁর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রত্যাখ্যান করাই প্রমাণ করে তারা সত্য নয়, প্রবৃত্তির অনুসারী।[১] মুতাজিলাদের দাবি, কাউকে দেখতে হলে একজন আরেকজনের সামনে থাকতে হয়, দূরত্ব কম-বেশির মাঝামাঝি থাকতে হয়, পর্যাপ্ত আলো থাকতে হয় ইত্যাদি! এভাবে তারা একদিকে আল্লাহকে সৃষ্টির মতো কল্পনা করে, অপরদিকে সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদিস অস্বীকার করে! অথচ তারা যদি অপব্যাখ্যা বাদ দিয়ে কুরআন-সুন্নাহ মেনে নিত, সমস্যা হতো না।[২]

অপব্যাখ্যার আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক পূর্ণিমা রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন,

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ

অর্থাৎ 'তোমরা চাঁদটাকে যেমন দেখছ, তোমাদের পালনকর্তাকে তেমন দেখবে।' উদ্দেশ্য আল্লাহ তায়ালা চাঁদের মতো সেটা নয়; বরং চাঁদকে যেমন সুস্পষ্টভাবে এবং কোনোরূপ ধাক্কাধাক্কি ছাড়া যার যার জায়গা থেকে দেখা যায়, আল্লাহকেও সেভাবে দেখা যাবে। তা হলে হাদিসে تَرونَ শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট: দেখা। কিন্তু অপব্যাখ্যাকারীরা এ-রকম একটা সুস্পষ্ট শব্দের ক্ষেত্রেও অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেয়। তারা বলে, এটা رأى মানে দেখা নয়; বরং এর অর্থ জানাশোনা। সুতরাং হাদিসের অর্থ হচ্ছে, তোমরা আল্লাহকে সেভাবে চিনবে ও জানবে, যেভাবে এই চাঁদকে চেনো।[৩] প্রশ্ন হতে পারে, رأى শব্দের এই অদ্ভুত অর্থ কী বাস্তবোচিত, নাকি তাদের মনগড়া? উত্তর হলো, رای শব্দের অনেকগুলো অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি অর্থ চেনা ও জানা। যেমন: কুরআনে সুরা ফিলে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ.

অর্থ: আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তিবাহিনীর সাথে কীরূপ ব্যবহার করেছেন? [ফিল: ১] এখানে 'আপনি দেখেননি' দ্বারা উদ্দেশ্য চোখের দেখা নয়; কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যিই সেটা দেখেননি। তবে

---

১. দেখুন: আন নিহায়া ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম, ইবনে কাসির (২/৩৫৪)।
২. গজনবি (৮৫)।
৩. আল-আওয়াসিমু ওয়াল কাওয়াসিম, ইবনুল উজির (৫/২৩৫); ইবনে আবিল ইজ (১৮০-১৮১)।

তিনি শুনেছেন ও জেনেছেন। কিন্তু কেবল শাব্দিক অর্থ দিয়ে কুরআন বোঝা যায় না। কুরআন বুঝতে হয় যার উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর কথার মাধ্যমে। রাসুলুল্লাহর হাদিসও মনগড়া পদ্ধতিতে বোঝা যায় না। বুঝতে হয় অন্যান্য হাদিসের সঙ্গে মিলিয়ে কিংবা সালাফের বুঝের মাধ্যমে।

দ্বীনকে নিজের মতো করে বোঝার নাম ঈমান নয়; প্রবৃত্তির অনুসরণ। আর এই প্রবৃত্তির অনুসরণ যেখানেই করা হবে, সেখানেই দ্বীন বরবাদ হবে। এ জন্যই ইমাম তহাবি রাহি. বলেছেন, **'জান্নাতবাসীর আল্লাহর সাক্ষাৎলাভের ব্যাপারে সে ব্যক্তির ঈমান বিশুদ্ধ হবে না, যে এটাকে নিজের কল্পনার আলোকে বুঝতে চাইবে, কিংবা নিজের বুঝ-বুদ্ধিমতো এটার ভুল ব্যাখ্যা দেবে। কারণ, আল্লাহর সাক্ষাৎ-সহ আল্লাহর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয় বোঝার একমাত্র বিশুদ্ধ পন্থা হচ্ছে, অপব্যাখ্যা বর্জন এবং আত্মসমর্পণ। এই আত্মসমর্পণের উপরই দাঁড়িয়ে আছে মুসলমানদের দ্বীন।'** কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَاُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থ: 'আপনি বলুন! নিশ্চয় আল্লাহর পথই সুপথ। আর আমরা আদিষ্ট হয়েছি যাতে স্বীয় পালনকর্তার আজ্ঞাবহ হয়ে যাই।' [আনআম: ৭১]

وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْـزِيهَ، فَإِنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَا مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الوَحْدَانِيَّةِ، مَنْعُوتٌ بِنُعُوتِ الفَرْدَانِيَّةِ، لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ أَحَدٌ مِنَ البَرِيَّةِ.

সুতরাং যে ব্যক্তি এসব ক্ষেত্রে অস্বীকার কিংবা (সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার) সাদৃশ্যকরণ থেকে বেঁচে না থাকবে, তার পদস্খলন ঘটবে এবং বিশুদ্ধ তাওহিদ (তানজিহ) পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। কারণ, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা সব ধরনের একত্ববাদের গুণে গুণান্বিত, অদ্বিতীয়ের বিশেষণে বিশেষিত, সৃষ্টির কেউ সেসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়।

ব্যাখ্যা

আল্লাহর সিফাতগুলো বোঝার মূলনীতি

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে তাঁর অনেকগুলো নাম (আসমা) ও গুণ (সিফাত) উল্লেখ করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে আল্লাহকে বিভিন্ন নামে ডেকেছেন, তাঁর বিভিন্ন সিফাতের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো আমরা কীভাবে বুঝব? এগুলোর উপর কীভাবে ঈমান আনব? এগুলোর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে?

উক্ত প্রশ্নগুলোর জবাব খুব সরল ও সংক্ষেপে দেওয়া যায়, যেমনটা ইমাম তহাবি রাহি. উপরে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহর জন্য এসব গুণ সাব্যস্ত করতে হবে, অস্বীকার (**নফি**) করা যাবে না। পাশাপাশি সৃষ্টির সঙ্গে সেগুলোর তুলনা (**তাশবিহ**) করা যাবে না। কারণ, আল্লাহ তায়ালার সিফাতগুলো কোনো মাখলুকের সিফাতের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে না। ফলে সিফাতের ক্ষেত্রে এই দুই প্রান্তিকতার মাঝেই হলো নির্ভেজাল তাওহিদ।

কিন্তু এই সরল বিষয়টি এতটাও সরল নয় যতটা মনে হচ্ছে; বরং এই বিষয়কে কেন্দ্র করেই মুসলিম উম্মাহর মাঝে অনেক বিভক্তি তৈরি হয়েছে। উম্মাহ অনেক দল-উপদল ও সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে পড়েছে। একদল এগুলো সাব্যস্তের ক্ষেত্রে

বাড়াবাড়ি করে আল্লাহকে সৃষ্টির মতো বানিয়ে ফেলেছে। আরেক দল আল্লাহকে পবিত্র রাখতে গিয়ে এগুলো পুরোপুরি অস্বীকার করে বসেছে! স্বয়ং আহলে সুন্নাতের ইমাম ও আলিমগণও একাধিক ধারায় ভাগ হয়ে পড়েছেন। একদল এগুলোর **বাহ্যিক অর্থ** সাব্যস্ত (ইসবাত) করাকেই সালাফের একমাত্র মাজহাব মনে করেন এবং সিফাত বোঝার বাকি সব পদ্ধতিকে বাতিল ও অস্বীকারের পর্যায়ে মনে করেন! আরেক দল এগুলোর **অর্থ** সাব্যস্ত করাকেই বাতিল ও দেহবাদ মনে করেন এবং এগুলোর অর্থ ও স্বরূপ আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া (তাফবিজ) কিংবা এগুলোর অর্থকে রূপকভাবে ব্যাখ্যা (তাবিল) করাকেই একমাত্র হক মনে করেন!

এখানে যদিও এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয় এবং এসব বিষয় নিয়ে বিস্তর আলোচনা সালাফের কাছে এবং তাদের অনুসরণে অধমের কাছেও পছন্দনীয় নয়, উপরন্তু সাধারণ পাঠকের জন্যও ততটা উপকারী কিংবা জরুরি নয়; তথাপি আমরা মৌলিক কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলব, যাতে হক প্রকাশের দায়িত্ব আদায় হয় এবং আকিদার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়িমুক্ত উম্মাহর প্রতি দরদ রাখবেন এমন কিছু দাঈ তৈরি হয়।

প্রথমে আমরা সিফাতের আয়াত ও হাদিসগুলো বুঝতে সালাফ তথা প্রথম যুগের ইমামদের কর্মপদ্ধতি উল্লেখ করব। এরপর খালাফ তথা পরবর্তী আলিমদের কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করব।

সালাফের তাফবিজ (تَفْوِيضٌ): সালাফের প্রথম সারির ইমামগণ আসমা ও সিফাতের মাসআলাতে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করেছেন। তারা আল্লাহর সিফাতগুলো সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে 'মুশাব্বিহাহ' (আল্লাহকে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্যকারী) ও 'মুজাসসিমাহ' (দেহবাদী) সম্প্রদায়ের অতিরঞ্জন বর্জন করেছেন। অপরদিকে তারা 'মুআত্তিলাহ' (সিফাত অস্বীকারকারী) সম্প্রদায়ের অতিরঞ্জন বর্জন করেছেন। তা হলে ফলাফল দাঁড়াল, তারা এক্ষেত্রে দুই প্রান্তিকতার মাঝামাঝি থেকেছেন। কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত আল্লাহর বিভিন্ন সিফাত, যেগুলোর বাংলা প্রতিশব্দ (والله المثل الأعلى) যেমন 'হাত', 'চোখ', 'চেহারা', 'পা', 'ওঠা', 'নামা, 'আসা' 'হাসা', 'ক্রুদ্ধ হওয়া' ইত্যাদি বিশেষণমূলক শব্দগুলোকে তারা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেননি, যেমনটা করেছে ভ্রান্ত মুআত্তিলাহ সম্প্রদায়। আবার এগুলোকে সৃষ্টির সঙ্গেও তুলনা করেননি, যেমনটা করেছে ভ্রান্ত মুশাববিহাহ ও

মুজাসসিমাহ সম্প্রদায়। বরং তারা এসব সিফাত স্বীকার করেছেন, মেনে নিয়েছেন। পাশাপাশি তাগিদ দিয়েছেন, এগুলো সৃষ্টির সিফাতের মতো নয়। তারা বলেছেন, **আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্য ও রাসুলুল্লাহ** সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম **তাঁর জন্য যা-কিছু (সিফাত) সাব্যস্ত করেছেন, আমরাও সেগুলো সাব্যস্ত করব। আর যা-কিছু থেকে তিনি নিজেকে এবং রাসুলুল্লাহ তাঁকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন, আমরাও সেগুলো থেকে তাঁকে পবিত্র ঘোষণা করব। আমরা বলব, তিনি সকল পূর্ণাঙ্গ গুণের (সিফাতে কামালিয়্যাহ) অধিকারী। সব ধরনের অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি (নাকস) থেকে পবিত্র। এক্ষেত্রে আমরা আল্লাহকে সৃষ্টির কারও সদৃশ মনে করব না। এগুলোর মর্মও বিকৃত করব না। আবার এগুলোর স্বরূপ নিয়ে মনগড়া বক্তব্যও দেবো না; বরং এ ব্যাপারে নীরব থাকব।**

- এ ব্যাপারে সাহাবি ইবনে আব্বাস (মৃ. ৬৮ হি.)-এর বক্তব্য হলো, 'এগুলো গোপন বিষয়, যা ব্যাখ্যা (তাফসির) করা যায় না।'[১]

- ইমাম আবু হানিফা (১৫০ হি.) থেকে এ ব্যাপারে বর্ণিত আছে; তিনি বলেন, 'আল্লাহকে সৃষ্টির কোনো বিশেষণে বিশেষিত করা যাবে না। ক্রোধ ও সন্তুষ্টি তাঁর দুটো সিফাত মেনে নিতে হবে। কোনো ধরন-স্বরূপ সাব্যস্ত করা যাবে না। (بلا كيف)। তাঁর 'হাত' কারও হাতের মতো নয়; কারণ তিনিই সকল হাতের স্রষ্টা। তাঁর 'চেহারা' কারও চেহারার মতো নয়, কারণ তিনিই সকল চেহারার স্রষ্টা।'[২]

- ইমাম মালেক (মৃ. ১৭৯ হি.)-কে আল্লাহর সিফাত 'ইস্তিওয়া' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইলেন। এরপর মথা উঁচু করে বললেন, 'আল্লাহ যেভাবে বলেছেন সেভাবে, এর স্বরূপ বা ধরন (كيفية) সম্পর্কে প্রশ্ন করা যাবে না।'[৩]

- ইমাম মুহাম্মাদ (১৮৯ হি.) বলেন, সকল ভূখণ্ডের ফকিহগণ এই ব্যাপারে একমত যে, কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহে আল্লাহ তায়ালার যেসব সিফাত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকে কোনো ধরনের পরিবর্তন, বিবরণ (وصف), সাদৃশ্য দেওয়া ছাড়া গ্রহণ করতে হবে। যে ব্যক্তি এগুলো ব্যাখ্যা (تفسير) করবে, সে আল্লাহর রাসুলের মানহাজ

---

১. লাওয়ামিউল আনওয়ার, সাফারিনি (১/৯৮)।
২. আল-ফিকহুল আকবার (১৬০-১৬১)।
৩. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বাইহাকি (ফাতহুল বারি (১৩/৪০৭)।

ও আহলে সুন্নাতের মানহাজ থেকে বিচ্যুত হবে। কারণ, তারা এগুলোর বিবরণ দেননি, ব্যাখ্যাও করেননি (لم يَصِفُوا ولم يُفَسِّرُوا)। বরং কুরআন ও সুন্নাহে যা এসেছে ততটুকু বলে চুপ হয়ে যেতেন![1]

- সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ (১৯৮হি.) বলেন,

كل ما وصف الله به نفسه في كتابه، فتفسيره قراءته والسكوت عنه، ليس لأحد أن يفسره إلا الله ورسوله

অর্থাৎ 'আল্লাহ তায়ালা কুরআনে নিজের সম্পর্কে যা বলেছেন, সেগুলো ওভাবে পাঠ করা এবং **চুপ থাকাই** সেগুলোর তাফসির। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল ছাড়া আর কেউ সেগুলো তাফসির করতে পারবে না।'[2]

- ইমাম আহমদ (মৃ. ২৪১ হি.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন, এর বাইরে তাঁকে কোনো বিশেষণে অভিহিত করা যাবে না। আমরা কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে যেতে পারি না।[3]

- ইমাম তিরমিজি (২৭৯ হি.) বলেন, 'সিফাতের ক্ষেত্রে সালাফের মানহাজ হলো, এগুলোর উপর ঈমান আনা, কোনো কল্পনা ও ধারণা না করা, ব্যাখ্যা না করা। 'কীভাবে' এটা না বলা। বরং **যেভাবে এসেছে সেভাবে রেখে দেওয়া**।[4]

- ইমাম খাত্তাবি (৩৮৮ হি.) বলেন, সিফাতের ক্ষেত্রে সালাফের মাজহাব হলো স্বরূপ বর্ণনা ও সাদৃশ্য ব্যতিরেকে **বাহ্যিক অবস্থার** উপর ছেড়ে দেওয়া।[5] ইবনে হাজার বর্ণনা করেন, ইমাম আওজায়ি (১৫৭ হি.), মালেক (১৭৯ হি.), সাওরি (১৬১ হি.), লাইস (১৭৫ হি.) প্রত্যেকে বলতেন (أَمِرُّوها كما جَاءَتْ) **'যেভাবে এসেছে ওভাবেই রেখে দাও।'**[6]

ঝামেলা হলো, এ ব্যাপারে সালাফের বক্তব্যগুলো দ্ব্যর্থক। ফলে যদি প্রশ্ন করা হয় 'যেভাবে এসেছে ওভাবে রাখা'র অর্থ কী? দেখব, এই বিষয়ে উম্মাহর মাঝে দুটো দল দাঁড়িয়ে গেছে। একদল আলিম মনে করেন, 'যেভাবে এসেছে ওভাবে রেখে দাও'

১. শরহুস সুন্নাহ, লালাকায়ি (৩/৪৮০); ফাতহুল বারি (১৩/৪০৭)।
২. ফাতহুল বারি (১৩/৪০৭); লাওয়ামিউল আনওয়ার, সাফারিনি (১/৯৯); জাম্মুত তাবিল, ইবনে কুদামা (১৯)।
৩. ফাতাওয়া হামাবিয়্যাহ কুবরা, ইবনে তাইমিয়া (২৬৫)।
৪. তিরমিজি (৬৬২, ২৫৫৫৭)।
৫. আল-উলুও, জাহাবি (২৩৬)।
৬. ফাতহুল বারি (১৩/৪০৭)।

মানে **অর্থ সাব্যস্ত করা আর স্বরূপ ও ধরন তাফবিজ করা** (إثبات المعنى وتفويض الكيفية)। আরেক দল মনে করেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, **অর্থ ও স্বরূপ দুটোই তাফবিজ করা** (التفويض المطلق)। বাস্তবতা কী?

- সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহর কথায় 'তাফবিজে মুতলাক' সুস্পষ্ট। কারণ, তিনি এগুলো **স্রেফ পড়া** এবং এ ব্যাপারে **নীরব** থাকাকেই সালাফের মানহাজ বলেছেন।[১]

- ইমাম আহমদ রাহি.-এর মতো ইমাম থেকেও এমন কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় যা 'তাফবিজে মুতলাক' বোঝায়। যেমন হাম্বলের এক রেওয়ায়েতে এসেছে, তাঁকে যখন 'ইস্তিওয়া', 'নুজুল' ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি বললেন,

نُؤْمِنُ بِهَا وَنُصَدِّقُ بِهَا وَلَا كَيْفَ **وَلَا مَعْنَى** وَلَا نَرُدُّ شَيْئًا مِنْهَا، وَنَعْلَمُ أَنَّ مَا قَالَهُ الرَّسُولُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَقٌّ إِذَا كَانَتْ بِأَسَانِيدَ صِحَاحٍ

অর্থাৎ আমরা এগুলোর উপর ঈমান রাখি, সত্যায়ন করি, **এগুলোর অর্থ নির্ধারণ করি না,** কাইফিয়্যাত নির্ধারণ করি না। আবার এগুলো প্রত্যাখ্যানও করি না; বরং যা-কিছু বিশুদ্ধ সনদে রাসুলুল্লাহ থেকে প্রমাণিত, আমরা সেগুলোকে হক মনে করি।'[২]

- ইবনে কুদামা হাম্বলি (৬২০ হি.)-এর বর্ণনাতেও ইমাম আহমদ থেকে এভাবে এসেছে:

نؤمن بهَا ونصدق بهَا وَلَا كَيفَ **وَلَا معنى**

আমরা এগুলোর উপর ঈমান রাখি, সত্যায়ন করি। এর কোনো স্বরূপ বা **অর্থ নেই**।'[৩]

- ইবনে হামদান হাম্বলি (৬৯৫ হি.) ইমাম আহমদ রাহি.-এর মাজহাব সম্পর্কে বলেন, 'ইমাম আহমদ বলেন, সিফাতের হাদিসগুলো যেভাবে এসেছে, সেভাবে রেখে দেওয়া হবে। **এগুলোর অর্থ খোঁজা হবে না...**(من غير بحث على معانيها)।'[৪]

---

১. ফাতহুল বারি (১৩/৪০৭); লাওয়ামিউল আনওয়ার, সাফারিনি (১/৯৯); জাম্মুত তাবিল, ইবনে কুদামা (১৯)।
২. ইবতালুত তাবিলাত, আবু ইয়ালা (৪৫)।
৩. জাম্মুত তাবিল, ইবনে কুদামা (১৯); লুমআতুল ইতিকাদ (৭)।
৪. নিহায়াতুল মুবতাদিয়িন, ইবনে হামদান (৩৩)।

• ইবনে আবি ইয়ালা (৫২৬ হি.) লিখেছেন, (আহলে সুন্নাহর আকিদা হলো) আল্লাহ তায়ালা তাঁর সিফাতের স্বরূপ (হাকিকত) ইলম ও **সেগুলোর অর্থ** নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন। পৃথিবীর মানুষকে জানাননি (استأثر بعلم حقائق صفاته **ومعانيها** عن العالمين)।[১]

• ইবনে কুদামা (৬২০ হি.)[২], ইমাম জাহাবি (৭৪৮ হি.)[৩] ও ইবনে হাজার আসকালানিও (৮৫২ হি.)[৪] **অর্থ ও স্বরূপ দুটোই তাফবিজ** (মুতলাক) করার কথা বলেছেন।

• ইমাম কুরতুবি (৬৭১ হি.) লিখেন, সালাফের মাজহাব হলো, এগুলো তাবিল না করা। আবার এগুলো দ্বারা যে **বাহ্যিক অর্থ/অবস্থা উদ্দেশ্য নয় সেটারও** তাগিদ দেওয়া (مع القطع باستحالة ظواهرها)।'[৫]

• ইমাম শাতেবি (৭৯০ হি.) বলেন, 'প্রথম যুগের মানুষ এগুলো মেনে নিয়েছেন; **এগুলোর অর্থের মাঝে প্রবেশ করেননি।** এগুলোর অর্থ জানার সঙ্গে ইসলামের কোনো বিধি-বিধানের সম্পর্ক নেই।'[৬]

এ কারণে একদল আলিম সালাফের তাফবিজ বলতে **তাফবিজে মুতলাক** বোঝেন। সকল সিফাতের **অর্থ** সাব্যস্ত করতে হবে—এমন দৃষ্টিভঙ্গিকে বিচ্যুতি মনে করেন। তাদের বক্তব্য কতটা সঠিক?

সালাফের ইসবাত: (ইসবাতুল মা'না ওয়া তাফবিজুল কাইফিয়্যাহ): কিন্তু বিষয়টি এত সরল নয়। কারণ, সালাফের অনেক বর্ণনাতে যেমন তাফবিজে মুতলাক তথা অর্থ পরিত্যাগ বোঝা যায়, তেমনইভাবে তাদের অনেক বর্ণনাতে **অর্থ** সাব্যস্তও (ইসবাত) বোঝা যায়। যেমন:

• আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজি.-এর হাদিস। তিনি সেটা বর্ণনা করার সময় হাসেন। কারণ হিসেবে বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসেছেন।

---

১. তাবাকাতুল হানাবিলাহ (২/২০৯)।
২. তাহরিমুন নাজার ফি ইলমিল কালাম, ইবনে কুদামা (৫২); লুমআতুল ইতিকাদ (৬)।
৩. সিয়ারু আলামিন নুবালা, জাহাবি (৭/১৮৩)।
৪. ফাতহুল বারি (৩/৩০)।
৫. তাফসিরে কুরতুবি (৪/১৪)।
৬. আল-মুওয়াফাকাত, শাতেবি (৩/৩১৯)।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারণ হিসেবে বলেন, আল্লাহ তায়ালা হেসেছেন।[১] আরেকটি হাদিসে সাহাবি আবু রাজিন রাসুলুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ তায়ালা কি হাসেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সাহাবি বললেন, যে প্রভু হাসেন তার কল্যাণ থেকে আমরা নিরাশ হব না।[২] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজি.-এর অন্য একটি হাদিস, যেখানে একজন ইহুদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আল্লাহ তায়ালা আকাশ এক আঙুলে রাখেন, জমিন আরেক আঙুলে রাখেন...' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনে হাসেন। তিনি কারণ হিসেবে বলেন, রাসুলুল্লাহ সত্যায়ন করেছেন।[৩] এখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিরা যদি 'হাসি' (জাহিক) এর **অর্থ** গ্রহণ না করতেন, তবে হেসে দেখানো অর্থহীন। এর দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহ হাসেন; তবে সেটা নিঃসন্দেহে সৃষ্টির হাসির মতো নয়।

• তাবেয়ি রবিআহ ইবনে আমর রাহি. আল্লাহ তায়ালার বাণী والسماوات مطويات بيمينه -এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'তাঁর অন্য হাত খালি, তাতে কিছু নেই!' ইবনে আব্বাস থেকেও আল্লাহর দুই হাত সংবলিত বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায়[৪]। তাবেয়ি হাকিম ইবনে জাবের, ইকরিমা প্রমুখ থেকেও বর্ণনা পাওয়া যায়। তারা আল্লাহর হাত সাব্যস্ত করতেন এবং হাত দ্বারা স্পর্শ করা, লেখা, আদমকে সৃষ্টি করার কথা।[৫] তারা যদি 'ইয়াদ' তথা হাতের কোনো অর্থ সাব্যস্ত না করতেন, তবে এর দ্বারা সৃষ্ট, স্পর্শ ও লেখার কথা বলতেন না।

• আমরা যদি ইমাম আহমদের মানহাজে নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিই, দেখব, কিছু কিছু বর্ণনা অনুযায়ী তিনি **অর্থ** সাব্যস্ত করতেন না বোঝা গেলেও (যেমনটা পিছনে গেছে) অন্য অনেক বর্ণনায় দেখা যায়, তিনিও সিফাত সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসের স্বাভাবিক **অর্থ** গ্রহণ করতেন (অর্থাৎ إثبات المعنى وتفويض الكيفية)।[৬]

• খাল্লাল (৩১১ হি.) ইমাম আহমদ থেকে বর্ণনা করেন, '**দেখার অর্থ জানা নয়**। ... এর দ্বারা বোঝা যায় 'সামি' এর **অর্থ:** 'বাসির'-এর **অর্থ** থেকে আলাদা।[৭]

---

১. মুসনাদে আহমদ (৩৭৯০)।
২. সুনানে ইবনে মাজা (১৮১); তয়ালিসি (১১৮৮); মুসনাদে আহমদ (১৬৪৩৭)।
৩. বুখারি (৪৮১১); মুসলিম (২৭৮৬)।
৪. তাফসিরে তাবারি (২১/৩২৪-৩২৫)।
৫. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩৫০৮৯); আস সুন্নাহ, আবদুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদ (১/২৯৫-২৯৬)।
৬. ইবতালুত তাবিলাত, আবু ইয়া'লা (১৯৬)।
৭. আকিদাহ (রিওয়াইয়াতু খাল্লাল) (১০২)।

এখানে সুস্পষ্ট যে, ইমাম আহমদ **অর্থ** নির্ধারণ করতেন। একইভাবে তাঁকে যখন আল্লাহর কালাম নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তিনি উত্তর দেন, 'আল্লাহ **আওয়াজ-সহ** কথা বলেন'। এরা দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি অর্থ সাব্যস্ত করেন।'[১]

- ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ (২৩৮ হি.)-এর বক্তব্য থেকেও বোঝা যায় তিনি **অর্থ** নির্ধারণ করতেন।[২]

- আবু হানিফা (১৫০ হি.), মালেক (১৭৯ হি.), আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১৮১ হি.) প্রমুখ সালাফের বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ কায়দ (بلا كيف তথা স্বরূপ-ধরনহীন) প্রমাণ করে, তারা **অর্থ** সাব্যস্ত করেন। **অর্থ** যদি আল্লাহর কাছেই সঁপে দেন, তবে তখন কাইফিয়্যাত থাকা-না থাকার প্রসঙ্গই থাকে না। অর্থ সাব্যস্ত না করলে স্বরূপ নিয়ে কথাই ওঠে না, ফলে ওটাকে নাকচ করার দরকার হয় না। স্বরূপ নিয়ে কথা ওঠে অর্থ সাব্যস্ত করলে, তাই ওটাকে নাকচ করেছেন তারা। এ কারণে মোল্লা আলি কারিও এগুলো সাব্যস্ত করেছেন। মোল্লা আলি কারি ইমাম বাজদাবি ও ইমাম সারাখসি থেকেও এসব **সিফাত সাব্যস্ত** করার কথা বলেছেন। যেমন: ইমাম বাজদাবি বলেছেন, 'হাত ও চেহারা সাব্যস্ত করা আমাদের মাজহাব।' অর্থাৎ এর আসল (মূল) জ্ঞাত, ব্যাখ্যা (ওয়াসফ) অজ্ঞাত (إثبات اليد والوجه حق عندنا، لكنه معلوم بأصله متشابه بوصفه)।[৩]

- একইভাবে সালাফের বড় একদল ইমাম থেকে 'ইস্তিওয়া' শব্দের **অর্থ সাব্যস্ত** সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। অর্থাৎ তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িন-সহ তৃতীয় শতাব্দের অনেক ইমাম 'ইস্তিওয়া'র একাধিক অর্থ করেছেন। ফলে সালাফ আল্লাহর সিফাতের **অর্থ** সাব্যস্ত করতেন না, এমন কথা মজবুতির সঙ্গে নাকচ হয়ে যায়।[৪]

- ইমাম তিরমিজির (২৭৯ হি.) কথা দ্বারাও বোঝা যায়, তিনি **অর্থ সাব্যস্ত করা**কে সালাফের মানহাজ বলছেন। কারণ, তিনি সিফাতের তাবিলের সমালোচনা করে ইবনে রাহাওয়াইহর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন, 'হাতের মতো হাত', 'শ্রবণের মতো শ্রবণ' এভাবে বললে তাশবিহ হয়। কিন্তু শুধু 'হাত', 'শ্রবণ' ইত্যাদি বললে তাশবিহ

---

১. তাবাকাতুল হানাবিলাহ, ইবনে আবু ইয়ালা (১/৪১৫)।
২. মূল কিতাব আবুশ শাইখ আল-আস্পাহানির 'সুন্নাহ'। মূল কিতাব সম্ভবত বিদ্যমান নেই। ইবনে তাইমিয়া এটা থেকে নকল করেন। দেখুন 'আল-ফাতাওয়া কুবরা, ইবনে তাইমিয়া (৬/৪২১)।
৩. মিনাহুর রাওজিল আজহার, আলি কারি (১২১-১২৩)।
৪. বিস্তারিত ইমাম জাহাবির 'আল-উলু' গ্রন্থে দেখা যেতে পারে।

হয় না।'[১] আল্লাহর 'শ্রবণ', 'দর্শন' ইত্যাদি সিফাতের **অর্থ** সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। ফলে এগুলোর সঙ্গে 'হাত' (ইয়াদ) ইত্যাদিকে উল্লেখ করা সুস্পষ্ট দলিল যে, ইমাম তিরমিজি এগুলোর অর্থও সাব্যস্ত করতেন।

- ইমাম তাবারি (৩১০ হি.) আল্লাহর ডান হাত, চেহারা, পা, হাসি, অবতরণ ইত্যাদির **অর্থ** গ্রহণ করেন।[২]

- ইমাম আবুল হাসান আশআরি (৩৩০ হি.) আহলে সুন্নাতের আকিদা বর্ণনা করেন এভাবে: আল্লাহ আরশের উপরে যেমন তিনি বলেছেন, তিনি নুর, তাঁর চেহারা রয়েছে, তাঁর দুই হাত রয়েছে, তাঁর দুই চোখ রয়েছে, তিনি আসেন, অবতরণ করেন![৩] **অর্থ গ্রহণ না করলে এসব শব্দ এভাবে এক জায়গায় নিয়ে এসে বলার কোনো অর্থ নেই।**

- ইবনে আবদুল বার (৪৬৩ হি.) বলেন, 'আহলে সুন্নাত কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত সিফাতগুলোকে **'হাকিকি'** ভাবে মানেন, **মাজাজ (রূপক) অর্থে নয়'** (حملها على الحقيقة على المجاز)[৪]

- ইমাম আবুল ইউসর বাজদাবি (৪৮২ হি.) বলেন, 'আল্লাহর হাত, চোখ ইত্যাদি বিশেষ সিফাত। কুরআন এগুলো সাব্যস্ত করেছে। তাই আমরাও সাব্যস্ত করব।'[৫] ইমাম আবু ইউসর বাজদাবি রাহি. অন্যত্র বলেন, 'আল্লাহ তায়ালার হাত, চোখ ও চেহারা রয়েছে। **এগুলো তাঁর সিফাত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়।**[৬]

- আবদুল কাদের জিলানি (৫৬১ হি.) থেকেও সিফাতগুলোর **'অর্থ'** সাব্যস্ত করার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৭]

- ইমাম কুরতুবি (৬৭১ হি.) আল্লাহর আরশের উপর ইস্তিওয়াকে **হাকিকিভাবে** মানা সালাফের মানহাজ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৮]

---

১. তিরমিজি (৬৬২ নং হাদিসের উপর ইমামের বক্তব্য)।
২. আত-তাবসির, তাবারি (১৩৩-১৩৫)।
৩. মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন, আশআরি (২১১)।
৪. আত-তামহিদ, ইবনে আবদুল বার (৭/১৪৫)।
৫. উসুলুদ্দিন, বাজদাবি (৩৯)।
৬. উসুলুদ্দিন, বাজদাবি (২৫১)।
৭. আল-গুনইয়াহ, জিলানি (১/১২৫)।
৮. তাফসিরে কুরতুবি (৭/২১৯)।

• ইমাম নববি (৬৭৬ হি.) বলেন, 'সিফাতের আয়াত ও সিফাতের হাদিসের ক্ষেত্রে আলিমদের দুটি কর্মপদ্ধতি: **এক**. অধিকাংশ বরং সকল সালাফের মাজহাব হলো **এগুলোর অর্থের** ব্যাপারে কথা না বলা; বরং এগুলো যেমন এসেছে তেমন বিশ্বাস করা এবং **এগুলোর এমন একটি অর্থে বিশ্বাস করা, যা আল্লাহর জন্য শোভনীয় এই বিশ্বাসের সঙ্গে যে, তিনি দেহ, স্থানান্তর, কোথাও স্থির হওয়া-সহ সৃষ্টির সকল বৈশিষ্ট্য থেকে পবিত্র।** এটা একদল মুহাক্কিক মুতাকাল্লিমীনেরও বক্তব্য এবং **এটাই নিরাপদ মানহাজ। দুই**. আর অধিকাংশ মুতাকাল্লিমীনের বক্তব্য হলো, এগুলো অবস্থা অনুযায়ী তাবিল করা।'[১] সুতরাং আল্লাহর জন্য **স্রেফ** শোভনীয় **অর্থ** বিশ্বাস করা তাশবিহ/তাজসিম নয়; বরং এটা সালাফ থেকে প্রমাণিত।

• সাফারিনি (১১৮৮ হি.) সালাফের মানহাজ সম্পর্কে বলেন: 'এ ব্যাপারে সালাফের মানহাজ হলো, এগুলোর **বাহ্যিক অর্থের** উপর ঈমান আনা আর প্রকৃত মর্ম আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া। এটাই ইমাম জুহরি, মালেক, আওজায়ি, সুফিয়ান সাওরি, লাইস ইবনে সাদ, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইমাম আহমদ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ সকলের মানহাজ! সিফাতের ক্ষেত্রে তারা সবাই বলেছেন, أمِرُّوها كما جاءت অর্থাৎ 'যেভাবে এসেছে সেভাবেই রেখে দাও।'[২]

• আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (১৩৫৩ হি.) বলেন, 'নুজুল ও ইস্তিওয়ার ক্ষেত্রে সালাফের মাজহাব হলো, কোনো ধরনের ব্যাখ্যা (তাবিল-তাফসিল) ও স্বরূপ বর্ণনা (তাকয়িফ) ছাড়া ঈমান আনা এবং কাইফিয়্যাত আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া।' তাঁর বক্তব্য থেকেও বোঝা যায়, তিনি সালাফের মুতলাক তাফবিজের পক্ষে নন; বরং তাফবিজুল কাইফিয়্যাহ-এর পক্ষে। ফলে সিফাতের অর্থ সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে তিনি কোনো সমস্যা দেখেন না।[৩]

• আল্লামা আবদুল গনি গুনাইমি হানাফিও সিফাতের **জাহের** সাব্যস্ত করেন। এগুলোর 'ইলম'কে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেন'।[৪]

• কারি তৈয়ব সাহেব রাহি. লিখেছেন, 'কুরআন ও সুন্নাহে হাত, পা, চেহারা, আঙুল, চোখ-সহ আল্লাহর ক্ষেত্রে যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাম ব্যবহার করা হয়েছে,

---

১. শরহে মুসলিম (৩/১৯)।
২. লাওয়ামিউল আনওয়ার, সাফারিনি (১/৯৯)।
৩. আল-আরাফুশ শাজি, কাশ্মীরি (১/৪১৬)।
৪. গুনাইমি (৭৪)।

সেগুলোর **অর্থ** সৃষ্টির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়; বরং সেগুলোর **অর্থ** আল্লাহর জন্য যেভাবে শোভনীয়। আল্লাহর সত্তা যেমন আমাদের সত্তার মতো নয়, আল্লাহর সিফাতগুলোও আমাদের সিফাতের মতো নয়। তাঁর কর্ম (আফআল) আমাদের কর্মের মতো নয়। ... সুতরাং এ ব্যাপারে নিরাপদ পথ হলো, এগুলো **'হাকিকি' অর্থের** উপর রেখে দেওয়া।'[১] কারি সাহেবের উক্ত বক্তব্য তাদের সুস্পষ্ট খণ্ডন, যারা অর্থ সাব্যস্ত করলেই সঙ্গে সঙ্গে তাশবিহ মনে করেন। আবার তাদেরও খণ্ডন, যারা মুখে না বললেও অর্থ সাব্যস্তের ক্ষেত্রে গুলু করে এগুলোকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ/আকার-আকৃতির পর্যায়ে নিয়ে যান (স্রেফ সৃষ্টির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো নয় বলাকে তানজিহ মনে করেন)।

সালাফ থেকে সিফাতের অর্থ সাব্যস্তের ব্যাপারে এত এত বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও একদল আলিম সিফাতের ইসবাত তথা অর্থ সাব্যস্তকে পুরোপুরি নাকচ করেন। কারণ, তারা মনে করেন, এতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত হয়; **অথচ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বোঝা ছাড়াও অর্থ সাব্যস্ত করা যায়।** যেমন আল্লাহ কুরআনে 'ইয়াদ' বলেছেন। ইয়াদ শব্দের শাব্দিক অর্থ বাংলাতে যেহেতু 'হাত' সুতরাং আমি হাত সাব্যস্ত করব। কিন্তু এর দ্বারা সৃষ্টির হাতের মতো তো নয়-ই; বরং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও বুঝব না। তা হলে এতে কোনো জটিলতা থাকার কথা নয়। সালাফের যারা ইসবাত করেছেন, তারা এটা বুঝেই করেছেন। হ্যাঁ, ইসবাতের নামে যদি কেউ 'অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ', 'দেহ' বা 'আকার-আকৃতি' বোঝে, তবে সেটা পরিত্যাজ্য।

সালাফের তাবিল: সালাফ যেভাবে তাফবিজ (মুতলাক এবং ইসবাতুল মা'না দুটোই) করেছেন, তেমনইভাবে প্রয়োজনে তারা তাবিলও করেছেন। উদাহরণ:

- ইবনে আব্বাস (৬৮ হি.) সুরা কলমে আল্লাহর বাণী يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, **এটা দ্বারা কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা বোঝানো হয়েছে।**[২] এভাবে তিনি শব্দের 'গোড়ালি' অর্থ না নিয়ে রূপক অর্থ 'অবস্থার ভয়াবহতা' নিয়েছেন, যা সুস্পষ্ট তাবিল।

- ইবনে আব্বাস ছাড়াও মুজাহিদ (১০২ হি.), সাইদ ইবনে জুবাইর (৯৫ হি.) ও কাতাদাহ (১১৭ হি.) থেকে উক্ত **তাবিল** বর্ণিত আছে।[৩]

---

১. কারি মুহাম্মদ তৈয়ব (৬৭)।
২. তাফসিরে ইবনে আবি হাতিম (১০/৩৩৬৬)।
৩. দেখুন: তাফসিরে তাবারি (২৩/৫৫৫)।

• একইভাবে সুরা আনআমের هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ আয়াতের তাফসিরে ইবনে আব্বাস এবং জাহহাক يأتي أمر ربك হিসেবে তাবিল করেছেন।[১] ফলে এখানে তারা আল্লাহর 'আগমন' বাহ্যিক অর্থের পরিবর্তে এটাকে রূপক অর্থ তথা 'তাঁর নির্দেশের আগমন' গ্রহণ করেছেন।

• وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ আয়াতে ইবনে আব্বাস রাজি. وَجْهُ (চেহারা)-এর তাবিল করেছেন هو عبارة عنه তথা আল্লাহর সত্তা দিয়ে।[২] কাছাকাছি অর্থের অন্য একটি আয়াতে ইমামদের কমপক্ষে চারটি তাবিল রয়েছে। সেটা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণী كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ এখানে তাবিলের বিষয়টি সর্বজনবিদিত। বরং এখানে ইমামগণ এত বেশি তাবিল করেছেন যে, কমপক্ষে চারটি মত তৈরি হয়েছে। এক. আল্লাহর চেহারা। দুই. আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কৃত আমল। ইবনে তাইমিয়াও এর পক্ষে।[৩] তিন. সত্তা। চার. রাজত্ব। এটা ইমাম বুখারির মত।[৪] অর্থাৎ একটি আয়াতের এতগুলো তাবিল এবং সালাফের বড় বড় ইমাম এসব তাবিল করেছেন।

• সুরা বাকারার وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ আয়াতের তাফসিরে ইবনে আব্বাস ও সাইদ ইবনে জুবাইর থেকে বর্ণিত আছে, علمه[৫] অর্থাৎ তারা আল্লাহর কুরসিকে তাঁর জ্ঞান অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। সুফিয়ান সাওরি থেকেও অনুরূপ তাবিল বর্ণিত আছে।[৬]

• সুরা জারিয়াতের وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَٰهَا بِأَيْي۟دٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ এই আয়াতেও ইবনে আব্বাস রাজি. أيد (হাত) -এর ব্যাখ্যা করেন بقوة তথা শক্তি। ইমাম তাবারিও এটাকে অগ্রাধিকার দেন।[৭]

• সুরা ফাজরের وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا আয়াতে ইমাম আহমদ রাহি. ব্যাখ্যা করতেন وجاء أمرك ربك দিয়ে। অর্থাৎ ইমাম আহমদ আল্লাহর আগমনের অর্থ না করে তাঁর নির্দেশ আগমনের অর্থ নিতেন! উক্ত বর্ণনার পরে বাইহাকি লিখেন, এর সনদে

---

১. দেখুন: তাফসিরে কুরতুবি (৭/১৪৪)।
২. তাফসিরে কুরতুবি (২/৮৪)।
৩. মাজমুউল ফাতাওয়া (২/৪৩৩)।
৪. বুখারি (৪৭৭২)।
৫. দেখুন: তাফসিরে ইবনে আবি হাতিম (২/৪৯১)।
৬. দেখুন: তাফসিরে সুফিয়ান সাওরি (৭১); আল-আসমা ওয়াস সিফাত (১/৩০৮)।
৭. দেখুন: তাফসিরে তাবারি (২২/৪৩৮)।

কোনো অস্পষ্টতা নেই।[১] ইবনে হাজামও ইমাম আহমদ থেকে এই তাবিল বর্ণনা করেছেন।[২] আবু ইয়া'লার বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি এর তাবিল করেছেন وجاءت قدرته।[৩] কেবল ইমাম আহমদ নন; বরং তাঁর আগে হাসান বসরি (১১০ হি.) وَجَاءَ رَبُّكَ (আল্লাহর আসা) -এর তাবিল করেছেন جاء أمره وقضاءه অর্থাৎ তার ফয়সালা আসা।[৪] তাঁর পরে ইমাম আবু বকর জাসসাস একই ব্যাখ্যা (আল্লাহর নির্দেশ) করেছেন এবং বাহ্যিক অর্থ নাকচ করেছেন।[৫] ইবনে আবু হাতিমও (৩২৭ হি.) এটাকে তাবিল করেছেন।[৬]

- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস حتى يضع فيها قدمه (জাহান্নামে আল্লাহর পা রাখবেন)-এর ব্যাখ্যায় হাসান বসরি (১১০ হি.) قدم (পা)-এর তাবিল করেছেন العلم السابق (পূর্ব জ্ঞান) দিয়ে।[৭] ইবনে হিব্বান (৩৫৪ হি.) তাঁর সহিহ গ্রন্থে উক্ত হাদিসে ব্যবহৃত قدم-এর তাবিল করেছেন موضع শব্দের মাধ্যমে।[৮]

- ইমাম মালেক (১৭৯ হি.) حديث النزول (আল্লাহর অবতরণ)-এর তাবিল করেছেন نزول الأمر (নির্দেশ অবতরণ)-এর মাধ্যমে। ইয়াহইয়া ইবনে বুকাইর রাহি. যখন এটা শোনেন, তিনি বলেন, 'মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর!' ইবনে আবদুল বার ইমাম মালেক রাহি.-এর উক্ত বক্তব্য নকল করেছেন এবং এটাকে সমর্থন করেছেন। পাশাপাশি নুআইম ইবনে হাম্মাদ-সহ যারা النزول الذاتي (সত্তাগত অবতরণ) এর পক্ষে ছিলেন তাদের বক্তব্য খণ্ডন করেছেন। ইবনে আবদুল বারের মতে, **'সত্তাসহ' শব্দটা যোগ করা স্বরূপ (কাইফিয়্যাত) নির্ধারণ করা।** এটা আহলে সুন্নাতের কাছে গ্রহণযোগ্য বক্তব্য নয়। কারণ, এটা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, আল্লাহর ক্ষেত্রে নয়। কুরআন-সুন্নাহে এমন কথা নেই। সুতরাং এটা বলা মনগড়া বক্তব্য হিসেবে পরিগণিত হবে।[৯] অন্য

---

১. বাইহাকির মানাকিবে আহমদ থেকে ইবনে কাসির বর্ণনা করেন। দেখুন: আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১০/৩৬১)।
২. আল ফাসল, ইবনে হাজাম (২/১৩২)।
৩. ইবতালুত তাবিলাত, আবু ইয়া'লা (১৩২)।
৪. তাফসিরে বাগাবি (৫/২৫২)। এ ব্যাপারে ইমাম কুরতুবি রাহি.-এর সুন্দর ও শক্তিশালী বক্তব্য দেখুন। তিনি উক্ত আয়াত-সহ কুরআনে আল্লাহর আসা সম্পর্কিত আরও একটি আয়াতের তাবিল করেছেন 'আমি অসুস্থ ছিলাম তুমি দেখতে আসোনি' হাদিসের মানহাজে; তাফসিরে কুরতুবি (২০/৫৫)।
৫. আহকামুল কুরআন, জাসসাস (১/৩৯৭)।
৬. তাফসিরে ইবনে আবি হাতিম (২/৩৭৩)।
৭. আল গরিবাইন ফিল কুরআন ওয়াল হাদিস, হারাবি (৫/১৫১৩); আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বাইহাকি (২/১৯০)।
৮. সহিহ ইবনে হিব্বান (২৬৮)।
৯. আত-তামহিদ, ইবনে আবদুল বার (৭/১৪৪-১৪৫); সিয়ারু আলামিন নুবালা, জাহাবি (৭/১৮৩); শরহে মুসলিম, নববি (৬/৩৬-৩৭)।

জায়গায় ইবনে আবদুল বার লিখেন, নিজেদের আহলে সুন্নাত দাবিদার এক সম্প্রদায় বলে, আল্লাহ **সত্তাগতভাবে** অবতরণ করেন। এমন বক্তব্য বর্জনীয়। কারণ, আল্লাহর সত্তা নব-উদ্ভাবিত কোনো কাজের স্থান নয়। সৃষ্টির কোনো বিশেষণ তাঁর মাঝে নেই।[১]

- কাজি আবু বকর ইবনুল আরাবি মালেকিও (৫৪৩ হি.) নুজুলের হাদিসকে তাবিল করেন। তিনি বলেন, এর দ্বারা তাঁর সত্তা উদ্দেশ্য নয়, বরং তাঁর আদেশ-নির্দেশ উদ্দেশ্য।[২]

- ইমাম বুখারি (২৫৬ হি.) হাদিসে বর্ণিত আল্লাহর হাসিকে (ضحك) 'রহমত' শব্দে তাবিল করেছেন।[৩]

- ইবনে আবদুল বার (৪৬৩ হি.) একইভাবে আল্লাহর হাসি (ضحك) এর অর্থ লিখেন: রহমত, সন্তুষ্টি ও ক্ষমা। (ضحك) শব্দটি এখানে রূপক (مجاز)। মানুষের হাসির মতো আল্লাহ হাসেন এমন বোঝা যাবে না। কারণ, তাঁর মতো কেউ নেই।[৪]

- ইমাম তিরমিজি (২৭৯ হি.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস لَوْ أَنَّكُمْ دَلَّيْتُمْ بِحَبْلٍ إِلَى الْأَرْضِ السُّفْلَى لَهَبَطَ عَلَى اللهِ অর্থাৎ 'যদি তোমরা একটা রশি সর্বনিম্ন ভূগর্ভ পর্যন্ত ঝুলিয়ে দাও, তবে তা আল্লাহর উপর গিয়ে পড়বে! ইমাম তিরমিজি এটার তাবিল করেছেন 'আল্লাহর ইলম ও কুদরত'।[৫] একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস: وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا اقْتَرَبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً অর্থাৎ 'যদি বান্দার আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে এক বাহু অগ্রসর হই। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।' ইমাম তিরমিজি এবং আ'মাশ (১৪৭ হি.) ক্ষমা ও রহমতের মাধ্যমে তাবিল করেছেন।[৬] একইভাবে ইমাম তিরমিজি রাহি. يَأْتِي الْقُرْآنُ وَأَهْلُهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ (সুরা আসবে)

---

১. আল-ইসতিজকার, ইবনে আবদুল বার (২/৫৩০)।
২. ফাতহুল বারি, ইবনে হাজার (৩/৩০)।
৩. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বাইহাকি (২/৪০২)।
৪. আল-ইসতিজকার (৫/৯৭)।
৫. তিরমিজি (৩২৯৮)।
৬. তিরমিজি (৩৬০৩)।

হাদিসের তাবিল করে লিখেছেন, সুরা পাঠের সওয়াব আসবে![১] ইমাম আহমদও উক্ত হাদিসের তাবিল করেছেন ‘সওয়াব’ দিয়ে।[২]

- ইমাম ইবনে হিব্বান (৩৫৪ হি.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ উল্লেখ করে বলেন, এটা মানুষ যেভাবে বোঝে সেভাবে বোঝানো হয়েছে, প্রকৃত অর্থে নয়। কারণ মানুষ সেটা বুঝবে না।[৩]

খালাফের মতাদর্শ: পিছনে আমরা দেখলাম, আকিদার ক্ষেত্রে সালাফ তাশবিহ ও তাতিলের মাঝামাঝি তানজিহের মানহাজ অবলম্বন করেছেন। তবে এই তানজিহ একভাবে নয়; বরং তারা কমপক্ষে তিন ভাগে গ্রহণ করেছেন: ইসবাত, তাফবিজ ও তাবিল। এর কারণ, সকল সিফাত একপর্যায়ের কিংবা সেগুলোর বর্ণনা কুরআন-সুন্নাহে একভাবে আসেনি। পাশাপাশি সেগুলো সিফাত কি সিফাত নয় এসব বিষয় নিয়েও রয়েছে জটিলতা। ভাষাগত সীমাবদ্ধতা আরেকটি বড় জটিলতা। তাছা ড়া সালাফ শব্দ ও এর প্রয়োগেরও জটিলতা আছে। সাহাবাদের যুগের সালাফ আর তৃতীয় শতাব্দের সালাফ এক নন। ফলে যেখানে সাহাবাদের যুগে সিফাতের মাসআলা নিয়ে তেমন কোনো আলোচনাই হতো না, সেখানে তৃতীয় শতকে এগুলোর উপর আলাদা বই প্রকাশ পেতে লাগল। **তাই সকল সিফাতে সকল সালাফের একটি মানহাজ ছিল—এটা গলদ দাবি। বরং এই দাবির কারণেই আহলে সুন্নাতের ভেদাভেদ আরও বেড়েছে। বাস্তবতা হলো, যুগ, ব্যক্তি ও সিফাতভেদে সালাফের দৃষ্টিভঙ্গিও বিভিন্ন হয়েছে, যেমনটা পিছনে দেখা গেছে। ফলে সালাফ থেকে বর্ণিত সকল মতামত একত্র করলে একটা মানহাজ নয়, একাধিক মানহাজ প্রকাশ পায়। আর এ কারণেই সিফাতেকন্দ্রিক মাসআলাতে উম্মাহ বিভক্ত হয়ে গেছে। সিফাতের ক্ষেত্রে সালাফের সুনির্ধারিত একটা মানহাজ ছিল আর মুসলিম উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সেখান থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে—এমন চিন্তা গলদ।**

যা-ই হোক, **সালাফ বিভিন্ন সিফাতের ক্ষেত্রে সেটার মুনাসিব পন্থা অবলম্বন করেছেন। ফলে কখনও তারা তাফবিজে মুতলাক করেছেন, কখনও অর্থের ইসবাত**

---

১. তিরমিজি (২৮৮৩)।
২. মাজমুউল ফাতাওয়া (৮/৪০৯)।
৩. সহিহ ইবনে হিব্বান (৪৪৮৪)।

এবং কাইফিয়্যাতের তাফবিজ করেছেন; আবার কখনও তাবিল করেছেন। এই বিভিন্নতার কারণেই পরবর্তী সময়ে ভিন্নতা আরও বেড়েছে। ফলে উম্মাহর মাঝে একাধিক মানহাজ তৈরি হয়েছে, যাদের সকলেই আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত ও সালাফের অনুসারী দাবি করা সত্ত্বেও 'সালাফের মানহাজ' ব্যাখ্যায় পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন। একদল আলিম সালাফের মানহাজ বলতে বোঝেন 'তাফবিজ' (মুতলাক) এবং 'তাবিল'। ইসবাত তথা **অর্থ** সাব্যস্তকরণকে তারা সাদৃশ্যবাদ কিংবা দেহবাদ মনে করেন এবং এর বিরোধিতা করেন।[১] অপর দল সালাফের মানহাজ বলতে কেবল **বাহ্যিক অর্থ/ সরল অর্থ** সাব্যস্ত ও স্বরূপ তাফবিজ বোঝেন; মুতলাক তাফবিজ ও তাবিলকে সিফাত অস্বীকার ও জাহমিয়্যাহদের মত হিসেবে আখ্যা দেন এবং তাফবিজকারীদের গোমরাহ বলেন।[২] **দুটি দলই** কমবেশি প্রান্তিকতার শিকার।

প্রথম দল সালাফের তাফবিজ-সংক্রান্ত আয়াতগুলোকে মুতলাক হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[৩] তাদের মতে, এটাই সালাফের মানহাজ। সালাফ এগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলা সমীচীন মনে করতেন না। বরং তারা এগুলো বাহ্যিক অবস্থার উপর ছেড়ে দিতেন। এগুলোর অর্থ (المعنى) আল্লাহর কাছে সঁপে দিতেন।[৪] অথচ আমরা পিছনে দেখেছি, এটা সর্বত্র সঠিক নয়। কারণ, সালাফ বিভিন্ন সিফাতের অর্থ সাব্যস্ত করেছেন। **সালাফ থেকে বিভিন্ন সিফাতের অর্থ সাব্যস্তকরণ এতটাই সুস্পষ্ট ও সুপ্রমাণিত যে, এটা অস্বীকারের কোনো সুযোগ নেই।**

এ দল সিফাতকে বোঝার জন্য কেবল তাফবিজের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেন না; বরং তারা মনে করেন যেহেতু সিফাতের বাহ্যিক অর্থ জানা নেই, তাই আয়াতগুলোর রূপক অর্থ (যা শরিয়াহর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে) তা গ্রহণ করতে অসুবিধা নেই। এ কারণে তারা আল্লাহর সিফাতগুলো তাশবিহ (সৃষ্টির সাদৃশ্য) থেকে বাঁচার জন্য তাবিল করেন।[৫] ফলে এ দল তাফবিজের পাশাপাশি তাবিলেরও সমর্থক।

কিন্তু তাবিলের ক্ষেত্রে তারা অতিরঞ্জনের শিকার হয়েছেন। সালাফ থেকে বর্ণিত তাবিলের সংখ্যা বেশ সীমিত, যার কিছু উদাহরণ আমরা পিছনে উল্লেখ করেছি। বরং

---

১. বাজলুল মাজহুদ (৫/৫৫৯)।
২. শুআইবি (৩৫৪)।
৩. বিস্তারিত দেখুন: ইবনুল জাওজির দাফউ শুবুহাতিত তাশবিহ গ্রন্থে শাইখ জাহেদ কাওসারি এবং হাসান সাক্কাফের টীকা ও ব্যাখ্যা।
৪. আল-আকিদাহ আন নিজামিয়্যাহ (১৬৫-১৬৬)। আল-বুরহান ফি উলুমিল কুরআন, জারকাশি (২/৭৮); আল-জাওহারাহ ফি ইলমিত তাওহিদ, লাকানি (পঙক্তি নং ৪০)।
৫. আসাসুত তাকদিস, রাজি (৯৬); ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, গাজালি (১/১০২)।

তারা সাধারণত তাফবিজ এবং ইসবাত করতেন। বিপরীতে উন্মুক্ত তাবিলের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাই ক্ষেত্রবিশেষে তাবিল করা হলে কিংবা সাধারণভাবে তাফবিজ ও ইসবাত এবং কিছু জায়গায় তাবিল করা হলে (যেসব জায়গায় সালাফ যা করেছেন) ভারসাম্যপূর্ণ হতো। কিন্তু সব জায়গায় তাবিল করা এবং এটাকে মানহাজ বানিয়ে নেওয়া সালাফের মানহাজ নয়। পিছনে আমরা সালাফের তাবিলের কিছু উদাহরণ দেখেছি। এবার তাদের তাবিল বিরোধিতার কিছু উদাহরণ দেখব।

- ইমাম আবু হানিফা রাহি. তাবিল নিষেধ করেছেন। 'হাত', 'চেহারা', 'নাফস'-কে তিনি যেভাবে কুরআনে এসেছে সেভাবে (সিফাত; অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়) বিশ্বাস করতে বলেছেন। কুদরত ও নিয়ামতের মাধ্যমে এগুলো তাবিল করতে বারণ করেছেন।[১] একইভাবে তিনি আল্লাহর 'সন্তুষ্টি' ও 'ক্রোধ'-কেও পুরস্কার ও শাস্তি ইত্যাদি শব্দে তাবিল করতে নিষেধ করেছেন।[২]

- ইমাম মুহাম্মাদ রাহি.-এর কথা দ্বারাও বোঝা যায়, তিনি তাবিল করতে নিষেধ করেছেন। বরং এটাকে আহলে সুন্নাতের বিরোধিতা বলেছে।[৩]

- সহিহ বুখারির কিতাবুত তাওহিদের অন্তর্গত হাদিসের শিরোনামগুলোর দিকে তাকালে যে কারও বুঝে আসবে, ইমাম বুখারিও আল্লাহ তায়ালার 'নাফস', 'চেহারা', 'চোখ', 'হাত' ইত্যাদি (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়) সাব্যস্ত করতেন।

- ইমাম আবুল হাসান আশআরি আল্লাহর সিফাতগুলোকে হাকিকিরূপে (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়) বিশ্বাস করতেন এবং সেগুলোকে মাজাজ (রূপক) বলার সমলোচনা করেছেন।[৪]

- ইমাম তিরমিজি (২৭৯ হি.) তাবিলকে জাহমিয়্যাহদের সিফাত বলেছেন।[৫]

- ইমাম তহাবিও (৩২১ হি.) পুরো আকিদা গ্রন্থে কোনো সিফাত তাবিল করেননি; বরং তিনি আল্লাহর কালাম, সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি ইসবাত করেছেন।

- ইস্তিওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাতে ইমাম আবুল ইউসর বাজদাবি (৪৮২ হি.)-কে দেখি (বিভিন্ন কুয়ুদ-সহ) ইসবাত করতে; তাবিল গ্রহণ করেননি।[৬]

---

১. আল-ফিকহুল আকবার, আবু হানিফা (২৭)।
২. আল-ফিকহুল আবসাত (১৫৯)।
৩. শরহুস সুন্নাহ, লালাকায়ি (৩/৪৮০); ফাতহুল বারি (১৩/৪০৭)।
৪. আল-ইবানাহ, আশআরি (১৩৯-১৪০)।
৫. তিরমিজি (৬৬২ নং হাদিসের উপর ইমামের বক্তব্য)।
৬. উসুলুদ্দিন, বাজদাবি (২৫১-২৫২)।

- আবদুল কাদের জিলানি (৫৬১ হি.) তাবিল নিষেধ করেছেন এবং সকল তাবিলকারীর শক্ত সমালোচনা করেছেন।[১]

- ইবনে দাকিকুল ঈদও (৭০২ হি.) প্রয়োজন ছাড়া তাবিল করতে বারণ করেছেন।[২]

- আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি বলেন, 'আহলে সুন্নাতের মূল মানহাজ হলো 'তাফবিজ'। আর তাবিল করা হবে প্রয়োজনে এবং ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে দরকার হলে।'[৩]

- আল্লাহর এসব সিফাত কীভাবে বুঝতে হবে সে ব্যাপারে অত্যন্ত মূল্যবান কথা লিখেছেন দারুল উলুম দেওবন্দের অর্ধ শতাব্দীর মুহতামিম কারি তৈয়ব ছাহেব রাহি.। তিনি দারুল উলুমের মুহতামিম ছিলেন বলে তাঁর কথা মূল্যবান— বিষয়টা তেমন নয়; বরং সিফাতের ক্ষেত্রে তিনি সেই আকিদা রাখতেন, যে আকিদা ছিল ইমাম আজম রাহি., ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম তহাবির। পরবর্তী আলিমদের বক্তব্য দ্বারা তিনি প্রভাবিত হননি। ফলে আকিদার ক্ষেত্রে কারি তৈয়ব সাহেব দেওবন্দি সিলসিলার এক সাহসী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। কারি সাহেব লিখেছেন:

فذاته ليس كذواتنا، وصفاته ليست كصفاتنا، وهكذا الأفعال والشؤون وجميع المتشابهات، فهو يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويسمع لا كسمعنا، وهكذا يعرج لا كعروجنا، وينزل لا كنزولنا، ويضحك لا كضحكنا، ويستوي على العرش لا كاستوائنا على عروشنا، لأنه ليس كمثلنا، فليس لله مثل...

অর্থাৎ 'আল্লাহর সত্তা যেমন আমাদের সত্তার মতো নয়, তেমনই আল্লাহর গুণাবলিও আমাদের গুণের মতো নয়। একই কথা কাজ-কর্ম ও সব ধরনের মুতাশাবিহাত (অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থক বিষয়াবলির) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ফলে আল্লাহ জানেন, কিন্তু আমাদের জানার মতো নয়। আল্লাহ দেখেন, কিন্তু আমাদের দেখার মতো নয়। আল্লাহ শোনেন, কিন্তু আমাদের শোনার মতো নয়, আল্লাহ 'উরুজ' (ঊর্ধ্বগমন) করেন,

---

১. আল-গুনইয়াহ, জিলানি (১/১২৫)।
২. গুনাইমি (৭৪)।
৩. আল-আরাফুশ শাজি, কাশ্মীরি (১/৪১৬)।

কিন্তু আমাদের উর্ধ্বগমনের মতো নয়। **আল্লাহ নুজুল (অবতরণ) করেন, কিন্তু সেটা আমাদের অবতরণের মতো নয়। আল্লাহ হাসেন (জাহিক), কিন্তু সেটা আমাদের হাসার মতো নয়। আল্লাহ আরশে ইস্তিওয়া করেন, কিন্তু সেটা আমাদের সিংহাসনে ইস্তিওয়ার মতো নয়। কেননা, তিনি আমাদের মতো নন। আল্লাহর মতো কিছু নেই।**[১]

কারি সাহেব অন্যত্র আরও স্পষ্ট ভাষায় এসব সিফাতের তাবিলকে নাকচ করেছেন। তিনি লিখেন:

والمذهب المنصور إثبات صفة الغضب والرضى والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك لله تعالى، كاثبات السمع والبصر والحياة والقدرة والعلم والكلام وغيرها، وهي حقيقة فيه تعالى لا مجاز، لكن لا ندري كيفيتها، ولا يجوز التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، فالغضب والرحمة وغيرهما وإن اطلقت على الانسان كما تطلق على الله جل ذكره، لكن هذا الاشتراك لفظى لا من حيث المعنى، فيثبت معنى الرضا والغضب فيه جل ذكره كما يليق بشانه، هذا غضب مالك خازن النار وغضب الملائكة على المنكرين لا يجب ان يكون مماثلا لغضب الآدميين، لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة حتى تغلي قلوبهم دما كما يغلى دم قلب الانسان عند غضبه، فما ظنك بغضب الله اللطيف الخبير المنزه عن الجسم وخواصه والمقدس عن الروح ولوازمه سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.

অর্থাৎ **'এ ব্যাপারে হক মাজহাব হলো, আল্লাহর ক্রোধ, সন্তুষ্টি, শত্রুতা (আদাওত), বন্ধুত্ব (বেলায়াত), পছন্দ, অপছন্দ ইত্যাদিকে সেভাবে মেনে নিতে হবে, যেভাবে শ্রবণ, দর্শন, জীবন (হায়াত), ক্ষমতা (কুদরত), ইলম, কালাম ও অন্যান্য সিফাতকে মেনে নেওয়া হয়। এগুলো আল্লাহর ক্ষেত্রে সব হাকিকত, মাজাজ নয়।** হ্যাঁ, আমরা এগুলোর স্বরূপ জানি না; কিন্তু তাই বলে **এগুলোকে এমনভাবে তাবিল করা**

---

১. কারি মুহাম্মাদ তৈয়ব (৩৬)। কারি তৈয়ব সাহেব (র.) এর ওপরের বক্তব্য সালাফের সিফাত-সংক্রান্ত মানহাজ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে কারি সাহেব উদাহরণ দিতে গিয়ে আল্লাহর 'উরুজ' তথা উর্ধ্বগমনের কথা বলেছেন, এটা ভুল। কারণ, কুরআন-সুন্নাহ কিংবা সালাফে সালেহিন আল্লাহর উপর 'উরুজ' শব্দ প্রয়োগ করেননি, ফলে এটা প্রয়োগ করা যাবে না। উদাহরণ দিতে গিয়েও আল্লাহর উপর এমন কোনো শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না, যা কুরআন-সুন্নাহ কিংবা সালাফ দ্বারা সমর্থিত নয়।

যাবে না, যা আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য **হাকিকতকে** নাকচ করে দেয়! ক্রোধ ও রহমত ইত্যাদি মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলেও সাদৃশ্য কেবল শব্দের ক্ষেত্রে। অর্থের ক্ষেত্রে কোনো সাদৃশ্য নেই। তাই আল্লাহর জন্য সন্তুষ্টি ও ক্রোধের **অর্থ** সাব্যস্ত করা হবে যা তাঁর শানের জন্য শোভনীয়। জাহান্নামের ফেরেশতা মালেক-সহ অন্যান্য ফেরেশতাও রাগ করেন, তাই বলে তাদের রাগ কি মানুষের মতো? তাদেরও কি শরীরে রক্ত গরম হয়ে যেতে হয় যেমন মানুষের হয়? তা হলে আল্লাহর কেন হতে হবে যিনি সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, রুহ এবং এ-জাতীয় সকল আবশ্যকতা থেকে পবিত্র?'[১]

- বরং শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি রাহি.-এর এতৎসংশ্লিষ্ট বক্তব্য আরও শক্ত। তিনি বলেন,

أَقُول لَا فرق بَين السّمع وَالْبَصَر وَالْقُدْرَة والضحك وَالْكَلَام والاستواء فَإِن الْمَفْهُوم عِنْد أهل اللِّسَان من كل ذَلِك غير مَا يَلِيق بجناب الْقُدس، وَهل فِي الضحك اسْتِحَالَة إِلَّا من جِهَة أَنه يَسْتَدْعِي الْفَم، وَكَذَلِكَ الْكَلَام؟ وَهل فِي الْبَطْش وَالنُّزُول اسْتِحَالَة إِلَّا من جِهَة أَنَّهُمَا يستدعيان الْيَد وَالرجل؟ وَكَذَلِكَ السّمع وَالْبَصَر يستدعيان الْأذن وَالْعين، وَالله أعلم.

واستطال هَؤُلَاءِ الخائضون على معشر أهل الحَدِيث، وسموهم مجسمة ومشبهة، وَقَالُوا هم المتسترون بالبلكفة، وَقد وضح عَليّ وضوحا بَينا أَن استطالتهم هَذِه لَيست بِشَيْء وانهم مخطئون فِي مقالتهم رِوَايَة ودراية وخاطئون فِي طعنهم أَئِمَّة الْهدى.

অর্থাৎ 'আল্লাহর শ্রবণ, দর্শন, কুদরত, হাসি, কথা, ইস্তিওয়া—এগুলোর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা এক্ষেত্রে এ সবগুলোর প্রচলিত অর্থই আল্লাহর জন্য শোভনীয় নয়। যেমন: হাসি দিতে ও কথা বলতে গেলে মুখ দরকার হয়; ধরতে ও অবতরণ করতে গেলে হাত ও পা দরকার হয়; শুনতে ও দেখতে গেলে কান ও চোখ দরকার হয়।' (ফলে এগুলোর প্রচলিত অর্থের একটিও আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য নয়; বরং তার জন্য সেভাবে প্রযোজ্য যেভাবে তাঁর শানের জন্য শোভনীয়। সুতরাং দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁর শানের শোভনীয় অর্থ গ্রহণ করা গেলে ইস্তিওয়া,

---

১. কারি মুহাম্মাদ তৈয়ব (১৩৬)।

নুজুল ইত্যাদির ক্ষেত্রে কেন যাবে না?—বন্ধনীর ভিতরের বক্তব্যটুকু ইমামের কথা স্পষ্টীকরণের জন্য অধমের ব্যাখ্যা)

'কিন্তু এ কারণে তারা মুহাদ্দিসিনে কেরামের উপর বাড়াবাড়ি করেছে। তাদের মুজাসসিমাহ-মুশাববিহাহ আখ্যা দিয়েছে। তাদের 'বালকাফা' (বিলা কাইফ)-কে ঢালস্বরূপ গ্রহণকারী (দেহবাদী) সাব্যস্ত করেছে। আমার কাছে দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট যে, তাদের এই বাড়াবাড়ি মূল্যহীন। তাদের বক্তব্য সাকুল্যে ভুলে ভরা। ইমামদের ব্যাপারে তাদের সমালোচনা অন্যায্য।'[১]

দ্বিতীয় দলের জটিলতাও কম নয়। প্রথম দল যেখানে সালাফের দুটি মানহাজ (তাফবিজ ও তাবিল) সাব্যস্ত করে থাকে, দ্বিতীয় দল দুটোকেই প্রত্যাখ্যান করেন এবং কেবল ইসবাত তথা (তাদের মতানুযায়ী) **বাহ্যিক অর্থ** সাব্যস্তকরণকেই সকল সিফাতের ক্ষেত্রে সকল সালাফের মানহাজ হিসেবে আখ্যা দেন। কিন্তু **এটা সঠিক বক্তব্য নয়।** পাশাপাশি সময়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া বিবর্তনের ফলে সালাফ এবং এই দলের আলিমদের মাঝে দুই ধরনের জটিলতা পরিলক্ষিত হয়:

এক. ইসবাতের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন। এটা করতে গিয়ে যেখানে খোদ সালাফও তাবিল করেছেন কিংবা নীরব থেকেছেন, সেসব জায়গাও তারা ইসবাত করেছেন। অর্থাৎ ধরা যাক, সালাফ পাঁচ জায়গায় ইসবাত করেছেন, কিন্তু তারা মনে করেছেন সব জায়গায় ইসবাত করতে হবে এবং তা-ই করেছেন। ফলে তারাও সব জায়গায় ইসবাত করেন। উপরন্তু ইসবাত করতে গিয়ে কেবল শব্দার্থ নির্ধারণেই ক্ষান্ত থাকেন না, বরং জাহে**র/হাকিকি/সরল/প্রকৃত/বাহ্যিক** ইত্যাদি বিভিন্ন পরিভাষা নিজেদের পক্ষ থেকে প্রয়োগ করেন। ইমাম আহমদ রাহি. মৃত্যুর একদিন আগেও বলে যান, وَلَا يُوصف الله بِأَكْثَرَ مِمَّا وصف بِهِ نَفسه بِلَا حد وَلَا غَايَة অর্থাৎ 'আল্লাহ নিজের জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন, এরচেয়ে বেশি কিছু তাঁর জন্য সাব্যস্ত করা যাবে না। আর সেগুলোও সাব্যস্ত করতে হবে সীমা-পরিসীমা বর্ণনা ছাড়া।'[২] সুতরাং সিফাতের অর্থ সাব্যস্ত করার সময় নিজেদের পক্ষ থেকে সেসব সিফাতের উপর কোনো মনগড়া শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না।

ইসবাতের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনের ফলে আরেকটি বিচ্যুতি তৈরি হয়েছে; সেটা হলো, তাফবিজের সামগ্রিক বর্জন। তারা তাফবিজকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেন

---

১. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (১/১২৪)।
২. আকিদাহ (রিওয়াইয়াতু খাল্লাল) (১২৭)

এবং তাফবিজকারীদের মুআত্তিলাহ বলেন! তাফবিজকে কুরআন-সুন্নাহর তাজহিলকরণ বলেন! তাদের কেউ কেউ তাফবিজকে সালাফের মানহাজ তো নয়ই বরং বিদআতি ও মুলহিদদের নিকৃষ্টতম বক্তব্য আখ্যা দিয়েছেন! অথচ আমরা পিছনে দেখেছি, খোদ ইমাম আহমদ ও অন্যান্য সালাফ একাধিক জায়গায় তাফবিজ করেছেন। বরং একটু পরে দেখব, ইমাম জাহাবি রাহি. সুস্পষ্টভাবে تفويض المعنى বলবেন! সুতরাং কোনো সালাফ তাফবিজ করেননি এটা বলে তাফবিজকারীদের ঢালাওভাবে বিদআতি ও মুলহিদ বলা অগ্রণযোগ্য বক্তব্য।

প্রশ্ন হতে পারে, আসলেই কি তাফবিজ মানে তাতিল ও কুরআনের তাজহিল? বাস্তবে বিষয়টি মোটেই তেমন নয়। বরং তাফবিজ হলো, আল্লাহ তায়ালা যা বলেছেন সেটাকে মেনে নেওয়া এবং গভীর মর্ম ও স্বরূপ তাঁর কাছে সঁপে দেওয়া। তাফবিজ মুতলাক ও তাফবিজ কাইফিয়্যাহর মাঝে কিছু পার্থক্য থাকলেও চূড়ান্ত নতিজা এক। ফলে একটাকে সালাফের মানহাজ বলে অন্যটাকে সিফাতের তাতিল ও কুরআন-সুন্নাহর তাজহিল বলার সুযোগ নেই। সামনে এ ব্যাপারে সবিস্তারে আলোচনা আসবে।

দুই. তাবিল পরিত্যাগের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি এবং তাকাল্লুফ। আমরা একটু আগে বলেছি, তাবিল যেমন সালাফের মানহাজ নয়, তেমনই সর্বাত্মকভাবে পরিত্যাজ্যও নয়। তারা প্রয়োজনে তাবিল করেছেন, যার অনেকগুলো উদাহরণ পিছনে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ ধারার আলিমগণ সিফাতের ক্ষেত্রে তাবিলকে সামগ্রিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। বরং তাবিলকে তারা তাতিল (তথা সিফাত অস্বীকার) হিসেবে আখ্যা দেন এবং উম্মাহর বড় বড় ইমামকে—যেমন: আবু মানসুর আল-মাতুরিদি, আবু হামেদ গাজালি, ফখরুদ্দিন রাজি—মুআত্তিলাহ তথা সিফাত অস্বীকারকারী আখ্যা দেন। তাদের কেউ কেউ 'মাজাজ' ও 'তাবিল'কে 'তাগুত' হিসেবে দেখেন এবং এটাকে তাতিল ও তাশবিহ থেকেও খারাপ বলেন! অথচ তারা নিজেরাও প্রয়োজনে নিজেদের গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গাতে তাবিল করেছেন।

এটা অস্বাভাবিক নয়; কারণ অনেক ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে বড় ধরনের জটিলতা তৈরি হবে। ফলে পিছনে আমরা দেখেছি সালাফও কীভাবে তাবিল করেছেন। তাই ক্ষেত্রবিশেষে বরং তারাও তাবিল করেন। যেমন: ইবনে আব্বাস রাজি.-এর বক্তব্য الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، فَمَنْ صَافَحَهُ وَقَبَّلَهُ فَكَأَنَّمَا صَافَحَ اللهَ وَقَبَّلَ يَمِينَهُ অর্থাৎ 'হজরে আসওয়াদ পৃথিবীতে আল্লাহর ডান হাত। সুতরাং যে ব্যক্তি এটাকে স্পর্শ করবে কিংবা চুমু খাবে, সে যেন আল্লাহর ডান হাতে

চুমু খেল।' স্পষ্ট যে, এখানে শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং পাথরে চুমু খাওয়ার গুরুত্ব বোঝানো উদ্দেশ্য। কিন্তু এ ধারার আলিমগণ যেহেতু তাবিলকে সামগ্রিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেন, ফলে এগুলো বাহ্যিকভাবে তাবিল করতে চান না। এমনভাবে এগুলো ব্যাখ্যা করেন, যাতে তাদের মতাদর্শ ঠিক থাকে, আবার ইবনে আব্বাসের বক্তব্যও ছুড়ে ফেলা না হয়। শেষে বলেন, সুতরাং এখানে কোনো তাবিল নেই। অথচ তাদের বক্তব্য প্রতিপক্ষের থেকেও বেশি তাবিলে ভরপুর।[১] স্বয়ং ইমাম ইবনে হামদান রাহি. লিখেছেন, ইমাম আহমদ অনেক আয়াত ও হাদিস তাবিল করেছেন। তন্মধ্যে উপরের আসারটিও তিনি তাবিল করেছেন।[২]

একইভাবে সহিহ মুসলিমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস, إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই বনি আদমের সবার হৃদয় আল্লাহর দুই আঙুলের মাঝে একটি হৃদয়ের মতো। তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেগুলো ঘোরান। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে হৃদয়ের পরিবর্তনকারী, আমার হৃদয় আপনার আনুগত্যের উপর স্থির রাখুন।'[৩] স্পষ্টতই এখানে শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো মানুষের হৃদয়ের উপর আল্লাহর কতখানি ক্ষমতা সেটা বোঝানো। এ কারণে বিজ্ঞ ইমামগণ এর তাবিল করেন। যেমন: ইবনে দাকিকুল ঈদ ও ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি উক্ত হাদিসকে তাবিল করেন। তারা এগুলোর পক্ষে দলিলও দেন। তাদের কথা আল্লাহ তায়ালার বাণী فَأَتَى اللهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ -এর অর্থ হচ্ছে ধ্বংস করা, নিচ থেকে আসা নয়। একইভাবে আল্লাহর বাণী إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لوجه الله مَعْنَاهُ لِأَجْلِ اللهِ -এর অর্থ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে খাওয়ানো, তাঁর চেহারার জন্য নয়।[৪] কিন্তু এ ধারার আলিমগণ এখানেও তাবিলকে অস্বীকার করেন। এরপর হাদিসের অর্থ ও নিজেদের মানহাজ দুটোর মাঝে সমন্বয় বিধানের জন্য লম্বা তাবিল করেন এবং শেষে তাবিলকারীদের মুআত্তিলাহ বলেন![৫]

---

১. মাজমুউল ফাতাওয়া (৬/৩৯৭); মুখতাসারুস সাওয়ায়িকিল মুরসালাহ (৩২৮); মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলু ইবনে উসাইমিন (১/১২০)।
২. নিহায়াতুল মুবতাদিয়িন (৩৫)।
৩. মুসলিম (২৬৫৪); ইবনে হিব্বান (৯০২); সুনানে কুবরা, নাসায়ি (৭৬৯০)।
৪. ফাতহুল বারি (১৩/৩৮৩)।
৫. বায়ানু তালবিসিল জাহমিয়্যাহ (৬/২৪৭); মুখতাসারুস সাওয়ায়িকিল মুরসালাহ (৩৯৫); আল-কাওয়ায়িদুল মুসলা (৫১)।

একইভাবে রাসুলের আরেকটি হাদিস, إِنِّي لَأَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمَنِ مِنْ جِهَةِ الْيَمَنِ অর্থাৎ আমি ইয়ামানের দিক থেকে রহমান আল্লাহ তায়ালার 'নিঃশ্বাস' পাই! এটাকেও এ ধারার আলিমগণ তাবিল করেন।[১] শেষে তাবিলকে অস্বীকার করে বলেন, এগুলোর বাহ্যিক অর্থ নিতে হবে! যারা তাবিল করে, তারা মুআত্তিলাহ! অথচ ইমাম নববি রাহি. মুসলিমের ব্যাখ্যায় তাবিলকে সালাফের কিছু জামাত—যেমন: মালেক, আওজায়ি—থেকে বর্ণনা করেছেন![২]

এভাবে রাসুলের আরও কিছু হাদিস, যেমন: আবু তালহার ঘোড়াকে রাসুলুল্লাহ বলেছেন, إِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا এটার শাব্দিক অর্থ আমি তাকে সমুদ্র পেয়েছি! অথচ রূপক অর্থ দ্রুতগামী! একইভাবে খালেদ বিন ওয়ালিদ সম্পর্কে আল্লাহর রাসুলের বাণী إِنَّ خَالِدًا سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ سَلَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ -এর শাব্দিক অর্থ খালেদ আল্লাহর তরবারি; অথচ খালেদ রক্তমাংসের মানুষ। উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনের বড় বীরপুরুষ ও দ্বীনের শত্রুদের বিধ্বস্তকারী। এ ধারার আলিমগণ এগুলোকেও অনিবার্যভাবে তাবিল করেন। কিন্তু তাবিল বা মাজাজ নামটা নিতে চান না।[৩]

অথচ তারা যদি তাবিলকে 'সীমাবদ্ধ' পরিসরেও গ্রহণ করে নিতেন, তবে এত স্ববিরোধিতায় পড়তে হতো না। কিন্তু তারা তাদের মূলনীতি বানিয়ে নিয়েছেন বাহ্যিক অর্থ সাব্যস্ত করা আর তাবিল প্রত্যাখ্যান করা। ফলে যেখানে বাহ্যিক অর্থ সাব্যস্ত করার কিংবা তাবিল ছাড়া উপায় নেই, ওখানে তাবিল করেন কিন্তু সেটা যে তাবিল দার্শনিক আলাপের প্যাঁচে এ ব্যাপারটা অস্বীকার করেন এবং তাফসির বিল-লাজিম, আল-মা'নাল হাকিকি আজ জাহের ইত্যাদি নাম দেন।[৪]

বরং তারা দাবিও করেন, সালাফের কেউ তাবিল করেননি! অথচ পিছনে আমরা যেসব উদাহরণ উল্লেখ করেছি, তাতে সচেতন ও নিরপেক্ষ পাঠকের কাছে বাস্তবতা পরিস্কার হওয়ার কথা।[৫] শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি রাহি. এসব সিফাতকে বাহ্যিকভাবে সাব্যস্ত করা সমর্থন করলেও কাছাকাছি অর্থ গ্রহণ করতে নিষেধ করতেন না।[৬] অর্থাৎ

---

১. মাজমুউল ফাতাওয়া (৬/৩৯৮); আল-কাওয়ায়িদুল মুসলা (৫১)।
২. শরহে মুসলিম, নববি (৬/৩৬)।
৩. মাজমুউল ফাতাওয়া (৩৩/১৮৪)।
৪. শরহুল ওয়াসিতিয়্যাহ, ইবনে উসাইমিন (১/৩১৪, ১/৪০৩)।
৫. সালাফের তাবিলগুলো বর্ণনা করতে গেলে আলাদা ভলিউম লিখতে হবে। আগ্রহী পাঠকগণ ইবনুল জাওজি রাহি.-এর 'দাফউ শুবাহিত তাশবিহ' পাঠ করতে পারেন।
৬. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (১/১২৪)।

দুটোকেই বৈধ মনে করতেন। হ্যাঁ, উত্তম-অনুত্তমের প্রশ্ন ভিন্ন। কিন্তু তারা তাবিলকে নাকচ করার ক্ষেত্রে এতটা বাড়াবাড়ি করেন, যা সম্পূর্ণ গলদ। বরং ইমাম বুখারি রাহি. যখন আল্লাহর 'ওয়াজহ' (চেহারা)-এর তাবিল করেন 'রাজত্ব'-এর মাধ্যমে,[১] তারা দাবি করেন ইমাম বুখারির আকিদা আহলে সুন্নাতের আকিদা নয়।

সমকালীন শাইখ আলি তানতাবি রাহি. সুন্দর কথা লিখেছেন। তিনি বলেন, কুরআনের কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য আয়াতে পাওয়া যায়। যেমন: সুরা মায়িদার ; قَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ' আয়াতের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কুরআনের সুরা ইসরার এই আয়াতে: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ফলে সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, بسط اليد দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দানশীলতা; হাকিকি হাত নয়। কারণ, এই আয়াতে হাতকে হাকিকি বলা হলে بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ এবং بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ এবং لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ এর ক্ষেত্রেও দুই হাকিকি হাত সাব্যস্ত করতে হবে। অথচ রহমত, আজাব এবং কুরআনের হাত নেই।[২]

শুধু এটা নয়, বরং কুরআন-সুন্নাহর অনেক জায়গাতেই রূপক ধরে ব্যাখ্যা (তাবিল) করা আবশ্যক। কারণ, সেখানে শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করলে অর্থ ঠিক থাকে না। ফলে শাব্দিক অর্থ যে উদ্দেশ্য নয়, তা স্বয়ং নস থেকেই সুস্পষ্ট। যেমন: কুরআনের আরেকটি আয়াত,

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا.

(অর্থ): 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া এবং আখেরাতে তাদের অভিসম্পাত করেছেন। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাকর শাস্তি।' [আহজাব: ৫৭]

এখানে 'আল্লাহর কষ্ট আমাদের কষ্টের মতো নয়' এ-জাতীয় কথা বলা ঠিক হবে না; বরং এটাকে রূপক অর্থে ধরতে হবে। একইভাবে আল্লাহর বাণী,

نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ '

অর্থ: 'তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, ফলে আল্লাহও তাদের ভুলে গিয়েছেন।' [তাওবা: ৬৭]

---

১. বুখারি (৪৭৭২)।

২. তারিফুন আম বিদীনিল ইসলাম, আলি তানতাবি (৭৪-৭৫)।

এখানে এমন বলা যাবে না যে, আল্লাহ ভুলে গিয়েছেন, তবে তার ভুলে যাওয়া আমাদের ভুলে যাওয়ার মতো নয়।

কুরআনের এমন আয়াত আরও রয়েছে, যা তাবিল তথা যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা ছাড়া গ্রহণের উপায় নেই। যেমন: আল্লাহ কুরআনের একটি আয়াতে বলেছেন وَجْهَ النَّهَارِ [আলে ইমরান: ৭২] এটার শাব্দিক অর্থ দিনের চেহারা। অথচ আমরা জানি দিনের কোনো চেহারা নেই। ফলে সকল মুফাসসির এর অর্থ করেছেন 'দিনের শুরু'। কেউ যদি বলে, 'মানুষের জ্ঞান অনেক ক্ষুদ্র। ফলে দিনের সত্যি সত্যি চেহারা থাকতেও পারে; কুরআন যেহেতু দিনের জন্য চেহারা সাব্যস্ত করেছে, তাই সেটাকে দিনের শুরু বললে অপব্যাখ্যা হবে। বরং আমরা বলব, দিনের চেহারা আছে যা তার জন্য শোভনীয়!' কেমন হবে? কুরআনের আরেকটি আয়াতে আল্লাহ মুমিনদের ব্যাপারে বলেন,

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ

[ইউনুস: ২]। এর শাব্দিক অর্থ: মুমিনদের জন্য রয়েছে সত্যের পা। অথচ সত্যের কোনো পা নেই। এ জন্য মুফাসসিরগণ এর অর্থ করেছেন 'পুণ্য', 'অগ্রগামিতা' ইত্যাদি। কেউ যদি বলে, 'আল্লাহ তায়ালা যেহেতু সত্যের জন্য পা সাব্যস্ত করেছেন, তাই আমরা সেটাকে অপব্যাখ্যা করব না, বরং বলব, সত্যের পা রয়েছে যেমন পা তার জন্য শোভনীয়!' কেমন হবে?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা মানুষকে লক্ষ্য করে বলবেন, 'হে আদম সন্তান, **আমি অসুস্থ ছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে আসোনি। আমি খাবার চেয়েছি, কিন্তু তুমি আমাকে খাবার দাওনি। আমি পিপাসার্ত ছিলাম, কিন্তু তুমি আমার পিপাসা নিবারণ করোনি।'** এখানে হাদিসের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কারণ, আল্লাহ তায়ালা অসুস্থ, ক্ষুধার্ত কিংবা তৃষ্ণার্ত হন না।[১] এখন কেউ যদি বলে, 'তিনি অসুস্থ হন, তবে আমাদের মতো অসুস্থ নয়; ক্ষুধার্ত হন, তবে আমাদের মতো ক্ষুধা নয়; তিনি পিপাসার্ত হন, তবে আমাদের মতো পিপাসা নয়!' অর্থ ঠিক থাকবে? আরেকটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, '...**তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শোনে; তার চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে; তার হাত হয়ে যাই, যা দ্বারা সে ধরে এবং তার**

১. মুসলিম (২৫৬৯); ইবনে হিব্বান (২৬৯)।

পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে।[১] আহলে সুন্নাতের আলিমদের সর্বসম্মত মতানুযায়ী এখানে হাদিসের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করাই যাবে না। কারণ, তাতে বান্দার মাঝে আল্লাহর 'হুলুল' আবশ্যক হয় এবং বিভ্রান্ত আকিদা ঢুকে যায়, যা রাসুলুল্লাহর উদ্দেশ্য নয়। তাই বাহ্যিক অর্থের তাবিল (ব্যাখ্যা) করতে হবে। এর অর্থ হবে, বান্দা তার চোখ, মুখ, কান, হাত ও পা আমার সন্তোষ অনুযায়ী পরিচালনা করে।

দুই তাফবিজের চূড়ান্ত নতিজা কী? পিছনের আলোচনাতে স্পষ্ট হয়েছে, সিফাতের মাসআলাতে একদল আলিম অর্থ সাব্যস্তকে সঠিক মনে করেন না, আরেক দল তাবিলকে সঠিক মনে করেন না। এই দুটি ক্ষেত্রে দুই দল দুই মেরুতে। ফলে তাদের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব নয়। তবে তাফবিজের ক্ষেত্রে তারা কিছুটা একমত হলেও বিস্তর ব্যাখ্যায় আবার দুই মেরুতে। প্রথম দলের কাছে সালাফের তাফবিজ হলো تفويض المعنى والكيفية أو التفويض المطلق তথা অর্থ ও স্বরূপ-সহ সামগ্রিক তাফবিজ। দ্বিতীয় দলের কাছ সালাফের তাফবিজ হলো إثبات المعنى وتفويض الكيفية অর্থাৎ অর্থ সাব্যস্ত করে স্বরূপ তাফবিজ। প্রশ্ন হলো, দুই তাফবিজের মাঝে আসলেই কি বড় ধরনের পার্থক্য আছে? নাকি দুটোর চূড়ান্ত নতিজা সমান আর পথে উভয় দলের মাঝে একটা সমন্বয় সম্ভব?

প্রথমেই একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি মাথায় রাখতে হবে। কারণ, এ মূলনীতিটা বুঝতে পারলেই সিফাতের ক্ষেত্রে একটা বিশাল ও দীর্ঘ যুদ্ধের অবসান ঘটা সম্ভব। এটার উপর ভিত্তি করেই গোটা উম্মাহকে এক করা সম্ভব। মূলনীতিটি হলো, প্রত্যেকটা শব্দের দুটো হাকিকি অর্থ থাকে। একটা হলো 'হাকিকতে লফজি' বা শব্দগত অর্থ, আরেকটা হলো 'হাকিকতে উরফি' তথা প্রচলিত অর্থ। যেমন 'ওয়াজহ' তথা চেহারা। 'ওয়াজহ'-এর দুটো হাকিকি অর্থ রয়েছে। একটা হলো হাকিকতে লফজি। এক্ষেত্রে 'চেহারা' অঙ্গ হওয়া জরুরি নয়। যেমন মানুষের চেহারা, সূর্যের চেহারা, আকাশের চেহারা, দিনের চেহারা, গাড়ির চেহারা, দেশের চেহারা— সবার চেহারা ভিন্ন ভিন্ন। ফলে 'হাকিকি মা'না' সাব্যস্ত করার পরেও সবার চেহারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়। মানুষ ও কিছু প্রাণীর ক্ষেত্রে চেহারা একটা নির্দিষ্ট অঙ্গ। কিন্তু অন্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেটা সেই নির্দিষ্ট অঙ্গ নয়। ফলে এক্ষেত্রে হাকিকতে উরফিতে যেতে

---

১. বুখারি (৬৫০২); বাইহাকি (সুনানে কুবরা) (৬৪৮৬); মুসনাদে আবু ইয়ালা (৭০৮৭)।

হবে আমাদের। হাকিকতে উরফিতে গেলে আমরা দেখব, মানুষের চেহারার জন্য যেটা হাকিকত, সূর্যের চেহারার হাকিকত সেটা নয়। আমাদের উরফে মানুষের চেহারা একরকম, সূর্যের চেহারা আরেক রকম। ফলে হাকিকতে লফজির ক্ষেত্রে সবগুলো এক হলেও উরফিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ভিন্নতা আমরা জানতে পেরেছি হাকিকতে উরফিতে এসে এবং সবগুলোর স্বরূপ জেনে। আমরা যদি সূর্য ও মানুষের স্বরূপ না জানতাম, তবে এই হাকিকতে উরফি পেতাম না। ফলে সবগুলোকে এক মনে করতাম, অথচ সেটা ভুল হতো।

আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যাক! আরবি শব্দ 'নুজুল' তথা অবতরণ করা, নামা। এটার দুটো হাকিকত। একটা হচ্ছে হাকিকতে লফজি তথা নামা। যেমন: মানুষের নামা, বিমান নামা, বৃষ্টি নামা, তাপমাত্রা নামা, রাগ নামা। সবগুলোর অর্থ নিচে নামা। কিন্তু এসব নামার মাঝে উরফে পার্থক্য আছে। মানুষের নামার যে হাকিকত, রাগ নামার হাকিকত সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই যে পার্থক্য আছে সেটা আমরা জানতে পেরেছি এগুলোর স্বরূপ জানার পরেই। স্বরূপ না জানলে এই পার্থক্য জানতে পারতাম না। ফলে সবগুলোকে এক মনে করতাম, অথচ সবগুলো এক নয়।

আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যাক 'হাত' দিয়ে। কুরআন-সুন্নাহে আল্লাহর হাতের কথা এসেছে। আবার মানুষের হাত রয়েছে, বানরের হাত রয়েছে, মশার হাত রয়েছে, কুঠারের হাত রয়েছে, খাটিয়ার হাত রয়েছে; অথচ এই সকল হাত ভিন্ন ভিন্ন। এই ভিন্নতা বোঝার জন্য আমাদের হাকিকতে উরফিতে যেতে হবে। এখানে এসে আমরা দেখব, মানুষের হাত আর মশার হাত এক নয়। বানরের হাত আর কুঠারের হাত এক নয়; অথচ সবগুলোই হাত। এভাবে পার্থক্য জানতে আমাদের হাকিকতে উরফিতে যেতে হয়েছে। আর হাকিকতে উরফি জানার জন্য স্বরূপ জানতে হয়েছে। স্বরূপ না জানলে আমরা হাকিকতে উরফি বুঝতাম না, পার্থক্যও জানতাম না। সুতরাং যার ক্ষেত্রে স্বরূপই প্রযোজ্য নয়, তার ক্ষেত্রে হাকিকতে উরফিও (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চাই তা যেমন হোক) প্রযোজ্য নয়।

এটা যদি হয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে, তা হলে আল্লাহর ক্ষেত্রেই বিষয়টি কতটা বেশি জরুরি! এ কারণে সালাফের যারা আল্লাহর সিফাতের **অর্থ** সাব্যস্ত করেছেন, সেটা হাকিকতে লফজি তথা শব্দের মূল অর্থ সাব্যস্ত করেছেন, হাকিকতে উরফি তথা প্রচলিত অর্থ নয়। কারণ, হাকিকতে উরফির জন্য আমাদের সেই বস্তুর স্বরূপ জানা

প্রয়োজন, অথচ আমরা আল্লাহর স্বরূপ জানি না। সুতরাং প্রথম দলের বক্তব্য—**সালাফ আল্লাহর হাতের হাকিকি অর্থ (মা'না হাকিকি) সাব্যস্ত করতেন না, বরং তাফবিজ করতেন**—যদি তারা এর অর্থ নেন, 'সালাফ **হাকিকতে উরফি** (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) সাব্যস্ত করতেন না; কারণ আল্লাহর ক্ষেত্রে স্বরূপ কথাটাই প্রযোজ্য নয়; অথচ উরফি অর্থ সাব্যস্তের জন্য স্বরূপ জানা জরুরি।' তবে তাদের বক্তব্য সঠিক। কারণ 'সালাফ তাফবিজ' করতেন' অর্থ হলো, সালাফ হাকিকতে উরফি তাফবিজ করতেন। 'সালাফ **হাকিকতে লফজিও** তাফবিজ করতেন'—এমন বক্তব্য **গলদ**। কারণ, তখন সেটা অর্থহীন বক্তব্য বা তাতিল হয়ে যায়। একইভাবে দ্বিতীয় দলের বক্তব্য—**সালাফ হাকিকি অর্থ (মা'না হাকিকি) সাব্যস্ত করতেন, তাফবিজ করতেন না**—যদি তারা এর অর্থ নেন, 'সালাফ **হাকিকতে লফজি** সাব্যস্ত করতেন। আর এটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়। কারণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হবে হাকিকতে উরফিতে এসে স্বরূপ জানার পরে, অথচ আল্লাহ স্বরূপ থেকে উর্ধ্বে।' তবে তাদের বক্তব্যও সঠিক। কারণ 'সালাফ তাফবিজ করতেন না' অর্থ হলো, হাকিকতে লফজি তাফবিজ করতেন না। 'সালাফ হাকিকতে উরফিও তাফবিজ করতেন না'—এমন বক্তব্য গলদ। কারণ, তাতে তাশবিহ ও তাজসিম হয়ে যায়।

ইমাম মালেক রাহি. বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় যেমন: আল্লাহর বাণী, 'ইহুদিরা বলে, আল্লাহর হাত (ঘাড়ে) বাঁধা' [মায়েদা: ৬৪] এরপর সে তার ঘাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে, কিংবা আল্লাহর বাণী 'তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন' [শুরা: ১১] বলে তার চোখ, কান কিংবা শরীরের কোনো অঙ্গের দিকে ইঙ্গিত করে, তা হলে তা কেটে ফেলা হবে। কারণ, সে আল্লাহকে নিজের সঙ্গে সাদৃশ্য করেছে।[১] এখানে লক্ষণীয়, যে ব্যক্তি এই আয়াতগুলো পড়ে তার নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে ইঙ্গিত করবে, সে কিন্তু এটা বলে না, 'আল্লাহর হাত হুবহু তার হাতের মতো, কিংবা আল্লাহর চোখ তার চোখের মতো।' কারণ, কোনো সুস্থ মানুষ এমন বলতে পারে না। সবাই জানে, আল্লাহর চোখ মানুষের চোখের মতো নয়, আল্লাহর হাত মানুষের হাতের মতো নয়। আল্লাহর হাত মানুষের হাতের মতো হবে তো দূরের কথা, বাঘের হাতও তো মানুষের হাতের মতো নয়, কুঠারের হাতও (হাতল) তো মানুষের হাতের মতো নয়। এতৎসত্ত্বেও ইমাম মালেকের এত ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ কী? কারণ একটাই, তিনি আল্লাহর সিফাতগুলোকে **শব্দের হাকিকত** (الحقيقة اللفظية) অন্য

---

১. আত-তামহিদ, ইবনে আবদুল বার (৭/১৪৫)।

কথায় বাহ্যিক অর্থের উপর ছেড়ে দিতেন। আমাদের মাঝে **প্রচলিত হাকিকত** (الحقيقة العرفية) তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করতেন না।

এখানেই বুঝে আসে ইমাম তিরমিজির বক্তব্য: যদি বলা হয় 'হাতের মতো হাত', 'শ্রবণের মতো শ্রবণ' তখন সেটা তাশবিহ হয়। কিন্তু এভাবে না বলে স্রেফ **বাহ্যিক অবস্থা** (জাহের বা হাকিকতে লফজি) সাব্যস্ত করলে তাশবিহ হয় না)[১] এর মানে বোঝা যায়, ইমাম তিরমিজি-সহ সালাফের কেউ জাহের বলতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বুঝতেন না। কারণ, আরবিতে (اليد) শব্দের অর্থ বলতে যদি সৃষ্টির একটি অঙ্গ হাত বোঝানো হয়, তাতেই কিন্তু তাশবিহ হয়ে যায়, 'আমাদের হাতের মতো নয়' এটা বলার দরকার হয় না। যেমন: মানুষের হাত, মশার হাত, বানরের হাত—এগুলো কি এক? মশার হাতের সঙ্গে যদি মানুষের হাতের সাদৃশ্য না থাকে, সেখানে আল্লাহর হাতের সঙ্গে সাদৃশ্যের তো প্রশ্নই ওঠে না। ফলে আমাদের মতো আল্লাহর হাত আছে (হুবহু সৃদশ) এটা কোনো দেহবাদীও বলবে না। তা হলে 'হাতের মতো হাত' বলতে ইমাম তিরমিজি কোনটাকে নাকচ করেছেন? স্পষ্টই যে, আল্লাহর জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করা নাকচ করেছেন। এভাবেই বুঝতে হবে, অন্যান্য সালাফ যখন দেহবাদীদের বক্তব্য 'আমাদের হাতের মতো হাত'-এর প্রতিবাদ করতেন সেটা। কারণ, আল্লাহর হাত আমাদের হাতের আকৃতিতে নয় এটা সবাই জানে। তারা প্রতিবাদ করতেন, আমরা যেমন হাত বলতে অঙ্গ বুঝি, আল্লাহর হাত তেমন অঙ্গ নয়। পিছনে ইমাম তহাবিও সেটা নাকচ করেছেন। **তা হলে তারা শাব্দিক অর্থের হাক্কিকতকে (হাক্কিকতে লফজি) ইসবাত করতেন, আমাদের প্রচলিত অর্থের হাক্কিকতকে (হাক্কিকতে উরফি) নয়। আবার তারা প্রচলিত অর্থের হাক্কিকতকে তাফবিজ করতেন। শাব্দিক অর্থের হাক্কিকতকে নয়।**

সুতরাং এভাবে হাকিকতে লফজি ও হাকিকতে উরফিকে যদি বোঝা যায়, তবে সালাফের মতাদর্শ নির্ধারণে উভয় ধারার মাঝে কোনো পার্থক্য থাকে না। এভাবে বুঝলে—তাফবিজ মুতলাক বলা হোক আর তাফবিজুল কাইফিয়্যাহ বলা হোক—উভয়টাই সঠিক। কারণ, উভয়টার অর্থ থাকে আল্লাহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে পবিত্র। বিষয়টি আরেকটু খেয়াল করুন! কেউ যদি বলে, يد الله মানে আল্লাহর হাত। 'আল্লাহর হাত' এটুকু বলব, আমাদের মনে ঘুণাক্ষরেও স্থান দেবো না যে, এটা

১. তিরমিজি (৬৬২)।

রক্ত-মাংসের হাত কিংবা আমাদের কারও হাতের মতো (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ)। আল্লাহ বলেছেন يد الله আর ইয়াদের হাকিকি অর্থ (লফজি) যেহেতু হাত, তাই আমরা এটাকে স্রেফ হাত বলেছি। নতুবা সৃষ্টির সঙ্গে এই হাতের কোনো সম্পর্ক নেই لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ তা হলে দেখা যাচ্ছে, এখানে শুধু হাকিকতে লফজিটা সাব্যস্ত করা হচ্ছে; স্বরূপ নয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও (হাকিকতে উরফি) নয়। ফলে এটা স্রেফ নসের প্রতি তাজিম দেখানো, নতুবা শেষমেষ **এটার হাক্বিকত** অজানাই থেকে যায়। আর দ্বিতীয় দল বলছেন, يد الله -এর অর্থ আল্লাহই ভালো জানেন। আমরা এর হাকিকত (উরফি) জানি না। কারণ يد মানে হাত। তবে আল্লাহর জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শোভনীয় নয় (কারণ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) ফলে এটাকে আমরা হাত বলব না। আমরা বলব এটার অর্থ (হাকিকতে উরফি) আল্লাহই ভালো জানেন। ফলে তাদের কাছেও **এটার হাক্বিকত** অজানা।

এভাবে দুই দলের বক্তব্যের মাঝে বাহ্যিক দৃষ্টিতে পার্থক্য থাকলেও ভিতরে পার্থক্য থাকবে না। কারণ, তাদের একদল বলছেন, সালাফের মাজহাব হলো—সিফাতসংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসগুলোর **হাকিকি অর্থ** (হাকিকতে লফজি) **ইসবাত করা** (উরফি তাফবিজ করা)। অপর দল বলছেন, সালাফের মাজহাব হলো—সিফাতসংক্রান্ত আয়াত ও হাদিসগুলোর **হাকিকি অর্থ** (হাকিকতে উরফি) **তাফবিজ করা** (হাক্বিকত লফজি ইসবাত করা)। ফলে **অর্থ** সাব্যস্ত করা এবং না করা দুইটি সাংঘর্ষিক বিষয় হলেও ভিতরে আসলে সংঘর্ষ নেই। এ কারণে স্বয়ং ইবনে তাইমিয়ার ছাত্র ইমাম জাহাবি তাফবিজ বা أمروها كما جاءت بلا تفسير -এর ব্যাখ্যায় লিখেন, الْإِقْرَارُ وَالْإِمْرَارُ وَتَفْوِيضُ مَعْنَاهُ إِلَى قَائِلِهِ الصَّادِقِ الْمَعْصُومِ স্বীকার করা, চালিয়ে দেওয়া, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এর **অর্থ** সমর্পণ করা।'[১] এখানে অর্থ বলতে (হাকিকতে উরফিকে) তাফবিজ করার কথা বলা হয়েছে; হাকিকতে লফজি নয়। আর যারা হাকিকি মা'নাকে ইসবাত করাকে সালাফের মানহাজ বলেছেন, যেমন কারি তৈয়ব সাহেব বলেছেন: فالطريق الأسلم أن تحمل هذه الأسماء على معانيها الحقيقية অর্থাৎ নিরাপদ পথ হলো, এগুলো হাকিকি অর্থের উপর প্রয়োগ করা।[২] এখানে মা'না হাকিকি সাব্যস্ত বলতে হাকিকতে লফজি উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কারণ, হাকিকতে উরফি জানতে স্বরূপ প্রয়োজন, আর আমরা আল্লাহর স্বরূপ জানি না। এভাবে দুই ধারার তাফবিজের মাঝে বাস্তবে কোনো সংঘর্ষ নেই। চূড়ান্ত নতিজার ক্ষেত্রে উভয়ের বক্তব্য এক ও অভিন্ন।

১. সিয়ারু আলামিন নুবালা (৭/১৮৩)।
২. কারি তৈয়ব (৬৭)।

এটাই হলো সালাফে সালেহিনের ইসবাত ও তাফবিজের অর্থ। এটাই ভারসাম্যপূর্ণ মানহাজ। যারা উক্ত ভারসাম্য থেকে ডানে-বামে চলে যাবে, তাফবিজ করতে গিয়ে এসব সিফাতের সব ধরনের অর্থকে (হাকিকতে উরফির সঙ্গে লফজিকেও) নাকচ করবে, অথবা যারা ইসবাত করতে গিয়ে সব ধরনের অর্থকে (হাকিকতে লফজির সঙ্গে উরফিকেও) সাব্যস্ত করবে, উভয় দলই 'গুলু'তে লিপ্ত হবে এবং সালাফের মানহাজ থেকে সরে তাতিল ও তাশবিহে জড়িয়ে পড়বে।

ইসবাত ও তাফবিজের উপরে প্রদত্ত ব্যাখ্যা যদি কারও মেনে নিতে কষ্ট হয়, তবুও এটা স্পষ্ট যে, দুই ধারা মূল তাফবিজের ক্ষেত্রে একমত এবং কেবল হাকিকি অর্থ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতবিরোধের শিকার। কারণ, বিষয়টি বেশ জটিল ও সূক্ষ্ম। ফলে এটুকু তারা এড়িয়ে যেতে পারতেন কিংবা এতটুকু মতভিন্নতা স্বীকার করে নিতে পারতেন। কিন্তু সেটা কেউই করেননি। বরং এটুকুর উপর ভিত্তি করেই একদল আরেক দলকে মুজাসসিমাহ ও জাহমিয়্যাহ ঘোষণা করেছে, আজও যা অব্যাহত রয়েছে।

অধমের কথা: উপরের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে, তাশবিহ (সাদৃশ্যকারী) ও তাজসিম (দেহবাদী) ধারা আল্লাহর সিফাত সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে চরম অতিরঞ্জন করে সেগুলোকে পুরো সৃষ্টির মতো বানিয়ে দিয়েছে। ফলে এগুলো ভ্রান্ত মতাদর্শ। একইভাবে তাতিলের মাধ্যমে সিফাতকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়, ফলে এটাও ভ্রান্ত মতাদর্শ। সুতরাং বাহ্যিক অর্থ সাব্যস্তকরণ কিংবা ইসবাতের ক্ষেত্রে যারা অতিরঞ্জন করবে, তাদের মাজহাব তাজসিমের অত্যন্ত কাছাকাছি। আবার যারা তাফবিজ কিংবা তাবিলের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করবে, তারাও তাতিল ও তাহরিফের অনেক কাছাকাছি। সুতরাং সিফাতের ইসবাত ও তাফবিজের ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত থেকে সুরক্ষিত থাকতে হলে উপরের মূলনীতি অনুসরণের বিকল্প নেই।

এটা হলো 'সালাফের ইসবাত ও তাফবিজের উদ্দেশ্য কী' সে প্রশ্নের জবাব। এখন প্রশ্ন হতে পারে, সামগ্রিকভাবে আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে সালাফের মানহাজ কী? আমরা আগেই বলেছি, **সকল সিফাতের ক্ষেত্রে সকল সালাফ কোনো একক মানহাজে ছিলেন না—কোথাও ইসবাত (শাব্দিক অর্থ সাব্যস্ত) করেছেন, কোথাও তাফবিজ (প্রচলিত অর্থ আল্লাহর কাছে সমর্পণ) করেছেন, আবার কোথাও তাবিল করেছেন।** বরং একজন একেক জায়গায় একেক রকম করেছেন। যেমন: ইমাম

আহমদ রাহি. কখনও তাফবিজ করেছেন,[১] কখনও ইসবাত করেছেন,[২] কখনও তাবিল করেছেন।[৩] তাই ইমাম আহমদের দু-একটা বক্তব্য থেকে তার জন্য পুরো একটা মানহাজ দাঁড় করানো যাবে না। বরং যেখানে যেটা মুনাসিব, তিনি সেটা করেছেন। ইমাম মালেক রাহি. কখনও তাফবিজ করেছেন, কখনও তাবিল করেছেন।[৪] ইবনে হাজারও লিখেছেন, আরবি ভাষার ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে সালাফের কেউ কেউ কখনও তাবিল করেছেন, কখনও তাফবিজ করেছেন।[৫] ইমাম তিরমিজি রাহি. ইস্তিওয়ার হাদিসে তাবিলের সমালোচনা করেছেন।[৬] সেই তিনিই আবার 'হাবল' এর হাদিসে তাবিল করেছেন।[৭] সুতরাং সালাফের কাজের মাধ্যমে খালাফের আবিষ্কৃত القول في بعض الصفات كالقول في بعض মূলনীতিটি ভুল প্রমাণিত হলো।[৮] কারণ, সকল সিফাতের ক্ষেত্রে এক ধরনের কথা বলা কখনোই সালাফের মানহাজ ছিল না। বরং নুসূসের যা চাহিদা, সালাফ সে অনুযায়ী সেটাকে গ্রহণ করেছেন।

ফলে সালাফকে কোনো সীমাবদ্ধ মানহাজে আবদ্ধ করার সুযোগ নেই। কিংবা আমাদের বানানো মানহাজকে 'এটাই সালাফের মানহাজ' এমন বলার সুযোগ নেই। সালাফ আমাদের দুটি মূলনীতি দিয়ে গিয়েছেন। এক. أمروها كما جاءت بلا كيف অর্থাৎ স্বরূপ নির্ধারণ করা ছাড়া যেভাবে এসেছে ওভাবেই রেখে দাও। দুই. لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والسنة অর্থাৎ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল যা সাব্যস্ত করেছেন সেগুলো সাব্যস্ত করা এবং কুরআন-সুন্নাহর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকা। এই দুই মূলনীতিকে সামনে রেখে সালাফ আল্লাহর সিফাতগুলোকে গ্রহণ করেছেন। আর স্পষ্ট যে, এই দুই মূলনীতিকে সামনে রেখে আল্লাহর সিফাতগুলো গ্রহণের বিভিন্ন পন্থা হতে পারে, যেমনটা সালাফ

---

১. তারিখে তাবারি (৮/৬৩৯); ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আল্লাহর বাণী'-এর অর্থ কী? এটার অর্থ কিন্তু আহলে সুন্নাতের সবার কাছে জ্ঞাত। তাও তিনি বলেন, 'আমি জানি না। আল্লাহ যেভাবে নিজেকে বর্ণনা করেছেন।'
২. আকিদাহ (রিওয়াইয়াতু খাল্লাল) (১০২)।
৩. আল ফাসল, ইবনে হাজাম (২/১৩২)।
৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা (৭/১৮৩)।
৫. ফাতহুল বারি, (৩/৩০)।
৬. তিরমিজি (৬৬২ নং হাদিসের উপর ইমামের বক্তব্য)।
৭. তিরমিজি (৩২৯৮ নং হাদিসের উপর ইমামের বক্তব্য)।
৮. মাজমুউল ফাতাওয়া (৩/১৭)।

প্রায়োগিকভাবে প্রমাণ করেছেন এবং পিছনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই দুই মূলনীতি রক্ষার জন্য সকল সিফাতকে পরবর্তী সময়ে রচিত কোনো একটা মানহাজ অনুযায়ী জোর করে হলেও ব্যাখ্যা করতে হবে—এটা সালাফের মানহাজের বিকৃতি।

তাই সালাফকে এই দুই মূলনীতির বাইরে কোনো খোলসে ঢোকানোর সুযোগ নেই। কারণ, সালাফ কারও লিখিত কোনো মানহাজের উপর চলেননি। বরং যেখানে যেটা প্রযোজ্য, সেখানে সেটা করেছেন। তাই আমাদের বানানো মানহাজে সালাফকে না ঢুকিয়ে সালাফের মানহাজে আমাদের ঢুকতে হবে। সামগ্রিকভাবে আমরাও তাদের সামগ্রিক মানহাজ অনুসরণ করব। সেটা হলো: **আল্লাহ তায়ালা তাঁর জন্য যেসব গুণ সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলোকে আমরা স্বীকার করব। যেমন: আল্লাহ বলেছেন, 'রহমান আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন', আমরা বলব না: 'না, তিনি ইস্তিওয়া করেননি।' আবার ইস্তিওয়াকে সৃষ্টির খাটে বসা, আরোহণ করা, ওঠা, থাকা, সমাসীন হওয়া ইত্যাদির সদৃশ বানিয়ে ফেলব না। আল্লাহকে কোনো বিশেষ দিকে বা স্থানে ভাবব না। হাদিসে এসেছে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার আকাশে নুজুল করেন, আমরা বলব না: 'তিনি নুজুল করেন না।' আবার এটাকে সৃষ্টির অবতরণ/স্থানান্তরের মতোও ভাবব না। আল্লাহ তায়ালা রহমান, আমরা বলব না: 'তাঁর রহমত নেই।' আবার তাঁর রহমত সৃষ্টির রহমতের মতোও ভাবব না। আল্লাহ রাগ করেন। আমরা বলব না: 'তিনি রাগ করেন না।' আবার তাঁর রাগকে সৃষ্টির রাগ-জাতীয় মনে করব না। কুরআনে আল্লাহ তায়ালার দুই হাতের (ইয়াদ) কথা এসেছে, চেহারার (ওয়াজহ) কথা এসেছে। আমরা বলব না: 'তাঁর হাত (ইয়াদ) নেই, চেহারা (ওয়াজহ) নেই।' কারণ তাঁর এগুলো আছে। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে এগুলো সিফাত (গুণ ও বিশেষণ)। ফলে এগুলোকে সৃষ্টির মতো (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ/ আকার-আকৃতি) ভাবব না; তাবিল করব না। আবার এগুলোর উপর 'হাকিকি হাত', 'হাকিকি চেহারা' এ-জাতীয় শব্দ প্রয়োগ করব না। বরং সালাফের মতো সংক্ষিপ্তভাবে এগুলোতে ঈমান রাখব আর এর গভীর মর্ম ও ধরন (ওয়াসফ ও কাইফিয়্যাত) এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা (তাফসির) আল্লাহর হাতে সোপর্দ করব। এগুলো নিয়ে অপ্রয়োজনীয় ঘাঁটাঘাঁটি থেকে বিরত থাকব।**[১]

---

১. আল-আসনা ফি শরহি আসমাইল্লাহিল হুসনা, কুরতুবি (১৬৯)। ইমাম নিশাপুরী 'ইস্তিওয়া' সম্পর্কে আবু হানিফা (র.) এর আকিদা লেখেন এভাবে: 'আমাদের রবের কিতাব যেভাবে বলেছে আমরা সেভাবে মানি। এব্যাপারে আমরা কোনো ইলম দাবি করি না। আমরা বিশ্বাস করি, তিনি ইস্তিওয়া করেছেন। কিন্তু সৃষ্টির ইস্তিওয়ার সঙ্গে তাঁর

আর পৃথক পৃথক মাসআলাতে সালাফ যা করেছেন, তা-ই করব। একটু আগেই বলা হয়েছে, সালাফ সকল মাসআলাতে যেকোনো একটা পদ্ধতি গ্রহণ করেননি; বরং যেখানে যেটা প্রযোজ্য সেটা গ্রহণ করেছেন। কারণ, কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত **সবগুলো** সিফাতকে যদি অর্থ এবং কাইফিয়্যাহ-সহ সম্পূর্ণভাবে (লফজি-সহ) তাফবিজ করা হয়, তবে এসবের আর কোনো অর্থ থাকে না, যা তাতিলের মতোই। এটা সালাফের মানহাজ নয়, খালাফেরও মানহাজ নয়; কারণ খালাফ অনেকগুলো সিফাতের অর্থ গ্রহণ করেন। আবার সবগুলোকে (লফজি-সহ) তাবিল করে ফেললেও এগুলো তাতিলের পর্যায়ে চলে যায়। এটাও সালাফ করেননি। আবার সবগুলোর বাহ্যিক অর্থ (উরফি-সহ) ইসবাত করলেও তাজসিম ও তাশবিহের পর্যায়ে চলে যায় কিংবা অনেক সময় এগুলোর অর্থ ঠিক থাকে না। ফলে সালাফ এটাও করেননি।

তাই আমরা সালাফের অনুসরণে যেখানে যেটা প্রযোজ্য, সেখানে সেটা করব। যেখানে তারা তাফবিজ করেছেন, আমরাও সেখানে তাফবিজ করব। যেখানে তারা শব্দের অর্থ ইসবাত করেছেন, আমরাও সেখানে ইসবাত করব। যেসব জায়গায় তারা তাবিল করেছেন, আমরাও সেখানে তাবিল করব। যদি কোথাও একাধিক সালাফ থেকে মতবিরোধপূর্ণ বক্তব্য পাওয়া যায় (বিশেষত ইসবাত ও তাবিলের ক্ষেত্রে), তবে যেটা সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী সেটা মানব। সবগুলো একপর্যায়ে থাকলে কিংবা মীমাংসা না করা গেলে (যথা কেউ তাবিল করেছেন কেউ করেননি), সেগুলো গ্রহণকারীদের পরস্পরকে মুজতাহিদ মনে করব। সবার মতকে আহলে সুন্নাতের অংশ

ইস্তিওয়ার কোনো সাদৃশ্য নেই। আরশের উপর ইস্তিওয়ার ব্যাপারে এটাই আমাদের বক্তব্য'। আল ইতিকাদ, নিশাপুরী (১৪৯)। নিহায়াতুল মুবতাদিয়ীন, ইবনে হামদান (৩১-৩৩)। আল-ইনসাফ, বাকিল্লানি (১২)। কারী মুহাম্মত তৈয়ব লিখেছেন, 'আল্লাহ শোনেন কিন্তু আমাদের শোনার মতো নয়। আল্লাহ দেখেন কিন্তু আমাদের দেখার মতো নয়।... আল্লাহ নুযূল করেন কিন্তু আমাদের নুজুলের মতো নয়। আল্লাহ হাসেন কিন্তু আমাদের হাসার মতো নয়। আল্লাহ আরশের উপর ইস্তিওয়া করেন কিন্তু আমাদের ইস্তিওয়ার মতো নয়' (৩৬, ১৩৬)। ইমাম আবুল ইউসর বাজদাবি (র.) বলেন, 'আল্লাহর হাত, চোখ ইত্যাদি বিশেষ সিফাত। কুরআন এগুলো সাব্যস্ত করেছে। তাই আমরাও সাব্যস্ত করবো। তবে সৃষ্টির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো মনে করবো না। আর আরবী থেকে অন্য ভাষায় এগুলো অনুবাদ নিয়ে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। কারও কাছে অঙ্গ ভেবে নয় এই শর্তে বৈধ, কেউ কেউ সতর্কতামূলক অবৈধ বলেছেন..' (উসুলুদ্দিন ৩৯)। সারাখসি (র.) বলেন, যারা অবৈধ বলেছেন তারা মূলত আম মানুষদের ফিতনার ভয়ে বলেছেন। নতুবা দীনী দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ। তবে হানাফি আলিমগণ অনুবাদ না করাকেই প্রাধান্য দেন (তাতারখানিয়া ৭/২৮৬-২৮৭)। কিন্তু সাধারণ মানুষদেরকে বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক করে অনুবাদ বৈধ হওয়াই উচিত। নতুবা এসব শব্দের অর্থ তাদের কখনোই জানা হবে না। পেছনে আমরা কাশ্মীরি (র.) এর বক্তব্য উল্লেখ করেছি, যিনি এগুলোর অনুবাদকে বৈধ মনে করেন। আল-আরাফুশ শাযী, কাশ্মীরি (১/৪১৬)। উক্ত স্থানে কাশ্মীরি (র.) আরও বলেন, নুযূল ও ইস্তিওয়ার ক্ষেত্রে সালাফের মাজহাব হলো, কোনো ধরনের ব্যাখ্যা (তাবিল) ও স্বরূপ বর্ণনা (তাকয়ীফ) ছাড়া যাহেরের উপর ঈমান আনা এবং কাইফিয়্যাত আল্লাহর কাছে সঁপে দেয়া।

মনে করব। সালাফের মানহাজের সুস্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ ছাড়া কাউকে আহলে সুন্নাত থেকে খারিজ করব না।

এটাই হলো সালাফের প্রকৃত অনুসরণ। এটাই সর্বোচ্চ নিরাপদ পথ। আর এটা বাদ দিয়ে যদি সব জায়গাতেই জোর করে সালাফকে জাহেরপন্থি বানাতে যাই, কিংবা সব জায়গায় তাদের তাবিলকারী বানাতে যাই, তবে সেটা সালাফের অনুসরণ হবে না, সালাফের নামে নিজেদের মতাদর্শের অনুসরণ হবে।

একটি নিবেদন: এগুলো নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা শেষ হবার নয়। দশ-বিশ পৃষ্ঠা দূরের কথা, আমরা যদি এগুলোর উপর হাজার পৃষ্ঠাও লিখে ফেলি আর পাঠক সেগুলো পড়েন, তবুও এ সম্পর্কে বিবাদের মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, বিতর্ক হাজার বছরের। তা হলে করণীয় কী? করণীয় হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা, বিনয়ী হওয়া; এ ব্যাপারে আলোচনা যথাসম্ভব সীমিত রাখা; নীরবতাকে প্রাধান্য দেওয়া; বিপরীত মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সদয় হওয়া।

বর্তমান যুগে আকিদা নিয়ে বিতর্ক একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর আল্লাহর সিফাত ছাড়া অন্যান্য বিষয় নিয়ে যেহেতু তেমন বিতর্ক নেই, তাই সিফাত নিয়ে বিবাদ-বিভেদ যেন আমাদের নিত্ত-নৈমিত্তিক চর্চায় পরিণত হয়েছে। যে যার মতো করে বিষয়টাতে নাক গলাচ্ছে। আকিদা-সম্পর্কে অজ্ঞ তরুণরা বড় বড় আলিম ও ইমামকে গালি-গালাজ করছে। বরং আকিদা মানেই সিফাত নিয়ে টানাটানি। অথচ এগুলো সালাফের কর্মপন্থা নয়। ইমাম মালেক রাহি.-কে যে লোক ইস্তিওয়া নিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, তিনি তাকে মসজিদের বাইরে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেন।[১] 'তাঁর মতো কেউ নয়' এটুকু বলে সারা দিন যদি আল্লাহর এসব সিফাত চর্চার বিষয়ই হতো, তবে রাগ করা কিংবা মসজিদের বাইরে বের করে দেওয়ার মতো পর্যায়ে যেত না। একইভাবে ইমাম মালেক রাহি.-কে যখন خلق الله آدم على صورته এবং إن الله يكشف عن ساقه এবং وأنه يُدْخِلُ يَدَهُ فِي جَهَنَّمَ حَتَّى يُخْرِجَ مَنْ أَرَادَ এই হাদিসগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি প্রচণ্ডভাবে প্রতিবাদ করেন এবং কাউকে এসব হাদিস বর্ণনা করতে নিষেধ করেন![২] এখানেও কাইফিয়্যাত সম্পর্কে নয়; বরং স্বাভাবিক বর্ণনা করতেও নিষেধ করা হয়েছে। আর

১. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বাইহাকি (ফাতহুল বারি (১৩/৪০৭)
২. সিয়ারু আলামিন নুবালা (৭/১৮২-১৮৩)।

ইমাম মালেক থেকে ইস্তিওয়া নিয়ে প্রশ্ন করা 'বিদআত' এটা তো আমাদের অনেকেরই মুখস্থ।[১] কিন্তু আমল করে ক-জন?

হাম্বল ইবনে ইসহাক যখন ইমাম আহমদকে আল্লাহর নুজুল নিয়ে প্রশ্ন করেন, 'ইলমের মাধ্যমে নুজুল কীভাবে?' ইমাম আহমদ বলেন, 'চুপ থাকো। তোমার এগুলো কী দরকার? হাদিস যেভাবে এসেছে কোনো স্বরূপ (كيفية), সীমানা/সংজ্ঞা (حد) নির্ধারণ করা ছাড়া, ওভাবেই রেখে দাও!'[২] স্পষ্টতই হাম্বল ইবনে ইসহাক ইমামকে নুজুলের কাইফিয়্যাতের কথা জিজ্ঞাসা করেননি। বরং কেবল প্রাসঙ্গিক একটু কথা জানতে চেয়েছিলেন, তাতেই ইমাম রাগ করলেন। ইবনে বাত্তার বর্ণনায় আছে, হাম্বল ইবনে ইসহাক তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কি ইলমের মাধ্যমে অবতরণ করেন, নাকি অন্যভাবে? আহমদ রাহি. তখন প্রচণ্ড রাগ করে বললেন, চুপ থাকো। তোমার এগুলো কী দরকার? হাদিস যেভাবে এসেছে স্বরূপ বর্ণনা ছাড়া, ওভাবেই রেখে দাও।[৩] যদি অর্থ নির্ধারণ করে বৈঠকের পর বৈঠক সাধারণ মানুষের মাঝে এসব আলোচনার বিষয় হতো, হাম্বল ইবনে ইসহাকের মতো ব্যক্তির সামনে ইমাম আহমদ কেন এগুলো আলোচনা করেননি? উলটো ক্রুদ্ধ হলেন কেন? অপর একটি বর্ণনায় আছে ইমাম আহমদ বললেন, 'এ ব্যাপারে কথা বলা আমি পছন্দ করি না।'[৪] ইমাম শাফেয়ি রাহি.-কে ইস্তিওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'কোনো-রকম সাদৃশ্য ছাড়া আমি ঈমান রাখি। আমি এটা উপলব্ধি করতে অক্ষম। কিন্তু এগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি থেকে আমি নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখি।'[৫]

ইমাম আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া দিমাশকি (৭৩৩ হি.) বলেন, "সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেয়িরা এসব বিষয় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতেন না। সাধারণ মানুষকে এগুলোর মাঝে ঢোকাতেন না। মিম্বর থেকে তারা এগুলো নিয়ে কথা বলতেন না। মানুষের হৃদয়ে এসব ব্যাপার নিয়ে ওয়াসওয়াসার আগুন জ্বালাতেন না। যে ব্যক্তি দাবি করে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মলত্যাগের পদ্ধতি শিখিয়েছেন আর ঈমানের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছেড়ে দিয়েছেন, তার এসব দাবি হলো অচল

---

১. হিলয়াতুল আউলিয়া, আবু নুআইম আস্পাহানি (৬/৩২৫); আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বাইহাকি (২/৩০৫); শরহুস সুন্নাহ, লালাকায়ি (৩/৪৪১)।
২. শরহুস সুন্নাহ, লালাকায়ি (৩/৫০২)।
৩. আল-ইবানাতুল কুবরা, ইবনে বাত্তাহ (৭/২৪২)।
৪. আল-ইবানাতুল কুবরা, ইবনে বাত্তাহ (৭/৩২৬)।
৫. লাওয়ামিউল আনওয়ার, সাফারিনি (১/২০০)।

মালের মতো, যা অভিজ্ঞ লোকের কাছে বিকায় না। সে কি জানে না যে, দুনিয়ার সব মানুষের মলত্যাগ করতে হয়, বরং দিনে একাধিকবার করতে হয়, কিন্তু সিফাতের মাসআলাতে সাধারণ মানুষের কেন ঢুকতে হবে? হ্যাঁ, তাদের যতটুকু প্রয়োজন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন, 'আমি মানুষের সঙ্গে জিহাদের জন্য আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই আর আমি তাঁর রাসুল!'... এ কারণে আমরা এসব বিষয়ে রাসুলুল্লাহ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িদের অনুসরণে চুপ থাকি। সাধারণ মানুষকে এগুলোতে ঢোকাই না। আর তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে সাধারণ মানুষকে এতে ঢোকানো। সুতরাং কারা সালাফের অনুসারী তা স্পষ্ট।"[১]

ইমাম শাতেবি রাহি. বলেন, 'প্রথম যুগের মানুষ এগুলো মেনে নিয়েছেন। **এগুলোর অর্থের মাঝে প্রবেশ করেননি। এগুলোর অর্থ** জানার সঙ্গে ইসলামের কোনো বিধি-বিধানের সম্পর্ক নেই।'[২]

বরং অর্থ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে সেটার অনিবার্য পরিণতি দেহবাদ। অতীতে এবং বর্তমানে অনেক আলিম অর্থ সাব্যস্তের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে দেহবাদ পর্যন্ত পৌঁছে যান। সিফাতের ব্যাপারে তাদের লম্বা লম্বা আলোচনা আর ব্যাখ্যা দেখলে ইসবাত আর দেহবাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন হয়। এ কারণেই সালাফের আলিমগণ এগুলো নিয়ে চুপ থাকতেন; কথা কম বলতেন। ইবনে হাজার আসকালানি রাহি. صفة النزول -এর ক্ষেত্রে লিখেছেন, **মুশাববিহাহরা এটাকে হাকিকি এবং বাহ্যিক অর্থ হিসেবে গ্রহণ করে, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সালাফ এর বিপক্ষে। তারা ইজমালি ঈমান এনেছেন।**[৩] ইবনে হাজার আরও বলেন, **উক্ত মাসআলাতে সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান আনা এবং আল্লাহকে সব ধরনের সাদৃশ্য ও স্বরূপ নির্ধারণ থেকে মুক্ত রাখাই সালাফের মানহাজ; বাইহাকি, চার ইমাম, সুফিয়ান সাওরি, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আওজায়ি ও লাইসের মাজহাব।**[৪] অন্যত্র বলেন, '**মুসলমানদের দায়িত্ব হচ্ছে এসব আলোচনা থেকে বিরত থাকা। এগুলো আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া। কুরআন ও সুন্নাহে যা সাব্যস্ত করা হয়েছে কিংবা নাকচ করা হয়েছে সেগুলোতে ইজমালিভাবে**

---

১. তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা (৯/৪০-৪১)।
২. আল-মুওয়াফাকাত, শাতেবি (৩/৩১৯)।
৩. ফাতহুল বারি (৩/৩০)।
৪. ফাতহুল বারি (৩/৩০)।

ঈমান আনা।[১] ইমাম ইবনুস সালাহ বলেন, '**কোনো মুফতিকে আকিদা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁর এ ব্যাপারে বিস্তারিত ফতোয়া দেওয়া উচিত নয়। বরং প্রশ্নকারী এবং সাধারণ মানুষ সবাইকে তিনি এগুলোর মাঝে ঢুকতে বারণ করবেন। তাদের নির্দেশ দেবেন যে, এক্ষেত্রে কোনো-রকম তফসিল ছাড়া সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান রাখতে হবে।**'[২] তিরমিজির বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার আল্লামা আবদুর রহমান মুবারকপুরি নুজুল সিফাতের আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন, 'এটাকে একদল বাহ্যিক অর্থ ও হাকিকত ধরে নিয়েছে', (حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَحَقِيقَتِهِ) তারা মুশাববিহাহ! **সংখ্যাগরিষ্ঠ সালাফ এর উপর সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান এনেছেন।**'[৩]

সংক্ষিপ্ত ঈমান কীরূপ? সেটা ইমাম জাহাবি ব্যাখ্যা করেছেন ইস্তিওয়ার মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাতে, যেখানে চরমপন্থিরা মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন আলিমকে নিয়মিত জাহমিয়্যাহ বলে আখ্যা দেয়। ইমাম জাহাবি বলেন, 'যে ব্যক্তি উক্ত মাসআলাতে কুরআন-সুন্নাহকে সত্যায়ন করবে, এর উপর ঈমান আনবে এবং এর **অর্থ আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুলের কাছে তাফবিজ (সমর্পণ) করবে,** তাবিল ও অতিরঞ্জন থেকে বিরত থাকবে, সে অনুগত মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে।'[৪] সুলতানুল উলামা ইজ ইবনে আবদুস সালাম বলেন, '...এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন সেটা-সহ ঈমান রাখি।'[৫]

তা ছাড়া সাহাবায়ে কেরাম রাজি. এসব সিফাত একসঙ্গে শেখেননি। কুরআনে এগুলো একসঙ্গে অবতীর্ণ হয়নি। হাদিসেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একসঙ্গে বলেননি। সিফাতের এসব আয়াত একসঙ্গে রেখে সাহাবায়ে কেরাম তাদের সন্তাদের শেখাননি। মানুষকে এগুলো মুখস্থ করতে বলেননি। বরং তারা এগুলো যে কখনও একসঙ্গে এভাবে চলে আসবে হয়তো কল্পনাও করেননি। তাই এগুলো একসঙ্গে রেখে, সালাফের বক্তব্যগুলোকে একত্র করে বড় বড় বই রচনার মাধ্যমে মুসলমানদের এগুলো নিয়েই বিতর্কের মাঝে ব্যস্ত করা সালাফের মানহাজ নয়। বরং মুসলমানরা কুরআন-সুন্নাহ পড়বে। যখন কোথাও কোনো সিফাত আসবে, সালাফের মানহাজ অনুযায়ী তাতে স্রেফ বিশ্বাস রাখবে। এটুকুই প্রত্যেক মুসলিমের জন্য যথেষ্ট।

---

১. ফাতহুল বারি (১৩/৩৮৩)।
২. ফাতাওয়ায়ে ইবনিস সালাহ (১/৮৩)।
৩. তুহফাতুল আহওজায়ি, মুবারকপুরি (২/৪৩১)।
৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা (১১/২৩০)।
৫. তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা (৮/২১৯)।

ইমাম ইবনে কুদামা রাহি. বলেন, **'আমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার সিফাতগুলোর মাধ্যমে তিনি কী উদ্দেশ্য নিয়েছেন সেটার অর্থ জানা দরকার নেই। কেননা এগুলোর সঙ্গে কোনো আমল জড়িত নয়। কেবল ঈমান আনা ছাড়া এগুলোর ক্ষেত্রে আর কোনো কাজ নেই। আর ঈমান আনার জন্য এগুলোর অর্থ জানা জরুরি নয়। কারণ, আল্লাহ তায়ালা আমাদের ফেরেশতা, কিতাব, রাসুলগণ এবং তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোর উপরও ঈমান আনতে বলেছেন, অথচ ওসবের আমরা নাম ছাড়া কিছুই জানি না।'**[১] তিনি এসব ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় সম্পর্কে বলেন, **'সুতরাং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এসব শব্দ, আয়াত ও হাদিসের উপর আল্লাহ যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন সেই ভিত্তিতে ঈমান আনা। যেসব অর্থ আমাদের জানা নেই সেসব ব্যাপারে নীরব থাকা, আল্লাহ তায়ালা যেগুলো আমাদের জানাননি, কিংবা জানার জন্য নির্দেশ দেননি, সেগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করা। এ পথে যারা চলবে তাদের কোনো ভয় নেই, তাদের উপর কোনো ভর্ৎসনা নেই। যারা তাদের ভর্ৎসনা করে, তারা ভুলের উপর আছে।'**[২]

কিন্তু আফসোস, যে সালাফ এসব বর্ণনা থেকে সর্বাধিক দূরে থাকতেন, তাদের নামেই আজ উম্মাহকে খণ্ড-বিখণ্ড করার কাজ চলছে অত্যন্ত ঈমান ও আবেগ নিয়ে। অথচ এগুলোকে দ্বীনের মূল বিষয় বানানো নিষ্প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, আমরা সবাই ভাই ভাই। ইসলামি আকিদা আমাদের ভাই-ভাই বানানোর জন্য এসেছে, একে অন্যের দুশমন বানাতে আসেনি। আমাদের হৃদয়গুলো এক করতে এসেছে, জুদা করতে আসেনি। আল্লাহ তায়ালা বলেন: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا অর্থ: 'আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ করো; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।' [আলে ইমরান: ১০৩]

---

১. তাহরিমুন নাজার ফি ইলমিল কালাম, ইবনে কুদামা (৫২)।
২. প্রাগুক্ত (৫৪)।

وَتَعَالَى عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَايَاتِ، وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدَوَاتِ، لَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ.

আল্লাহ তায়ালা সব ধরনের সীমা-পরিসীমা ও গণ্ডির উর্ধ্বে। তিনি সকল উপাদান, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উপকরণ থেকে মুক্ত। সৃষ্টির মতো ছয় দিক তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না।

ব্যাখ্যা

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির সবকিছুর উর্ধ্বে: আল্লাহ তায়ালা জগতের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা। তিনি মানুষ ও অন্য সকল প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। সবার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রূপদান করেছেন। তিনিই জগতে বিদ্যমান ছোট-বড় সকল সাজ-সরঞ্জাম, উপায়-উপকরণ অস্তিত্বে এনেছেন। ফলে এগুলোর কোনোকিছুই তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে না। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল তিনি বানিয়েছেন; আকাশ ও মাটি তিনি গড়েছেন; সূর্য ও চন্দ্র তিনি উদ্ভাবন করেছেন। পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ, উপর ও নিচ তাঁর বানানো। ফলে তিনি উপর ও নিচের উর্ধ্বে। এসব দিক সৃষ্টির জন্য প্রযোজ্য; সৃষ্টির বোঝার সুবিধার্থে। আল্লাহর জন্য এসব দিক প্রযোজ্য নয়। কেনো দিক (জিহাহ) তাঁকে পরিবেষ্টিত করতে পারে না। কোনো সীমা-পরিসীমা (হদ-গায়াহ) তাঁকে ধারণ করতে পারে না। এগুলোই ইমাম তহাবি রাহি.-এর বক্তব্যের অর্থ।

কিন্তু একদল ব্যাখ্যাতা এখানে ইমাম তহাবির উপর প্রচণ্ড আপত্তি করেছেন। তাদের বক্তব্য—আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিজের ব্যাপারে এসব শব্দ প্রয়োগ করেননি, রাসুলুল্লাহও আল্লাহর ব্যাপারে এমন শব্দ প্রয়োগ করেননি। ফলে এগুলো ব্যবহার না করাই উত্তম। বরং কেউ কেউ তো এটাও বলেছেন যে, 'এগুলো ইমাম তহাবি বলেননি, অন্যকেউ ঢুকিয়েছে', আর আফসোস করেছেন, 'যদি ইমাম তহাবি এমন কথা না বলতেন!'

কিন্তু এই আপত্তি যথাযথ নয়। কারণ, ইমাম তহাবি রাহি. এখানে যা বলেছেন, সেটা কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফ থেকে গৃহীত ব্যাখ্যাই। তা ছাড়া এসব শব্দ তাঁর নিজের আবিষ্কৃত নয়; বরং সালাফের মাঝেও এসব পরিভাষা প্রচলিত ছিল। খোদ ইমাম আজম আবু হানিফা রাহি. আল্লাহর জন্য 'হদ' (সীমা) নাকচ করেছেন। আল-ফিকহুল আকবারে তিনি বলেন, 'তাঁর কোনো 'হদ' (সীমা) নেই, প্রতিপক্ষ নেই, সমকক্ষ নেই; তাঁর মতো কিছু নেই।' (لا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له)।[১]

আবু দাউদ তয়ালিসি (২০৪ হি.) বলেন, 'সুফিয়ান সাওরি, শু'বা, হাম্মাদ ইবনে জায়দ, হাম্মাদ ইবনে সালামাহ, শরিক ও আবু আওয়ানাহ আল্লাহর জন্য **'হদ'** নির্ধারণ করতেন না, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে সাদৃশ্য দিতেন না, সৃষ্টির কিছুর সঙ্গে তাকে মেলাতেন না।'[২] সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুস্তরি (২৮৩ হি.) বলেন, 'আল্লাহ তায়ালার সত্তা ইলমের গুণে গুণান্বিত, কিন্তু তাকে পূর্ণ উপলব্ধি কিংবা ধারণ করা সম্ভব নয়। দুনিয়াতে তাঁকে চোখে দেখা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, ঈমানের মাধ্যমে তিনি বিদ্যমান আছেন সেটা বোঝা সম্ভব। কিন্তু **তাঁর সীমারেখা নির্ধারণ সম্ভব নয়**, তাঁকে পরিবেষ্টন করা সম্ভব নয়। সৃষ্টির মাঝে তাঁকে ধারণ করা সম্ভব নয়....'[৩]

ইমাম আহমদ রাহি. থেকে খাল্লাল (৩১১ হি.) বর্ণনা করেন, মৃত্যুর আগের দিন ইমামকে সিফাতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দেন, 'যেভাবে এসেছে ওভাবেই রেখে দিতে হবে। ওগুলোর উপর ঈমান আনতে হবে। বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত হলে কোনোকিছু নাকচ করা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা নিজের ব্যাপারে যা বলেছেন, তারচেয়ে কিছু বেশি বলা যাবে না। কোনোরূপ **সীমা-পরিসীমা** (بلا حد ولا غاية) নির্ধারণ ব্যতিরেকে!'[৪] লালাকায়ির (৪১৮ হি.) বর্ণনাতেও এসেছে, ইমাম আহমদ রাহি. বলেন, আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর কোনো **সীমা** ও স্বরূপ নির্ধারণ ছাড়া স্বীকার করা (بلا حد ولا صفة)।[৫] ইবনে হিব্বান (৩৫৪ হি.) বলেন, আল্লাহ তায়ালার কোনো **সীমা নেই** তিনি সীমাবদ্ধ নন (ليس له حد محدود فيحتوى)। তিনি স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে।[৬] যেহেতু মুশাববিহাহ ও মুজাসসিমাহ সম্প্রদায় আল্লাহর ব্যাপারে এসব শব্দ

---

১. আল-ফিকহুল আকবার (২)।
২. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বাইহাকি (২/৩৩৪); সুনানে কুবরা, বাইহাকি (৪৭২৯)।
৩. আর রিসালাহ কুশাইরিয়্যাহ (২/৪৬৪)।
৪. আকিদাহ (রিওয়াইয়াতু খাল্লাল) (১২৭)।
৫. শরহুস সুন্নাহ, লালাকায়ি (২/৪৪৬); তারিখুল ইসলাম, জাহাবি (৫/১০২৪)।
৬. আস সিকাত, ইবনে হিব্বান (১/১)।

সাব্যস্ত করত, তাই সালাফগণ আল্লাহর ব্যাপারে এসব শব্দ নাকচ করে দিয়েছেন। ফলে এগুলো ব্যবহারের উপর আপত্তি একেবারেই নিষ্প্রয়োজন।

একইভাবে 'আরকান' ও "আ'জা" শব্দের উপরও একদল ব্যাখ্যাতা আপত্তি করেছেন। তাদের মতে, কুরআন-সুন্নাহ কিংবা সালাফের কেউ বলেননি আল্লাহ 'জিসম' (শরীর) নন! ফলে যেসব আয়াতে আল্লাহর হাত-পা সাব্যস্ত করা হয়েছে, ওগুলোর উপর 'জিসম' শব্দ প্রয়োগ করা নিষেধ নয়। উপরন্তু তহাবির এসব শব্দ ভ্রান্ত ধারার মানুষরা তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ছড়ানোর কাজে ব্যবহার করবে। তারা এর মাধ্যমে প্রমাণ করবে, ইমাম তহাবি কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত আল্লাহ তায়ালার সিফাত যেমন 'ওয়াজহ' (চেহারা), 'ইয়াদ' (হাত), 'আইন' (চোখ) ইত্যাদি নাকচ করেছেন। ফলে এসব শব্দ আল্লাহর শানে ব্যবহার না করা চাই।

কিন্তু এমন আপত্তিও আপত্তিকর। আমরা তাদের প্রশ্ন করব, আপনারা আল্লাহর শানে ব্যবহৃত 'চেহারা', 'হাত', 'চোখ' ইত্যাদি দিয়ে কী বোঝেন? যদি তারা বলে, সৃষ্টির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাত, পা, চোখ ইত্যাদির মাধ্যমে যা বোঝায় কুরআনেও তা-ই বোঝানো হয়েছে, তবে তারা সাদৃশ্যকারী ও দেহবাদী, তাদের সঙ্গে আর কোনো কথা নেই। কিন্তু তারা যদি বলে, এগুলো আল্লাহর সিফাত। আমরা এগুলোতে বিশ্বাস রাখি, কিন্তু এর স্বরূপ আল্লাহর কাছে সমর্পণ করি, তবে ইমাম তহাবির উপর আপত্তি নিষ্প্রয়োজন। কারণ, ইমাম তহাবি আল্লাহর সিফাতকে প্রত্যাখ্যান করেননি, কিংবা নিজের পক্ষ থেকে এসব শব্দ সিফাত হিসেবে ব্যবহার করেননি; বরং মুজাসসিমাহ তথা দেহবাদীরা আল্লাহর ব্যাপারে এসব শব্দ প্রয়োগ করে, ইমাম তহাবি কেবল তাদের খণ্ডন করেছেন।

আল্লাহর উপর জিসম তথা 'দেহ' শব্দের প্রয়োগ বৈধ নয়। এ ধরনের শব্দ তানজিহের সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক। ইমাম আহমদ আল্লাহর উপর 'জিসম' শব্দ প্রয়োগ করতে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন।[১] বরং তিনি বলেছেন, 'কেউ যদি বলে আল্লাহর শরীর আছে, কিন্তু আমাদের শরীরের মতো নয়, তবে সে কাফের!।[২] কারণ, আল্লাহর জন্য শরীর সাব্যস্ত করাই গলদ। আমাদের মতো নয় বলা কিংবা না বলার মাঝে বিশেষ ফারাক নেই।

---

১. আল-আকিদা (খাল্লালের বর্ণনা) (২/২০৯)।
২. নিহায়াতুল মুবতাদিয়িন, ইবনে হামদান (৩১)।

একইভাবে আল্লাহর **ছয় দিক থেকে উর্ধ্বে** হওয়ার বিষয়টির উপরও তারা আপত্তি করেন। তাদের বক্তব্য হলো, এর মাধ্যমে অনেকে আল্লাহ তায়ালার 'উলু'কে অস্বীকার করবে। ফলে আল্লাহর ব্যাপারে এমন শব্দ প্রয়োগ না করা উত্তম। কিন্তু আমরা একটু গভীরে গেলে দেখব, এখানেও আপত্তির মতো কিছু নেই। কারণ, এসব দিক আল্লাহর মাখলুক। আল্লাহ খালিক। ফলে এসব দিক তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। এগুলো সৃষ্টির জন্য বানানো হয়েছে। পৃথিবীর সকল সৃষ্টি কোনো-না-কোনো দিকে বিদ্যমান। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এগুলোর উর্ধ্বে। যখন কোনো দিক ছিল না, তখনও আল্লাহ তায়ালা ছিলেন। সৃষ্টির কোনোকিছু তাকে ধারণ করতে পারে না।[১] আল্লাহ তায়ালা বলেন, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَٰلَمِينَ অর্থ: 'নিশ্চয়ই আল্লাহ গোটা জগদ্‌বাসী থেকে অমুখাপেক্ষী।'

তুর্কিস্তানি ও গজনবি লিখেন, 'কারণ ছয় দিক আল্লাহর সৃষ্টি। এগুলো সৃষ্টিজগতের বিশেষণ। আর আল্লাহ তায়ালার কোনো শুরু নেই। তিনি সর্বদাই ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। যখন কোনো সময় ছিল না, স্থান ছিল না, উপর ছিল না, নিচ ছিল না, সম্মুখ ছিল না, পিছন ছিল না, ডান ছিল না, বাম ছিল না, তখনও আল্লাহ তায়ালা ছিলেন। জগৎ সৃষ্টি করার পরে জগৎ ছয়টি দিকে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি নন; ফলে তিনি এই ছয় দিকে সীমাবদ্ধ নন; বরং তিনি সবকিছু পরিবেষ্টন করে আছেন।'[২] শাইবানি লিখেন, 'আল্লাহ তায়ালা সকল স্থান থেকে পবিত্র। কোনো স্থান তাঁকে ধারণ করতে পারে না। কারণ স্থানও তাঁর সৃষ্টি।'[৩] গুনাইমি লিখেন, 'কারণ তিনি দিক ও স্থান সৃষ্টি করার আগেই বিদ্যমান। তিনি তেমনই আছেন, যেমন ছিলেন।'[৪]

তা হলে একদল আলিম ইমাম তহাবির উপর কেন আপত্তি করেন? **বরং কেউ কেউ তো এক্ষেত্রে ইমাম তহাবিকে আহলে সুন্নাতের মানহাজ বিরোধী কাজ করেছেন বলেও অপবাদ দিয়েছেন**। কারণ, ইমাম তহাবি রাহি.-এর বক্তব্য তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তারা কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফের বক্তব্যে আল্লাহ 'উপরে' বলতে আমাদের মাথার উপরের 'দিক' সাব্যস্ত করেন। আল্লাহকে এই 'দিকটাতে'ই কল্পনা করেন। কিন্তু ইমাম তহাবি বলছেন, ছয়দিক আল্লাহর সৃষ্টি। ফলে আল্লাহর জন্য এগুলো প্রযোজ্য হতে পারে না। সৃষ্টির জন্য বানানো এসব সীমিত দিকের অনেক উর্ধ্বে মহান আল্লাহ তায়ালা।

---

১. আকহাসারি (১৫৭)।
২. তুর্কিস্তানি (১১১); গজনবি (৮৮)।
৩. শাইবানি (২১)।
৪. গুনাইমি (৭৫)।

'দিক' ও 'সীমা' সাব্যস্তকারীদের মানহাজের পর্যালোচনা: উপরে আমরা ইমাম তহাবির ব্যবহৃত শব্দগুলোর উপর একদল আলিমের আপত্তির কথা উল্লেখ করেছি। তারা ইমাম তহাবির **সম্পূর্ণ বিপরীত** মত পোষণ করেন এবং আল্লাহর জন্য 'হদ' (সীমা) এবং 'জিহাহ' (দিক) দুটোই সাব্যস্ত করেন। বরং তারা আল্লাহর 'সীমা' অস্বীকার করাকে বাতিল মনে করেন! আল্লাহর সীমা থাকাকে তারা সালাফের মানহাজ মনে করেন। তাদের মতে, আরশ আমাদের উপরে এবং এটা একটা 'দিক'। আর আল্লাহ আরশের 'উপরে' এটাও একটা 'দিক'। সুতরাং আল্লাহ একটা 'দিকেই' আছেন (فِي جِهَةٍ)। উপরন্তু এটাকে তারা ইমাম আহমদের মাজহাব হিসেবে ঘোষণা করেন। এক্ষেত্রে তাদের দলিল, ইমাম আহমদ আল্লাহর আরশে ইস্তিওয়াকে সাব্যস্ত করেন।[১]

কিন্তু ইমাম আহমদ রাহি. এমন মাজহাব থেকে মুক্ত। যদি আরশের উপর ইস্তিওয়া সাব্যস্ত করার কারণে ইমাম আহমদ দিক সাব্যস্ত করেন বলা হয়, তবে তো সকল সালাফের ব্যাপারে বলতে হবে তারাও দিক সাব্যস্ত করেন। অথচ সালাফ কেবল 'জাহের' সাব্যস্ত করতেন। নুসুসের অনুসরণে ইস্তিওয়াসহ সকল সিফাতকে হুবহু যেভাবে এসেছে সেভাবে রেখে দিতেন। এর গভীর মর্ম, স্বরূপ ও ধরন উপলব্ধি করতে নিজেদের অক্ষম মনে করতেন, যেমনটা ইমাম মালেক ও শাফেয়ি থেকে প্রসিদ্ধ। ফলে আরশে আল্লাহর ইস্তিওয়ার স্বরূপ তিনিই ভালো জানেন। এর সঙ্গে 'দিকের' কোনো সম্পর্ক নেই। আল্লাহর জন্য জিহাহ সাব্যস্ত করা সালাফ কিংবা খালাফ কোনো মুহাক্কিকেরই মাজহাব নয়।[২]

ইমাম আহমদ রাহি.-এর মাজহাব হলো: 'আরশ সৃষ্টির আগে কিংবা পরে আল্লাহর মাঝে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। কোনো **সীমারেখা** আল্লাহকে পরিবেষ্টিত করতে পারে না।'[৩] ইবনে হামদান (৬৯৫ হি.) ইমাম আহমদ রাহি. থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম আহমদ বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ আরশের উপরে যেভাবে তিনি চেয়েছেন। কোনো সীমা (হদ) ছাড়া।'[৪] ইবনে হামদান ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের আকিদা বর্ণনা করে আরও লিখেন, "আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে 'নিচ', '**উপর**', 'সম্মুখ', 'পিছন', 'স্বরূপ'

---

১. বায়ানু তালবিসিল জাহমিয়্যাহ (৩/৪৬৬, ৫৯১, ৭৩০)।
২. ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়্যাহ, মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহি (১/২৪৬)।
৩. আকিদাহ, আহমদ ইবনে হাম্বল (১১)।
৪. নিহায়াতুল মুবতাদিয়ীন (৩১)।

ইত্যাদি সাব্যস্ত করা যাবে না!'[১] ইবনে জামাআহ (৭৩৩ হি.) লিখেন, 'ইমাম আহমদ রাহি. আল্লাহর জন্য '**দিক**' (জিহাহ) সাব্যস্ত করতেন না।'[২]

কেবল ইমাম আহমদ নন; বরং তাঁরও আগে ইমাম আজম আবু হানিফা রাহি.-এর মানহাজ ছিল আল্লার জন্য 'হদ' (সীমার)-এর মতো 'জিহাহ' তথা দিককেও নাকচ করা। ইমাম পরকালে আল্লাহর দিদার প্রসঙ্গে লিখেন, 'ধরনহীন', 'সাদৃশ্যহীন', 'দিকহীন' (لا كيف ولا تشبيه ولا جهة)।[৩] সুতরাং ইমাম তহাবি ইমাম আজমের আকিদা লিখতে গিয়ে 'দিক' নাকচ করবেন এটাই স্বাভাবিক।

পরবর্তী সকল হানাফি আলিমের বক্তব্যও এক ও অভিন্ন। ইমাম সারাখসি (৪৮৩ হি.) লিখেন, 'আল্লাহর জন্য দিক (জিহাহ) সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। কারণ, তাঁর কোনো দিক (জিহাহ) নেই।'[৪] ইমাম ফখরুল ইসলাম বাজদাবিও আল্লাহর জন্য 'দিক' (জিহাহ) সাব্যস্ত করাকে অসম্ভব বলেছেন।[৫]

সুতরাং আল্লাহর জন্য 'দিক' ও সীমা' কোনোকিছু নির্ধারণ করা যাবে না। তিনি এ সবকিছুর উর্ধ্বে। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে হিব্বান (৩৫৪ হি.) আল্লাহর 'সীমা' নির্ধারণ প্রত্যাখ্যান করলে দেহবাদীরা তাকে তার দেশ থেকে বের করে দিয়েছিল। তাদের উগ্রতা স্পষ্ট হয় এই মহান ইমামের প্রতি তাদের বক্তব্যে। তারা বলত, 'তার ইলম আছে, কিন্তু দ্বীনদারি কম। কারণ, সে আল্লাহর 'সীমা' অস্বীকার করে!'[৬] পরবর্তীকালে এই মাজহাব গ্রহণ করেন উসমান ইবনে সাইদ দারেমি এবং নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহর প্রতি আরও একটা সীমা সংযোজন করেন। এবার আল্লাহর সীমা হয় দুটি! দারেমি বলেন, 'আল্লাহর সীমা রয়েছে যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না! আরশের উপরে তাঁর স্থানেরও রয়েছে সীমা। এ হিসেবে মোট দুটি সীমা হলো!.'[৭]

কিন্তু এমন বক্তব্য সঠিক নয়। সালাফ আরশের উপর আল্লাহর ইস্তিওয়াকে স্বরূপহীন সাব্যস্ত করেছেন। এ কারণেই ইমাম তহাবি রাহি. অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীনভাবে

---

১. প্রাগুক্ত (৩৪)।
২. ইজাহুদ দলিল, ইবনে জামাআহ (১০৮)।
৩. আল-ওয়াসিয়্যাহ (৫৯)।
৪. উসুলুস সারাখসি (১/১৭০)।
৫. উসুলুল বাজদাবি (১০)।
৬. বায়ানু তালবিসিল জাহমিয়্যাহ (৩৫-৩৬)।
৭. নাকজুদ দারেমি আলাল মারিসি (১/২২৩-২২৪)।

বলেছেন, **'আহলে সুন্নাতের মাজহাব হলো আল্লাহকে সকল দিক ও সীমার উর্ধ্বে মনে করা।'**

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি 'আল-আকিদাতুল হাসানাহ' গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন, 'আল্লাহ শরীর (জিসম) নন। **তিনি কোনো স্থানে সীমাবদ্ধ (হাইয়িজ) নন। তিনি কোনো দিকে (জিহাহ) নন।** তাঁর দিকে ইশারা করে বলা যাবে না তিনি এখানে বা ওখানে!' একটু পরেই লিখেছেন, 'তিনি আরশের উপর যেমনটা তিনি নিজের ব্যাপারে বলেছেন। **কিন্তু সেটা কোনো স্থানে বা দিকে নয়।** বর এই উর্ধ্বত্ব ও ইস্তিওয়ার প্রকৃত রূপ (কুনহ) তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না।'[১] বরং আল-কাওলুল জামিলেও তিনি আল্লাহর জন্য জিহাহ নাকচ করেছেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ সব ধরনের অপূর্ণতা, দৈহিক প্রয়োজন, কেনো স্থানে সীমাবদ্ধ থাকা, চওড়া হওয়া, দিক, রং ও আকার-আকৃতি থেকে মুক্ত।'[২] কাশ্মীরি রাহি. আল্লাহর জন্য দিক সাব্যস্তের কঠোর সমালোচনা করে সেটাকে তাজসিম সদৃশ বলেছেন।[৩]

হজরত থানভি লিখেন, "আল্লাহ 'জিহাহ' তথা দিক থেকে পবিত্র; এটা নকল ও আকল উভয়ভাবে প্রমাণিত। আল্লাহর জন্য **দিক** নির্ধারণ করে ফেললে স্বরূপ ও ধরন (কাইফিয়্যাত) সঁপে দেওয়ার কিছু থাকে না; বরং স্বরূপই নির্ধারণ করা হয়। মুজাসসিমারা আল্লাহর জন্য দিক সাব্যস্ত করে। কিন্তু আহলে সুন্নাতের মুহাদ্দিস ও সুফিগণ সবাই আল্লাহর জন্য এগুলো দিক ছাড়া সাব্যস্ত করেন। এ ব্যাপারে এটাই গ্রহণযোগ্য কথা।'[৪]

---

১. আল-আকিদাতুল হাসানাহ (৫/৬)।
২. আল-কাওলুল জামিল (৪৩)।
৩. ফয়জুল বারি (৬/৫৬৩)।
৪. ইমদাদুল ফাতাওয়া (৬/২৫-২৬)।

وَالـمِعْرَاجُ حَقٌّ، وَقَدْ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرِجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقَظَةِ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللهُ مِنَ العُلَى، وَأَكْرَمَهُ اللهُ بِمَا شَاءَ، وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى، { مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَى}، فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الآخِرَةِ وَالأُولَى.

মিরাজ সত্য। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নৈশ ভ্রমণ করানো হয়েছে। অতঃপর তাকে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে আকাশে নেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে আল্লাহ যেখানে চেয়েছেন তাঁকে ঊর্ধ্বজগতে নিয়ে গিয়েছেন। তিনি তাকে যেভাবে চেয়েছেন সম্মানিত করেছেন। তিনি তাঁর প্রতি ওহি নাজিল করেছেন। 'তাঁর হৃদয় মিথ্যা বলেনি যা তিনি দেখেছেন।' আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন।

ব্যাখ্যা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-সম্পর্কিত আরও কিছু আকিদা

ইসরা ও মিরাজ: এগুলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-সংশ্লিষ্ট আকিদা। ইসরা হলো নৈশ ভ্রমণ করা। আর মিরাজ হলো উর্ধ্বগমনের সিঁড়ি। আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর জীবদ্দশায় এক রাতে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মক্কা থেকে ফিলিস্তিনের বাইতুল মাকদিস পর্যন্ত নিয়ে যান। সেখান থেকে উর্ধ্ব জগতে ডেকে নেন। তাঁর সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেন। নামাজ ফরজ করেন। সেই রাতেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবার মক্কাতে নিজ গৃহে পৌঁছে দেন! এই আকিদাগুলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আকিদা। কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই প্রত্যেক মুসলিমের জন্য এগুলোতে বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। প্রকৃতির

স্বাভাবিক নিয়ম-বিরুদ্ধ মনে হওয়াতে কেউ কেউ এগুলো মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি করতে পারে। তাই আকিদার গ্রন্থগুলোতে এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। আমরা সংক্ষেপে নিচে ইসরা ও মিরাজ-সংশ্লিষ্ট জরুরি আলোচনাগুলো তুলে ধরছি।

ঘটনা-প্রবাহ: প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা রাজি. ও শ্রদ্ধেয় চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর পরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। তারা যে বছর ওফাত পান, সেই বছরটি 'আমুল হুজন' তথা দুঃখের বছর হিসেবে ইসলামের ইতিহাসে পরিচিতি পায়। আল্লাহ তায়ালা এই দুঃখের সময়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা ও সম্মাননা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তিনি তাঁকে ইসরা ও মিরাজ উপহার দেন। এ ছিল এমন উপহার, যা তাঁর আগে কিংবা পরে মানবজাতির কাউকে দেওয়া হয়নি। কুরআনের পাশাপাশি অসংখ্য সাহাবি ইসরা ও মিরাজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হ্যাঁ, এগুলোর সময় নির্ধারণ ও বিস্তারিত বর্ণনার ক্ষেত্রে তাদের মাঝে মতভেদ হয়েছে। কারণ, ঘটনাটি অনেক দীর্ঘ এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে অনেককিছু দেখেছেন, ফলে বিভিন্ন হাদিসে বিক্ষিপ্তভাবে এসেছে সেসব বর্ণনা। কিন্তু মূল ঘটনা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। ফলে জগতের সব ধারার সকল মুসলিম ইসরা ও মিরাজে বিশ্বাস করে থাকেন। কেবল হাতেগোনা কিছু বিভ্রান্ত মানুষ এটাকে অস্বীকার করে। কেউ কেউ আবার অপব্যাখ্যা করে। তাদের ধারণা—এগুলো ইসরাইলি বর্ণনা, ইহুদি ও শিআদের বানানো গল্প।[1] অথচ ইসরা ও মিরাজের বিষয়টি কুরআন-সুন্নাহ ও উম্মাহর ইজমা দ্বারা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত। তাই যদি কেউ জেনে-শুনে এগুলোকে অস্বীকার করে এবং এক্ষেত্রে তার কোনো উজর না থাকে, তবে সে কাফের হিসেবে পরিগণিত হবে।

ইসরা সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِیَهٗ مِنْ اٰیٰتِنَا ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ.

অর্থ: 'পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চারদিকে আমি বরকত দান করেছি, যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিই। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।' [ইসরা: ১]

---

১. উদাহরণস্বরূপ দেখুন মুহাম্মাদ আবু রাইয়াহর 'আজওয়াউন আলাস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ'। আহমদ শালাবির 'আল-ইসরা ওয়াল মিরাজ'।

আর মিরাজ সম্পর্কে বলেন,

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى. اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى. لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى.

অর্থ: 'নিশ্চয় তিনি তাকে আরেকবার দেখেছিলেন; সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে, যার কাছে অবস্থিত বসবাসের জান্নাত, যখন বৃক্ষটি যা দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার তা দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি এবং সীমালঙ্ঘনও করেনি। নিশ্চয় তিনি তার পালনকর্তার মহান নিদর্শনাবলি অবলোকন করেছেন।' [নাজম: ১৩-১৮]

সংক্ষেপে ইসরা ও মিরাজের ঘটনাক্রম ছিল এমন: নবুওতের পরে[১] ও হিজরতের আগে এক রাতে মক্কায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমন্ত ছিলেন। হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হলেন। ফেরেশতা জিবরাইল আলাইহিস সালাম অবতরণ করে তাঁর বক্ষ বিদারণ করলেন। জমজমের পানি দ্বারা সেটা ধৌত করে তাঁর হৃদয়কে ঈমান ও হিকমতের আলোতে পূর্ণ করলেন। এরপর 'বোরাক' নামের একটি প্রাণী নিয়ে আসা হয়। এটি একটি লম্বা সাদা রঙের প্রাণী ছিল। আকারে গাধার চেয়ে বড় খচ্চরের চেয়ে একটু ছোট ছিল। কিন্তু এর গতি ছিল অকল্পনীয়। দৃষ্টিসীমার শেষে এর পা পড়ত।[২] এটা অন্য নবিদেরও বাহন ছিল। সেটার পিঠে চড়ে তিনি ফিলিস্তিনের মসজিদুল আকসাতে আসেন। মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাআত নামাজ আদায় করেন।

অতঃপর তাঁকে উর্ধ্ব গগনের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। দুনিয়ার আকাশের দরজা খুলে দেওয়া হয় তাঁর জন্য। সেখানে আদম আলাইহিস সালামের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়।

---

১. ইসরা ও মিরাজের তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে নির্ভরযোগ্য মত হলো, নবুওতের পরে রাসুলুল্লাহর মক্কি জীবনে। কারণ, নামাজ ফরজ হয়েছিল মিরাজের রাতে। আর নামাজ তো নবুওতের আগে ফরজ হওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, 'নবুওতের আগে'। এ কারণে কেউ কেউ খোদ ইসরা ও মিরাজকে অস্বীকার করেছেন। কেউ কেউ হাদিসকে জাল বলেছেন এবং ইমাম বুখারি ও মুসলিমের সমালোচনা করেছেন। বাস্তব কথা হলো, ইমাম বুখারি ও মুসলিম যেভাবে বর্ণনা পেয়েছেন, সেভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদিসে উল্লিখিত 'নবুওতের আগে' শব্দটি হয়তো ব্যাখ্যা করা হবে অথবা বর্ণনাকারী তাবেয়ি শরিক রাহি.-এর ভুল হিসেবে গণ্য করা হবে। ইসরা ও মিরাজ আলিমদের সর্বসম্মত মতানুযায়ী নবুওতের পরে সংঘটিত হয়েছিল। বিস্তারিত দেখুন: ফাতহুল বারি, ইবনে হাজার (১৩/৪৮০-৪৮৭); শরহে মুসলিম, নববি (২/২০৯)।

২. আমাদের দেশে বোরাক নামে প্রচলিত ডানাবিশিষ্ট একটি প্রাণীর ছবি লক্ষ করা যায়। বিশুদ্ধ কোনো বর্ণনায় বোরাককে ডানাবিশিষ্ট বলা হয়নি। প্রচলিত ছবিতে বোরাকের যে চিত্র দেখা যায়, সেটা মূলত বিভিন্ন জাল কিংবা দুর্বল হাদিসের ভিত্তিতে তৈরি (দেখুন: আল-মাওজুআত, ইবনুল জাওজি ১/২৮৮)।

দ্বিতীয় আকাশে ঈসা ও ইয়াহইয়া, তৃতীয় আকাশে ইউসুফ, চতুর্থ আকাশে ইদরিস, পঞ্চম আকাশে হারুন, ষষ্ঠ আকাশে মুসা ও সপ্তম আকাশে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হয়। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বিভিন্ন রং তাঁকে ঘিরে ফেলে। তিনি বলতে পারেননি সেগুলো কী ছিল। অতঃপর তাকে আরও উর্ধ্বে বাইতুল মামুরে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতিদিন তাতে সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদত করেন। একবার যারা প্রবেশ করেন, দ্বিতীয়বার আর কখনও প্রবেশের সুযোগ পান না। তিনি জিবরাইল আলাইহিস সালামকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখতে পান। অতঃপর তাঁকে আরও উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া হয় আল্লাহ তায়ালা যে পর্যন্ত চেয়েছেন সে পর্যন্ত। একপর্যায়ে তিনি লাওহে মাহফুজে কলমের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলেন! আল্লাহ তায়ালা তাঁর সঙ্গে একান্তে কথা বলেন। তাঁর উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেন। পরে মুসা আলাইহিস সালামের পরামর্শে তাঁর অনুরোধের প্রেক্ষিতে সেটা পাঁচ ওয়াক্ত করে দেওয়া হয়। অতঃপর তাঁকে জান্নাত ও জাহান্নাম পরিভ্রমণ শেষে মক্কায় ফিরিয়ে আনা হয়।[১]

ইসরা ও মিরাজের ঘটনাগুলো প্রকাশ্যে আনার পরে স্বভাবতই কাফেররা সেগুলো অস্বীকার করে। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতিমে দাঁড়ান। আল্লাহ তাঁর সামনে বাইতুল মাকদিসকে উন্মোচিত করে দেন। তিনি দেখে দেখে সেটার বর্ণনা তাদের শোনান।[২]

একটি প্রশ্ন ও উত্তর: ইসরা ও মিরাজ কি জাগ্রত অবস্থায় ছিল, নাকি ঘুমে ও আধ্যাত্মিকভাবে? আয়েশা, মুআবিয়া ও হাসান বসরি থেকে মিরাজ আধ্যাত্মিকভাবে হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। তারা মূলত কুরআনের বাণী:

وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

'আর যে দৃশ্য আমি আপনাকে দেখিয়েছি তা তো কেবল মানুষকে পরীক্ষার জন্য।' [ইসরা: ৬০] এখানে ব্যবহৃত আরবি শব্দটির শাব্দিক অর্থ স্বপ্ন ধরেন। তা ছাড়া বুখারিতে আনাস রাজি.-এর হাদিসের শুরুতে 'তিনি ঘুমে ছিলেন' এবং শেষে 'তিনি

---

১. বুখারি (৭৫১৭); মুসলিম (১৬২); সহিহ ইবনে হিব্বান (৪৭, ৪৮, ৫৯); মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩৭৭২৫)।

২. বুখারি (৩৮৮৬)।

মসজিদে হারামে জাগ্রত হলেন' কথার মাধ্যমে বুঝেছেন যে, ইসরা ও মিরাজ স্বপ্নে হয়েছিল। বিপরীতে মুসলিম উম্মাহর আকিদা হলো, রাসুলের মিরাজ সশরীরে ও জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল। কারণ, ইবনে আব্বাস, জাবের, আনাস, হুজাইফা, উমর, আবু হুরাইরা, মালেক ইবনে সা'সাআহ, ইবনে মাসউদ, জাহহাক, সাইদ ইবনে জুবাইর, কাতাদা, সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব, ইবনে শিহাব জুহরি, মাসরুক, মুজাহিদ-সহ সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবি ও তাবেয়ির এই মত। এই মত ইমাম তাবারি, আহমদ ইবনে হাম্বলের। তৃতীয় আরেক দল মনে করেন, ইসরা অংশটুকু সশরীরে হয়েছে, মিরাজ হয়েছে স্বপ্নে! কিন্তু নির্ভরযোগ্য মত হলো, দ্বিতীয় মত তথা নবিজির ইসরা ও মিরাজ দুটোই সশরীরে হয়েছিল।[১]

ইবনে হিব্বান ও কাজি ইয়াজ বলেন, স্বপ্নে হলে কাফেরদের এগুলো অস্বীকার করার মতো কিছু ছিল না। কারণ, স্বপ্নে মানুষ মুহূর্তে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যায়। একইভাবে মিরাজের ঘটনাও স্বপ্ন হলে তাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্বের কিছু নেই। কারণ, স্বপ্নে সাধারণ মানুষও আকাশ, ফেরেশতা, নবি-রাসুল, জান্নাত-জাহান্নাম দেখতে পারে। ফলে এক্ষেত্রে ইসরা ও মিরাজের ঘটনার আলাদা কোনো গুরুত্বই থাকত না। এ দুটো মুজিজা হিসেবেও পরিগণিত হতো না। বাস্তব কথা হলো, আল্লাহ তায়ালার জন্য সবকিছু সম্ভব। এটা যারা উপলব্ধি করতে না পারে, তারা সন্দেহের দোলাচলে উদভ্রান্তের মতো ঘুরতে থাকে। যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, জান্নাত-জাহান্নাম বিশ্বাস করে, তাদের জন্য ইসরা ও মিরাজের ঘটনা অবিশ্বাস্য কিছু নয়। যারা সশরীরে ইসরা ও মিরাজকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে না, তাদের হৃদয় বক্র ও ব্যাধিগ্রস্ত। আল্লাহর উপর তাদের বিশ্বাস নড়বড়ে কিংবা অসম্পূর্ণ।[২]

তাছাড়া ইসরার ঘটনাটিকে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তাঁর একটা বড় নিয়ামত হিসেবে বলেছেন: 'পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চারদিকে আমি বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিই। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু

---

১. শিফা, কাজি ইয়াজ (১/১৮৮-১৮৯)। ফাতহুল বারি (১৩/৪৮৭)
২. বিস্তারিত দেখুন ইবনে হিব্বান (৫০)। শিফা, কাজি ইয়াজ (১/১৮৮-১৮৯) লাওয়ামিউল আনওয়ার, সাফারিনি (২/২৮৮-২৮৯); তাফসিরে ইবনে কাসির (৫/৪০-৪১)।

শোনেন, সবকিছু দেখেন।' [ইসরা: ১] কেবল স্বপ্নে হলে এটা এভাবে বলার মতো কিছু ছিল না। কারণ, স্বপ্নে তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং আল্লাহকে এবং জান্নাত-জাহান্নাম বারবার দেখেছেন। কুরআনে আল্লাহ তায়ালার বাণী,

وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ.

অর্থাৎ 'এবং যে দৃশ্য আমি আপনাকে দেখিয়েছি তা তো কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য।' [ইসরা: ৬০] এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রাজি. দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বচক্ষে দেখেছেন, যে রাতে তাঁকে ইসরা করানো হয়েছিল; স্বপ্ন নয়।[১] বস্তুত এ ব্যাপারে হাদিসের শব্দগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলেও স্পষ্ট হয়, ইসরা ও মিরাজ সশরীরে ছিল, স্বপ্নে নয়। এ কারণে ইমাম তহাবিও সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, **'অতঃপর তাকে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে আকাশে নেওয়া হয়েছে।'**

অনেকে বিজ্ঞানের সঙ্গে মিরাজকে মেলাতে গিয়ে বিভ্রান্তি কিংবা হতবুদ্ধির শিকার হয়। বিজ্ঞান বলছে, পৃথিবী থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের পরে কোনো মানুষের স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আর কোনো আধুনিক যান ছাড়া সেই পর্যন্ত যাওয়াও সম্ভব নয়। তা ছাড়া আকাশ বলতে ছাদের মতো কোনো বস্তু নেই। ফলে মিরাজের সময় বিভিন্ন আকাশের দরজা থাকা, অনুমতি নিয়ে সেসবের ভিতরে প্রবেশ করা, সেখানে আগের নবিদের সাক্ষাৎ পাওয়া, আবার এক রাতে সেখান থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসা ইত্যাদি সম্ভব নয়!

এগুলো হলো দ্বীনের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা। এই পথে হাঁটার সমাপ্তি বিচ্যুতি ও বরবাদি। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, তা হলে কি দ্বীন মানে অন্ধ অনুসরণ? সেখানে গবেষণা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো স্থান নেই? না। কস্মিনকালেও দ্বীন মানে অন্ধ অনুসরণ নয়। তবে দ্বীন মানে নিজের সীমাবদ্ধতা বুঝে অসীম সৃষ্টিকর্তার প্রতি আত্মসমর্পণ; দ্বীন মানে নিজের বিবেকের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করে তাকে সীমার ভিতরে রাখা। আধুনিক বিজ্ঞান মহাবিশ্ব সম্পর্কে এখনও তেমন কিছুই জানে না। তবু যতটুকু জেনেছে, তাতেই এই সৃষ্টির বিশালতা দেখে হতবাক হয়ে যেতে হয়। এই বিশাল মহাবিশ্বের এক ক্ষুদ্র পরমাণু পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র ও অসহায় জীবের পক্ষে সৃষ্টিকর্তার রহস্য ধারণ করা সম্ভব? আধুনিক বিজ্ঞান অদ্যাবধি মহাবিশ্বের কোনো সীমানা খুঁজে পায়নি। তাই বলে সীমানা নেই? আকাশ নেই? আজকের বিজ্ঞান মহাকাশে যতগুলো গ্রহ, ছায়াপথ, নীহারিকার কথা

---

১. ইবনে হিব্বান (৫৬); আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (১১৬৪১)।

বলছে, আজ থেকে শত বছর আগে সেগুলো সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানত না। তখন যদি কেউ বলত, ছায়াপথ বলতে কিছু নেই, আমাদের পৃথিবীর চেয়ে মহাবিশ্বে আর কোনো বড় গ্রহ নেই, আর কোনো সূর্য বা চন্দ্র নেই, সেগুলো সঠিক হতো? না জানা তো না থাকা নয়। আগামী দুইশো বছরের মাঝে হয়তো আমরা মহাবিশ্বের সীমানাও খুঁজে পেয়ে যাব। আজ সেটা অস্বীকার করতে পারি? তা হলে দেখা যাচ্ছে, পারা-না পারা, জানা-না জানা এগুলো আপেক্ষিক, চিরন্তন সত্য নয়। বিপরীতে থাকা-না থাকা চিরন্তন সত্য। আমরা না পারলেই কোনো জিনিস হতে পারবে না, আমরা না জানলেই কোনো জিনিস থাকতে পারবে না—বিষয়টা এমন নয়। রাসুলুল্লাহর ইসরাকে মক্কার কাফেররা অস্বীকার করেছিল। তাদের যুক্তি ছিল, মক্কা থেকে ফিলিস্তিন আসা-যাওয়া কয়েক মাসের ব্যাপার। এক রাতে সেটা সম্ভব নয়। ফলে তারা অস্বীকার করে। আজ যদি মক্কার কেউ দাবি করে, আমি এক রাতে ফিলিস্তিন গিয়ে আবার ফিরে এসেছি, কেউ বিস্মিত হবে কিংবা অস্বীকার করবে? অথচ আজকের দূরত্ব সেই তখনকার দূরত্বের মতোই; আজকের মানুষ সেই তখনের মানুষই। পালটেছে কেবল মানুষের ক্ষমতা ও সামর্থ্যের পরিধি। শত বছর আগের কোনো মানুষ যদি বলত, এমন একটা সময় আসবে, যখন দুজন মানুষ একজন পৃথিবীর পশ্চিমে আরেকজন পূর্বে বসে কথা বলবে, দুজন দুজনকে দেখবে—তাকে কেউ বিশ্বাস করত? অথচ আজকে সেটাই বাস্তবতা।

ফলে জ্ঞানী তো সে-ই, যে নিজের সীমাবদ্ধতা জানে, আল্লাহর অসীমতা জানে ও মানে। এই মহাবিশ্ব যেই সৃষ্টিকর্তা গড়তে পেরেছেন, তিনি তাঁর রাসুলকে কোনো যান ছাড়া, অক্সিজেন ছাড়া ঊর্ধ্বজগতে নিতে পারেন না? এখানেই একজন জ্ঞানী ও মূঢ় এবং মুমিন ও কাফেরের পার্থক্য। আল্লাহর জন্য যদি এতটুকু অসম্ভব হয়, এটুকু কারণে যদি মিরাজকে মেনে নেওয়া না যায়, তবে ফেরেশতা, পূর্বের নবি-রাসুল, কুরআন, আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম কোনোকিছুর উপরই ঈমান আনা সম্ভব নয়! আল্লাহই হিদায়াতের মালিক।

وَالْحَوْضُ الَّذِي أَكْرَمَهُ اللهُ تَعَالَى بِهِ غِيَاثًا لِأُمَّتِهِ حَقٌّ

হাউজ (কাওসার) সত্য, যা (কিয়ামতের দিন) উম্মাহর পিপাসা নিবারণের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাকে দান করে সম্মানিত করেছেন।

ব্যাখ্যা

হাউজে কাওসার: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরেকটি আকিদা হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে প্রদত্ত হাউজে বিশ্বাস করা। এ হাউজ আল্লাহ তায়ালা তাঁকে হাশরের দিন প্রদান করবেন। তিনি এটা থেকে তাঁর উম্মতকে পান করিয়ে পিপাসা নিবারণ করাবেন। কারণ, হাশরের দিন হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। প্রচণ্ড রোদ ও তাপে মানুষ ঘেমে যাবে, পিপাসায় ছাতি ফেটে যাওয়ার উপক্রম হবে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে এই হাউজ থেকে পানি পান করাবেন। যে একবার পান করবে, সে কখনোই পিপাসার্ত হবে না!

প্রায় ত্রিশজন সাহাবি থেকে বিশুদ্ধ সনদে হাউজের বর্ণনা এসেছে। ফলে হাদিসগুলো মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে, যা নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের উদ্দেশে বলেন, 'তোমরা আমার পরে শীঘ্রই প্রচণ্ড স্বার্থপরতা দেখতে পাবে, আরও এমন অনেককিছু দেখবে যা তোমাদের খারাপ লাগবে। সুতরাং তোমরা ধৈর্যধারণ করো যতক্ষণ না আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে হাউজের পারে তোমাদের সাক্ষাৎ হয়!'[১] অন্য একটি হাদিসে বলেন, 'আমি তোমাদের আগে যাচ্ছি। আর আমি তোমাদের উপর সাক্ষী। তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে হাউজের পাড়ে। আমি এখান থেকে তা দেখতে পাচ্ছি।'[২] আরেকটি হাদিসে বলেন, 'আমি তোমাদের আগে হাউজের পাশে থাকব। যে ব্যক্তি

১. বুখারি (৩১৪৭), (৩৭৯২), (৪৩৩০); মুসলিম (১০৫৯)।
২. বুখারি (৪০৪২)।

আমার পাশ দিয়ে যাবে, সে-ই ওখান থেকে পান করবে। আর যে একবার পান করবে, সে কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না।'[১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাউজের কিছু চিত্র আঁকেন এভাবে: 'হাউজের পরিধি হবে মদিনা ও সানআর মধ্যবর্তী জায়গার সমান! তাতে পানপাত্র থাকবে আকাশের তারকার মতো (অধিক)।'[২] অন্য একটি হাদিসে বলা হয়েছে 'আইলা' ও 'জুহফা'র মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান!'[৩] আবু জর রাজি. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, হাউজের পাত্র কেমন হবে? তিনি বললেন, 'ওই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! মেঘমুক্ত অন্ধকার রাতে আকাশে দৃশ্যমান তারকাপুঞ্জ ও নক্ষত্ররাজির চেয়েও এর পাত্রসংখ্যা বেশি হবে। এসব পাত্র জান্নাতেরই পাত্র। যে সেই পাত্রে একবার পান করবে, সে কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। জান্নাত থেকে তাতে দুটো প্রস্রবণ বাহিত হবে। যে ব্যক্তি তা থেকে পান করবে, কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। তার প্রস্থ দৈর্ঘ্যের সমান আম্মান ও আইলার মধবর্তী জায়গা পরিমাণ। তার পানি দুধের চেয়েও অধিক সাদা, মধুর চেয়েও অধিক মিষ্টি।'[৪] বুখারির আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, 'আমার হাউজের পরিধি এক মাসের পথ। এর পানি দুধের চেয়ে সাদা, ঘ্রাণ মিশকের চেয়ে সুন্দর, এর পেয়ালা আকাশের তারকার মতো। যে একবার পান করবে, কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না।'[৫]

কিন্তু এই হাউজ থেকে একমাত্র রাসুলুল্লাহর সত্য ও প্রকৃত উম্মতরাই পান করবে। কাফের, মুরতাদ, বিদআতপন্থি ও গোমরাহ লোকেরা এই হাউজ থেকে রাসুলুল্লাহর হাতে পানি পানের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে। একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি তোমাদের আগে হাউজের কাছে গিয়ে থাকব। তোমাদের একটি দল আমার কাছে আসবে, কিন্তু তাদের আসতে দেওয়া হবে না। আমি বলব, 'হে প্রভু, তারা আমার উম্মত।' তিনি বলবেন, 'আপনি জানেন না, তারা আপনার পরে (দ্বীনের মাঝে) কী উদ্ভাবন করেছে!'[৬] তখন আমি তাদের বলব, 'যারা আমার পরে আমার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে, তারা দূর হোক!'[৭] আরেকটি বর্ণনায়

১. বুখারি (৬৫৩৮)।
২. বুখারি (৬৫৯২)।
৩. মুসলিম (২২৯৬)।
৪. মুসলিম (২৩০০); সহিহ ইবনে হিব্বান (৬৪৫৫)।
৫. বুখারি (৬৫৭৯)।
৬. বুখারি (৬৫৭৬)।
৭. বুখারি (৬৫৩৮)।

এসেছে, 'আপনি জানেন না তারা আপনার পরে কী করেছে। তারা তাদের পিছনে ফিরে গেছে।'[১] মুসলিমের হাদিসে এসেছে, 'হাউজে আমার কাছে আমার উম্মতের এমন একটি দল আসবে, যাদের আমি সেখান থেকে সেভাবে তাড়াব, যেভাবে উটের মালিক অন্যের উটকে নিজের কুয়া থেকে তাড়িয়ে দেয়।' সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের চিনতে পারবেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ তোমাদের চিনতে পারব। তোমাদের এমন আলামত থাকবে যা অন্য কারও থাকবে না। ওজুর ফলে তোমাদের কপাল আলোকিত থাকবে।'[২]

ইবনে হিব্বানের একটি বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, কেবল মুরতাদ, গোমরাহ ও বিদআতি লোকেরাই নয়, জালেম শাসক, তাদের সহযোগী ও দরবারি আলেমরাও হাউজে কাউসার থেকে বঞ্চিত হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার পরে আমির-উমারাদের আগমন ঘটবে। তাদের মিথ্যাকে সত্য বলো না, তাদের জুলুমে সাহায্য করো না। কারণ, যে তাদের সত্যকে মিথ্যা বলবে, তাদের জুলুমে সাহায্য করবে, সে আমার হাউজের কাছে আসতে পারবে না।'[৩] অপর একটি বর্ণনায় এভাবে এসেছে, 'কারণ যে তাদের দরবারে যাবে, তাদের মিথ্যাকে সত্য বলবে, তাদের জুলুমে সাহায্য করবে, সে আমার কেউ নয় আমিও তার কেউ নই। সে আমার হাউজের কাছে আসতে পারবে না। আর যে তাদের কাছে যাবে না, তাদের মিথ্যাকে সত্য বলবে না, তাদের জুলুমে সাহায্য করবে না, সে আমার, আমিও তার। সে আমার হাউজে আসবে।'[৪]

হাউজের নাম: ইমাম তহাবি রাহি.-কেবল হাউজের কথা বলেছেন। হাদিসেও কেবল 'হাউজ' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। তাহলে 'হাউজে কাউসার' নাম এলো কোত্থেকে? কুরআনে উল্লিখিত কাউসার কি এই হাউজ নাকি ভিন্ন কোনো বস্তু?

বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। একদল আলিম দুটোকে এক বলেছেন। অন্য একদল আলিম দুটোকে আলাদা বলেছেন। এই মতভেদের কারণ হচ্ছে—এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহে স্পষ্ট বক্তব্য নেই; একদিক থেকে বোঝা যায় দুটো একই, অন্যদিক থেকে বোঝা যায় দুটো আলাদা।

---

১. বুখারি (৬৫৮৫)।
২. মুসলিম (২৪৭), (২৪৯)।
৩. সহিহ ইবনে হিব্বান (২৮৪)।
৪. সহিহ ইবনে হিব্বান (২৮৫)।

সহিহ মুসলিমে এসেছে, রাসুলুল্লাহর উপর যখন সুরা কাউসার অবতীর্ণ হলো, তখন তিনি সাহাবাদের বললেন, 'তোমরা কি জানো কাউসার কী?' তারা বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভালো জানেন।' তিনি বললেন, 'এটা একটা নদী। আল্লাহ তায়ালা আমাকে তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাতে কল্যাণ রয়েছে। এটা হাউজ, কিয়ামতের দিন আমার উম্মত এখানে আমার কাছে পান করার জন্য আসবে। এর পাত্রগুলো আকাশের তারকা পরিমাণ।....'[১] উক্ত হাদিসে দেখা যাচ্ছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউসারকে প্রথমে 'নদী' বলে আখ্যা দিলেও পরে এটাকেই 'হাউজ' বলে আখ্যা দেন। ফলে বোঝা যায়, হাউজ আর কাউসার আলাদা নয়; বরং নদী বলা হলেও হাউজটির নামই কাউসার।

কিন্তু কিছু কিছু হাদিসে বোঝা যায়, কাউসার এবং রাসুলুল্লাহর হাউজ আলাদা। যেমন আবু দাউদের বর্ণনায় উক্ত হাদিসটিই এভাবে এসেছে: فَإِنَّهُ نَهَرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّةِ ، وَعَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، عَلَيْهِ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ এখানে দেখা যাচ্ছে, কাউসারকে জান্নাতের নদী বলা হচ্ছে; অথচ হাউজ জান্নাতে নয়, বরং হাশরের মাঠে। অপরদিকে হাউজকে নদীর উপর বলা হচ্ছে।[২] এর মানে, হাউজটি জান্নাতের কাউসার নদী থেকে উৎসারিত। অন্য কিছু হাদিসও এটাকে শক্তিশালী করছে। যেমন আবু জর রাজি. থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, 'হাউজ জান্নাতের দুটো নালার সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে।'[৩] এতে বোঝা যাচ্ছে, হাউজটি জান্নাতের কাউসার নদী থেকেই উৎসারিত। অর্থাৎ একদিক থেকে দুটো ভিন্ন; একটি নদী, অপরটি হাউজ। আরেক দিক থেকে দুটো এক। কারণ, হাউজটি নদীরই শাখা। এ কারণে সম্ভবত এর নাম হয়েছে 'হাউজে কাউসার' তথা কাউসার নদী থেকে উৎসারিত হাউজ। আল্লাহ এর স্বরূপ ভালো জানেন।[৪]

---

১. মুসলিম (৪০০); একই রকম শব্দে এসেছে মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাতে (৩২৩১২)।
২. আবু দাউদ (৪৭৪৭)।
৩. মুসলিম (২৩০০); সহিহ ইবনে হিব্বান (৬৪৫৫)।
৪. দেখুন: গুনাইমি (৭৭-৭৮)।

وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي ادَّخَرَهَا لَهُمْ حَقٌّ، كَمَا رُوِيَ فِي الأَخْبَارِ.

শাফায়াত সত্য, যা তিনি মুমিনদের জন্য বরাদ্দ রেখেছেন, যেমনটা বিভিন্ন হাদিসে এসেছে।

ব্যাখ্যা

শাফায়াতের পরিচয় ও প্রকারভেদ: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আখিরাত সংশ্লিষ্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ আকিদা হচ্ছে শাফায়াত তথা সুপারিশ। আখিরাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপরাধীদের পক্ষে সুপারিশ করে তাদের উদ্ধার করার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে। এটাকেই বলা হয় 'শাফায়াত'। বিভ্রান্ত খারেজি ও মুতাজিলারা এটাকে অস্বীকার করে। তারা ব্যতীত আহলে সুন্নাতের সকল ধারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই শাফায়াতকে বিশ্বাস করে। ফলে এটা মুসলমানদের সর্বসম্মত আকিদা।[১]

মূলত শাফায়াত কেবল আখিরাত ও আল্লাহর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় নয়; এটি মানব সভ্যতার একটি শাশ্বত বৈশিষ্ট্য; একটি সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। সমাজে আল্লাহ তায়ালা সকল মানুষকে এক পর্যায়ে রাখেন না—কেউ ধনী কেউ দরিদ্র; কেউ সবল কেউ দুর্বল। সমাজে সবার সঙ্গে সবার সুসম্পর্ক কিংবা সবার উপর সবার প্রভাব থাকে না। কিন্তু কল্যাণকর সুপারিশ এই ভেদাভেদ ঘুচিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ তৈরি করতে পারে। কেউ ভালো একটা প্রতিষ্ঠানে পড়তে চাচ্ছে, সম্ভব হলে আপনি তার জন্য সুপারিশ করুন। কারও একটা চাকরি দরকার এবং আপনি জানেন সে ওই পদের যোগ্য, তবে আপনি তার জন্য দায়িত্বশীলদের কাছে সুপারিশ করুন। এভাবে প্রত্যেকে যখন প্রত্যেকের জায়গা থেকে ইতিবাচক কাজে সুপারিশ করবে, তখনই প্রকৃত অর্থে সামাজিক 'তাকাফুল' বাস্তবায়িত হবে এবং সমাজের প্রত্যেকটি সদস্যের পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হবে। এ কারণে ইসলাম সুপারিশের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

১. সালেহ ফাওজান (৭৭)।

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۚ

অর্থ: 'যে কল্যাণকর সুপারিশ করবে, তাতে তারও অংশ থাকবে।' [নিসা: ৮৫] হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা সুপারিশ করো, এর বিনিময় পাবে। সেটা কবুল হোক না হোক।'[১] সুতরাং সুপারিশ গৃহীত হওয়া আবশ্যক নয়; আপনার উচিত সম্ভব হলেই সুপারিশ করা।

কিন্তু বিপরীতে আরেক প্রকারের সুপারিশও রয়েছে, যাকে আমরা মন্দ সুপারিশ বলতে পারি। অন্যায় ও হারাম কাজে কাউকে উদ্বুদ্ধ বা সহায়তা করা, অন্যায় কাজে প্রস্তুত ব্যক্তির জন্য অন্যের কাছে সুপারিশ করা ইত্যাদি। এটা অবৈধ সুপারিশ। যেমন বিচারকের কাছে অপরাধীকে ছেড়ে দেওয়ার সুপারিশ করা। মানুষের অধিকার নষ্ট ও জুলুমের ক্ষেত্রে সুপারিশ করা। এক্ষেত্রে সুপারিশকারীও অন্যায়ের অংশীদার হিসেবে বিবেচিত হবে। ইসলামে এ ধরনের সুপারিশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ

অর্থ: 'আর যে মন্দ সুপারিশ করবে, সে তার দায়ভার বহন করবে।' [নিসা: ৮৫] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো অপরাধীকে আশ্রয় দেবে, তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।'[২]

কিন্তু আল্লাহর কাছে শাফায়াতের স্বরূপ সৃষ্টির কাছে সুপারিশের মতো নয়। সৃষ্টির কাছে যেখানে অন্যায়কারীকে মুক্তি দিয়ে দেওয়ার সুপারিশ করা যায় না, আল্লাহর কাছে অন্যায়কারীর মুক্তির জন্যই শাফায়াত করা হয়। যেমন: গুনাহে লিপ্ত মুমিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও হিদায়াতের দোয়া করা, মৃত গুনাহগারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। এমনকি গুনাহের কারণে জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেছে কিংবা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে তাকে ক্ষমা করে জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুপারিশ করা। ইসলামে এর প্রত্যেকটিই বৈধ। এর মাধ্যমে সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর অসীম ক্ষমাশীলতা ও অপরিমেয় দয়ার্দ্রতাই ফুটে ওঠে।

---

১. বুখারি (১৪৩২); মুসলিম (২৬২৭)।
২. বুখারি (১৮৭০); মুসলিম (১৩৭০)।

তবে আখিরাতে আল্লাহর কাছে শাফায়াতের জন্য **দুটি শর্ত** রয়েছে: **এক**. আল্লাহর অনুমতি পাওয়া। কারণ, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ তার কাছে শাফায়াতের দুঃসাহস করতে পারবে না। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলছেন,

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ

অর্থ: 'কে আছে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করবে?' [বাকারা: ২৫৫] কারণ, আল্লাহ চাইলে শাফায়াত ছাড়াও কাউকে ক্ষমা করে দিতে পারেন; আবার না চাইলে শাফায়াতের পরেও ক্ষমা না করতে পারেন। তিনি সবকিছুর মালিক। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন। **দুই**. যার জন্য শাফায়াত করা হবে, সে মুমিন হতে হবে। কারণ, কোনো কাফেরের জন্য শাফায়াত বৈধ নয়। জগতের সকল মানুষ ও জিন মিলেও কোনো কাফেরের জন্য শাফায়াত করলে আল্লাহ তায়ালা সেটা কবুল করবেন না। কারণ, তারা পৃথিবীতে আল্লাহকে অস্বীকার করেছে। ফলে আল্লাহ তায়ালা কাফেরের প্রতি সন্তুষ্ট নন। আর কুরআনে এসেছে, আল্লাহ যার প্রতি রাজি নন, তার জন্য শাফায়াত করার সুযোগ নেই। আল্লাহ বলেন,

وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى

অর্থ: 'তারা কেবল তার জন্যই সুপারিশ করবে, আল্লাহ যার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবেন।' [আম্বিয়া: ২৮] অন্যত্র বলেন,

لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى

অর্থ: 'তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, তবে আল্লাহ যার জন্য চান এবং যার ব্যাপারে তিনি রাজি হন।' [নাজম: ২৬]

কিয়ামতে রাসুলুল্লাহর শাফায়াত: শাফায়াতের অনেকগুলো প্রকার রয়েছে। কিছু শাফায়াত সকল নবি-রাসুল, ফেরেশতা ও সৎকর্মশীল মুমিন সবার জন্য। আর কিছু শাফায়াত একমাত্র রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্ধারিত। আমরা প্রথমে রাসুলুল্লাহর জন্য নির্ধারিত শাফায়াতগুলো নিয়ে আলোচনা করব, এরপর সবার জন্য উন্মুক্ত শাফায়াত উল্লেখ করব।[১]

এক. আহলুল মাওকিফ তথা হাশরের ময়দানে চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য অপেক্ষমাণ মানুষের উদ্ধারের শাফায়াত। যখন হাশরের মাঠে মানুষের অবস্থান

---

১. ইবনে আবিল ইজ (২০২-২০৬); গুনাইমি (৭৯-৮১); সালেহ ফাওজান (৭৯-৮০)।

অত্যন্ত দীর্ঘ হতে থাকবে, ভিড় বাড়তে থাকবে, সূর্য মাথার কাছাকাছি চলে আসবে, বিপদ ও উৎকণ্ঠায় মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে, তখন সকল মানুষ চাইবে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাক; কিন্তু সেটা বাস্তবায়িত করার পথ কী? যেকোনো নবির মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সেটা প্রার্থনা করা। এ জন্য সবাই আদম আলাইহিস সালামের কাছে গিয়ে আল্লাহর দরবারে শাফায়াত প্রার্থনা করবে; কিন্তু তিনি অপারগতা পেশ করবেন। অতঃপর তারা নুহ আলাইহিস সালামের কাছে যাবে। তিনিও অপারগতা পেশ করবেন। এরপর যাবে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কাছে। তিনিও রাজি হবেন না। এরপর যাবে মুসা আলাইহিস সালামের কাছে। তিনিও নিজের অক্ষমতার কথা বলবেন। এরপর যাবে ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে। ঈসাও নিজের অক্ষমতা পেশ করবেন। সবশেষে তারা যাবে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। তিনি সম্মত হয়ে বলবেন, 'হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত।' তখন তিনি আল্লাহর কাছে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে দোয়া ও কান্নাকাটি করতে থাকবেন। একপর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা বলবেন, 'আপনার মাথা উত্তোলন করুন। আপনি চান, দেওয়া হবে। আপনি সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।' তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে সৃষ্টির ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা দেওয়ার সুপারিশ করবেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করে চূড়ান্ত ফয়সালা শুরু করবেন।[১]

এটা হলো 'শাফায়াতে উজমা' তথা সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ শাফায়াত। কারণ, এটা একদিকে একমাত্র রাসুলুল্লাহর জন্য নির্ধারিত। জগতের বড় বড় নবি-রাসুলও এটা করতে পারবেন না। ফলে এর মাধ্যমে একদিকে যেমন রাসুলুল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়, অপরদিকে শুধু তাঁর উম্মত নয়, গোটা সৃষ্টির প্রতি তাঁর অনুগ্রহ ও দরদ প্রকাশ পায়। এই মর্যাদা গোটা সৃষ্টির মাঝে কেবল রাসুলুল্লাহরই। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এটাকে 'মাকামে মাহমুদ' তথা প্রশংসনীয় স্থান হিসেবে অভিহিত করে তা রাসুলুল্লাহকে দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا.

অর্থ: 'রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ পড়ুন। এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত শ্রেষ্ঠত্ব। আশা করা যায়, আপনার পালনকর্তা আপনাকে 'মাকামে মাহমুদে' পৌঁছাবেন।[২] [ইসরা: ৭৯]

---

১. বুখারি (৪৭১২); মুসলিম (১৯৪); তিরমিজি (২৪৩৪)।
২. গুনাইমি (৭৯)।

দুই. জান্নাতের ফয়সালাপ্রাপ্ত লোকদের জন্য জান্নাতে প্রবেশের শাফায়াত। তিনিই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তাঁর উম্মতই সর্বপ্রথম উম্মত হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তিন. জান্নাতবাসীর জন্য জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধির শাফায়াত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল জান্নাতির মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য শাফায়াত করবেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর শাফায়াত কবুল করে সেসব লোকের মর্যাদা বুলন্দ করবেন।

চার. নিজ চাচা আবু তালিবের জন্য শাফায়াত। এটা একটা বিশেষ শাফায়াত, যা একমাত্র রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কাউকে দেওয়া হবে না। আবু তালিবও একমাত্র মানুষ, যিনি অমুসলিম থাকা সত্ত্বেও তার ব্যাপারে শাফায়াতের অনুমতি দেওয়া হবে এবং সে শাফায়াত কবুল করা হবে। তবে তিনি অমুসলিম হওয়াতে চিরস্থায়ী জাহান্নাম তার জন্য অনিবার্য। ফলে রাসুলের শাফায়াত তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতের জন্য নয়, বরং তার শাস্তি লঘু করার জন্য। কারণ তিনি রাসুলুল্লাহর প্রিয় চাচা, অভিভাবক। তিনিই রাসুলুল্লাহকে মাতা সাইয়িদা আমিনা ও দাদা আবদুল মুত্তালিবের ইন্তিকালের পরে বড় করেছেন। যতদিন বেঁচে ছিলেন, রাসুলের সুরক্ষা-প্রাচীর হয়ে ছিলেন। আবু তালিবের কারণে কেউ রাসুলুল্লাহর দিকে হাত প্রসারিত করতে পারত না। তার মৃত্যুর পরেই কাফেররা রাসুলুল্লাহকে কষ্ট দেওয়ার সুযোগ পায়। এই বিশাল ভালোবাসা ও অনুগ্রহের বিনিময়স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা তার শাস্তি লঘু করে দেবেন। ফলে জাহান্নামিদের মাঝে আবু তালিবের শাস্তি হবে সবচেয়ে কম, তথাপি তার কাছে মনে হবে সবার চেয়ে বেশি।[১]

গুনাহগার মুমিনদের জন্য শাফায়াত: উপরে বর্ণিত শাফায়াতগুলো কেবল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্ধারিত। এর বাইরে আরেকটি শাফায়াত রয়েছে, যা রাসুলুল্লাহর পাশাপাশি সবার জন্য উন্মুক্ত। সেটা হলো, গুনাহগার মুমিনদের জন্য শাফায়াত। যাদের গুনাহের কারণে জাহান্নামের ফয়সালা হয়ে গেছে, তাদের জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি কিংবা যাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়ে গেছে, তাদের সেখান থেকে বের করার জন্য এই শাফায়াত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা শাফায়াতের মাধ্যমে একদল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন।[২] রাসুলুল্লাহর পাশাপাশি প্রত্যেক মুমিনের জন্য প্রত্যেক

১. মুসলিম (২১১, ২১৩)।
২. মুসলিম (১৯১); মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদ (৯০৫); সুনানে কুবরা, বাইহাকি (২০৮৩৫)।

মুমিন এই শাফায়াত করতে পারবে। ফলে ফেরেশতা, নবি-রাসুল, ওলি-আউলিয়া, বালেগ হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণকারী ছোট ছোট শিশু সবাই তাদের প্রিয় ও পরিচিতজনদের জন্য এই শাফায়াত করতে পারবে।[১] এটা আহলে সুন্নাতের সকল ধারার আকিদা। কিন্তু খারেজি, মুতাজিলা এবং সমকালীন ইবাজিয়্যাহ সম্প্রদায় ও তাদের দ্বারা প্রভাবিত অনেকে এক্ষেত্রে বিভ্রান্তির শিকার। তারা এই শাফায়াতকে অস্বীকার করে.[২]। আকীদাহ ত্বহাবিয়্যার সমকালীন একজন ব্যাখ্যাতা হাসান সাক্কাফ এ ধরনের শাফায়াতকে অস্বীকার করেন এবং এটাকে ইহুদিদের আকিদা মনে করেন।[৩]

এগুলো দ্বীনের অপব্যাখ্যা। কারণ তাদের মতাদর্শে, কবিরা গুনাহকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামি। ফলে কেউ যদি কবিরা গুনাহ করে, তবে সে ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যাবে, আর পরকালে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে। কিন্তু এটা ভুল আকিদা। কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক। কেউ ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে যত গুনাহই থাকুক, একদিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জাবের রাজি. থেকে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট হাদিস বর্ণিত আছে, 'আমার শাফায়াত আমার উম্মতের মাঝে কবিরা গুনাহকারীদের জন্য।'[৪] এ কারণে ইমাম ইবনে আবদুল বার লিখেন, 'এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসগুলো মুতাওয়াতির। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সকলে এগুলো সত্যায়ন করেন। কেবল বিদআতিরা অস্বীকার করে।'[৫]

রাসুলের শাফায়াত কীভাবে পাওয়া যাবে? কিয়ামতের দিন রাসুলের শাফায়াতে ধন্য হওয়া বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। এই শাফায়াত নসিব হলে জান্নাতে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, বিনা হিসাবে জান্নাত পাওয়া যাবে, জাহান্নামের ফয়সালা হয়ে যাওয়ার পরেও জান্নাতে যাওয়া যাবে। এমনকি জাহান্নামে প্রবেশ করে থাকলেও (নাউজুবিল্লাহ) এই শাফায়াতের উসিলায় আল্লাহ বের করে আনবেন।[৬] প্রশ্ন হলো, রাসুলুল্লাহর শাফায়াত কীভাবে পাওয়া যাবে?

আমাদের সৌভাগ্য যে, আল্লাহর রাসুল তাঁর শাফায়াত পাওয়ার জন্য অনেকগুলো পথ বাতলে দিয়েছেন; বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আমলের বিনিময়ে শাফায়াত

---

১. মুসলিম (১৮৩); মুসনাদে আহমদ (১২০৭৯); তয়ালিসি (২২৯৩)।
২. ইবনে আবিল ইজ (২০৬)।
৩. দেখুন: হাসান সাক্কাফ (৫৭৮)।
৪. সহিহ ইবনে হিব্বান (৬৪৬৭); আবু দাউদ (৪৭৩৯); তিরমিজি (২৪৩৫)।
৫. আত-তামহিদ, ইবনে আবদুল বার (১৯/৬৯)।
৬. মুসনাদে আহমদ (২৩২১৪)।

প্রাপ্তির সুসংবাদ দিয়েছেন। ফলে সামান্য আন্তরিকতা থাকলেও কিয়ামতের দিন আল্লাহ চাইলে তাঁর শাফায়াত পাওয়া সহজ। শাফায়াতপ্রাপ্তির কিছু পথ ও পদ্ধতি:

এক. তাওহিদের উপর মৃত্যুবরণ করা। আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক না করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে হৃদয়ের গভীর থেকে বলবে 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই', সে কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াতের সৌভাগ্য লাভ করবে।[১]

দুই. আজানের পরে দোয়া পাঠ করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আজানের পরে এই দোয়া পাঠ করবে: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ তার জন্য আমার শাফায়াত অবধারিত হয়ে যাবে।[২]

তিন. মদিনায় সবর করে বসবাস করা এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মদিনার কষ্ট এবং প্রতিকূলতা সহ্য করে এখানে বসবাস করবে এবং মৃত্যুবরণ করবে আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য শাফায়াতকারী হব।'[৩] আরেকটি হাদিসে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মদিনাতে মৃত্যুবরণ করতে সক্ষম, সে যেন এখানে মৃত্যুবরণ করে। কারণ, এখানে যে মৃত্যুবরণ করবে, আমি তার জন্য সুপারিশ করব।'[৪]

আগের দিনে মদিনাতে বসবাস করা কষ্টকর ছিল, কিন্তু যে-কেউ চাইলে সেটা সম্ভব ছিল। এখন মদিনায় বসবাস করা কষ্টকর নয়, কিন্তু চাইলেই সেটা সম্ভব হয় না। তবে বসবাস সম্ভব না হলেও মৃত্যু সম্ভব, আল্লাহ যদি সে সৌভাগ্য কপালে লিখে রাখেন। এ জন্য আমাদের অনেক শাইখ মদিনায় মৃত্যুবরণ করতে চাইতেন। এটা সম্ভব না হলেও প্রথম দুটি সবার জন্যই সম্ভব।

---

১. বুখারি (৯৯, ৬৫৭০); বাজ্জার (৮৪৬৯)।
২. বুখারি (৬১৪); আবু দাউদ (৫২৯); ইবনে খুজাইমা (৪২০)।
৩. মুসলিম (১৩৭৪, ১৩৭৮); তিরমিজি (৩৯২৪)।
৪. তিরমিজি (৩৯১৭); ইবনে মাজা (৩১১২); মুসনাদে আহমদ (৫৫৩৮)।

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-সম্পর্কিত আকিদার ক্ষেত্রে একাধিক সম্প্রদায় প্রান্তিকতার শিকার হয়েছে। কিছু সম্প্রদায় তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ তাঁকে যে মাকাম দান করেছেন তার চেয়েও উর্ধ্বে উঠিয়ে ফেলেছে। অথচ তিনি বলে গিয়েছেন, 'হে লোকসকল, তোমাদের শয়তান যেন ধোঁকায় না ফেলে। আমি আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মাদ। আল্লাহর শপথ! আমি চাই না যে, আল্লাহ আমাকে যতটুকু উঁচু মর্যাদা দিয়েছেন, তোমরা আমাকে তারচেয়ে উপরে ওঠাবে!'[1] আর কিছু সম্প্রদায় তাঁর মর্যাদা খাটো করেছে। তাঁর শেষ নবি হওয়া অস্বীকার করেছে। নিজেরা নবি দাবি করেছে। আহলে সুন্নাতের অবস্থান উভয় প্রান্তিকতার মাঝামাঝি। তারা আল্লাহর রাসুলের সম্মানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে না। আবার তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কিংবা তাঁর জন্য শোভনীয় নয় এমন কিছু বলে না কিংবা করে না।

তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু মাসআলাকে কেন্দ্র করে স্বয়ং আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন ধারা মতভেদের শিকার হয়েছে। কেবল মতভেদ নয়; বরং বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়েছে। সেসব মাসআলার মাঝে উল্লেখযোগ্য তিনটি মাসআলা হচ্ছে: **তাওয়াসসুল**, **ইস্তিগাসা** এবং **তাবাররুক**। আসলেই এসব মাসআলা আহলে সুন্নাতের বিভেদের কারণ হতে পারে কি না কিংবা এগুলোকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মাঝে এতটা অন্তর্দ্বন্দ্ব হতে পারে কি না, সেই বিষয়টি আমরা এখানে দেখব, ইনশাআল্লাহ।

এক. কারও উসিলা দিয়ে দোয়া করা (তাওয়াসসুল): রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা কারও উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করার বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। সালাফ ও খালাফের একদল আলিম এটাকে জায়েজ মনে করেন না। সুতরাং কেউ যদি বলে, 'হে আল্লাহ, অমুকের কারণে (بحق فلان) আমাদেকে ক্ষমা করে দিন', তবে এটা বৈধ হবে না। তাদের মতে, কারণ এটা আল্লাহর উপর অন্যের নাম দিয়ে শপথ করা হচ্ছে এবং তাঁর উপর হক দাবি করা হচ্ছে। অথচ আল্লাহর উপর কারও হক নেই। যত বড় ফেরেশতা বা নবি-রাসুল হোন, সবাই তাঁর দাস ও অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল।

---

১. সুনানে কুবরা, নাসায়ি (১০০০৬); মুসনাদে আহমদ (১২৭৪৬)।

একইভাবে কেউ যদি নবি-রাসুলদের উসিলায় দোয়া করে এই চিন্তা করে যে, নবি-রাসুলগণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা, তাই তাদের সম্মানে দোয়া কবুল হওয়ার আশা করা যায়, যেমন বলে, 'হে আল্লাহ, অমুক নবির/ওলির উসিলায়/সম্মানে/ বরকতে'... তবুও এমন দোয়া নিষিদ্ধ বিদআত। কারণ, সাহাবাগণ এমন দোয়া করেননি। অথচ তারা রাসুলুল্লাহর সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত ছিলেন, তাঁকে পৃথিবীর সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। হাদিসে বনি ইসরাইলের তিন ব্যক্তির গুহায় আটকে পড়া এবং নেক আমলের উসিলা ধরে দোয়া করার মাধ্যমে নাজাত পাওয়াও প্রমাণ করে, আমলের উসিলায় দোয়া করা যায়, ব্যক্তির উসিলায় নয়।[১] তা ছাড়া—তাদের মতে—আল্লাহর রাসুল কিংবা সাহাবারা এভাবে দোয়া করতেন না। বরং তারা আল্লাহর নাম নিয়ে দোয়া করতেন, যেভাবে কুরআন-সুন্নাহ আমাদের শিখিয়েছে। কুরআনে এসেছে, وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا। 'আর আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম, তোমরা সেসব নামে তাকে ডাকো।' [আরাফ: ১৮০]

হানাফি মাজহাবের মুতাকাদ্দিম ইমামদের থেকেও এ ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়্যাহ ও দুররে মুখতার-সহ বিভিন্ন গ্রন্থে ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রাহি.-এর বরাতে বলা হয়েছে, আল্লাহর সত্তা, তাঁর নাম ও গুণাবলি ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে তাঁর কাছে দোয়া করা উচিত নয়। ...'দোয়ার মাঝে আপনার নবি/রাসুল/ওলির হকের উসিলায়' বলা মাকরুহ। কারণ, আল্লাহর উপর কারও হক তথা অধিকার নেই।[২] ইমাম আলাউদ্দিন কাসানি (৫৮৭ হি.) লিখেন, 'হে আল্লাহ, আপনার নবি-রাসুল কিংবা অন্য কারও হকের উসিলায়' দোয়া করা মাকরুহ।[৩] ইমাম জাইলায়ি রাহি. একই কথা লিখেছেন। সঙ্গে কাবা ঘরের হকের উসিলা দেওয়াকেও যুক্ত করেছেন।[৪] ইবনুল হুমাম রাহি. থেকেও একই বক্তব্য পাওয়া যায়।[৫] হানাফি মাজহাবের বাইরে আল্লামা মুনাভি, ইজ ইবনে আবদুস সালাম থেকে জায়েজ হওয়ার যেসব বক্তব্য পাওয়া যায়, সেটাও কেবল রাসুলুল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত। অন্যদের উসিলা দিয়ে দোয়া করা তাদের মতেও জায়েজ নেই।[৬]

---

১. ইবনে আবিল ইজ (২১২-২১৪); আত-তাওয়াসসুল, আলবানি (৪২)।
২. রদ্দুল মুহতার, ইবনে আবিদিন (৬/৩৯৬/৩৯৭)।
৩. বাদায়েউস সানায়ে, কাসানি (৫/১২৬)।
৪. তাবয়িনুল হাকায়িক শরহে কানজিদ দাকায়িক, জাইলায়ি (৬/৩১)।
৫. ফাতহুল কাদির, ইবনুল হুমাম (১০/৬৪)।
৬. রদ্দুল মুহতার, ইবনে আবিদীন (৬/ ৩৯৭)।

কিন্তু এটার উপর উম্মাহর আমল নয়। ফলে মুতাআখখিরিন হানাফি এবং মুতাকাদ্দিমিন শাফেয়ি, হাম্বলি ও মালেকি মাজহাব-সহ উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম নবি ও রাসুলদের হক/সম্মানের উসিলা দিয়ে দোয়া করা জায়েজ মনে করেন। তকিউদ্দিন সুবকি এটাকে জায়েজ বলে লিখেন, এটা জায়েজ ও ভালো কাজ হওয়া স্পষ্ট।[১] হাম্বলি ফকিহ বাহুতি লিখেন, নেককার বান্দাদের উসিলা দিয়ে দোয়া করতে সমস্যা নেই। **ইমাম আহমদ রাহি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি নবিজির উসিলা দিয়ে দোয়া করা বৈধ বলেছেন**।[২] ইমাম মালেক রাহি.-কে যখন মসজিদে নববিতে খলিফা আবু জাফর জিজ্ঞাসা করল, 'কিবলামুখী হয়ে দোয়া করব, নাকি রাসুলুল্লাহর দিকে মুখ করে?' তিনি বললেন, **'কেন আপনি তাঁর কাছ থেকে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেবেন, অথচ তিনি কিয়ামতের দিন আপনার ও আপনার পিতা আদমের উসিলা? বরং তাঁর দিকে মুখ করুন, তাঁর কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করুন, আল্লাহ তাঁর শাফায়াত গ্রহণ করবেন।'**[৩] ইমাম সাবি মালেকি আশ-শরহুস সগির-এর ব্যাখ্যায় লিখেন, 'এরপর রওজার সামনে এসে সালাম পেশ করবে, নিজের সকল প্রার্থনায় তাঁর উসিলা গ্রহণ করবে।[৪] ইবনে আবিদিন রাহি. আদ-দুররুল মুখতারের মূল ভূমিকার শেষে ব্যাখ্যায় লিখেন, 'আল্লাহর নবি এবং আল্লাহর কাছে সম্মানিত প্রত্যেক পুণ্যবানের উসিলা দিয়ে দোয়া করছি'...।[৫] আল্লামা ইসহাক দেহলভি, হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি, রশিদ আহমদ গঙ্গুহি, আশরাফ আলি থানভি, খলিল আহমদ সাহারানপুরি, জফর আহমদ উসমানি, মাহমুদ হাসান গঙ্গুহি-সহ আকাবিরে দেওবন্দের সকল বিজ্ঞ ইমামের মতে, জীবিত কিংবা মৃত যে-কারও উসিলা দিয়ে দোয়া করা বৈধ।[৬] আল্লামা শাওকানিও এ ধরনের দোয়াকে জায়েজ বলেছেন।[৭]

তাওয়াসসুল জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে অনেক জাল হাদিস থাকলেও বেশ কিছু বিশুদ্ধ হাদিসও রয়েছে। একটি হাদিস হচ্ছে অন্ধ সাহাবির দোয়া, اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে চাচ্ছি, আপনার

১. শিফাউস সিকাম, সুবকি (১৬০)।
২. কাশশাফুল কিন্না, বাহুতি (২/৭৩)।
৩. শিফা, কাজি ইয়াজ (২/৪১)।
৪. হাশিয়াতুস সাবি আলাশ শারহিস সাগির (১/২৮৪)।
৫. রদ্দুল মুহতার (১৭৮)।
৬. আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ, সাহারানপুরি (৫০); ইমদাদুল ফাতাওয়া (৫/৪১১, ৫/১০১); ইমদাদুল আহকাম (১/১৩৩-১৩৪); ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া (১/৫৮০-৫৮১)।
৭. তুহফাতুজ জাকিরিন, শাওকানি (৬০)।

নবি রহমতের নবির মাধ্যমে আপনার অভিমুখী হয়েছি'...[১] এখানে স্পষ্ট যে, উক্ত সাহাবি আল্লাহর রাসুলের উসিলা দিয়ে দোয়া করেছেন।[২] একইভাবে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে প্রার্থনাকারীদের হকের উসিলায়, আমার (মসজিদের দিকে) হাঁটার উসিলায়, আপনার কাছে প্রার্থনা করছি...।'[৩] একইভাবে আলি রাজি.-এর মাতা ফাতিমা বিনতে আসাদ রাজি.-এর জন্য রাসুলুল্লাহর দোয়া: اللهُ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اغْفِرْ لِأُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ، وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ এখানেও স্বয়ং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের ও অন্য নবিদের উসিলায় দোয়া করছেন। অন্য নবিগণ কিন্তু দুনিয়ার হিসেবে মৃত। ফলে এর মাধ্যমে মৃতদের নামে উসিলা দিয়ে দোয়া করাও প্রমাণিত।[৪] তা ছাড়া উমর রাজি. কর্তৃক আব্বাস রাজি.-এর উসিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করাও এটা জায়েজ হওয়ার প্রমাণ।[৫] এই হাদিসগুলো বিভিন্ন মানের। তাই সবগুলোকে পাইকারি হারে জাল ও ভিত্তিহীন বলার সুযোগ নেই, যেমনটা প্রথম দলের অনেক আলিম দাবি করেছেন।[৬]

প্রথম দলের যুক্তির জবাবে তারা বলেন, নবি-রাসুল এবং ওলিগণ আল্লাহর কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ও মহব্বতের পাত্র। আর স্বাভাবিকভাবেই কারও কাছে কারও ভালোবাসার মানুষের নাম নিয়ে প্রার্থনা করা যায়। সে হিসেবে এমন দোয়া অবৈধ নয়। তাদের মতে, এখানে হক বলতে আল্লাহর উপর তাদের অধিকার উদ্দেশ্য নয়; বরং

---

১. তিরমিজি (৩৫৭৮); মুসনাদে আহমদ (১৭৫১৩); মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদ (৩৭৯); আরও দেখুন: আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (৮৩১১)।

২. কিন্তু প্রথম দলের আলিমগণ এই সুস্পষ্ট হাদিসটিকে এমন লম্বা ব্যাখ্যার মারপ্যাঁচে ফেলেন, যাকে অপব্যাখ্যা বললে অত্যুক্তি হবে না। তাদের দাবি, এর মাধ্যমে নবির উসিলা নয়; নবির দোয়ার উসিলার বৈধতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট তাকাল্লুফ। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে হাদিসটিতে তাকালে ব্যক্তির উসিলা দিয়ে দোয়ার বৈধতা সুস্পষ্ট।

৩. সুনানে ইবনে মাজা (৭৭৮); মুসনাদে আহমদ (১১৩২৫)।

৪. তাবারানি, আল-মুজামুল কাবির (৮৭১); আল-মুজামুল আওসাত (১৮৯)।

৫. বুখারি (১০১০); সুনানে বাইহাকি কুবরা (৬৫২০)। তাওয়াসসুলকে যারা বিদআহ মনে করেন, তারাও এই হাদিস দিয়ে দলিল দেন। তারা বলেন, উমর রাজি. রাসুলুল্লাহর উসিলা না দিয়ে আব্বাস রাজি.-এর উসিলা দিয়েছেন। বোঝা গেলে, মৃত ব্যক্তির উসিলা দেওয়া জায়েজ নেই। কিন্তু এটা তাদের দলিল নয়। কারণ, আব্বাস রাজি.-এর উসিলা দিয়ে দোয়া করার মূল কারণ তিনি রাসুলুল্লাহর চাচা। আর তাদের দোয়া ছিল বৃষ্টির ব্যাপারে। যেহেতু রাসুলুল্লাহর বৃষ্টির প্রয়োজন নেই, বরং আব্বাস রাজি.-এর বৃষ্টির প্রয়োজন, তাই রাসুলুল্লাহর উসিলা না দিয়ে তাঁর চাচার উসিলা দিয়েছেন।

৬. মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া (১/২৮৭)।

আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা অধিকার দিয়েছেন সেটা কিংবা কেবল সম্মান ও মর্যাদা বোঝানো উদ্দেশ্য। আর এ কারণেই এটা মুতাকাদ্দিমিন হানাফি ইমামগণ থেকে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না। ফলে উম্মাহর সর্বসম্মত বৈধ আমল গণ্য হবে।

আমরা গভীর দৃষ্টি বোলালে দেখব, উভয় পক্ষের বক্তব্যের মাঝে সমন্বয় বিধান সম্ভব। অর্থাৎ যারা এমন দোয়াকে অবৈধ বলেন, তারাও কিছু কিছু সুরতকে বৈধ বলেন; অপরদিকে যারা বৈধ বলেন, তারা মূলত এগুলোই উদ্দেশ্য নেন, ফলে উভয়ের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। আরেকটু খুলে বলা যাক! প্রথম দলের মতে, কারও সত্তার উসিলা দিয়ে দোয়া করা বৈধ হবে না; কিন্তু কারও অনুসরণ ও মহব্বতের উসিলা দিয়ে দোয়া করা বৈধ (অর্থাৎ এটা নেক আমলের উসিলায় দোয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে)। ইবনে তাইমিয়া লিখেন, 'নবি-রাসুল ও পুণ্যবানদের আল্লাহর কাছে বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। কিন্তু তাদের এই মর্যাদাই কারও দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে কার্যকর কারণ নয়। হ্যাঁ, যদি কেউ তাদের অনুসরণ করে, তাদের মহব্বত করে, কিংবা তারা কারও জন্য দোয়া করেন, কারও জন্য সুপারিশ করেন, সেটা তাকে উপকার করবে। কিন্তু এগুলোর পরিবর্তে কেবল তাদের নাম ও সম্মানের উসিলা দিয়ে দোয়া করার অর্থ হলো, এমন বস্তুর মাধ্যমে দোয়া করা যা তার নয়!'[১]

এটা কেবল আখিরাতের বিষয়ে নয়, দুনিয়ার বিষয়েও সম্ভব। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক! প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে তাঁর ছেলে অত্যন্ত প্রিয় ও মূল্যবান। এখন আপনি কোনো ব্যক্তির ছেলের কাছের বন্ধু ও ভালোবাসার মানুষ হলে যদি সেই ছেলের বাবার কাছে তার উসিলা দিয়ে কোনোকিছু প্রার্থন করেন, তবে তা গৃহীত হওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা আছে। কারণ, তিনি জানেন আপনি তার ছেলের বন্ধু ও ভালোবাসার মানুষ। কিন্তু যদি এমন হয়, আপনি তার ছেলের কেউ নন, তার সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই; আপনি কেবল তাকে চেনেন, এর পর তার নামে তার পিতার কাছে কিছু প্রার্থনা করেন, সেটা গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা আছে? না, নেই। কারণ, সেটা গৃহীত হওয়ার মতো কোনো কাজ আপনি করেননি। বরং উলটো ধমক খাওয়ারও আশঙ্কা আছে। তিনি আপনাকে প্রশ্ন করতে পারেন, আমার ছেলের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী? তার নাম ভাঙিয়ে খাওয়ার অভিযোগেও অভিযুক্ত হতে পারেন।

---

১. মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া (১/২১১-২১২)।

ফলে দেখা যাচ্ছে, যারা এমন দোয়াকে অবৈধ বলছেন, তারা কেবল সত্তা বোঝাচ্ছেন, নতুবা নবিদের অনুসরণের (নেক আমল) উসিলা দিয়ে দোয়া করাকে তারাও বৈধ বলেন। অপরদিকে যারা নবিদের উসিলা দিয়ে দোয়া করাকে বৈধ বলেন, আমরা দেখব, তারাও মূলত এই অনুসরণ ও মহব্বতের ভিত্তিতেই দোয়া করেন। কেউ আল্লাহকে, তাঁর নবি-রাসুলকে ভালোবাসে, তাদের প্রতি সুধারণা রাখে বিধায়ই তাদের নামের উসিলা দিয়ে দোয়া করে। বাহ্যত তাদের নামের উসিলা হলেও প্রকৃত অর্থে এটা তাদের ভালোবাসার উসিলা। নতুবা চেনা নেই, জানা নেই, মহব্বত নেই, ইত্তিবা নেই এমন মানুষের উসিলা দিয়ে দোয়া করা অযৌক্তিক। তখন সেটা দোয়ার পরিবর্তে অনধিকার চর্চা ও উপহাসে পরিণত হয়। ফলে মুসলমানদের কেউ যদি নবিজির উসিলা দিয়ে দোয়া করে, স্পষ্ট যে, সে নবির মহব্বত ও ইত্তিবার ভিত্তিতেই দোয়া করছে। ফলে উভয় বক্তব্যের মাঝে আর বৈপরীত্য থাকল না এবং অবৈধ বলার সুযোগ থাকল না।

সমকালীন কিছু আলিম ব্যাপারটি নিয়ে অতিরঞ্জন করছেন এবং এটাকে শিরকের পথ আখ্যায়িত করে নিকৃষ্টতম বিদআত বলছেন। অথচ এটা সুস্পষ্ট বাড়াবাড়ি। উভয় পক্ষেরই দলিল রয়েছে। ফলে একটার চেয়ে আরেকটাকে উত্তম বলা যায়; কিন্তু বিদআত বলা একেবারেই পরিত্যাজ্য। বরং স্বয়ং ইবনে তাইমিয়া এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন।[১] শাইখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব বলেন, (তাওয়াসসুল) বিষয়টি মতভেদপূর্ণ এবং এমন মতভেদ বৈধ। যদিও আমাদের কাছে এটা মাকরুহ, তথাপি যে এটা করবে, আমরা তাকে বাধা দিই না।'[২]

তাম্বিহ: শেষে একটা জরুরি বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে। এই ধরনের দোয়া বৈধ ধরা হলেও আমাদের কর্তব্য হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর কাছাকাছি থাকা। কুরআন আমাদের হিদায়াতের উৎস, সকল কল্যাণ ও আলোর আধার। নবিগণ আমাদের আদর্শ। কুরআনে আমরা যদি নবিদের দোয়াগুলো দেখি, দেখব, তারা কেবল আল্লাহর নামে দোয়া করতেন। দোয়া যেহেতু একটি ইবাদত, এটা কেবল আল্লাহর জন্যই হওয়া উচিত। আল্লাহ তায়ালা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দোয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন এভাবে:

---

১. মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া (১/২৮৫)।
২. ফাতাওয়া ওয়া মাসাইল, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব (৬৮)।

وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ.

অর্থ: 'আপনি বলুন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে ক্ষমা করে দিন, অনুগ্রহ করুন। আপনি সর্বোত্তম অনুগ্রহকারী।' [মুমিনুন: ১১৮] জাকারিয়া আলাইহিস সালামের দোয়া সম্পর্কে কুরআন আমাদের বলছে,

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ.

অর্থ: 'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে নিঃসন্তান রাখবেন না। নিশ্চয়ই আপনি সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী।' [আম্বিয়া: ৮৯] মুসা আলাইহিস সালামের দোয়া সম্পর্কে কুরআন বলছে,

اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ.

অর্থ: 'আপনি আমাদের অভিভাবক, তাই আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের রহম করুন। আপনি সর্বোত্তম ক্ষমাকারী।' [আরাফ: ১৫৫] শুআইব আলাইহিস সালামের দোয়া ছিল এমন,

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ.

অর্থ: 'হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মাঝে ফয়সালা করে দিন। আপনিই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।' [আরাফ: ৮৯] ঈসা আলাইহিস সালামের দোয়া এসেছে কুরআনে এভাবে,

وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ.

অর্থ: 'আপনি আমাদের রিজিক দান করুন। আপনিই সর্বোত্তম রিজিকদাতা।' [মায়িদা: ১১৪] উপরের সবগুলো কুরআনি দোয়াতে শুধু আল্লাহ তায়ালার বিভিন্ন নাম ও গুণের উসিলা দিয়ে দোয়া করা হয়েছে। ফলে এটাই দোয়ার ক্ষেত্রে নবি-রাসুলের সুন্নাত।

মোট কথা, কারও উসিলা দিয়ে দোয়া বিশেষ বিশেষ সুরতে করা গেলেও স্বাভাবিক অবস্থায় আল্লাহর নাম নিয়েই দোয়া করা চাই। বিশেষ অবস্থা যেমন: রাসুলুল্লাহর প্রতি বিশেষ কোনো মহব্বতের প্রকাশকালে কিংবা তাঁর কবর জিয়ারতের সময় রওজার সামনে দাঁড়িয়ে। এ কারণে ইমাম কামাল ইবনুল হুমামকে দেখি, উপরে

নবিদের হকের উসিলা দিয়ে দোয়া করা মাকরুহ লিখলেও রওজা জিয়ারতের সময় লিখেন, 'এরপর রাসুলের উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে।'[১]

এমন ব্যতিক্রম অবস্থা ছাড়া আল্লাহর কাছেই সরাসরি দোয়া করা উচিত; বরং এটা দ্বীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য। জগতের অন্যান্য ধর্মে আল্লাহর কাছে যেতে হলে মাধ্যম ধরে যেতে হয়, কিন্তু ইসলামে আল্লাহ ও বান্দার সম্পর্ক সরাসরি। মাঝে কোনো ফেরেশতা, নবি কিংবা ওলির মধ্যস্থতা দরকার নেই। জগতের রাজা-বাদশাহ বা সবলদের কাছে যেতে হলে অন্যের উসিলা ধরে যেতে হয়, অন্যের সুপারিশে যেতে হয়; কারণ, তারা আপনাকে জানে না, আপনার অবস্থা সম্পর্কে ধারণা রাখে না। কিন্তু আল্লাহ সবকিছু জানেন; বরং যার উসিলাতে তাঁকে ডাকছেন, তার চেয়ে তিনি আপনাকে বেশি জানেন। সুতরাং নিজের প্রয়োজন সরাসরি আল্লাহকে বলুন। আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণের উসিলা দিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন। তিনি প্রার্থনা কবুলকারী। এটাই সালাফের মানহাজ। আনওয়ার শাহ কাশ্মীরিও তাওয়াসসুলকে সালাফের নয়, বরং মুতাআখখিরিনদের মানহাজ বলেছেন। এটা জায়েজ-না জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে তিনি বলেছেন, 'আমি দ্বিধাগ্রস্ত।'[২] যদিও এটা দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার মতো বিষয় নয়, তথাপি পিছনে আমরা উল্লেখ করেছি যে, মুতাকাদ্দিমিন এটা নিষেধ করতেন। মুনাভি ইজ ইবনে আবদুস সালাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তাওয়াসসুল কেবল রাসুলের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা চাই।[৩] তাওয়াসসুল নিয়ে বাড়াবাড়ির ফলে আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানভি রাহি. লিখেন, উসিলার নাম দিয়ে বুজুর্গদের কাছে আরজি পেশ করা, তাদের কাছে নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি এবং প্রত্যাখ্যাত কাজ।[৪] ফলে সালাফের যত কাছে থাকা যায়, তত উত্তম ও তত নিরাপদ।

দুই. রাসুলের কাছে শাফায়াত (ইস্তিশফা)/সাহায্য প্রার্থনা (ইস্তিগাসা): রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত-সংশ্লিষ্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে 'ইস্তিশফা' ও 'ইস্তিগাসা'। 'ইস্তিশফা' হলো শাফায়াত প্রার্থনা করা, আর 'ইস্তিগাসা' শব্দের অর্থ সাহায্য চাওয়া। ইসলামি শরিয়াহ মতে, জীবিত মানুষের কাছে তাদের সাধ্যের ভিতরের যেকোনো বস্তু/সাহায্য ইত্যাদি প্রার্থনা করা সুস্পষ্টভাবে জায়েজ;

---

১. ফাতহুল কাদির (৩/১৮১)।
২. ফয়জুল বারি (২/৪৯৬, ৪/১৮৮)।
৩. রদ্দুল মুহতার (৬/৩৯৭)।
৪. ইখতিলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকিম (৫৭-৫৮)।

চাই সেখানে ইস্তিগাসা কিংবা যেকোনো শব্দ ব্যবহার করা হোক। বিপরীতে মানুষের সাধ্যের বাইরে এমন কিছু চাওয়া, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ দিতে পারে না, সেটা অন্যের কাছে চাওয়া নাজায়েজ। এই হিসেবে জীবিত ওলি-আউলিয়া কিংবা মৃত কবরবাসীর কাছে এ ধরনের কিছু প্রার্থনা করা ইসলামে হারাম। আর যদি কেউ কোনো কবরের মৃত সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে যে, সে তার প্রার্থনা শুনতে এবং নিজে তার প্রয়োজন পূর্ণ করতে সক্ষম, তবে সেটা শিরক। কারণ, কোনো মৃত ব্যক্তি প্রার্থনা শোনা ও নিজে তা পূর্ণ করার সামর্থ্য রাখে না।

প্রশ্ন হচ্ছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে এই জায়গাতে কোনো ছাড় রয়েছে কি না? যেহেতু রওজার সামনে গিয়ে রাসুলকে জীবিত ব্যক্তির মতো 'ইয়া রাসুলাল্লাহ' বলে সালাম পেশ করা হয় এবং নবিগণ কবরে জীবিত, সুতরাং তাঁর কাছ থেকে কিয়ামতের দিনের জন্য শাফায়াত প্রার্থনা করা যাবে কি না, কিংবা 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের সাহায্য করুন!' এমন কিছু বলা যাবে কি না?

বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। কেবল মতভেদপূর্ণ নয়, বরং উম্মাহ এক্ষেত্রে বহুধাবিভক্ত হয়েছে এবং পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়েছে। এর কারণে একদল আরেক দলকে কাফের বলেছে, মুশরিক বলেছে, বিদআতি বলেছে, যা আজও সমান গতিতে চলছে। এক্ষেত্রে যেসব দল সুস্পষ্ট গোমরাহির শিকার হয়েছে, তারা আমাদের আলোচনার বাইরে। কারণ তারা রাসুলুল্লাহকে নিয়ে এমন বাড়াবাড়ি করেছে, যা খ্রিষ্টানরা করেছে ঈসা আলাইহিস সালামকে নিয়ে; অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশায় বারবার এমন করতে নিষেধ করেছেন।[১] তারা রাসুলুল্লাহকে পরোক্ষভাবে খোদার আসনে বসিয়ে তাঁর ইবাদত করা শুরু করেছে, তাঁর ব্যাপারে বিশ্বাস করেছে—তিনি গায়েব জানেন, সন্তান দিতে পারেন, প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারেন। ফলে তারা তাঁর কাছে ক্ষমা চায়, তাঁর কাছে সন্তান চায়, তাঁর কাছে হিদায়াত চায়। মুখে আল্লাহর নাম ততবার উচ্চারণ করে না, যতবার রাসুলের নাম উচ্চারণ করে। রাসুলকে নিয়ে ধ্যান করে, অথচ রাসুল বলেছেন, এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করো যেন তুমি তাঁকে দেখছ, তুমি তাঁকে না দেখলে, ভাবো—তিনি তোমাকে দেখছেন!'[২] তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দিন-রাত সাহায্য চায়, অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন কিছু চাইবে, আল্লাহর কাছে চাইবে,

১. বুখারি (৩৪৪৫); দারেমি (২৮২৬); বাজ্জার (১৯৪)।
২. বুখারি (৫০, ৪৭৭৭); মুসলিম (৮, ৯)।

যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে আল্লাহর কাছে করবে।'[১] তারা রাসুল ও ওলিদের কবরে সিজদা দেয়, অথচ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করো না।'[২] ইসলাম বিশুদ্ধ তাওহিদের ধর্ম। অথচ এসব ফিরকা আল্লাহর রাসুলকে ভালোবাসার নাম করে ইসলামকে কবরপূজা-সর্বস্ব প্রথা-পার্বণে পরিণত করে ফেলেছে। এদের জীবনের সবকিছু নবি-রাসুল ও ওলি-আউলিয়ার কবর ঘিরে। ইসলামের রুহের সঙ্গে এসব ফিরকার কোনো সম্পর্ক নেই। তাই তাদের নিয়ে আমরা এখানে কথা বলব না। আমরা কথা বলব আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধারার পারস্পরিক মতপার্থক্য নিয়ে।

একদল আলিম মনে করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন। হ্যাঁ, কবরে তিনি জীবিত কিন্তু সে জীবন বিশেষ জীবন; দুনিয়ার জীবনের মতো নয়। তাই মৃত্যুর পরে তাঁকে কেবল সালাম দেওয়া যাবে। তাঁর কাছে কোনোকিছু চাওয়া যাবে না। তাঁর কাছে সাহায্য, শাফায়াত কিংবা দোয়া কোনোকিছুই প্রার্থনা করা যাবে না। এক্ষেত্রে তিনি অন্যান্য মানুষের মতো। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি রাসুলের কাছে সাহায্য চায়, কিংবা কোনোকিছু প্রার্থনা করে, তবে সেটা বড় পর্যায়ের শিরক গণ্য হবে। তার কাজটি কবরপূজা হিসেবে বিবেচিত হবে। যদি জেনে-বুঝে এগুলো করে, তবে সে মুশরিক হয়ে যাবে।

বিপরীতে উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম মনে করেন, বিষয়গুলোর এত সহজীকরণ সম্ভব নয়; বরং ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। রাসুলুল্লাহর কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করা, তাঁর কবরের সামনে গিয়ে কিছু চাওয়া, অন্যান্য পুণ্যবান মৃত ব্যক্তির কাছে গিয়ে কিছু প্রার্থনা করার বিভিন্ন স্তর ও অবস্থা রয়েছে। এসব কাজের কিছু শিরক, কিছু অবৈধ (হারাম), কিছু অনুত্তম (মাকরুহ), আবার কিছু একেবারেই বৈধ (জায়েজ ও মুবাহ)। ফলে এক কথায় সিদ্ধান্ত দেওয়া কঠিন।

প্রথম ধারার আলিমদের একটা গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো, জীবদ্দশায় মানুষের কাছে তার সাধ্যের বাইরে যা কেবল আল্লাহ তায়ালার কাছে চাওয়া যায়, এমন কিছু চাওয়া শিরক। আর মৃত্যুর পরে যেকোনো কিছু চাওয়া শিরক। কারণ, তাতে আল্লাহর অংশীদারত্ব সাব্যস্ত হয়। কিন্তু জমহুর আলিম মনে করেন, সবার ব্যাপারে এ-রকম এক ও অভিন্ন মূল নীতি প্রযোজ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ রাসুলুল্লাহ এই নিয়মের বাইরে। কারণ,

১. মুসতাদরাকে হাকিম (৬৩৫৯); মুসনাদে আহমদ (২৭১৩); আবু ইয়ালা (২৫৫৬)।
২. মুসলিম (৫৩২); সহিহ ইবনে খুজাইমা (৭৮৯); মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৭৬২৮)।

আমরা দেখি, রাসুলুল্লাহর জীবদ্দশায় কিছু কিছু সাহাবি তার কাছে এমন জিনিস চাচ্ছেন, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ দিতে পারেন না। তথাপি তিনি তাদের বারণ করেননি কিংবা এ-রকম প্রার্থনা করতে নিষেধ করেননি। যেমন রবিআহ ইবনে কাব রাজি.-এর হাদিস। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে রাত যাপন করতাম এবং তার ওজুর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু এগিয়ে দিতাম। একরাতে তিনি আমাকে বললেন, তোমার যা ইচ্ছা চাও। আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সঙ্গে থাকতে চাই। তিনি বললেন, অন্যকিছু? আমি বললাম, না, এটাই। তিনি বললেন, তা হলে অধিক সেজদার মাধ্যমে এ কাজে আমাকে সহায়তা করো।'[১]

এখানে সুস্পষ্ট, উক্ত সাহাবি রাসুলুল্লাহর কাছে এমন জিনিস চাইলেন যা তাঁর হাতে নেই বরং একমাত্র আল্লাহর হাতে। বরং রাসুলুল্লাহ বিভিন্ন হাদিসে একাধিকবার তাগিদ দিয়েছেন যে, আল্লাহর অনুগ্রহ না হলে তিনি নিজেও পরকালে মুক্তি পাবেন না।[২] এই যদি হয় তাঁর নিজের অবস্থা, তা হলে অন্যের ব্যাপারে জান্নাতের গ্যারান্টি তিনি কীভাবে দিতে পারেন? আর তাঁর কাছে জান্নাত প্রার্থনা কীভাবে বৈধ হতে পারে? যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা হয়, তা হলে অবৈধই মনে হবে। কিন্তু বাস্তব কথা হলো, সাহাবি জানতেন তিনি রাসুলুল্লাহর কাছে কী চাচ্ছেন। আর রাসুলুল্লাহও জানতেন সাহাবি কী চাচ্ছেন। ফলে তিনি তাকে এমন প্রশ্ন শুনে বারণ করেননি, বরং অধিক ইবাদত করতে বলেছেন। কারণ, তাদের দুজনেরই জানা ছিল জান্নাতের মালিক আল্লাহ তায়ালা। ফলে আপনার সঙ্গে জান্নাতে থাকতে চাই—এর অর্থ তাঁর কাছে জান্নাত চাওয়া নয়, বরং জান্নাতের দোয়া চাওয়া। ফলে এ ধরনের প্রার্থনার নাম যা-ই দেওয়া হোক, এটা নিষিদ্ধ নয়। এখান থেকে প্রমাণিত হয়, মানুষের সাধ্যের বাইরে কিছু চাইলেই সেটা শিরক হবে না; বরং ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও বিশ্বাস পর্যবেক্ষণ করা জরুরি।

আরেকটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যদি তোমাদের কেউ নির্জন ভূমিতে পথ হারিয়ে ফেলে, কিংবা কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন পড়ে, অথচ সেখানে কোনো সাহায্যকারী থাকে না, তখন সে যেন উচ্চৈঃস্বরে ডাক দেয়, হে আল্লাহর বান্দারা, আমাকে সাহায্য করুন! হে আল্লাহর বান্দারা, আমাকে সাহায্য করুন! কারণ, আল্লাহর এমন কিছু বান্দা রয়েছেন, যাদের

---

১. মুসলিম (৫৩২); সহিহ ইবনে খুজাইমা (৭৮৯); মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৭৬২৮)।
২. মুসলিম (২৮১৬); মুসনাদে আহমদ (৭৫৯৭); বাজ্জার (৯৬৭৩)।

আমরা দেখতে পাই না।'[১] বিষয়টি বড়দের দ্বারা পরীক্ষিত। ইমাম আহমদ রাহি.-এর ছেলে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি পাঁচবার হজ করেছি। একবার হজে যাওয়ার সময় পথ হারিয়ে ফেলি। তখন আমি বলতে থাকি, হে আল্লাহর বান্দারা, আমাকে পথ দেখিয়ে দিন। এভাবে বলতে বলতে একসময় আমি পথ পেয়ে যাই।'[২]

উক্ত হাদিসটি একাধিক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এবং ইমামগণ এটাকে প্রমাণিত বলেছেন। উক্ত হাদিসে 'আমাকে সাহায্য করুন' এর আরবি হচ্ছে, 'আগিসুনি'। আর এই সাহায্য চাওয়াকে আরবিতে বলা হয় 'ইস্তিগাসা'। আর এটা যে আল্লাহর পরিবর্তে ফেরেশতাদের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে, তা তো হাদিসে স্পষ্টই। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য চাওয়া মানেই সেটা শিরক, এমন বলার সুযোগ নেই। কারণ, যিনি ডাকেন, তিনিও জানেন, আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া ফেরেশতাদের পক্ষে তাকে সাহায্য করা সম্ভব নয়। ফলে যেকোনো নবি-রাসুল কিংবা পুণ্যবান ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া মানেই শিরক নয়। বরং যিনি চাচ্ছেন এবং যার কাছে চাচ্ছেন তাদের অবস্থাভেদে বিধান ভিন্ন ভিন্ন হবে।

এবার কথা হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাদে অন্য সাধারণ **মৃত মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়ার** বিধান কী? এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ আলিমদের মতে, রাসুলুল্লাহ-সংশ্লিষ্ট বিধান অন্য সাধারণ মানুষের মতো নয়। তাই আমরা প্রথমে রাসুলুল্লাহ-সংশ্লিষ্ট বিধানগুলো আলোচনা করব, এরপর সাধারণ পুণ্যবানদের কাছে সাহায্য প্রার্থনার বিধান উল্লেখ করব।

প্রথমেই যে বিষয়টি স্পষ্ট করে নিতে হবে সেটা হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করা সত্ত্বেও কবরে তিনি মৃত নন, বরং জীবিত। কেবল তিনি নন, সকল নবি-রাসুল কবরে জীবিত। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বসম্মত আকিদা। যদিও তাদের কবর-জগতের জীবন দুনিয়ার জীবনের মতো নয়, এবং তা 'হায়াতে বারজাখিয়্যাহ' নামে পরিচিত। তথাপি বেশ কিছু দিক দিয়ে দুনিয়ার জীবনের সঙ্গে সে জীবনের সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন: নামাজ আদায় করা, জীবিতদের সালাম শুনতে পাওয়া এবং সেগুলোর জবাব দেওয়া। কোনো কোনো হাদিস অনুযায়ী

---

১. তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবির (২৯০)।
২. মাসায়িলু আহমদ ইবনে হাম্বল, আবদুল্লাহ সূত্রে (২৪৫)।

উম্মতের ভালো কাজে খুশি হওয়া, খারাপ কাজে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ইত্যাদি। যেমন:

• আনাস ইবনে মালেক রাজি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নবিগণ কবরে জীবিত। তারা নামাজ আদায় করেন।[১]

• অপর একটি হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা জুমুআর দিন আমার উপর বেশি বেশি সালাম পাঠ করো। কারণ, তোমাদের সালাম আমার সামনে পেশ করা হয়। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কীভাবে আমাদের সালাম আপনার কাছে পেশ করা হবে, আপনি তো ততদিনে নিঃশেষ হয়ে যাবেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তায়ালা মাটির উপর নবিদের দেহ ভক্ষণকে হারাম করে দিয়েছেন।[২]

• আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, 'তোমরা যেখানেই থাকো, তোমাদের সালাম আমার কাছে পৌঁছয়।'[৩]

• বরং আবু হুরাইরা রাজি.-এর সূত্রে বর্ণিত সুনানে আবু দাউদের হাদিসটি এখানে আরও প্রাসঙ্গিক। সেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'তোমাদের কেউ যখন আমার উপর সালাম পেশ করে, তখন আল্লাহ আমার রুহকে ফিরিয়ে দেন এবং আমি তার সালামের জবাব দিই।'[৪]

• বাইহাকির শুআবুল ঈমানের একটি বর্ণনাতে হাদিসটি এভাবে এসেছে, 'তোমাদের কেউ যখন আমার কবরের কাছে সালাম পেশ করে, আমি শুনতে পাই; আর দূর থেকে যখন সালাম পেশ করে, আমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।'[৫]

• এক্ষেত্রে আরেকটি হাদিস রয়েছে, যা ইস্তিগাসা বৈধতার মতামতকে শক্তিশালী করে এবং এটা বৈধ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে। হাদিসটি হলো, রাসুলুল্লাহ বলেছেন, 'আমার জীবন তোমাদের জন্য কল্যাণকর। কারণ, তোমরা আমার সঙ্গে কথা বলো, আমিও তোমাদের সঙ্গে কথা বলি। আমার মৃত্যুও তোমাদের জন্য

---

১. মুসনাদে বাজ্জার (৬৮৮৮); মুসনাদে আবু ইয়ালা (৩৪২৫)।
২. সহিহ ইবনে খুজাইমা (১৭৩৩); আবূ দাউদ (১০৪৭); ইবনে মাজা (১০৮৫)।
৩. মুসনাদে আহমদ (৮৯২৬); মুসনাদে আবু ইয়ালা (৬৭৬১)।
৪. আবূ দাউদ (২০৪১); সুনানে বাইহাকি কুবরা (১০৩৭৯); মুসনাদে আহমদ (১০৯৬৯)।
৫. শুআবুল ঈমান (৩/১৪০)।

কল্যাণকর। কারণ, আমার কাছে তোমাদের আমলসমূহ পেশ করা হয়। যখন তাতে ভালো কিছু দেখি, আল্লাহর প্রশংসা করি, আর যখন খারাপ কিছু দেখি, তোমাদের জন্য ইস্তেগফার করি।'[১]

• রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পরে তাঁর কাছে কিছু চাওয়ার অন্যতম আরেকটি স্পষ্ট দলিল হচ্ছে উমর রাজি.-এর খাদ্যমন্ত্রী মালেক-দার এর একটি বর্ণনা। তিনি বলেন, উমর রাজি.-এর যুগে যখন প্রচণ্ড অনাবৃষ্টি দেখা দেয়, তখন এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহর কবরের কাছে এসে বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার উম্মত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আপনার প্রভুর কাছে বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন। তখন স্বপ্নে তাকে উমর রাজি.-এর কাছে গিয়ে রাসুলুল্লাহর পক্ষ সালাম বলতে বলা হলো। এরপর বলতে বলা হলো, ধীরে-সুস্থে সবরের সঙ্গে কাজ করতে হবে। তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করা হবে। যখন লোকটি উমর রাজি.-এর কাছে এসে এগুলো জানাল, উমর কাঁদলেন এবং বললেন, হে প্রভু, আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব ছিল, আমি ত্রুটি করিনি![২]

• একইভাবে মদিনাতে একবার প্রচণ্ড অনাবৃষ্টি হলে লোকজন আয়েশা রাজি.-এর কাছে এলো। আয়েশা রাজি. বললেন, নবিজির কবরের ছাদে (কবরে নয়) একটা ছিদ্র করে দাও, যাতে কবর ও আকাশের মাঝে কোনো ফাঁকা না থাকে। ছিদ্র করা হলো। আল্লাহ এত বৃষ্টি দান করলেন যে, সবার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেল।[৩]

এসব হাদিস থেকে উলামায়ে কেরাম দলিল দেন যে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুমতিতে রাসুল কবরে আমাদের কথা শুনতে পান। আমাদের সালাম ও অন্যান্য আমল তার কাছে পেশ করা হয়। আমাদের জন্য তিনি আল্লাহর দেওয়া শক্তি ও তাওফিকে দোয়া করেন। উম্মাহর বিভিন্ন দুর্যোগে তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করে সেসব দুর্যোগ দূর করেন। আল্লাহ তাঁর কবরে থেকে করা দোয়ার উসিলায় উম্মাহকে সাহায্য করেন। ফলে আমরা যখন তার কাছে শাফায়াত কিংবা সাহায্য চাইব, সেটাও তিনি আল্লাহর জানানোর মাধ্যমে জানবেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন। এই

---

১. মুসনাদে বাজ্জার (১৯২৫); আল-মাতালিবুল আলিয়াহ (৩৮২৪); তরহুত তাসরিব, ইরাকি (৩/২৯৭); ইমদাদুল আহকাম (১/১৩৬-১৩৭)।

২. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩২৬৬৫); বুখারি আত-তারিখুল কাবির (অংশবিশেষ ১২৯৫); দালায়িলুন নুবুওয়্যাহ, বাইহাকি (৭/৪৭)।

৩. মুসনাদে দারেমি (৯৩); সামহুদি উক্ত ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করে বলেন, সেই থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত মদিনাতে প্রচণ্ড খরার সময় রাসুলুল্লাহর কবরের ছাদে ছিদ্রের প্রচলন রয়েছে (দেখুন: খুলাসাতুল ওয়াফা, সামহুদি ২/১৪২) ফলে এটা মদিনাবাসীর মুতাওয়াতির ও মুতাওয়ারিস আমলের মাধ্যমে প্রমাণিত।

দৃঢ় বিশ্বাসের তাগিদের সঙ্গে যে, **রাসুলুল্লাহর নিজের কিছু করার ক্ষমতা নেই।** সম্ভবত এই ভিত্তিতেই:

• ফাতহুল কাদিরে কামাল ইবনুল হুমাম রওজা জিয়ারতের আদব বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন, 'অতঃপর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করবে। বলবে: **ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি আপনার কাছে শাফায়াত চাচ্ছি। ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি আপনার কাছে শাফায়াত চাচ্ছি এবং আপনার উসিলায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, যেন আপনার মিল্লাত এবং সুন্নাহর উপর আমার মৃত্যু হয়।**'[১]

• ফাতাওয়ায়ে আলমগিরিতেও বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, কেউ যদি রাসুলের কাছে কারও মাধ্যমে সালাম পাঠায়, তবে সে রওজার সামনে দাঁড়িয়ে বলবে, অমুকের ছেলে অমুকের পক্ষ থেকে **আপনার উপর সালাম হে আল্লাহর রাসুল। সে আপনার কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করছে। আপনি তার জন্য ও সকল মুসলমানের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করুন।**[২]

• কাজি ইয়াজ ইমাম মালেক রাহি. থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম মালেক রাহি.-কে যখন মসজিদে নববিতে খলিফা আবু জাফর জিজ্ঞাসা করল, কিবলামুখী হয়ে দোয়া করব, নাকি রাসুলুল্লাহর অভিমুখী হয়ে? মালেক বললেন, কেন আপনি তাঁর কাছ থেকে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেবেন, অথচ তিনি কিয়ামতের দিন আপনার ও আপনার পিতা আদমের উসিলা? বরং তাঁর অভিমুখী হোন, **তাঁর কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করুন,** আল্লাহ তাঁর শাফায়াত গ্রহণ করবেন।'[৩]

• ইবনে কাসির রাহি. তাঁর তাফসিরে শাইখ আবু নসর আস সাববাগ-সহ একটি জামায়াত থেকে বর্ণনা করেন, একদিন এক গ্রাম্য লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের কাছে এসে বলল, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি আল্লাহকে কুরআনে বলতে শুনেছি: (অর্থ) 'তারা নিজেদের উপর জুলুম করার পরে যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসুল তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তা হলে তারা অবশ্যই আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী ও অনুগ্রহশীল পেত।' [নিসা: ৬৪] **আর তাই আমি আপনার কাছে এসেছি, যাতে আপনি আল্লাহর কাছে আমার গুনাহের**

---

১. ফাতহুল কাদির (৩/১৮১)।
২. ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি (১/২৬৬)।
৩. শিফা, কাজি ইয়াজ (২/৪১)।

ক্ষমাপ্রার্থনা করেন আর আমার জন্য শাফায়াত করেন।[১] ইবনে কাসির উক্ত ঘটনাকে ইতিবাচকভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এর উপর কোনো আপত্তি করেননি।

• ইমাম কুরতুবিও তার তাফসিরগ্রন্থে এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং সেটার উপর তিনি কোনো আপত্তি করেননি[২]। বোঝা গেল, তারা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরে তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা এবং তাঁর কাছে শাফায়াত কামনা বৈধ মনে করেন।

• ইবনুল জাওজিও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর রওযা জিয়ারত করার সময় শাফায়াত প্রার্থনা করতে বলেছেন![৩]

• ইবনে কুদামা রওজা জিয়ারতের আদব প্রসঙ্গে লিখেন, যখন মসজিদে ঢুকবে, নবিজির কবরের কাছে এসে পিঠকে কিবলামুখী করবে আর নিজে কবরের অভিমুখী হয়ে বলবে, আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়্যু ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ! হে আল্লাহ, আপনি বলেছেন এবং আপনার কথা সত্য (অর্থ) 'তারা নিজেদের উপর জুলুম করার পরে যদি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসুল তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তা হলে তারা অবশ্যই আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী ও অনুগ্রহশীল পেত: [নিসা: ৬৪] **আর তাই আমি আপনার কাছে আমার সমস্ত গুনাহ থেকে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে এবং আপনার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে শাফায়াতপ্রত্যাশী হিসেবে এসেছি।'**[৪]

• শাইখুল হাদিস জাকারিয়া কান্ধলভি রাহি. লিখেন, ...'উক্ত হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে শাফায়াত প্রার্থনা করা যায়। কেননা তিনি আল্লাহর কাছে সম্মানিত।'[৫]

• ইমাম বুখারি আল-আদাবুল মুফরাদে বর্ণনা করেন, একবার ইবনে উমর রাজি.-এর পা অবশ হয়ে গেলে এক ব্যক্তি তাকে বলল, আপনার সবচেয়ে প্রিয়

---

১. তাফসিরে ইবনে কাসির (২/৩০৬); মুগনি, ইবনে কুদামা (৩/৪৭৮)।
২. তাফসিরে কুরতুবি (৫/২৬৫-২৬৬)।
৩. আত-তাবসিরাহ, ইবনুল জাওজি (২/২৬৩)।
৪. আল-মুগনি, ইবনে কুদামা (৩/৪৭৮-৪৭৯)।
৫. বাজলুল মাজহুদ (১৩/১৪৪)।

মানুষটির নাম স্মরণ করুন, ভালো হয়ে যাবে। তিনি বললেন, 'হে মুহাম্মাদ', তখন তার পা ভালো হয়ে গেল![1]

• তাবেয়ি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির অসুস্থতা অনুভব করলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের উপর তার গাল রাখতেন! এ ব্যাপারে তার সমালোচনা করা হলে তিনি বললেন, আমি রাসুলুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।[2]

• ইবনুল মুকরি' রাহি. একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা (তার সঙ্গে তাবারানি-সহ কয়েকজন সঙ্গী ছিলেন) ক্ষুধায় ভুগছি। কিছুক্ষণ পরে এক ব্যক্তি এসে বলল, আপনারা আমার বিরুদ্ধে রাসুলুল্লাহর কাছে নালিশ করেছেন। এই আপনাদের খাবার।[3]

এসব বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, মোটামুটি চার মাজহাবেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শাফায়াত/সাহায্য প্রার্থনা বৈধ। কারণ, এটা বাহ্যত তাঁর কাছে পেশ করলেও মূল প্রার্থনা করা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার কাছে।

দলিলের পর্যালোচনা: বাস্তবেই কি উপরের হাদিসগুলো থেকে রাসুলুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া, নিকট ও দূর থেকে তাঁর কাছে নিজেদের প্রয়োজনের কথা তুলে ধরার বৈধতা প্রমাণিত হয়?

বিষয়টি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। যেসব হাদিস রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশার সঙ্গে সম্পর্কিত, সেগুলো দ্বারা এটা আদৌ প্রমাণিত হয় না। কারণ, জীবন আর মৃত্যু এক নয়। জীবদ্দশায় কারও কাছে কিছু চাওয়া আর মৃত্যুর পরে চাওয়া এক নয়। আর ফেরেশতাদের সাহায্যের জন্য ডাকা আর মৃত মানুষকে সাহায্যের জন্য ডাকা ভিন্ন ব্যাপার। সুতরাং এই হাদিস দিয়েও ইস্তিগাসার প্রমাণ দেওয়া যায় না।

এরপর আসা যাক সালাম-সম্পর্কিত হাদিসগুলোতে। বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, আমার কাছে তোমাদের সালাম পৌঁছে দেওয়া হয়। কীভাবে পৌঁছানো হয় সেটা আল্লাহই ভালো জানেন। একটি বর্ণনায় এসেছে, আমার ভিতরে রুহ ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং আমি সালামের জবাব দিই। আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, আমার কাছে এসে যে সালাম দেয়, আমি তার সালাম শুনতে পাই। যেহেতু কবরের জীবন পার্থিব জীবনের

---

১. আল-আদাবুল মুফরাদ, বুখারি (নং ৯৬৪)।
২. সিয়ারু আলামিন নুবালা (রিসালা) (৫/৩৫৮)।
৩. তাজকিরাতুল হুফফাজ, জাহাবি (৩/১২২)।

মতো নয়, তাই একটাকে অপরটার উপর কিয়াস করা যাবে না; বরং কুরআন ও সুন্নাহে যতটুকু এসেছে, ততটুকুর মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। সুতরাং রাসুলুল্লাহ সালাম শুনতে পান, তাই সব কথা শুনতে পাবেন—এমন বোঝা সঠিক নয়।

অতঃপর আসে আল্লাহর রাসুলের কাছে আমলনামা পেশ-সংক্রান্ত হাদিসটি। যারা ইস্তিগাসা বৈধের পক্ষে, তাদের জন্য এটি একটি শক্তিশালী হাদিস নিঃসন্দেহে। কিন্তু বড় বড় মুহাদ্দিস এই হাদিসের সমালোচনা করেছেন, হাদিসের বিভিন্ন অংশের উপর আপত্তি করেছেন। যদি এটা বিশুদ্ধ ধরেও নিই, তবুও এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় না যে, রাসুলুল্লাহ আমাদের প্রার্থনা শুনতে পান। এখানে কেবল বলা হয়েছে, তার কাছে আমাদের আমলনামা পেশ করা হয়, তিনি আমাদের জন্য দোয়া করেন। কাউকে ডাকলে তিনি শুনতে পান, আর তার কাছে আমলনামা পেশ করা হয়—দুটো ভিন্ন বিষয়। তা ছাড়া এটি রাসুলুল্লাহর কোনো স্বতন্ত্র গুণ নয়; বরং এটা সাধারণ মুমিনদের বেলাতেও প্রযোজ্য। একাধিক হাদিসে এসেছে, জীবিত মানুষের আমলনামা তাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনের কাছে পেশ করা হয়। যদি ভালো হয়, তবে তারা খুশি হয়; আর খারাপ হলে হিদায়াতের দোয়া করে।[১] কিছু হাদিসে এসেছে, যখন কেউ মৃত্যুবরণ করে এবং তাকে দাফন করা হয়, তখন তার কাছে অন্যান্য রুহ এসে তাদের জীবিত আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। ভালো কিছু শুনলে খুশি হয়, খারাপ কিছু শুনলে মন খারাপ করে, আল্লাহর কাছে হিদায়াতের দোয়া করে।[২] বরং কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, মৃত স্বামী তার রেখে যাওয়া স্ত্রীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে, সে বিয়েশাদি করেছে কি না।[৩] তা হলে রাসুলুল্লাহর কাছে আমাদের আমলনামা পেশ করা হয়—এই হাদিসের মাধ্যমে যদি তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া বৈধ হয়, তা হলে জগতের সকল মৃত মুসলমানের কাছে, সকল কবরের কাছে সাহায্য চাওয়া বৈধ হবে। অথচ সেটা তারাও বলবেন না। অতএব, বোঝা গেল, এসব হাদিস নিছক অদৃশ্যের ও কল্পনার বাইরের বিষয়। এগুলো মানবিক বুদ্ধি-বিবেক দিয়ে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাই একদিকে এগুলোর উপর আমাদের ঈমান আনতে হবে, অপরদিকে এগুলো শর্তহীনভাবে গ্রহণ করা যাবে না; বরং শরিয়তের মেজাজের আলোকে গ্রহণ করতে হবে। যতটুকুই এসেছে, ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। এগুলোর প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা যার ব্যাপারে চান,

---

১. আবু দাউদ তয়ালিসি (১৯০৩); মুসতাদরাকে হাকেম (৭৯৪৪); মুসনাদে আহমদ (১২৮০০)।
২. তাফসিরে মুজাহিদ (৭৪৫); মুসনাদে বাজ্জার (৯৭৬০); কানজুল উম্মাল (৪২৭৩৭, ৪২৭৩৮) আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি (১/৫৩)।
৩. তাহজিবুল আসার, তাবারি (২/৫১০)।

যখন চান, তার ব্যাপারে কিছু তথ্য মৃত আত্মীয়দের জানিয়ে থাকেন। যেমন: মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা শেষ হলে সে জীবিতদের জুতোর শব্দ শুনতে পায়।[১] বদরযুদ্ধে কাফেরদের নেতৃবৃন্দকে হত্যা করে কূপে ফেলার পরে রাসুলুল্লাহ তাদের ডেকে কিছু কথা বলেছিলেন এবং তারা সেটা শুনেছিল; বরং উমর রাজি. যখন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি মৃতদের সঙ্গে কথা বলছেন! তখন তিনি জবাবে বললেন, তোমরা তাদের চেয়ে বেশি শুনছ না।[২]

এগুলো দিয়ে কি দলিল দেওয়া যাবে যে, মৃত ব্যক্তি তাদের কবরের বাইরের সবকিছু শুনতে পায়? না, সেটা করা যাবে না। বরং এগুলোতে যেটুকু এসেছে, সেটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। কারণ, কুরআন ও সুন্নাহর একাধিক জায়গায় এমন ধারণাকে নাকচ করা হয়েছে। বুখারি ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস রাজি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন খুতবায় বললেন, 'হে লোকসকল, নিশ্চয়ই তোমরা সকলে হাশরের ময়দানে নগ্নপদ, নগ্নশরীর ও খতনাবিহীন অবস্থায় উপস্থিত হবে।' এরপর তিনি কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করলেন:

كَمَا بَدَاْنَاۤ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ ؕ وَعْدًا عَلَيْنَا ؕ اِنَّا كُنَّا فٰعِلِيْنَ.

অর্থ: 'যেমনভাবে আমি তোমাদের প্রথমে সৃষ্টি করেছি, সেভাবেই আবার পুনরুত্থিত করব। এটা আমার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। আমি এটা অবশ্যই পূর্ণ করব।' [আম্বিয়া: ১০৪] এরপর তিনি বললেন, "হে লোকসকল, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে পোশাক পরানো হবে। অতঃপর আমার উম্মতের কিছু মানুষকে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব, 'হে প্রভু, তারা তো আমার লোকজন।' তখন আমাকে বলা হবে, 'আপনি জানেন না আপনার পরে তারা কী করেছে।' তখন আমি ঈসা আলাইহিস সালাম যেভাবে বলেছিলেন সেভাবে বলব,

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ؕ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ.

'আমি তো তাদের উপর সাক্ষী ছিলাম যতক্ষণ আমি তাদের মাঝে ছিলাম। যখন আপনি আমাকে মৃত্যু দান করলেন, তখন আপনি তাদের পর্যবেক্ষণকারী ছিলেন; আর

---

১. বুখারি (১৩৩৮); মুসলিম (২৮৭০)।
২. বুখারি (৩৯৭৬); মুসনাদে আহমদ (১৬৬২১)।

আপনি সবকিছুর সাক্ষী।' [মায়িদা: ১১৭] তখন বলা হবে, 'আপনি তাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে তারা পশ্চাতে ফিরে গিয়েছিল।'"[১]

এর দ্বারা বোঝা যায়, উম্মতের বিস্তারিত অবস্থা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানেন না। কারণ, তিনি আলিমুল গায়েব নন। হ্যাঁ, তাকে সালাম ইত্যাদি যতটুকু জানানো হয় ততটুকুই জানেন। আর সাধারণ মুসলমানদের ব্যাপারে তো উক্ত নিষেধাজ্ঞা আরও বেশি প্রযোজ্য। ফলে এ ব্যাপারে হানাফি মাজহাবের আলিমদেরও নির্ভরযোগ্য কথা হলো, মৃতরা স্বাভাবিক অবস্থায় কিছু শুনতে পায় না। কামাল ইবনুল হুমাম রাহি. বলেন, আমাদের অধিকাংশ শাইখের মত হচ্ছে, মৃতরা কিছু শুনতে পায় না।[২] সুতরাং যারা শুনতেই পায় না, তাদের ডাকা কতটুকু বৈধ ও যৌক্তিক? হ্যাঁ, যদি ধরে নেওয়া হয়, কবরের পাশে গিয়ে ডাক দিলে শুনতে পায়, তবুও তার সাহায্য করার ক্ষমতা নেই। ফলে ডাকা অর্থহীন। আর দূর থেকে শুনতে পায় এমন বিশ্বাসে ডাকা তো শিরক।

তবে সর্বশেষ উমরের যুগে এক ব্যক্তি রাসুলের কবরের কাছে এসে তাকে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করতে বলার হাদিসটি বেশ জটিল। হাদিসটি ইবনে আবি শাইবা, বাইহাকি-সহ একাধিক ইমাম বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারিও সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। হ্যাঁ, বিভিন্ন মুহাদ্দিস বর্ণনাটির সমালোচনা করেছেন, তাদের অনেকে একে অপ্রমাণিত আখ্যা দিয়েছেন;[৩] কিন্তু অনেকে এটাকে প্রমাণিত বলেছেন।[৪] অধমের পর্যবেক্ষণে বর্ণনাটিকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। আর এ কারণেই যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরেও তাঁর কাছে কিছু চাওয়াকে বৈধ মনে করেন, এই হাদিসটি তাদের অন্যতম শক্তিশালী দলিল। তাদের মতে, যে লোকটি কবরের কাছে গিয়েছেন, তিনি একজন সাহাবি। তা ছাড়া সাহাবাগণ, বিশেষত উমর রাজি., যিনি সকল অন্যায় বিশেষত শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সতর্ক ও সচেতন ছিলেন, তিনি পর্যন্ত প্রতিবাদ করলেন না। যদি উক্ত সাহাবির কাজ ভুল হতো, উমর সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করতেন; কিন্তু প্রতিবাদ না করে তিনি কাঁদতে লাগলেন! এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রাসুল

---

১. বুখারি (৪৬২৫); মুসলিম (২৮৬০)।
২. ফাতহুল কাদির (২/১০৪); রদ্দুল মুহতার (৩/৮৩৬)।
৩. আত-তাওয়াসসুল, আলবানি (১১৮-১২০)।
৪. ফাতহুল বারি (২৪৯৫-৪৯৬)।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু চাওয়াকে অবৈধ মনে করতেন না। কারণ, তারা জানতেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে জীবিত। হ্যাঁ, এই শর্তে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কিছু করার ক্ষমতা রাখেন না, বরং তিনি কেবল দোয়া করবেন। আর রাসুলের যেহেতু আল্লাহর কাছে বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, তাই তাঁর মাধ্যমে দোয়া করলে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

কিন্তু প্রথম ধারার আলিমগণ এক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষের মাঝে পার্থক্য করেন না। তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শাফায়াত কিংবা যেকোনো কিছু চাওয়াকে ইসলাম ভঙ্গকারী শিরকে আকবর মনে করেন! তাদের মতে, 'রাসুলুল্লাহর কাছে এভাবে প্রার্থনা করা যে, '**হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার কাছে শাফায়াত চাই'—কুফর এবং শিরকে আকবর!** এর মাধ্যমে একজন মানুষ ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। কেননা সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে দোয়া করেছে। দোয়া একটি ইবাদত। আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে দোয়া করল, সে তার ইবাদত করল। আর যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে, সে মুশরিক হয়ে যাবে।'[১] তবে **এত সরল সমীকরণ সঠিক নয়।** সব ধরনের দোয়া ইবাদত নয়। ফলে কেউ রাসুলের কাছে শাফায়াতের দোয়া করলেই সেটা শিরকে আকবর হয়ে যাবে—এমন কথা দ্বীনের ক্ষেত্রে গুলু ও বাড়াবাড়ি।

একইভাবে তাদের কারও বক্তব্য, '**কেউ যদি একমাত্র আল্লাহকেই সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী ও সর্বদাতা মনে করেও রাসুলের কাছে স্রেফ সুপারিশ প্রার্থনা করে, তাও শিরকে আকবর; সে ব্যক্তি মুশরিক হয়ে যাবে; তাকে হত্যা করা হবে; তার সম্পদ গনিমত হিসেবে নিয়ে নেওয়া হবে।**'[২]—সঠিক নয়। স্বয়ং ইমাম ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য এমন গুলুর বিপরীত। ইবনে তাইমিয়া রাহি. লিখেছেন, যদি মৃত কিংবা অনুপস্থিত নবি বা ওলির কাছে বলা হয়, 'আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, ইস্তিগফার করুন', তবে সেটাও **বৈধ** নয়।[৩] এভাবে তিনি এটাকে স্রেফ অবৈধ বলেছেন। শিরকে আকবর বলেননি।

---

১. আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ ফিল আজউয়িবাহ আন-নজদিয়্যাহ (২/১৬৬)।
২. আদ দুরারুস সানিয়্যাহ ফিল আজউয়িবাহ আন নজদিয়্যাহ (১/২২৪, ২৩৪); আরও দেখুন মাহমুদ শুকরি আলুসি কৃত গায়াতুল আমানি ফির রাদ্দি আলান নাবহানি (১/২৬২-২৬৪)।
৩. মাজমুউল ফাতাওয়া (১/১৬১-১৬২)।

অধমের পর্যবেক্ষণ: প্রথমে আমাদের যে বিষয়টি খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে তা হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন। কারণ, তিনি মানুষ ছিলেন, চিরঞ্জীব নন। ফলে অন্যান্য মানুষ যেমন মৃত্যুবরণ করে, তিনিও তেমন মৃত্যুবরণ করেছেন। খ্রিষ্টানদের মতো এই উম্মাহ যেন বিভ্রান্তিতে না পড়ে, তাই কুরআনের একাধিক আয়াতে এ বিষয়টি বারবার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَائِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ.

অর্থ: 'আপনার পূর্বেও কোনো মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে?' [আম্বিয়া: ৩৪] অন্য আয়াতে বলেন,

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ.

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আপনি মরণশীল, তারাও মরণশীল।' [জুমার: ৩০] আল্লাহ বলেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ.

অর্থ: 'আর মুহাম্মাদ একজন রাসুল বৈ তো নয়। তাঁর পূর্বেও বহু রাসুল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তা হলে তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা কি পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কোনো ক্ষতি নেই। আর কৃতজ্ঞদের আল্লাহ তায়ালা বিনিময় দান করবেন।' [আলে ইমরান: ১৪৪] ফলে কবরে নবিদের যে জীবনের কথা বলা হচ্ছে, সেটা 'বারজাখি জীবন', পার্থিব জীবনের মতো নয়। সুতরাং সেটাকে পার্থিব জীবনের উপর কিয়াস করা যাবে না।

তা ছাড়া ইন্তিকালের আগে বারবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর-কেন্দ্রিক সতর্কতামূলক বক্তব্য থেকে অনুভব করা যায়, তিনি উম্মাহকে নিয়ে কতটা অস্থির ছিলেন। এ জন্য ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তাঁর কবর-কেন্দ্রিক যেকোনো বিচ্যুতি এড়াতে সর্বোচ্চ সতর্ক করে গিয়েছেন সাহাবাদের। জুনদুব থেকে বর্ণিত, বিদায়ের মাত্র পাঁচ দিন আগে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতেরা তাদের নবি ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের কবরকে সিজদার স্থান বানিয়ে

নিত। সাবধান! তোমরা কবরকে সিজদার স্থান বানিয়ো না। আমি তোমাদের নিষেধ করছি।'[১] আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানিয়ো না, আর আমার কবরকে উৎসবের স্থান বানিয়ো না; আর তোমরা আমার উপর সালাম পাঠ করো। কেননা তোমরা যেখানেই থাকো, তোমাদের সালাম আমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।'[২] ভালো করে খেয়াল করুন, হাদিসের দ্বিতীয় অংশটুকু যেন প্রথম অংশের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ তোমরা দূর থেকে সালাম পেশ করলেই যথেষ্ট। যত দূরেই থাকো, তোমাদের সালাম আমার কাছে পৌঁছয়, এ জন্য কাছে এসে সালাম দেওয়ার দরকার নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকটি হাদিসে বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের উপর অভিসম্পাত করেছেন। কারণ তারা তাদের নবির কবরকে সিজদার স্থানরূপে গ্রহণ করেছে।'[৩] অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করেছেন, 'হে আল্লাহ, আমার কবরকে ইবাদতের স্থানে পরিণত করবেন না! সেই সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর প্রচণ্ড ক্রোধ হয়েছে, যারা তাদের নবির কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।'[৪]

সম্ভবত এসব কারণেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পরে তাঁর কবর ঘিরে সাহাবায়ে কেরামের কোনো অতিরিক্ত আগ্রহ, বিশেষ কোনো মজলিস, অনুষ্ঠান কিংবা কর্মশালা চোখে পড়ে না। যে মানুষটিকে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন, নিজেদের জীবন দিয়েও যার গায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ হোক সেটা সহ্য করতেন না, যার থুতু মাটিতে পড়তে দিতেন না, যার ঘাম সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহার করতেন, যার একটি চুল সযত্নে সংরক্ষণ করতেন, সেই মানুষটিকে কবরে রাখার পরে সাহাবায়ে কেরামের কী করা উচিত ছিল? যদি অন্য কোনো ধর্ম হতো, তা হলে দেখা যেত, কবরের পাশে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সেই মহাপুরুষের অনুসারীরা বসে থাকতেন, অশ্রু ঝরাতেন, প্রার্থনা ও শোক পালন করতেন। কিন্তু ইসলাম হলো সুস্পষ্ট ও বাস্তববাদী দ্বীন। সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন বিশুদ্ধ তাওহিদের ঝান্ডাবাহী। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবন

---

১. মুসলিম (৫৩২); মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৭৬২৮)।
২. আবু দাউদ (২০৪২); মুসনাদে আহমদ (৮৯২৬); মুসনাদে আবু ইয়ালা (৪৬৯)।
৩. মুসলিম (৫৩০); মুসনাদে আহমদ (২২০০৫)।
৪. মুয়াত্তা ইমাম মালেক (৫৯৩)।

ব্যয় করে তাদের হাতে তাওহিদের যে আমানত তুলে দিয়েছিলেন, তাদের যে মহাপবিত্র দীক্ষায় দীক্ষিত করেছিলেন, সেটা তারা আবেগের কাছে নষ্ট হতে দেবার মতো প্রজন্ম ছিলেন না। তাই তাঁর ওফাতের পরেই তারা যে যার দায়িত্বে লেগে গেলেন। একদল গোটা পৃথিবীতে দ্বীনের দাওয়াত ও জিহাদের পতাকা উঁচু করে বেরিয়ে পড়লেন। প্রাণের চেয়ে প্রিয় মানুষ এবং তাঁর শহরকে পিছনে ফেলে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে পৌঁছে গেলেন চীনের সীমান্তে, আফ্রিকার জঙ্গলে, আটলান্টিকের তটে। আর যারা মদিনায় থাকলেন, তারা যে যার মতো স্বাভাবিকভাবে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে গেলেন। ফলে একজন সাহাবি থেকেও বর্ণিত হয়নি, যিনি আল্লাহর রাসুলের কবর ঘিরে বিশেষ ধরনের কোনো ইবাদত কিংবা আমল করেছেন; অথবা কবরের পাশে এসে বসে থেকেছেন, ধ্যান করেছেন। এটা যদি বিশেষ ফজিলতের কিছু হতো, তা হলে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সেই ফজিলত অর্জনের সবচেয়ে আগ্রহী ও উপযুক্ত প্রজন্ম। ইসলামে যদি এগুলো করার সুযোগ থাকত, তা হলে সাহাবায়ে কেরাম সেই সুযোগ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ছিলেন সবচেয়ে অগ্রগামী। তারা যেহেতু এমন কিছুই করেননি, বোঝা গেল, এগুলো করার মাঝে কোনো ফজিলত নেই, সুযোগও নেই। এভাবে মহাপুরুষদের ইতিহাসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই প্রথম ব্যক্তি, মৃত্যুর পরে যার কবর ঘিরে কোনো ধরনের কুসংস্কার কিংবা অতিরঞ্জন হয়নি।

বরং মসজিদে নববিতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যেকবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর জিয়ারত করতেন এমন প্রমাণও পাওয়া যায় না। কিছু কিছু বর্ণনার দ্বারা বোঝা যায়, যখন তারা কেবল মদিনার বাইরে থেকে আসতেন, তখন রওজার সামনে এসে সালাম দিতেন। যেমন: ইবনে উমর রাজি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি যখন কোনো সফর শেষ করে মদিনায় আসতেন, ঘরে প্রবেশের আগে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের সামনে এসে বলতেন, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ, আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা বকর, আসসালামু আলাইকা ইয়া আবাতাহ (হে পিতা)![১] এরপরে ঘরে যেতেন। আবদুর রাজ্জাকের বর্ণনায় এসেছে, উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, ইবনে উমর ছাড়া রাসুলের আর কোনো সাহাবি এমন করতেন না। আর ইবনে উমরও

১. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (১১৯১৫); মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক (৬৭২৪); সুনানে বাইহাকি কুবরা (১০৩৮০)।

উপরের তিনটি বাক্যের বেশি কিছু বলতেন না বা করতেন না। যদিও ইবনে উমর ছাড়া আর কেউ করতেন না—আবদুর রাজ্জাকের এমন কথা সঠিক নয়; বরং অন্য সাহাবারাও করতেন। যেমন: আবদুল্লাহ ইবনে কুরত রাজি. যখন ইয়ারমুক থেকে মদিনায় এলেন, তিনি উটের পিঠ থেকে নেমে এসে প্রথমেই রওজার সামনে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করেন।[১] হ্যাঁ, তিনি সালাম ছাড়া অন্যকিছু করেননি। আলি ইবনে হুসাইন (জাইনুল আবিদিন) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি একটি ফাঁকা স্থান দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের কাছে আসত এবং সেখানে বসে দোয়া করত। একদিন তিনি তাকে দেখে ডাকলেন এবং বললেন, আমি কি তোমাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস শোনাবো না, যা আমি আমার বাবা (হুসাইন) ও দাদার (আলি) কাছ থেকে শুনেছি? তিনি বলেছেন, 'তোমরা আমার কবরকে সমবেত হওয়ার স্থান বানিয়ো না, আর তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানিয়ো না। তোমরা আমার উপর সালাম পাঠ করো। যেখানেই থাকো, তোমাদের সালাম আমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।'[২] এ বর্ণনাতে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, স্বয়ং নবি-পরিবারের লোকজন নিজেরা তো কবর নিয়ে কোনো ধরনের অতিরঞ্জন করতেনই না; বরং অন্য কাউকে দেখলেও বারণ করতেন। আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হলো, আল্লাহর রাসুলের কবরের কাছাকাছি আসা এবং সেখানে বসে দোয়া করা সালাফের চোখে কোনো প্রশংসাযোগ্য আমল ছিল না। কারণ, স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গিয়েছেন, **'তোমরা কবরের উপর বসো না এবং কবরের দিকে ফিরে নামাজ পড়ো না।'**[৩]

আর সম্ভবত এ কারণেই ইমাম মালেক রাহি. মদিনাবাসীর জন্য প্রত্যেক নামাজে মসজিদে আসার সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজার কাছে আসা পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, 'বহিরাগতদের জন্য প্রত্যেকবার মসজিদে আসার সময় কবরে সালাম দেওয়াতে সমস্যা নেই। **কিন্তু মদিনাবাসীর জন্য এর কোনো ভিত্তি নেই। তাই এটা বর্জন করা উত্তম। এই উম্মতের পরবর্তী প্রজন্ম সে পথেই সফল হবে, যে পথে প্রথম প্রজন্ম হয়েছিল; আর তাদের কেউ এমনটি করতেন বলে আমার জানা নেই।**'[৪] বরং ইমাম মালেক 'আমি নবিজির কবর জিয়ারত করেছি'—এমন বক্তব্য

১. ফুতুহুশ শাম, ওয়াকেদি (১/১৬৬)।
২. মুসনাদে আবু ইয়ালা (৪৬৯); মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৭৬২৪)।
৩. মুসলিম (৯৭২); আবু দাউদ (৩২২৯); তিরমিজি (১০৫০)।
৪. শিফা, কাজি ইয়াজ (২/৮৮)।

মাকরুহ আখ্যায়িত করেছেন। কাজি ইয়াজ এর কারণ হিসেবে বলেন, যেহেতু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর থেকে অত্যন্ত সতর্ক করেছেন, এ জন্য 'কবর' শব্দটা উচ্চারণ করা ইমাম মালেক পছন্দ করতেন না। ফলে এর পরিবর্তে 'আমি রাসুলুল্লাহকে জিয়ারত করেছি' বলা মাকরুহ বলতেন না।[১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর জিয়ারত ও কেবল সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রেও যদি এই হয় ইমাম মালেক ও আমাদের প্রথম প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গি, তা হলে রওজার সামনে দাঁড়িয়ে লম্বা সময় কান্নাকাটি করা, রাসুলের কাছে প্রয়োজনের কথা তুলে ধরা এবং সাহায্য প্রার্থনার দৃশ্য দেখলে সালাফ কী বলতেন? এই সেই মদিনার ইমাম মালেক, যার ব্যাপারে বর্ণিত আছে, যখনই তাঁর সামনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারণ করা হতো, তাঁর শরীরের রং বিবর্ণ হয়ে যেত, তিনি এমনভাবে ঝুঁকে যেতেন, যা তাঁর বৈঠকে উপস্থিত মানুষের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ত,[২] যিনি ওজু ছাড়া কখনও হাদিস বর্ণনা করতেন না, হাদিস ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানে কখনও রাস্তায়, দাঁড়িয়ে কিংবা তাড়াহুড়া করে হাদিস বর্ণনা করতেন না, যিনি বার্ধক্য ও শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও মদিনার ভিতরে কখনও কোনো বাহনে চড়তেন না, বলতেন, 'যে মাটিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়ে আছেন, আমি সে মাটির উপরে উঠতে পারি না',[৩] যে মানুষটিকে তিনি এত ভালোবাসেন, তার কবরে প্রত্যেক বেলা মদিনার লোক আসবে সেটা তিনি পছন্দ করতেন না—এটা কী করে সম্ভব? কারণ, তারা তো সেই আলোকিত প্রজন্মের আলোকিত মানুষ, যারা আবেগ ও আনুগত্যের মাঝে ভারসাম্য জানতেন। মনের সামনে দ্বীনকে ভূলুণ্ঠিত হতে দিতেন না।

বারবার রাসুলের কবরের কাছে আসা এবং সেখানে কিছু সময় সালাম ও দোয়া পাঠের প্রতিও যদি মদিনার ইমাম মালেকের এই দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, তা হলে কবরের সামনে দাঁড়িয়ে রাসুলুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া, তাঁর কাছে নিজের প্রয়োজন তুলে ধরা—এগুলোর প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হতো? কেবল ইমাম মালেক নয়, যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সকল কথা শুনতে পেতেন, তাঁকে ডাকা যদি বৈধ হতো, তা হলে সাহাবায়ে কেরাম সবার আগে এই আমল করতেন।

১. প্রাগুক্ত (২/৮৪)।
২. প্রাগুক্ত (২/৪২)।
৩. ওয়াফাইয়াতুল আইয়ান, ইবনে খাল্লিকান (৪/১৩৫-১৩৬)।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরে গোটা জাজিরাতুল আরবে ধর্মত্যাগের তুফান ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গায় মানুষ নিজেদের নবি দাবি করতে থাকে। একের পর এক সম্প্রদায় ইসলাম থেকে বেরিয়ে কুফরের ভিতরে চলে যেতে থাকে। ইসলাম মাত্র কয়েকটি শহরে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এর পর একের পর এক তুফান চলতেই থাকে। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন জটিলতায় জড়িয়ে যায়। তাদের শেষ করার জন্য আদাজল খেয়ে মাঠে নামে শত্রুরা। বারবার আক্রান্ত হয় মক্কা ও মদিনা। মসজিদে নববিতে আজান ও নামাজ বন্ধ থাকে। এত ঝড়-তুফানের ভিতর দিয়ে যাওয়ার পরেও এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, একজন সাহাবি কোনো একদিন মসজিদে নববির কাছে এসে, রওজার সামনে এসে আল্লাহর রাসুলের কাছে তাদের সমস্যার কথা বলেছেন এবং সমাধানের জন্য দোয়া চেয়েছেন। হ্যাঁ, একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যা আমরা পিছনে উল্লেখ করেছি। প্রসিদ্ধ মতে, তিনি একজন সাহাবি বিলাল ইবনে হারিস আল-মুজানি। কিন্তু তিনি উমর, উসমান, আলি, আশারায়ে মুবাশশারাহ, তথা প্রথম সারির সাহাবাদের কেউ নন। ফলে বড় বড় সাহাবির ইজমায়ি আমলের সামনে একজনের এমন আমল খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়, যদিও আমরা এটাকে ছুড়ে ফেলছি না, যা প্রথমেই বর্ণনা করেছি এবং এসব কারণেই আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-সংশ্লিষ্ট বিধানগুলোকে আলাদা করি।

যেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর থেকে এত সতর্কতা, সেখানে সাধারণ মানুষ বা পির-আউলিয়ার কবরের ব্যাপারে তো কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে জীবিত, তাঁর কাছে আমাদের সালাম পৌঁছয়, বরং তিনি আমাদের সালাম শুনতে পান, আমাদের আমলনামা তাঁর কাছে পেশ করা হয়, তা ছাড়া তিনি কিয়ামতের দিন আমাদের জন্য শাফায়াত করবেন—এসব কারণেই একদল মুহাক্কিক তাঁর কাছে শাফায়াত চাওয়া (যা প্রকারান্তরে দোয়া চাওয়া) বৈধ বলেছেন। বিপরীতে সাধারণ মানুষ মৃত্যুর সাথে সাথে দুনিয়ার সঙ্গে তাদের সব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারা কবরে তাদের নিজেদের পরিণতি নিয়ে অস্থির থাকে। অন্যের প্রয়োজন শোনা ও পূর্ণ করার সুযোগ কোথায় তার? **তাই যে নামেই হোক ওলি-আউলিয়া ও পির-মাশায়েখের কবরের কাছে গিয়ে সরাসরি তাদের কাছে প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা করা, কিংবা তারা উপকার করতে পারেন—এ ধরনের বিশ্বাস রেখে তাদের কাছে দোয়া করা শিরক। দূর থেকে মৃত ব্যক্তিকে ডাকাও শিরক। আর কবরের কাছে গিয়ে স্রেফ দোয়া চাওয়াও অনুচিত। কারণ**

তারা জীবিতদের ডাক শোনে না; আর শুনলেও সেটার হাকিকত আমাদের অজানা। কিন্তু তাদের উসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করা বৈধ, যা পিছনে উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

---

১. শাইখ জফর আহমদ উসমানি রাহি. মাকালাতে উসমানিতেও তথাকথিত 'ইস্তিআনাহ', 'ইস্তিমদাদ', 'নিদা' ইত্যাদি নাম দিয়ে মৃত মানুষের কাছে বৃষ্টি, পানি, সন্তান, সুস্থতা ইত্যাদি প্রার্থনাকে শিরক ফাতাওয়া দিয়েছেন। কিন্তু সাধারণ তাওয়াসসুল তথা আল্লাহর কাছে কারও উসিলা দিয়ে প্রার্থনা করা বৈধ। কারণ, এখানে মূল প্রার্থনা মানুষ নয়, বরং আল্লাহর কাছে করা হচ্ছে (২/২৮৫-৩০৯)। মোট কথা, দোয়া কার কাছে করা হচ্ছে এটা গুরুত্বপূর্ণ এবং বৈধ-অবৈধের মাপকাঠি। দোয়া সরাসরি আল্লাহর কাছে করা হলে এরপর তাওয়াসসুল, ইস্তিআনা-সহ সেগুলোকে কী নামে অভিহিত করা হবে সেটা গৌণ বিষয়। কিন্তু মূল দোয়া ও প্রার্থনা আল্লাহ বাদ দিয়ে অন্য কারও কাছে করা হারাম এবং ক্ষেত্রবিশেষে শিরক।

প্রশ্ন হতে পারে, তা হলে আকাবিরে দেওবন্দ যে বড়দের কবর থেকে রুহানি ফয়েজ লাভ করার কথা বলেন, সেটা কীসের ভিত্তিতে বৈধ বলেন? সেটাও তো হারাম, বরং শিরক হওয়ার কথা? বাস্তবতা হলো, যারা আপত্তি করেন, তারা ফয়েজের অর্থই বোঝেননি; তারা ফয়জকে ইস্তিগাসা কিংবা মৃতের কাছে চাওয়া মনে করেছেন। অথচ ফয়েজ বলতে আকাবিরের উদ্দেশ্য স্রেফ রুহানি তুমানিনাহ ও সুকুন এবং তাও অনেক শর্তযুক্ত। মৃতদের ডাকার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। [আল-মাতালিবুল আলিয়াহ, ফখরুদ্দিন রাজি ৭/২৭৬-২৭৭] জফর আহমদ উসমানি লিখেন, 'আমাদের কাছে মৃত ওলি থেকে ফয়েজ গ্রহণ জায়েজ। কিন্তু সেটা অনেকগুলো শর্তসাপেক্ষ এবং যারা এটা প্রাপ্তির উপযুক্ত, তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিপরীতে মৃতকে প্রয়োজন পূর্ণকারী মনে করা, কিংবা কবরের কাছে বা দূরে থেকে কাউকে ডেকে বলা—'আমার কাজটি করে দিন'—আমাদের কাছে মোটেই বৈধ নয়।' (মাকালাতে উসমানি ২/৩০৩)

অধম ব্যক্তিগতভাবে এসব বিষয়ের মাঝে প্রবেশকে উত্তম মনে করে না। কারণ, শর্তসাপেক্ষে বৈধ বলা হলেও এ ধরনের পরিভাষা কিংবা কর্ম সালাফ থেকে প্রমাণিত নয়। অথচ সালাফ যা করেননি, তার মাঝে কল্যাণ থাকতে পারে না; আবার যা কল্যাণকর, সালাফ সেগুলো বাদ দিতে পারেন না; কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের ব্যাপারে যে পরিমাণ সতর্ক করেছেন, অন্য কিছু থেকে সম্ভবত এত সতর্ক করেননি। ফলে কবরকেন্দ্রিক যেকোনো বিষয় থেকে যত দূরে থাকা যায়, তত উত্তম। কাশ্মীরি রাহি.-কে একবার শাইখ মিরাঠি রাহি. ফয়েজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'মুহাদ্দিসগণ এটাকে জায়েজ বলেন না। কিন্তু আহলে হাকায়েক হজরতগণ এটা করেন বিধায় আমি জায়েজ বলি....' (ফয়জুল বারি ৩/৫৮৬, ৪/১৮৮)। শাইখ মিরাঠি লিখেন, কারণ তিনি আহলে হাকায়েক (তথা তাসাওউফপন্থি বুজুর্গ আলিমদের) প্রতি সুধারণা রাখতেন। ফলে কোথাও তাদের মাঝে আর শরিয়তের মাঝে বাহ্যত সংঘাত দেখলে তিনি নীরব থাকতেন... (ফয়জুল বারি ৪/১৮৮)। কাশ্মীরি রাহি.-এর মানহাজে সুস্পষ্ট যে, সালাফ ও মুহাদ্দিসদের কাছে এটা বৈধ নয়। তিনি কেবল বুজুর্গদের প্রতি সুধারণাবশত বৈধ মনে করতেন। এখন যেহেতু সেই যুগও নেই, সেসব বড় ব্যক্তিত্বও নেই, তাই এগুলো জিইয়ে না রাখাই উত্তম। তবে সাকুল্যে এটা বৈধ-অবৈধের মাসআলা, শিরক ও কবর-পূজা নয়।

হজরত থানভি রাহি.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, মুরাকাবার সময় পিরের হৃদয় থেকে ফয়েজের ধ্যান করলে সেটার বিধান কী? তিনি বলেন, 'যদি মাবুদ হিসেবে তার দিকে তাওয়াজজুহ করে, তবে শিরক। একইভাবে যদি মনে করে পির তার ব্যাপারে সবকিছু জানে, সেটাও শিরক। আর যদি মনে করে আল্লাহর জানানোর ভিত্তিতে জানে, তবে শিরক না হলেও যেহেতু পিরের জানার কোনো দলিল নেই, তাই অবৈধ এবং শিরকের কাছাকাছি। আর যদি অন্য সকল আকিদা ব্যতিরেকে তাওয়াজজুহকে স্রেফ ফয়েজের কারণ মনে করে, তবে বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য এটা শর্তসাপেক্ষে বৈধ বলা গেলেও **আম মানুষদের জন্য বরবাদির সূচনা** (ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/৩৮৮)। হজরত গাঙ্গুহি লিখেছেন, ওলিদের মাজার থেকে ফয়েজ কামেল ব্যক্তিদের অর্জিত হতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষদের এগুলো বলা কুফর ও শিরকের দরজা খুলে দেওয়ার নামান্তর (ফাতাওয়ায়ে রশিদিয়া ২৪৫)। মুফতি রশিদ আহমদ লুধিয়ানভি রাহি. লিখেন, তাসাউরে শাইখ (পিরের ধ্যান) এবং ওলিদের কবর থেকে ইসতিফাদা (ফয়েজ) ফি নাফসিহি বৈধ হলেও নিষেধ করা উচিত। কারণ, এগুলো শিরকের দরজা খুলে দেয়। সুতরাং কেউ যদি এগুলোর বিরোধিতা করে, তবে তার বিরোধিতা সঠিক (আহসানুল ফাতাওয়া ৯/২৮-২৯)।

সন্দেহের অপনোদন: কেউ কেউ শহিদদের জীবিত থাকার দলিলগুলো দিয়ে সাধারণ মৃতদের কাছেও দোয়া ও প্রার্থনাকে জায়েজ বলতে চান; অথচ এটা ভুল। কারণ, শহিদদের জীবিত থাকা তাদের জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা অন্যদের নেই। উপরন্তু তাদের জীবন দুনিয়ার জীবনের মতো নয়, বারজাখি জীবন। ফলে তাদের কাছে কিছু চাওয়া বৈধ নয়। অনেকে রাসুলুল্লাহ ও ওলিদের কাছে প্রার্থনা বৈধতার যুক্তি হিসেবে দেখান যে, তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা; সুতরাং তাদের মাধ্যমে দোয়া করালে সেটা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। নিঃসন্দেহে এই যুক্তি ফেলে দেবার মতো নয়। কিন্তু সেটা তো মৃত মানুষের জন্য প্রযোজ্য নয়। আপনি জীবিত পুণ্যবান ওলিদের কাছে যান, তাদের কাছে দোয়া চান। এটা ইসলামে সর্বসম্মতভাবে বৈধ। কিন্তু ওলিদের নাম করে মৃত মানুষের কাছে এমন জিনিস চাওয়া, যা কেবল আল্লাহর কাছে চাওয়া যায়, এটা কুরআন-সুন্নাহর কোন দলিলে বৈধ হয়? হ্যাঁ, দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা অথবা বর্ণনা দ্বারা এর দলিল দেওয়া যাবে। কুরআন-সুন্নাহর জোড়াতালি দিয়ে যেকোনো অবৈধ বিষয়কে বৈধ বানানো যাবে। তাই এটা ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মাজহাব। আহলে সুন্নাতের মানহাজ হলো, সকল আয়াত ও হাদিস একত্র করে সে আলোকে ফয়সালা দেওয়া। দু-একটা অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থক বর্ণনার বিপরীতে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা অসংখ্য আয়াতে মানুষকে তাঁর কাছে দোয়া করার জন্য আহ্বান করেছেন; অন্যের কাছে কিছু চাইতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَإِنِّىْ قَرِيْبٌ ۖ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.

অর্থ: 'যখন আমার বান্দারা আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলুন, আমি কাছেই আছি। আমাকে যখন কেউ ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই।' [বাকারা: ১৮৬] অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ إِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

অর্থ: 'তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ডাকো কাকুতি-মিনতি সহকারে ও সংগোপনে।' [আরাফ: ৫৫] আরেক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا.

অর্থ: 'আর আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম; তোমরা সেসব নামে তাকে ডাকো।' [আরাফ: ১৮০] অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ

অর্থ: 'আর আপনার পালনকর্তা বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।' [গাফের: ৬০] অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا یَنْفَعُنَا وَلَا یَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلٰۤی اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا.

অর্থ: 'আপনি বলুন, আমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুকে ডাকব যা আমাদের কোনো উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে না? আর আল্লাহ তায়ালা আমাদের হিদায়াত দান করার পরে আমরা কি আমাদের পশ্চাতে ফিরে যাব?' [আনআম: ৭১] আরেকটি আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا یَنْفَعُكَ وَلَا یَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِیْنَ.

অর্থ: 'আর আপনি আল্লাহ ছাড়া এমন কাউকে ডাকবেন না যে আপনার কোনো উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে না। যদি আপনি তা করেন, তবে জালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হবেন।' [ইউনুস: ১০৬] আরেকটি আয়াতে আল্লাহ বলেন,

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ وَالَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا یَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِیْرٍ. اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا یَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ؕ وَیَوْمَ الْقِیٰمَةِ یَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ؕ وَلَا یُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِیْرٍ.

অর্থ: 'তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই। তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদের ডাকো, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটিরও অধিকারী নয়। তোমরা তাদের ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শোনে না; শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শিরককে অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞ আল্লাহর মতো আপনাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না।' [ফাতির: ১৩-১৪]

কেউ বলতে পারেন, এসব আয়াত এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কেননা যারা 'ইস্তিগাসা' বৈধ হওয়ার পক্ষে, তারা সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা ওলিদের ডাকার কথা বলছেন না। কারণ, সেটা তো স্পষ্ট শিরক; বরং তারা কেবল তাদের উসিলা দিয়ে আল্লাহকে ডাকছেন যাতে করে আল্লাহ তাদের উসিলায় দোয়া কবুল করেন। সুতরাং শিরক-সম্পর্কিত আয়াতগুলো এখানে আনা উচিত নয়। আমরা বলব, উসিলা দিয়ে দোয়া করার নাম 'তাওয়াসসুল' এবং একটু আগে এটার উপর সবিস্তার আলোচনা

করা হয়েছে। এখানে উসিলা দিয়ে দোয়া নয়, বরং সরাসরি ব্যক্তির কাছে চাওয়া হচ্ছে। কেউ বলতে পারেন, কোনো মুসলমানের পক্ষে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে কি প্রার্থনা করা সম্ভব? আমরা বলব, হ্যাঁ, সম্ভব। একজন সচেতন মুসলমান কিংবা আলিম হয়তো অবিচল থাকবেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ যখন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকে, তখন তার ভিতরে অতিমানবিক কোনোকিছু বিশ্বাস করেই ডাকে। নতুবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মধ্যস্থ কেন বানাবে? হাদিসে যেখানে এসেছে, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির উপর অসন্তুষ্ট হন যে তার কাছে না চায়'[১], সেখানে আল্লাহকে ছেড়ে ফেরেশতা বা ওলিদের কাছে চাইতে হবে কেন? হ্যাঁ, যদি কেউ প্রকৃত অর্থেই ওলিদের স্রেফ উসিলা ধরে আল্লাহর কাছে চায়, সেটা ভিন্ন ব্যাপার।

শেষ কথা: সবশেষে আরজ করতে চাই, যদি রাসুলুল্লাহর **রওজার কাছে উপস্থিত হয়ে** শাফায়াত ও দোয়া চাওয়া—চাই সেটাকে ইস্তিশফা' কিংবা ইস্তিগাসা যে নামেই ডাকা হোক—দলিলের ভিত্তিতে এবং কিছু শর্তসাপেক্ষে বৈধ মেনে নেওয়া হয়[২], তবুও এই পথ নিঃসন্দেহে কন্টকাকীর্ণ, বড় পিচ্ছিল। তারা জায়েজ হবার যেসব শর্ত উল্লেখ করেছেন, সেগুলো সাধারণ মানুষের মাঝে খুঁজে পাওয়া দুস্কর। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন—এ ধরনের বিশ্বাসকে হানাফি উলামায়ে কেরাম সুস্পষ্ট কুফর ফাতাওয়া দিয়েছেন।[৩] কিন্তু পরবর্তী সময়ে এ ব্যাপারে শিথিলতাই উম্মাহর সামনে শিরক ও হাজারও কুসংস্কারের দুয়ার খুলে দিয়েছে। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার পরিবর্তে মুসলমানদের 'মদদ ইয়া আলি', 'মদদ ইয়া হুসাইন', 'মদদ ইয়া আবদুল কাদের জিলানি'তে ব্যস্ত করে দিয়েছে। মুসলমানদের বিশ্বাস করিয়েছে, নবিজি যেহেতু কবরে জীবিত এবং উম্মাহর কথা শোনেন, তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেন, তাই অসম্ভব নয় যে, সময়ে সময়ে তিনি কবর থেকে বের হয়ে প্রিয়জনদের অনুষ্ঠানে মিলাদে ওরসে সশরীরে হাজির হন। আজ মুসলিম উম্মাহ কবর এবং বিভ্রান্ত ওলি-আউলিয়া-কেন্দ্রিক যে অন্ধকারে ডুবে আছে, এর অন্যতম কারণ এই দরজাগুলো খুলে রাখা। কারণ, যারা কবরে-মাজারে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে বিভিন্ন ইবাদত করছে, সিজদা

---

১. তিরমিজি (৩৩৭৩)।
২. দূর থেকে নয়। শাইখ জফর আহমদ উসমানি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে তার কাছে কিছু বলাকে ইসলামের মৌলিক আকিদা ও উসুলের খেলাফ মনে করেন (দেখুন: মাকালাতে উসমানি ২/২৯৪)। মুফতি মাহমুদ হাসান গঙ্গুহি রাহি. দূর থেকে রাসুলুল্লাহকে ডাকা এবং তিনি সেই ডাক শোনেন ও সাড়া দেনড় এমন বিশ্বাসকে কুফর বলেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে যদি এটা কুফর/শিরক হয়, অন্যদের ক্ষেত্রে কী হবে তা সহজেই অনুমেয়। (ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়াহ ১/৩৪৭)।
৩. শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (৪২২); আহসানুল ফাতাওয়া (১/৩৬)!

দিচ্ছে, প্রার্থনা করছে, তাদের মাঝে কবরের মৃতকে কেবল উসিলা মনে করে প্রকৃত অর্থে আল্লাহর কাছে চাচ্ছে—এমন লোক বিরল; বরং তারা মূলত মৃতের ব্যাপারে অতিমানবিক এমন কিছু বিষয়ে বিশ্বাসী, যা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ব্যাপারে বিশ্বাস করা কুফর। ফলে ওখানে যা হচ্ছে, তার অধিকাংশই শিরকে আকবরে রূপান্তরিত হতে পারে, যেগুলো মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এগুলো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বৈধ বানানোর কোনো সুযোগ নেই।[১]

উপরে যেমনটা বলা হয়েছে, **'মৃত ব্যক্তি প্রয়োজন পূর্ণ করতে সক্ষম'—এমন বিশ্বাস রেখে সরাসরি তার কাছে প্রয়োজন পেশ করা এবং সেটা পূর্ণ করার জন্য প্রার্থনা করা সুস্পষ্ট হারাম এবং সর্বসম্মত শিরক। আর যদি আল্লাহকেই একমাত্র প্রয়োজন পূর্ণকারী বিশ্বাস করে মৃত ব্যক্তির কাছে স্রেফ দোয়া চাওয়া হয়, যেমন: 'আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন....' (যা কবরের কাছে হলে প্রকারান্তরে তাওয়াসসুল), তবে সেটা মতভেদপূর্ণ, যেমন মতভেদ তাওয়াসসুলের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। একদল আলিম অবৈধ বলেন, অন্য আলিমগণ বৈধ বলেন। দূরে থেকে ডাকলে এটাও হারাম ও শিরক।**[২] ফলে হুকুম আরোপের সময় এগুলোর পার্থক্য মনে রাখা চাই। আবার জীবিত-মৃত এসব ফারাক ও এর ফলাফলও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা চাই। অনেক আলিম সবগুলোকে স্রেফ বিদআত বলেছেন। অথচ তাতে ইনকারুল মুনকারের হক আদায় হয় না। কারণ, এগুলোকে পাইকারিভাবে বিদআত বললে হালকা করে দেখানো হয়। প্রথমটা তো সুস্পষ্ট শিরক। হ্যাঁ, ব্যক্তিবিশেষকে মুশরিক বলা থেকে বিরত থাকা এক বিষয় এবং পাইকারি হারে সবকিছুকে শিরক বলাও প্রান্তিকতা। কিন্তু কোনো পাপ যদি শিরকের পর্যায়ে হয়, তবে সেটাকে স্রেফ বিদআত বলা যথাযথ নয়। ফলে মুহাক্কিক আলিমগণ এগুলোর কোনোটাকে যেমন হারাম ও অবৈধ বলেছেন, অনেকগুলোকে সুস্পষ্ট কুফরও বলেছেন। তাই সেভাবেই বলতে হবে।

• শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি লিখেন, যদি কোনো ব্যক্তি আজমির কিংবা সালার মাসউদ বা অন্য মাশাইখের কবরের কাছে প্রয়োজন পেশ করার জন্য যায়, তবে সেটা হত্যা ও ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক পর্যায়ের গুনাহ। এটা প্রকারান্তরে লাত-উজ্জাকে পূজা দেওয়ার মতোই। হ্যাঁ, আমি ব্যক্তিবিশেষকে কাফের বলি না।[৩]

---

১. ইমদাদুল আহকাম (১/১১৩); যুগে যুগে কীভাবে মুসলিমরা এক্ষেত্রে অতিরঞ্জনের শিকার হয়ে কবর-পূজায় লিপ্ত হয়েছে তা দেখতে: আল-ইস্তিগাসা ফির রাদ্দি আলাল বাকরি (৩০৭-৩১০)।

২. শাওয়াহিদুল হক, নাবহানি (১১৮)।

৩. আত-তাফহিমাতুল ইলাহিয়্যাহ (২/৪৫)।

• দামাদ আফেন্দি লিখেন, যদি কেউ মনে করে (মৃত) মাশাইখের রুহ সর্বত্র উপস্থিত এবং তারা সবকিছু জানে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে।[১]

• রদ্দুল মুহতারে এসেছে, আল্লাহর পরিবর্তে কোনো মৃতের ব্যাপারে এই ধারণা রাখা যে, সে যা ইচ্ছা করতে পারে, কুফর।[২]

• আলুসি লিখেন, বর্তমানে মানুষ আল্লাহর পরিবর্তে জীবিত ও মৃত মাশাইখকে ডাকার মাঝে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। যেমন: 'হে সাইয়েদ অমুক, আমাকে রক্ষা করুন।' কোনো মুসলিমের জন্য এ-জাতীয় কথা বলা উচিত নয়। অনেক আলেমের কাছে এটা শিরক; শিরক না হলেও শিরকের মতোই। কারণ, এগুলো যারা করে, তারা সেই মৃতের ব্যাপারে জীবিত হওয়া, সবকিছু শোনা, জানা এবং উপকার-অপকার করতে পারার ক্ষমতার বিশ্বাসের কারণেই করে। তারা এমন বিশ্বাস না রাখলে আল্লাহ ছাড়া তাকে ডাকত না; অথচ এটা ভীষণ ভয়ংকর ব্যাপার।[৩]

• শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভি লিখেছেন, তারা কবরের কাছে গিয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা, আদব ও খুশুর ক্ষেত্রে যতটা বাড়াবাড়ি করে, যতটা অতিরঞ্জনের সঙ্গে নিজেদের অক্ষমতা পেশ করে, আল্লাহর ঘর মসজিদেও কখনও তেমন করতে দেখা যায় না। তাদের কাছে কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করা, তাতে বাতি জ্বালানো, ইতিকাফ করা, আগরবাতি ও সুগন্ধি দেওয়া, কবর পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার যত গুরুত্ব, আল্লাহর ঘর মসজিদের প্রতি সে তুলনায় বিন্দুমাত্র গুরুত্বও নেই।[৪] তিনি অন্যত্র লিখেন, **সুতরাং আল্লাহর ওলিদের কাছে গিয়ে নিজেদের প্রয়োজন পূরণের দোয়া করা, তাদের ডাকা, প্রার্থনার জন্য তাদের কবরের কাছে যাওয়া মূলত তাদের ইবাদত করা**। যদিও তারা দাবি করে যে, আমরা তো স্রেফ কবর জিয়ারত করি, ইবাদত করি না। কিন্তু এগুলো তাদের বাহানা।[৫]

• শাহ আবদুল আজিজ দেহলভি লিখেছেন, সন্তান ও সুস্থতা ইত্যাদি যা আল্লাহ ছাড়া কেউ দিতে পারে না, সেগুলো অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে চাওয়া হারাম; বরং কুফর। যদি কোনো মুসলমান জীবিত অথবা মৃত ওলির কাছে এ-জাতীয়

---

১. মাজমাউল আনহুর (১/৬৯১)।
২. রদ্দুল মুহতার (২/৪৩৯)।
৩. রুহুল মাআনি (৩/২৯৭-২৯৮)।
৪. আল-বালাগুল মুবিন (উর্দু) (৫২)।
৫. আল-বালাগুল মুবিন (উর্দু) (৬০)।

প্রার্থনা করে, তবে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে।[১] সুতরাং যেকোনো মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে উপকার-অপকার, দোয়া কবুল, সাহায্য-সহযোগিতা-সহ এ ধরনের সকল বিশ্বাস শিরক।[২]

- হজরত গাঙ্গুহিও এগুলো করতে নিষেধ করেছেন।[৩]

তাই যত দ্রুত এসব দরজা বন্ধ করা যাবে, মুসলিম উম্মাহ তত দ্রুত কুফর ও শিরকের অন্ধকার থেকে মুক্তি পাবে। ফিরে যাবে সেই বিশুদ্ধ তাওহিদের আলোর রাজপথে, যেখানে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তাদের ছেড়ে গিয়েছিলেন।

তিন. নবি-রাসুল ও ওলিদের বরকতগ্রহণ (তাবাররুক): এটাও ইমাম তহাবি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-সংশ্লিষ্ট আকিদার আলোচনা এই মাসআলা উল্লেখ ছাড়া পূর্ণতা পায় না। কারণ, এটা সেই মাসআলা যাকে কেন্দ্র করে উম্মাহ শতাব্দের পর শতাব্দ বিতর্ক ও বাদানুবাদে জড়িয়েছে। একদল আরেক দলকে মুশরিক, বিদআতি ও ভ্রান্ত বানিয়েছে। সেই অস্থিরতা আজও চলমান। তাই বিষয়টির সুরাহায় সংক্ষেপে কিছু কথা বলা আবশ্যক মনে করছি।

প্রথমে **তাবাররুক-এর অর্থ** জেনে নেওয়া আবশ্যক। আরবি শব্দ 'তাবাররুক' বারাকাহ থেকে উৎসারিত। এর অর্থ প্রাচুর্য, সমৃদ্ধি, পবিত্রতা ইত্যাদি। এটা দুই ধরনের হতে পারে। এক হলো অশরীরী ও বিমূর্ত বরকত। যেমন: কুরআনকে আল্লাহ তায়ালা كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ বরকতময় গ্রন্থ বলেছেন [আনআম: ১৫৫]। কারণ, এর মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষ অন্ধকার থেকে আলোর পথে এসেছে, হিদায়াত পেয়েছে, দুনিয়া ও আখিরাতের সমৃদ্ধি লাভ করেছে। একইভাবে কোনো ব্যক্তি বরকতময় মানে তার মাধ্যমে মানুষ বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়। যেমন: উসাইদ ইবনে হুজাইর রাজি. সাইয়েদুনা আবু বকরের পরিবারকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, এটাই আপনাদের পরিবারের প্রথম বরকত নয়, হে আবু বকর।[৪] কারণ ইসলাম ও সাহাবায়ে কেরাম আবু

১. ফাতাওয়ায়ে আজিজি সূত্রে ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া (টীকা ১/৩৪৯)।
২. ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া (১/৩৫০); আরও দেখুন: ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া (১/৪৪)।
৩. ফাতাওয়ায়ে রশিদিয়া (১৭৪)।
৪. বুখারি (৩৩৪); মুসলিম (৩৬৭)।

বকর ও তার পরিবারের মাধ্যমে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়েছেন। এই অশরীরী বরকত গ্রহণও (তাবাররুক) করতে হয় অশরীরীভাবে। যেমন: কুরআন দ্বারা বরকত নেওয়ার অর্থ হচ্ছে কুরআন পড়ে পুণ্য লাভ করা। কাবাঘর দ্বারা বরকত নেওয়ার অর্থ হচ্ছে সেখানে গিয়ে ইবাদত করা। লাইলাতুল কদর দ্বারা বরকত লাভ করার অর্থ হলো এ রাতে ইবাদত করা। সাহরি খাওয়ার মাধ্যমে বরকত লাভ করার মানে হলো সাহরি খেয়ে পুণ্য লাভ করা। আরেক প্রকারের বরকত হচ্ছে শরীরী বরকত; অর্থাৎ বাস্তবিকপক্ষেই কোনো জিনিস বেড়ে যাওয়া, সমৃদ্ধ হওয়া। এটা নবি-রাসুলের হাতে প্রকাশিত মুজিজা এবং পুণ্যবানদের হাতে প্রকাশিত কারামতের অংশ। যেমন: শুষ্কপ্রায় কূপ পানিতে ভরে যাওয়া, একজনের খাবার অসংখ্য মানুষের জন্য যথেষ্ট হওয়া ইত্যাদি। এই বরকত গ্রহণও করতে হয় শারীরিকভাবে। ফলে এই বরকত বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের সকল ধারার আলিম একমত থাকলেও এটা যাদের হাতে প্রকাশিত হয়, সেই পুণ্যবান ব্যক্তিদের থেকে (তাবাররুক) গ্রহণের ক্ষেত্রে আলিমদের প্রচণ্ড মতভেদ রয়েছে।

তাবাররুক নাকচকারীদের মত: একদল আলিমের মতে, তাবাররুক তথা বরকতগ্রহণ রাসুলুল্লাহর মাঝে সীমাবদ্ধ। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মানুষের আর তাঁর জীবদ্দশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বস্তু ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর বরকত গ্রহণ বৈধ নয়। এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওজুর পানি, তাঁর চুল, ঘাম ইত্যাদি থেকে বরকত গ্রহণ করলেও তাঁর জীবদ্দশায় কিংবা তাঁর ওফাতের পরে অন্য কারও কিংবা (তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন) কিছুর বরকত নেননি। বোঝা গেল, তারা জানতেন যে, এটা রাসুলুল্লাহর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ফলে বড় বড় ও বুজুর্গ সাহাবা, যেমন: চার খলিফা, আশারায়ে মুবাশশারা (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবা), আহলে বদর-সহ কোনো সাহাবির কেউ বরকত নেননি। পাশাপাশি রাসুলের ওফাতের কিছুকাল পরে (যখন তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছু শেষ হয়ে গেছে তখন) তাঁর দ্বারা বরকত গ্রহণের পথও বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে আজ কোনো প্রকারের বস্তুগত (শরীরী) বরকত গ্রহণের পদ্ধতি অবশিষ্ট নেই—না রাসুলুল্লাহর কবর দ্বারা বরকত নেওয়া যাবে, আর না সালেহিন তথা পুণ্যবান ব্যক্তি ওলি-আউলিয়াদের বরকত নেওয়া যাবে। বরং এগুলো সব বিদআত ও শিরকে আসগর (তথা ছোট শিরক) হিসেবে গণ্য হবে। তাই মুসলমানদের এই ধরনের বরকত গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ, এটা মানুষকে শিরক ও গাইরুল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়।

এই ধারার আলিমদের কাছে বরকত কিংবা সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের চারপাশে যা-কিছু করা হবে, সব বিদআত। যেমন: রাসুলুল্লাহর কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা, কিংবা তাঁর কবরের দিকে দৃষ্টি দেওয়াকে বরকতময় মনে করা, কবরের পাশে অতিরিক্ত পুণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় করা, সেখানে দোয়া কবুল হওয়ার বেশি সম্ভাবনা আছে—এই বিশ্বাস রেখে দোয়া করা, একইভাবে রাসুলের কবরের দিকে ফিরে দোয়া করা, কবরের পাশে বসা, বরকতের আশায় দীর্ঘক্ষণ সেখানে সময় কাটানো, কবরের পাশে কুরআন তিলাওয়াত করা, আল্লাহর জিকির করা, তাওবা নবায়ন করা, কবরের দেওয়াল স্পর্শ করা, চুমু দেওয়া ইত্যাদি। একইভাবে মক্কা ও মদিনায় রাসুলুল্লাহর স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন স্থান, স্থাপত্য, পাহাড়, কূপ, ময়দান ইত্যাদি বরকতময় মনে করে সেগুলো জিয়ারত করা অথবা সেখানে বরকতের উদ্দেশ্যে বিশেষ কোনো ইবাদত করা (যা রাসুলুল্লাহ করেননি), বরকতের উদ্দেশ্যে সেগুলো স্পর্শ করা বা চুমু দেওয়া বিদআত। তেমনইভাবে রাসুলুল্লাহর পদচিহ্ন—যা বিভিন্ন দেশে দেখা যায় এবং তাঁর পদচিহ্ন বলে প্রচার করা হয়—দেখে, স্পর্শ করে, চুমু দিয়ে, সেগুলোর পাশে বিশেষ কোনো দোয়া বা ইবাদতের মাধ্যমে বরকত নেওয়া নিকৃষ্ট বিদআত। কারণ, সেগুলো রাসুলুল্লাহর পদচিহ্ন হিসেবে প্রমাণিত নয়; আর প্রমাণিত হলেও বিদআত হতো। কারণ, সাহাবারা এগুলোর মাধ্যমে বরকত নেননি।

তাদের মতে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কারও বরকতগ্রহণ—যেমনটা উপরে বলা হয়েছে—একেবারেই বৈধ নয়। কারণ, এটা রাসুলুল্লাহর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বরং যে ব্যক্তি ওলি-আউলিয়ার কাছ থেকে বরকত নিল, সে মূলত আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা করল, আল্লাহর রাসুলের মর্যাদাকে খাটো করল। কারণ, যে বিষয়টি আল্লাহ তাঁর রাসুলের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সে তাতে অন্যকে শরিক করল এবং তাঁর স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট করল। এভাবে সাধারণ মানুষের বরকত নিলে আল্লাহর রাসুলের হক নষ্ট করা হয় এবং পাশাপাশি এটা তার হৃদয়ে রাসুলুল্লাহর ভালোবাসার অনুপস্থিতি কিংবা দুর্বলতার প্রমাণ। সুতরাং বরকতের উদ্দেশ্যে বুজুর্গদের স্পর্শ করা, তাদের পরিহিত কাপড় পরিধান করা, কিংবা তাদের পাত্রে অবশিষ্ট খাবার বা পানি পান করা, কারও কবর স্পর্শ করা, চুমু দেওয়া, অধিক পুণ্যের আশায় তাদের কবরের পাশে নামাজ, জিকির ও অন্যান্য ইবাদত করা ইত্যাদি সবকিছু বিদআত। ব্যক্তির বাইরে বিশেষ কোনো কাল

কিংবা পাত্র ইত্যাদি থেকেও বরকতগ্রহণ নিষিদ্ধ। সুতরাং নবি-রাসুলদের স্মৃতিবিজড়িত স্থান বরকতের উদ্দেশ্যে জিয়ারত করা এবং সেখানে বিশেষ ধরনের কোনো ইবাদত করা বৈধ নয়। একইভাবে বিশেষ দিন কিংবা রাতে বরকতলাভের উদ্দেশ্যে এমন কোনো ইবাদত করা যা শরিয়তে বর্ণিত হয়নি, সেটাও বিদআত হিসেবে গণ্য হবে। এমনকি যেখানে বরকতলাভ প্রমাণিত, সেটাও যদি সঠিক পদ্ধতিতে না হয়, তাও বিদআত হিসেবে গণ্য হবে। যেমন: আল্লাহর ঘর বরকতময়; কিন্তু সেখানের বরকত অর্জিত হবে শরিয়তসম্মত পন্থায় ইবাদতের মাধ্যমে। হজরে আসওয়াদ চুমু দিয়ে বরকত নেওয়া যাবে, কারণ তা ইবাদত। কাবার রুকনে ইয়ামানি কর্নার স্পর্শ করা যাবে, কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। কিন্তু এর বাইরে কেউ যদি কাবার দরজা বা গিলাফ বরকতের উদ্দেশ্যে স্পর্শ করে কিংবা চুম্বন করে, তা হলে তা বিদআত হিসেবে গণ্য হবে। কারণ, শরিয়তে এগুলো অনুপস্থিত। এক কথায়, শরিয়তে যেগুলো ইবাদত হিসেবে প্রমাণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন, সেগুলো করা যাবে এবং ইবাদত হিসেবে সেগুলো বরকতময় হবে। শরিয়তে যা ইবাদত নয়, সেগুলো করা যাবে না। ফলে হজরে আসওয়াদ চুম্বন বরকত নয়; মূলত ইবাদতের উদ্দেশ্যে করা হবে। যদি এটা শরিয়তে না থাকত, তবে সেটা চুম্বন করাও বিদআত গণ্য হতো। এ কারণেই উমর রাজি. হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করে বললেন, 'আমি জানি তুমি স্রেফ একটা পাথর; কোনো উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারো না। ফলে যদি আল্লাহর রাসুলকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তবে তোমাকে কখনোই চুম্বন করতাম না।'[১]

এ কারণেই রাসুলুল্লাহর কাছে সাহাবাদের একটি দল যখন বলেছিল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, তাদের যেমন 'জাত আনওয়াত' আছে, আমাদের জন্য এমন একটি 'জাত আনওয়াত' নির্ধারণ করে দিন। এটা মূলত একটা বৃক্ষ ছিল, কাফেররা এর চারপাশে সমবেত হতো, বিভিন্ন ধরনের ইবাদত-উৎসব করত, অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথা শুনে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'আল্লাহু আকবার। এটা তো সেই পূর্ববর্তী কাফেরদের রীতি। তোমরা তো সেভাবে চাচ্ছ যেভাবে বনি ইসরাইল মুসার কাছে চেয়েছিল (আল্লাহর বাণী): হে মুসা, আমাদের জন্য একজন ইলাহ (মূর্তি) নির্ধারণ করে দিন যেভাবে তাদের অনেক ইলাহ (মূর্তি) আছে। মুসা বললেন, নিশ্চয়ই তোমরা জাহেল সম্প্রদায়।' [আরাফ: ১৩৮] এরপর

১. বুখারি (১৬১০); মুসলিম (১২৭০)।

রাসুলুল্লাহ বললেন, 'আল্লাহর শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই তোমরা পূর্ববর্তী লোকদের বিভিন্ন রীতি অনুসরণ করবে।'[১]

কিন্তু এসব বক্তব্য কতটুকু সঠিক? নিচে আলোচনা করা হচ্ছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তাবাররুক: উপরে উল্লিখিত বেশ কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাতের সকল ধারার আলিম একমত। যেমন: রাসুলুল্লাহর সত্তা কিংবা তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে বরকত গ্রহণ করা। এর বৈধতার ব্যাপারে সকল আলেম একমত। কারণ, অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদিসে সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক রাসুলুল্লাহর কাছ থেকে বরকত গ্রহণের বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটা উদাহরণ উল্লেখ করা হচ্ছে:

- বদর প্রাঙ্গণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের যুদ্ধের সারি প্রস্তুত করছিলেন। আনসারি সাহাবি সাওয়াদ ইবনে গাজিয়্যাহ কাতারে একটু বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতে থাকা লাঠি দিয়ে সাওয়াদের পেটে গুঁতা দিয়ে বললেন, সাওয়াদ, সোজা হয়ে দাঁড়াও। সাহাবি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি আমাকে আঘাত করেছেন। আমি এর প্রতিশোধ নিতে চাই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পেট উন্মুক্ত করে দিয়ে বললেন, নাও, প্রতিশোধ গ্রহণ করো। সাওয়াদ আল্লাহর রাসুলকে জড়িয়ে ধরে তাঁর পেটে চুম্বন এঁকে দিলেন। রাসুল বললেন, এমন কেন করলে? সাওয়াদ রাজি. বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, দুশমনের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, হয়তো মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাব না। তাই চেয়েছি জীবনের শেষ মুহূর্তে আমার দেহে যেন আপনার দেহের স্পর্শ লেগে থাকে।[২]

- সাহল ইবনে সাদ থেকে বর্ণিত, এক নারী সাহাবি নিজ হাতে একটি সুন্দর জামা বানিয়ে আল্লাহর রাসুলকে হাদিয়া দিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা পরিধান করে বের হলেন। অন্য এক সাহাবি সেটা দেখে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, জামাটা অনেক সুন্দর! ওটা আমাকে দিয়ে দিন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়ে দিলেন। সাহাবারা আপত্তি করে বললেন, এটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রয়োজন ছিল। তার পরেও তুমি তার কাছে কেন

---

১. ইবনে হিব্বান (৬৭০২); তিরমিজি (২১৮০); মুসনাদে আহমদ (২২৩১৫)।
২. আল-ইসাবা, ইবনে হাজার আসকালানি (৪/৫২৭)।

চাইলে, অথচ তুমি জানো আল্লাহর রাসুলকে কিছু চাওয়া হলে তিনি না করেন না? সাহাবি বললেন, আমি ওটা পরার জন্য চাইনি, কাফনের জন্য চেয়েছি। সাহল বলেন, পরিশেষে সেই জামাই তার কাফন ছিল।[১]

• হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় কুরাইশরা যখন উরওয়া ইবনে মাসউদকে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠাল, তখন উরওয়া রাসুলুল্লাহর প্রতি সাহাবাদের ভক্তি ও ভালোবাসার যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, ইতিহাসে তা বিরল। তিনি দেখেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাশি দেন কিংবা গলা পরিষ্কার করেন, তাঁর কফ কোনো সাহাবির গায়ে পড়লে তিনি লুফে নেন এবং নিজের মুখ ও শরীরে মেখে ফেলেন। তিনি তাদের কোনো নির্দেশ দিলে সেটা পালনের জন্য তাদের হুড়াহুড়ি লেগে যায়। তিনি ওজু করার সময় তাঁর ওজুর পানির জন্য সাহাবায়ে কেরাম প্রতিযোগিতা করেন। তিনি কথা বললে তাঁর সামনে তাদের আওয়াজ নিচু করে ফেলেন। তাঁর সম্ভ্রমে তাদের কেউ সরাসরি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন না। এরপর উরওয়া ফিরে গিয়ে কুরাইশদের বলেন, হে আমার সম্প্রদায়, আমি দুনিয়ার বড় বড় অনেক বাদশাহর দরবারে গিয়েছি; আমি কায়সার-কিসরা সবাইকে দেখেছি। কিন্তু আল্লাহর শপথ, আমি আমার জীবনে এমন কোনো বাদশাহ দেখিনি, যার সঙ্গীরা তাকে এতটা শ্রদ্ধা করে যতটা মুহাম্মাদের সঙ্গীরা তাঁকে করে।[২]

• রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুল কাটলে সেসব চুল সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বন্টন করে দিতেন। তারা সেগুলো গ্রহণ করে বরকত অর্জন করতেন।[৩]

• তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নখ কাটলে সেগুলো সাহাবাদের মাঝে বন্টন করে দিতেন। সাহাবাগণ সেগুলো সংরক্ষণ করে রাখতেন।[৪]

• আনাস ইবনে মালেক রাজি. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুটি জুতা সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন।[৫]

---

১. বুখারি (১২৭৭); সুনানে ইবনে মাজা (৩৫৫৫)।
২. বুখারি (২৭৩১); মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক (৯৭২০)।
৩. মুসলিম (১৩০৫); মুসলিম (৯৪৯৫)।
৪. সহিহ ইবনে খুজাইমা (২৯৩১); আল-আহাদিসুল মুখতারাহ, মাকদিসি (৩৫৩); মুসতাদরাকে হাকেম (১৭৫০); মুসনাদে আহমদ (১৬৭৩৭); সুনানে কুবরা, বাইহাকি (৯১)।
৫. বুখারি (৩১০৭); শামায়েলে তিরমিজি (৭৭)।

• তাবেয়িগণও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া বিভিন্ন বস্তু সংরক্ষণ করে রাখতেন এবং সোগুলো দ্বারা বরকত গ্রহণ করতেন। হাসান বসরির কাছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু চুল সংরক্ষিত ছিল যা তিনি আনাস রাজি. ও তার পরিবার সূত্রে পেয়েছিলেন। তাবেয়ি আবিদাহ ইবনে আমর বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি চুল আমার কাছে গোটা পৃথিবী এবং এর ভিতরে যা আছে সবকিছুর চেয়ে দামি।[১]

• মহাবীর সাহাবি খালিদ ইবনে ওয়ালিদের কাছে রাসুলুল্লাহর কিছু চুল ছিল। তিনি সেগুলো তার টুপির ভিতর সংরক্ষণ করে রাখতেন। টুপিটি পুরোনো ও জীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি এটি নিয়েই যুদ্ধ করতেন। কারণ, তাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল ছিল। আলিমগণ মনে করেন, তিনি বরকত হিসেবে রাসুলুল্লাহর চুলগুলো সবসময় নিজের সঙ্গে রাখতেন। অসম্ভব নয় যে, সেই বরকতে জীবদ্দশায় কোনো যুদ্ধে তিনি পরাজিত হননি।[২]

• সাহাবি হানজালা ইবনে হুজাইমের ছোটবেলায় আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাথায় হাত রেখে দোয়া করেছিলেন। তিনি সারা জীবন তার মাথায় রাসুলের হাতের স্পর্শ সংরক্ষণ করেছেন এবং সেগুলোর মাধ্যমে বরকত গ্রহণ করতেন, মানুষের চিকিৎসা করতেন। যখন কোনো অসুস্থ ব্যক্তি তার কাছে আসত, তিনি মাথায় হাত দিয়ে বলতেন, 'বিসমিল্লাহ যে জায়গায় আল্লাহর রাসুল হাত রেখেছিলেন', এরপর সেই হাত অসুস্থ ব্যক্তির শরীরে বুলিয়ে দিতেন। এতে সে সুস্থ হয়ে উঠত।[৩]

• রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝেমধ্যে তাঁর খালা উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহানের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিতেন, ঘুমাতেন। আর উম্মে সুলাইম আল্লাহর রাসুলের শরীর থেকে নিঃসৃত ঘাম সুগন্ধি ও বরকত হিসেবে সংরক্ষণ করতেন। আল্লাহর রাসুল এটা ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতেন এবং সম্মতি দিতেন।[৪]

---

১. বুখারি (১৭০)।
২. আল-মাতালিবুল আলিয়াহ, ইবনে হাজার (৩৮২৪); মুসনাদে আবু ইয়ালা (৭১৮৩); আল মুজামুল কাবির, তাবারানি (৩৮০৪)।
৩. মুসনাদে আহমদ (২০৯৯৬); আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি (২৮৯৬)।
৪. মুসলিম (২৩৩১); মুসনাদে আহমদ (১৩৫১৪)।

তাবাররুক রাসুলুল্লাহর সঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়: এ কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বরকতগ্রহণ বৈধ হওয়ার বিষয়ে আহলে সুন্নাতের সকল আলিম একমত। কিন্তু রাসুলুল্লাহর পরবর্তী কোনো পুণ্যবান ব্যক্তির বরকত নেয়া যাবে কি না এ বিষয়ে আলিমদের দ্বিমত রয়েছে। পিছনে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, একদল আলিম মনে করেন, রাসুলুল্লাহর পরে অন্য কারও শারীরিক বরকতগ্রহণ জায়েজ নয়। কারণ, বরকতগ্রহণ মূলত ইবাদত। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করা যায় না।

অপরদিকে **সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম** মনে করেন, বরকতগ্রহণ রাসুলুল্লাহর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নয় কিংবা তাঁর মাঝে সীমাবদ্ধ নয়; বরং যেকোনো ওলির বরকত গ্রহণ করা যেতে পারে। কারণ, বরকতগ্রহণ ইবাদত নয়; এটা হচ্ছে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার নিদর্শন। একজন মানুষ যখন আরেকজন মানুষকে বেশি ভালোবাসে, তখন সেটা এভাবে প্রকাশ করে। এখানে ইবাদতের কোনো অর্থ নেই; সুতরাং নিষিদ্ধ হওয়ার সুযোগ নেই। হ্যাঁ, যদি কেউ ইবাদত হিসেবে করে কিংবা তাতে অন্য কোনো নিষিদ্ধ উপকরণ থাকে, তবে সেটা অবৈধ বিবেচিত হবে। কিন্তু সেটার জন্য তাবাররুক দায়ী নয়। বরং এটা যেকোনো বৈধ ইবাদতে পাওয়া যেতে পারে। যেমন: বাবা-মাকে শ্রদ্ধা করা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। কিন্তু কেউ যদি বাবা-মাকে শ্রদ্ধা করতে গিয়ে ইবাদতে লিপ্ত হয়, তখন সেটা অবৈধ হয়ে যাবে। কিন্তু এর জন্য বাবা-মাকে শ্রদ্ধার মূলনীতি দায়ী হবে না। সুতরাং ইবাদতের বিশ্বাস না রেখে কেবল ভালোবাসা ও সুসম্পর্কের ভিত্তিতে যদি কোনো পুণ্যবান ব্যক্তির ব্যবহৃত জামা পরিধান করা হয়, অথবা তার পান করা অবশিষ্ট পানি পান করা হয়, এতে অবৈধ হওয়ার কিছু নেই। হ্যাঁ, যদি সেখানে কোনো নিষিদ্ধ বিষয় পাওয়া যায়, তবে সেটা অবৈধ হবে; কিন্তু মূল তাবাররুক তাতে অবৈধ হবে না।

সালাফের তাবাররুক: এ কারণেই রাসুলুল্লাহর পরে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িন তথা সালাফের মাঝে পরস্পর থেকে বরকতগ্রহণের অনেক উদাহরণ ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই। যারা দাবি করেন, সালাফ রাসুলুল্লাহর পরে কারও কাছ থেকে বরকত গ্রহণ করেননি, তাদের কথা সঠিক নয়। কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হচ্ছে:

- তাবেয়ি সাবেত বুনানি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখনই আনাস ইবনে মালেক রাজি.-এর কাছে আসতাম, তার হাত দুখানা ধরে চুমু দিতাম এবং বলতাম, 'আমার পিতা উৎসর্গিত হোক এই দুই হাতের উপর যা আল্লাহর রাসুলকে স্পর্শ

করেছে।’ আমি তার কপালে চুমু দিতাম এবং বলতাম, ‘আমার পিতা উৎসর্গিত হোক এই দুই চোখের উপর যা আল্লাহর রাসুলকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছে।’[১]

- আনাস ইবনে মালেক রাজি. আবুল আলিয়াকে একটি আপেল দিলেন। আবুল আলিয়া সেটা হাতে নিয়ে স্পর্শ করলেন, চুমু দিলেন এবং চেহারায় বোলাতে লাগলেন আর মুখে বলছিলেন, ‘এই আপেল তো সেই হাত স্পর্শ করেছে যে হাত রাসুলুল্লাহর হাত স্পর্শ করেছে।’[২]

- আবু হুরাইরা রাজি. নবিজির দৌহিত্র হাসান রাজি.-এর কাছে আবেদন করেন যে, তিনি তার ওই স্থানে চুম্বন করতে চান যেখানে নবিজি চুম্বন করেছেন; সেটা ছিল তার নাভিদেশ। তখন হাসান খুলে দেন আর আবু হুরাইরা সেখানে নবিজি ও তাঁর বংশধরের বরকতের উদ্দেশ্যে চুম্বন করেন।[৩]

- একইভাবে ইমাম শাফেয়ি ইমাম আহমদের জামা দিয়ে বরকত গ্রহণ করেছেন।[৪]

- ইমাম আহমদও শাফেয়ি রাহি.-এর জামা দ্বারা বরকত নিয়েছেন।[৫]

- আবু হানিফার মাধ্যমে বরকত নেওয়া-সংক্রান্ত ইমাম শাফেয়ির বিখ্যাত উক্তি অনেক আলিম প্রমাণিত বলেছেন।[৬]

- ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের ছেলে সালেহ নিজ পিতার জুব্বা দ্বারা বরকত গ্রহণ করতেন। ইমাম আহমদ সেই জুব্বাতে নামাজ পড়তেন। সালেহও সেটাতে বরকতের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়তেন।[৭]

- রাসুলের ব্যবহৃত জোব্বাধোয়া পানির মাধ্যমে অসুস্থের চিকিৎসা-সংক্রান্ত হাদিসটি উল্লেখ করে সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় ইমাম নববি লিখেন, উক্ত হাদিসটি

---

১. মুসনাদে আবু ইয়ালা (৩৪৯১); আল-মাতালিবুল আলিয়াহ (৪০৫৯); আলিমগণ যদিও এই বর্ণনাকে দুর্বল বলেছেন, তথাপি আখবারের ক্ষেত্রে এগুলো গ্রহণ করা যায়।
২. আল-কুবল ওয়াল মুআনাকাহ ওয়াল মুসাফাহাহ, ইবনুল আরাবি (৬৪)।
৩. উমদাতুল কারি, আইনি (৯/২৪১)।
৪. তারিখে দিমাশক, ইবনে আসাকির (৫/৩১১); মানাকিবুল ইমাম আহমদ, ইবনুল জাওজি (৬০৯-৬১০); তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল কুবরা, সুবকি (২/৩৬); যদিও ঘটনাটির বিশুদ্ধতা নিয়ে কিছু আলিমের আপত্তি রয়েছে, অন্যরা এটাকে বিশুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করেন। উপরন্তু এটাকে আমরা মূল হিসেবে নয়, বরং সহায়ক ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছি।
৫. উমদাতুল কারি, আইনি (৯/২৪১)।
৬. তারিখে বাগদাদ, খতিব বাগদাদি (১/৪৪৫)।
৭. মানাকিবুল ইমাম আহমদ, ইবনুল জাওজি (৩৯৯-৪০০); তাসহিলুস সাবিলাহ, সালেহ আল-উসাইমি (১/৮৭)।

পুণ্যবান ব্যক্তিদের রেখে যাওয়া জিনিসপত্র এবং তাদের কাপড়-চোপড়ের মাধ্যমে বরকত অর্জন করা মুস্তাহাব হওয়ার প্রমাণ।[১]

- বরং বনি ইসরাইলের মাঝেও পুণ্যবান ব্যক্তিদের তাবাররুকগ্রহণ প্রচলিত ছিল। রাসুলুল্লাহ সাহাবাদের সেসব ঘটনা বলেছেন, কিন্তু বরকতগ্রহণ নাকচ করেননি। যেমন: রাহেব জুরাইজের ঘটনা।[২]

- জারির ইবনে আবদুল্লাহ রাজি. পানিতে তাঁর মিসওয়াক ভিজিয়ে সেই পানি দিয়ে পরিবারকে ওজু করতে বলতেন।[৩]

- পুণ্যবানদের বরকতগ্রহণ বৈধতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হচ্ছে নবজাতক শিশুর তাহনিক করা, অর্থাৎ পুণ্যবান ব্যক্তি কর্তৃক খেজুর কিংবা মিষ্টি দ্রব্য চিবিয়ে সেটা শিশুকে খাওয়ানো। এটা সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।[৪] হাসান বসরির জন্য উমর রাজি. তাহনিক করেছেন।[৫] ইমাম নববি লিখেন, আলেমদের ঐকমত্যে নবজাতকের তাহনিক করা মুস্তাহাব।[৬] আরেক জায়গায় এই তাহনিক প্রসঙ্গে নববি লিখেন, এর দ্বারা পুণ্যবান ব্যক্তিদের বরকতগ্রহণের বৈধতা সাব্যস্ত হয়।[৭]

- হাফেজ ইরাকি বলেন, বরকতগ্রহণের উদ্দেশ্যে পবিত্র স্থানগুলোতে চুম্বন করা, সৎ নিয়তে পুণ্যবান ব্যক্তিদের হাত ও পা চুম্বন করা ভালো ও প্রশংসনীয় কাজ[৮]। বরং একটি হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, স্বয়ং নবিজি মুসলমানদের ওজুর পানি দ্বারা বরকত গ্রহণ করতেন।[৯] এরপর ইমাম নববি লিখেন, এর মাধ্যমে পুণ্যবানদের ব্যবহৃত উপকরণ, অবশিষ্ট ওজুর পানি, খাবার, পানীয় ইত্যাদির মাধ্যমে বরকতগ্রহণের বৈধতা প্রমাণিত হয়।[১০]

---

১. শরহে মুসলিম, নববি (২০৬৯ নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যা ১৪/৪৪)।
২. মুসলিম (২৫৫০)।
৩. বুখারি (১৮৭)।
৪. মুসনাদে আহমদ (১২২১০); মুসনাদে আবু ইয়ালা (৩৮৮২)।
৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসির (৯/৩০৩)।
৬. শরহে মুসলিম, নববি (১৪/১২২)।
৭. শরহে মুসলিম, নববি (৩/১৯৪)।
৮. উমদাতুল কারি, আইনি (৯/২৪১)।
৯. আল মুজামুল আওসাত, তাবারানি (৭৯৪); হিলইয়াতুল আউলিয়া, আবু নুআইম (৮/২০৩); হাদিসটিকে কেউ কেউ অপ্রমাণিত বলেছেন। কিন্তু এটা জাল বা বানোয়াট নয়।
১০. শরহে মুসলিম, নববি (৪/২১৯)।

- বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে হিব্বান তার সহিহ গ্রন্থে একটি হাদিসের শিরোনাম লিখেন এভাবে: 'নেককার ব্যক্তিদের বরকত নেওয়া মুস্তাহাব।'[১]

মহব্বত ইবাদত নয়: এসব বর্ণনার মাধ্যমে একদিকে যেমন তাবাররুক রাসুলুল্লাহর সঙ্গে সীমাবদ্ধ হওয়ার দাবি নাকচ হয়ে যায়, অপরদিকে ইবাদত ও মহব্বতের পার্থক্য বুঝে আসে। ইবাদতের মাঝে মহব্বত থাকা অনিবার্য। কিন্তু মহব্বত মানেই ইবাদত নয়। ইসলাম এই দুটো বিষয়ের মাঝে সুস্পষ্ট সীমারেখা টেনে দিয়েছে। এ কারণে মানুষের আবেগ-অনুভূতি শরিয়ত-বিরুদ্ধ না হলে ইসলাম সেটা বন্ধ করতে যায়নি। তাই যেকোনো তাবাররুকের একমাত্র তাফসির বিদআত নয়।

মারওয়ান ইবনুল হাকাম একদিন মসজিদে নববিতে ঢুকে আল্লাহর রাসুলের কবরের উপর মুখ রেখে এক ব্যক্তিকে বসা দেখলেন। তিনি তার কাছে গিয়ে ঘাড়ে হাত দিয়ে বললেন, 'তুমি কী করছ তা জানো?' লোকটি ফিরে তাকালেন। দেখা গেল, তিনি রাসুলের মেজবান জ্যেষ্ঠ সাহাবি আবু আইউব আনসারি রাজি.। তিনি মারওয়ানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, জানি। **আমি আল্লাহর রাসুলের কাছে এসেছি, পাথরের কাছে নয়।** আমি রাসুলুল্লাহকে বলতে শুনেছি, যখন যোগ্য মানুষ দ্বীনের দায়িত্ব নেয়, তার জন্য কেঁদো না; যখন অযোগ্যরা দ্বীনের দায়িত্ব নেয়, তার জন্য কাঁদো।'[২] উক্ত বর্ণনা উল্লেখের পিছনে আমাদের উদ্দেশ্য রাসুলের কবর স্পর্শ করে বরকত নেওয়া বৈধ প্রমাণ করা নয়। কারণ, সাহাবি কবরের উপর বরকতের উদ্দেশ্যে মুখ রেখেছিলেন কি না তা স্পষ্ট নয়। উপরন্তু চার মাজহাবের অধিকাংশ ইমাম কবর স্পর্শ না করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, যেমনটি আমরা একটু পরে উল্লেখ করব। এ ঘটনা উল্লেখ করার পিছনে আমাদের উদ্দেশ্য হলো, বিদআতের নামে মানুষের আবেগ-অনুভূতিকে মূল্যহীন করে দেওয়ার বিরোধিতা করা। যেকোনো কাজ দেখার সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে বিদআত আখ্যায়িত করা ভয়ংকর প্রবণতা। আপনি আগে দেখুন তিনি ইবাদতের উদ্দেশ্যে কাজটি করছেন কি না। আপনি আগে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানুন। তাকে জিজ্ঞাসা করুন, কেন তিনি এমন করছেন। এরপর ফয়সালা দিন। কেউ বলতে পারেন, এভাবে সবাইকে জিজ্ঞাসা করা অসম্ভব। ফলে একটা সাধারণ বিধান (তথা বিদআত ও হারাম) ঘোষণা করা জরুরি। জটিলতা এই জায়গাতেই।

---

১. সহিহ ইবনে হিব্বান (৫৫৮)।

২. মুসনাদে আহমদ (২৪০৭২); মুসতাদরাকে হাকেম (৮৬৬৬)।

যারা পৃথিবীর দূরদূরান্ত থেকে কাবাঘরে যায়, আল্লাহর রাসুলের রওজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, সেগুলোকে একটু স্পর্শ করে, চুমু দেয়, তাদের অনেকেই সেগুলো বরকতের জন্য করে না; বরং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের ভালোবাসা তাদের মন ও মননকে এতটাই তৃষ্ণার্ত করে রাখে যে, তারা এই পাথর স্পর্শ করে সেই তৃষ্ণা মেটাতে চান। প্রেমাস্পদ যে পথ দিয়ে হেঁটে যায়, আশিকের সেই পথে হাঁটতে ভালো লাগে। কারণ, সে পথে প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের দেখা পায়। প্রেমাষ্পদ যে আলো-বাতাসে জীবন-যাপন করে, সেই আলো-বাতাস আশিকের আবে হায়াত। এগুলো তার জীবনে প্রাণ সঞ্জীবনী শক্তি সরবারহ করে। প্রেমাষ্পদের ঘর-বাড়ির ইট-পাথর আশিকের প্রশান্তির পরশমণি। এগুলোর ছোয়াঁতে খরা জীবনে প্রাণবন্ততার বারিধারা নামে। এসবের সঙ্গে ইবাদত কিংবা বরকত অর্জনের কোনো সম্পর্ক নেই।

সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উমরের জীবন ও কর্ম এখানে বেশি প্রাসঙ্গিক। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব জায়গাতে গিয়েছেন, পরবর্তীকালে আবদুল্লাহ ইবনে উমর সেসব জায়গায় যেতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পথ দিয়ে হাঁটতেন, যেখানে কদম ফেলতেন, তিনিও সে পথে সেই স্থানে কদম ফেলতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জায়গাতে বসতেন, তিনি সেখানে বসতেন। এভাবে জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্ত তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেছেন। এখানে আমরা প্রথম পক্ষের সঙ্গে একমত যে, সকল সাহাবির বিপক্ষে আবদুল্লাহ ইবনে উমরের এই কাজ আমাদের জন্য অনুসরণীয় নয়। এটা তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কারণ, অন্য কোনো সাহাবি এমন করেননি। কিন্তু যে পয়েন্টে আমরা তাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ দ্বিমত করছি এবং এটার মাধ্যমে আমাদের যেটা বোঝানো উদ্দেশ্য তা হলো, সালাফের কেউ ইবনে উমরের এই কাজকে বিদআত বলেননি। যারা দিন-রাত মুসলমানদের বিভিন্ন কাজকে বিদআত বিদআত জপেন তারাও ইবনে উমরের এই কাজকে বিদআত বলার দুঃসাহস করতে পারেননি। অথচ তিনি যে কাজটা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কিংবা প্রথম সারির বুজুর্গ সাহাবাগণ থেকে সেটার কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না। তা হলে এটাকে কেন বিদআত বলা হচ্ছে না? কারণ, ইবনে উমর সুন্নাহ ও বিদআত বুঝতেন; ইবাদত ও মহব্বতের পার্থক্য জানতেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমরের রক্তে রক্তে, শিরায় শিরায় রাসুলের ভালোবাসা টইটম্বুর ছিল। তাই ওফাতের পরেও সর্বদা রাসুলের জীবদ্দশার মতো কাছাকাছি

থাকতে চাইতেন। জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্ত, প্রত্যেকটা নিঃশ্বাস রাসুলুল্লাহর সান্নিধ্যে, তাঁর স্মৃতির সঙ্গে কাটাতে চাইতেন। ফিকহের দাঁড়িপাল্লা এই ভালোবাসার ওজন মাপতে অক্ষম। আশিকের দিলের ব্যথা তো রাসুলের মেজবান আবু আইউব আনসারি ও ইবনে উমররা বুঝবেন। অন্যরা সে ব্যথা কীভাবে বুঝবে? কেউ বলবেন, এটা সকল সাহাবির আমল নয়। ফলে দু-একজনের পরিবর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবার অনুসরণ করা কি উচিত নয়? আমরা বলব, হ্যাঁ, অবশ্যই উচিত। কিন্তু দু-একজনের আমলের মাধ্যমে এ কাজের বৈধতা প্রমাণিত হয় এবং বিদআত নাকচ সাব্যস্ত হয়। ফলে উত্তম-অনুত্তম আর বৈধতা-অবৈধতার মাঝে ফারাক রক্ষা জরুরি।

উপরন্তু কেবল আবু আইউব আনসারি কিংবা ইবনে উমর নন; অন্যান্য সাহাবি থেকেও বিভিন্ন পবিত্র স্থানের মাধ্যমে বরকত গ্রহণের কথা প্রমাণিত। যেমন: সাহাবি ইতবান ইবনে মালেক রাজি.-এর প্রসিদ্ধ ঘটনা। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার ঘরে ডেকে নামাজ পড়ান এবং সেই জায়গাটা বরকতস্বরূপ নিজের নামাজের জায়গা হিসেবে গ্রহণ করেন।[১] উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার আসকালানি লিখেন, এর মাধ্যমে যেসব জায়গায় আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ আদায় করেছেন কিংবা যেখানে তিনি পা রেখেছেন, সেগুলো থেকে বরকত নেওয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়। পাশাপাশি এটাও বোঝা যায় যে, কোনো নেককার ব্যক্তিকে যদি বরকত গ্রহণের জন্য ডাকা হয়, তা হলে ফিতনার ভয় না থাকলে সাড়া দেওয়া উচিত।[২] সুনানে ইবনে মাজাতে মুআজ বিন জাবাল রাজি.-এর রাসুলের কবরের পাশে বসে কান্নার বর্ণনা আছে।[৩] বিলাল রাজি. রাসুলের কবরের মাটিতে গড়াগড়ি করেছেন বলে বর্ণনা পাওয়া যায়।[৪] আবদুল্লাহ ইবনে উমরের ছেলে তাবেয়ি সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর তাঁর পিতার মতো রাসুলের স্মৃতিবিজড়িত জায়গাগুলো অনুসরণ করতেন।[৫]

এ কারণে কাবাঘরে, মসজিদে নববিতে, রওজাতে অসংখ্য মানুষ যারা ওখানে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, আল্লাহর রাসুলের রওজার দিকে গভীর দৃষ্টিতে অপলক নেত্রে

---

১. বুখারি (৪২৫); মুসলিম (৩৩)।
২. ফাতহুল বারি (১/৫২২)।
৩. সুনানে ইবনে মাজা (৩৯৮৯)।
৪. তারিখে দিমাশক, ইবনে আসাকির (৭/১৩৭); শিফাউস সিকাম, সুবকি (৫৩); ওয়াফাউল ওয়াফা, সামহুদি (৪/১৮২)।
৫. বুখারি (৪৮৩)।

তাকিয়ে থাকে, চোখে অশ্রুর বান নামে, ইট-পাথর স্পর্শ করে, তাদের দেখলেই বিদআতি আখ্যা দেবেন না। কারণ, তারা আল্লাহ ও রাসুলের কাছে এসেছে, সাত সাগর পাড়ি দিয়ে পাথরের কাছে আসেনি। তারা পাথর ছুঁয়ে ইবাদত করে না, মনের তৃষ্ণা মেটায়। সম্ভবত ইমাম জাহাবি এই কষ্টটা ধরতে পেরেছিলেন। ফলে তিনি যারা বারবার এই যুক্তি দেন যে, 'যদি উত্তম হতো তবে সাহাবারা করতেন', তাদের খণ্ডনে লিখেন, 'সাহাবায়ে কেরাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন। তাঁর হাতে চুম্বন করেছেন। তাঁকে দেখে দেখে তাদের চোখ পরিতৃপ্ত করেছেন। আমাদের পক্ষে যখন সেই সৌভাগ্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি, কমপক্ষে তাঁর কবরের সামনে নিজেকে সঁপে দিয়ে তাকে সম্মান জানানো, সেটাকে চুম্বন করা, স্পর্শ করা এতটুকু করা যেতে পারে। এগুলো কোনো মুসলিম তখনই করে, যখন সে রাসুলের মহব্বতে বেকারার হয়ে যায়। কারণ, প্রত্যেক মুসলিম আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলকে নিজের চেয়ে, নিজের পিতা-মাতার চেয়ে, সকল মানুষের চেয়ে, সম্পদের চেয়ে, জান্নাতের চেয়ে, জান্নাতের হুরের চেয়ে বেশি ভালোবাসতে আদিষ্ট। এই ভালোবাসায় সাহাবায়ে কেরাম তো রাসুলকে সিজদা করতে চেয়েছিলেন। যদি তিনি অনুমতি দিতেন, তা হলে সাহাবারা তাকে সিজদা করতেন—সম্মানের সিজদা, ইবাদতের নয়। **এ কারণে কেউ যদি ইবাদতের উদ্দেশ্য ছাড়া কেবল সম্মানের কারণে রাসুলের কবরকে সিজদা করে, সে কাফের হবে না, কিন্তু গুনাহগার হবে। কারণ, ইসলামে এটা নিষিদ্ধ।'**[১] সিয়ারু আলামিন নুবালাতে ইমাম জাহাবি লিখেন, 'আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসুলের কবরের সামনে মুসলমানের ব্যাকুলতা, চিৎকার, প্রচণ্ড কান্না, দেওয়াল চুম্বন তো আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলকে

---

১. মুজামুশ শুয়ুখ, জাহাবি (১/৭৩-৭৪); ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিজদা দিলে সুস্পষ্ট কুফর হবে। আর ইবাদত ছাড়া কেবল সম্মানের উদ্দেশ্যে (সাধারণ তাজিম ও তাহিয়্যাহ তথা অভিবাদন) সিজদা দিলে কবিরা বরং বড় ধরনের কবিরা গুনাহ হবে। দেখুন: তাবয়িনুল হাকায়িক, জাইলায়ি (৬/২৫); শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (৫১৫); ফাতাওয়ায়ে গিয়াসিয়্যাহ (১০৭); রদ্দুল মুহতার (৬/৩৮৩); হিফজুল ঈমান, থানভি (৬-৮); ইমদাদুল ফাতাওয়া, থানভি (৫/৩৫৩-৩৫৫); ইমদাদুল আহকাম, জফর আহমদ উসমানি (১/১১৪); কিফায়াতুল মুফতি, কিফায়াতুল্লাহ দেহলভি (১/২৩১); ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়াহ (১/২৮৫)। তবে ইমাম সারাখসি 'মাবসুত' এ সম্মানের উদ্দেশ্যে সিজদাকেও কুফর বলেছেন (আল-মাবসুত, সারাখসি ২৪/১৩০); যদিও অগ্রগণ্য মত প্রথমটি, তথাপি এ ব্যাপারে কঠোরতা করাই উত্তম। নতুবা একদল সম্মানের নামে ইবাদত করা শুরু করবে। ইবাদত করেও বলবে সম্মান করছি। অনেকে হয়তো দুটোর মাঝে পার্থক্যই করতে পারবে না। তাই কবরের সামনে সব ধরনের সিজদাকে কুফর বলা উচিত। যাতে কেউ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে। কারণ, সম্মানের উদ্দেশ্যে সিজদাকে বৈধ মনে করলে সেটাও সর্বসম্মতিক্রমে কুফর গণ্য হবে। ফলে উভয় অবস্থাতেই মাজারে/কবরে সিজদা কুফর হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কেউ যদি সিজদা করেই ফেলে, এক বাক্যে তাকে কাফের/মুশরিক বলা থেকে বিরত থাকা চাই। কারণ, ব্যক্তিবিশেষকে (তাকফিরে মুআইয়ান) কাফের বলার ক্ষেত্রে শরিয়তে সুনির্দিষ্ট মূলনীতি (জাওয়াবিত) রয়েছে, যা রক্ষা করা জরুরি। সামনে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

মহব্বতের কারণে হয়ে থাকে। এগুলোর দ্বারা প্রমাণিত হয়, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসে। আর এই ভালোবাসাটাই জান্নাতি ও জাহান্নামির মাঝে পার্থক্য।[১]

তাই এগুলো নিয়ে কথা বলার সময় বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির মাঝামাঝি থাকা চাই। হ্যাঁ, কবর চুমু দেওয়া ও স্পর্শ করার মাসআলাতে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। একদল জায়েজ বলেছেন, আরেক দল নিষেধ করেছেন। ইমাম আহমদ থেকে এগুলো জায়েজ হিসেবে বর্ণিত আছে। ইমাম আহমদকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, রাসুলের মিম্বর ও কবর স্পর্শ ও চুম্বনের মাধ্যমে বরকতগ্রহণ বৈধ কি না। তিনি বলেন, কোনো সমস্যা নেই।[২] বাহুতি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের শাগরিদ শাইখুল ইসলাম ইবরাহিম আল-হরবির বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন, তিনি মনে করতেন রাসুলুল্লাহর হুজুরা চুম্বন করা মুস্তাহাব।[৩] একইভাবে ইমাম শাফেয়ি থেকেও কাবার যেকোনো অংশ চুম্বন বৈধ বর্ণিত আছে।[৪] কিন্তু বিপরীতে আরেক দল এসব করতে নিষেধ করেছেন। তবে তাদের নিষেধাজ্ঞার পদ্ধতি স্বভাবতই মহানুভবতাপূর্ণ। ইমাম মালেক বলেছেন, কবর স্পর্শ আমি পছন্দ করি না।[৫] ইমাম নববি এটাকে মাকরুহ বলেছেন।[৬] কারণ, অনেকে এটাকে উপকারী কিংবা পুণ্য অর্জনের মাধ্যম মনে করে। ইমাম গাজালিও লিখেছেন এগুলো সুন্নাহ নয়; বরং আদব হলো দূর থেকে সালাম দেওয়া।[৭] রশিদ আহমদ গাঙ্গুহিকে জিজ্ঞাসা করা হলো, মসজিদে নববি ও রওজার ছবিতে চুমু দেওয়ার বিধান কী? তিনি বললেন, 'এগুলোতে চুমু দেওয়া, চোখে লাগানো ইত্যাদি প্রমাণিত নয়। তবে কেউ যদি প্রচণ্ড আগ্রহ ও ভালোবাসা থেকে করে ফেলে, তবে তাকে নিন্দা-ভর্ৎসনাও করা যাবে না।' হজরত থানভি উক্ত জবাবকে সমর্থন করেছেন।[৮]

তাই তাবাররুক দেখলেই একদিকে যেমন নিকৃষ্ট বিদআত ও শিরক বলা যাবে না, অপরদিকে আবার এগুলোর উপর মানুষকে উৎসাহিত করাও যাবে না। কারণ, সাধারণ মানুষ অধিকাংশ সময়ই ইবাদত ও আবেগ, বিদআত ও ভালোবাসা দুটোর

---

১. সিয়ারু আলামিন নুবালা (রিসালাহ) (৪/৪৮৪)।
২. আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল (২/৪৯২)।
৩. কাশশাফুল কিনা', বাহুতি (২/১৫১)।
৪. উমদাতুল কারি, আইনি (৯/২৪১)।
৫. আত-তাওজিহ, খলিল মালেকি (২/১০১)।
৬. শরহুল মুহাজ্জাব, নববি (৮/২৭৫); তবে অনেক ইমাম নববি রাহি.-এর বিরোধিতা করে এগুলো জায়েজ বলেছেন, যা আমরা উপরে উল্লেখ করেছি। বিস্তারিত দেখুন নাবহানি কৃত 'শাওয়াহিদুল হক' গ্রন্থে (৮৬-৮৭)।
৭. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন (১/২৫৯)।
৮. ইমদাদুল ফাতাওয়া (৪/৩৮০)।

পার্থক্য করতে পারে না। ফলে এটা বিদআতের পর্যায়ে চলে যাবে। আবার অনেক সময় মানুষ এমন মানুষের বরকত নেওয়া শুরু করে, যে নামাজও পড়ে না। বরকতের নামে ফরজ গোসলের পানি পান করা, ময়লা উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের ঘটনাও বিরল নয়।

শেষ কথা: পুণ্যবানদের তাবাররুক গ্রহণ ইসলামে একটি স্বীকৃত বিষয়। যারা এটাকে কেবল রাসুলুল্লাহর মাঝে সীমাবদ্ধ রাখেন, তাদের বক্তব্য সঠিক নয়, যার কিছু প্রমাণ আমরা পিছনে উল্লেখ করেছি। এ ব্যাপারে বিস্তারিত লিখতে গেলে গ্রন্থের কলেবর দীর্ঘ হয়ে যাবে, তাই এখানেই শেষ করা হচ্ছে। উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় স্পষ্ট হওয়ার কথা যে, একদিকে যেমন বুজুর্গ-ওলিদের মাধ্যমে তাবাররুক গ্রহণের বৈধতা স্বীকার করতে হবে, অপরদিকে বরকতের নামে প্রচলিত বিদআত ও কুসংস্কারেরও বিরোধিতা করতে হবে।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, সাহাবায়ে কেরাম তাদের স্মৃতি বিজড়িত এ সকল স্থানের প্রতি কতটুকু গুরুত্ব দিতেন আর আমরা কতটা গুরুত্ব দিই। আজ মক্কাতে বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মস্থান বলে প্রচলিত জায়গাটিতে ভিড় করে এটাকে বরকতময় মনে করতে এবং ওখানে বিভিন্ন ইবাদত করতে দেখা যায়। একইভাবে দেখা যায় মানুষ দলে দলে হেরা গুহায় যাচ্ছে, ওখানে গিয়ে নামাজ-সহ বিভিন্ন ইবাদত করছে। অথচ তাঁর জন্ম কোথায় হয়েছিল সে জায়গাটি আজ সন্দেহাতীতভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কারণ, তার জন্ম হয়েছিল জাহেলি যুগে। তখন এসব জায়গার বিশেষ কোনো গুরুত্ব ছিল না। নবুওতের পরে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর জন্য পাগলপারা থাকলেও, তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা সত্ত্বেও এসব জায়গার ব্যাপারে গুরুত্ব দেননি। কারণ, তাদের কাছে রাসুলুল্লাহর জন্মস্থানের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল রাসুলুল্লাহর আনীত জীবনবিধান। নবুওতের আগে তিনি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত হেরা গুহায় ইবাদত করতেন। অথচ নবুওত পরবর্তী বাকি ২৩ বছরে একটি বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, তিনি কিংবা সাহাবারা সেই জায়গাটিকে দেখতে গিয়েছিলেন। অথচ আজ মুসলমানরা এসব জায়গাতেই বেশি আগ্রহ নিয়ে যায়, সময় কাটায়।

কারণ কী? কারণ, সাহাবায়ে কেরামের কাছে এগুলোর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল রাসুলের অনুসরণ। জন্মস্থান দর্শনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তিনি যে তাওহিদ নিয়ে এসেছেন সেটার বাস্তবায়ন ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ। এগুলো করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরাম অলস সময় কাটানোর সুযোগ পাননি। এখন যেহেতু মুসলমানদের চিন্তাভাবনা

বদলে গিয়েছে, চিন্তাভাবনায় অধঃপতন নেমে এসেছে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছেড়ে অগুরুত্বপূর্ণ কিংবা কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি তাদের মনোযোগ বেড়েছে, ফলে দেখা যাচ্ছে ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে তাদের উল্লেখযোগ্য মনোযোগ নেই, অথচ পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করে সময় কাটানোর ক্ষেত্রে তারা অগ্রগামী। জিহাদের প্রতি অনেকে মনে অজানা বিদ্বেষ রাখে কিংবা বাঁকা দৃষ্টিতে তাকায়, অথচ বদর ও উহুদের ময়দানে ঘোরাঘুরি ও সেলফি তোলায় তারা দারুণ ব্যস্ত। রাসুলুল্লাহর জুতা, চুল, পদচিহ্ন (যার কোনোটাই আজ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত নয়) ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে দেশে দেশে বিরাট বিরাট ব্যাবসা দাঁড়িয়ে গেছে; অথচ রাসুলুল্লাহর আনীত দ্বীনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এখানেই শেষ নয়। শরিয়তের নির্দেশ পালনে মুসলমানরা যতটা গাফেল হয়েছে, ততটাই বেড়েছে পির ও কবরের প্রতি মনোযোগ। পির নামে নোংরা লোকদের ওজু-গোসলের পানি পান করা হচ্ছে। সেগুলো দিয়ে বিরিয়ানি রান্না করে বরকতের উদ্দেশ্যে খাওয়া হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, অনেক দ্বীনি মহলেও বুজুর্গদের ওজু-গোসলের পানি নিয়ে বাড়াবাড়ির উদাহরণ রয়েছে। অথচ স্বয়ং থানভি লিখেছেন, রাসুলুল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ওজুর পানি দিয়ে বরকতগ্রহণ প্রমাণিত নয়।[১]

বরকতের দোহাই দিয়ে মুসলমানদের মসজিদ শূন্য হয়েছে। আসর-উরশ আর কবর-মাজারে উপচে পড়া ভিড় জমেছে। বুজুর্গদের প্রতি শ্রদ্ধার অর্থ হয়ে গেছে কবরের সামনে এসে গর্দান ঝোঁকানো, কবরে ফুল দেওয়া, চাদর জড়ানো, বাতি জ্বালানো ইত্যাদি। ফলে প্রত্যেকটা কবর একেকটা দানবীয় কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে, যেখানে বিনা পুঁজিতে চলে বিলিয়ন বিলিয়ন টাকার ব্যাবসা; চলে কিছু ফাসিক লোকের পেটপূজা। এগুলো সবই সেই তাবাররুক নামক সূত্র থেকে উৎসারিত। তাই এ ব্যাপারে আলিমদের কঠোর অবস্থান নেওয়ার বিকল্প নেই। তাদের আদর্শ হতে পারেন সাইয়েদুনা উমর ইবনুল খাত্তাব, যিনি হুদাইবিয়ার বৃক্ষের নিচে মানুষ জড়ো হওয়ার কথা জানতে পেরে বৃক্ষটাই কেটে ফেলার নির্দেশ দেন।[২] কারণ, অনিষ্টকে সমূলে উপড়ে ফেলাই ইনসাফ।

---

১. ইমদাদুল ফাতাওয়া (৪/৩৯০)।
২. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৭৬২৭)।

وَالـمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ ءَادَمَ وَذُرِّيَّتِهِ حَقٌّ. وَقَدْ عَلِمَ اللهُ تَعَالَى فِيمَا لَمْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الـجَنَّةَ، وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ جُمْلَةً وَاحِدَةً، فَلَا يُزَادُ فِي ذَلِكَ العَدَدِ وَلاَ يَنْقُصُ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ أَفْعَالَهُمْ فِيمَا عَلِمَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ، وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. وَالأَعْمَالُ بِالـخَوَاتِيمِ. وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللهِ تَعَالَى، وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ اللهِ تَعَالَى.

আল্লাহ তায়ালা আদম আলাইহিস সালাম এবং তার সন্তানদের কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন, তা সত্য। অনাদিকাল থেকেই আল্লাহ তায়ালা বিস্তারিত জানেন কতজন মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং কতজন জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সুতরাং তাতে প্রবেশকারীদের সংখ্যা কোনো ধরনের কমবেশি হবে না। একইভাবে পৃথিবীতে কে কী কাজ করবে আল্লাহ তায়ালা তাও জেনে রেখেছেন। ফলে প্রত্যেককে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজ তার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। সকল আমল শেষ অবস্থার উপর নির্ভরশীল। তাই প্রকৃত সৌভাগ্যবান হচ্ছে সে ব্যক্তি, আল্লাহ তায়ালা যার কপালে সৌভাগ্য লিখে রেখেছেন। আর দুর্ভাগা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা যার কপালে দুর্ভাগ্য লিখে রেখেছেন।

ব্যাখ্যা
তাকদির বিষয়ে আরও কিছু আকিদা

রুহের জগতের অঙ্গীকার: আল্লাহ তায়ালা জগতের সকল মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর আগে তাঁর একত্ববাদের সাক্ষ্য নিয়েছেন; তাকে রব হিসেবে স্বীকার করার অঙ্গীকার নিয়েছেন। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বসম্মত আকিদা। তবে এই সাক্ষ্যগ্রহণ ও অঙ্গীকারের স্বরূপ কী এটা নিয়ে আলিমদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। নিচে আমরা সংক্ষেপে এ ব্যাপারে আলোচনা করছি:

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَآ ۛ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوٓا إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ

অর্থ: 'আর যখন আপনার পালনকর্তা বনি আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদের বের করলেন এবং নিজের উপর সাক্ষ্য নিলেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বলল, অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি। আবার না কিয়ামতের দিন বলতে শুরু করো যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না। অথবা বলতে শুরু করো যে, শিরক তো করেছে ইতঃপূর্বে আমাদের বাপ-দাদারা, আমরা তো তাদের পরবর্তী প্রজন্ম। আপনি কি তা হলে পথভ্রষ্টদের কর্মের কারণে আমাদের ধ্বংস করবেন? [আরাফ: ১৭২-১৭৩]

- উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় উবাই ইবনে কাব বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তখন কিয়ামত পর্যন্ত যারা পৃথিবীতে আসবে, সবার রুহকে একত্র করেন, এরপর তাদের অবয়ব দান করেন। তাদের কথা বলতে বলেন এবং তারা কথা বলে। আল্লাহ তায়ালা তখন তাদের থেকে এই প্রতিশ্রুতি নেন ('আর যখন আপনার পালনকর্তা বনি আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদের বের করলেন এবং নিজের উপর সাক্ষ্য নিলেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? তারা বলল, অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি। আবার না কিয়ামতের দিন বলতে শুরু করো যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না। অথবা বলতে শুরু করো যে, অথবা বলতে শুরু করো যে, শিরক তো করেছে ইতঃপূর্বে আমাদের বাপ-দাদারা, আমরা তো তাদের পরবর্তী প্রজন্ম। আপনি কি তা হলে পথভ্রষ্টদের কর্মের কারণে আমাদের ধ্বংস করবেন?')। আল্লাহ বলেন, আমি সাত আকাশ ও সাত জমিনকে তোমাদের উপর সাক্ষী হিসেবে রাখছি, আর সাক্ষী হিসেবে রাখছি তোমাদের পিতা আদমকে, যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন না বলো যে, আমরা তো জানতাম না অথবা আমরা এগুলো থেকে গাফেল ছিলাম। সুতরাং তোমরা আমার সঙ্গে অন্যকিছু শরিক করো না। আমি তোমাদের কাছে আমার রাসুলদের প্রেরণ করব। তারা তোমাদের আমাকে প্রদত্ত এই অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। আমি তোমাদের উপর আমার গ্রন্থাবলি অবতীর্ণ করব। তখন সবাই বলল,

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের রব। আপনি ছাড়া আমাদের আর কোনো রব নেই। আপনি ছাড়া আমাদের আর কোনো ইলাহ নেই...।'[১]

- আরেকটি হাদিসে আবদুর রহমান ইবনে কাতাদা সুলামি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা আদমকে সৃষ্টি করেন। এরপর তার পিঠ থেকে সমগ্র সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেন। অতঃপর বলেন, এরা জান্নাতের জন্য; আর আমি কোনোকিছুর পরোয়া করি না। এরা জাহান্নামের জন্য; আর আমি কোনোকিছুর পরোয়া করি না। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, তা হলে আমাদের আমল করে কী লাভ? তিনি বললেন, তাকদিরের ফয়সালা অনুযায়ী।[২]

- উমর ইবনুল খাত্তাবকে এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হলে উমর বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তখন আমি তাকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করে তাঁর ডান হাত আদমের পিঠে বুলিয়ে দেন এবং সেখান থেকে আদমের সন্তানদের বের করেন। অতঃপর বলেন, এদের জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি। তারা জান্নাতিদের আমলই করবে। অতঃপর তিনি আদমের পিঠে হাত বুলিয়ে দেন এবং সেখান থেকে তার সন্তানদের বের করেন। অতঃপর বলেন, এদের আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি ফলে তারা জাহান্নামিদের আমল করবে। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, তা হলে আমরা আমল কেন করব? আল্লাহর রাসুল বললেন, আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তাকে জান্নাতিদের কাজে লাগিয়ে দেন। ফলে জান্নাতিদের আমলের উপরেই তার মৃত্যু হয় এবং জান্নাতে প্রবেশ করে। আর যখন তিনি কাউকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, জাহান্নামিদের কাজে লাগিয়ে দেন। ফলে জাহান্নামিদের কাজের উপর তার মৃত্যু ঘটে এবং সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।[৩]

- ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা আদমের পিঠ থেকে তার সকল সন্তানকে বের করে তাঁর সামনে রাখেন। অতঃপর তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তখন তারা বলে, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম...।[৪]

---

১. মুসতাদরাকে হাকেম (৩২৭৪)।
২. মুসতাদরাকে হাকেম (৮৫)।
৩. সুনানে আবু দাউদ (৪৭০৩); সহিহ ইবনে হিব্বান (৬১৬৬); মুসতাদরাকে হাকেম (৩২৭৫); মুয়াত্তা ইমাম মালেক (৬৭৮/৩৩৩৮) (রিওয়াইয়াতু ইহইয়া আল-লাইসি নং ১৫৯৩)।
৪. মুসনাদে আহমদ (২৪৯৪); সুনানে কুবরা বাইহাকি (১১১২৭)।

• আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন জাহান্নামের সবচেয়ে কম শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলবেন, যদি তুমি গোটা ভূপৃষ্ঠের সবকিছুর মালিক হতে, তা হলে কি সেগুলো এই শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিসর্জন দিতে? সে বলবে, হ্যাঁ, অবশ্যই। আল্লাহ বলবেন, আমি তো তোমার কাছ থেকে এরচেয়ে হালকা জিনিস চেয়েছিলাম যখন তুমি আদমের পিঠে ছিলে। আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমার সঙ্গে কাউকে শরিক করো না, কিন্তু তুমি শিরক করেই ছাড়লে।[১]

উপরের হাদিসগুলোতে সাহাবাদের বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট যে, তারা আল্লাহ কর্তৃক মানুষের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়ার বিষয়টি আধ্যাত্মিক ও শারীরিক দুইভাবেই মনে করেন। অর্থাৎ সকল মানুষকে প্রত্যেকের বাবার পিঠ থেকে বের করা হয়। প্রতিশ্রুতি নেওয়ার পরে আবার তাদের সেখানে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এর পর তারা ধারাবাহিকভাবে পৃথিবীতে আসতে থাকে। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বসম্মত আকিদা।

কিন্তু তারা কুরআনের যে আয়াত (আরাফ: ১৭২-১৭৩) দিয়ে দলিল দিয়েছেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে আলিমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। প্রথম দলের মতে, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যাই হচ্ছে যা উপরে সাহাবাদের মুখে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত আয়াতে প্রতিশ্রুতি বলতে বাস্তব (আধ্যাত্মিক ও শারীরিক) প্রতিশ্রুতি বোঝানো হয়েছে। ফলে আয়াতটি উপরের হাদিসগুলোর দলিল। কিন্তু বিপরীতে আরেক দল মনে করেন, হাদিসগুলোতে উল্লিখিত (রুহের জগতের বাস্তব) প্রতিশ্রুতি সত্য। কিন্তু সেগুলো হাদিস দ্বারাই প্রমাণিত। আয়াতের সঙ্গে সেই রুহের জগতের বাস্তব প্রতিশ্রুতির কোনো সম্পর্ক নেই। বরং আয়াতে রূপক অর্থে মানুষের ইসলাম ও তাওহিদের উপর জন্মের কথা বলা হয়েছে, যা কুরআনে 'ফিতরত' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

অর্থ: 'তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো। এটাই আল্লাহর ফিতরত (প্রকৃতি), যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো

---

১. বুখারি (৬৫৫৭); মুসলিম (২৮০৫)।

পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।' [রোম: ৩০] হাদিসেও এটাকে ফিতরত (সত্য ও ভালোর প্রতি স্বভাবজাত আগ্রহ) বলে বোঝানো হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'প্রত্যেক মানবসন্তান ফিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তীকালে তার বাবা-মা তাকে ইহুদি, খ্রিষ্টান কিংবা অগ্নিপূজারী বানিয়ে ফেলে।'[১] ফলে সত্য ধর্ম তথা ইসলামের প্রতি মানুষের এই সতত স্বভাবজাত আকর্ষণকে আয়াতে রূপকভাবে বলা হয়েছে।[২]

এক্ষেত্রে তারা কিছু যুক্তি পেশ করেন। যেমন: হাদিসগুলোতে বলা হয়েছে আল্লাহ তায়ালা সবাইকে আদমের পিঠ থেকে বের করেন, কিন্তু আয়াতে বলা হয়েছে সবাইকে সবার পিতার পিঠ থেকে বের করেন। আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, সবার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে এটা তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেদের সাক্ষ্য থাকে এবং পরে যেন বলতে না পারে যে, আমরা গাফেল ছিলাম। অথচ রুহের জগতের সেই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আমরা সবাই গাফেল। কারণ, সেটা কারও মনে নেই। একইভাবে আয়াত দেখলে বোঝা যায়, সেই প্রতিশ্রুতিই তাদের বিরুদ্ধে হুজ্জত কায়েমের জন্য যথেষ্ট। অথচ বাস্তবে আল্লাহ তায়ালা বলেন, রাসুল পাঠানো ছাড়া তিনি কাউকে শাস্তি দেবেন না। এর দ্বারা বোঝা গেল, উক্ত আয়াত হাদিসগুলোর দলিল নয়, কিংবা হাদিসগুলো আয়াতের ব্যাখ্যা নয়। বরং হাদিসগুলোর বিষয়বস্তু রুহের জগতের প্রতিশ্রুতি, আর আয়াতের বিষয়বস্তু মানুষকে তাওহিদের ফিতরতের উপর তৈরির বর্ণনা, প্রতিশ্রুতি এখানে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এভাবে তারা উক্ত আয়াতের তাবিল করেন; অথচ এমন তাবিল নিষ্প্রয়োজন। বরং উক্ত আয়াতে প্রতিশ্রুতি বলতে রুহের জগতের সেই বাস্তব প্রতিশ্রুতিই বোঝানো হয়েছে, যা হাদিসগুলোতে বলা হয়েছে। ফলে আয়াত ও হাদিসের বিষয়বস্তু অভিন্ন প্রতিশ্রুতিই। উবাই বিন কাব, উমর ইবনুল খাত্তাব-এর মতো সাহাবগণ সেটাই বুঝেছেন। আর তারা যেসব আপত্তি তুলেছেন, সেগুলো ততটা শক্তিশালী নয়। যেমন: হাদিসে বলা হয়েছে সবাইকে আদমের পিঠ থেকে বের করার কথা, আর আয়াতে বলা হয়েছে সবাইকে সবার পিতার পিঠ থেকে বের করার কথা। দুটোর মাঝে আদতে বৈপরীত্য নেই। কারণ, প্রত্যেকের পিতাও তখন আদমের পিঠেই ছিলেন। সেই হিসেবে মূল কথা একই, প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন।[৩]

---

১. বুখারি (১৩৮৫); মুসলিম (২৬৫৮)।
২. সালেহ ফাওজান (৮১-৮২); হামুদ শুআইবি (১১০)।
৩. তাফসিরে কাবির, রাজি (১৫/৪০১-৪০২)।

কেবল এটুকুই নয়, উক্ত আয়াতটি নিয়ে আলিমগণ আরও বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন[১]। তবে বিস্তারিত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে দ্বিমত থাকলেও মূল মাসআলাতে কোনো দ্বিমত নেই। রুহের জগতে আল্লাহর নেওয়া প্রতিশ্রুতি এবং মানুষকে তাওহিদের ফিতরতের উপর সৃষ্টি দুটোই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা। আয়াত প্রথমটার দলিল কি না সেটা গৌণ বিষয়। কারণ, যারা আয়াতকে রুহের জগতে প্রতিশ্রুতির দলিল মানেন না, তারাও সেই প্রতিশ্রুতিকে অস্বীকার করেন না। এর কারণ, আয়াত সেটার দলিল হোক বা না হোক, বিষয়টি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং অস্বীকারের প্রশ্নই ওঠে না।[২]

একটি জরুরি কথা: পৃথিবীর কোনো মানুষের পক্ষে রুহের জগতের এসব প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করা সম্ভব নয়। এ কারণে অনেক দুর্ভাগা যখন এগুলো নিজের যুক্তির মানদণ্ডে বিচার করতে চায় এবং এর গভীরতা ঠাওর করতে না পারে, তখন অস্বীকার করতে শুরু করে। অথচ আল্লাহর নেওয়া প্রতিশ্রুতির সত্যতা যাচাই করার আগে সে যদি নিজের সীমাবদ্ধতা ও সামর্থ্য যাচাই করত, তা হলে হয়তো ধ্বংসের অতল গহ্বরে মুখ থুবড়ে পড়ত না। সে নিজের দিকে কখনও তাকিয়ে দেখেনি, অথচ আল্লাহর দিকে তাকাতে গিয়েছে। সে রুহের জগতের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করতে না পেরে সেটাকে অস্বীকার করছে, অথচ তার মায়ের পেটে থাকা নয় মাসের কিছুই স্মরণ করতে পারে না। তা হলে কি সে তা অস্বীকার করে? কেবল মায়ের পেট নয়; জীবনের প্রথম কয়েক বছরের বড় হওয়া, হাঁটা-চলা, নাওয়া-খাওয়া, হাসিকান্না, খেলাধুলা কিছুই মানুষ মনে করতে পারে না। তবুও মানুষকে বিশ্বাস করতে হয় সবকিছু। আল্লাহ সত্য বলেছেন, وَكَانَ الْإِنسَٰنُ كَفُورًا। অর্থ: 'আর মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ।' [ইসরা: ৬৭] জ্ঞানীগণ সত্য বলেছেন, যে মানুষ নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন, আল্লাহকে চেনা তার জন্য কঠিন নয়।

আল্লাহর জানা কি আপনাকে বাধ্য করে? ইমাম তহাবির বক্তব্য **'অনাদিকাল থেকেই আল্লাহ তায়ালা বিস্তারিত জানেন কতজন মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং কতজন জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সুতরাং তাতে প্রবেশকারীদের সংখ্যা কোনো ধরনের কমবেশি হবে না। একইভাবে পৃথিবীতে কে কী কাজ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাও জেনে রেখেছেন।'**—এই কথাগুলো মূলত কুরআনের কিছু আয়াত ও হাদিসের

---

১. গজনবি (৯৫-৯৬)।
২. তাফসিরে ইবনে কাসির (৩/৪৫৬)।

নির্যাস। কারণ, আল্লাহ তায়ালা সব জানেন। অতীতে কী হয়েছে তিনি জানেন, বর্তমানে কী হচ্ছে জানেন, ভবিষ্যতে কী হবে জানেন, আর তিনি জানেন যা হয়নি যদি হতো কীভাবে হতো। সুতরাং তিনি মানুষ সৃষ্টির আগেই জানতেন যে, প্রত্যেক মানুষ পৃথিবীতে কী আমল করবে এবং সর্বশেষে তার স্থান জান্নাতে হবে নাকি জাহান্নামে। আর আল্লাহর জ্ঞান যেহেতু পরিপূর্ণ ও অনিবার্য, তাই তিনি সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার আগেই যে জান্নাতি এবং জাহান্নামির সংখ্যা সম্পর্কে জেনেছেন তাতে কমবেশি হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

এটুকু বোঝা সহজ। কিন্তু বক্তব্যের শেষাংশ '**ফলে প্রত্যেককে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজ তার কাছে সহজ করে দেওয়া হবে**' একটু জটিল। যদিও আমরা পিছনে এটা নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু বক্তব্যের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য আরও কিছু কথা যোগ করা প্রয়োজন মনে করছি। বাস্তব কথা হলো, ইমাম তহাবি তাঁর কিতাবে তাকদিরের আলোচনা এক জায়গায় করেননি; বরং বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জায়গাতে এনেছেন। এ জন্য অনেক সময় কিছু কথার পুনরাবৃত্তিও হয়েছে। তবে সম্ভবত বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ করেই তিনি বারবার বলার চেষ্টা করেছেন।

জটিলতা হলো রাসুলুল্লাহর বাণী '**প্রত্যেককে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজ তার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে**'।[১] তা হলে এর অর্থ কী দাঁড়াল? এখানে হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, যাকে যে জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য সে কাজটা সহজ করে দেবেন। অর্থাৎ আল্লাহ প্রথমেই একজনকে জান্নাতের জন্য তৈরি করেছেন, আরেকজনকে জাহান্নামের জন্য তৈরি করেছেন। এর পর পৃথিবীতে দুজনকে পাঠানোর পরে একজনের জন্য জান্নাতের কাজ সহজ করে দিয়েছেন, আরেকজনের জন্য জাহান্নামের কাজ সহজ করে দিয়েছেন। ফলে একজন জান্নাতি হবে, আরেকজন জাহান্নামি হবে। এখানেই জটিলতা। কারণ আমরা জানি, পৃথিবীতে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনোকিছুই হয় না। আল্লাহ যদি কাউকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, এর পর তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে জাহান্নামের কাজ তার জন্য সহজ করে দেন, তা হলে তার জাহান্নাম ছাড়া উপায় কী? এক্ষেত্রে মানুষের দায় কোথায়? এর পর তাকে ঈমান আনতে বলা, ভালো কাজ করতে বলার মূল্য কী? কারণ, আল্লাহ তাকে তৈরি করেছেন জাহান্নামের জন্য, আর জাহান্নামের পথ তার জন্য সহজ করে দিয়েছেন!

১. মুসনাদে আহমদ (২০); মুসনাদে বাজ্জার (২৮)।

কিন্তু হাদিসের এই বাহ্যিক ব্যাখ্যা ভুল। আমরা যদি এ ব্যাপারে বর্ণিত একাধিক হাদিস দেখি, জটিলতা কেটে যাবে। কয়েকভাবে এই জটিলতার সমাধান করা যেতে পারে। একটি সমাধান হচ্ছে যা আমরা পিছনে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত কথা বলার পরে কুরআনের আয়াত দিয়ে তার বক্তব্য স্পষ্ট করেছেন। তিনি কুরআনের এই আয়াত পড়েন:

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَ اتَّقٰى. ۙ وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنٰى. ۙ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى. وَ اَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَ اسْتَغْنٰى. ۙ وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنٰى. ۙ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى

অর্থ: 'অতএব, যে দান করে, আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্যায়ন করে, তার জন্য আমি সুখের বিষয়কে সহজ করে দেবো। আর যে কৃপণতা করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং উত্তম বিষয়কে অস্বীকার করে, আমি তার জন্য দুঃখের পথ সহজ করে দেবো।'[১] [লাইল: ৫-১০] আয়াতে স্পষ্ট যে, জান্নাত ও জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ প্রথমেই তাকে জান্নাত-জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীতে কেবল পুতুল হিসেবে পাঠিয়েছেন। তাহলে নবি-রাসুল প্রেরণ, কিতাব অবতরণ ও হালাল-হারামের বিধান দেওয়ার অর্থ হয় না। বরং তিনি তাঁর ইলমের মাধ্যমে জেনেছেন কে জান্নাতিদের আমল করে জান্নাতি হবে, আর কে জাহান্নামিদের আমল করে জাহান্নামি হবে। এটাকেই 'সৃষ্টি করেছেন' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ জন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ভালো কাজ করলে ভালো পথ সহজ হবে, আর মন্দ কাজ করলে মন্দ পথ সহজ হবে। আগে থেকে নির্ধারিত থাকার ফলে প্রত্যেকে ভালো এবং মন্দ কাজে বাধ্য হয়ে যাবে এ-রকম নয়।

আবদুল্লাহ ইবনে উমরের সূত্রে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা যে কাজগুলো করি সেগুলো কি তাকদিরে লিখিত, নাকি আমরা নিজেদের মতো করে করি? আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাকদিরে লিখিত'। তখন কেউ বললেন, তা হলে আমল করে কী লাভ? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'জান্নাতবাসীর জন্য জান্নাতের কাজ সহজ করে দেওয়া হবে; জাহান্নামবাসীর জন্য জাহান্নামের কাজ সহজ করে দেওয়া হবে।'[২] এখানেও জান্নাতবাসীর জন্য

---

১. বুখারি (৪৯৪৯); মুসলিম (২৬৪৭)।
২. আবু দাউদ (৪৬৮২)।

জান্নাতের কাজ সহজ করে দেওয়া হবে আর জাহান্নামবাসীর জন্য জাহান্নামের কাজ সহজ করে দেওয়া হবে-এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির আগে কারও জন্য নিজ থেকে জান্নাত ও জাহান্নাম নির্ধারণ করেছেন, এর পর দুনিয়ায় পাঠিয়ে তার জন্য সে পথ সহজ করে দেন; বরং আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির আগেই জেনেছেন পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে পাঠানোর পরে কোন মানুষ কোন পথে যাবে, তাই আল্লাহ তায়ালা সেটা লিখে রেখেছেন। পরবর্তী সময়ে পৃথিবীতে আসার পরে সে নিজ থেকেই যেহেতু সেটাকে অবলম্বন করেছে, তাই তার জন্য সেটা সহজ করে দেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতে দুটি গ্রন্থ নিয়ে আমাদের নিকট এসে বললেন, 'তোমরা কি জানো এ দুটো কী?' আমরা বললাম, 'না, হে আল্লাহর রাসুল' (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তিনি তাঁর ডান হাতের গ্রন্থের দিকে ইশারা করে বললেন, 'এটা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একটি কিতাব। এতে জান্নাতি সকল ব্যক্তির নাম, তাদের বাপ-দাদার নাম এবং তাদের গোত্রের নাম লেখা আছে। আর শেষে এর মোট সংখ্যা রয়েছে এবং এতে কম-বেশি করা হবে না।' তারপর তিনি তার বাম হাতের গ্রন্থের দিকে ইশারা করে বললেন, 'এটাও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে একটি গ্রন্থ। এতে জাহান্নামি সকল ব্যক্তির নাম, তাদের বাপ-দাদার নাম এবং গোত্রের নাম লেখা আছে। এর শেষেও মোট ফল রয়েছে। এতে হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না।' সাহাবিরা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, তবে আমলের কী প্রয়োজন?' তিনি বললেন, 'তোমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করতে থাকো। যথাসম্ভব আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করো। কেননা, কেউ জান্নাতি হয়ে থাকলে তার শেষ আমল জান্নাতিদের আমলই হবে, আগে যে আমলই করুক। কেউ যদি জাহান্নামি হয়ে থাকে, তা হলে তার শেষ আমল জাহান্নামিদের আমলই হবে, আগে যে আমলই করে থাকুক।' তারপর রাসুলুল্লাহ তার দুই হাতে ইশারা করেন এবং কিতাব দুটি ফেলে দিয়ে বলেন, 'তোমাদের প্রভু তার বান্দাদের আমল চূড়ান্ত করে ফেলেছেন—একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর অন্যদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'[১]

উক্ত হাদিসটিও আমাদের আগের মূলনীতিতে বুঝতে হবে। অর্থাৎ মানুষের চূড়ান্ত আমলের উপর তার আখিরাতের পরিণতি নির্ভরশীল। এ জন্য সবসময় সত্যের

---

১. তিরমিজি (২১৪১)।

উপর থাকার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এটা এই হাদিসের মূল অর্থ। এর অর্থ এটা নয় যে, কেউ সারা জীবন জান্নাতের আমল করবে আর জীবনের শেষ মুহূর্তে আল্লাহ তার হাত ধরে জোর করে জাহান্নামিদের আমল করিয়ে তাকে জাহান্নামে ছুড়ে ফেলবেন। বরং আল্লাহ আগে থেকেই জানতেন, সে সারা জীবন ভালো আমল করলেও শেষ পর্যায়ে এসে খারাপ আমল করে জাহান্নামে যাবে। ফলাফলে এর দায়ভার আল্লাহ নন, সে নিজে বহন করবে।

উক্ত হাদিসটি সাহল ইবনে সাদ সূত্রে দেখলে আরও একটু স্পষ্ট হয়। সাহল রাজি. বলেন, কোনো ব্যক্তি সারা জীবন এমন কাজ করতে থাকে **যা মানুষের চোখে জান্নাতিদের কাজ মনে হয়,** অথচ সে জাহান্নামি। আবার অনেক সময় কোনো লোক সারা জীবন এমন কাজ করতে থাকে **যা মানুষের কাছে জাহান্নামিদের কাজ মনে হয়,** অথচ সে জান্নাতি।[১]

এ কারণে অনেক বর্ণনায় **'ফলে প্রত্যেককে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে কাজ তার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে'** না বলে কেবল 'প্রত্যেকের জন্য সহজ করে দেওয়া হবে' এটুকু বলা হয়েছে।[২] আবার কোথাও, যেমন: জাবের ও সুরাকা রাজি. সূত্রে এসেছে, كُلُّ عَامِلٍ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِهِ **প্রত্যেকের জন্য তার কাজ সহজ করে দেওয়া হবে।**[৩] এটা হাদিসের মর্ম বুঝতে আরও সহায়ক ও সুস্পষ্ট। এখানে এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে: আল্লাহ তায়ালা সবাইকে স্বাধীনভাবে তৈরি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। প্রত্যেকের জন্য তার আগ্রহের কাজকে সহজ করে দেওয়া হবে। সুতরাং সে জান্নাতের কাজ করতে চাইলে জান্নাতের কাজ তার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে, আর জাহান্নামের কাজ করতে চাইলে জাহান্নামের কাজ তার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে।

সকল আমল শেষ অবস্থার উপর নির্ভরশীল: এটা মূলত হাদিসের বক্তব্য। উপরে এ সংক্রান্ত সাহল বিন সাদ রাজি.-এর হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। বুখারি-সহ বিভিন্ন গ্রন্থে হাদিসটি এসেছে। সবগুলোর মর্মার্থ হচ্ছে, মানুষের নিজের ভালো কাজ নিয়ে আত্মতুষ্টিতে না ভোগা উচিত। বরং কর্তব্য হলো সারাজীবন হকের উপর অটল থাকার চেষ্টা করে যাওয়া; অলসতা ও অবহেলা না করা। কারণ, কার মৃত্যু কোন অবস্থায় হবে, ঈমান নাকি কুফরের উপর, পুণ্য নাকি গুনাহের উপর এটা কারও জানা নেই। ফলে

---

১. বুখারি (২৮৯৮); মুসলিম (১১২)।
২. সহিহ ইবনে হিব্বান (৩৩৭)।
৩. সহিহ ইবনে হিব্বান (৩৩৬); মুসনাদে আহমদ (১৪৮২৪)।

সবসময় আনুগত্যের উপর থাকা আবশ্যক। কেননা পরকালের পরিণতি শেষ অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

ইমাম তিরমিজির বর্ণনায় এ-রকম একটি হাদিস দেখলে বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজি.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের মায়ের গর্ভে সর্বপ্রথম তার সৃষ্টি প্রকাশ পায় চল্লিশ দিনে। এর পরের চল্লিশ দিনে রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়। এর পর চল্লিশ দিনে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। তখন আল্লাহ তার কাছে একজন ফেরেশতা পাঠান যে তার ভিতরে রুহ ফুঁকে দেয় এবং চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করে: রিজিক, মৃত্যু, আমল এবং সে সৌভাগ্যবান হবে নাকি দুর্ভাগা। ওই সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তোমাদের কেউ জীবনভর জান্নাতের আমল করতে থাকে, এর পর যখন জান্নাত এবং তার মাঝে মাত্র এক হাত বাকি থাকে, ওই সময় ভাগ্যলিপি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং তার সর্বশেষ আমল হয় জাহান্নামিদের আর সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আবার তোমাদের কেউ সারা জীবন জাহান্নামের আমল করে। পরিশেষে যখন তার মাঝে ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত দূরত্ব থাকে, ভাগ্যলিপি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, তার জীবনের শেষ আমল হয় জান্নাতিদের আর সে জান্নাতে প্রবেশ করে।'[১] এ কারণে ইমাম তিরমিজি উক্ত হাদিসের শিরোনাম লিখেছেন 'সকল আমল শেষ পরিণতির উপর নির্ভরশীল'।

উক্ত হাদিসের তাৎপর্য বান্দার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার জীবনের শেষ মুহূর্তে তাকে জান্নাতি কিংবা জাহান্নামি বানানো নয়; জীবনের শেষ সময়ে তাকদিরের মাধ্যমে কারও সারা জীবনের আমল বরবাদ করে তাকে জুলুম করা নয়; বরং হাদিসের তাৎপর্য হলো, মানবজীবনের সর্বশেষ মুহূর্তের গুরুত্ব তুলে ধরা। অর্থাৎ কোন পরিস্থিতিতে মানুষের মৃত্যু হবে সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সবসময় ভালো কাজের মাধ্যমে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বৃদ্ধ হলে তাওবা করব, ঠিক হয়ে যাবো—এমন চিন্তা চরম নির্বুদ্ধিতা। যেখানে এক মুহূর্ত পরে তার পরিণতি সম্পর্কে কেউ জানে না, সেখানে কবে বৃদ্ধ হবে আর তাওবা করবে সেটার নিশ্চয়তা তাকে কে দেবে?

আর হাদিসে জীবনের শেষ মুহূর্তে ভাগ্যলিপি এসে যে ফারাক তৈরি করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, এখানে বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং এই হাদিসকেও

---

১. তিরমিজি (২১৩৭)।

পিছনের হাদিসগুলোর মতো বুঝতে হবে। অর্থাৎ কোনো লোক সারা জীবন ভালো কাজ করেছে, জীবনের শেষ মুহূর্তেও সে ভালো কাজ করে জান্নাতে যেত, কিন্তু আল্লাহ ভাগ্যের মাধ্যমে তাকে জান্নাত থেকে ঘুরিয়ে জাহান্নামে ছুড়ে ফেললেন— তেমন নয়; বরং আল্লাহ জানতেন যে, সারা জীবন ভালো কাজ করার পরেও মৃত্যুর আগ মুহূর্তে জাহান্নামিদের কাজ করে জাহান্নামে যাবে। সুতরাং মৃত্যুর আগ মুহূর্তে জান্নাতি মানুষটাকে ভাগ্যলিপি জাহান্নামি বানিয়ে দেবে—এমন নয়; বরং সে জাহান্নামি হবে এটা আল্লাহ আগেই জেনেছেন এবং সে অনুযায়ী লিখে রেখেছেন, মৃত্যুর আগ মুহূর্তে কেবল সেটা প্রকাশ পাবে। ফলে তার কর্মের জন্য সে দায়ী; ভাগ্যলিপি নয়।

সারা জীবন খারাপ কাজ করে মৃত্যুর আগ মুহূর্তে জান্নাতি, আর সারা জীবন ভালো কাজ করে শেষ মুহূর্তে জাহান্নামি হওয়ার অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। যেমন: নিষ্ঠাহীনতা, লৌকিকতা কিংবা অন্য যেকোনো অপরাধে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চনা এবং শেষে নিজ কর্মফলে পথ হারানো। অপরদিকে সারা জীবন খারাপ কাজ করে মৃত্যুর আগ মুহূর্তে ভালো কাজ করারও অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। যেমন নিষ্ঠা, বিনয় কিংবা যেকোনো সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহের পাত্র হওয়া এবং ফলাফলে জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাওয়া। তবে আল্লাহর অনুগ্রহে পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়ম হলো, যিনি সারা জীবন নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহর আনুগত্য করেন, তার মৃত্যু আনুগত্যের উপরেই হয়। আর যে সারা জীবন আল্লাহর অবাধ্য থাকে, গুনাহের কাজ করে, তার মৃত্যু মন্দের উপর হয়।

সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে: উপরে উল্লিখিত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজি.-এর হাদিস এই মূলনীতির ভিত্তি।[১] ইবনে মাসউদ ছাড়া অন্যান্য সাহাবি থেকেও বিভিন্ন গ্রন্থে হাদিসটি এসেছে। আনাস ইবনে মালেক রাজি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তায়ালা মাতৃগর্ভে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত রাখেন। তিনি বলেন, হে প্রভু বীর্য, হে প্রভু রক্তপিণ্ড, হে প্রভু মাংসপিণ্ড। এর পর যখন সৃষ্টির সর্বশেষ ধাপ সম্পন্ন করার সময় আসে, তখন তিনি বলেন, হে প্রভু পুরুষ নাকি নারী? সৌভাগ্যবান নাকি দুর্ভাগা? রিজিক ও জীবনকাল কী? এভাবে সবকিছু মায়ের পেটে থাকতেই লেখা হয়।[২] জাবের রাজি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন মাতৃগর্ভে বীর্য ৪০ দিন অথবা ৪০ রাত

---

১. তিরমিজি (২১৩৭)।
২. বুখারি (৩১৮, ৩৩৩৩)।

অবস্থান করে, তখন আল্লাহ তায়ালা একজন ফেরেশতা পাঠান। তিনি বলেন, হে রব, তার রিজিক কী হবে? তাকে বলে দেওয়া হয়। এরপর প্রশ্ন করেন, হে রব, তার জন্মকাল কতটুকু হবে? তাকে বলে দেওয়া হয়। এরপর প্রশ্ন করেন, হে রব, নারী হবে নাকি পুরুষ হবে? তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়। এরপর প্রশ্ন করেন, হে রব, সৌভাগ্যবান হবে নাকি দুর্ভাগা? তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়।[১]

এই হাদিসগুলোকে পূর্বের হাদিসগুলোর মতো একই মূলনীতিতে বুঝতে হবে। সেটা হলো, আল্লাহ তায়ালা মানুষের পেটে থাকা অবস্থায় সৌভাগ্যবান অথবা দুর্ভাগা লিখে দেন, এর পর পৃথিবীতে এসে সে রোবটের মত তা-ই করে—ব্যাপারটা এমন নয়। এমন হলে তো বান্দার কোনো দোষ থাকে না। কারণ, আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। সুতরাং তাঁর জন্মের আগেই যদি সে সৌভাগ্যবান নাকি দুর্ভাগা লেখা হয়ে যায়, তবে আল্লাহর সেই লেখার বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। বোঝা গেল, হাদিসগুলোর উদ্দেশ্য বাহ্যিক অর্থ নয়; বরং অভ্যন্তরীণ মর্ম। আর তা হলো, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। সে চাইলে ঈমান ও কুফর, তাওহিদ ও শিরক—এগুলোর মাঝে যেকোনো একটা নিজ ইচ্ছায় বেছে নিতে পারে। আল্লাহ তায়ালা যেহেতু সবকিছু জানেন, তাই প্রত্যেক সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার আগেই সে কোনটা বেছে নেবে তা খুব ভালোভাবে জানেন এবং সেটা লিখে রাখেন। কিন্তু ফেরেশতা যেহেতু জানেন না, তাই প্রশ্ন করে জেনে নেন। সুতরাং কাউকে সৌভাগ্যবান আর কাউকে দুর্ভাগা লেখার অর্থ হলো—যিনি সৌভাগ্যবান হবেন, তিনি তার নিজ কর্ম ও আল্লাহর অনুগ্রহে সৌভাগ্যবান হবেন; আর যে দুর্ভাগা হবে, সে নিজের কর্ম ও আল্লাহর ইনসাফের কারণে দুর্ভাগা হবে। আল্লাহ তায়ালা যেহেতু সবকিছু জানেন, তিনি তা লিখে রেখেছেন এবং তিনি চাইলে নিজ অনুগ্রহে যে কাউকে সৌভাগ্যবান করতে পারেন, আবার ইনসাফের ভিত্তিতে যে কাউকে দুর্ভাগা বানাতে পারেন, এ জন্যই মূলত সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের ফয়সালা তার দিকেই সম্পৃক্ত করা হয়।

---

১. মুসনাদে আহমদ (১৫৫০২)।

وَأَصْلُ الْقَدَرِ سِرُّ اللهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ، لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ. وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الْخِذْلَانِ، وَسُلَّمُ الْحِرْمَانِ، وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ، فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ ذَلِكَ نَظَرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةً، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى طَوَى عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ أَنَامِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ فَمَنْ سَأَلَ لِمَ فَعَلَ فَقَدْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ، وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.

তাকদির সৃষ্টিজগতের ব্যাপারে আল্লাহর এক গোপন রহস্য। আল্লাহর নিকটবর্তী কোনো ফেরেশতা কিংবা প্রেরিত নবিরও এ সম্পর্কে জ্ঞান নেই; বরং এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি এবং অধিক চিন্তাভাবনা দুর্ভাগ্য বয়ে আনে, বঞ্চিত করে, অবাধ্যতার পথে নিয়ে যায়। সুতরাং তাকদির নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনা এবং মনের কুমন্ত্রণার ব্যাপারে পূর্ণ সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিজগতের কাছ থেকে তাকদিরের জ্ঞান ঢেকে রেখেছেন। এর পিছনে পড়তে নিষেধ করেছেন। যেমন: তিনি বলেছেন, 'তিনি যা করেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হন না, কিন্তু তারা যা করে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।' সুতরাং কেউ যদি বলে, 'তিনি কেন এটা করলেন', তবে সে আল্লাহর কিতাবের আইনকে অমান্য করল। আর যে আল্লাহর কিতাবের আইন অমান্য করে, সে কাফের।

ব্যাখ্যা

তাকদির নিয়ে অতিরিক্ত অনুসন্ধান নিষিদ্ধ: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমামদের সর্বসম্মতিক্রমে তাকদির একটি রহস্যপূর্ণ বিষয়, যা সৃষ্টির সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়ের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কারণ, **আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিজগতের কাছ থেকে তাকদিরের জ্ঞান ঢেকে রেখেছেন। এর পিছনে পড়তে নিষেধ করেছেন।** ফলে এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহে যতটুকু এসেছে, ততটুকুতে ঈমান আনার মাঝেই সীমাবদ্ধ

থাকতে হবে। প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহর কাছে সঁপে দিতে হবে। যে ব্যক্তি এক্ষেত্রে দুঃসাহসিকতা দেখাবে, সে হোঁচট খাবে। সত্যের পথ থেকে পা পিছলে গোমরাহির গহ্বরে নিপতিত হবে। কারণ কুরআন-সুন্নাহে তাকদির নিয়ে বিভিন্ন মূলনীতির উল্লেখ থাকলেও মানুষের মনে উত্থাপিত সকল প্রশ্নের জবাব নেই তাতে, কিংবা থাকলেও মানুষের সেগুলো বোঝার সামর্থ্য নেই। কেননা এটা বোঝার মেশিনই দেওয়া হয়নি মানুষকে। এ কারণে বরং কুরআনের অনেক আয়াতের রহস্য নিয়ে মানুষ কূল-কিনারা করতে পারবে না। যেমন: আল্লাহর বাণী:

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

অর্থ: 'আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে হিদায়াত দিতাম; কিন্তু আমার এ উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি অবশ্যই জিন ও মানব সকলকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব।' [সাজদা: ১৩] আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ: 'আপনার রব যদি চাইতেন, তবে ভূপৃষ্ঠের সবাই সামগ্রিকভাবে মুমিন হয়ে যেত। অতএব, আপনি কি মানুষকে মুমিন হওয়ার জন্য বাধ্য করবেন?' [ইউনুস: ৯৯] অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ يُّرِدِ اللهُ أَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُّرِدْ أَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ.

অর্থ: 'আল্লাহ যাকে হিদায়াত দিতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন; আর যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন, যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। এভাবেই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন।' [আনআম: ১২৫]

মুফাসসিরগণ বিভিন্নভাবে এসব আয়াতের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমরা যদি এসব আয়াতের গভীরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, আসলেই আল্লাহ কেন দুনিয়ার সবাইকে মুমিন বানাতে চাননি? কেন আল্লাহ তার সৃষ্টি করা একদল মানুষ ও জিনকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবেন? দুনিয়াতে ভালো-মন্দের অস্তিত্ব কেন? তিনি

চাইলে কেবল ভালো দিয়েও তো দুনিয়ার জীবন বৈচিত্র্যময় করে সাজাতে পারতেন, যেহেতু তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন। আমাদের তিনি কেন পরীক্ষা করলেন? তিনি চাইলে আমাদের পরীক্ষা ছাড়াও তো জান্নাত দিতে পারতেন, যেহেতু তিনি জানেন অধিকাংশ মানুষই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে না, ফলে তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামে যেতে হবে। তা হলে এমন পরীক্ষা করার কী প্রয়োজন ছিল? তাদের সৃষ্টি না করলেই কি তাদের প্রতি অনুগ্রহ হতো না? কারণ, তাদের কেউ তো আল্লাহর কাছে নিজেকে সৃষ্টির আবেদন করেনি। কেউ জান্নাতে গেলে যদি তাঁর ক্ষতি না হয় এবং জাহান্নামে গেলে তাঁর লাভ না হয়, তা হলে জাহান্নাম সৃষ্টিরই-বা কী দরকার ছিল? নাউজুবিল্লাহ!

এগুলো নিতান্তই কিছু উদাহরণ। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, এই পথে চলতে থাকলে এ-রকম প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসতেই থাকবে, যে প্রশ্নের কোনো শেষ নেই, যে অন্ধকারের কোনো সীমা নেই। ধীরে ধীরে এভাবে মানুষ অন্ধকারে তলিয়ে যাবে। হয়তো বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে, কিন্তু এগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ ও চূড়ান্ত উত্তর মানবীয় সামর্থ্য-সীমার উর্ধ্বের বিষয়। আল্লাহ এগুলো অবশ্যই কোনো-না-কোনো হিকমতের কারণে করেছেন। কিন্তু মানুষের নিজস্ব সীমাবদ্ধতা জানতে ও মানতে হবে। এটার নামই ঈমান। যে এক্ষেত্রে আত্মম্ভরিতা দেখাবে, নিজের জ্ঞান নিয়ে অতি অহংকারী হবে, তার ধ্বংস অনিবার্য।

এ জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িন, সালাফ ও খালাফ সকল যুগেই উলামায়ে কেরাম মানুষকে তাকদির নিয়ে অতিরিক্ত অনুসন্ধান ও ঘাঁটাঘাঁটি করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। কুরআন ও সুন্নাহে এ ব্যাপারে যা এসেছে, ততটুকুর মাঝে ঈমান এনে সীমাবদ্ধ থাকা আবশ্যক মনে করেন। যারা তাদের নিষেধাজ্ঞা শুনেছে, তাকদিরের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বক্তব্যের মাঝে সন্তুষ্ট থেকেছে, অতিরিক্ত অনুসন্ধান ও বিবেক-বুদ্ধি খাটানো থেকে বিরত থেকেছে, তারা নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে পেরেছে, মুক্তি পেয়েছে। বিপরীতে যারা এসব নিষেধাজ্ঞায় কর্ণপাত করেনি, কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং নিজের সীমাবদ্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ বিবেক-বুদ্ধিকে মানদণ্ড ধরে এই সুপ্ত সুড়ঙ্গে প্রবেশের দুঃসাহস দেখিয়েছে, তারা এর অন্ধকারে হারিয়ে গেছে, কখনও বের হতে পারেনি। এ কারণে ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলিম উম্মাহর

বিভিন্ন সম্প্রদায় এটা নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে ধ্বংস হয়েছে। যদি এটা বোঝা এত সহজই হতো, এতগুলো সম্প্রদায় বিভ্রান্ত হতো না।

আবু হুরাইরা রাজি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাদের মাঝে বের হলেন। তখন আমরা তাকদির নিয়ে বিবাদ করছিলাম। তিনি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন। তাঁর মুখ লাল হয়ে যায়। মনে হচ্ছিল সেখানে ডালিম নিংড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, 'তোমাদের কি এটা করতে বলা হয়েছে? আমি কি এটা নিয়ে তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি? তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা তখনই ধ্বংস হয়েছিল যখন এটা নিয়ে তারা বিতর্ক শুরু করেছিল। তাই আমি তোমাদের কঠোরভাবে এটা নিয়ে বিতর্ক করতে নিষেধ করে দিচ্ছি।'[১] ইমাম তিরমিজি উক্ত অধ্যায়ের শিরোনাম লিখেছেন 'তাকদির নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ও খোঁড়াখুঁড়ি নিষিদ্ধ'।

আমর ইবনে শুআইব তার পিতা থেকে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে দেখলেন সাহাবাগণ তাকদির নিয়ে কথা বলছেন। তিনি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলেন। মনে হচ্ছিল তার মুখে ডালিম নিংড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি তাদের লক্ষ্য করে বললেন, 'কী ব্যাপার? তোমরা আল্লাহর কিতাবের একটি অংশকে অপর অংশের বিরুদ্ধে দাঁড় করাচ্ছ কেন? এভাবেই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।' বর্ণনাকারী বলেন, আমি কোনো দিন রাসুলুল্লাহর কোনো মজলিসে অনুপস্থিত থেকে খুশি হইনি, যতটা খুশি সেদিন হয়েছিলাম (কারণ তিনি রাসুলুল্লাহর ক্রোধ থেকে বেঁচে গিয়েছেন)।[২] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও সাওবান থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তাকদির নিয়ে আলোচনা শুরু হয়, তখন সেটা থেকে বিরত থাকো।'[৩]

ইমাম আজুররি (মৃ. ৩৬০ হি.) লিখেন, মুসলমানদের তাকদির নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা উচিত নয়। কেননা তাকদির আল্লাহর একটি রহস্য। তাই ভালো-মন্দ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়—এতটুকুতে ঈমান আবশ্যক। এর বাইরে কেউ চিন্তা করতে গেলে তাকদিরের যেকোনো বিষয় অস্বীকার করে বসতে পারে; আর এভাবে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যেতে পারে।[৪]

---

১. তিরমিজি (২১৩৩); মুসানদে আবু ইয়ালা (৬০৪৫); বাজ্জার (১০০৬৩); মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক (৯৭৩৭)।
২. মুসনাদে আহমদ (৬৭৭৯)।
৩. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (১৪২৭, ১০৪৪৮); আল-মাতালিবুল আলিয়াহ (২৯৫৬)।
৪. আশ-শরিয়াহ (২/৭০২)।

ইবনে আবদুল বার (৪৬৩ হি.) লিখেন, 'তাকদির আল্লাহর রহস্য। অনুসন্ধান কিংবা বিবাদের মাধ্যমে এটা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। দলিল-প্রমাণ ও মুনাজারার মাধ্যমে এ সম্পর্কে পূর্ণ তৃপ্তিলাভ সম্ভব নয়। তাই মুমিনের জন্য এক্ষেত্রে যথেষ্ট হচ্ছে, সে বিশ্বাস করবে—জগতে আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনোকিছুই হয় না। সৃষ্টি ও নির্দেশ আল্লাহরই। আরও বিশ্বাস রাখবে—আল্লাহ কাউকে বিন্দু পরিমাণ জুলুম করেন না; কারও উপর তার সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপিয়ে দেন না। তিনি পরম করুণাময়, দয়ার সাগর।'[১]

সামআনি (মৃ. ৪৮৯ হি.) বলেন, 'তাকদির সম্পর্কে জানার একমাত্র মাধ্যম হলো কুরআন ও সুন্নাহ। বিবেক-বুদ্ধি কিংবা অনুমান খাটিয়ে এটা জানা সম্ভব নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে না, সে বিভ্রান্ত হবে। হতবুদ্ধিতার সাগরে ঘুরতে থাকবে; কখনোই সমাধানের সৈকতে পৌঁছাতে পারবে না; কখনোই তার হৃদয় প্রশান্ত হবে না। কারণ, তাকদির আল্লাহর একটি গোপন বিষয়, যার জ্ঞান তাঁর কাছেই রয়েছে। বিশেষ হিকমতের কারণে গোটা সৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। যে কারণে কোনো নবি-রাসুল কিংবা ফেরেশতা পর্যন্ত এ সম্পর্কে কিছু জানতে সক্ষম হননি। বলা হয়, তাকদিরের রহস্য জান্নাতে গেলে উদঘাটিত হবে। জান্নাতে প্রবেশের আগ পর্যন্ত এ রহস্য উদঘাটিত হবে না।'[২]

বরং মুসলিম উম্মাহর মাঝে কিছু মানুষ যে তাকদিরের ক্ষেত্রে বিচ্যুতির শিকার হবে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটার ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাজি. বলেন আমি রাসুলুল্লাহকে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই আমার উম্মতের ভিতরে এমন কিছু সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা তাকদির অস্বীকার করবে।'[৩] ইবনে উমর থেকে আরেকটি বর্ণনায় এসেছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'শেষ যুগে একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা তাকদির অস্বীকার করবে। সাবধান! তারা এই উম্মতের অগ্নিপূজারী (মাজুস)। তারা অসুস্থ হলে তোমরা দেখতে যাবে না, মৃত্যুবরণ করলে (জানাজা/কাফন/দাফনে) উপস্থিত হবে না।'[৪]

---

১. আত-তামহিদ (৩/১৩৯)।
২. ফাতহুল বারি, ইবনে হাজার (১১/৪৭৭)।
৩. আবু দাউদ (৪৬১৩); সুনানে কুবরা, বাইহাকি (২০৯৪০); মুসতাদরাকে হাকেম (২৮৪)।
৪. তাবারানি, আল-মুজামুস সাগির (৮০০); আল-আওসাত (৫৩০৩)।

তাকদির নিয়ে প্রশ্ন করার বিধান: ইমাম তহাবির বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী তাকদির নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না। কারণ, তিনি বলেছেন, **'তিনি (আল্লাহ) যা করেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হন না, কিন্তু তারা যা করে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'** সুতরাং **কেউ যদি বলে, 'তিনি কেন এটা করলেন', তবে সে আল্লাহর কিতাবের আইন অমান্য করল। আর যে আল্লাহর কিতাবের আইন অমান্য করে, সে কাফের।** এর মানে কি এটা যে, কোনো ব্যক্তি তাকদিরের যেকোনো বিষয় নিয়ে যদি বলে 'এটা আল্লাহ কেন করলেন', তা হলে কাফের হয়ে যাবে? এটা ইমাম তহাবির কথার বাহ্যিক অর্থ। কিন্তু প্রকৃত মর্ম অন্যরকম। তাকদির নিয়ে আলোচনাই করা যাবে না—এমন নয়। কারণ, এমন হলে কুরআন-সুন্নাহে তাকদির নিয়ে এত আলোচনা থাকত না। বরং বিভিন্ন বর্ণনায় আমরা দেখি স্বয়ং তাবেয়িরা সাহাবাদের তাকদির নিয়ে প্রশ্ন করছেন, আর সাহাবারা সেগুলোর জবাব দিচ্ছেন।[১] ইমাম তহাবির কথার অর্থ হচ্ছে, তাকদির নিয়ে অন্যায়ভাবে বিতর্ক ও অমূলক কথা বলা যাবে না; না জেনে অনুমান-নির্ভর বক্তব্য দেওয়া যাবে না; আল্লাহর কোনো সিদ্ধান্তের উপর আপত্তি তোলা যাবে না। ইবনে আবদুল বার বলেন, যে ব্যক্তি জানার জন্য এবং নিজের অজ্ঞতা দূর করার জন্য দ্বীনি প্রয়োজনে প্রশ্ন করবে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, অজ্ঞতার চিকিৎসা প্রশ্নই। কিন্তু যে ব্যক্তি জানার উদ্দেশ্যে নয়, বরং হঠকারিতামূলক প্রশ্ন করবে, এমন প্রশ্ন বৈধ নয়।[২]

---

১. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (১০৫৬৪)।
২. আত-তামহিদ (২১/২৯২)।

فَهٰذِهِ جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ مُنَوَّرٌ قَلْبُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ تَعَالَى، وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ، لِأَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ: عِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَوجُودٌ، وَعِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَفْقُودٌ، فَإِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ كُفْرٌ، وَادِّعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ كُفْرٌ، وَلَا يَثْبُتُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِقَبُولِ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ وَتَرْكِ طَلَبِ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ.

আলোকিত অন্তরের অধিকারী আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জন্য (তাকদির বিষয়ে) এটুকুই যথেষ্ট। এটাই জ্ঞানীদের স্তর। কারণ, জ্ঞান দুই প্রকার: বিদ্যমান জ্ঞান এবং অবিদ্যমান জ্ঞান। বিদ্যমান জ্ঞানকে অস্বীকার করা কুফর, ঠিক যেমন অবিদ্যমান জ্ঞানের দাবি করা কুফর। আর ঈমানের মূল কথা হলো, বিদ্যমান জ্ঞান গ্রহণ করা, অবিদ্যমান জ্ঞানের অনুসন্ধান বর্জন করা।

ব্যাখ্যা

কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান ও অদৃশ্যের জ্ঞান: বিদ্যমান জ্ঞান বলতে সেসব জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে যা কুরআন-সুন্নাহ থেকে উৎসারিত, অথবা মানুষের বিবেক-বোধ ও মস্তিষ্কের মাধ্যমে অর্জিত। যেমন: আল্লাহ ও পরকালের অস্তিত্ব, শরিয়তের হালাল-হারাম, আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি। এগুলো যেমন কুরআন-সুন্নাহর মাধ্যমে জানা যায়, একইভাবে মানুষের সুস্থ বুদ্ধিমত্তা ও মস্তিষ্কও এগুলোর সত্যতার বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং কুরআন-সুন্নাহ ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত এসব বিষয়কে অস্বীকার করা কুফর। কারণ, এতে কুরআন-সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। অপরদিকে অবিদ্যমান জ্ঞান হচ্ছে অদৃশ্যের জ্ঞান যা মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। যেমন আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির স্বরূপ, তাকদির, কিয়ামতের সময় নির্ধারণ ইত্যাদি। এসব জ্ঞানের দাবি করা কুফর। কারণ, এতে আল্লাহর বিশেষণকে নিজের জন্য দাবি করা হয়। ফলে এমন জ্ঞান কারও জন্য দাবি করা যাবে না; না নিজের জন্য, না নবি-রাসুলের জন্য। অনেক চরমপন্থি সুফি রাসুলকে আলিমুল গায়েব মনে করে। এটা সুস্পষ্ট গোমরাহি।[১] আল্লাহ তায়ালা বলেন,

---

১. গজনবি (১০০); হারারি (১৪২)।

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ۚ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۚ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

অর্থ: 'নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জানেন গর্ভাশয়ে যা থাকে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন মাটিতে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।' [লুকমান: ৩৪] আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহকে বলতে বলেন,

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ

অর্থ: 'আপনি বলুন, আকাশ ও জমিনে যারা আছে, তাদের কেউ গায়েব জানে না। গায়েব জানেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা।' [নামল: ৬৫] অন্য একটি আয়াতে রাসুলুল্লাহকে বলতে বলেন,

وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ

অর্থ: 'আমি যদি গায়েব জানতাম, তবে নিজের জন্য অধিক কল্যাণ সংগ্রহ করতাম।' [আরাফ: ১৮৮] হ্যাঁ, আল্লাহর রাসুল গায়েবের কিছু কিছু বিষয় জানেন, তবে সেটা শুধু সেগুলোই যেগুলো আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ

অর্থ: 'তাঁর জ্ঞান থেকে তারা কোনোকিছুই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন।' [বাকারা: ২৫৫] ফলে এটাকে গায়েব জানা বলে না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম কিয়ামতের ক্ষণকাল জিজ্ঞাসা করেন, তিনি জবাব দেন, প্রশ্নকারীর চেয়ে যার কাছে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি এ ব্যাপারে অতিরিক্ত কিছু জানেন না। অর্থাৎ এটা যেমন জিবরাইল জানেন না, তেমনইভাবে নবিজিও জানেন না।[১]

কুরআন-সুন্নাহ কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান অস্বীকার করা একধরনের অজ্ঞতা ও মূর্খতা বটে। যেমন: আল্লাহর অস্তিত্ব, পরকালের অস্তিত্ব—এগুলো কুরআন-সুন্নাহর বাইরে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল দ্বারাও সমর্থিত। কারণ, আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র একটা বস্তুও এমনি এমনি অস্তিত্বে আসে না, বরং আমাদের তৈরি করতে হয়। সেখানে এই বিশাল মহাজগৎ কীভাবে একজন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া সৃষ্টি হয়ে যাবে? একইভাবে এই পৃথিবীর জীবন যদি একমাত্র জীবন

১. বুখারি (৫০); মুসলিম (৮)।

হয়, তা হলে পৃথিবীতে ন্যায়-নীতি ও মূল্যবোধ বলতে কিছুর অস্তিত্ব থাকত না। সে ব্যক্তিই সফল হিসেবে গণ্য হতো, যে জোর-জুলুম, হত্যা-অপহরণ, চুরি-লুণ্ঠন কিংবা যেকোনো পন্থায় মানুষকে ঠকিয়ে সবকিছু নিজে একা ভোগ করে। কারণ জীবন একটাই। পরবর্তী জীবন বলতে কোনোকিছুই নেই। সুতরাং এত মূল্যবোধ দিয়ে কী হবে? অথচ সেটা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। ভালো কাজের প্রতিদান আর মন্দ কাজের শাস্তি জগতের চিরন্তন নিয়ম। তা হলে যেসব জালেম কিংবা অপরাধী কোনো প্রকার শাস্তি পাওয়া ছাড়াই মৃত্যুবরণ করে, তাদের বিচারের কী হবে? এ কারণেই মৃত্যুর পরে একটা জীবন থাকা বাঞ্ছনীয়, যেখানে এসব অন্যায়-অত্যাচারের বিচার হবে।

একইভাবে তাকদিরের জ্ঞান অস্বীকার করা মূর্খতা। কারণ, বিশ্বজগতের কোটি কোটি মানুষ এবং অগণন প্রাণিকুলের মাঝে যদি শৃঙ্খলা বেঁধে দেওয়া না হয়, সুষ্ঠুভাবে সবকিছু বন্টন করে দেওয়া না হয়, তবে গোটা পৃথিবীতে নৈরাজ্য লাগবে, বিশৃংঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং এটাকে অস্বীকারের সুযোগ নেই।[১] ইবনে উমর বলেন, আল্লাহর কসম! যদি কারও কাছে উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে, আর সে পুরোটা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দেয়, আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন না, যদি না সে তাকদিরে বিশ্বাস রাখে।[২]

আনুগত্যের সদিচ্ছা থাকলে স্বল্পজ্ঞান নিয়েও মানুষ বিশাল মহামানব হয়ে যেতে পারে। আর আনুগত্যের সদিচ্ছা না থাকলে জ্ঞানের জাহাজ নিয়েও কূপমণ্ডুক হতে পারে মানুষ। এ যুগে এসে অনেকেই কুরআন-সুন্নাহ ও অদৃশ্যে বিশ্বাসকে অন্ধবিশ্বাস ভাবে। তাদের মতে এটা পশ্চাৎপদতা, অতীতে পড়ে থাকা, প্রগতিশীলতা ও আলোকিত মননের বিরোধিতা। অথচ দিনশেষে এসব মানুষ নিজেরাই আধ্যাত্মিক, মানসিক, সামাজিক সকল দিক থেকে হতাশাগ্রস্ত, দুর্ভাগা, অন্ধকার জগতের বাসিন্দা। এ কারণে কুরআনকে মুত্তাকিদের জন্য হিদায়াত বলা হয়েছে [বাকারা: ২]। কারণ, যারা আল্লাহকে ভয় করে না, অদৃশ্যে বিশ্বাস রাখে না, ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ও সীমাবদ্ধ বুদ্ধিই যাদের কাছে সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড, তারা কুরআন দ্বারাও হিদায়াত পাবে না। তাকদিরের বিষয়টাও তেমন। এটার স্বরূপ ও সর্বপ্রকার রহস্য না জানা থাকলেও অন্তর্জ্ঞানসম্পন্ন আল্লাহর প্রিয় মানুষদের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। বিপরীতে মূর্খ ও কূপমণ্ডুকদের যত ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক, তাদের কাছে যতই স্পষ্ট করা হোক, তারা এটা অস্বীকারই করে যাবে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের কুরআন-সুন্নাহে বিদ্যমান জ্ঞানের আনুগত্য করতে হবে, অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহর কাছে সঁপে দিতে হবে।

---

১. সাইদ ফুদাহ (৮০৯-৮১০)।
২. মুসলিম (৮)।

وَنُؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَبِجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْ رُقِمَ. فَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللهُ تَعَالَى فِيهِ أَنَّهُ كَائِنٌ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائِنٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ. وَلَوِ اجْتَمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللهُ تَعَالَى فِيهِ لِيَجْعَلُوهُ كَائِنًا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ. جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَا أَخْطَأَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ.

আমরা লাওহ (মাহফুজে), কলম এবং (লাওহে) লিপিবদ্ধ সবকিছুতে বিশ্বাস করি। সুতরাং তাতে যদি কোনো বিষয় 'হবে' বলে লেখা থাকে, গোটা সৃষ্টি মিলেও সেটাকে প্রতিহত করতে পারবে না। একইভাবে তাতে যদি কোনো বিষয় 'হবে না' লেখা থাকে, গোটা সৃষ্টির সবাই মিলেও সেটা করতে পারবে না। কলম শুকিয়ে গেছে। ফলে যা লেখা হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত সেগুলোই থাকবে। কেউ যা পায়নি, সে কখনও তা পাওয়ারই ছিল না। আর যা পেয়েছে, কখনও তা হারানোরই ছিল না।

ব্যাখ্যা

বর্তমান আলোচনা তাকদির বিষয়ে আলোচনার ধারাবাহিকতা। গ্রন্থকার ইমাম তহাবির যুগে তাকদির নিয়ে বিভ্রান্তি তুঙ্গে ছিল। এক্ষেত্রে বিভ্রান্তির শিকার অনেক সম্প্রদায় তখন ময়দানে ছিল। সে কারণে এমন একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থেও জায়গায় জায়গায় তিনি তাদের খণ্ডন করেছেন। তা ছাড়া তাকদিরে বিশ্বাস ঈমানের ছয় রুকনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুকন। আলি রাজি. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'চারটি বিষয়ে ঈমান না আনা পর্যন্ত কেউ মুমিন হতে পারবে না—এক+দুই: আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল—এই সাক্ষ্য দেওয়া। তিন. মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান সম্পর্কে বিশ্বাস করা। চার. তাকদিরে ঈমান আনা।'[১] জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না,

১. সহিহ ইবনে হিব্বান (১৭৮)।

যতক্ষণ না সে তাকদিরের ভালো-মন্দে ঈমান আনে, যতক্ষণ না সে এই বিশ্বাস রাখে যে, সে যা পেয়েছে তা কখনও হারানোর ছিল না, আর যা সে হারিয়েছে তা কখনও পাওয়ারই ছিল না।'[১] আবুদ দারদা রাজি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'প্রত্যেকটি বস্তুর একটি মর্ম থাকে; আর ঈমানের মর্মের গভীরে কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ না সে বিশ্বাস রাখবে—সে যা পেয়েছে তা কখনও হারানোরই ছিল না; আর যা সে হারিয়েছে কখনও তা পাওয়ারই ছিল না।'[২] আবুদ দারদা থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ বলেন, 'তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক. মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান। দুই. মদ্যপানে আসক্ত ব্যক্তি। তিন. তাকদির অস্বীকারকারী।'[৩] ইবনে উমর বলেন, 'আল্লাহর কসম! যদি কারও কাছে উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে, আর সে পুরোটা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দেয়, আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন না যদি না সে তাকদিরে বিশ্বাস রাখে।'[৪]

অধিকন্তু তাকদিরের প্রতি ঈমানকে অনেক মানুষ অস্বীকার করে, কিংবা এটা বোধগম্য না হওয়াতে সন্দেহ পোষণ করে। এ জন্য ইমাম তহাবি বিভিন্নভাবে বারবার তাকদিরের আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

লাওহ ও কলম: তাকদিরের প্রতি ঈমান যেসব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, তন্মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে লাওহে মাহফুজ ও কলমের উপর ঈমান আনা। এর অর্থ হচ্ছে—আল্লাহ তায়ালা গোটা সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার পূর্বে সবকিছু বিস্তারিত জেনেছেন, এরপর তিনি সেগুলো তাঁর জানা অনুযায়ী কলমের মাধ্যমে উর্ধ্ব জগতে **লাওহে মাহফুজ** নামক সুরক্ষিত ফলকে লিখে রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা ওখানে যা লিখে রেখেছেন, জগতে সেগুলোই অক্ষরে অক্ষরে ঘটবে। কোনোকিছু চুল পরিমাণ এদিক-সেদিক হবে না। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাতে কী লেখা আছে জানে না—না কোনো ফেরেশতা কিংবা কোনো রাসুল। ফলে তাদের আল্লাহ যতটুকু জানান, ততটুকুই জানেন। সুতরাং কোনো ওলি-আউলিয়া লাওহে মাহফুজের খবর রাখবে—এটা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। প্রত্যেক মুমিনকে লাওহে মাহফুজে বিশ্বাস রাখতে হবে। যে এটাতে বিশ্বাস রাখবে না সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। আহলে সুন্নাতের সকলে এ ব্যাপারে সর্বসম্মত আকিদা রাখেন।

---

১. তিরমিজি (২১৪৪)।
২. মুসনাদে আহমদ (২৮১৩৫)।
৩. মুসনাদে তয়ালিসি (১২২৭); মুসনাদে আহমদ (২৮১২৯); বাজ্জার (৪১০৬)।
৪. মুসলিম (৮); সহিহ ইবনে হিব্বান (১৬৮)।

লাওহে মাহফুজকে শরিয়তে বিভিন্ন নাম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কখনও 'লাওহ', কখনও 'কিতাব', কখনও 'উম্মুল কিতাব' কখনও 'কিতাব মুবিন' ইত্যাদি। কিন্তু সর্বত্রই এটাকে জগতের সবকিছুর তাকদির লিখে রাখার স্থান বোঝানো হয়েছে। কুরআনে অধিকাংশ জায়গায় এটাকে 'কিতাব' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.

অর্থ: 'আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ জানেন যা-কিছু আকাশে ও পৃথিবীতে আছে? নিশ্চয়ই এসব কিতাবে লিখিত আছে। এটা আল্লাহর জন্য সহজ।' [হজ: ৭০] অন্য আয়াতে বলেন,

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.

অর্থ: 'আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোনো গোপন ভেদ নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে না আছে।' [নামল: ৭৫] অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.

অর্থ: 'বস্তুত যে অবস্থাতেই তুমি থাকো আর কুরআনের যে অংশ থেকেই পাঠ করো, কিংবা যে কাজই তোমরা করো, আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি যখন তোমরা তাতে মগ্ন হয়ে যাও। আর আকাশ কিংবা পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র কণাও তোমার রবের কাছ থেকে গোপন থাকে না। আর এরচেয়ে বড় কিংবা ক্ষুদ্র যা-কিছু রয়েছে, সব সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ।' [ইউনুস: ৬১]

অপর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.

অর্থ: 'তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে গাছের পাতা

ঝরে না। কোনো শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোনো আর্দ্র ও শুষ্ক (জীবিত ও মৃত) দ্রব্য নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত নেই।' [আনআম: ৫৯] অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ.

অর্থ: 'আর পৃথিবীতে যত বিচরণশীল প্রাণী রয়েছে, সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন। তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমর্পিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে।' [হুদ: ৬] অন্য এক আয়াতে বলেন,

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ۗ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ.

অর্থ: 'পৃথিবীতে এবং তোমাদের উপর যা-কিছু বিপদ আসে, তা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।' [হাদিদ: ২২] সকল জিনিসের মতো লাওহে মাহফুজে কুরআনও লেখা আছে। আল্লাহ বলেন,

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۙ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ.

অর্থ: 'বরং এটা সম্মানিত কুরআন, সুরক্ষিত ফলকে।' [বুরুজ: ২১-২২]

একাধিক হাদিসে লাওহে মাহফুজের কথা এসেছে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সকল মাখলুকের তাকদির সৃষ্টি করেছেন। তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে।'[১] আলি রাজি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বাকিউল গারকাদে একটি জানাজায় ছিলাম। এমন সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে এলেন। তিনি বসে গেলেন। আমরাও তাঁর চারপাশে বসে গেলাম। তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি মাথা নুইয়ে লাঠি দ্বারা মাটিতে কিছু রেখা টানতে লাগলেন আর বললেন, 'তোমাদের মাঝে এমন কেউ নেই, এমন কোনো জীবিত আত্মা নেই জান্নাত কিংবা জাহান্নামে যার স্থান লেখা হয়নি, সে সৌভাগ্যবান নাকি দুর্ভাগা হবে তা লেখা হয়নি।' তখন কেউ বললেন, তা হলে কি

---

১. মুসলিম (২৬৫৩)।

আমরা তাকদিরের লিখনের উপর বসে থেকে আমল ছেড়ে দেবো না? কারণ, আমাদের ভিতরে যাকে সৌভাগ্যবানদের মাঝে লেখা হয়েছে, সে এমনিতেই সৌভাগ্যবানদের আমল করবে। আর যাকে দুর্ভাগাদের মাঝে লেখা হয়েছে, সে স্বাভাবিকভাবে দুর্ভাগাদের আমল করবে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'না, বরং যারা সৌভাগ্যবান, তাদের জন্য সৌভাগ্যের কাজ সহজ করে দেওয়া হবে; আর যারা দুর্ভাগা, তাদের জন্য দুর্ভাগাদের কাজ সহজ করে দেওয়া হবে।' অতঃপর তিনি কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন:

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى. فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى. وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى. فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى.

অর্থ: 'অতএব, যে দান করে, আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয় সত্যায়ন করে, তার জন্য সুখের বিষয় সহজ করে দেবো। আর যে কৃপণতা করে, মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং উত্তম বিষয় অস্বীকার করে, আমি তার জন্য দুঃখের পথ সহজ করে দেবো।'[১]

লাওহে মাহফুজের মাঝে আল্লাহ তায়ালা গোটা সৃষ্টির ভাগ্য **কলমের** মাধ্যমে লিখেছেন। কুরআন ও সুন্নাহর অনেক জায়গায় এই কলমের বর্ণনা এসেছে। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা কলমের নামে শপথ করেছেন এবং একটি সুরার নাম রেখেছেন 'কলম'। আল্লাহ তায়ালা এই সুরার শুরুতে বলেন,

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ.

অর্থ: 'নুন। শপথ কলমের আর সেই বিষয়ের যা তারা লিপিবদ্ধ করে।' [কলম: ১]

সুরাকা ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা যেসব কাজ করছি, সেগুলো কি আগে থেকেই তাকদিরে লেখা হয়ে গিয়েছে, নাকি আমরা নতুন করে করছি? তখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—না, তোমরা যা করছ সবকিছু লেখা হয়ে গিয়েছে; কলম শুকিয়ে গিয়েছে। তখন তিনি বললেন, তা হলে আমল করে কী লাভ? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আমল করতে থাকো। প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেকের কাজ সহজ করে দেওয়া হবে।[২] উবাদা ইবনুস সামিত রাজি. তার ছেলেকে বলেন, হে প্রিয় বৎস, তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের মর্ম

১. বুখারি (১৩৬২, ৪৯৪৮,৪৯৪৯); মুসলিম (২৬৪৭)।
২. মুসলিম (২৬৪৮)।

বোঝার স্বাদ উপলব্ধি করতে পারবে না, যতক্ষণ না এই বিশ্বাস রাখবে যে, তুমি যা পেয়েছ তা কখনও হারানোর ছিল না, আর যা হারিয়েছ তা কখনও পাওয়ারই ছিল না। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। এরপর তাকে নির্দেশ দিয়েছেন, তুমি লেখো। কলম বলল, হে আমার প্রভু, আমি কী লিখবো? আল্লাহ বললেন, কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টির সবকিছুর তাকদির লেখো। আমি রাসুলুল্লাহকে বলতে শুনেছি, যে এই বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে না, সে আমার কেউ নয়।[১]

আল্লাহর সর্বপ্রথম সৃষ্টি: উপরের হাদিসে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন; অথচ অন্য কিছু হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, সর্বপ্রথম আরশ সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন: আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সকল মাখলুকের তাকদির সৃষ্টি করেছেন। তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে।[২] আরেকটি হাদিসে যখন আবু রাজিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, জগৎ সৃষ্টির আগে আল্লাহ কোথায় ছিলেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি ছিলেন তাঁর সঙ্গে কেউ ছিল না (كان في عماء)। উপরে ও নিচে কোনো বায়ু ছিল না। অতঃপর তিনি পানির উপর আরশ সৃষ্টি করেছেন।[৩] উক্ত হাদিসগুলোতে খেয়াল করলে দেখা যাবে, কলম সৃষ্টির আগে আরশ থাকার কথা বলা হচ্ছে। এ কারণে ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়িম-সহ অনেক আলিমের মতে, কলম নয়, আরশ আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি।[৪] আবার ইমাম তাবারি, ইবনে হাজার আসকালানি, ইবনে রজব হাম্বলি-সহ অনেকের মতে, সর্বপ্রথম পানি সৃষ্টি করা হয়েছে। কারণ, বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, আল্লাহর আরশ ছিল

---

১. আবু দাউদ (৪৭০০); সুনানে বাইহাকি কুবরা (২০৯৩৪)।

২. মুসলিম (২৬৫৩); আরও দেখুন: বুখারি (৩১৯১, ৪৬৮৪)।

৩. তিরমিজি (৩১০৯); ইবনে মাজা (১৮২); আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (৪৬৮); সমকালীন একদল আলিম উক্ত হাদিসের অনুবাদ করেন, 'আল্লাহ মেঘের মাঝে ছিলেন। তাঁর উপরে ও নিচে বায়ু ছিল।' হাদিসে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে সৃষ্টিকে সৃষ্টির আগে কোথায় ছিলেন। রাসুলুল্লাহ হাদিসে সেই উত্তরই দিয়েছেন। কিন্তু তারা বুঝেছেন আল্লাহ মেঘে ছিলেন তাঁর উপরে-নিচে বাতাস ছিল। তা হলে প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের সামঞ্জস্য কোথায়? كان في عماء এর অর্থ মেঘ নয়; বরং এর অর্থ আল্লাহ ছিলেন, তাঁর সঙ্গে কিছুই ছিল না। ইমাম তিরমিজি ইয়াজিদ ইবনে হারুন থেকে এ অর্থ বর্ণনা করেছেন (তিরমিজি ৩১০৯ নং হাদিস)। 'তার' উপরে ও নিচে বায়ু ছিল না বলতে বোঝানো হয়েছে কোথাও কিছু ছিল না, একমাত্র তিনি ছিলেন; কিন্তু এসব আলিম 'তার' উপর নিচ-বলতে আল্লাহর 'উপর-নিচ' মনে করেছেন, যা সঠিক নয়। (আত-তামহিদ, ইবনে আবদুল বার ৭/১৩৮)। পাশাপাশি হাদিসটির সনদও প্রশ্নাতীত নয়।

৪. আস সাফাদিয়্যাহ, ইবনে তাইমিয়া (২/৬২); কাসিদাহ নুনিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়িম (৬৫)।

পানির উপর। ফলে আরশ সৃষ্টির সময় পানি ছিল না এটা হতে পারে না, বরং পানি আরশের আগে (কিংবা নিদেনপক্ষে) একসঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে।[১] তা ছাড়া আরেকটি হাদিসে স্পষ্টভাবে এসেছে, সবকিছু পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।[২] ইবনে রজব লিখেন, সকল সৃষ্টির মূল উপকরণ পানি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস-সহ অনেক সালাফ থেকে এমন বক্তব্য বর্ণিত আছে।[৩] সে হিসেবে অগ্রগণ্য কথা হচ্ছে, আল্লাহ সর্বপ্রথম পানি সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশ, অতঃপর কলম, অতঃপর অন্যান্য সৃষ্টি। আর কলমকে যে হাদিসে সর্বপ্রথম সৃষ্টি বলা হয়েছে, উলামায়ে কেরাম সেটার দুটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এক. আরশ ও পানি ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্টির দিকে লক্ষ করে সর্বপ্রথম সৃষ্টি বলা হয়েছে। দুই. বাক্যের অর্থ ভিন্নভাবে তোলা হবে। তখন অর্থ হবে—কলম সৃষ্টির পরে সর্বপ্রথম নির্দেশ দিয়েছেন 'তুমি লেখো'। এক্ষেত্রে কলম কখন সৃষ্টি হয়েছে এ ব্যাপারে হাদিসে কোনো বক্তব্য থাকবে না। ফলে অন্যান্য হাদিসের সঙ্গে বৈপরীত্যও থাকবে না।[৪]

তাকদির লেখার ধারাক্রম: তাকদির লেখার কয়েকটি ধাপ রয়েছে। একটা হচ্ছে লাওহে মাহফুজের লিখন, যা সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সম্পন্ন হয়েছে।[৫] আরেকটি হচ্ছে প্রত্যেকের মাতৃগর্ভের লিখন। একাধিক হাদিস দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত। যখন মাতৃগর্ভে বীর্য ৪০ দিন অথবা ৪০ রাত অবস্থান করে, তখন আল্লাহ তায়ালা একজন ফেরেশতা পাঠান। তিনি বলেন—হে রব, তার রিজিক কী হবে? তাকে তাকে বলে দেওয়া হয়। এরপর প্রশ্ন করেন—হে রব, তার জন্মকাল কতটুকু হবে? তাকে বলে দেওয়া হয়। এরপর প্রশ্ন করেন—হে রব, নারী হবে নাকি পুরুষ হবে? তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়। এরপর প্রশ্ন করেন—হে রব, সৌভাগ্যবান হবে নাকি দুর্ভাগা? তাকে জানিয়ে দেওয়া।[৬] এটা ফেরেশতাদের জন্য নতুন হলেও আল্লাহর জন্য নতুন নয়। কারণ, এগুলো সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত 'লাওহে মাহফুজে' লিখিত আছে। তৃতীয় আরেকটি স্তর হচ্ছে বাৎসরিক লিখন। এটাও প্রথম ও দ্বিতীয় লিখনের শাখা। লাইলাতুল কদরে এক বছরের জন্য প্রত্যেক সৃষ্টির জীবন, রিজিক-সহ সবকিছু লেখা হয় [দুখান: ১-৪]।

---

১. তারিখে তাবারি (১/৪০)।
২. ইবনে হিব্বান (২৫৫৯); মুসনাদে আহমদ (৮০৪৭)।
৩. বিস্তারিত দেখুন: লাতাইফুল মাআরিফ, ইবনে রজব (২১-২২)।
৪. ফাতহুল বারি (৬/২৮৯); ইবনে আবিল ইজ (২৪২); আকহাসারি (১৭২)।
৫. মুসলিম (২৬৫৩)।
৬. মুসনাদে আহমদ (১৫৫০২)।

তাকদিরের লিখন খণ্ডন করা যায়? এই তিন প্রকার লেখনীর মাঝে দ্বিতীয় ও তৃতীয়, যা ফেরেশতাদের হাতে, সেগুলোর মাঝে বান্দার আমল অনুযায়ী তাকদিরের পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু লাওহে মাহফুজে লেখা মূল তাকদিরে কোনো পরিবর্তন ঘটে না, যা আমরা পিছনে বলে এসেছি। অর্থাৎ দোয়া কিংবা যেকোনো পুণ্যের মাধ্যমে যদি বান্দা তার দিকে ছুটে আসা কোনো বিপদ প্রতিহত করে ফেলে, অথবা খারাপ কাজের মাধ্যমে যদি তার মৃত্যু এগিয়ে নিয়ে আসে, তবে ফেরেশতাদের হাতে থাকা আমলনামাতে পরিবর্তন আনা হয়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরুন, ফেরেশতাদের হাতে থাকা তাকদিরে লেখা—এক ব্যক্তি পঞ্চাশ বছর হায়াত পাবে। কিন্তু দেখা গেল সে এমন কোনো পুণ্যের কাজ করল, যাতে তার হায়াত আরও দুই বছর বৃদ্ধি পেল। ফেরেশতারা তখন আগের পঞ্চাশ বছর মুছে বায়ান্ন বছর লিখবেন। কিন্তু আল্লাহর কাছে বিদ্যমান লাওহে মাহফুজে লেখা মূল তাকদিরে কিন্তু প্রথম থেকেই এসব বিস্তারিত লেখা আছে। অর্থাৎ প্রথমে যে পঞ্চাশ বছর, এরপর পুণ্যের মাধ্যমে দুই বছর বৃদ্ধি ইত্যাদি সবকিছু সবিস্তারে লেখা রয়েছে। ফলে সেখানে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেন,

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۚ وَعِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ.

অর্থ: 'আল্লাহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন। কিন্তু মূল গ্রন্থ তাঁর কাছেই রয়েছে।' [রাদ: ৩৯] এটাই হলো তাকদির পরিবর্তন-সংক্রান্ত কিছু হাদিসের ব্যাখ্যা। যেমন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আত্মীয়তার সম্পর্করক্ষা মানুষের জীবন বৃদ্ধি করে।'[১] আরেকটি হাদিসে বলেছেন, 'কেবল দোয়াই তাকদিরকে ফেরাতে পারে। সৎকর্ম হায়াত বৃদ্ধি করে; গুনাহ রিজিক হ্রাস করে ফেলে।'[২] আরও একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি তার রিজিক বৃদ্ধি করতে চায় এবং মৃত্যু পেছাতে চায়, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।'[৩] অর্থাৎ এগুলো ফেরেশতাদের হাতে থাকা তাকদিরনামায়, মূল লাওহে মাহফুজে এগুলো-সহই লেখা আছে। সেখানে পরিবর্তন নেই এবং পরিবর্তনের প্রয়োজনও নেই।

---

১. মুজামুল আওসাত, তাবারানি (৯৪৩)।
২. তিরমিজি (২১৩৯); মুসনাদে বাজ্জার (২৫৪০)।
৩. বুখারি (৫৯৮৬); মুসলিম (২৫৫৭); ইবনে হিব্বান (৪৩৯); বাজ্জার (৬৩১৬)।

ইমাম তহাবির বক্তব্য '**সুতরাং তাতে যদি কোনো বিষয় 'হবে' বলে লেখা থাকে, গোটা সৃষ্টি মিলেও সেটাকে প্রতিহত করতে পারবে না। একইভাবে তাতে যদি কোনো বিষয় 'হবে না' লেখা থাকে, গোটা সৃষ্টির সবাই মিলেও সেটা করতে পারবে না। কলম শুকিয়ে গেছে। ফলে যা লেখা হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত সেগুলোই থাকবে। কেউ যা পায়নি, সে কখনও তা পাওয়ারই ছিল না। আর যা পেয়েছে, কখনও তা হারানোরই ছিল না**।'—প্রথম প্রকারের লেখা তথা লাওহে মাহফুজের ব্যাপারে প্রযোজ্য।

লাওহে মাহফুজের উপর আমাদের ইজমালিভাবে ঈমান আনতে হবে। এই দুটো আল্লাহর বিশাল সৃষ্টি। কিন্তু এগুলোর স্বরূপ সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহে বিস্তারিত কিছু আসেনি। দু-একটি বর্ণনাতে স্রেফ বলা হয়েছে, লাওহে মাহফুজ সাদা মুক্তোর তৈরি। তার কিতাব ও কলম দুটো নুর। আরেক বর্ণনাতে এর পাতাকে ইয়াকুতের তৈরি বলা হয়েছে।[১] এগুলো সব অদৃশ্যের বিষয়। ফলে অনুমানভিত্তিক কথা বলা নিষিদ্ধ।

তাকদিরে বিশ্বাসের সুফল: তাকদির, লাওহ, কলম—এগুলোর স্বরূপ নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে দৈনন্দিন জীবনে এগুলো থেকে আমাদের পাথেয় নিতে হবে। তাকদিরের উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে জীবনে পথচলা সহজ হয়। ঝড়-তুফান মোকাবিলা করা আসান হয়। বিশাল সাফল্য এলে অহংকার তৈরি হয় না। আশেপাশের মানুষকে ছোট করে দেখা যায় না। অপরদিকে ব্যর্থতার সুনামির মুখেও বড় কোনো ভুল করতে হয় না। বরং সবরের সঙ্গে সেগুলো মোকাবিলা করে নতুন করে পথ চলার পাথেয় মেলে তাকদিরের প্রতি ঈমান থেকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰىنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

অর্থ: 'আপনি বলুন, আমাদের কেবল তা-ই স্পর্শ করবে যা আল্লাহ আমাদের জন্য লিখে রেখেছেন। তিনি আমাদের অভিভাবক। আর মুমিনদের কেবল আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।' [তাওবা: ৫১] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যা তোমার জন্য উপকারী, সেগুলো করতে সচেষ্ট থাকো। আল্লাহর সাহায্য কামনা করো। ভেঙে পড়ো না। যদি কোনো বিপদ আসে, এ কথা বলো না, 'আমি যদি এমন করতাম এমন হতো, অমন করলে অমন হতো'; বরং বলো, 'আল্লাহ যা-কিছু লিখে রেখেছেন এবং ইচ্ছা করেছেন, তা-ই হয়েছে।' কেননা 'যদি' শয়তানের

---

১. মুসতাদরাকে হাকেম (৩৭৯২, ৩৯৩৯); আল-মুজামুল কাবির (১২৫১১)।

কুমন্ত্রণার পথ খুলে দেয়।'[১] আরেক হাদিসে তিনি ইবনে আব্বাসকে শিশুকালে নসিহত করেন, 'হে বালক, আমি তোমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিচ্ছি: আল্লাহকে হিফাজত করো (অর্থাৎ তাঁর নির্দেশ মেনে চলো), আল্লাহ তোমাকে হিফাজত করবেন। আল্লাহকে হিফাজত করো, তাকে তোমার কাছে পাবে। সুখের সময় তাকে মনে রেখো, তা হলে দুঃখের সময় তিনি তোমাকে মনে রাখবেন। যখন কিছু চাইবে, আল্লাহর কাছে চাইবে। যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে। মনে রেখো, যদি জগতের সকল মানুষ তোমাকে উপকার করতে চায়, কোনো উপকার করতে পারবে না; হ্যাঁ, ততটুকু পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। যদি জগতের সকল মানুষ তোমাকে ক্ষতি করতে চায়, কোনো ক্ষতি পারবে না; হ্যাঁ, ততটুকু পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিতাব শুকিয়ে গেছে।'[২]

মানুষ যেহেতু উপকার বা ক্ষতি কোনোটাই করার ক্ষমতা রাখে না, তাই মানুষকে সন্তুষ্ট করার চিন্তা বাদ দিয়ে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে হবে। মুমিনের আপ্তবাক্য হোক এই হাদিস: 'যা পেয়েছ, তা কখনও হারানোরই ছিলো না। আর যা হারিয়েছ, তা কখনও পাওয়ারই ছিল না।'[৩]

---

১. মুসলিম (২৬৬৪); ইবনে মাজা (৭৯)।
২. তিরমিজি (২৫১৬); মুসনাদে আহমদ (২৮৪৯); আল-মুজামুল কাবির (১১৫৬০)।
৩. তিরমিজি (২১৪৪); মুসনাদে আহমদ (২১৮৩৫); বাজ্জার (৪১০৭)।

وَعَلَى العَبْدِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللهَ قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ كَائِنٍ مِنْ خَلْقِهِ، فَقَدَّرَ ذَلِكَ تَقْدِيرًا مُحْكَماً مُبْرَمًا لَيْسَ فِيهِ نَاقِضٌ وَلاَ مُعَقِّبٌ وَلاَ مُزِيلٌ وَلاَ مُغَيِّرٌ وَلاَ مُحَوِّلٌ وَلاَ نَاقِصٌ وَلاَ زَائِدٌ مِنْ خَلْقِهِ فِي سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ... وَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ الإِيمَانِ وَأُصُولِ الـمَعْرِفَةِ وَالاعْتِرَافِ بِتَوحِيدِ اللهِ تَعَالَى وَرُبُوبِيَّتِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا} وَقَالَ تَعَالَى: {وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} فَوَيْلٌ لِمَنْ صَارَ لِلهِ تَعَالَى فِي القَدَرِ خَصِيماً، وَأَحْضَرَ لِلنَّظَرِ فِيهِ قَلْبًا سَقِيمًا، لَقَدِ الْتَمَسَ بِوَهْمِهِ فِي فَحْصِ الغَيْبِ سِرًّا كَتِيمًا، وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ أَفَّاكًا أَثِيمًا.

বান্দার জানা কর্তব্য, শুরু থেকেই সৃষ্টির প্রত্যেকটি বিষয়ে আল্লাহ্ তায়ালার সর্বাঙ্গীণ জ্ঞান রয়েছে। তাই তিনি সুচারুরূপে এবং সুদৃঢ়ভাবে সকলের তাকদির নির্ধারণ করেছেন। আসমান ও জমিনের কারও পক্ষে এটা রদ কিংবা বাতিল করার সাধ্য নেই। এটার বিরুদ্ধাচরণ কিংবা পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও সংযোজন-বিয়োজনের সামর্থ্য নেই...। এটাই দৃঢ় ঈমান এবং প্রকৃত জ্ঞান; আল্লাহ্ তায়ালার তাওহিদ এবং রবুবিয়্যাতের স্বীকৃতি। পবিত্র কুরআনে তিনি বলেছেন, 'আর তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলো পরিমিতভাবে নির্ধারণ করেছেন।' আল্লাহ আরও বলেছেন, 'আর আল্লাহ্‌র নির্দেশ সুনির্ধারিত।' সুতরাং ধ্বংস সে ব্যক্তির জন্য, যে তাকদির নিয়ে আল্লাহ্‌র সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়; অসুস্থ অন্তর দিয়ে এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করে। এভাবে সে নিছক অনুমানের বশবর্তী হয়ে সুপ্ত জ্ঞানের সন্ধানে ঘোরে। শেষে পরিণত হয় মিথ্যুক পাপাচারীতে।

ব্যাখ্যা

তাকদির ঈমানের মৌলিক বিষয়: তাকদিরের আলোচনার এ পর্যায়ে এসে ইমাম তহাবি বলতে চাচ্ছেন, এই গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গাতে বারবার তাকদিরের আলোচনা আনার কারণ হচ্ছে, এটা ঈমানের মৌলিক বিষয়; আল্লাহর তাওহিদ ও রবুবিয়্যাতের

স্বীকৃতি। কারণ তাকদির আল্লাহর রবুবিয়্যাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ফলে এটাকে হালকা করে দেখার সুযোগ নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঈমান কী?' তিনি বললেন, 'ঈমান হলো আল্লাহকে বিশ্বাস করা, ফেরেশতাগণকে বিশ্বাস করা, কিতাবগুলোকে বিশ্বাস করা, রাসুলগণকে বিশ্বাস করা, পরকালে বিশ্বাস করা, তাকদিরের ভালো-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে এ মর্মে বিশ্বাস করা।'[১] ফলে যে তাকদির অস্বীকার করবে, সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবে। আবার তাকদিরের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর উপর দৃঢ় ঈমান ও ইয়াকিন রেখে নিজেকে এর প্রতি সমর্পণ করে দেওয়াই প্রকৃত জ্ঞান। কারণ, এটা আল্লাহর সুপ্ত রহস্য। এ রহস্য কখনোই উদঘাটন করা সম্ভব নয়। তাই এটা নিয়ে অনুমানভিত্তিক ও মনগড়া বক্তব্য ঈমানের জন্য ক্ষতিকর। বরং **'যে তাকদির নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবে, অসুস্থ অন্তর দিয়ে এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করবে, সে পরিণত হবে মিথ্যুক পাপাচারীতে।'** কারণ, এটার পূর্ণ উপলব্ধি মানুষের সামর্থ্যের বাইরে।

এ কারণেই কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায়ের লোকেরা গোমরাহ হয়ে গিয়েছে। কারণ, তারা তাকদিরের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর সামনে আত্মসমর্পণ না করে নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিকে রাহবর বানিয়েছিল। তাদের প্রাথমিক আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল মূলত সাহাবাদের যুগে। এ জন্য সাহাবাদের মুখে তাদের ব্যাপারে ব্যাপক ও শক্ত সতর্কবার্তা পাওয়া যায়। বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও দুর্বল সূত্রে কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন: আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেন, আমি রাসুলুল্লাহকে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই আমার উম্মতের ভিতরে এমন কিছু সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যারা তাকদির অস্বীকার করবে।'[২] ইবনে উমর থেকে আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'শেষ যুগে একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যারা তাকদির অস্বীকার করবে। সাবধান! তারা এই উম্মতের অগ্নিপূজারী (মাজুস)। তারা অসুস্থ হলে তোমরা দেখতে যাবে না; মৃত্যুবরণ করলে (জানাজা/কাফন/দাফনে) উপস্থিত হবে না।'[৩] জাবের থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এই উম্মতের অগ্নিপূজারী হচ্ছে তাকদির অস্বীকারকারীরা।'[৪] ইবনে আব্বাস

---

১. মুসলিম (৮); তিরমিজি (২৬১০); ইবনে মাজা (৬৩)।
২. আবু দাউদ (৪৬১৩, ৪৬৯১); সুনানে কুবরা, বাইহাকি (২০৯৪০); মুসতাদরাকে হাকেম (২৮৪)।
৩. তাবারানি, আল-মুজামুস সাগির (৮০০); আল-আওসাত (৫৩০৩)।
৪. তাবারানি, আল-মুজামুস আওসাত (৪০৪৬)।

থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার উম্মতের দুটি সম্প্রদায়ের জন্য ইসলামে কোনো অংশ নেই। তারা হলো মুরজিয়া ও কাদারিয়্যাহ।'[১]

একটু দৃষ্টি আকর্ষণ: আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহর ব্যাখ্যাকার শাইখ আবু হাফস সিরাজুদ্দিন গজনবি উপরে মূল টেক্সটের (...) চিহ্নিত স্থানে একটি বাক্য যোগ করেছেন, যা মূল গ্রন্থ কিংবা অন্য কোনো প্রাচীন ব্যাখ্যাগ্রন্থে অনুপস্থিত। বাক্যটি হলো: ولا يكون مكوَّنٌ إلا بتَكوينه، والتكوين لا يكون إلا حَسَنا جَميلا, যার সরল অর্থ হলো: পৃথিবীর প্রত্যেকটা বস্তুই তাকউইন তথা গঠনের মাধ্যমে অস্তিত্বে এসেছে। আর এই তাকউইন তথা গঠন সবসময় সুন্দর হওয়া আবশ্যক।[২] কথা হলো, এই বাক্যটি গজনবি কোথায় পেলেন? অধমের কাছে আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহর চারটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি আছে। বাস্তবতা হলো, মাত্র একটি পাণ্ডুলিপিতে উক্ত বাক্যটি বিদ্যমান; অপর তিনটি পাণ্ডুলিপিতে অনুপস্থিত। উপরন্তু গজনবি ছাড়া আশআরি ও মাতুরিদি ধারার সকল ব্যাখ্যাগ্রন্থেও বাক্যটি অনুপস্থিত। কেবল সমকালীন ব্যাখ্যাকার শাইখ সাইদ ফুদাহ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে তার কথাতে স্পষ্ট যে, তিনি বাক্যটি কোনো পাণ্ডুলিপি থেকে নয়, বরং—তার ভাষ্যমতে—বাবিরতি থেকে নিয়েছেন। যদিও বাবিরতির ব্যাখ্যাটি মূলত গজনবির ব্যাখ্যাই, ভুলে বাবিরতির নামে প্রচারিত হয়েছে।

উক্ত বাক্যটা কি ইমাম তহাবির? চূড়ান্তভাবে ফয়সালা দেওয়া কঠিন, যেহেতু একটা পাণ্ডুলিপিতে এটা পাওয়া যায়। কিন্তু ইমাম তহাবির শব্দচয়ন ও লেখার ধারা খুব সম্ভবত এটার পরবর্তী সময়ে অনুপ্রবেশের দিকেই ইঙ্গিত দেয়। কারণ, প্রথমত বাক্যটির এই স্থানে প্রাসঙ্গিকতা কম। দ্বিতীয়ত 'তাকউইন' হচ্ছে মাতুরিদি ধারার একটি বিশেষ আকিদা, যা অন্যান্য ধারার মাঝে বলতে গেলে অনুপস্থিত। আর ইমাম তহাবির পুরো বইয়ে আমরা তার শব্দচয়নে কোনো বিশেষ ধারার বিশেষ আকিদার প্রতিনিধিত্ব দেখি না। ফলে এমন একটি বাক্যের উপস্থিতি এখানে বেশ অদ্ভুত। আল্লাহ ভালো জানেন।

---

১. তিরমিজি (২১৪৯); ইবনে মাজা (৬২); মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদ (৫৭৯)।
২. গজনবি (১০৩)।

وَالعَرْشُ وَالكُرْسِيُّ حَقٌّ، وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ العَرْشِ وَمَا دُونَهُ، مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ فَمَا فَوْقَهُ، وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الإِحَاطَةِ خَلقَهُ.

আরশ এবং কুরসি সত্য। আল্লাহ তায়ালা আরশ এবং আরশের নিচে বিদ্যমান সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি সকল বস্তু এবং আরশের উপর যা-কিছু রয়েছে, সবগুলোকে পরিবেষ্টনকারী। সৃষ্টিজগৎ তাকে পরিবেষ্টন করতে অক্ষম।

ব্যাখ্যা
আরশ ও কুরসি-সম্পর্কিত আকিদা

আল্লাহ তায়ালার আরশ ও কুরসি সত্য। কুরআনের একাধিক আয়াত ও বিশুদ্ধ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। এ কারণে জগতের সকল মুসলমান আল্লাহর আরশ ও কুরসিতে বিশ্বাস করে। আরশ হচ্ছে আল্লাহর সর্ববৃহৎ ও (পানির পরে) সর্বপ্রথম সৃষ্টি।[১] কুরআনে একে বিশাল আরশ, সম্মানিত আরশ [তাওবা: ১২৯, মমিনুন: ১১৬, নামল: ২৬] ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিসে আরশ বহনকারী এক ফেরেশতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তাঁর কানের লতি থেকে কাঁধ পর্যন্ত সাত শত বছরের দূরত্ব।[২] এর মাধ্যমে আরশের বিশালত্ব অনুভব করা যায়। কুরআনের আয়াত ও একাধিক হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, আরশ বিশাল সৃষ্টি হলেও এর সীমারেখা রয়েছে। ফলে এটা অসীম নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ.

অর্থ: 'যারা আরশকে বহন করে আর যারা তার চারপাশে রয়েছে, তারা তাদের রবের প্রশংসা-সহ পবিত্রতা ঘোষণা করছে।' [গাফের: ৭] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

---

১. তিরমিজি (৩১০৯); ইবনে মাজা (১৮২); আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (৪৬৮); সর্বপ্রথম সৃষ্টি-সম্পর্কিত আলোচনা পিছনে দেখুন।
২. আবু দাউদ (৪৭২৭)।

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ.

অর্থ: 'আপনি ফেরেশতাগণকে দেখবেন, তারা আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের পালনকর্তার প্রশংসা-সহ পবিত্রতা ঘোষণা করছে।' [জুমার: ৭৫] সহিহ বুখারিতে আরশকে জান্নাতের উপরে বলা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায়, নিচের দিক থেকে আরশের সীমা রয়েছে, আর তা জান্নাতুল ফিরদাউস।[১]

কুরসি সম্পর্কে কুরআনে মাত্র একটি আয়াত এসেছে। সেটা হলো আয়াতুল কুরসি। সেখানে কুরসি সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ.

অর্থ: 'তাঁর কুরসি সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টিত করে আছে।' [বাকারা: ২৫৫] বিভিন্ন হাদিসে কুরসি সম্পর্কে বক্তব্য এসেছে। তবে এসব হাদিস শক্তিশালী নয়। মুজাহিদ বলেন, আকাশসমূহ ও জমিন কুরসির তুলনায় তেমন, যেমন বিশাল মরুভূমিতে পড়ে থাকা একটি আংটা।[২] ইবনে হিব্বানের একটি বর্ণনায় যোগ করা হয়েছে—আর আরশের তুলনায় কুরসি হচ্ছে, যেমন মরুভূমির তুলনায় আংটা।[৩] কিন্তু কুরসির স্বরূপ নিয়ে নানা মত রয়েছে। কারও মতে, আরশ ও কুরসি এক; কারও মতে, কুরসি দুই পা রাখার জায়গা। এটা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করা হয়। তবে ইবনে আব্বাস থেকে কুরসির ব্যাখ্যা আল্লাহর পায়ের জায়গা অর্থের পরিবর্তে আল্লাহর ইলম-সংক্রান্ত ব্যাখ্যা অধিক শক্তিশালী। ইমাম তাবারি এটাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[৪] এ সম্পর্কে আল্লাহ ভালো জানেন।

আল্লাহ সবার সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা ও সুরক্ষাকর্তা। তিনি আরশেরও স্রষ্টা ও সুরক্ষাকর্তা। তিনি পরিপূর্ণ—সকল প্রয়োজন ও বিচ্যুতি থেকে মুক্ত। ফলে সৃষ্টির কোনোকিছুর প্রতি তাঁর প্রয়োজন ও মুখাপেক্ষিতা থাকতে পারে না। আরশ সৃষ্টির পরেও তিনি তেমন পূরিপূর্ণ, যেমন পরিপূর্ণ এটা সৃষ্টির আগে ছিলেন। সুতরাং আরশ-

---

১. বুখারি (২৭৯০)।
২. সুনানে সাঈদ ইবনে মানসুর (৪২৫)।
৩. সহিহ ইবনে হিব্বান (৩৬১); হাদিসটির প্রামাণ্যতা নিয়ে আপত্তি রয়েছে; তবে এটা একাধিক সনদে বর্ণিত।
৪. তাফসিরে তাবারি (৫/৪০১); উল্লেখ্য যেসব বর্ণনায় কুরসিকে 'পা রাখার জায়গা' বলা হয়েছে, সেগুলোতে স্রেফ কুরসির পরিচয়ের উদ্দেশ্যে এটা বলা হয়েছে। এই 'পা'-এর সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার সংশ্লিষ্টতা নেই। এর অর্থ—আল্লাহর জন্য 'দুই পা' সাব্যস্ত করা নয়। কিন্তু পরবর্তী লোকেরা এক্ষেত্রে বিচ্যুতির শিকার হয়েছে। কুরসিকে 'দুই পা রাখার জায়গা'র পরিবর্তে 'আল্লাহর দুই পা রাখা'র জায়গা বানিয়ে ফেলেছে। দুটোর মাঝে পার্থক্য আসমান-জমিন।

সংশ্লিষ্ট কোনো সিফাতের মাধ্যমে আল্লাহর মাঝে কামালত তথা পরিপূর্ণতা এসেছে, কিংবা তাঁর পরিপূর্ণতার জন্য আরশ প্রয়োজন—এমন কথা কুফর। আল্লাহ তায়ালা যখন ছিলেন, তখন তিনি ছাড়া অন্যকিছু ছিল না; আরশও ছিল না। অতঃপর আল্লাহ আরশ সৃষ্টি করেন। সুতরাং আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টির মতো আরশও একটি সৃষ্টি। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা একাধিক আয়াতে নিজেকে رَبُّ الْعَرْشِ 'আরশের রব' হিসেবে অভিহিত করেছেন [তাওবা: ১২৯]। সুতরাং আল্লাহ তার সৃষ্টির প্রতি মুখাপেক্ষী হতে পারেন না, সেটা যত বড় ও শ্রেষ্ঠই হোক না কেন। একারণেই ইমাম তহাবি লিখেছেন, **আল্লাহ তায়ালা আরশ এবং আরশের নিচে বিদ্যমান সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি সকল বস্তু এবং আরশের উপর যা-কিছু রয়েছে, সবগুলোকে পরিবেষ্টনকারী। সৃষ্টিজগৎ তাকে পরিবেষ্টন করতে অক্ষম।**

আরশকে কেন্দ্র করে উম্মাহর সংঘাত: প্রশ্ন হচ্ছে, ইমাম তহাবি কেন আল্লাহকে আরশ থেকে অমুখাপেক্ষী বললেন? কেউ কি আল্লাহকে আরশের প্রতি মুখাপেক্ষী বলে, কিংবা বলতে পারে? কারণ, আল্লাহ স্রষ্টা আর আরশ সৃষ্টি। স্রষ্টা কীভাবে সৃষ্টির প্রতি মুখাপেক্ষী হতে পারেন! আসলে এই বক্তব্যের মাধ্যমে ইমাম তহাবি সেই বিশাল জটিলতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, আজও যে ক্ষত মুসলিম উম্মাহকে কুরে-কুরে খাচ্ছে। সেটা হলো, আল্লাহর আরশ ও আরশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে জটিলতা। এটা সেই বিষয় উম্মাহ যুগের পর যুগ যা নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদ ও মারামারি-হানাহানি করেছে এবং দুঃখজনকভাবে আজও করছে, যাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য সম্প্রদায় সত্যিকার অর্থেই গোমরাহির শিকার হয়েছে। আবার অনেক সম্প্রদায় নিজেকে হক দাবি করে অন্যদের গোমরাহ আখ্যায়িত করেছে। এটা এমন এক মাসআলা, যা নিয়ে আলোচনা অধিকাংশ সময়ই নিষ্ফল। কারণ, প্রত্যেক সম্প্রদায়ই এখানে নিজেকে হক ও অন্যকে বাতিল মনে করে। এ কারণেই লক্ষ করলে দেখবেন, ইমাম তহাবি তাকদির এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর লম্বা লম্বা আলোচনা করলেও এখানে মাত্র একটি লাইন ব্যয় করেছেন এবং তাতেই একেবারে সংক্ষেপে মূল বিষয়টা তুলে ধরেছেন।

এমন একটি মাসআলা, যাকে কেন্দ্র করে শতাব্দীর পর শতাব্দী উম্মাহ মতভেদ করে আসছে, একদল আরেক দলকে কাফের ও গোমরাহ বলে আসছে, এমন একটি মাসআলা মাত্র দেড় লাইনে কেন বলা হলো? কারণ, সম্ভবত ইমাম তহাবি সে যুগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ বিষয়টিতে মুসলমানরা একমত হতে পারবে না। ফলে আহলে সুন্নাতের মূল ধারা যেটুকুতে একমত, ততটুকু বলে এবং ভ্রান্ত মুজাসসিমাহ

সম্প্রদায়ের খণ্ডন করে তিনি নীরব হয়ে গেছেন। তাই আমরাও বিষয়টি নিয়ে খুব লম্বা আলোচনা করব না। কারণ, সাধারণ মুসলমানদের জন্য এসব তাত্ত্বিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; তথাপি আগ্রহী পাঠকদের জন্য এ ব্যাপারে কিছু কথা পেশ করছি, যাতে মনের তৃষ্ণা মেটে, যেটা উত্তম সেটা গ্রহণ করা যায়।

মতপার্থক্যের স্থান নির্ধারণ: আরশ আল্লাহর একটি সৃষ্টি, আল্লাহ আরশের মুখাপেক্ষী নন—এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের সকল ধারা একমত। আল্লাহ আরশের উপর 'ইস্তিওয়া' করেছেন—এ ব্যাপারেও সকল মুসলমান একমত। কারণ, কুরআনের একাধিক আয়াতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। যেমন: আল্লাহ বলেন,

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ یُغْشِی الَّیْلَ النَّهَارَ یَطْلُبُهٗ حَثِیْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ.

অর্থ: 'নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর **আরশের উপর ইস্তিওয়া** করেছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমন অবস্থায় যে, দিন দ্রুত রাতের পিছনে আসে। তিনি স্বীয় আদেশের অনুগামী করে সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র। মনে রেখো, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। আল্লাহ বরকতময়, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।' [আরাফ: ৫৪] অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ یُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَفِیْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ.

অর্থ: 'নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমিনকে ছয় দিনে, অতঃপর তিনি **আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন।** তিনি কার্য পরিচালনা করেন। কেউ সুপারিশ করতে পারে না তবে তাঁর অনুমতি ছাড়া। তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তোমরা তাঁরই ইবাদত করো। তোমরা কি চিন্তা করো না?' [ইউনুস: ৩] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

اَللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ؕ كُلٌّ یَّجْرِیْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّی ؕ یُدَبِّرُ الْاَمْرَ یُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ.

অর্থ: 'আল্লাহ যিনি উন্নীত করেছেন আকাশমণ্ডলকে কোনো স্তম্ভ ব্যতীত। তোমরা সেগুলো দেখো। অতঃপর তিনি **আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন,** এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন, নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।' [রাদ: ২] আরেকটি আয়াতে আল্লাহ বলেন,

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى.

অর্থ: '**রহমান আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন।**' [ত্বহা: ৫] আল্লাহ আরও বলেন,

الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَیْنَهُمَا فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَى الْعَرْشِ.

অর্থ: 'যিনি ছয় দিনে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মাঝে যা-কিছু আছে, সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর **আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন।**' [ফুরকান: ৫৯] আল্লাহ আরও বলেন,

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَیْنَهُمَا فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِیٍّ وَّ لَا شَفِیْعٍ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ.

অর্থ: 'আল্লাহ যিনি ছয় দিনে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মাঝে যা-কিছু আছে, সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর **আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন।**' [সাজদা: ৪] আরেকটি আয়াতে আল্লাহ বলেন,

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ

অর্থ: 'তিনিই ছয় দিনে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর **আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন।**'

এভাবে কুরআনের একাধিক আয়াতে আরশের উপর আল্লাহর '**ইস্তিওয়া**'র কথা বর্ণিত হয়েছে। ফলে আরশের উপর আল্লাহর ইস্তিওয়াকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তাই সকল মুসলমান আল্লাহর আরশকে এবং আরশের উপর ইস্তিওয়াকে বিশ্বাস করে। **তা হলে জটিলতা কোথায়?**

জটিলতা হলো আরবি শব্দ 'ইস্তিওয়া'র অর্থ নির্ধারণে। এটাকে কেন্দ্র করেই যত মত ও পথ তৈরি হয়েছে। যুগে যুগে অনেক সম্প্রদায় এই ইস্তিওয়ার ব্যাখ্যা করতে

গিয়ে পদস্খলনের শিকার হয়েছে। কোনো কোনো সম্প্রদায় গোমরাহির অতলে চলে গেছে; আবার কেউ বিচ্যুতির শিকার হয়েছে; কেউ সত্যের কাছাকাছি থেকেছে। যেমন: মুজাসসিমাহ ও মুশাববিহাহ সম্প্রদায়। তারা ইস্তিওয়ার অর্থ করেছে বসা। ফলে তাদের মতে, আল্লাহ আরশের উপর চেপে বসেছেন, যেভাবে মানুষ চেয়ারে চেপে বসে, রাজা-বাদশাহ রাজসিংহাসনে চেপে বসে। ঠিক বিপরীত দিকে গিয়েছে ভ্রান্ত জাহমিয়্যাহ, মুতাজিলা ও মুআত্তিলাহ সম্প্রদায়। তারা আল্লাহর ইস্তিওয়াকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। তাদের মতে, এটা সৃষ্টির গুণ, আল্লাহর নয়। ফলে আল্লাহ আরশের উপর ইস্তিওয়া করেননি। এই ধারাগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব না। কারণ, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বাইরে, ভ্রান্ত ফিরকা।

আমরা আলোচনা করব আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত ধারাগুলো নিয়ে, বিশেষত দুটি ধারা, যারা উভয়েই আহলে সুন্নাতের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও 'ইস্তিওয়া'র ব্যাখ্যা নিয়ে দুই বিপরীত মেরুতে। তা হলে কি এদের যেকোনো একটা সঠিক অপরটা বেঠিক? যেকোনো একটাকেই কি ঠিক হতে হবে? দুটো কি ঠিক হতে পারে? ইস্তিওয়ার ক্ষেত্রে বিপরীতধর্মী দুটো ব্যাখ্যা দিয়েও কি উভয় ধারা আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে? সংক্ষেপে সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা এর উত্তর খুঁজব।

প্রথম দলের মত: একদল আলিম ইস্তিওয়ার অর্থ করেন—আরোহণ করা (الصعود), উপরে ওঠা (العلو), উন্নীত হওয়া (الارتفاع), স্থির হওয়া (الاستقرار)। এ হিসেবে বাংলায় অর্থ করলে তাদের কাছে উল্লিখিত সবগুলো আয়াতে ইস্তিওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহ আরশের উপর **উঠেছেন,** আরশে **অবস্থান** গ্রহণ করেছেন। তাদের বিশ্বাস, আমাদের মাথার উপর যে আকাশ দেখা যাচ্ছে, এ-রকম একটির উপর আরেকটি করে সাতটি আকাশ রয়েছে। সবগুলোই আমাদের মাথা বরাবর উপরের দিকে। সাত আকাশের **'উপর'** রয়েছে সাগর। সাগরের উপর রয়েছে কুরসি। কুরসি বরাবর উপরে রয়েছে আল্লাহর আরশ। সেই আরশের উপর আল্লাহ তায়ালা থাকেন। এভাবে কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াতে যেখানেই আল্লাহর ইস্তিওয়ার কথা এসেছে, তারা সেটার অর্থ করেছেন 'আল্লাহ আরশের উপর **উঠেছেন**'। তবে আরশের উপর তিনি কীভাবে **আছেন,** এর স্বরূপ তিনি ভালো জানেন, কোনো মানুষের পক্ষে এটা জানা সম্ভব নয়।

এটা হলো এ দিক থেকে ইস্তিওয়ার সবচেয়ে নরম ও সহনীয় ব্যাখ্যা। নতুবা কেউ কেউ ইস্তিওয়ার অর্থ নির্ধারণে এতটাই বাড়াবাড়ি করেছেন যে, আল্লাহকে মানুষের

মতো বানিয়ে ফেলেছেন। কেউ আরশকে আল্লাহর অবস্থানস্থল (مكان) আখ্যা দিয়েছেন। কেউ ইস্তিওয়া শব্দ বাদ দিয়ে বসা, সমাসীন হওয়া ও উপবেশন করা (الجلوس والقعود) ইত্যাদি শব্দ আল্লাহর শানে প্রয়োগ করেছেন। ফলে ইস্তিওয়ার ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, আল্লাহ আরশের উপর বসে আছেন। পা দুটো রেখেছেন কুরসির উপর। আবার কখনও কখনও কুরসির উপরও বসেন। তিনি যখন আরশে বসেন, তখন কটকট করে আওয়াজও বের হয়। তিনি আরশে বসলে সেখানে মাত্র চার আঙুল জায়গা খালি থাকে। সেখানে তাঁর পাশে আরশের উপর আবার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও বসাবেন। আর বসা যেহেতু কোনো বস্তুর সঙ্গে লেগে যাওয়া, তাই আল্লাহ আরশের উপর লেগে বসে আছেন। আরশ যেখানে শেষ, সেখান থেকে আল্লাহ শুরু। এভাবে তারা আল্লাহর জন্য দিক ও সীমা (الجهة والحد) নির্ধারণ করেছেন। এর পর কথা হলো, সীমা কোন দিকে? নিচ থেকে যেহেতু আল্লাহর সীমা রয়েছে অর্থাৎ আরশ, অন্যদিক থেকেও কি সীমা রয়েছে? কেউ কেউ বলেছেন—না, অন্যদিক থেকে সীমা নেই। আবার কেউ কেউ বলেছেন—সব দিক থেকেই সীমা রয়েছে। অর্থাৎ আমাদের যেমন উপর, নিচ, ডান বাম রয়েছে, তেমনই আল্লাহরও রয়েছে। ফলে তিনি সব দিক থেকে সীমায় নির্ধারিত। এভাবে কেউ কেউ আল্লাহর জন্য দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, লম্বা-চওড়া ইত্যাদির মতো হিসাবও কষেছেন; এসব শিরোনামে বই লিখেছেন। বরং যারা বলেন আল্লাহ সীমার উর্ধ্বে, তাদের তারা জাহমিয়্যাহ আখ্যা দিয়েছেন। কেউ আল্লাহর ওজন আছেও বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ফলে এই ওজনের কারণে ফেরেশতাদের আরশ ওঠাতেও কষ্ট হয়। তবে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পড়ার পরেই কেবল ওঠাতে পারেন। তারা আরও বলেছেন, আল্লাহ সময়ে-সুযোগে পৃথিবীতে এসে ঘোরাঘুরিও করেন।

বরং কেউ কেউ আল্লাহর আরশকে ছাগলের পিঠে বসিয়ে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তারা আব্বাস রাজি.-এর দিকে সম্পৃক্ত একটি বর্ণনা দ্বারা দলিল দেন। আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সাহাবাদের একটি দলের সঙ্গে বাতহায় ছিলাম। আমাদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন। তখন আমাদের পাশ দিয়ে একটি মেঘ উড়ে যাচ্ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা এটাকে কী নামে ডাকো? আমরা বললাম, 'সাহাব' (মেঘ)। তিনি বললেন, 'মুজন' (মেঘ)। আমরাও বললাম 'মুজন'। তিনি বললেন, 'আনান' (মেঘ)। আমরাও বললাম, 'আনান'। অতঃপর তিনি বললেন,

তোমরা কি জানো আকাশ ও ভূপৃষ্ঠের মাঝে দূরত্ব কতটুকু? সাহাবাগণ বললেন, আমরা জানি না। তিনি বললেন, এ দুটোর মাঝে দূরত্ব একাত্তর, বাহাত্তর কিংবা তিয়াত্তর বছর। এর উপর আকাশ। এভাবে তিনি সাত আকাশ পর্যন্ত গণনা করলেন। অতঃপর বললেন, সপ্তম আকাশের উপরে রয়েছে সাগর, যে সাগরের তলদেশ এবং পৃষ্ঠদেশের মাঝে দূরত্ব এক আকাশ থেকে আরেক আকাশের দূরত্বের সমান। **এর উপরে রয়েছে আটটি পাহাড়ি ছাগল, যেগুলোর হাঁটু ও খুরের দূরত্ব এক আকাশ থেকে আরেক আকাশের দূরত্বের সমান। তাদের উপরে রয়েছে আরশ।** এর উপরের ও নিচের অংশের মাঝে দূরত্ব এক আকাশ থেকে আকাশের দূরত্বের সমান। এর উপর রয়েছেন মহান আল্লাহ তায়ালা।' উক্ত বর্ণনাটি কিছু শব্দভেদে তিরমিজি, সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজা, মুসনাদে বাজ্জার, মুসনাদে আহমদ, মুসতাদরাকে হাকেম-সহ বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিজি এটাকে হাসান গরিব বলেছেন।[১] হাকেম এটাকে সহিহ বলেছেন।[২] বাস্তবতা হলো, এটা দুর্বল। বাজ্জার[৩], ইবনুল জাওজি, ইবনে আদি, মিজ্জি, সমকালীন শাইখ আলবানি-সহ[৪] অসংখ্য মুহাদ্দিস এটাকে দুর্বল বলেছেন। ফলে আকিদার মতো এত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এমন বর্ণনা দিয়ে দলিল দেওয়া কোনোভাবেই বিশুদ্ধ নয়।

মোট কথা, ইস্তিওয়ার ক্ষেত্রে এসব আলিমের মাজহাব হলো—কুরআন ও সুন্নাহে যত জায়গায় আল্লাহর উপরে থাকার কথা এসেছে, সবগুলো বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করা। ফলে তারা বলেন, আমাদের মাথার ঠিক উপরের দিকে আরশ। আল্লাহ আরশের উপর উঠেছেন, আরোহণ করেছেন, বসেছেন এবং স্থিত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি সত্তা-সহ আরশের উপরে আছেন। এটাকেই তারা কুরআন-সুন্নাহর বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা এবং সালাফে সালেহিনের মানহাজ মনে করেন। এক্ষেত্রে তারা (১) কুরআনের ইস্তিওয়া-সংক্রান্ত আয়াত, (২) আল্লাহর 'উপরে থাকা' (علي/فوق) সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিস (৩) আমল ও বিভিন্ন জিনিস উপরে ওঠা-সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিস (৪) আল্লাহর আকাশে থাকা (في السماء) সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিস এবং এ ব্যাপারে সালাফের শত শত বক্তব্য দলিল হিসেবে পেশ করেন। তাদের মতে, সালাফও এসব আয়াত ও হাদিস সেভাবে

---

১. তিরমিজি (৩৩২০)।
২. মুসতাদরাকে হাকেম (৩৪৪৮)।
৩. মুসনাদে বাজ্জার (১৩১০)।
৪. সিলসিলা জয়িফাহ, আলবানি (১২৪৭)।

বুঝেছেন, যেভাবে তারা বোঝেন; অর্থাৎ সালাফও উপরে বলতে আমাদের মাথার উপর বুঝতেন এবং ইস্তিওয়া বলতে আরশের উপর ওঠা বুঝতেন।

প্রশ্ন হলো: বাস্তবেই কি তা-ই? কুরআন-সুন্নাহ কি আমাদের মাথার উপর যে আকাশ, সেই আকাশের উপর সাত আকাশ, সেই সাত আকাশের উপরে আরশ, এবং সেই আরশের উপরে আল্লাহ বসেছেন এটাই বুঝিয়েছে? নাকি আমরা যাতে সহজে বুঝি, সেই শব্দে এসব অকল্পনীয় ও অদৃশ্যের ব্যাপার ব্যক্ত করা হয়েছে? সালাফ কি এই বাহ্যিক অর্থটাই গ্রহণ করতেন ও বুঝতেন? নাকি তারা ইস্তিওয়ার একেবারে ইজমালি অর্থটা (শব্দের হাকিকত যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষের মাথায় আসে; মুশাববিহিনদের মাথা নয়) স্বীকার করে গভীর মর্ম ও স্বরূপকে আল্লাহর কাছে সঁপে দিতেন এবং এক্ষেত্রে তারা আল্লাহর জন্য কোনো দিক, সীমারেখা নির্ধারণ করতেন না? **এগুলো কিছু জটিল প্রশ্ন।** এগুলোর উত্তরে শতাব্দের পর শতাব্দ হাজার হাজার পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে। ফলে কয়েক পৃষ্ঠায় এগুলোর জবাব খোঁজা অসম্ভব। আমরা সংক্ষেপে কিছু মূলনীতি উল্লেখ করব।

প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে, ইস্তিওয়া-সহ আল্লাহর অন্যান্য সিফাতের ক্ষেত্রে সালাফের মানহাজ হলো বাহ্যিক অবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া। অর্থাৎ যেভাবে এসেছে ওভাবেই রেখে দেওয়া। এ কারণে কুরআন ও হাদিসে আল্লাহর সিফাত ঠিক যে শব্দে এসেছে, সালাফ **হুবহু সে শব্দ সংরক্ষণ করেছেন** এবং সেভাবেই বলেছেন ও বুঝেছেন। কিন্তু পরবর্তী লোকেরা তানজিহের এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনি। ফলে তাদের গ্রন্থে সালাফের লম্বা লম্বা বক্তব্য থাকলেও সালাফের আকিদা আর তাদের আকিদা এক নয়।

কীভাবে? ইস্তিওয়ার মাধ্যমেই উদাহরণটা দেওয়া যাক। জয়নব বিনতে জাহাশ রাজি.-এর বক্তব্য, 'আল্লাহ তায়ালা আমাকে সাত আকাশের উপর থেকে বিয়ে দিয়েছেন।'[১] একইভাবে আয়েশার ব্যাপারে ইবনে আব্বাসের বক্তব্য, 'আল্লাহ তায়ালা সাত আকাশের উপর থেকে আপনার জন্য পবিত্রতা অবতীর্ণ করেছেন।'[২] ইমাম আওজায়ি (১৫৭ হি.) বলেন, 'আমরা অসংখ্য তাবেয়ির বিদ্যমান অবস্থায় বলতাম, আল্লাহ তায়ালা তাঁর আরশের উপরে। আর আমরা সুন্নাহে তাঁর যেসব গুণাবলি বর্ণিত

---

১. বুখারি (৭৪২০); তিরমিজি (৩২১৩)।
২. মুসনাদে আহমদ (২৫৩৭)।

হয়েছে, সেগুলোতে ঈমান আনি।'[১] দাসীর হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জিজ্ঞাসা করেন, 'আল্লাহ কোথায়?' দাসী জবাব দেন, 'আকাশে'।[২]

সাহাবা ও তাবেয়িন থেকে এমন প্রায় শতাধিক বক্তব্য রয়েছে। যেখানে 'সাত আকাশের উপর থেকে', 'আরশের উপরে', 'আকাশে', 'উপর থেকে', 'আকাশ থেকে' এ-জাতীয় বক্তব্য রয়েছে। প্রথম ধারার অনুসারীগণ যখন ইস্তিওয়ার ব্যাপারে সালাফের এসব বক্তব্য একত্রে পেশ করেন এবং একের পর এক সালাফের ইজমার কথা শোনান, তখন সাধারণ পাঠক হকচকিয়ে যায়। ভেবে কূল পায় না, সালাফের এত বক্তব্য থাকতেও কি কোনো জটিলতা হতে পারে? কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পাঠক জানেন, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, 'তিনি আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন।' সুতরাং সালাফ কীভাবে বলবেন, 'না, তিনি ইস্তিওয়া করেননি'? কুরআন ও সুন্নাহে এসেছে, 'আল্লাহ আকাশে।' সালাফ কীভাবে বলবেন, 'না, তিনি আকাশে নন'? সালাফের মানহাজ হলো, **যেভাবে এসেছে সেভাবে রেখে দেওয়া**। কিন্তু এটা কি পরবর্তী লোকদের মাজহাব? উত্তর হলো—না, পরবর্তী আলিমরা এগুলোর সঙ্গে নিজেদের মতাদর্শ যোগ করে সালাফের বক্তব্য তাদের দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে। অথচ সালাফ তাদের মতাদর্শ থেকে মুক্ত। সালাফ আল্লাহর ব্যাপারে বলেননি যে, আমাদের মাথার উপর ঠিক বরাবর যে শূন্য জায়গা দেখা যাচ্ছে সেটা প্রথম আকাশ, তার উপর দ্বিতীয় আকাশ, এভাবে আমাদের ঠিক মাথার উপরে যেতে যেতে সপ্তম আকাশ। এর ঠিক সোজা উপরে আরশ। আরশের সীমা শেষ হওয়ার পরে আল্লাহর সীমা শুরু। এ-রকম দিক, স্থান, সীমা ইত্যাদি সাব্যস্তকরণ থেকে সালাফ মহাপবিত্র।

এটা বলা সম্ভবও নয়। কারণ, দিক তো সৃষ্টির জন্য, আল্লাহর জন্য দিক প্রযোজ্য নয়। পিছনে এ ব্যাপারে ইমাম তহাবি-সহ অন্য অনেক ইমামের বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে আমরা নিজেরাই জানতে পারছি যে, দিক ধারণা নিতান্তই আপেক্ষিক। মানুষের সুবিধার্থে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন। নতুবা মহাশূন্যের কোনো দিক নেই। আমেরিকাতে থাকা একজন মানুষের কাছে যা উপরে, চীনের আরেকজনের কাছে সেটাই নিচে। তা ছাড়া দিক অবিনশ্বর কোনো বাস্তবতা নয়, বরং প্রত্যেকটা গ্রহের দিক ভিন্ন ভিন্ন। মানুষ পৃথিবী থেকে অন্য গ্রহে যাওয়ার সময় তার **উপর** হিসেবে বিবেচিত হয় পৃথিবীর বিপরীত দিক আর **নিচ** গণ্য হয় পা তথা

---

১. তাজকিরাতুল হুফফাজ, জাহাবি (১/১৩৫)।
২. মুসলিম (৫৩৭); আবু দাউদ (৯৩০, ৩২৮২)।

পৃথিবীর দিক। কিন্তু যখন সে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বলয় পার হয়ে যায়, তখন ব্যাপারটি পুরো উলটো হয়ে যায়। অর্থাৎ পৃথিবীর বিপরীতে যদি কোনো একটা গ্রহ থাকে এবং কোনো মানুষ যদি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পার হয়ে সেই গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ বলয়ের ভিতরে ঢুকে যায়, তখন সেটার মাধ্যাকর্ষণ তাকে টানা শুরু করবে। ফলে তার নিচ হবে সেই গ্রহ (যা এতক্ষণ উপর ছিল), আর পৃথিবী হবে উপর, যা এতক্ষণ নিচ ছিল। সেই গ্রহ থেকে আকাশের দিকে ইশারা করলে তার ইশারা যাবে পৃথিবীর দিকে। অর্থাৎ এতদিন হাতের ইশারার মাধ্যমে সে যে দিকে আল্লাহর অবস্থান নির্ধারণ করত, এখন বিপরীত দিকে আল্লাহর অবস্থান নির্ধারণ করছে।

আমাদের মহাবিশ্ব যে কত বড়, আমরা তা কল্পনাও করতে পারি না। আমাদের বিশাল সৌরজগৎ, এমন অগণিত সৌরজগৎ মিলে বিশাল গ্যালাক্সি, অগণিত গ্যালাক্সি নিয়ে গ্যালাক্সিপুঞ্জ, অগণিত গ্যালাক্সিপুঞ্জ নিয়ে গ্যালাক্সিমহাপুঞ্জ। এভাবে অদ্যাবধি যতটুকু আমরা জানতে পেরেছি, সে মহাবিশ্বে পৃথিবীর অবস্থা একটা অণু-পরমাণুর চেয়েও ক্ষুদ্র। ফলে বিশাল এ মহাবিশ্বে উপর-নিচের যেসব ধারণা আমরা রাখি, সেগুলো নিতান্তই তুচ্ছ। ফ্ল্যাট আর্থের কল্পনার ফলাফলস্বরূপ আমরা মনে করি সব গ্রহের **উপর** আর আমাদের পৃথিবীর **উপর** একই। এটা মূলত মানুষের সীমাবদ্ধ কল্পনাশক্তির দুর্বলতম প্রকাশ। ফলে আল্লাহকে এই কল্পনার ফ্রেমে বাঁধার চেষ্টা করা দুঃসাহসিকতা।[১]

এক্ষেত্রে প্রথম পক্ষ কুরআনের সেসব আয়াত দিয়ে দলিল দেন, যেগুলোতে আমল উপরের দিকে ওঠার কথা বলা হয়েছে। অথচ বাস্তবতা হলো, আমাদের দৃষ্টিতে আমলের উপরের দিকে ওঠা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। আমল মাটির ভিতরে চলে যায়, অথবা ডানে-বামে পথ খুঁজে নেয় এমন বলার যেহেতু সুযোগ নেই, সে কারণে **উপরে** যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কেবল আমল নয়, আজ আমরা বিজ্ঞানের কল্যাণে জানি, অন্য কোনো গ্রহে মহাকাশযান পাঠাতে হলে সেটাকে সর্বপ্রথম—আমাদের দৃষ্টিতে—**উপরের** দিকেই পাঠাতে হয়। এর অর্থ এটা নয় যে, সেই গ্রহটি আমাদের মাথার উপরে। বরং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ থেকে বের হতে হলে পৃথিবী যেদিকে আছে সেটার বিপরীত দিকে যানটাকে ধাক্কা দিতে হবে। শুধু এতটুকুই। উপর-নিচ এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। ফলে আমল আল্লাহর কাছে পৌঁছয়—সহজ ভাষায় এটা মানুষকে বোঝাতে হলে '**উপর**' বলা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

---

১. ফাতহুল বারি, ইবনে হাজার (৬/১৩৬, ১৩/৪১৬); আল-বাহরুর রায়েক, ইবনে নুজাইম (১/৩০২)।

একইভাবে তারা আল্লাহকে আমাদের মাথার উপর মনে করেন রাসুলুল্লাহর আকাশের দিকে আঙুল উঠিয়ে ইশারার মাধ্যমে, মানুষের দোয়াতে উপরে হাত ওঠানোর মাধ্যমে। অথচ এগুলো তাদের মতাদর্শের দলিল হতে পারে না। আমেরিকার একজন মানুষ যখন উপরে হাত উঠিয়ে দোয়া করে, চীনের আরেকজন মুসলমান যখন ঠিক সেই সময় উপরে হাত উঠিয়ে দোয়া করে, দুজনের হাত সুবিস্তৃত মহাবিশ্বের দুই দিকে ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে উপর-নিচ তুচ্ছ। পৃথিবীকে চওড়া অথবা দূর থেকে বড় বলের মতো কল্পনাবিলাসী মানুষ ছাড়া আর কেউ এখানে উপর-নিচ খুঁজে পাবে না। চাঁদকে আমরা মাথার **উপরই** বলি, কারণ সচরাচর তা-ই দেখি। অথচ চাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর **উপর-নিচের** কোনো সম্পর্ক নেই। তাই দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সত্তার দিকে ইঙ্গিত নয়, বরং উপরের দিকটাকে দোয়ার কিবলা হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে, যেমনটা ইমাম নববিসহ অসংখ্য আলিম বলেছেন।[১] তা ছাড়া উপর ছাড়া অন্য কোনো দিক ফাঁকাও নেই যে দিককে বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করা যাবে।

এটা তারাও বিভিন্ন জায়গাতে স্বীকার করেন। যেমন: দাসীর হাদিসে 'আল্লাহ কোথায়'—এমন প্রশ্নে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীকৃতি দিয়েছেন, **'আল্লাহ আকাশের ভিতরে'** (في السماء)। এক্ষেত্রে তারাও কিন্তু আক্ষরিক অর্থ ধরে বলেন না যে, আল্লাহ আকাশের ভিতরে ঢুকে আছেন। বরং তারা এটার অর্থ করেন **'আকাশের উপরে'**। অথচ 'আকাশের ভিতরে'র মতো 'উপরের দিকে' আক্ষরিক অর্থে নিলেও আল্লাহকে সৃষ্টির কল্পনায় বেঁধে ফেলার কারণে বিচ্যুতি গণ্য হবে। কারণ আল্লাহ এসব কিছুর উর্ধে। প্রশ্ন আসতে পারে, তা হলে **আল্লাহ আকাশে** বা **আরশের উপরে** এমন কেন বলা হলো? উত্তর হলো, আল্লাহ উপরে তো ঠিকই আছেন, কারণ তিনি তো ভূগর্ভে নন। ডানে-বামে, সামনে-পিছনে বিদ্যমান সৃষ্টির মাঝেও নন। ফলে কুরআন-সুন্নাহে যেভাবে এসেছে, সেভাবেই রেখে স্বীকৃতি দিতে হবে। কিন্তু 'উপর' বলতে যদি একটা বিশেষ দিকের মাঝে আল্লাহকে সীমাবদ্ধ করা হয়, নির্দিষ্ট কোনো দিকে বা স্থানে তাকে কল্পনা করা হয়, তবে সেটা বিচ্যুতি। আল্লাহ সেসব থেকে পবিত্র।[২]

একইভাবে কুরআনে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বক্তব্য: وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ অর্থ: 'তিনি বললেন, আমি আমার পালনকর্তার কাছে যাচ্ছি। তিনি আমাকে পথপ্রদর্শন করবেন।' [সাফফাত: ৯৯] আয়াতে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম

১. শরহে মুসলিম (৪/১৫২)।
২. দেখুন: ইবনে আবিল ইজ (২৬৫-২৭০)।

নিজ সম্প্রদায়ের দাওয়াত কবুলের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে তাদের ছেড়ে শামে হিজরত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। সেটাকেই তিনি 'আল্লাহর কাছে' যাওয়া শব্দে ব্যাখ্যা করেন। এ আয়াতের আক্ষরিক অর্থ ধরে কেউ কিন্তু বলবে না—আল্লাহ শামে আছেন; খোদ তারাও বলবেন না। অথচ ইস্তিওয়ার ক্ষেত্রে ঠিকই আক্ষরিক ও শারীরিক অর্থ ধরে তারা আল্লাহকে সত্তা-সহ আরশের উপর অবস্থানকারী ভাবেন। সালাফ এমন আকিদা থেকে পবিত্র। কেবল এসব স্থানে নয়, আক্ষরিক অর্থ ধরা হলে কুরআনের অসংখ্য আয়াত বোঝার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি তৈরি হবে। ফলে আক্ষরিক অর্থ গ্রহণের নামে অতিরঞ্জন পরিত্যাজ্য।

অনেকের কাছে আমাদের বক্তব্য সন্তোষজনক নাও মনে হতে পারে। সেজন্য আমরা এখন এ ব্যাপারে ইমামদের বক্তব্য তুলে ধরব। সর্বপ্রথম আমরা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের বক্তব্য উল্লেখ করব। কারণ, তাঁর বক্তব্য এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট এবং হুবহু আমাদের আকিদার দলিল। ইমাম আহমদ বলেন,

... ونجزم بأنه سبحانه وتعالى في السماء ، وأنه استوى على العرش بلا كيف، بل على ما يليق به في ذلك كله، ولا نتأول ذلك، ولا نفسره، ولا نكيفه، ولا نتوهمه، ولا نعينه، ولا نعطله، ولا نكذبه، بل نكل علمه إلى الله تعالى... وقال أحمد : نحن نؤمن بأن الله على العرش كيف شاء بلا حد، ولا صفة يبلغها واصف، أو يحده حاد. ومن قال: إنه بذاته في كل مكان، أوفي مكان. فكافر، لأنه يلزم منه قدم المكان، وحلوله في الأماكن القذرة وغيرها تعالى الله عن ذلك علواًكبيراً. وهذا لا ينافي كونه في السماء وعلى العرش على ما يليق به؛ لما سبق . .. ولا نقول إن العرش مكانه، لأن الأمكنة صنعة الله، وهي بعده، ولا نقول إنه بذاته قاعد على العرش، أوقائم، أومضطجع، ولا نائم، ولامماس، ولا ملاصق، بل نطلق الصفة كما نطق به القرآن، ونضرب عن الخوض فيما لا يبلغ حقيقته اللسان.

অর্থাৎ 'আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, আল্লাহ তায়ালা আকাশে। আমরা আরও বিশ্বাস রাখি, তিনি আরশের উপর স্বরূপহীন ইস্তিওয়া করেছেন। এসব কিছু যেভাবে তাঁর জন্য শোভনীয় সেভাবে। আমরা এগুলো তাবিল করি না, তাফসির করি না, স্বরূপ নির্ধারণ করি না, এগুলোর ব্যাপারে কল্পনা ও বিশেষ অনুমান করি না; এগুলোকে নাকচ করি

না, মিথ্যা সাব্যস্ত করি না। বরং এগুলোর জ্ঞান আল্লাহর কাছে সঁপে দিই... ইমাম আহমদ আরও বলেন, আমরা বিশ্বাস রাখি, আল্লাহ আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন, যেভাবে তিনি চেয়েছেন। এর স্বরূপ ও ধরন নেই, বিবরণ ও ব্যাখ্যা নেই, **সীমা (হদ) নেই।** যে ব্যক্তি বলবে, আল্লাহ সকল স্থানে কিংবা **একটা বিশেষ স্থানে,** সে কাফের। কারণ, এর মাধ্যমে স্থানও আল্লাহর মতো চিরন্তন হতে হবে। আল্লাহর নোংরা স্থানে বিদ্যমান হতে হবে। অথচ আল্লাহ এসব থেকে অনেক উর্ধ্বে। **তবে এর মাধ্যমে তার আকাশে ও আরশে হওয়া নাকচ হবে না। কারণ, সেটা তার শান অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে।** ...**আমরা আরশকে আল্লাহর 'স্থান' (মোকান) বলি না,** কারণ স্থান তো আল্লাহর সৃষ্টি; আল্লাহর পরে অস্তিত্বে এসেছে। আমরা বলি না, '**আল্লাহ সত্তা-সহ আরশে বসে আছেন,** কিংবা দাঁড়িয়ে আছেন, অথবা শুয়ে আছেন; ঘুমিয়ে আছেন, আরশের সঙ্গে মিশে আছেন—এগুলোর কিছুই বলি না, বরং কুরআনে সিফাতটি যেভাবে এসেছে সেভাবে বলেই ক্ষান্ত থাকি। যে গভীর মর্ম মানুষের ভাষা তুলে ধরতে অক্ষম, আমরা তাতে প্রবেশ করি না।'[১]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের উপর্যুক্ত বক্তব্যের সারমর্ম হলো: আল্লাহকে যেমন সর্বত্র কল্পনা করা যাবে না, বিশেষ কোনো একটা স্থানেও কল্পনা করা যাবে না। কারণ, একসময় আল্লাহ ছিলেন, অন্যকিছু ছিল না। আরশ কিংবা আরশের উপর বলতেও কিছু ছিল না। সুতরাং আরশকে কিংবা আরশের 'উপর'কে আল্লাহর স্থান বানানো নাকচ হয়ে গেল। একইভাবে ইস্তিওয়ার পরিবর্তে 'সত্তা-সহ', 'বসা', 'দাঁড়ানো', 'শোয়া' ও 'অবস্থান' ইত্যাদি সব ধরনের মনগড়া শব্দ আল্লাহর ব্যাপারে প্রয়োগ করা নাকচ হয়ে গেল। কারণ, আল্লাহ এগুলো নিজের জন্য প্রয়োগ করেননি!

কেউ বলতে পারেন, আরশের 'উপর' বলতে আমরা কোনো স্থান নির্ধারণ করছি না, কারণ আরশ সবকিছুর উপর। আরশের উপর আর কোনো সৃষ্টি নেই। ফলে আরশের উপরে আল্লাহ কোনো স্থানে নন; বরং স্থানহীন বিদ্যমান রয়েছেন। জবাবে আমরা বলব, এটাও গলদ বক্তব্য। কারণ, আল্লাহর সত্তাকে আরশের উপর কল্পনা করলে তাতে আল্লাহর জন্য 'দিক' (উপর) ও 'সীমা' (নিচ থেকে আরশ) সাব্যস্ত করা হচ্ছে। অথচ ইমাম আহমদ সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর জন্য যেমন স্থান নাকচ করেছেন, একইভাবে 'সত্তা-সহ আরশে', দিক ও সীমাও নাকচ করেছেন। 'আল্লাহ আরশের উপরে' কথাটি

---

১. নিহায়াতুল মুবতাদিয়িন, ইবনে হামদান (৩১-৩৩)।

নিছক নুসুসের প্রতি আত্মসমর্পণ; অন্যকিছু নয়। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহে বলা হয়েছে 'আল্লাহ আরশের উপরে', তাই আমরা এটা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করছি, তাঁর উপর প্রয়োগ করছি। কিন্তু তিনি আমাদের কল্পনা ও ধ্যান-ধারণার উর্ধ্বে। প্রশ্ন হতে পারে, তা হলে আল্লাহ কোথায়? ইমাম আহমদ জবাবে বলেন, 'আল্লাহ আরশের উপরে'। কিন্তু এর অর্থ হবে, وهو كما كان قبل خلق المكان **'স্থান সৃষ্টির আগে তিনি যেমন ছিলেন, এখনও তেমন আছেন।'**[১]

সালাফের মাজহাব: এটাই সকল সালাফে সালেহিন ও আহলে সুন্নাতের ইমামদের আকিদা। সালাফ কেবল কুরআন-সুন্নাহে যতটুকু এসেছে, সেগুলোর উপর ঈমান এনে এর গভীর মর্ম ও স্বরূপ আল্লাহর কাছে অর্পণ করতেন। এরপর বলতেন, 'তিনি যেমন বলেছেন তেমন' (هو كما وصف نفسه); একটা শব্দও বৃদ্ধি করতেন না।[২] ফলে ইস্তিওয়ার ক্ষেত্রেও তাদের আকিদা ও কর্মপদ্ধতি অভিন্ন।

ইমাম আবু হানিফা (১৫০ হি.) আল্লাহর জন্য 'দিক' নাকচ করেছেন।[৩] ইমাম তহাবির (৩২১ হি.) 'দিক' নাকচ-সংক্রান্ত আলোচনা পিছনে অতিক্রান্ত হয়েছে। ইমাম বাজদাবি (৪৮২ হি.) আল্লাহর জন্য 'দিক' সাব্যস্ত করাকে অসম্ভব বলেছেন।[৪] ইমাম সারাখসিও (৪৮৩ হি.) লিখেন, 'তাঁর কোনো দিক নেই।'[৫]

ইবনে হামদান (৬৯৫ হি.) ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের আকিদা বর্ণনা করে লিখেন, 'আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে 'নিচ', **'উপর'**, 'সামনে', 'পিছনে', 'স্বরূপ' ইত্যাদ সাব্যস্ত করা যাবে না।'[৬] ইবনে জামাআহ (৭৩৩ হি.) লিখেন, 'ইমাম আহমদ রাহি. আল্লাহর জন্য **'দিক'** সাব্যস্ত করতেন না।'[৭]

আবু দাউদ তয়ালিসি রাহি. বলেন, "সুফিয়ান সাওরি, শুবা, হাম্মাদ ইবনে জায়দ, হাম্মাদ ইবনে সালামাহ, শরিক, আবু আওয়ানাহ আল্লাহর জন্য 'হদ' (সীমা) নির্ধারণ করতেন না, আল্লাহর সঙ্গে কারও সাদৃশ্য সাব্যস্ত করতেন না, সৃষ্টির কিছুর সঙ্গে তাকে

---

১. নিহায়াতুল মুবতাদিয়িন, ইবনে হামদান (৩১)।
২. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বাইহাকি (২/৩০৪)।
৩. আল-ওয়াসিয়্যাহ, আবু হানিফা (৫৯)।
৪. উসুলুল বাজদাবি (১০)।
৫. উসুলুস সারাখসি (১/১৭০)।
৬. নিহায়াতুল মুবতাদিয়িন (৩৪)।
৭. ঈজাহুদ দলিল, ইবনে জামাআহ (১০৮)।

মেলাতেন না। হাদিসগুলো বর্ণনা করে যেতেন, 'কীভাবে' বলতেন না।"[১] ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনকে আল্লাহর নুজুল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন, 'এগুলোতে বিশ্বাস রাখো, বর্ণনা দিয়ো না।' ইমাম মালেককে ইস্তিওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'ইস্তিওয়া অজ্ঞাত নয়; কিন্তু এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদআত।' ইয়াহইয়া ইবনে ইবরাহিম ইবনে মাজিন বলেন, 'ইমাম মালেক এ ধরনের প্রশ্ন অপছন্দ করার কারণ হলো, কেউ কেউ এগুলোতে আল্লাহর সীমারেখা ও সাদৃশ্য আবিষ্কার করতে পারে, সেজন্য এগুলো আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়াই নিরাপদ।'[২]

ইমাম মুহাম্মাদ (শাইবানি) বলেন, 'সকল দেশের ফকিহ এই ব্যাপারে একমত যে, কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহে আল্লাহ তায়ালার যেসব সিফাত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকে কোনো ধরনের পরিবর্তন, বিবরণ (وصف), সাদৃশ্য দেওয়া ছাড়া গ্রহণ করতে হবে। যে ব্যক্তি এগুলো ব্যাখ্যা (تفسير) দেবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর রাসুলের মানহাজ ও আহলে সুন্নাতের মানহাজ থেকে বিচ্যুত হবে। কারণ, তারা এগুলোর বিবরণ দেননি, ব্যাখ্যাও করেননি (لم يصفوا ولم يفسروا)। বরং কুরআন ও সুন্নাহে যা এসেছে, ততটুকু বলে চুপ হয়ে যেতেন।'[৩]

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ বলেন,

كل ما وصف الله به نفسه في كتابه، فتفسيره قراءته والسكوت عنه، ليس لأحد أن يفسره إلا الله ورسوله

অর্থাৎ 'আল্লাহ তায়ালা কুরআনে নিজের সম্পর্কে যা বলেছেন, সেগুলো ওভাবে পাঠ করা এবং চুপ থাকাই সেগুলোর তাফসির। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল ছাড়া আর কেউ সেগুলো তাফসির করতে পারবে না।'[৪] ইমাম তিরমিজি বলেন, "সিফাতের ক্ষেত্রে সালাফের মানহাজ হলো, এগুলোর উপর ঈমান আনা, কোনো কল্পনা ও ধারণা না করা, ব্যাখ্যা না করা। 'কীভাবে' এটা না বলা; বরং যেভাবে এসেছে ওভাবে রেখে দেওয়া।"[৫] ইমাম ইবনে হিব্বান লিখেন, 'আল্লাহ সকল সীমারেখার উর্ধ্বে। কোনো

১. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বাইহাকি (২/৩৩৪); সুনানে কুবরা, বাইহাকি (৪৭২৯)।
২. আত-তামহিদ, ইবনে আবদুল বার (৭/১৫১)।
৩. শরহুস সুন্নাহ, লালাকায়ি (৩/৪৮০); ফাতহুল বারি (১৩/৪০৭)।
৪. ফাতহুল বারি (১৩/৪০৭); লাওয়ামিউল আনওয়ার, সাফারিনি (১/৯৯); জাম্মুত তাবিল, ইবনে কুদামা (১৯)।
৫. তিরমিজি (৬৬২, ২৫৫৫৭)।

সময় বা স্থান তাঁকে ধারণ করতে পারে না।'[১] ইমাম তহাবি লিখেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা সব ধরনের সীমা-পরিসীমা ও গণ্ডির উর্ধ্বে। তিনি সকল উপাদান, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উপকরণ থেকে মুক্ত। সৃষ্টির মতো ছয় দিক তাকে পরিবেষ্টন করতে পারে না।'

ইবনে আবদুল বার বলেন, (নুজুলের ক্ষেত্রে) **'সত্তা-সহ' শব্দটা যোগ করা স্বরূপ (কাইফিয়্যাত) নির্ধারণ করা।** এটা আহলে সুন্নাতের কাছে গ্রহণযোগ্য বক্তব্য নয়। কারণ, এটা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, আল্লাহর ক্ষেত্রে নয়। কুরআন-সুন্নাহে এমন কথা নেই। সুতরাং এটা বলা মনগড়া বক্তব্য হিসেবে পরিগণিত হবে।[২] ইবনে আবদুল বার আরও বলেন, নিজেদের আহলে সুন্নাত দাবিদার এক সম্প্রদায় বলে, আল্লাহ **সত্তাগতভাবে** অবতরণ করেন। এমন বক্তব্য বর্জনীয়। কারণ, আল্লাহর সত্তা নব-উদ্ভাবিত কোনো কাজের স্থান নয়। সৃষ্টির কোনো বিশেষণ তাঁর মাঝে নেই।[৩] নুজুলের ক্ষেত্রে যেমন 'সত্তাগত' বর্জনযোগ্য, ইস্তিওয়ার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

এমন বর্ণনা সালাফ থেকে অসংখ্য। দেখুন, তারা এসব হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে কতটা সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এ ব্যাপারে একটা শব্দ যোগ তো দূরে থাক, মাথায়ও কোনো কল্পনার স্থান দিতেন না; বরং যেভাবে এসেছে হুবহু ওভাবে রেখে দিতেন এবং এ ব্যাপারে কথা বলা অপছন্দ করতেন। ফলে সালাফ যখন কুরআন-সুন্নাহে পেয়েছেন 'আল্লাহ আরশের উপরে' তারা সেটাকে সেভাবেই মেনে নিয়েছেন। এ জন্য আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম প্রাণী মানুষের মাথার উপরের দিকটা হতে হবে, সালাফ সেটা দাবি করেননি। আর সেটা দাবি করলে সালাফের বক্তব্য (স্বরূপ বর্ণনা করা যাবে না) বহাল থাকল কীভাবে? কুরআন-সুন্নাহে এসেছে, তারা বিশ্বাস করেছেন—এটুকুই। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সালাফের নামে আল্লাহর উপর যাচ্ছেতাই শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, তাঁকে মাথার উপর উপবিষ্ট ভাবা হয়েছে। তাঁর আরশকে রাজা-বাদশাহর সিংহাসন ও বসার জায়গা বলা হয়েছে। সৃষ্টির মতো তার নুজুলকে উপর থেকে নিচে অবতরণ বোঝানো হয়েছে। তাকে একদিক থেকে আরেক দিকে যাচ্ছেন—এভাবে কল্পনা করা হয়েছে। 'সত্তা-সহ', 'হাকিকি', 'আল্লাহর দিক আছে', 'সীমা আছে', 'স্থান আছে'—এমন তুচ্ছ শব্দগুলো মহান আল্লাহর শানে ব্যবহার করা হয়েছে! এগুলো সালাফের মানহাজের সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক।

---

১. আস-সিকাত, ইবনে হিব্বান (১/১)।

২. আত-তামহিদ, ইবনে আবদুল বার (৭/১৪৪-১৪৫)। আত-তামহিদ (৭/১৪৫)।

৩. আল-ইসতিজকার, ইবনে আবদুল বার (২/৫৩০)।

মোট কথা, ইস্তিওয়ার ক্ষেত্রে সালাফের মানহাজ হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহে যা এসেছে ততটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকা; এক্ষেত্রে নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু যোগ না করা এবং অধিক ঘাঁটাঘাঁটি না করা। ফলে ইস্তিওয়া সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়—যেমন: আল্লাহ আরশে 'বসেন', 'ওঠেন', 'আরশে থাকেন', 'উপবিষ্ট হন', 'অবস্থান করেন', 'সমাসীন হন', 'চার আঙুল ফাঁকা থাকে', 'বসার সময় কটকট আওয়াজ হয়', 'আল্লাহর ভারে ফেরেশতারা প্রথমে ওঠাতে পারেন না', 'আরশ আমাদের ঠিক মাথার উপর', 'হাকিকি ইস্তিওয়া', 'সত্তা-সহ ইস্তিওয়া' ইত্যাদি—সঠিক নয়। এসব শব্দ আল্লাহর উপর প্রয়োগ করা যাবে না।[১]

দ্বিতীয় দলের মতামত: 'ইস্তিওয়া'র ব্যাপারে প্রথম ধারার বিপরীতে উম্মাহর আরও বেশ কিছু ধারা রয়েছে। তাদের নিজেদের মাঝে আবার এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। আমরা সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনায় প্রবেশ করব না; বরং মোটাদাগে প্রথম ধারার বিপরীতে তাদের বক্তব্যগুলো পর্যালোচনা করব।

তাদের মতে, আরশ আল্লাহর একটি সৃষ্টি। আরশ সৃষ্টির আগে আল্লাহ ছিলেন। যেহেতু তিনি আগে থেকেই পরিপূর্ণ, তাই আরশ সৃষ্টি তাঁর পূর্ণতার ভিতরে কিছু যোগ করেছে—এটা সম্ভব নয়। তাঁর সকল গুণ অনাদি। ফলে আরশ সৃষ্টির পরে তাঁর ভিতরে নতুন কোনো গুণ তৈরি হয়েছে—এমন নয়। আল্লাহ যখন ছিলেন, তখন কোনো দিক ও সীমা ছিল না। আল্লাহই এসব দিক ও সীমা সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আল্লাহ সকল দিক ও সীমার উর্ধ্বে। উপর-নিচ ও ডান-বাম বলতে আমরা যা বুঝি, সব সৃষ্টির ক্ষেত্রে

---

১. উল্লেখ্য, সালাফের যুগের একদল আলিম থেকে ইস্তিওয়া-সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু বিচ্ছিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়। 'বিচ্ছিন্ন' এ কারণে যে, তারা আল্লাহর উপর এমন কিছু শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যা আল্লাহ নিজের উপর প্রয়োগ করেননি, তাঁর রাসুল করেননি, সংখ্যাগরিষ্ঠ সালাফে সালেহিন করেননি। কুরআন-সুন্নাহ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সালাফে সালেহিনের মানহাজ ছিল 'ইস্তিওয়া আলাল আরশ'-এর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকা। কিন্তু আলোচ্য ব্যক্তিবর্গ সেটাতে সীমাবদ্ধ থাকেননি। বরং তারা এক্ষেত্রে 'সত্তা-সহ ইস্তিওয়া', 'হাকিকিভাবে আরশের উপর থাকা', 'অবস্থান করা', 'আরোহণ করা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তারা সম্ভবত এটা তৎকালীন যুগের জাহমিয়্যাহদের খণ্ডনে ব্যবহার করে থাকবেন। কিন্তু, যেমনটা বলা হলো, এসব শব্দ কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা স্বীকৃত নয়। জমহুর সালাফে সালেহিনও আল্লাহর উপর এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ করেননি, যেমনটা ইমাম আহমদের বক্তব্য দেখানো হয়েছে। ফলে প্রথম কয়েক শতাব্দের লোক হওয়াতেই কারও বক্তব্য বিশুদ্ধ হয়ে যাবে, চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করতে হবে—এমন নয়। কারণ, তাদের কারও ইসমাতের সনদ নেই। আবার জাহমিয়্যাহদের বিরোধিতা করতে গিয়েও এমন কোনো শব্দ আল্লাহর উপর প্রয়োগ করা যাবে না, যা তিনি নিজের উপর প্রয়োগ করেননি অথবা তাঁর রাসুল করেননি। ফলে এটাকে সর্বোচ্চ ইজতিহাদ ও তাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি বলা যাবে। সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য হলো, ব্যক্তিবিশেষ কিংবা সংখ্যালঘু দলের বিচ্ছিন্ন বক্তব্য পরিহার করে কুরআন-সুন্নাহ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সালাফে সালেহিনের সঙ্গে থাকা, কুরআনি শব্দ ও তাবিরের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকা, যা তানজিহের সর্বোচ্চ বাস্তবায়ন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

প্রযোজ্য। আল্লাহর ক্ষেত্রে এগুলো প্রযোজ্য নয়। ফলে আল্লাহ আরশের উপর উঠেছেন—ইস্তিওয়ার এমন অর্থ ধরলে আল্লাহকে দিকের মাঝে সীমাবদ্ধ করা হয়, অথচ তিনি সকল দিকের উর্ধ্বে। তাই তারা আল্লাহর ইস্তিওয়া-সংক্রান্ত আয়াতগুলোকে 'মুতাশাবিহাত' গণ্য করেন এবং এগুলোর কোনো অর্থ নির্ধারণ করেন না। তাদের মতে, **আল্লাহ কোনো স্থানে সীমাবদ্ধ নন; বরং তিনি আরশ সৃষ্টির আগে যেমন ছিলেন, তেমন আছেন। আবার যেদিন আরশ থাকবে না, তিনি থাকবেন। কারণ, তিনি ছাড়া কেউ চিরন্তন ও অবিনশ্বর নয়। ফলে আরশের আগে যেথায় ছিলেন, আরশের পরে যেথায় থাকবেন, এখন তিনি সেখানেই আছেন। অন্য কথায়, স্থান-কাল সৃষ্টির জন্য প্রযোজ্য; আল্লাহর জন্য নয় (بلا زمان ومكان)।**[১]

এ ধারার আলিমগণ মনে করেন, ইস্তিওয়াকে আরশের উপর ওঠা বললে প্রশ্ন আসে—আরশ সৃষ্টির আগে আল্লাহ কোথায় ছিলেন? তা ছাড়া আরশের উপর **ওঠা** বললে বোঝা যায় আগে তিনি নিচে ছিলেন। কিংবা আরশের উপর আল্লাহর বসাকে **পূর্ণতা** মনে করলে বোঝা যায়, আল্লাহ আগে অপূর্ণ ছিলেন। যেহেতু আরশ সৃষ্টির আগে এই বসার পূর্ণতা তার মাঝে ছিল না। ফলে আরশ আল্লাহর পূর্ণতা এনে দিয়েছে। আল্লাহর পূর্ণতা আরশের প্রতি মুখাপেক্ষী। অথচ আহলে সুন্নাতের আকিদা হলো, আল্লাহ আরশের প্রতি মুখাপেক্ষী নন। রাজি লিখেন, 'কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আল্লাহর আরশকে আটজন ফেরেশতা বহন করে। [হাক্কাহ: ১৭] আল্লাহকে যদি আরশের উপর বসা মনে করা হয়, তবে অর্থ দাঁড়াচ্ছে—আটজন ফেরেশতা আল্লাহকে বহন করে। অথচ এ ধরনের বক্তব্য যে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি, তা যে কারও কাছে ধরা পড়বে। কারণ, আল্লাহ তায়ালা সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী। সুতরাং তিনি স্থান ও দিক থেকেও অমুখাপেক্ষী।'[২]

এ কারণে তারা কুরআনে ইস্তিওয়া-সংক্রান্ত আয়াত তাবিল করার মাধ্যমে তাদের মাজহাব প্রমাণিত ও বিপরীত মাজহাব খণ্ডন করেন। তাদের বক্তব্য:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ.

অর্থ: 'নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন। [আরাফ: ৫৪] এই

---

১. আত-তাফসিরুল কাবির, রাজি (২৫/১৩৮)।
২. আত-তাফসিরুল কাবির, রাজি (১৪/২৬৮)।

আয়াতে ثُمَّ (অতঃপর) শব্দটি দ্বারা বোঝায়—আসমান ও জমিন সৃষ্টির সময় তিনি আরশের উপর ছিলেন না, অথচ আরশ তখনও ছিল। কারণ আরশ আল্লাহর সর্বপ্রথম সৃষ্টি। আর তাদের করা অর্থমতে আয়াতের অর্থ দাঁড়াচ্ছে, আকাশ ও মাটি সৃষ্টির পরে তিনি আরশে উঠেছেন, এর আগে আরশে ছিলেন না।[১]

মোটকথা, তারা কুরআনে ব্যবহৃত ইস্তিওয়ার ক্ষেত্রে দুটো মানহাজ অবলম্বন করেন: **(এক.)** এগুলোর **অর্থ,** মর্ম, ধরন, স্বরূপ—সবকিছু আল্লাহর কাছে সঁপে দেন (তাফবিজ মুতলাক করেন)। এ ধারার প্রথম যুগের আলিমদের মাঝে এ কর্মপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। **(দুই.)** পরবর্তী যুগের আলিমগণ নতুন আরেকটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন এবং বর্তমানেও তারা সেটার উপরই জোর দেন। তা হলো, এসব শব্দের আল্লাহর শানের উপযোগী ব্যাখ্যা **(তাবিল)** করা। ফলে তারা ইস্তিওয়ার অর্থ করেন: **প্রতিপত্তি** (الاستيلاء), **সৃষ্টির পরিচালনা** (تدبير)। অর্থাৎ আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করার পরে সেগুলোর পরিচালনা শুরু করেন।[২]

উদাহরণ হিসেবে সুরা আরাফ ধরা যাক। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থ: 'নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমন অবস্থায় যে, দিন দ্রুত রাতের পিছনে আসে। তিনি স্বীয় আদেশের অনুগামী করে সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র। মনে রেখো, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। আল্লাহ বরকতময়, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।' [আরাফ: ৫৪] তারা মনে করেন, উক্ত আয়াতে ইস্তিওয়ার অর্থ বসা নয়। কারণ, আলোচ্য আয়াতটি মূলত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি এবং এগুলোর পরিচালনা-সংক্রান্ত। সৃষ্টির সঙ্গে বসার কোনো সম্পর্ক নেই। বরং আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াতে বলেছেন, তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করে রাত, দিন, চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি ইত্যাদি-সহ সৃষ্টির পরিচালনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। আয়াতের পরের অংশ 'সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই'—

---

১. আত-তাফসিরুল কাবির, রাজি (১৪/২৬৮); সাইদ ফুদাহ (৮৩৬-৮৩৯)।
২. তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ, মাতুরিদি (১/৪১১)।

এখানেও দেখা যাচ্ছে, সৃষ্টিকে পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আয়াতের শেষ অংশে 'বিশ্বজগতের পালনকর্তা' হিসেবে আল্লাহর গুণকীর্তন করা হয়েছে। আর গুণকীর্তনের সঙ্গে বসার সম্পর্ক নেই; বরং গোটা বিশ্বকে পরিচালনার কারণেই তিনি এই গুণকীর্তনের অধিকারী। উপরের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতে ব্যবহৃত ثُمَّ (অতঃপর) নিয়েও কোনো জটিলতা নেই। কারণ সৃষ্টির পরেই তো পরিচালনার কথা আসে। সৃষ্টি না থাকলে পরিচালনার প্রসঙ্গ আসে না। অপরদিকে বিশ্ব-সৃষ্টির সঙ্গে বসার কোনো সম্পর্ক নেই।[1]

একইভাবে আল্লাহ তায়ালার বাণী:

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

অর্থ: 'যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি বলুন, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তার উপর ভরসা করলাম, আর তিনি মহান আরশের প্রতিপালক।' [তাওবা: ১২৯] এখানেও আল্লাহর উপর ভরসার সঙ্গে ইস্তিওয়া শব্দটা আনা হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যিনি আরশের মতো এত বড় সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন, আমার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আরশে বসার সঙ্গে ভরসার সম্পর্ক নেই।

সুরা ইউনুসে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.

অর্থ: 'নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমিনকে ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন। তিনি কার্য পরিচালনা করেন। কেউ সুপারিশ করতে পারে না তাঁর অনুমতি ছাড়া। তিনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তোমরা তাঁরই ইবাদত করো। তোমরা কি চিন্তা করো না?' [ইউনুস:৩] এখানে সুস্পষ্টভাবে ইস্তিওয়াকে পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তা ছাড়া আয়াতে সুপারিশের কথা বলা হয়েছে, যা একধরনের মালিকানা, কর্তৃত্ব ও পরিচালনা বোঝায়। বসার সঙ্গে সুপারিশের কোনো সম্পর্ক নেই।

---

১. আত-তাফসিরুল কাবির, রাজি (১৪/২৬৯); সাইদ ফুদাহ (৮৪০-৪১)।

সুরা রাদে আল্লাহ বলেন,

اَللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ؕ كُلٌّ یَّجْرِیْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّی ؕ یُدَبِّرُ الْاَمْرَ یُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ.

অর্থ: 'আল্লাহ যিনি উন্নীত করেছেন আকাশমণ্ডলীকে কোনো স্তম্ভ ব্যতীত। তোমরা সেগুলো দেখো। অতঃপর তিনি আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন, এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন, নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।' [রাদ: ২] এখানেও আকাশ উন্নত করা, চন্দ্র-সূর্য সবকিছু পরিচালনা করার সঙ্গে ইস্তিওয়ার উল্লেখ রয়েছে, যার সঙ্গে বসার সম্পর্ক নেই।

এভাবে এই ধারার প্রথম যুগের আলিমগণ ইস্তিওয়ার অর্থ ও স্বরূপ **তাফবিজ** করতেন। ইস্তিওয়ার কোনো অর্থ নির্ধারণ করতেন না।[১] পরবর্তী আলিমগণ তাফবিজের পাশাপাশি **তাবিলের** পন্থা গ্রহণ করেন এবং ইস্তিওয়াকে 'রাজত্ব', 'কর্তৃত্ব', 'পরিচালনা' ইত্যাদি অর্থে ব্যাখ্যা করেন। প্রশ্ন হতে পারে, এই দৃষ্টিভঙ্গি কতটুকু সঠিক? অন্য কথায়, ইস্তিওয়ার ক্ষেত্রে 'তাফবিজ' ও 'তাবিল'-এর পথে হাঁটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মানদণ্ডে কতটা সঠিক?

পিছনে আমরা আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে তাফবিজি দৃষ্টিভঙ্গির শুদ্ধ্যশুদ্ধি নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা বিভিন্ন দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে স্পষ্ট করেছি যে, সালাফে সালেহিন থেকে সিফাতের তাফবিজ প্রমাণিত। কিন্তু সেই তাফবিজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ঢালাওভাবে সবকিছু এড়িয়ে যাওয়া নয়। অর্থাৎ ইস্তিওয়া তাফবিজ করার অর্থ যদি হয় হাকিকতে লফজি (শাব্দিক অর্থ) সাব্যস্ত করে হাকিকতে উরফি (প্রচলিত অর্থ) আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া, তবে সেটা সালাফে সালেহিনের মানহাজ। কিন্তু যদি তাফবিজ অর্থ করা হয় ইস্তিওয়ার সব ধরনের হাকিকত আল্লাহর কাছে সঁপে দিয়ে এ ব্যাপারে পুরোপুরি অন্ধ থাকা, তবে সেটা সালাফে সালেহিনের মানহাজ নয়। এ ধরনের তাফবিজ কোনো সিফাতের ক্ষেত্রেই বৈধ নয়। কারণ, এ প্রকারের তাফবিজের ক্ষেত্রে 'ইস্তিওয়া', 'নুজুল', 'ইয়াদ', 'ওয়াজহ' ইত্যাদির মাঝে কোনো তফাত থাকে

১. শরহুল জাওহারাহ, বাইজুরি (১৮৮)।

না। বরং যা-ই 'ইস্তিওয়া', তা-ই নুজুল, যা-ই 'ইয়াদ' তা-ই ওয়াজহ' হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ তায়ালা যেখানে 'ইস্তিওয়া' শব্দ প্রয়োজন সেখানে 'ইস্তিওয়া'ই ব্যবহার করেছেন, যেখানে 'নুজুল' শব্দ প্রয়োজন সেখানে নুজুলই ব্যবহার করেছেন। তাই সবগুলোর সব রকমের হাকিকত নাকচ করার সুযোগ নেই। তা ছাড়া অসংখ্য সালাফে সালেহিন থেকে ইস্তিওয়ার **'অর্থ'** সাব্যস্ত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। হ্যাঁ, তারা কোন **'অর্থ'** গ্রহণ করতেন এবং সেসব **'অর্থ'** কীভাবে বুঝব—সে ব্যাপারে পিছনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই বলে সম্পূর্ণরূপে **অর্থ** (হাকিকতে লফজি) তাফবিজের সুযোগ নেই। ফলে এ ধারার আলিমগণ যদি 'আল্লাহর ইস্তিওয়ার তাফবিজ' বলতে শব্দের হাকিকত সাব্যস্ত করে **প্রচলিত** হাকিকত (নিচ থেকে উপরে ওঠা) তাফবিজের কথা বলেন, তবে সেটা বিশুদ্ধ। কিন্তু যদি লফজি ও উরফি সব ধরনের হাকিকতকে তাফবিজের কথা বলেন, তবে তাদের কথা সঠিক নয়। এটা সালাফের মানহাজ নয়। এটা কুরআন-সুন্নাহ তাজহিলের নামান্তর।

এ ধারার পরবর্তী আলিমগণ কুরআনে আল্লাহর ইস্তিওয়া-সম্পর্কিত সবগুলো আয়াতকে **পরিচালনা, প্রতিপত্তি, রাজত্ব** ইত্যাদি অর্থে নেন এবং এটাকেই আয়াতের মর্ম অনুযায়ী ব্যাখ্যা মনে করেন।[১] প্রশ্ন হয়, **এই তাবিল কতটুকু সঠিক?**

গভীর ও নিরপেক্ষভাবে আমরা এসব নসের দিকে তাকালে দেখব—এসব তাবিল ত্রুটিমুক্ত নয়। কারণ, আরশ আল্লাহর স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টি। একাধিক হাদিসে এসেছে—যখন কিছু ছিল না, আল্লাহ তায়ালা ছিলেন। এরপর আল্লাহ আরশকে পানির উপর সৃষ্টি করেন।[২] আরশ আল্লাহর প্রথম পর্যায়ের সৃষ্টিগুলোর মাঝে একটি শরীরী সৃষ্টি। ফলে 'ইস্তিওয়া আলাল আরশ'কে প্রতিপত্তির মতো রূপক অর্থে নিলে আরশের বিশেষ কোনো অর্থ থাকে না। একইভাবে কুরআনের বাণী, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে দেখা যায়, আটজন ফেরেশতা আরশ বহন করছেন। আরশকে যদি রাজত্বের মাধ্যমে তাবিল করা হয়, সেই রাজত্ব আটজন ফেরেশতা বহন করার কোনো যুক্তি আছে কি? এ কারণে আমরা দেখি—ইমাম আহমদ রাহি. ইস্তিওয়ার মাসআলাতে বলছেন, 'আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি, আল্লাহ তায়ালা আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন যেমন তিনি বলেছেন, যেমন তাঁর জন্য শোভনীয়। আমরা এটা তাবিল করি না,

---

১. তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ, মাতুরিদি (১/৪১১); বাহরুল উলুম, সমরকন্দি (২/৩৯০); আহকামুল কুরআন, জাসসাস (৩/২৮৭); সাইদ ফুদাহ (৮৪০-৮৫০)।

২. তিরমিজি (৩১০৯); ইবনে মাজা (১৮২); আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (৪৬৮)।

তাফসির করি না...।'[১] খোদ ইমাম আবুল হাসান আশআরি রাহি.-ও এর বিপক্ষে। তিনি ইস্তিওয়াকে প্রতিপত্তি (الاستيلاء), প্রভাব (القهر), রাজত্ব ইত্যাদির মাধ্যমে তাবিল করাকে মুতাজিলা, জাহমিয়্যাহ, হারুরিয়্যাহদের মত হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।[২] কাজি ইসমাইল শাইবানি হানাফিও তাবিলের সমালোচনা করে লিখেছেন, মুতাজিলারা আরশকে রাজত্ব আর কুরসিকে ইলম দ্বারা তাবিল করে।[৩] আবদুল কাদের জিলানি রাহি. লিখেন, ইস্তিওয়াকে তাবিল করা উচিত নয়। ...**ইস্তিওয়ার অর্থ সম্মান ও মর্যাদাগত উচ্চতা নয় ...। কিংবা এর অর্থ পরিচালনা ও প্রতিপত্তিও নয়...**। কারণ, শরিয়তে এসব বলা হয়নি। সাহাবি, তাবেয়িন কিংবা সালাফের কেউ এগুলো বলেননি। বরং তারা স্বাভাবিক অবস্থার উপর রেখে দিয়েছেন।[৪] ইমাম বাইহাকি বলেন, আমাদের পূর্ববর্তী আলিমগণ এগুলোর তাফসির করতেন না, এগুলো নিয়ে কথাও বলতেন না।[৫] এর পরও এটাকে তাবিল করার সুযোগ থাকে কীভাবে?

তাই এই ধারার, বিশেষত পরবর্তী আলিমদের, জটিলতা হচ্ছে **অতিরিক্ত তাবিল করা**। তারা যেখানে স্বীকার করছেন সালাফের মাজহাব তাফবিজ, সেখানে তারা সেটার অনুসরণ না করে তাবিল করছেন। তারা এক্ষেত্রে যুক্তি দেন যে, সময় ও মানুষের প্রয়োজনে তাবিল করা হয়েছে; অথচ এমন প্রয়োজন আগেও ছিল, কিন্তু সালাফ তাবিল করেননি। কারণ, তাবিল করলে কুরআন-সুন্নাহে নিজের মনগড়া কথা ঢুকে পড়ার ব্যাপক আশঙ্কা থাকে। তা ছাড়া আমরা আগেও উল্লেখ করেছি, **সালাফ প্রয়োজনে তাবিল করেছেন। বরং তারা অসংখ্য জায়গায় তাবিল করেছেন। কুরআন-সুন্নাহর অনেক জায়গা তাবিল করা অপরিহার্য। কারণ, সেগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেগুলো নসের প্রয়োজনে এবং শর্তসাপেক্ষে। সালাফ তাবিলকে মানহাজ বানিয়ে নেননি।**

ইমাম তিরমিজি লিখেন, 'আল্লাহ তায়ালা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায়, হাত, পা, শ্রবণ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন। জাহমিয়্যাহরা এগুলোর অপব্যাখ্যা করে। সালাফ বলেছেন, আল্লাহ আদমকে তার হাতে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু জাহমিয়্যাহরা

---

১. নিহায়াতুল মুবতাদিয়িন, ইবনে হামদান (৩১)।
২. আল-ইবানাহ, আশআরি (১০৮)।
৩. শাইবানি (২৭)।
৪. আল-গুনইয়াহ, জিলানি (১/১২৪)।
৫. আল-আসমা ওয়াস সিফাত (২/৩০৩)।

বলে, তিনি আদমকে শক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন।'[১] এখানে ইমাম তিরমিজির বক্তব্যে তাবিলের নিন্দা সুস্পষ্ট; বরং যারা তাবিল করেন, তারাও স্বীকার করেন যে, তাবিল করা অনুত্তম।

ইমাম রাজি লিখেন, 'সুতরাং ইস্তিওয়া বলতে আরশের উপর আল্লাহর বসা, স্থিতি, কিংবা জায়গা ও দিক দখল ইত্যাদি বোঝাবে না; বরং আহলুল ইলমদের কাছে এখানে দুই পন্থার যেকোনো একটা বেছে নিতে হবে: **এক. আল্লাহ তায়ালা সব ধরনের স্থান ও দিকের উর্ধ্বে বিশ্বাস করব। এ সম্পর্কিত আয়াতগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যার মাঝে প্রবেশ করব না; বরং এগুলোর প্রকৃত ইলম আল্লাহর কাছে সঁপে দেবো (তাফবিজ)। এটা আমার পছন্দের মত। আমি এটা বলি ও এর উপর আস্থা রাখি।** দুই. এগুলোর যথোপযুক্ত তাবিল করব। যেমন ইস্তিওয়া বলতে পরিচালনা, কর্তৃত্ব, রাজত্ব ইত্যাদি।'[২] ইমাম রাজি অন্যত্র ইস্তিওয়ার ব্যাখ্যায় লিখেন, 'এ ব্যাপারে আলিমদের দুটো মত। এক. **এর মর্ম আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া।** দুই. যথোপযুক্ত তাবিল তথা ব্যাখ্যা করা। **তবে প্রথম পন্থাটি নিরাপদ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ।'**[৩] সুতরাং অনিরাপদ বাদ দিয়ে নিরাপদ পথে হাঁটা যে উত্তম, সেটা সবার জানার কথা। 'তাসিসে' ও ইমাম রাজি রাহি. লিখেন, '**এগুলোর অর্থ আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়াই সালাফের মানহাজ**। তাদের কাছে এগুলোর তাফসির করা বৈধ নয়। কিন্তু মুতাকাল্লিমিন এগুলোর **তাবিল** করে থাকেন।' (يجب تفويض معناها إلى الله، ولا يجوز الخوض في تفسيرها، وقال جمهور المتكلمين: بل يجب الخوض في تأويل تلك المتشابهات)।[৪]

ইমামুল হারামাইন জুয়াইনি লিখেন, 'কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত সিফাতের আয়াতগুলো সালাফ তাবিল করেননি, বরং বাহ্যিক অবস্থার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। এগুলোর অর্থ আল্লাহর কাছে সঁপে দিয়েছেন। **এটাই আমাদের পছন্দের মতামত এবং এটাই আমাদের আকিদা ও দ্বীন।** কারণ সালাফের অনুসরণ আর নব আবিষ্কার (বিদআত) পরিত্যাগ করা উত্তম। শরিয়তের দলিল দ্বারা প্রমাণিত যে, উম্মতের ইজমা একটি অনুসরণীয় দলিল এবং এটা শরিয়তের একটি বড় প্রমাণ। আর আল্লাহর রাসুলের সাহাবাগণ এগুলোর অর্থ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেননি, এসবের রহস্য উদঘাটনের পিছনে

---

১. তিরমিজি (৬৬২)।
২. আত-তাফসিরুল কাবির, রাজি (১৪/২৬৯-২৭১)।
৩. আত-তাফসিরুল কাবির, রাজি (২৫/১৩৭)।
৪. তাসিসুত তাকদিস, রাজি (২২৯)।

নিজেদের ব্যস্ত করেননি, অথচ তাঁরা ছিলেন ইসলামের সর্বোত্তম প্রজন্ম, শরিয়তের নিশান-বরদার। দ্বীনের সুরক্ষার ক্ষেত্রে, উম্মাহর ভিত্তি মজবুত করতে তারা কোনো ত্রুটি করতেন না। মানুষকে প্রয়োজনীয় জিনিস শিক্ষা দিতে তারা সামান্য অবহেলা করতেন না। যদি এসব আয়াত ও হাদিসকে তাবিল করা সঠিক ও আবশ্যক হতো, তা হলে শরিয়তের শাখাগত বিষয় (হালাল-হারাম ইত্যাদি) এর পরিবর্তে এগুলোর প্রতি তাদের গুরুত্ব আরও বেশি হতো। **কিন্তু এভাবেই তাবিল ছাড়া তাদের যুগ এবং তাবেয়িদের যুগ শেষ হয়ে যায়।** আর সালাফের মানহাজ যেহেতু অনুসরণীয়, তাই প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হবে আল্লাহকে সব ধরনের সৃষ্টির গুণ থেকে পবিত্র জানা এবং **নিজেকে অস্পষ্ট বিষয়ের তাবিলে ব্যস্ত না করে** এর অর্থ আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া।'[১]

জাওহারার ব্যাখ্যায় বাইজুরি লিখেন, 'ইস্তিওয়ার ব্যাপারে **সালাফের মানহাজ ছিল এটা বলা যে, ইস্তিওয়া কিন্তু আমরা সেটার স্বরূপ জানি না।** আর খালাফের কাছে এর অর্থ প্রভাব ও প্রতিপত্তি।'[২] কাশ্মীরিও ইস্তিওয়াকে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করাকে সঠিক মনে করেন না। আবার আক্ষরিক (শারীরিক) অর্থেও নয়।' (فليس الاستواءُ عندي محمولًا على الاستِعارة، ولا على الحِسّيِّ الذي نَتعقَّلُه)[৩] এ ব্যাপারে হজরত থানভি রাহি.-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আয়াত ও হাদিস হাকিকিভাবে বিশ্বাস করতে হবে, কিন্তু এর স্বরূপ আল্লাহর কাছে সঁপে দিতে হবে।'[৪]

ইমাম তহাবির বক্তব্যের ব্যাখ্যা: প্রশ্ন আসতে পারে, ইমাম তহাবি কোন পক্ষে? বরাবরের মতো এখানেও তাকে নিয়ে টানাটানি। প্রথম ধারা মনে করে ইমাম তহাবি তাদের আকিদা সমর্থন করেছেন। দ্বিতীয় ধারা মনে করে ইমাম তহাবি তাদের আকিদা সর্মথন করেছেন। তাদের উভয়ের দলিল ইমাম তহাবির বক্তব্য: **'আল্লাহ তায়ালা আরশ এবং আরশের নিচে বিদ্যমান সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি প্রত্যেক বস্তু এবং তার (তথা আরশের) উপর যা-কিছু রয়েছে সবগুলোকে পরিবেষ্টনকারী'** (مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ فما فَوْقَهُ)। প্রথম দল এটার অর্থ করেছে 'আল্লাহ সবকিছুর উর্ধ্বে'।[৫] ফলে ইমাম তহাবির বক্তব্য তাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে। দ্বিতীয় দল এটার অর্থ করেছে,

---

১. আল-আকিদাহ আন নিজামিয়্যাহ, জুয়াইনি (১৬৬)।
২. শরহুল জাওহারাহ, বাইজুরি (১৮৮)।
৩. ফয়জুল বারি (৬/৫৬৩)।
৪. ইমদাদুল ফাতাওয়া (৬/২৮)।
৫. ইবনে আবিল ইজ (২৫৯); সালেহ ফাওজান (১০০); আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা, আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর (২৬২)।

রূপকভাবে উর্ধ্বে।[1] ফলে ইমাম তহাবির বক্তব্য তাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে। অথচ বাস্তব কথা হলো, ইমাম তহাবি এই দুই পক্ষের জটিলতার মাঝে ঢুকতেই চাননি। ফলে কুরআন-সুন্নাহর মতো তিনিও ব্যাপারটি এমনভাবে রেখে দিয়েছেন, যাতে তার কথা দুই দিকেই নেওয়া যায়। এটা সম্ভবত এই কারণে যে, তিনি এসব নিয়ে মুসলিম উম্মাহর বিভক্তি পছন্দ করতেন না। কারণ, এগুলো আকিদার মৌলিক বিষয় নয়।

ফলে আমরা যদি ইমাম তহাবির বক্তব্যের একটু গভীরে যাই, এখানে আল্লাহর সত্তাগত/রূপক অর্থে কোনোভাবেই উর্ধ্বে হওয়ার কোনো বক্তব্য নেই যেমনটা উভয় ধারা মনে করে থাকে; বরং এখানে স্রেফ 'পরিবেষ্টন' সম্পর্কিত বক্তব্য। বাক্যের প্রথম অংশে বলা হয়েছে, তিনি সবকিছু পরিবেষ্টনকারী। কুরআনে পরিবেষ্টন (الإحاطة) সংক্রান্ত যত আয়াত এসেছে, সবগুলো আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতা দ্বারা পরিবেষ্টন বোঝানো হয়েছে; সত্তাগতভাবে নয়। ফলে এখানেও জ্ঞানগত পরিবেষ্টনই বোঝানো হয়েছে। কারণ, সত্তাগতভাবে আল্লাহ সবকিছু বেষ্টন করে আছেন এমন আকিদা সর্বেশ্বরবাদী বিশ্বাস, যা প্রথম দলেরও বক্তব্য। আর বাক্যের দ্বিতীয় অংশ (فما فوقه) এর 'আতফ' পরিবেষ্টনের উপর; আল্লাহর উপর নয়। কিছু কিছু পাণ্ডুলিপিতে এটা (بما فوقه) ও (وما فوقه) রয়েছে এবং সবগুলোর অর্থই এক। ফলে পিছনের বাক্য-সহ এর অর্থ দাঁড়াবে: আল্লাহ আরশ ও আরশের নিচে বিদ্যমান সকল সৃষ্টি থেকে যেমন অমুখাপেক্ষী, তেমনই তিনি আরশ, আরশের নিচে বিদ্যমান সকল সৃষ্টি এবং আরশের উপর বিদ্যমান সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী। ফলে এখানে প্রসঙ্গ হলো 'পরিবেশষ্টন'; 'অবস্থান' নয়। বিশেষত (بما فوقه), (فما فوقه) ও (وما فوقه) পড়লে তো সত্তাগত অবস্থানের বক্তব্য দেওয়ার সুযোগই নেই। স্রেফ (وفوقه) পড়লে আল্লাহর অবস্থানগত বক্তব্যের সুযোগ থাকে। কিন্তু সেটাও সত্তাগত হয় না। কারণ, স্বয়ং প্রথম দলও বাক্যের প্রথম অংশ (পরিবেষ্টন)-কে সত্তাগত নয়, বরং রূপক ধরেন। ফলে প্রথম অংশ রূপক ধরে পরের অংশ শাব্দিক ধরার কোনো সুযোগ নেই। ইবনে আবিল ইজ আরেকটি রূপ বর্ণনা করেছেন (محيط بكل شيء فوقه)। এখানে সত্তাগতভাবে অর্থ তোলার কোনো সুযোগই নেই। কারণ, তখন এর অর্থ আরশের উপরে যা-কিছু বিদ্যমান সেগুলোকেও পরিবেষ্টন করা, সত্তাগত উর্ধ্বে নয়। ফলে দুটো পরিবেষ্টনের একই (রূপক) অর্থ দাঁড়াবে।

উপরের আলোচনায় স্পষ্ট যে, ইমাম তহাবিকে এখানে আকিদার প্রচলিত কোনো ধারার মাঝে ঢোকানো যাবে না। কারণ, ইমাম তহাবি খালাফের আকিদার

---

১. গজনবি (১০৬); সাঈদ ফুদাহ (৮৮৮); আল-আকিদা আত ত্বহাবিয়্যাহ, মুফতি শরিফুল ইসলাম (৩১)।

প্রবর্তক নন। বরং এখানে ইমাম তহাবির মানহাজ থেকে আমাদের শিক্ষণীয় হলো, তিনি চাইলে তার বইয়ে এগুলো নিয়ে লম্বা কথা বলতে পারতেন, কিন্তু করেননি। যেখানে তাকদির নিয়ে, রাসুলুল্লাহ নিয়ে, জিহাদ ও ওয়ালা-বারা নিয়ে তিনি তুলনামূলক লম্বা কথা বলেছেন, সেখানে **পুরা বইয়ে তিনি ইস্তিওয়া/নুজুল শব্দগুলো উল্লেখই করেননি**। এর দ্বারা বোঝা যায়, এটা জানা মুসলিম উম্মাহর জন্য যতটা উপকার, তারচেয়ে বরং ক্ষতির পরিমাণ বেশি। কারণ, যেখানে এই আকিদা আল্লাহর প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসার পাথেয় হওয়ার কথা ছিল, সেটাকে আজ বানানো হয়েছে বিভক্তি ও কাটাকাটির হাতিয়ার।

সিফাতের আলোচনা সর্বসাধারণের জন্য নিষিদ্ধ: ইস্তিওয়ার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহ এতটাই বিভক্ত যে আল্লাহ তায়ালা না চাইলে কখনোই তাদের এ ব্যাপারে একমত করা সম্ভব নয়। স্রেফ মতানৈক্য থাকলেও সমস্যা ছিল না। কারণ এমন মতানৈক্য তো চার মাজহাবের ভিতরেও রয়েছে। কিন্তু এখানে পরস্পরকে গালি-গালাজ, হিংসা-বিদ্বেষ, সমালোচনা, হানাহানি-মারামারি, সম্পর্ক ছিন্ন-সহ সব ধরনের ফ্যাসাদের উৎস এই মাসআলা। যেহেতু এটার সমাধান করা কখনোই সম্ভব নয়, কারণ শতাব্দের পর শতাব্দ মুসলিম উম্মাহ এটা নিয়ে ঝগড়া করেও কোনো সমাধানে পৌঁছাতে পারেনি, এ জন্য আমাদের উচিত হবে বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের সুর খুঁজে বের করা।

প্রথম কথা হলো, অন্যান্য সিফাতের মতো এখানেও কিছু সম্প্রদায় বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে। তারা বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির শিকার হয়েছে। একদল আল্লাহকে আরশের উপর সেভাবে বসিয়ে দিয়েছে, যেভাবে রাজা-বাদশাহ তাদের সিংহাসনে বসে। এরা হলো দেহবাদী ও সাদৃশ্যবাদী। আরেক দল আল্লাহ তায়ালার এ সকল সিফাতকে এমনভাবে অপব্যাখ্যা করেছে যে, এর কোনো অস্তিত্বই থাকেনি। এরা হলো জাহমিয়্যাহ, মুতাজিলা ইত্যাদি। ফলে এই দুই সম্প্রদায় আমাদের আলোচনার বাইরে।

আগেও আমরা বলেছি, আল্লাহর অন্যান্য সিফাতের মতো এখানেও আমরা সালাফের মানহাজের সঙ্গে থাকব। আর তা হলো, কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকা। তাই কুরআন ও সুন্নাহে যতটুকু বলা হয়েছে ততটুকুই বলব;

নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো কথা যোগ করব না। **আল্লাহ বলেছেন, তিনি আরশের উপর ইস্তিওয়া করেছেন, আমরা বলব না: 'না, তিনি ইস্তিওয়া করেননি।' আবার এগুলোর স্বরূপ নির্ধারণ কিংবা এমন অর্থ করব না যা মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে।**

ফলে মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দগুলো যেমন ওঠা, আরোহণ করা, বসা, সমাসীন হওয়া, স্থিত হওয়া, অবস্থান গ্রহণ করা ইত্যাদি আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহার করব না। কারণ, আল্লাহ নিজের জন্য এগুলো ব্যবহার করেননি। আবার এটার তাবিলও করব না। কারণ, তাবিলের মাধ্যমে যে অর্থটা আমরা নির্ধারণ করছি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা সালাফ তা করেননি। একইভাবে যেসব হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, 'আল্লাহ আরশের উপরে', আমরা সেগুলো অস্বীকার করব না। কিন্তু সৃষ্টিজীবের জন্য প্রযোজ্য ক্ষুদ্র দিক বা স্থানের মাঝেও আল্লাহকে আমরা সীমাবদ্ধ করব না। বিশেষ কোনো দিকে বা স্থানে তাকে কল্পনা করব না। আমরা বলব, 'আল্লাহ আরশের উপরে ইস্তিওয়া করেছেন যেমন তিনি ও তাঁর রাসুল বলেছেন, যেভাবে তাঁর জন্য শোভনীয়। এর স্বরূপ ও ব্যাখ্যা তিনিই ভালো জানেন। তিনি সকল স্থান ও কালের উর্ধ্বে। সৃষ্টি তাকে ধারণ করতে পারে না, উপলব্ধি করতে পারে না। এর বাইরে 'সত্তা-সহ', 'স্বয়ং নিজে', 'হাকিকিভাবে', 'আরশ থেকে ফাঁকা হয়ে বা মিলে', 'আরশ বরাবর', 'আমাদের মাথার উপরের দিকে', 'আরশের সীমা শেষ হওয়ার পরে' ইত্যাদি শর্ত যোগ করব না। কারণ, কুরআন-সুন্নাহ কিংবা সালাফ এটা করেননি। এগুলো দেহবাদের দিকে নিয়ে যায়। আবার রাজত্ব, কর্তৃত্ব, পরিচালনা ইত্যাদিও বলব না। কারণ, আল্লাহ নিজের জন্য এসব শব্দ ব্যবহার করেননি, সালাফ করেননি। তাই আকিদার ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর বাইরে অনুমানমূলক কিছু বলব না। কিছু মনে মনেও ভাবব না। সংক্ষেপে ইজমালিভাবে ঈমান আনব। প্রকৃত রূপরেখা আল্লাহর হাতে সঁপে দেবো। **এগুলো নিয়ে আলোচনা করা ইসলামের জরুরি বিষয় মনে করব না; বরং যথাসম্ভব এগুলো নিয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকব। আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত কেউ যদি আমার এই বিশ্বাস না রাখে, তাকে দাওয়াত দেবো, যথাসম্ভব মাজুর মনে করব।**[১]

এই আকিদা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জরুরি হলে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাহে স্পষ্টভাবে বলে যেতেন যে, **আল্লাহ আরশের উপর বসেছেন; উপর বলতে যা বোঝায়, বসা বলতে যা বোঝায়, তা-ই; তবে সৃষ্টির বসার মতো নয়।** এটুকু বললে মুসলিম উম্মাহর মাঝে কোনো বিবাদ হতো না। সালাফও এই কথাটা বলতে পারতেন। কিন্তু আমরা দেখি, তাদের কেউ এই কথা বলছেন

---

১. হজরত থানভি বলেন, এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি পরিত্যাজ্য। সালাফের মাজহাব তানজিহের সঙ্গে হাকিকতকে সাব্যস্ত করা। আর খালাফ প্রয়োজনে সেটা তাবিল করেছেন। আহলে সুন্নাতের তাবিল আর আহলে বিদআতের তাবিল এক নয়, সেটা মনে রাখা জরুরি (ইমদাদুল ফাতাওয়া ৬/৩৫)।

না। তারা শুধু বলছেন, '**যেভাবে এসেছে সেভাবে রেখে দাও।**' অথবা তাদের কেউ বলছেন, '**আরশের উপর আল্লাহর ইস্তিওয়া সত্য।**' কিন্তু তিনি ইস্তিওয়া দিয়ে কী বোঝাচ্ছেন এবং উপর বলতে কোন উপর বোঝাচ্ছেন, সেগুলো স্পষ্ট করেননি। ফলে জটিলতা রয়েই গেছে। এর দ্বারা বোঝা যায়, সালাফ মনে করতেন, এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহে যা এসেছে, সেটার উপর ইজমালি ঈমান এনে বাকিটা আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু পরবর্তী আলিমগণ এখানে স্থির থাকেনি। তাদের একদল ইস্তিওয়ার অর্থ নির্ধারণে এতটাই অতিরঞ্জন করেছে যে, আল্লাহকে রাজা-বাদশাহর মতো আরশের উপরে একটা চেয়ার দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। আরেক দল ইস্তিওয়ার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এতটাই অতিরঞ্জন করেছে, যা আয়াতের রুহ নাকচের পর্যায়ে চলে গিয়েছে।

তা ছাড়া প্রশ্ন হলো, যে বিষয়টি নিয়ে উম্মাহ যুগের পর যুগ বিভক্ত হচ্ছে, বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, পরস্পর ভয়ংকর দুশমনে পরিণত হচ্ছে, যেটাকে কেন্দ্র করে মুসলমানরা একে অপরের নোংরা সমালোচনা করছে, গালি দিচ্ছে, কথা বন্ধ করছে, সম্পর্ক ছিন্ন করছে, ইসলামে সেটার গুরুত্ব কতখানি? ইস্তিওয়া, নুজুল এবং এ-জাতীয় সিফাতের অর্থ ও উদ্দেশ্য জানা কি দ্বীনের মৌলিক কোনো বিষয়?

ইবনে খুজাইমাকে (৩১১ হি.) আসমা ও সিফাতের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, '**এটা একটা বিদআত, যা তারা আবিষ্কার করেছে। নতুবা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন, মুসলমানদের ইমাম, ফিকহি মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতাগণ, যেমন: মালেক ইবনে আনাস, সুফিয়ান সাওরি, আওজায়ি, আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, শাফেয়ি, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক হানজালি (ইবনে রাহাওয়াইহ), ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া—তারা কেউ এ ব্যাপারে কথা বলতেন না। এগুলোর মাঝে প্রবেশ করতে নিষেধ করতেন। তাদের কিতাবে দৃষ্টি বোলাতে বারণ করতেন। আল্লাহ আমাদের সব ধরনের ফিতনা থেকে রক্ষা করুন।**'[১]

খতিবে বাগদাদি (৪৬৩ হি.) লিখেছেন, 'মুহাদ্দিসের জন্য উচিত হচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে এমন হাদিস বর্ণনা না করা, যা তাদের আকল গ্রহণ করতে অক্ষম। **যেমন: সিফাতের হাদিসগুলো। এগুলো বাহ্যিকভাবে আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য, দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদির দিকে ইঙ্গিত করে। অথচ আল্লাহ তায়ালা তা থেকে পবিত্র। সাধারণ**

১. ইতিকাদ, নিশাপুরি (১৭৬-১৭৭)।

মানুষের কাছে এগুলো বর্ণনা করা হলে তারা আল্লাহকে সৃষ্টির সঙ্গে মিলিয়ে ফেলবে। তাই এগুলো কেবল উপযুক্ত ব্যক্তিদের কাছেই বর্ণনা করা উচিত।'[১]

ইবনে কুদামা (৬২০ হি.) বলেন, لا حاجة لنا إلى علم معنى مَا أَرَادَ الله تَعَالَى من صِفَاته... অর্থাৎ আমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার সিফাতের উদ্দিষ্ট অর্থ জানা দরকার নেই। কেননা এগুলোর সঙ্গে কোনো আমল জড়িত নয়। কেবল ঈমান আনা ছাড়া এগুলোর ক্ষেত্রে আর কোনো কাজ নেই। আর ঈমান আনার জন্য এগুলোর অর্থ জানা জরুরি নয়। কারণ, আল্লাহ তায়ালা আমাদের ফেরেশতা, কিতাব এবং রাসুল এবং তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোর উপরও ঈমান আনতে বলেছেন, অথচ ওসবের আমরা নাম ছাড়া কিছুই জানি না।'[২]

ইবনে কুদামা এসব ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় সম্পর্কে বলেন, 'সুতরাং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এসব শব্দ, আয়াত ও হাদিসের উপর আল্লাহ যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন, সেই ভিত্তিতে ঈমান আনা। যেসব অর্থ আমাদের জানা নেই, সেসব ব্যাপারে নীরব থাকা; আল্লাহ তায়ালা যেগুলো আমাদের জানাননি কিংবা জানার জন্য নির্দেশ দেননি, সেগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করা। এ পথে যারা চলবে, তাদের কোনো ভয় নেই, তাদের উপর কোনো ভর্ৎসনা নেই। যারা তাদের ভর্ৎসনা করবে, তারা ভুলের উপর আছে।'[3]

ইমাম রাজি (৬০৬ হি.) লিখেন, ইস্তিওয়ার জ্ঞান আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়াই উত্তম। কারণ, যে জিনিসের জ্ঞান ওয়াজিব নয়, সে সম্পর্কে যদি কেউ বলে 'আমি জানি না', তা হলে সে নিন্দার পাত্র হবে না। ইসলামের অন্যতম মূলনীতি হলো তিনটি—তাওহিদ তথা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস রাখা, পরকালে বিশ্বাস রাখা ও রাসুলদের স্বীকৃতি দেওয়া। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, পরকালে বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব, কিন্তু বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানা ওয়াজিব নয়। যেমন এটা কবে হবে সে জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া কারও নেই। তাওহিদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব, তাঁর একত্ববাদ এবং তাঁর সুন্দর সুন্দর গুণের প্রতি সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্বাস রাখা এবং সকল বিচ্যুতি ও ত্রুটি থেকে তাকে মুক্ত ঘোষণা করাই যথেষ্ট। তাঁর সকল গুণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরি নয়। ইস্তিওয়াও আল্লাহর তেমন একটি সিফাত, যা সম্পর্কে জানা ওয়াজিব নয়। সুতরাং কেউ যদি এটা না জানে, তবে কোনো ক্ষতি নেই। বিপরীতে কেউ যদি

---

১. আল-জামি লি-আখলাকির রাবি ওয়া আদাবিস সামি (২/১০৭)।
২. তাহরিমুন নাজার ফি ইলমিল কালাম, ইবনে কুদামা (৫২)।
৩. প্রাগুক্ত (৫৪)।

নিজেকে এটার ভিতরে ঢুকিয়ে ভুল কিছু বলে কিংবা উলটো বিশ্বাস রাখে, তবে সেটা ক্ষতিকর।[১]

হাকিমুল উম্মত থানভি লিখেন, এগুলো এমন তালা, যেসবের চাবি মানুষকে দেওয়া হয়নি। ফলে এগুলোর আলোচনা থেকে বিরত থাকা উচিত।[২]

এর পরেও কেউ কেউ ঘাড় বাঁকিয়ে নিজের পথে থাকবে। ইস্তিওয়ার মাসআলাকে কালিমার মতো দ্বীনের মূল বিষয় মনে করবে। মানুষের জন্য এগুলো জানা এবং সাধারণ মানুষকে এগুলোর প্রতি দাওয়াত দেওয়া আবশ্যক ভাববে। এক্ষেত্রে তারা আবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক এক দাসীকে আল্লাহ কোথায়-সম্পর্কিত হাদিস দিয়ে দলিলও দেবে।[৩] অথচ কখনও ভাববে না, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জীবনে একবারই একটা দাসীকে এমন প্রশ্ন করেছেন। তাও নিয়মিত দাওয়াতের অংশ হিসেবে নয়; বরং স্রেফ দাসী মুমিন কি না সেটা পরীক্ষার জন্য। রাসুলের তো মিশন ছিল 'যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই আর আমি আল্লাহর রাসুল।'[৪] বরং খোদ দাসীর হাদিসটিও বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে, যেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 'আল্লাহ কোথায়' এমন প্রশ্ন না করে 'তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহ এক?', কিংবা 'তোমার রব কে?' এমন শব্দে প্রশ্ন করেছেন।[৫] ফলে এই হাদিসের উপর ভিত্তি করে 'ইস্তিওয়া'-সংক্রান্ত নিগূঢ় আলোচনাকে দ্বীনের মূল বিষয় বানিয়ে নেওয়ার সুযোগ নেই।

কিন্তু আজকের এই আলিম শ্রেণির কাছে রাসুলের জীবনের সব মিশন গুরুত্বহীন। কাফেররা মুসলমানদের শেষ করে দিক, সেকুলাররা পুরো প্রজন্মকে মুরতাদ বানিয়ে দিক, নাস্তিকরা তাদের গালি-গালাজ অব্যাহত রাখুক, মিশনারিরা মুসলমানদের খ্রিষ্টান বানিয়ে ফেলুক, শিয়া-কাদিয়ানিরা সাধারণ মানুষকে বেঈমান করে দিক, জালিমরা অসহায় মুসলিম উম্মাহর পিঠের ছাল তুলে নিক, কিছুতে কিছু আসে যায় না, আল্লাহকে আরশে বসাতে হবে। তাঁর জন্য হাত-পা প্রমাণ করাই লাগবে। এটাই যেন তাওহিদের মূল কথা; সকল নবির মূল মিশন; ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্যের

---

১. আত-তাফসিরুল কাবির, রাজি (২৫/১৩৭)।
২. ইমদাদুল ফাতাওয়া (৬/৫৭-৫৮)।
৩. মুসলিম (৫৩৭); আবু দাউদ (৯৩০, ৩২৮২)।
৪. বুখারি (২৫, ৩৯২); মুসলিম (২১)।
৫. মুসনাদে আহমদ (১৫৯৮৪); মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক (১৬৮১৪); নাসায়ি (৩৬৫৫); ইবনে হিব্বান (১৮৯)।

চাবিকাঠি; দ্বীন-দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জিহাদ। অথচ বাস্তবতা পুরাই বিপরীত। দ্বীনি বাসিরাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। তাই তাঁর কাছেই এর জন্য মুনাজাত।

আমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে, মুসলিম ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে লেখা আকিদার কিতাবগুলো নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। বরং অধিকাংশ কিতাবই বিপরীত পক্ষকে খণ্ডনের জন্য লেখা হয়েছে। সেটা তখন সম্ভব ছিল। কারণ, গোটা মুসলিম উম্মাহ ছিল খেলাফত নামক বিস্তৃত ও শক্তিশালী অভিভাবকত্বের ছায়ায়। নিদেনপক্ষে মুসলিমরা ক্ষমতাশালী ছিল। স্বাধীনভাবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর ইবাদত করতে পারত। ফলে এসব বিষয় নিয়ে পারস্পরিক মতপার্থক্য মুসলিম উম্মাহর সাংঘাতিক কোনো ক্ষতির কারণ ছিল না। কিন্তু আজ যেখানে খেলাফত সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত, মুসলিম উম্মাহ নিপীড়িত, দুর্বল; রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, জাতি, ভাষা, ভৌগোলিক সীমারেখা-সহ বিভিন্নভাবে বিচ্ছিন্ন, খণ্ড-বিখণ্ড; সে সময় আগের যুগের আকিদার মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলো সামনে আনা চরম আত্মঘাতী কাজ। এগুলো মুসলিম উম্মাহকে আরও শেষ করে দেবে। তাদের বিনাশ ত্বরান্বিত করবে। আমরা বলছি না যে, শিরককে শিরক বলা যাবে না, মুসলিম উম্মাহর দুর্বলতার কারণে নিকৃষ্ট বিদআতকে সুন্নাহ বলে প্রচার করতে হবে; বরং আমরা বলছি, যেগুলো দ্বীন ও ঈমানের মৌলিক বিষয় নয়, দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষ যেগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে না, মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে যেগুলো জানা ও চর্চা করা অপরিহার্য নয়, সেসব বিষয়ের মাঝে দিন-রাত ডুবে থাকা, হাজার বছরের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ঘেঁটে সেগুলো বের করে মুসলমানদের সামনে পরিবেশন করা এবং সেগুলোর ভিত্তিতে উম্মাহর দুর্বল দেহটাকে আরও কুচিকুচি করে কাটা কখনোই বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। শিরক, কুফর, নাস্তিক্যবাদ-সহ ইসলামের বিরুদ্ধে সকল শত্রুদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধঘন মুহূর্তে মুসলিম উম্মাহর উচিত হবে কেবল ফরজ বিষয়গুলো সামনে আনা; কুফর ও ঈমানের বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দেওয়া; গৌণ ও শাখাগত বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া। এটা সেই কাজ যা ইমাম তহাবি মুসলমানদের গৌরবের যুগে করেছেন, যার বরকতে আজও তাঁর গ্রন্থটি আহলে সুন্নাতের অনুসারী সকল ধারার মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য। তা হলে বর্তমান সময়ে এমন হিকমত ও বুদ্ধিদীপ্ত মানহাজের উপর থাকা কতটা জরুরি সহজেই অনুমেয়।

وَنَقُولُ: إِنَّ اللهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَكَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيمًا إِيمَانًا وَتَصْدِيقًا وَتَسْلِيمًا.

আমরা পূর্ণ বিশ্বাস, সত্যায়ন ও সমর্পণপূর্বক ঘোষণা করছি, আল্লাহ তায়ালা ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে খলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন।

ব্যাখ্যা
ইবরাহিম ও মুসা আলাইহিস সালামের মর্যাদা

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বসম্মত আকিদা হচ্ছে, রাসুলগণ গোটা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। সাধারণ মানুষ যত বড় ওলি ও বুজুর্গ হোক না কেন, সবচেয়ে কনিষ্ঠ নবির মর্যাদায়ও পৌঁছতে পারবে না। আর নবি ও রাসুলদের মাঝে রাসুলগণ শ্রেষ্ঠ। কারণ, নবিগণ শ্রেফ নবুওতের অধিকারী; আর রাসুলগণ নবুওত ও রিসালাত দুটোর অধিকারী। রাসুলগণ আবার সবাই সমস্তরের নন। আল্লাহ তায়ালা তাদের কতকের উপর কতককে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ.

অর্থ: 'এই রাসুলগণ আমি তাদের অনেককে অনেকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।' [বাকারা: ২৫৩] অন্যত্র বলেছেন,

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ.

অর্থ: 'আমি কতক নবিকে কতক নবির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।' [ইসরা: ৫৫]

রাসুলদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন পাঁচজন। তাঁরা নুহ, ইবরাহিম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহিম ওয়া সাল্লাম)। তাদের বলা হয় 'উলুল আজমি মিনার রুসুল' তথা দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রাসুল। সকল নবি-রাসুলই দ্বীনের পথে কষ্ট ও

মুজাহাদা ব্যয় করেছেন। তবে এই পাঁচজনের কষ্ট ও মুজাহাদার পরিমাণ অন্যদের তুলনায় বেশি, তাই তারা আল্লাহর অধিক প্রিয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ

অর্থ: 'যখন আমি নবিদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম, আপনার কাছ থেকে এবং নুহ, ইবরাহিম, মুসা ও মরিয়ম তনয় ঈসার কাছ থেকে।' [আহজাব: ৭] অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ.

অর্থ: 'তিনি তোমাদের জন্য সেই দ্বীন নির্ধারণ করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নুহকে; আর যা আমি ওহি করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহিম, মুসা ও ঈসার প্রতি এ মর্মে যে, তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করো এবং তাতে মতভেদ করো না।' [শুরা: ১৩]

এসব আয়াতের ভিত্তিতে এই পাঁচজন রাসুলের বিশেষ মর্যাদা ফুটে ওঠে। তবে এ ধরনের রাসুল কেবল পাঁচজন কি না এটা নিয়ে মতভেদ থাকলেও উপরের মতটিই শক্তিশালী। আবু হুরাইরার একটি বক্তব্য থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, 'আদম সন্তানদের সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন পাঁচজন: নুহ, ইবরাহিম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ (আলাইহিমুস সালাম)। আর তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।'[১]

উক্ত পাঁচজনের মাঝে সর্বসম্মতিক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; আমাদের রাসুল বলে নন, কুরআন-সুন্নাহর সাক্ষ্য অনুযায়ী। উপরের আয়াত সেটার প্রমাণ। সুরা শুরাতে আল্লাহ তায়ালা নবিদের কালানুক্রমিক বর্ণনা দিয়েছেন, অর্থাৎ কার পরে কার শরিয়ত এসেছে সে ভিত্তিতে। এ কারণে নুহ আলাইহিস সালামকে সবার আগে আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবার পরে এনেছেন

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ.

---

১. মুসনাদে বাজ্জার (৯৭৩৭)।

বিপরীতে সুরা আহজাবে শরিয়তের ইতিহাস বর্ণনা করা হয়নি; ফলে বাকি চারজন আগের জায়গাতে থাকলেও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবার আগে উল্লেখ করা হয়েছে

وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ.

এটা দ্বারা অন্যদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

বিভিন্ন হাদিসের মাধ্যমেও বিষয়টি প্রমাণিত। একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেন, 'আমি কিয়ামতের দিন সকল আদম সন্তানের নেতা। সর্বপ্রথম আমার কবরই বিদীর্ণ হবে। আমি সর্বপ্রথম সুপারিশকারী, সর্বপ্রথম আমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।'[১] শাফায়াত-সংক্রান্ত লম্বা হাদিসেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি কিয়ামতের দিন সকল মানুষের নেতা হব।'[২] আরেকটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা ইসমাইল আলাইহিস সালামের সন্তানদের থেকে কিনানাকে বাছাই করেছেন। কিনানা থেকে কুরাইশকে নির্বাচিত করেছেন। আর কুরাইশ থেকে বনু হাশিমকে বেছে নিয়েছেন। আর বনু হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন।'[৩] ইবনে কাসির বলেন, এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর মাঝে দ্বিমত নেই যে, (পাঁচজন রাসুলের) সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এরপর ইবরাহিম, অতঃপর মুসা, এরপর ঈসা।[৪] বিষয়টি পিছনেও আলোচনা করা হয়েছে। এখানে পুনরাবৃত্তির কারণ হচ্ছে, কুরআন অনুসরণের দাবিদার কিছু বিভ্রান্ত লোক রাসুলের সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়াকে অস্বীকার করে; বরং কেউ কেউ ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে। এটা সুস্পষ্ট গোমরাহি।

রাসুলুল্লাহর পরে, আলিমদের মতে, চারজনের মাঝে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। হাদিস দ্বারাও বিষয়টি প্রমাণিত হয়। আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ডাক দেয়, হে সৃষ্টির সর্বোত্তম। তখন রাসুলুল্লাহ বলেন, 'তিনি ইবরাহিম' আলাইহিস সালাম।[৫] সাফারিনি লিখেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে ইবরাহিম

---

১. মুসলিম (২২৭৮); তিরমিজি (৩১৪৮)।
২. বুখারি (৪৭১২); মুসলিম (১৯৪)।
৩. মুসলিম (২২৭৬); তিরমিজি (৩৬০৬)।
৪. তাফসিরে ইবনে কাসির (৫/৮১)।
৫. মুসলিম (২৩৬৯); আবু দাউদ (৪৬৭২)।

আলাইহিস সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম। এটা মুসলমানদের সর্বসম্মত মতামত। সুতরাং ইবরাহিম আলাইহিস সালাম মুসা আলাইহিস সালামের চেয়ে উত্তম। তবে শেষ তিনজনের মাঝে কে উত্তম সেটা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে হাজার আসকালানি প্রথমে মুসা আলাইহিস সালাম, এরপর ঈসা আলাইহিস সালাম, সর্বশেষ নুহ আলাইহিস সালামকে রাখেন। কোনো কোনো আলিমের মতে, মুসাকে নুহ ও ঈসার আগে আনার কারণ হচ্ছে, তিনি আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।[১] তা ছাড়া মিরাজের রাতেও তাঁকে নবিজি ষষ্ঠ আকাশে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পরে (সপ্তম আকাশে) দেখতে পান।[২] সম্ভবত ইমাম তহাবিও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে ইবরাহিম ও মুসা আলাইহিস সালামকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এ জন্য বাকি দুইজনের আলোচনা না আনলেও ইবরাহিম ও মুসার আলোচনা এনেছেন। তা ছাড়া তাঁর যুগের মুতাজিলারা যারা মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে আল্লাহর কথা বলাকে অস্বীকার করত, তাদেরও খণ্ডন করেছেন।

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর খলিল: খলিল মানে পরম প্রিয় বন্ধু। এটা ভালোবাসার সর্বোচ্চ চূড়া। আল্লাহ তায়ালা সকল মুমিন, মুসলমানকে ভালোবাসেন, তাওবাকারীদের, পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন। কুরআনে এমন অনেককেই ভালোবাসার কথা বলেছেন। কিন্তু 'খুল্লাহ' তথা সর্বোচ্চ ভালোবাসা লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন মাত্র দুজন মানুষ। একজন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং অন্যজন আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا

অর্থ: 'আর আল্লাহ ইবরাহিমকে খলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। [নিসা: ১২৫] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা যেভাবে ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে খলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, আমাকেও খলিল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।'[৩] কিয়ামতের শাফায়াত-সংক্রান্ত হাদিসগুলোতেও ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে আল্লাহর খলিল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৪]

---

১. লাওয়ামিউল আনওয়ার, সাফারিনি (২/৩০০)।
২. বুখারি (৩২০৭)।
৩. মুসলিম (৫৩২); ইবনে হিব্বান (৬৪২৫); আল-মুজামুল কাবির (১৬৮৬)।
৪. বুখারি (৪৪৭৬, ৭৪১০)।

এভাবে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। কেবল মুসলিমরা নয়, ইহুদি-খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্মের লোকজনও ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে সর্বোচ্চ সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। তিনি মুসা, ঈসা (মায়ের দিক থেকে) ও আমাদের নবির পূর্বপুরুষ। তারা সকলে তাঁর বংশধর। এ জন্য ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে 'আবুল আম্বিয়া' তথা নবিদের পিতা বলা হয়। তিনি একাই এক উম্মাহ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [নাহল: ১২০]। তিনি তাওহিদবাদীদের ইমাম قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا [বাকারা: ১২৪], ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا [নাহল: ১২৩], فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا [আলে ইমরান: ৯৫]। তিনি মুসলিম জাতির একমাত্র পিতা; ফলে অন্য কেউ মুসলিম জাতির পিতা হবে না: مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ هُوَ سَمَّىٰكُمُ الْمُسْلِمِينَ [হজ: ৭৮]। এভাবে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এমন এক পুরুষ, যার পরে জগতের শীর্ষস্থানীয় নবি-রাসুলদের সকলেই তাঁর সন্তান। ফলে সেই যুগ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আল্লাহকে চিনবে, ইসলাম গ্রহণ করবে, তাদের সকলের পুণ্য ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তাঁর নবি-রাসুল সন্তানদের আমলনামায় যোগ হবে। ইবরাহিমের পরিবার জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবার। আর এ কারণে আমরা প্রত্যেক নামাজে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তাঁর পরিবারের উপর সালাম পেশ করি।

তবে ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে নিয়ে যেসব বাড়াবাড়ি বিদ্যমান, যেমন: তাকে কেন্দ্র করে ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্ম মিলিয়ে ইবরাহিমি ধর্ম তৈরি করার পরিকল্পনা (Milah Abraham + Abraham Accord), ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা কিংবা তাঁকে হিন্দুদের দেবতা (ব্রহ্মা=ব্রাহামা=ইবরাহিম) মনে করা ইত্যাদি ভিত্তিহীন ও বর্জনীয় কাজকারবার।

মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথনকারী: পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালাকে দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলা সম্ভব। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ۚ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ.

অর্থাৎ 'কোনো মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন। কিন্তু ওহির মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোনো দূত প্রেরণ করবেন অতঃপর আল্লাহ যা চান, সে তা তাঁর অনুমতিক্রমে পৌঁছে দেবে। নিশ্চয় তিনি সবার উর্ধ্বে, প্রজ্ঞাময়।' [শুরা: ৫১] আর মুসা আলাইহিস সালাম সেই সৌভাগ্যবানদের একজন, যারা আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছেন। এ কারণে তাকে 'কালিমুল্লাহ' তথা আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথনকারী বলা হয়।

তবে একমাত্র মুসা আলাইহিস সালাম কালিমুল্লাহ নন। পৃথিবীতে তিনজন মানুষ ছিলেন। যারা আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছেন: প্রথমে আদম আলাইহিস সালাম, দ্বিতীয় মুসা আলাইহিস সালাম, তৃতীয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আবু জর রাজি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মসজিদে ঢুকে রাসুলুল্লাহকে দেখতে পেলাম। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসুল, সর্বপ্রথম নবি কে? তিনি বললেন, আদম। আমি বললাম, তিনি কি নবি ছিলেন? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথনকারী নবি' (نَبِيٌّ مُكَلَّمٌ)।[১] রাসুলুল্লাহও মিরাজের রাতে আল্লাহর সঙ্গে কোনো মাধ্যম ছাড়া কথা বলেছেন। আল্লাহর কাছে নামাজ পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেকে পাঁচ ওয়াক্তে নামিয়ে আনার জন্য বারবার আবেদন করেন।[২] হাদিসটি উল্লেখ করার পরে ইবনে হাজার লিখেন, এটা এ কথার অন্যতম শক্তিশালী দলিল যে, মিরাজের রাতে আল্লাহ তায়ালা নবিজির সঙ্গে কোনো মাধ্যম ছাড়া কথা বলেছেন।[৩] আল্লাহর বাণী,

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ.

অর্থ: 'এই রাসুলগণ আমি তাদের অনেককে অনেকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের কারও কারও সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছেন।' [বাকারা: ২৫৩] ইবনে কাসির এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন, মুসা ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছেন।[৪]

---

১. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩৭০৮৩); সহিহ ইবনে হিব্বান (৬১৯০)।
২. বুখারি (৩৮৮৭); সহিহ ইবনে হিব্বান (৪৮)।
৩. ফাতহুল বারি, ইবনে হাজার (৭/২১৬)।
৪. তাফসিরে ইবনে কাসির (১/৫১১)।

তবে মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে আল্লাহর কথা বলার বিষয়টি সবার থেকে আলাদা। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সঙ্গে কথা বলার বিষয়টি কুরআনে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন, যা আদম ও আমাদের নবির ক্ষেত্রে হয়নি। আল্লাহ বলেন,

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا

অর্থ: 'আর আল্লাহ মুসার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন।' [নিসা: ১৬৪] অন্য এক আয়াতে বলেন,

وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ

অর্থ: 'আর মুসা যখন আমার প্রতিশ্রুত সময় অনুযায়ী এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর সাথে তাঁর রব কথা বললেন।' [আরাফ: ১৪৩] পরের আয়াতে আল্লাহ বলেন,

قَالَ يٰمُوْسٰۤى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَ بِكَلَامِىْ ۖ فَخُذْ مَاۤ اٰتَيْتُكَ وَ كُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ.

অর্থ: 'তিনি বললেন, হে মুসা, আমি আপনাকে সকল মানুষের মধ্য থেকে আমার পয়গাম ও কথোপকথনের জন্য মনোনীত করেছি। সুতরাং যা-কিছু আমি দান করলাম, সেগুলো গ্রহণ করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হোন।' [আরাফ: ১৪৪]

এভাবে আল্লাহ তায়ালা মুসার সঙ্গে তাঁর সরাসরি কথোপকথনকে চিরস্থায়ী করে রেখেছেন। আয়াতের মাঝে একটি সূক্ষ্ম বিষয় আছে। তা হলো, এখানে একমাত্র মুসাকেই সকল মানুষের মাঝ থেকে কথা বলার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে মর্মে বলা হয়েছে। অথচ আদম ও আমাদের নবির সঙ্গেও আল্লাহ কথা বলেছেন। এর কারণ হলো, আদম আলাইহিস সালামের সঙ্গে আল্লাহ কথা বলেছেন জান্নাতে। আর নবিজির সঙ্গে কথা বলেছেন মিরাজের রাতে পৃথিবীর বাইরে উর্ধ্বজগতে। বিপরীতে মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে কথা বলেছেন এই পৃথিবীর মাটিতেই। পৃথিবীতে থেকেই তিনি কোনো ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহর কথা শোনার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। ভূপৃষ্ঠের মাটিতে বসে স্রষ্টার কথা শোনার বিরল সৌভাগ্যবান একমাত্র মানুষ তিনিই। খুব সম্ভব এই কারণে কেবল তিনিই 'কালিমুল্লাহ' হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছেন।

জগতের সকল মুসলমান এ ব্যাপারে একমত। কিন্তু কালামের স্বরূপ নিয়ে তাদের মাঝে মতভেদ তৈরি হয়েছে। মুতাজিলারা বলে, আল্লাহ অক্ষর ও আওয়াজ

সৃষ্টি করেন যেগুলো বোধগম্য হয়। ফলে আল্লাহর 'কথা' তাদের কাছে মাখলুক বা সৃষ্ট। এখান থেকে তারা কুরআনকেও মাখলুক বলে। সুতরাং মুতাজিলারা এ কথা বলে না যে, আল্লাহ কথা বলেন না। কিন্তু তারা কথা বলার স্বরূপকে এভাবে ব্যাখ্যা করে। আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন ধারার মাঝে আল্লাহর কথার স্বরূপ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। একদল মনে করেন, আল্লাহ মুসার সঙ্গে অক্ষর ও আওয়াজ-সহ কথা বলেছেন। তাদের মতে, আল্লাহর কালাম অক্ষর ও আওয়াজ-সহ। তবে তারা এটাকে মাখলুক বলেন না। তারা বলেন, আল্লাহর মূল কালাম কাদিম। কিন্তু নির্ধারিত আওয়াজ কাদিম হওয়া জরুরি নয়। আর অন্যদল অক্ষর ও আওয়াজ-সহ কথাকে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু তারা নিজেরা আবার মতভেদ করেন। কারও মতে, আল্লাহ তাঁর সঙ্গে আত্মকথা (الكلام النفسي) বলেছেন। আবার কারও মতে, আল্লাহ এমন আওয়াজ সৃষ্টি করেছেন, যা কথা হিসেবে মানুষ শোনে। এক্ষেত্রে প্রথম দলের সমালোচনায় তারা বলেন, আল্লাহর ইলম ও জীবন রয়েছে, কিন্তু সেগুলো সৃষ্টির ইলম ও জীবনের মতো নয়। আল্লাহর শক্তি রয়েছে, কিন্তু সেটা সৃষ্টির শক্তির মতো নয়। তা হলে আল্লাহর কথাকে কেন সৃষ্টির কথার মতো (অক্ষর ও আওয়াজ-সহ) হতে হবে? তা ছাড়া তাদের যুক্তি, অক্ষর ও আওয়াজ-সহ হলে এটা সিফাত হয় না, বরং সৃষ্টি হয়; ফলে তাদের মাঝে আর মুতাজিলাদের মাঝে কোনো পার্থক্য রইল না! বিপরীতে প্রথম দল বলেন, দ্বিতীয় দল কালামের যে ব্যাখ্যা করে, তা মূলত আল্লাহর কালাম অস্বীকারের পর্যায়ে।[১]

বস্তুত এসব তাত্ত্বিক আলোচনায় সাধারণ মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ কিছু জড়িত নয়; বরং আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে কথা বলেছেন, মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর কথা শুনেছেন ও বুঝেছেন—এতটুকুর উপর ঈমান আনা এবং এর স্বরূপ কী ছিল সেটা আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়াই যথেষ্ট। এ জন্যই ইমাম তহাবি এ সম্পর্কে কোনো বিবাদের অবতারণা করেননি। কারণ, এসব বিতর্কে আল্লাহর সঙ্গে কিয়ামতের দিন ও জান্নাতে সরাসরি কথোপকথনের যে স্বাদ ও তৃপ্তির স্বপ্ন দেখে মুসলমান, সেটা হারিয়ে গিয়ে নিরস তাত্ত্বিকতায় পরিণত হয় আকিদার আলোচনা।

---

১. গুনাইমি (৯৩-৯৪); শুআইবি (৫৯); সাঈদ ফুদাহ (৫৪৭-৫৫৮)।

وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ.

আমরা ফেরেশতা, নবি এবং রাসুলদের উপর অবতীর্ণ সকল আসমানি গ্রন্থে ঈমান রাখি। আমরা সাক্ষ্য দিই যে, তারা সুস্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

ব্যাখ্যা
ফেরেশতাদের উপর ঈমান

ঈমানের ছয়টি রুকনের দ্বিতীয় রুকন হচ্ছে মালাইকাহ তথা ফেরেশতাদের উপর ঈমান। আল্লাহ বলেন,

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ.

অর্থ: 'রাসুল ঈমান এনেছেন যা তার প্রতি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। ঈমান এনেছে মুমিনগণ। তারা সকলে আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ ও রাসুলদের উপর ঈমান এনেছে।' [বাকারা: ২৮৫] অন্য আয়াতে বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا.

অর্থ: 'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর ঈমান আনো। ঈমান আনো সেই কিতাবের প্রতি, যা তিনি তাঁর রাসুলের উপর অবতীর্ণ করেছেন। আর সেই কিতাবের প্রতি, যা পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রাসুলগণ আর পরকাল অস্বীকার করে, সে সুদূর বিভ্রান্তিতে নিপতিত।' [নিসা: ১৩৬]

কুরআনের একাধিক আয়াত এবং অনেক হাদিসে ফেরেশতাদের আলোচনা এসেছে। আরবি 'মালাইকাহ' শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, বার্তাবাহক, দূত। তারা যেহেতু আল্লাহর বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেন, এ জন্য তাদের মালাইকাহ বা (মূল ফারসি ও প্রচলিত উর্দু-বাংলায়) ফেরেশতা বলা হয়। ফেরেশতারা হচ্ছেন নুরের তৈরি আল্লাহর একধরনের সৃষ্টি। আয়েশা রাজি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ফেরেশতারা নুরের তৈরি। জিন আগুনের তৈরি। আর আদম যা তোমাদের বলা হয়েছে (মাটির) তৈরি।'[১]

তারা আধ্যাত্মিক সৃষ্টি নন, বাস্তবিক অর্থে এবং শারীরিকভাবে বিদ্যমান সৃষ্টি; কিন্তু তারা স্বাভাবিকভাবে দৃশ্যমান নন। আল্লাহ তায়ালা যাদের চান, কেবল তারা তাদের দেখতে পারে। তারা আল্লাহর অনুগত ও উপাসনারত সৃষ্টি। দিন-রাত সবসময় আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকেন। কখনও ক্লান্ত বা বিরক্ত হন না। তারা আল্লাহর একান্ত অনুগত সৃষ্টি; কখনও তাঁর অবাধ্য হন না; তাঁর নির্দেশের বাইরে যান না। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ.

অর্থ: 'নিশ্চয় যারা আপনার পালনকর্তার নিকট রয়েছেন, তারা তার দাসত্বের ক্ষেত্রে অহংকার প্রদর্শন করেন না। তারা তার তাসবিহ পাঠ করেন এবং তার সিজদায় লুটিয়ে পড়েন।' [আরাফ: ২০৬] অন্য আয়াতে বলেন,

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.

অর্থ: 'আর আকাশ ও মাটিতে যারা রয়েছে, সবাই আল্লাহর জন্যই; আর তার নিকট যারা রয়েছেন, তারা তার দাসত্বের ক্ষেত্রে অহংকার প্রদর্শন করেন না। আর তারা ক্লান্ত ও বিরক্ত হন না।' [আম্বিয়া: ১৯] আবু জর রাজি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সুরা ইনসান (দাহর) পড়ে বললেন, আমি যা দেখি তোমরা তা দেখো না; আমি যা শুনি তোমরা তা শোনো না। আকাশ গর্জন করেছে আর গর্জন করাই তার জন্য শোভা পায়। আকাশের ভিতরে চার আঙুল পরিমাণ এমন কোনো ফাঁকা জায়গা নেই, যেখানে কোনো-না-কোনো মাথা আল্লাহর জন্য সিজদায় লুটিয়ে পড়ে না আছে। আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি, যদি তোমরা তা জানতে, তা হলে তোমরা কম হাসতে, বেশি কাঁদতে। বিছানায় নারীদের সঙ্গে আনন্দ

---

১. মুসলিম (২৯৯৬); ইবনে হিব্বান (৬১৫৫)।

উপভোগ করতে না; বরং পথে-প্রান্তরে বেরিয়ে আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করতে। (আবু জর বলেন), আল্লাহর শপথ! হায়! যদি আমি একটা বৃক্ষ হতাম যাকে কেটে শেষ করে ফেলা হতো।[১]

ফেরেশতারা অন্য সকল প্রাণীর মতো একদিন মৃত্যুবরণ করবেন। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ

অর্থ: 'তিনি ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল।' [কাসাস: ৮৮] তবে তাদের মৃত্যু কীভাবে হবে, পরকালে সবাই জান্নাত ও জাহান্নামে চলে যাওয়ার পরে তাদের কাজ কী হবে, সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানা যায় না। কিন্তু কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দেখলে বোঝা যায়, জান্নাত ও জাহান্নামের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ তাদের নিজ নিজ কর্মে অব্যাহত থাকবেন। এর দ্বারা বোঝা যায়, কিয়ামতের সময় সবার সঙ্গে তারাও মৃত্যুবরণ করবেন এবং পুনরুত্থিত হবেন। অতঃপর জান্নাত ও জাহান্নামে যার যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। আল্লাহ ভালো জানেন। [রাদ: ২৩-২৪, আম্বিয়া: ১০৩, জুমার: ৭১, মুলক: ৮]

তাদের ঘুম-নিদ্রা, পানাহার ও বিশ্রামের প্রয়োজন হয় না। কুরআনে এসেছে—ফেরেশতাদের একটি দল ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কাছে মানুষের আকৃতিতে এলে তিনি তাদের সামনে একটি বাছুর রান্না করে উপস্থাপন করেন। কিন্তু তারা সেটা খাননি। [জারিয়াত: ২৬-২৮, হুদ: ৭০] তারা নারী বা পুরুষ নন। ফলে তাদের বিয়ে-শাদি কিংবা প্রাকৃতিক সম্পর্কেরও প্রয়োজন হয় না। কাফেররা ফেরেশতাদের আল্লাহর মেয়ে মনে করত। আল্লাহ তাদের বিশ্বাস খণ্ডন করে বলেন,

وَ جَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَ يُسْـَٔلُوْنَ.

অর্থ: আর তারা ফেরেশতাদের নারী বানিয়ে দিয়েছে, অথচ তারা আল্লাহর বান্দা। তারা কি তবে তাদের সৃষ্টির সময় উপস্থিত ছিল? তাদের সাক্ষ্য লিখে রাখা হবে আর তারা জিজ্ঞাসিত হবে।' [জুখরুফ: ১৯] আল্লাহর ইবাদত ও নির্ধারিত দায়িত্বই তাদের জীবনের একমাত্র কাজ। তাদের সংখ্যা অগণিত। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তা জানেন

১. তিরমিজি (২৩১২); মুসতাদরাকে হাকেম (৩৯০৫)।

না।[১] রাসুলুল্লাহ মিরাজের রাতে সপ্তম আকাশে বাইতুল মামুর দেখেন। সেখানে প্রতিদিনি সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদত করেন। একবার যারা প্রবেশ করেন, দ্বিতীয়বার আর প্রবেশের সুযোগ পান না।[২] কিয়ামতের দিন যখন জাহান্নামকে নিয়ে আসা হবে, তখন জাহান্নামের সত্তর হাজার লাগাম থাকবে। প্রত্যেক লাগাম ধরে থাকবে সত্তর হাজার ফেরেশতা। তারা তাকে টেনে নিয়ে আসবে।[৩] এগুলো গায়েবি বিষয়। এর স্বরূপ আল্লাহই জানেন, তাই এভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। নিজের বুদ্ধির লাঙল চালাতে গেলে ধ্বংস অনিবার্য। বিজ্ঞান আমাদের বলে—মহাবিশ্বে এমন তারকা রয়েছে, যেগুলোর আলো আজও আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়নি। মহাবিশ্বে এত তারকা রয়েছে, যা মানুষের পক্ষে গণনা করা কিংবা উপলব্ধি করাও সম্ভব নয়। এই যদি হয় মানুষের কেবল জানা কিছু বিষয়ের অবস্থা, তা হলে ফেরেশতাদের সংখ্যা, জাহান্নামের প্রকাণ্ড আকৃতি কি অদ্ভুত কিছু? মোটেই না।

ফেরেশতাদের স্বরূপ: ফেরেশতারা আল্লাহর অনুমতিতে নিজস্ব রূপ বদলাতে এবং বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে সক্ষম। যেমন: জিবরাইল আলাইহিস সালাম মারইয়ামের কাছে আগমন করেন [মারইয়াম: ১৭]; ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কাছে ফেরেশতাদের একটি দল সুন্দর যুবকের রূপ ধরে আগমন করেন; জিবরাইল আলাইহিস সালাম নিয়মিতই রাসুলের কাছে মানুষের রূপ ধরে আগমন করতেন। তবে তাদের প্রকৃত রূপ কেমন, সেটা আল্লাহ ভালো জানেন। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিস দেখলে বোঝা যায়, ফেরেশতারা মানুষ-সহ আমাদের পরিচিত অন্যান্য সৃষ্টিজীবের তুলনায় আলাদা। তবে তারা সুদৃশ ও সুন্দর। আল্লাহ তায়ালা জিবরাইল আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. ۝ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ.

অর্থ: 'তাঁকে শিক্ষা দান করে এক শক্তিশালী ফেরেশতা, সুন্দর-সুদৃশ।' [নাজম: ৫-৬] কুরআনের আয়াত দেখলে বোঝা যায়, ফেরেশতাদের দুটি, তিনটি ও চারটি করে ডানা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

---

১. লাওয়ামিউল আনওয়ার, সাফারিনি (১/৪৪৭)।
২. বুখারি (৭৫১৭); মুসলিম (১৬২); সহিহ ইবনে হিব্বান (৪৭, ৪৮, ৫৯); মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩৭৭২৫)।
৩. মুসলিম (২৮৪২); তিরমিজি (২৫৭৩)।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ؕ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

অর্থ: 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, আর যিনি ফেরেশতাগণকে করেছেন বার্তাবাহক—তারা দুই-দুই, তিন-তিন ও চার-চার ডানাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সক্ষম। [ফাতির: ১] আয়াতের শেষাংশ দ্বারা বোঝা যায়, কারও কারও এর বেশি থাকতে পারে। যেমন: একটি হাদিসে ফেরেশতা জিবরাইলের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তাঁর ছয়শো ডানা রয়েছে। একেকটি ডানা পুরো দিগন্তকে ঢেকে দেওয়ার মতো প্রকাণ্ড।[১] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিসে আরশ বহনকারী আট জন ফেরেশতার একজনের আকৃতি বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেন, তাঁর কানের লতি থেকে কাঁধ পর্যন্ত সাত শত বছরের দূরত্ব।[২]

সুতরাং তাদের রূপ ও স্বরূপ কেমন এটা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। আল্লাহর দুর্বলতম সৃষ্টি মানুষ ফেরেশতাদের নিজস্ব আকৃতিতে দেখার সামর্থ্য রাখে না। তাই ফেরেশতা মানুষের রূপ ধারণ করে মানুষের কাছে আসেন, যেমন জিবরাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহর রাসুলের কাছে আসতেন। জীবনে মাত্র দুইবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজস্ব আকৃতিতে দেখেছেন। প্রথমবার মক্কার উপকণ্ঠে। তখন তিনি তাকে দেখে বেহুঁশ হয়ে যান।[৩] দ্বিতীয়বার মিরাজের রাতে সিদরাতুল মুনতাহার কাছে দেখেন। আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে বলেন,

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى. ذُوْمِرَّةٍ ؕ فَاسْتَوٰى. وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى. فَاَوْحٰٓى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى. اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى. وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى. اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى. لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى.

অর্থ: 'তাঁকে শিক্ষা দান করে এক শক্তিশালী ফেরেশতা। শক্তিসম্পন্ন ও সুন্দর, সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল, ঊর্ধ্ব দিগন্তে। অতঃপর নিকটবর্তী হলো ও ঝুলে

১. মুসলিম (১৭৪); মুসনাদে আহমদ (৩৮২৫); আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১/৪৬)।
২. আবু দাউদ (৪৭২৭)।
৩. বুখারি (৪৮৫৫); ইবনে হিব্বান (৬০); মুসনাদে আহমদ (৩০১৩)।

গেল। তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কম। তখন আল্লাহ তাঁর দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার, তা প্রত্যাদেশ করলেন। রাসুলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা তিনি দেখেছেন। তোমরা কি সে বিষয়ে বিতর্ক করবে যা তিনি দেখেছেন? নিশ্চয় তিনি তাকে আরেকবার দেখেছিলেন, সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে, যার কাছে অবস্থিত বসবাসের জান্নাত, যখন বৃক্ষটিকে যা আচ্ছন্ন করার তা আচ্ছন্ন করে নিয়েছিল। তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি এবং সীমালঙ্ঘনও করেননি। নিশ্চয় তিনি তার পালনকর্তার মহান নিদর্শনাবলি অবলোকন করেছেন।' [নাজম: ৫-১৮] এ ছাড়া সবসময় তিনি তাকে মানুষের আকৃতিতে দেখেছেন। অধিকাংশ সময়ই জিবরাইল আলাইহিস সালাম সাহাবি দিহইয়া কালবির রূপ ধারণ করে রাসুলের কাছে আসতেন।[১]

ফেরেশতাদের দায়িত্ব: আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন ইবাদত ও সৃষ্টির মাঝে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য। তাদের মাঝে কেউ মানুষের কাছে ওহি নিয়ে আসার দায়িত্বে নিয়োজিত, যেমন জিবরাইল আলাইহিস সালাম। আবার কেউ বৃষ্টিবর্ষণ ও ফসল ফলানোর দায়িত্বে নিয়োজিত, যেমন মিকাইল আলাইহিস সালাম। কেউ সৃষ্টিকে মৃত্যুদানের দায়িত্বে নিয়োজিত, যেমন মালাকুল মউত আলাইহিস সালাম। [সাজদা: ১১] আবার কেউ শিঙায় ফুঁক দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত, যেমন ইসরাফিল আলাইহিস সালাম। একদল জান্নাতের পাহারাদার হিসেবে নিয়োজিত। [জুমার: ৭৩] আরেক দল জাহান্নামের পাহারাদার হিসেবে নিয়োজিত 'জাবানিয়্যাহ' হিসেবে পরিচিত ফেরেশতার দল। তাদের সর্দার মালেক। [জুখরুফ: ৭৭, জুমার: ৭১, আলাক: ১৭-১৮] আরেক দল মানুষকে সার্বিক সুরক্ষাদানের দায়িত্বে নিয়োজিত (হাফাজাহ ও মুআক্কিবাত), তারা মানুষের সামনে-পিছনে থেকে রক্ষা করেন। [রাদ: ১১] অনেক সময় মানুষ হঠাৎ বড় ধরনের বিপদাপদ কিংবা এক্সিডেন্ট থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পায়। ভাবে, কাকতালীয়ভাবে রক্ষা পেয়েছে। অথচ আল্লাহ তাকে সেই ফেরেশতাদের মাধ্যমে রক্ষা করেছেন, এটা ভুলে যায়। এসব ফেরেশতাকে 'হে আল্লাহর বান্দা, আমাকে সাহায্য করুন' বলে ডাকলে তারা মানুষকে পথ দেখান, সাহায্য করেন।[২] কেউ কেউ দুনিয়াতে মানুষকে পরীক্ষার জন্য আগমন করেন, যেমন বনি ইসরাইলের তিন ব্যক্তিকে পরীক্ষা

---

১. বুখারি (৩৬৩৪); মুসলিম (১৬৭); সালেহ ফাওজান (১০২)।
২. তাবারানি, আল-মুজামুল কাবির (২৯০)।

করা;[১] বাবেল শহরে হারুত ও মারুত নামক দুই ফেরেশতা অবতীর্ণের ঘটনা।[২] আরেক দল মাতৃগর্ভে মানবসন্তানের ভ্রূণের দায়িত্বে নিয়োজিত।[১] আরেক দল মানুষের

---

১. আবু হুরাইরা রাজি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বনি ইসরাইলের মধ্যে তিন ব্যক্তি ছিল। একজন কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত, দ্বিতীয়জন টেকো এবং তৃতীয়জন অন্ধ। আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন। তিনি তাদের কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা (প্রথমে) কুষ্ঠরোগীর কাছে এসে বললেন, 'তুমি কী চাও?' সে বলল, 'সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক। আর আমার নিকট থেকে এই রোগ দূরীভূত হোক, যার জন্য মানুষ আমাকে ঘৃণা করছে।' ফেরেশতা তার দেহে হাত বুলিয়ে দিলেন, তার রোগ দূর হয়ে গেল এবং তাকে সুন্দর রং দেওয়া হলো। অতঃপর তিনি বললেন, 'তোমার নিকট প্রিয়তম সম্পদ কী?' সে বলল, 'উটনী অথবা গাভি।' ফেরেশতা তাকে দশ মাসের গর্ভবতী একটি উটনী দিলেন এবং দোয়া করলেন, 'আল্লাহ তোমাকে এতে বরকত দান করুন।' অতঃপর ফেরেশতা টাক মাথার কাছে এসে বললেন, 'তুমি কী চাও?' সে বলল, 'সুন্দর কেশ এবং এই রোগ দূরীভূত হওয়া, যার জন্য মানুষ আমাকে ঘৃণা করছে।' ফেরেশতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তার রোগ দূর হয়ে গেল এবং তাকে সুন্দর কেশ দান করা হলো। ফেরেশতা বললেন, 'তোমার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় বস্তু কোনটা?' সে বলল, 'গাভি'। সুতরাং তাকে একটি গর্ভবতী গাভি দিয়ে বললেন, 'আল্লাহ এতে তোমার জন্য বরকত দান করুন।' অতঃপর ফেরেশতা অন্ধের কাছে এলেন এবং বললেন, 'তুমি কী চাও?' সে বলল, 'আল্লাহ তায়ালা যেন আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন, যার দ্বারা আমি লোকেদের দেখতে পাই।' ফেরেশতা তার চোখে হাত বুলিয়ে দিলেন, ফলে সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। ফেরেশতা বললেন, 'তুমি কোন বস্তু সবচেয়ে বেশি পছন্দ করো?' সে বলল, 'ছাগল'। তাকে একটি গর্ভবতী ছাগল দেওয়া হলো।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের পশুতে বরকত হলো। উট, গরু ও ছাগলে সবার উপত্যকা ভরে গেল। এমন সময় একদিন আবার সেই ফেরেশতা একসময়ের কুষ্ঠরোগীর কাছে এসে বললেন, 'আমি একজন সহায়-সম্বলহীন মুসাফির। সফরে আমার সকল পাথেয় শেষ হয়ে গেছে। ফলে দেশে পৌঁছার জন্য আল্লাহ অতঃপর তোমার সাহায্য ছাড়া আজ আমার কোনো উপায় নেই। সেজন্য আমি ওই সত্তার নামে তোমার কাছে একটি উট চাচ্ছি, যিনি তোমাকে সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক দান করেছেন; যার দ্বারা আমি আমার এই সফরের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাই।' সে উত্তর দিলো, আমার কাঁধে অনেকের দেনা-পাওনা আছে। ফেরেশতা বললেন, 'আমি যেন তোমাকে চিনতে পারছি। তুমি কি কুষ্ঠরোগী ছিলে না, লোকেরা তোমাকে ঘৃণা করত? তুমি কি দরিদ্র ছিলে না, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ধন প্রদান করেছেন?' সে বলল, 'এ ধন তো আমি বাপ-দাদা থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি।' ফেরেশতা বললেন, 'যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিন।' অতঃপর তিনি পূর্বের টাক মাথার কাছে এসে একই কথা বললেন। টেকোও একই জবাব দিলো। ফেরেশতা তাকেও বললেন, 'যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, আল্লাহ তোমাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিন।' সবশেষে অন্ধের নিকট এসে বললেন, আমি একজন মিসকিন ও মুসাফির মানুষ, সফরের যাবতীয় পাথেয় শেষ হয়ে গেছে। ফলে দেশে পৌঁছার জন্য আল্লাহ অতঃপর তোমার সাহায্য ছাড়া আজ আমার আর কোনো উপায় নেই। সুতরাং আমি তোমার নিকট সেই সত্তার নামে একটি ছাগল চাচ্ছি, যিনি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন; যার দ্বারা আমি আমার এই সফরের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাই।' সে বলল, 'নিঃসন্দেহে আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন (আর এই ছাগলও তাঁরই দান)। অতএব, তুমি ছাগলের পাল থেকে যা ইচ্ছা নিতে পারো। আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে বাধা দেবো না।' এ কথা শুনে ফেরেশতা বললেন, 'তুমি তোমার সম্পদ তোমার কাছে রাখো। তোমাদের পরীক্ষা করা হলো (যাতে তুমি কৃতকার্য হলে)। ফলে আল্লাহ তায়ালা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তোমার সঙ্গীদ্বয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন।' [মুসলিম: ২৯৬৪); বুখারি (৬৬৫৩)।

২. কুরআনের মাত্র একটি আয়াতে বাবেল শহরে এই দুই ফেরেশতা অবতরণের ঘটনা রয়েছে। তারা মানুষকে পরীক্ষার নিমিত্তে জাদু শেখানোর জন্য এসেছিলেন (বাকারা: ১০২)। কুরআন ও হাদিসে এর বাইরে কোনো তথ্য নেই। ফলে এসব বিষয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু বলার সুযোগ নেই। আমাদের সমাজে হারুত-মারুতকে কেন্দ্র করে যেসব গালগল্প প্রচলিত, যেমন: এক নারীর প্রেমে পড়া, আল্লাহ কর্তৃক তাদের শাস্তি দিয়ে আকাশের সঙ্গে উলটো ঝুলিয়ে

আমলনামা লেখার দায়িত্বে নিয়োজিত (কিরামান কাতিবিন)। [ইনফিতার: ১০-১১, ক্বাফ: ১৭-১৮] আরেক দল কবরে প্রশ্নের দায়িত্বে নিযুক্ত (মুনকার-নাকির)।[২] আবার অনেক ফেরেশতা পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে থাকেন। বিভিন্ন জিকির ও দ্বীনি মজলিসে তারা অংশগ্রহণ করেন।[৩]

ফেরেশতার অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ কুফর: কুরআন-সুন্নাহে এমন স্পষ্ট বর্ণনা থাকার পরও মুসলমানদের কিছু সম্প্রদায় ফেরেশতা-কেন্দ্রিক আকিদার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। যেমনটা পূর্বে বলা হয়েছে, ফেরেশতারা কোনো আধ্যাত্মিক বা অদৃশ্য শক্তি নয়; বরং তারা আল্লাহর সৃষ্টি এবং শারীরিকভাবে বিদ্যমান, যদিও তাদের আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু আফসোসের বিষয়, কিছু সম্প্রদায় তাদের বাস্তবিক ও শারীরিকভাবে বিদ্যমান থাকা অস্বীকার করে এবং তারা মনে করে, ফেরেশতারা আকাশের তারকা। আবার কেউ কেউ আধ্যাত্মিক শক্তি বলে মনে করে, বাস্তবে যাদের অস্তিত্ব নেই। আবার নিজেদের প্রগতিশীল ও পণ্ডিত ভাবা অনেক অতিবুদ্ধিমান লোক ফেরেশতার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। তারা মনে করে, যেহেতু ফেরেশতা দেখা যায় না, সুতরাং ফেরেশতা বলতে কোনোকিছু নেই। অদৃশ্যের প্রতি মানুষের কাল্পনিক ভয় ও ভালোবাসা ইত্যাদি থেকে ফেরেশতার ধারণার সূত্রপাত। ইসলাম ফেরেশতার ধারণা আরবদের কল্পিত বিশ্বাস ও অন্যান্য ধর্মের মিথ থেকে গ্রহণ করেছে ইত্যাদি। এসব কথাবার্তাকে শরিয়তের পরিভাষায় বলা হয় 'জানদাকাহ' তথা মুনাফেকি। যদি কেউ জেনেবুঝে এসব কথা বলে, তবে সে মুরতাদ হিসেবে গণ্য হবে।

রাখা ইত্যাদি—এগুলো সব ইসরাইলি পুরাকাহিনি। সম্মানিত ফেরেশতাদ্বয়ের ব্যাপারে এমন গল্প একেবারেই মানহানিকর। ফলে এসব বাজে গল্প প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং কুরআনে যা এসেছে ততটুকু ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি পূর্ণ সম্মান-সহ বিশ্বাস করতে হবে। দুঃখজনকভাবে অনেক মুফাসসির এসব ইসরাইলি বর্ণনা (তালমুদ থেকে) বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া গ্রহণ করেছেন। এভাবে কুরআন যেই বিশ্বাস খণ্ডনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো তারা আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আজ সেটা নাস্তিক ও ইসলাম-বিদ্বেষীদের জন্য কুরআনের দিকে আঙুল তোলার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। অনেকেই বলার সুযোগ পাচ্ছে, কুরআন এটা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কাছ থেকে নিয়েছে (দেখুন: আব্রাহাম আইজ্যাক ক্যাতশ কৃত Judaism in Islam: Biblical and Talmudic Backgrounds of the Koran and its Commentaries)। তারা কেবল ইসরাইলি বর্ণনাই গ্রহণ করেননি, এগুলো ইবনে উমরের মতো বড় বড় সাহাবির সূত্রে স্বয়ং রাসূলুল্লাহর প্রতি সম্পৃক্ত করেছেন। অথচ এগুলো ভুয়া, জাল ও বানোয়াট বর্ণনা (তাফসিরে ইবনে কাসির ১/২৪৬ , শিফা- কাজি ইয়াজ ২/১৭৫)। একইভাবে সুহাইল ও জাহরা তারকার ব্যাপারে যা-কিছু বর্ণনা করা হয়, সেগুলোও বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

১. বুখারি (৩২০৮); মুসলিম (২৬৪৩)।
২. তিরমিজি (১০৭১); ইবনে হিব্বান (৩১১৭)।
৩. বুখারি (৬৪০৮)।

আবার অনেকে অজ্ঞতার কারণে ফেরেশতাদের অন্যান্য ধর্মে বিদ্যমান ফেরেশতার বিকৃত ধারণার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন। কেউ কেউ ফেরেশতাদের জিনদের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেন। এগুলো সবই অজ্ঞতা। ইসলামে ভূত-প্রেত, রাক্ষস-ডাইনি-পরি ইত্যাদি বলতে কিছু নেই। মানুষের বাইরে ইসলাম কেবল দুটো অদৃশ্য শক্তির স্বীকৃতি দেয়: এক. নুরের তৈরি ফেরেশতা, দুই. আগুনের তৈরি জিন ও শয়তান। আগেকার যুগের মানুষ জিনদের নারী-পুরুষকে ভূত-প্রেত ও পরি ইত্যাদি মনে করত। বর্তমানেও এমন অনেক বিশ্বাস রয়েছে। বাস্তবে এমন ভিন্ন কিছুর অস্তিত্ব নেই। ওগুলো জিনই।

ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা ফেরেশতাতে বিশ্বাস করে। কারণ, তাদের ধর্ম মূলত ইসলাম ধর্মই ছিল। শরিয়ত আলাদা হলেও আকিদা এক ও অভিন্ন ছিল। ফলে মুসলমানদের মতো তারাও বিশ্বাস করে—ফেরেশতারা নুরের তৈরি, এবং তারা মানুষ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। তাদের অসুস্থতা নেই, ক্লান্তি নেই, ঘুম নেই, মৃত্যু নেই (ইসলামে আল্লাহ ছাড়া সবকিছুর মৃত্যু রয়েছে। সুতরাং ফেরেশতারাও মৃত্যুবরণ করবেন)। তারা বিয়ে-শাদি করে না। মুসলমানদের মতো ইহুদি-খ্রিষ্টানরাও বিশ্বাস করে—জিবরাইল আলাইহিস সালাম প্রধান ফেরেশতা। কিন্তু তাঁর ব্যাপারে তারা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। জিবরাইল আলাইহিস সালামকে বলা হয় 'রুহুল কুদস'। কিন্তু খ্রিষ্টানরা সেটাকে আল্লাহ মনে করে ট্রিনিটির একজন সদস্য বানিয়ে দিয়েছে। ফলে তাদের কাছে জিবরাইল আর রুহুল কুদস ভিন্ন সত্তা। এভাবে তাদের ধর্ম বিকৃত হয়ে যাওয়ার ফলে ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে তারা অনেক ভিত্তিহীন ও বিকৃত আকিদা লালন করে। যেমন: তারা ভাবে, কিছু ফেরেশতা আগুনের তৈরি; কিছু ফেরেশতা অহংকার ও অবাধ্যতার ফলে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হয়ে শয়তান বনে গেছে। হারুত-মারুতের ব্যাপারে মন্দ গল্পগুলো তারাই তৈরি করেছে। ব্যবলনীয় তালমুদে এই বানোয়াট কাহিনি রয়েছে।[১]

ফেরেশতারা রোবট নন: ফেরেশতারা দ্বীনের প্রতি গাইরতসম্পন্ন মুমিন সম্প্রদায়। ফলে তারা ঈমান ও আনুগত্যকে ভালোবাসেন। নবি-রাসুল ও মুমিনদের মহব্বত করেন, সাহায্য করেন; কুফরকে ঘৃণা করেন; কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তাদের শাস্তি দেন, শায়েস্তা করেন। এ কথার মাধ্যমে সেসব লোকের বিভ্রান্তি স্পষ্ট হয়, যারা ফেরেশতাদের কেবল রোবটের মতো মনে করে। তাদের ধারণা—আল্লাহ

১. দেখুন: মতি ৩:২৮। লূক ৪:২৪। মার্ক ৫:১৬। লূক ১:১৯-২৮। ব্যাবিলনীয় তালমুদ: মিদ্রাস। পিটার দ্বিতীয় পত্র ২:৪। জুডার পত্র (৬)।

ফেরেশতাদের যে কাজ করতে বলেন সেটাই করেন, সুতরাং তাদের নিজস্ব পছন্দ, ভালোলাগা, নিষ্ঠা বলতে কিছু নেই। এগুলো ভিত্তিহীন ধারণা। হ্যাঁ, তারা আল্লাহর নির্দেশ মান্য করেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ঈমান ও মুমিনদের প্রতি তাদের ভালোবাসা নেই, তারা রোবটের মতো। আমরা কুরআনে দেখি ফেরেশতারা নবিদের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের দুশমনদের বিরুদ্ধে অভয় দেন। আল্লাহ তায়ালা লুত আলাইহিস সালাম ও ফেরেশতাদের মাঝে কথোপকথন সম্পর্কে কুরআনে বলেন,

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ. قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ. قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ.

অর্থ: 'আর যখন আমার প্রেরিত দূতগণ লুত আলাইহিস সালামের নিকট উপস্থিত হলো, তখন তাঁদের আগমনে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন এবং তিনি বলতে লাগলেন, আজ অত্যন্ত কঠিন দিন। আর তাঁর কওমের লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার (গৃহ) পানে ছুটে আসতে লাগল। পূর্ব থেকেই তারা কুকর্মে (সমকামিতায়) তৎপর ছিল। লুত আলাইহিস সালাম বললেন, হে আমার কওম, এ আমার কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং অতিথিদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোনো ভালো মানুষ নেই? তারা বলল, তুমি তো জানোই তোমার কন্যাদের নিয়ে আমাদের কোনো গরজ নেই। আর আমরা কি চাই তাও তুমি অবশ্যই জানো। লুত আলাইহিস সালাম বললেন, হায়! তোমাদের বিরুদ্ধে যদি আমার শক্তি থাকত, অথবা আমি কোনো সুদৃঢ় আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হতাম। মেহমান ফেরেশতাগণ বললেন, **হে লুত, আমরা আপনার পালনকর্তার পক্ষ হতে প্রেরিত দূত। এরা কখনোই আপনার কাছে পৌঁছতে পারবে না।** আপনি রাতের একটা অংশে নিজের লোকজন নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। আপনাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়, আপনার স্ত্রী ব্যতীত; কারণ, তার উপরও তা আপতিত হবে, যা ওদের উপর আপতিত হবে। ভোরবেলাই তাদের প্রতিশ্রুতির সময়। ভোর কি

খুব নিকটে নয়?'। [হুদ: ৭৭-৮১] বদর, খন্দক-সহ একাধিক যুদ্ধে ফেরেশতারা সাহাবাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন [আলে ইমরান: ১২৩-১২৫, আনফাল: ৯-১২, আহজাব: ৯]।[১] অন্যান্য মুজাহিদের সঙ্গেও ফেরেশতারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেন, বর্তমানেও করছেন, ভবিষ্যতেও করতে থাকবেন।

বরং ফেরেশতা কর্তৃক মুমিনদের ভালোবাসার সুস্পষ্ট বর্ণনা হাদিসে পাওয়া যায়। আবু হুরাইরা রাজি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিবরাইলকে ডেকে বলেন, আল্লাহ তায়ালা অমুককে ভালোবাসেন, সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাসো। তখন জিবরাইল তাকে ভালোবাসেন। অতঃপর জিবরাইল আকাশের অধিবাসীদের মাঝে ঘোষণা করেন, আল্লাহ তায়ালা অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ভালোবাসো। তখন আকাশের অধিবাসীরা তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। অতঃপর পৃথিবীর মানুষের অন্তরে তার ভালোবাসা ও গ্রহণযোগ্যতা ঢেলে দেওয়া হয়।'[২] ফেরেশতারা মুমিনদের জন্য দোয়া করেন। আলিমদের জন্য দোয়া করেন।[৩] দ্বীনি শিক্ষায় রত ছাত্রদের জন্য ডানা বিছিয়ে দেন।[৪] প্রথম দিকের কাতারগুলোতে যারা নামাজ আদায় করে, তাদের জন্য দোয়া করেন।[৫] যারা রোজার সাহরি খায়, তাদের জন্য দোয়া করেন।[৬] যারা রোগী দেখতে যায়, ফেরেশতারা তাদের জন্য দোয়া ও ক্ষমাপ্রার্থনা করেন।[৭] বরং পুণ্যবান কেউ মারা গেলে ফেরেশতারা তার জানাজাতেও অংশগ্রহণ করেন।[৮] তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন [ফুসসিলাত: ৩০-৩১]।

বিপরীতে কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন গুনাহগার ও অপরাধীদের উপর ফেরেশতাদের অভিসম্পাত করতে দেখা যায়। কারণ তারা ওগুলো পছন্দ করেন না [বাকারা: ১৬১, আলে ইমরান: ৮৬-৮৭]। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা তাঁর সাহাবাদের গালি দেবে, ফেরেশতারা তাদের উপর

---

১. বুখারি (৩৯৯২)।
২. বুখারি (৩২০৯); মুসলিম (২৬৩৭)।
৩. তিরমিজি (২৬৮৫)।
৪. সহিহ ইবনে হিব্বান (১৩২১)।
৫. আবু দাউদ (৬৬৪); সহিহ ইবনে খুজাইমা (১৫৫৭)।
৬. সহিহ ইবনে হিব্বান (৩৪৬৭); মুসনাদে আহমদ (১১২৫৫)।
৭. আবু দাউদ (৩০৯৮)।
৮. সুনানে কুবরা, নাসায়ী (২১৯৩)।

অভিসম্পাত করেন।[১] যারা আল্লাহর শরিয়তের বিধি-বিধান, হুদুদ-কিসাস ইত্যাদি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, ফেরেশতারা তাদের লানত করেন।[২] এভাবে মানুষের অস্তিত্বের শুরু থেকে জান্নাত/কিংবা জাহান্নাম পর্যন্ত সর্বত্রই ফেরেশতারা মানুষের সঙ্গে লেগে থাকেন। ভালো হলে তার সঙ্গে ভালো আচরণ করেন, দোয়া করেন, সাহায্য করেন। মন্দ হলে অসন্তুষ্ট হন, বদদোয়া করেন, শাস্তি দেন।

কে শ্রেষ্ঠ, মানুষ না ফেরেশতা? ফেরেশতারা মাসুম। তারা কোনো গুনাহ করেন না। তারা আল্লাহর অবাধ্য হন না। মন্দ চরিত্রের কোনো কাজে লিপ্ত হন না। এটা সকল মুসলমানের আকিদা। এ কারণে ভালো মানুষ বোঝাতে আমরা বলি ফেরেশতা। কারও ভালো চরিত্র বোঝাতে আমরা বলি 'ফেরেশতা-চরিত্রের অধিকারী'। ফলে স্বাভাবিকভাবে ফেরেশতারা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হন। আর এখান থেকেই কে শ্রেষ্ঠ সে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। আসলে কুরআন ও সুন্নাহে এটা নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো ফয়সালা দেওয়া হয়নি। ফলে স্বভাবতই আলিমদের মাঝে মতবিরোধ তৈরি হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, ফেরেশতা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের মতে ব্যাপারটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ (কাফের ও ফাসেক) থেকে ফেরেশতা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু নবি-রাসুল, ওলি-আউলিয়া, ও পুণ্যবান মুসলমানরা ফেরেশতার চাইতে শ্রেষ্ঠ। কারণ, আদম আলাইহিস সালামকে ফেরেশতারা সিজদা করেছেন [বাকারা: ৩৪, কাহাফ: ৫০]। আর উত্তম অনুত্তমের জন্য সিজদা করতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা আরেকটি আয়াত বলেন,

اِنَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِکَ هُمۡ خَیۡرُ الۡبَرِیَّۃِ.

অর্থ: 'নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তারা গোটা সৃষ্টিজগতের সর্বোত্তম।' [বাইয়িনাহ: ৭] যেহেতু ফেরেশতারাও সৃষ্টিজগতের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং পুণ্যবান মানুষ ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হলো।

কিন্তু এটা কোনো চূড়ান্ত মতামত নয়। বরং ইমাম আবু হানিফা রাহি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ মত রাখতেন। কাউকে শ্রেষ্ঠ না বলে নীরব থাকতেন।[৩] তাই এটা নিয়ে চূড়ান্ত কোনো কথা বলা কিংবা অতিরিক্ত ঘাঁটাঘাঁটি

---

১. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (১২৭০৯)।
২. আবু দাউদ (৪৫৯১); সুনানে কুবরা, নাসায়ি (৬৯৬৫)।
৩. ইবনে আবিল ইজ (২৮১)।

নিষ্প্রয়োজন। কারণ, এটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা নয়। দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও এটা কাজে লাগার মতো কিছু নয়। মুমিনের কর্তব্য হলো পুণ্য অর্জন করা এবং ফেরেশতাদের ভালোবাসা। ইমাম বাইহাকি লিখেন, এটা একটা সাধারণ বিষয়। এটা জানার মাঝে বিশেষ কোনো উপকার নেই।[১] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন বিষয় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর যেসব বিষয় ফরজ করেছেন, সেগুলো নষ্ট করো না; যেসব বিষয় হারাম করেছেন, সেগুলোর মাঝে লিপ্ত হয়ো না; যেসব সীমারেখা বেঁধে দিয়েছেন, সেগুলো লঙ্ঘন করো না। আর কিছু বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ (অনুগ্রহ করে, ভুলে গিয়ে নয়) নীরব থেকেছেন; তোমরা তা খোঁজাখুঁজি করো না।'[২]

১. শুআবুল ঈমান, বাইহাকি (১/৩২২)।
২. সুনানে দারাকুতনি (৪৩৯৬)। আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (৫৮৯)।

নবি-রাসুলের উপর ঈমান

নবি ও রাসুলের পরিচয়: ইসলামে মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হচ্ছেন নবি-রাসুলগণ। আল্লাহ তায়ালা তাদের মানবজাতির হিদায়াতের জন্য, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, মন্দ থেকে ভালোর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনোনীত করেছেন। মূর্তিপূজা থেকে মানুষকে এক লা-শারিক ইলাহের ইবাদতের দিকে, প্রবৃত্তিপূজা ও অসৎ চরিত্র থেক মানুষকে পবিত্রতার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তাদের নির্বাচিত করেছেন, দায়িত্ব দিয়েছেন। তারা সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে একসময় পরম প্রিয় বন্ধু আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর কাছে চলে গিয়েছেন। নবুওত ও রিসালাত আল্লাহর অনুগ্রহ। এটা যোগ্যতাবলে অর্জন করা সম্ভব নয় [হজ: ৭৫]।

নবি ও রাসুলের মাঝে পার্থক্য: পিছনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সার কথা হলো, নবি এবং রাসুল দুজনের প্রতিই ওহি অবতীর্ণ হয়। এদিক থেকে তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু অন্যান্য দিক দিয়ে নবি ও রাসুলের মাঝে পার্থক্য আছে। রাসুল নবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। প্রত্যেক রাসুল নবি, কিন্তু প্রত্যেক নবি রাসুল নন। কিন্তু কাকে নবি বলা হবে আর কাকে রাসুল, এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহে সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই। ফলে উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত কোনো মত নেই। অধমের কাছে যেটা অধিক বিশুদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত মনে হয় তা হলো, নবি হচ্ছেন যিনি আগের রাসুলের উম্মাহ; অন্য কথায়, মুমিনদের মাঝে প্রেরিত হন এবং দাওয়াতি কাজ করেন। আর রাসুল হচ্ছেন যিনি বিরুদ্ধবাদী বা কাফের সম্প্রদায়ের মাঝে প্রেরিত হন, দাওয়াত ও জিহাদ করেন। প্রতিকূল পরিবেশে তাওহিদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেন। নতুন কিতাব ও নতুন শরিয়ত এখানে মুখ্য নয়। নবি হয়েও কেউ আল্লাহর প্রশংসা ও জিকিরসংবলিত কিতাব লাভ করতে পারেন। আবার কিতাব না পেয়েও এবং মোটাদাগে আগের রাসুলের শরিয়তের অনুসারী হতেও কেউ রাসুল হতে পারেন, যদি তাকে কাফেরদের মাঝে তাওহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হয়। অন্য কথায়, রাসুলের মর্যাদা নবির তুলনায় বেশি হওয়ার কারণ হলো, রাসুলের দায়িত্ব, ঝুঁকি, সংগ্রাম, মুসিবত নবির তুলনায় বেশি।

নবি-রাসুলের সংখ্যা: আদম আলাইহিস সালাম হলেন সর্বপ্রথম নবি। আর সর্বশেষ নবি হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাদের মাঝে কতজন নবি-রাসুল ছিলেন? কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানায়নি। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ؕ

অর্থ: 'আমি আপনার পূর্বের অনেক রাসুলের অবস্থা আপনাকে বর্ণনা করেছি আর অনেক রাসুলের অবস্থা বর্ণনা করিনি।' [নিসা: ১৬৪] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

অর্থ: 'আর আমি আপনার পূর্বে নিশ্চয়ই অনেক রাসুল প্রেরণ করেছি যাদের কারও কারও অবস্থা আপনার কাছে বর্ণনা করেছি, আর কারও কারও অবস্থা আপনার কাছে বর্ণনা করিনি।' [গাফের: ৭৮]

দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা সকল নবি-রাসুলের কথা আমাদের কাছে বর্ণনা করেননি। অথচ তিনি আমাদের বলেছেন, পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের মাঝে তিনি নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

অর্থ: 'আপনি তো কেবল একজন ভীতিপ্রদর্শক, আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শনকারী রয়েছে।' [রাদ: ৭] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ؕ وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্য-সহ সুসংবাদ প্রদানকারী ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মাঝে সতর্ককারী গত হয়েছেন।' [ফাতির: ২৪] আরেকটি আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

অর্থ: 'আর আমি প্রত্যেক উম্মতের মাঝে রাসুল প্রেরণ করেছি এই পয়গাম দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো আর তাগুত বর্জন করো।' [নাহল: ৩৬]

কারণ হলো, রাসুল পাঠানো ছাড়া শাস্তি দিলে কিয়ামতের দিন কেউ আপত্তি করতে পারে। তা ছাড়া এটা আল্লাহর ইনসাফের জন্যও শোভনীয় নয়। এ জন্য তিনি বলেছেন,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

অর্থ: 'আমি রাসুল পাঠানোর আগ পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দিই না।' [ইসরা: ১৫] ফলে আল্লাহ তায়ালা জগতের প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের মাঝে ধারাবাহিকভাবে রাসুল পাঠানো অব্যাহত রেখেছেন। একজন চলে যাওয়ার পরেই দ্বিতীয়জন পাঠিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

ثُمَّ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّمَا جَآءَ اُمَّةً رَّسُوْلُهَا كَذَّبُوْهُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّ جَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ.

অর্থ: '**এরপর আমি ধারাবাহিকভাবে আমার রাসুল প্রেরণ করেছি।** যখনই কোনো উম্মতের কাছে তাঁর রাসুল আগমন করেছেন, তখনই তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি তাদের একের পর এক ধ্বংস করেছি এবং তাদের কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করেছি। সুতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা।' [মুমিনুন: ৪৪] জগতের সকল সম্প্রদায়ের কাছে এভাবে হাজার হাজার বছর ধরে নবি-রাসুল পাঠানো অব্যাহত থাকলে তাদের সংখ্যা যে কত বেশি হতে পারে, সেটা সহজেই বোধগম্য। কুরআনে এ ব্যাপারে কিছু না পাওয়া গেলেও হাদিসে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। যদিও কোনো কোনো আলিম এসব হাদিসের বিষয়ে আপত্তি করেছেন, তথাপি এগুলোর মাধ্যমে কিছুটা আন্দাজ করা যায় এবং এগুলো যে বিশুদ্ধ হওয়া অসম্ভব নয়, তাও অনুধাবন করা যায়।

আবু জর রাজি. থেকে বর্ণিত তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, নবিদের সংখ্যা কত? তিনি বলেন, 'এক লক্ষ বিশ হাজার'। আবু জর জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, তাদের ভিতরে রাসুল কতজন? তিনি বলেন, 'তিনশো তেরো জন'[১]। ভিন্ন একটি সূত্রে কাছাকাছি অর্থের আরও একটি হাদিস পাওয়া যায়। আবু উমামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর

---

১. সহিহ ইবনে হিব্বান (৩৬১)। হাদিসটির সনদ নিয়ে মুহাদ্দিসদের ঘোর আপত্তি রয়েছে। তা ছাড়া হাদিসের ভিতরেও যেসব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে বোঝা যায়, খুব সম্ভব এগুলো বনি ইসরাইলের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে নবি-রাসুলের সংখ্যা যে অনেক বেশি, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

নবি, নবিদের সংখ্যা কত?' তিনি বললেন, 'এক লক্ষ চব্বিশ হাজার; আর তাদের ভিতরে রাসুল তিনশো পনেরো জন।'[১] কোনো কোনো দুর্বল বর্ণনায় নবিদের সংখ্যা এক হাজারও পাওয়া যায়।[২] আনাস রাজি. থেকে একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, নবিদের সংখ্যা আট হাজার। চার হাজার বনি ইসরাইলের মাঝে, আর বাকি চার হাজার গোটা মানবজাতির মাঝে।[৩] এটাও দুর্বল বর্ণনা। তবে রাসুলদের সংখ্যা বিভিন্ন হাদিসে তিনশো তেরো থেকে পনেরোর মাঝেই সীমাবদ্ধ দেখা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হওয়ার কথা যে, নবি ও রাসুলদের সুনির্ধারিত সংখ্যা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তবে এটা অনুমান করা অসম্ভব নয় যে, তাদের সংখ্যা অনেক বড় এবং বেশি হবে। এত বেশি সংখ্যক নবি-রাসুলের ভিতর থেকে কুরআনে কারিমে মাত্র চব্বিশ বা পঁচিশজন নবি-রাসুলের কথা এসেছে। তাদের মাঝে আবার হাতেগোনা মাত্র কয়েকজনের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। বাকিদের কারও কেবল নাম উল্লেখ করা হয়েছে। উপরন্তু যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মাঝে আবার কারও কারও ব্যাপারে সুস্পষ্ট কিছু জানানো হয়নি। ফলে তারা নবি ছিলেন কি না এটা নিয়ে মতানৈক্য তৈরি হয়েছে। এসবের কারণ হলো, কুরআন ইতিহাসের গ্রন্থ নয়। ফলে সকল নবির জীবনী তো নয়ই; স্রেফ নাম উল্লেখ করাও প্রয়োজন নেই। এ কারণে কুরআন শুধু সেসব নবির নাম ও সেসব ঘটনা উল্লেখ করেছে, যাদের সঙ্গে আমাদের ইহকাল ও পরকালের কোনো কল্যাণ জড়িত।

কুরআনে বর্ণিত নবি-রাসুলদের নাম ইবনে কাসির এভাবে লিখেন: আদম, ইদরিস, নুহ, হুদ, সালেহ, ইবরাহিম, লুত, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, আইউব, শুআইব, মুসা, হারুন, ইউনুস, দাউদ, সুলাইমান, ইলিয়াস, আল-ইয়াসা', জাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা, জুল কিফল (অনেক মুফাসসিরের মতে) এবং সবার নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।[৪]

উক্ত পঁচিশজনের মাঝ থেকে আঠারোজনের নাম কুরআনে এক সঙ্গে এসেছে। আল্লাহ বলেন,

---

১. তাফসিরে ইবনে আবি হাতিম (১/১৮২)।
২. মুসনাদ আহমদ (১১৯৩১); মুসতাদরাকে হাকেম (৪১৯০)।
৩. মুসনাদে আবু ইয়ালা (৪১৩২); আল-মাতালিবুল আলিয়াহ (৩৪৪৪)।
৪. তাফসিরে ইবনে কাসির (২/৪১৭)।

وَتِلْكَ حُجَّتُنَاۤ اٰتَیْنٰهَاۤ اِبْرٰهِیْمَ عَلٰی قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِیْمٌ عَلِیْمٌ . وَ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَیْنَا ۚ وَ نُوْحًا هَدَیْنَا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِهٖ دَاوٗدَ وَ سُلَیْمٰنَ وَ اَیُّوْبَ وَ یُوْسُفَ وَ مُوْسٰی وَ هٰرُوْنَ ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ . وَ زَكَرِیَّا وَ یَحْیٰی وَ عِیْسٰی وَ اِلْیَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ . وَ اِسْمٰعِیْلَ وَ الْیَسَعَ وَ یُوْنُسَ وَ لُوْطًا ؕ وَ كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَی الْعٰلَمِیْنَ .

অর্থ: 'এটি ছিল আমার হুজ্জত যা আমি ইবরাহিমকে তাঁর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় সমুন্নত করি। আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক এবং ইয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথপ্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নুহকে পথপ্রদর্শন করেছি, তাঁর সন্তানদের মধ্যে দাউদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসুফ, মুসা ও হারুনকে। এমনইভাবে আমি সৎকর্মীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। আরও (পথ প্রদর্শন করেছি) জাকারিয়্যা, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকে। তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর ইসমাইল, ইয়াসা', ইউনুস ও লুত প্রত্যেককেই আমি সারা জগদ্বাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি [আনআম: ৮৩-৮৬]। এর বাইরে আদম, হুদ, সালেহ, শুআইব, ইদরিস, জুল কিফল ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত সকলের নবুওতের ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম একমত। তবে কুরআনে তারা ছাড়াও কিছু ব্যক্তিত্বের নাম বা আলোচনা এসেছে, যাদের নবুওতের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন খিজির। সর্বসম্মত কিংবা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের মতে তিনি নবি ছিলেন। অধমও সাধ্যানুযায়ী অধ্যয়ন, গবেষণা এবং আলিমদের বক্তব্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে **এটাকেই বিশুদ্ধতর মনে করছে যে, খিজির আলাইহিস সালাম নবি ছিলেন, ইনশাআল্লাহ।** এই তালিকায় তিনি ছাড়া আরও রয়েছেন জুল কারনাইন (আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট নয়; সে মুশরিক ছিল), লুকমান, ইউশা' ইবনে নুন, তুব্বা', উজাইর প্রমুখ। অনেকের মতে তারা নবি ছিলেন। অনেকের মতে নবি নন। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা বলা সম্ভব নয়। তবে তাদের প্রত্যেকে উঁচু পর্যায়ের পুণ্যবান ব্যক্তি ও আল্লাহর ওলি ছিলেন এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

নবি-রাসুলের উপর ঈমান আনার অর্থ: নবি-রাসুলের উপর ঈমান আনা ইসলামি আকিদার অন্যতম মৌলিক ভিত্তি, ঈমানের ছয় রুকনের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ.

অর্থ: 'সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর, কিতাবের উপর এবং নবিদের উপর।' [বাকারা: ১৭৭] বিখ্যাত হাদিসে জিবরিলে জিবরাইল আলাইহিস সালাম যখন নবিজিকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি বলেন, ঈমান হলো—আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, রাসুলগণ, আখিরাত ও তাকদিরে বিশ্বাস করা।[১]

নবিদের উপর ঈমান আনার অর্থ হলো এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মাঝে তাদের হিদায়াতের জন্য, তাওহিদের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

অর্থ: 'আর আমি প্রত্যেক উম্মতের মাঝে রাসুল প্রেরণ করেছি এই পয়গাম দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো আর তাগুত বর্জন করো।' [নাহল: ৩৬] আরও বিশ্বাস রাখা যে, সকল নবি ও রাসুল ছিলেন সত্যবাদী, নিষ্ঠাবান, পুণ্য ও পরিপূর্ণতার শিখরে অধিষ্ঠিত। তারা তাদের দায়িত্ব সর্বোত্তমরূপে পালন করেছেন। আল্লাহর কোনো বিধান তারা গোপন করেননি, কোনোকিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেননি, নিজেদের পক্ষ থেকে বিন্দু পরিমাণ সংযোজন-বিয়োজন করেননি; বরং তাদের উপর অর্পিত দাওয়াত ও রিসালাতের সর্বোচ্চ হক আদায় করেছেন, আল্লাহর আমানত সম্পূর্ণ সুরক্ষার সঙ্গে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

সুতরাং সকল নবি-রাসুলের ব্যাপারে একই বিশ্বাস রাখতে হবে। কারণ, তারা সকলে আল্লাহর দ্বীন (ইসলামকে) পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে আগমন করেছেন। এমন নয় যে, আমাদের রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাই আমরা তাঁকে ছাড়া আর কাউকে স্বীকার করব না, তিনি ছাড়া আর কাউকে শ্রদ্ধা করব না কিংবা ভালোবাসব না। কেউ এমন করলে তাঁর ঈমান বিশুদ্ধ হবে না; বরং সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত দ্বীনের বিরোধিতা করল। এটা ইহুদি

---

১. বুখারি (৫০); মুসলিম (৮)।

ও খ্রিষ্টানদের স্বভাব। তারা তাদের বানানো মূলনীতির বাইরে কোনো নবি-রাসুলের স্বীকৃতি দেয় না। যেমন: ইহুদিরা মুসা আলাইহিস সালামের উপর ঈমান আনলেও ঈসা আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবি বলে স্বীকার করে না। আবার খ্রিষ্টানরা মুসা ও ঈসা আলাইহিস সালামের উপর ঈমান আনলেও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবি বলে স্বীকার করে না। কিন্তু মুসলমানগণ পৃথিবীর সকল দেশের, সকল জাতির, সকল ভূখণ্ডের নবি-রাসুলের উপর ঈমান আনেন। কারণ, তারা সবাই ইসলাম নিয়েই পৃথিবীতে এসেছেন। মুসলমানগণ কোনো নবি-রাসুলের মাঝে পার্থক্য করেন না। মুসা আলাইহিস সালাম ইহুদিদের নিজস্ব নবি নন, ঈসাও আলাইহিস সালাম একমাত্র খ্রিষ্টানদের নবি নন; বরং তারা সবাই ইসলাম ও মুসলমানদের নবি। এটাই মূলত প্রকৃত আত্মসমর্পণ ও সঠিক আনুগত্য। নতুবা নিজ গোত্রে প্রেরিত নবিকে স্বীকৃতি দিয়ে অন্যদের অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে জাতীয়তাবাদ কিংবা সাম্প্রদায়িকতা। কারণ, সকল নবি-রাসুলের দাওয়াতের উৎস ও গন্তব্য এক। তা হলে কেন একজনকে স্বীকার করা হবে, অন্যজনকে প্রত্যাখ্যান করা হবে? বরং একজনকে অস্বীকার করার অর্থ হলো সবাইকে অস্বীকার করা।

এ কারণে কুরআন আমাদের শিখিয়েছে,

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ مَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ مَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ.

অর্থ: 'তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবিকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, সবকিছু উপর। **আমরা তাদের মাঝে পার্থক্য করি** না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।' [বাকারা: ১৩৬] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۚ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

অর্থ: 'রাসুল বিশ্বাস রাখেন ওইসব বিষয়ে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর

ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসুলদের প্রতি। তারা বলে, **আমরা তাঁর নবিদের মাঝে কোনো ভেদাভেদ করি না।** তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। হে আমাদের প্রভু, আমরা আপনার ক্ষমা চাই। আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।' [বাকারা: ২৮৫] আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ مَاۤ اُنْزِلَ عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ مَاۤ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ.

অর্থ: 'বলুন, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা-কিছু অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের উপর, ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের সন্তানের উপর, আর যা-কিছু দেওয়া হয়েছে মুসা, ঈসা এবং অন্য নবি-রাসুলকে তাঁদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে। **আমরা তাঁদের কারও মাঝে তারতম্য করি না।** আর আমরা তাঁরই অনুগত।' [আলে ইমরান: ৮৪] এসব নির্দেশের পাশাপাশি রাসুলদের মাঝে পার্থক্য নির্ধারণ কিংবা কাউকে স্বীকার করে অন্যকে অস্বীকার করার ব্যাপারে আল্লাহ কুরআনে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ؕ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا.

অর্থ: 'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করো এবং বিশ্বাস স্থাপন করো তাঁর রাসুল ও তাঁর কিতাবের উপর, যা তিনি নাজিল করেছেন স্বীয় রাসুলের উপর এবং সে সমস্ত কিতাবের উপর, যেগুলো নাজিল করা হয়েছিল ইতঃপূর্বে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, রাসুলগণ ও কিয়ামত দিনে বিশ্বাস করবে না, সে সুদূর বিভ্রান্তিতে নিপতিত।' [নিসা: ১৩৬] আরেকটি আয়াতে তিনি বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا. اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا.

অর্থ: 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলগণকে অস্বীকার করে, উপরন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসুলদের মাঝে ভেদাভেদ করে আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি কিন্তু

কতককে অবিশ্বাস করি, এবং এরই মধ্যবর্তী কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়, তারাই প্রকৃত কাফের। আর আমি কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।' [নিসা: ১৫০-১৫১]

এ কারণে আলিমগণ একমত যে, কেউ যদি সকল নবি-রাসুলের উপর ঈমান এনেও কেবল একজন নবির নবুওতকে অস্বীকার করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। কুরআনে নুহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِيْنَ

অর্থ: 'নুহের সম্প্রদায় রাসুলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল।' [শুআরা: ১০৫] হুদ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বলেন,

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِيْنَ

অর্থ: 'আদ সম্প্রদায় রাসুলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল।' [শুআরা: ১২৩] সালেহ আলাইহিস সালামের কওমের ব্যাপারে বলেন,

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ

অর্থ: 'সামুদ সম্প্রদায় রাসুলদের মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল'। [শুআরা: ১৪১] লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বলেন,

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِيْنَ

অর্থ: 'লুতের সম্প্রদায় রাসুলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল।' [শুআরা: ১৬০] উপরের আয়াতগুলোতে দেখুন, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বলা হচ্ছে—তারা রাসুলদের অস্বীকার করেছে। অথচ তাদের প্রত্যেকের কাছে কেবল নিজেদের একজন রাসুলই এসেছিলেন। তা হলে বহুবচন ব্যবহারের রহস্য কী? রহস্য হলো, প্রত্যেক রাসুল তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে পূর্ববর্তী রাসুলের সত্যায়নকারী ও পরবর্তী রাসুলের সুসংবাদ প্রদানকারী হিসেবে আসতেন। ফলে তাদের একজনকে অস্বীকার করার অর্থ ছিল তাঁর পূর্বাপর সকলকে অস্বীকার করা।

রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধ কি নবি? যেমনইভাবে সকল নবি-রাসুলের উপর কোনো ভেদাভেদ ছাড়া ঈমান আনা আবশ্যক, তেমনইভাবে কুরআন-সুন্নাহর দলিল ছাড়া

কাউকে নবি-রাসুল সাব্যস্ত করা থেকে বিরত থাকাও আবশ্যক। হ্যাঁ, যদি কারও নবি হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে, কাতয়ি কিংবা জান্নি প্রমাণাদি থাকে, সালাফের বক্তব্য থাকে, সেক্ষেত্রে তাকে নবি বলা যেতে পারে। যেমন: খিজির আলাইহিস সালাম। কুরআন-সুন্নাহে তাঁর নবি হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকলেও তাঁর ব্যাপারে কুরআনের বক্তব্যগুলো দেখলে বোঝা যায়, এগুলো নবি ছাড়া আর কারও ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। ফলে সালাফ ও খালাফের অসংখ্য আলিম খিজির আলাইহিস সালামকে নবি বলেছেন।[১] বিপরীতে লুকমান, জুল কারনাইন, ইউশা' প্রমুখের নবুওত কুরআনে সুস্পষ্টভাব প্রমাণিত নয়, ফলে তাদের নবি বলা যাবে না। একইভাবে অন্যান্য ধর্মের অনুসরণীয় ব্যক্তি, যাদের তাদের অনুসারীরা তাদের খোদার দূত, অবতার ইত্যাদি মানে, ইহুদি ধর্মের বিভিন্ন নবি (যাদের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহে হ্যাঁ বা না-বাচক কোনো বক্তব্য আসেনি), খ্রিষ্টধর্মের সেন্ট পল, হিন্দু ধর্মের রাম ও কৃষ্ণ প্রমুখ, পারসি ধর্মের জরথুস্ত্র (জারাদিশত), বৌদ্ধধর্মের গৌতম বুদ্ধ, চীনের কনফুফিয়াস, কিংবা গ্রিসের সক্রেটিস, তাদের কাউকেই নবি বলা যাবে না। যদি তাদের আনীত মতাদর্শে তাওহিদের নিদর্শন পাওয়া যায়, নবিদের দাওয়াতের সঙ্গে তাদের বিভিন্ন সাদৃশ্য থাকে, তবুও তাদের নবি সাব্যস্ত করা বৈধ নয়; বরং তাদের ব্যাপারে 'তাওয়াককুফ' তথা নিরপেক্ষ ভূমিকায় থাকতে হবে, গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান কোনোটাই না করে আল্লাহর কাছে সঁপে দিতে হবে; কারণ নবুওত অদৃশ্যের বিষয়, কুরআন-সুন্নাহর উপর নির্ভরশীল; ইতিহাস, কল্পনা, গবেষণা বা যুক্তির উপর নয়। অনেককে এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ির শিকার দেখা যায়। ফলে কেউ কেউ বুদ্ধ, রাম কিংবা জরথুস্ত্রকে নবি বানিয়ে দেন। আবার বিপরীতে কেউ কেউ তাদের সরাসরি মুশরিক আখ্যা দেন।[২] অথচ দুটোই ভুল।

---

১. শরহে মুসলিম, নববি (১৫/১৩৬); আল-কালাইদ, কওনভি (১৭৩)।

২. বুদ্ধ, জরথুস্ত্র, রাম, কৃষ্ণ, কনফুসিয়াসকে যেমন নবি বলা ভুল, একইভাবে তাদের মুশরিক আখ্যা দেয়াও ভুল। কারণ, তাদের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ নীরব। ফলে কেবল অনুসারীরা তাদের কোন দৃষ্টিতে দেখে সেটার ভিত্তিতে ফয়সালা দেওয়া বস্তুনিষ্ঠ ও ইনসাফ নয়। উদাহরণস্বরূপ ঈসা আলাইহিস সালাম। কুরআন-সুন্নাহ যদি তাঁর ব্যাপারে নীরব থাকত, তাঁর ব্যাপারে খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস ও খ্রিষ্টীয় সূত্রগুলো থেকে যদি তাকে বিচার করতে হতো, তবে কেমন হতো? একজন মিথ্যুক ও খোদা দাবিদার ভণ্ড লোক ছাড়া তাকে আর কিছু ভাবা যেত? নাউজুবিল্লাহ। অথচ তিনি ও তাঁর মাতা খ্রিষ্টানদের সকল মিথ্যাচার, বিকৃতি ও বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত। একই কথা এসব প্রাচীন ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যারা ঈসা আলাইহিস সালামের ন্যূনতম অর্ধ সহস্র বছর আগের লোক। ফলে অসম্ভব নয় যে, তাদের প্রকৃত চিত্র আজ একেবারেই বিপরীত। তাই কেবল অনুসারীদের বিশ্বাসের মাধ্যমে তাদের মাপা উচিত হবে না। একইভাবে তাদেরকে নবি আখ্যা দেওয়াও ভুল। বিশেষত অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের উদারতা প্রকাশের জন্যও এটা করা উচিত নয়। কারণ, এমন উদারতার শরয়ি ভিত্তি নেই। তাই এক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ভূমিকায় থাকতে হবে। (দেখুন: কিফায়াতুল মুফতি ১/৮৯-৯০, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ১/৪৪৯)।

একইভাবে নবিদের ব্যাপারে ঠিক ততটুকু বিশ্বাস রাখতে হবে, যতটুকু কুরআন ও সুন্নাহে এসেছে। এর বাইরে ঐতিহাসিক কোনো গ্রন্থের উপর কিংবা তাদের অনুসারী দাবিদারদের বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি কিংবা ছাড়াছাড়ি কোনোটাই করা যাবে না। যেমন: ইহুদিরা নবিদের মাসুম মনে করে না, বরং নবিদের ব্যাপারে তাদের বিকৃত গ্রন্থাবলিতে এমন জঘন্য বক্তব্য আছে, যা নবিগণ তো দূরের কথা সুস্থ রুচির কোনো সাধারণ মানুষের সঙ্গেও যায় না। যেমন: মদ্যপান, মেয়ের সঙ্গে অজাচার, নাচগান, মিথ্যা বলা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, অধীনস্থের সঙ্গে খিয়ানত করে তার বউকে বাগিয়ে নেওয়া, কোনো নবিকে জারজ সন্তান মনে করা ইত্যাদি। নবিদের ব্যাপারে এমন জঘন্য বক্তব্যে ইহুদিদের গ্রন্থগুলো ভরপুর। এগুলো বিশ্বাস করা যাবে না। কারণ, জগতের সকল নবি-রাসুল সব ধরনের কবিরা গুনাহ ও মানহানিকর কর্ম কিংবা চারিত্রিক স্খলন থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। ঠিক বিপরীতভাবে নবিদের ব্যাপারে বাড়াবাড়িও করা যাবে না। যেমন: খ্রিষ্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে অতিরঞ্জন করে তাকে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে ফেলেছে, তিন খোদার এক খোদা নির্ধারণ করেছে। এগুলো বিশ্বাস করা যাবে না। বরং ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর নবি ও রাসুল এটুকু বিশ্বাস করতে হবে।

খিজির আলাইহিস সালাম কি জীবিত? একইভাবে খিজির আলাইহিস সালামের ব্যাপারে সেসব বাড়াবাড়ি করা যাবে না, যেসব বাড়াবাড়ি কিছু মুসলিম ঘরানাতে পাওয়া যায়। যেমন: খিজির ও ইলিয়াস আলাইহিস সালাম এখনও জীবিত, তারা পাহাড়ে সাগরে জঙ্গলে থাকেন, ওলি-আউলিয়াদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তাদের সহায়তা করেন—এ জাতীয় বক্তব্য। ইমাম কুরতুবি, নববি, ইরাকি, ইবনুস সালাহ-সহ[১] অনেক মুহাক্কিক আলিম ও তাসাউফের মোটামুটি অধিকাংশ বুজুর্গই এ কথা বলেছেন। মাশায়েখে দেওবন্দ খিজির আলাইহিস সালামকে জীবিত মানেন। কিন্তু তারা যেসব দলিল পেশ করেন, সেগুলো দ্বারা আদৌ তারা দুজন জীবিত সেটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় না। বরং কুরআন-হাদিসের সকল দলিল তাদের মৃত্যুকে নিশ্চিত করে। যেমন: কুরআনে বর্ণিত মানবজীবনের চিরন্তন রীতি:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

১. শরহে মুসলিম, নববি (১৫/১৩৬); তাহযিবুল আসমা, নববি (১/১৭৭)।

অর্থ: 'প্রত্যেক নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে'। [আম্বিয়া: ৩৫] রাসুলকে লক্ষ্য করে আল্লাহর বাণী,

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

অর্থ: 'আপনি মৃত্যুবরণ করবেন যেমন তারা মৃত্যুবরণ করবে।' [জুমার: ৩০] অন্যত্র রাসুলুল্লাহকে বলেন,

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ

অর্থ: আমি আপনার পূর্বে কোনো মানুষকে চিরঞ্জীব করিনি। সুতরাং আপনি যদি মৃত্যুবরণ করেন, তারা কি চিরকাল থাকবে? [আম্বিয়া: ৩৪] এ কারণে আহলে সুন্নাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামের কাছে গ্রহণযোগ্য মত হলো, খিজির ও ইলিয়াস মৃত্যুবরণ করেছেন।[১] কেউ ঈসা আলাইহিস সালামের জীবিত থাকার যুক্তি দেখাতে পারে। অথচ দুটো কোনোভাবেই এক নয়। ঈসা আলাইহিস সালাম আকাশে রয়েছেন। আর আকাশের জীবন দুনিয়ার জীবন থেকে ভিন্ন; বরং আকাশে তো অন্যান্য রাসুলও রয়েছেন। তাছাড়া ঈসা আলাইহিস সালামের জীবিত থাকার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট সাক্ষ্য রয়েছে। বিপরীতে তাদের দুজনের ব্যাপারে এমন কিছুই নেই। সুতরাং ঈসা আলাইহিস সালামের উপর কিয়াস করে খিজির ও ইলিয়াসকে জীবিত বলা সঠিক নয়।

একইভাবে রাসুলুল্লাহর হাদিস, যেখানে এক রাতে তিনি সাহাবাদের লক্ষ্য করে বলেছেন, আজ যারা দুনিয়ার বুকে আছে, একশো বছর পরে কেউ থাকবে না।[২] এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, তারা কেউ জীবিত নন। ইমাম নববি-সহ কেউ কেউ এখান থেকে খিজিরকে ব্যতিক্রম ধরার কথা বলেন। দাজ্জাল (জাসসাসাহ) ও ইয়াজুজ-মাজুজের উপর কিয়াস করে। কিন্তু এটা শুদ্ধ নয়। কারণ, তাদের জীবিত থাকা নস দ্বারা প্রমাণিত। ফলে তাদের ব্যতিক্রম ধরা হবে। কিন্তু খিজির আলাইহিস সালামের জীবন প্রমাণিতই নয়; ব্যতিক্রম তো পরের বিষয়।

বিপরীতে তাদের জীবিত থাকার যেসব দলিল পেশ করা হয়, তার অনেকগুলো বানোয়াট বাকিগুলো দুর্বল, অজ্ঞাত ব্যক্তির বর্ণনা, স্বপ্নের দর্শন, কল্পনা ও যুক্তি ইত্যাদি, যেগুলোর মাধ্যমে আকিদা প্রমাণিত হয় না। ইমাম বুখারি, ইমাম আহমদ

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১/৩৯৪)।

২. বুখারি (১১৬); মুসলিম (২৫৩৭)।

এমন আকিদা প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইবনুল জাওজি শক্তভাবে এটা খণ্ডন করেছেন।[১] ইমাম নববি খিজির জীবিত থাকাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের মত বলেছেন।[২] কিন্তু ইবনে হাজার আসকালানি সেটাকে খণ্ডন করেছেন।[৩] ইবনে কাসিরও খিজির জীবিত থাকার মত খণ্ডন করেছেন এবং তারা যেসব দলিল দেন, সেগুলোকে অশুদ্ধ বলেছেন।[৪] আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহতে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, দলিলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, খিজির এবং ইলিয়াস দুজনই মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদের জীবিত থাকার ব্যাপারে যেসব দলিল দেওয়া হয়, সেগুলো সহিহ নয়।[৫] হজরত থানভি খিজির জীবিত থাকাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, এটা বুজুর্গদের মাধ্যমে মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত।[৬]

তর্কের খাতিরে যদি মেনে নেওয়া হয়, খিজির ও ইলিয়াস আলাইহিমাস সালাম জীবিত, প্রশ্ন ওঠে, এমন জীবনের সার্থকতা ও যৌক্তিকতা কী? ঈসা আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে এসে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবেন, দাজ্জাল-সহ দ্বীনের শত্রুদের পরাভূত করবেন। ইসলামের পতাকা বুলন্দ করবেন, রণাঙ্গণে মুজাহিদদের নেতৃত্ব দেবেন। ফলে এমন প্রত্যাবর্তন দ্বীনের জন্যই। বিপরীতে হাজার বছর ধরে খিজির ও ইলিয়াস বেঁচে আছেন, মুসলিম উম্মাহ অধঃপতনের অতলে তলিয়ে গেছে, শিরক-বিদআত উম্মাহকে গ্রাস করে নিয়েছে, বারবার ইসলামের দুশমনের হাতে বিধ্বস্ত হয়েছে, মুসলমানদের খেলাফত লুপ্ত হয়েছে, ইহুদি-খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছে, মুসলিম উম্মাহ দাওয়াত ও জিহাদ ভুলে দুনিয়াদারির মাঝে মেতে আছে, তবুও খিজির ও ইলিয়াস একটি বারের জন্য জঙ্গল থেকে বের হলেন না; মুসলিম দাঈদের এই বিপদ থেকে উত্তরণের পরামর্শ দিলেন না; মুজাহিদদের ময়দানে নেমে সহায়তা করলেন না; কেবল মাঝে মাঝে জঙ্গলে গেলে কিছু সুফি-সাধকের সামনে তারা ধরা দেন, দু-একটি কথা বলে আবার মুহূর্তেই নাই হয়ে যান। এমন জীবন থেকে তা হলে কে উপকৃত হচ্ছে? তারা নিজেরা? নাকি ইসলাম ও মুসলমান? শরয়ি এবং আকলি কোনোভাবেই এমন বেঁচে থাকার সার্থকতা নেই।

---

১. বিস্তারিত দেখুন আল-মানারুল মুনিফ, ইবনুল কাইয়িম (তাহকিক: আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ) (৬৭)। আরও দেখুন: আউনুল মাবুদ, আজিমাবাদি (১১/৩৩৮); আল-মাউজুআত, ইবনুল জাওজি (১/১৯৭)।
২. তাহজিবুল আসমা, নববি (১/১৭৭)।
৩. আল-ইসাবাহ, ইবনে হাজার (৩/২৪০)।
৪. তাফসিরে ইবনে কাসির (৫/১৬৯)।
৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (১/৩৯৪)।
৬. ইমদাদুল ফাতাওয়া (৪/৫৪১-৫৪২)।

নবিদের উপর ঈমানের স্তরভেদ: ঈমান আনার প্রশ্নে নবিদের মাঝে কোনোরূপ পার্থক্য না করা গেলেও ঈমান আনার পরিমাণের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। একটা হলো ঈমানে মুজমাল বা সংক্ষিপ্ত ঈমান। এটা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। আরেকটা ঈমানে মুফাসসাল তথা বিস্তারিত ঈমান। এটা সবার উপর ওয়াজিব নয়, বরং কিছু মানুষ করলে অন্যদের উপর থেকে দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে।

সকল নবি-রাসুলের উপর ইজমালিভাবে ভাবে ঈমান আনা ওয়াজিব। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মানুষের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে অনেক নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন, যারা আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের হাতে মুজিজা প্রকাশিত হয়েছে। আমরা তাদের জানি বা না জানি, সবার উপর সংক্ষিপ্ত ঈমান রাখতে হবে। তাই প্রত্যেক নবি-রাসুলের নাম, তাদের বিস্তারিত পরিচয়, সময় ও ঠিকানা, সেসব শরিয়তের আসমানি গ্রন্থ, বিধি-বিধান, হালাল-হারাম ইত্যাদি জানা সবার উপর ওয়াজিব নয়। তবে সকল নবি-রাসুলকে ভালোবাসতে হবে। তাদের সম্মান করতে হবে। তাদের কারও ব্যাপারে বেয়াদবি কিংবা অসম্মান হয় এমন কিছু বলা যাবে না। তাদের সমালোচনা করা যাবে না; **বরং প্রত্যেক মুসলিমকে সকল নবির সম্মান ও মর্যাদার অতন্দ্র প্রহরী হতে হবে। তাদের অনুসারী দাবিদার কিংবা অন্য যে-কেউ যাতে কোনো নবির শানে অমূলক কিছু বলতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।**

আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর শেষ নবি ও রাসুল এতটুকু ঈমান প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। এটুকু ঈমান না থাকলে সে ব্যক্তি মুসলমানই হতে পারবে না। কিন্তু কেবল মুখে এতটুকু ঈমান আনলেই হবে না; বরং রাসুলুল্লাহর শরিয়তের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান জানতে হবে এবং সেগুলো জীবনের সর্বক্ষেত্রে পালন করতে হবে। হ্যাঁ, রাসুলুল্লাহর বংশপরিচয়, বাবা-মায়ের নাম ইত্যাদি জানা দরকার নেই, কিন্তু তিনি শেষ নবি ও রাসুল, তাঁর উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে ইত্যাদি দ্বীনসংশ্লিষ্ট মৌলিক বিষয়গুলো জানতে হবে।[১] পাশাপাশি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের জীবনের চেয়ে, পৃথিবীর সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-

---

১. তাতারখানিয়া (৭/৩০১)।

মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হবো।[১] তাই কেবল নামকাওয়াস্তে কিংবা বংশসূত্রে মুসলমান ব্যক্তি স্বীয় দ্বীনের ব্যাপারে লাপাত্তা থাকলে যেকোনো সময় ঈমানহারা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসার অন্যতম নিদর্শন হলো, তাঁর আনীত জীবনবিধান, শরিয়ত ও হালাল-হারাম মেনে চলা এবং তাঁর সম্মান ও মর্যাদার অতন্দ্র প্রহরী হওয়া। সুতরাং কেউ যেন আল্লাহর রাসুলকে গালি দিতে না পারে কিংবা তাঁর সমালোচনা করতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে; কিংবা করলে সেটা থেকে তাকে নিবৃত্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে। রাসুলের স্ত্রী-সন্তান, পরিবার-পরিজন সবাইকে ভালোবাসতে হবে; তাদের জন্য দোয়া করতে হবে; তাদের সম্মান সুরক্ষিত রাখতে হবে।

নবিদের মিশন: এক. জগতের সকল নবি-রাসুলের দাওয়াতের মূল কথা ছিল তাওহিদ ও ইসলাম। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ.

অর্থ: 'আমি আপনার পূর্বে যত রাসুল পাঠিয়েছি, সবাইকে এই প্রত্যাদেশ করেছি যে, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।' [সুরা আম্বিয়া: ২৫] অপর একটি আয়াতে বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

অর্থ: 'আমি প্রত্যেক জাতির মাঝেই রাসুল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত বর্জন করো।' [নাহল: ৩৬] জগতের সকল নবি-রাসুলের ধর্ম ছিল ইসলাম। নুহ আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলেন,

وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থ: 'আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হতে আদিষ্ট হয়েছি।' [ইউনুস: ৭২] ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তায়ালা মুসলিম হতে নির্দেশ দেওয়ায় তিনি মুসলিম হন। আল্লাহ বলেন,

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

---

১. বুখারি (১৪, ১৫)।

অর্থ: "যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন, 'ইসলাম গ্রহণ করো', তখন তিনি বললেন, 'আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তার কাছে আত্মসমর্পণ (ইসলাম গ্রহণ) করলাম'।" [বাকারা: ১৩১] ইবরাহিম ও তার পৌত্র ইয়াকুব তাদের সন্তানদেরও মুসলিম হওয়ার ওসিয়ত করেছেন। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

وَ وَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ بَنِیْهِ وَ یَعْقُوْبُ یٰبَنِیَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّیْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

অর্থ: 'আর ইবরাহিম এবং ইয়াকুব তাদের সন্তানদের ওসিয়ত করেছিলেন, হে আমার সন্তানগণ, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা মুসলমান হওয়া ব্যতীত মৃত্যুবরণ করো না।' [বাকারা: ১৩২] এই ওসিয়তের ফলাফল ছিল ইয়াকুবের সন্তানগণ সবাই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ یَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِیْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِیْ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَ اِلٰهَ اٰبَآىِٕكَ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ وَ اِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا وَّ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ.

অর্থ: 'আর তোমরা কি উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের কাছে মৃত্যু হাজির হয়েছিল, যখন তিনি তার সন্তানদের বলেছিলেন তোমরা আমার মৃত্যুর পরে কার ইবাদত করবে? তখন তারা বলল, আমরা আপনার এবং আপনার বাপ-দাদা ইবরাহিম, ইসমাইল ও ইসহাকের ইলাহের ইবাদত করব। তিনি এক ইলাহ। আমরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী মুসলমান।' [বাকারা: ১৩৩] বনি ইসরাইলের ধর্মও ছিল ইসলাম। মুসা আলাইহিস সালাম তার সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলেন,

وَ قَالَ مُوْسٰى یٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَیْهِ تَوَكَّلُوْۤا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِیْنَ.

অর্থ: 'আর মুসা তার সম্প্রদায়কে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাকো, তবে তার উপর ভরসা করো, যদি তোমরা মুসলমান হও। [ইউনুস: ৮৪] ঈসা আলাইহিস সালামের ধর্মও ছিল ইসলাম। তিনি ইসলামের দিকেই তার উম্মতকে দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّاۤ اَحَسَّ عِیْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِیْۤ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِیُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ اشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ.

অর্থ: 'অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম যখন তাদের (বনি ইসরাইলের) কুফর উপলব্ধি করতে পারলেন তখন বললেন, কারা আছে আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে? তখন হাওয়ারিগণ (সাহাবা) বললেন, আমরা রয়েছি আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলমান।' [আলে ইমরান: ৫২]

দুই. মানুষের উপর হুজ্জত কায়েম হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ কাফেররা যাতে পরকালে আল্লাহর উপর দায় চাপাতে না পারে, যেমনটা পিছনে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা রুহের জগতে আমাদের কাছ থেকে সাক্ষ্য নিয়েছেন যে, তিনি আমাদের প্রভু কি না। তখন আমরা সবাই সাক্ষ্য দিয়েছিলাম, 'হ্যাঁ, আপনি আমাদের প্রভু।' আল্লাহ চাইলে সেই সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে আমাদের কাছ থেকে হিসাব নিতে পারতেন। কিন্তু তাতে কাফেররা বলত, আমাদের তো সেই সাক্ষ্যের কথা মনে নেই। সুতরাং আমাদের কেন শাস্তি দিচ্ছেন? এ জন্য আল্লাহর ইনসাফের দাবি হচ্ছে, রাসুল পাঠানো হোক। এর পর যারা তাদের কথা শুনবে, তারা মুক্তি পাবে; আর যারা শুনবে না, তারা ধ্বংস হবে। এভাবে আল্লাহ তায়ালা মানুষের উপকার করতে এবং কাফেরদের লা জওয়াব করে দিতে রাসুল প্রেরণ করেন। আল্লাহ বলেছেন,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

অর্থ: 'আমি রাসুল পাঠানোর আগ পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দিই না।' [ইসরা: ১৫]
অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا.

অর্থ: (আমি প্রেরণ করেছি) রাসুলগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে, যাতে রাসুলদের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মতো কোনো অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [নিসা: ১৬৫]

তিন. দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও দুনিয়া পরিচালনা। এটা নবিদের আগমনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ইসলাম পরকাল গড়তে গিয়ে দুনিয়া ধ্বংস করতে হবে এমন বিশ্বাস করে না। বরং এটা মানুষের ইহকাল ও পরকাল দুটোই গড়তে এসেছে। উভয় জগতে মানুষকে কল্যাণের পথে নিতে এসেছে। এ জন্য নবিগণ শুধু আখিরাত নয়; ইহকালীন জীবনেরও নেতৃত্ব দিতেন। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ.

অর্থ: 'তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের অবশ্যই পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করবেন, যেমন তিনি কর্তৃত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের। আর তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন। আর তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের শান্তি দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না। এর পর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য।' [নুর: ৫৫] বনি ইসরাইলের নবিগণ ছিলেন পরকালের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়া আবাদের অন্যতম দৃষ্টান্ত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বনি ইসরাইলকে নবিগণ নেতৃত্ব দান করতেন। যখন এক নবি মৃত্যুবরণ করতেন, অন্যজন তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে কোনো নবি নেই। তাই খলিফারা আমার স্থলাভিষিক্ত হবে।[১]

চার. পূর্ণাঙ্গ আদর্শের বাস্তবোচিত উদাহরণ। নবি-রাসুলগণ পৃথিবীর সর্বোত্তম প্রজন্ম। অথচ তারা রক্ত-মাংসের মানুষ। তারা হাঁটতেন, বাজারে যেতেন, সংসার করতেন। রক্তমাংসের একজন মানুষ হয়েও কীভাবে মানবিক ও আধ্যাত্মিক পূর্ণাঙ্গতার শিখরে পৌঁছে যাওয়া যায়, নবিগণ তার জীবন্ত উদাহরণ। মানুষ যেন দুনিয়ার জীবনের ঘোরে পথচ্যুত না হয়, শয়তানের দলের ভার ও বড়ত্বে আদর্শ-সংকটে না ভোগে, তাই আল্লাহ তাদের পাঠিয়েছেন। ফলে যে নবিদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবে, সে পূর্ণতার পথের দিশা পাবে।

নবি-রাসুলগণ নিষ্পাপ (ইসমতে আম্বিয়া): নবি-রাসুলগণ মানুষের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। ফলে তারা সকল অন্যায় ও অপরাধ থেকে পবিত্র। ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা নবি রাসুলদের ব্যাপারে তাদের পবিত্র (!) গ্রন্থে যেসব অপবাদ আরোপ করে, নবি-রাসুলগণ সেগুলো থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। পৃথিবীর মানুষের উপর আল্লাহর পরে নবিগণই সবচেয়ে অনুগ্রহশীল। তারা মানুষের কল্যাণের জন্য সারা জীবন কাজ করেছেন; ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানি করেছেন। অনেকে দাওয়াতের এ পথে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। ফলে নবিগণ আমাদের ঈমান, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও দোয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত।

---

১. বুখারি (৩৪৫৫); মুসলিম (১৮৪২)।

প্রশ্ন হচ্ছে, নবি-রাসুলগণ গুনাহ করেন কি না? হকপন্থি সকল মুসলমান এ ব্যাপারে একমত যে, নবিগণ সবে ধরনের কুফর থেকে মুক্ত—সেটা নবুওতের আগেও নয়; পরে তো নয়ই। **আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বসম্মত আকিদামতে, (এক) নবিগণ কবিরা গুনাহ থেকে পবিত্র। (দুই) দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ—যার জন্য তারা মনোনীত ও প্রেরিত হন—করার ক্ষেত্রেও তারা পরিপূর্ণ ও সকল বিচ্যুতি থেকে পবিত্র। (তিন) একইভাবে তারা পবিত্র সেসব সগিরা গুনাহ থেকে যা উত্তম চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যায় না।** কিন্তু লঘুতর সগিরা গুনাহ—যা চারিত্রিক শোভন কিংবা ব্যক্তিত্বের জন্য হানিকর নয়—থেকে নবিগণ পবিত্র কি না, এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের মাঝে মতভেদ রয়েছে।[১]

প্রথম দলের মত: একদল আলিমের বক্তব্য হলো, নবিগণ কবিরা গুনাহ ও অন্যান্য সগিরা গুনাহ থেকে পবিত্র, কিন্তু এই প্রকারের (লঘু) সগিরা গুনাহ থেকে নন। ইবনে বাত্তাল মালেকি (৪৪৯ হি.) বলেন, আহলে সুন্নাতের মতে, নবিগণ থেকে সগিরা গুনাহ প্রকাশ পেতে পারে।[২] ইবনে আবদুল বার (৪৬৩ হি.) বলেন, 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেবল সগিরা গুনাহ ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে। কারণ, এ কথা সর্বজনবিদিত যে, তিনি কিংবা কোনো নবি কখনও কবিরা গুনাহ করেন না। কারণ, তারা কবিরা গুনাহ থেকে মাসুম।'[৩] কাজি ইয়াজ (৫৪৪ হি.) বলেন, 'সালাফের একদল ইমাম নবিদের কাছ থেকে সগিরা গুনাহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব বলেছেন। এটা আবু জাফর তাবারি-সহ অন্যান্য অনেক ফকিহ, মুহাদ্দিস ও মুতাকাল্লিমিনের মাজহাব।'[৪] আমেদি (৬৩১ হি.) তাঁর 'আল-ইহকাম' গ্রন্থে এ ব্যাপারে লম্বা আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, অধিকাংশ শাফেয়ি এবং মুতাজিলি আলিমদের মতে, সগিরা গুনাহ থেকে নবিগণ নিষ্পাপ নন।[৫] ইমাম নববি সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেন, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে সালাফ ও খালাফের অধিকাংশ ফকিহ, মুহাদ্দিস ও মুতাকাল্লিমিনের মতে, নবিদের কাছ থেকে সগিরা গুনাহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। তাদের দলিল কুরআন ও সুন্নাহর বাহ্যিক নসসমূহ।[৬] ইবনে তাইমিয়া (৭২৮ হি.) বলেন,

১. শিফা, কাজি ইয়াজ (২/১৪৫); শরহে মুসলিম, নববি (৩/৫৪); হারারি (৫৫)।
২. শরহে সহিহিল বুখারি, ইবনে বাত্তাল (১০/৪৩৯)।
৩. আল-ইসতিজকার, ইবনে আবদুল বার (২/৪৯৬)।
৪. শিফা, কাজি ইয়াজ (২/১৪৪)।
৫. আল-ইহকাম, আমেদি (১/১৭১)।
৬. শরহে মুসলিম, নববি (৩/৫৪)।

অধিকাংশ আলিমের বক্তব্য হলো, নবিগণ কবিরা গুনাহ থেকে পবিত্র, সগিরা গুনাহ থেকে নন। এমনকি অধিকাংশ আহলুল কালামেরও এই মত। আমেদির মতে, অধিকাংশ আশআরি এমন মত পোষণ করেন। বস্তুত সাহাবি, তাবেয়িন-সহ সালাফ থেকে এসংশ্লিষ্ট যেসব বক্তব্য পাওয়া যায়, সেগুলো এই মতকেই সমর্থন করে।[১] জাহাবিও (৭৪৮ হি.) নবিগণ থেকে সাময়িকভাবে সগিরা গুনাহ প্রকাশ পেতে পারে বলে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের মত হিসেবে উল্লেখ করেন।[২]

এই মত পোষণকারীরা তাদের উক্ত মতের সমর্থনে কুরআন-সুন্নাহ থেকে একাধিক দলিল পেশ করেন। তন্মধ্যে:

- আদম আলাইহিস সালাম কর্তৃক আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ, যেটাকে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى.

যার শাব্দিক অর্থ: 'আদম আল্লাহর আদেশ অমান্য করে পথচ্যুত হয়ে পড়লেন।' [তহা: ১২১] তাদের মতে, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে عصيان (অবাধ্যতা) যোগ করেছেন যাতে এ ব্যাপারে আর সন্দেহ থাকে না।

- নুহ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ কর্তৃক ভৎর্সনা। যখন তিনি তাঁর ছেলের ব্যাপারে সুপারিশ করেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সতর্ক করে দেন যে, এটা ঠিক নয়। ফলে নুহ আলাইহিস সালাম তৎক্ষণাৎ তাওবা করেন এবং বলেন, যদি তাঁর অপরাধ ক্ষমা করা না হয় তবে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

وَنَادٰى نُوۡحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابۡنِىۡ مِنۡ اَهۡلِىۡ وَاِنَّ وَعۡدَكَ الۡحَـقُّ وَاَنۡتَ اَحۡكَمُ الۡحٰكِمِيۡنَ. قَالَ يٰنُوۡحُ اِنَّهٗ لَـيۡسَ مِنۡ اَهۡلِكَ‌ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيۡرُ صَالِحٍ‌ ۖ فَلَا تَسۡـئَلۡنِ مَا لَـيۡسَ لَـكَ بِهٖ عِلۡمٌ‌ ؕ اِنِّىۡۤ اَعِظُكَ اَنۡ تَكُوۡنَ مِنَ الۡجٰهِلِيۡنَ. قَالَ رَبِّ اِنِّىۡۤ اَعُوۡذُ بِكَ اَنۡ اَسۡـئَلَكَ مَا لَـيۡسَ لِىۡ بِهٖ عِلۡمٌ‌ ؕ وَاِلَّا تَغۡفِرۡ لِىۡ وَتَرۡحَمۡنِىۡۤ اَكُنۡ مِّنَ الۡخٰسِرِيۡنَ.

[হুদ: ৪৫-৪৭] তাদের মতে, এটা গুনাহের প্রমাণ।

---

১. মাজমুউল ফাতাওয়া (৪/৩১৯)।
২. আল-মুনতাকা, জাহাবি (৫০)।

● মুসা আলাইহিস সালাম যখন তার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে সাহায্য করতে গিয়ে অন্য লোককে হত্যা করে ফেলেন। যদিও কাজটা অনিচ্ছায় ছিল, কিন্তু তিনি এটার জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন এবং এটাকে শয়তানের কাজ বলে আখ্যা দেন; পাশাপাশি তিনি নিজের উপর জুলুম করেছেন এই মর্মে স্বীকৃতি দেন।

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ۫ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهٖ ۙ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ۫ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ.

[কাসাস: ১৫]

● দাউদ আলাইহিস সালাম একবার বিচার করার সময় দ্বিতীয় পক্ষের রায় না শুনেই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ফেলেন। পরে তিনি বুঝতে পারেন এটা ঠিক হয়নি। ফলে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন।

وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ.

[সাদ: ২৪]

● ইউনুস আলাইহিস সালাম নিজ কওমকে ছেড়ে যাওয়াতে আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে শাস্তি দান করেন এবং ইউনুস আলাইহিস সালাম নিজের উপর জুলুম করেছেন বলে স্বীকার করেন।

فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۫ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

[আম্বিয়া: ৮৭]

● ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন, আমি আশা করি, তিনি বিচারের দিবসে আমার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন।

وَالَّذِيْۤ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْٓـَٔتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ.

[শুআরা: ৮২]

● রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও আল্লাহ তায়ালা একাধিকবার ভর্ৎসনা করেন। একবার যখন তিনি স্ত্রীদের কারণে নিজের উপর মধু হারাম ঘোষণা করেন, তখন:

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ.

[তাহরিম: ১] অন্যবার যখন তিনি অন্ধ সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে দেখে কিছুটা বিরক্ত হন:

عَبَسَ وَتَوَلَّى. أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى.

[আবাসা: ১-৩] আরেকবার বদরের যুদ্ধে কাফের বন্দিদের কাছ থেকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তেও আল্লাহ তায়ালা অসন্তোষ প্রকাশ করেন। [আনফাল: ৬৮]

- এ ছাড়া তারা স্বয়ং নবিদের মুখে স্বীকার করা ত্রুটির কথা দিয়েও দলিল দেন। যেমন 'হাদিসে শাফায়াহ' নামে প্রসিদ্ধ হাদিসে একাধিক নবি নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকার কথা স্বীকারপূর্বক সুপারিশ করতে অপরাগতা প্রকাশ করবেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠাবেন।[১]

দ্বিতীয় দলের মত: দ্বিতীয় মত পোষণকারীরা বলেন, নবিগণ কবিরা গুনাহের মতো সব ধরনের সগিরা গুনাহ থেকেও পবিত্র। কারণ আল্লাহ তাদের গোটা সৃষ্টির উপর মনোনীত করেছেন। তারা মানুষের জন্য সামগ্রিক আদর্শ। ফলে তাদের দ্বারা সগিরা গুনাহও হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি আদর্শ হতে পারেন না। তা ছাড়া তাদের মতে, নবিগণ ইনসানে কামেল তথা পূর্ণাঙ্গ মানব; আর সগিরা গুনাহ সেই পূর্ণাঙ্গতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক, তাওবা করা হলেও। ফলে নবিগণ সগিরা গুনাহ থেকে পবিত্র। এই দলের প্রথমে আছেন ইমাম আবু হানিফা (১৫০ হি.)। তিনি নবিদের সগিরা, কবিরা-সহ সব ধরনের কুফর ও মানহানিকর বিষয় থেকে মাসুম বলেন। তবে তাদের ভুল ও বিচ্যুতি (زلات/خطايا) হয়ে থাকতে পারে।[২] আবু ইসহাক ইসফারায়েনি (৪১৮ হি.) এই মতকে অগ্রাধিকার দেন এবং এটাকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের মত হিসেবে বর্ণনা করেন। পাশাপাশি প্রথম মতকে 'কারও কারও মত বলে' ভিত্তিহীন আখ্যা দেন।[৩] ইমাম আবুল ইউসর (সদরুল ইসলাম) বাজদাবি (৪৯৩ হি.) নবিগণকে সগিরা ও কবিরা সব ধরনের গুনাহ থেকে মাসুম বলেছেন।[৪] মুফাসসির ইবনে আতিয়্যাহও (৫৪২ হি.) মতানৈক্যের কথা বর্ণনা করে সব ধরনের গুনাহ থেকে মাসুম

১. বুখারি (৩৩৪০); মুসলিম (১৯৪); তিরমিজি (২৪৩৪)।
২. আল-ফিকহুল আকবার (৩৭)।
৩. তাফসিরে কুরতুবি (১/৩০৯)।
৪. উসুলুদ্দিন, বাজদাবি (১৭২)।

হওয়ার মতকে অগ্রাধিকার দেন।[১] ইমাম নববি (৬৭৬ হি.) লিখেন, আমাদের ইমামদের মাঝ থেকে একদল মুহাক্কিক ফকিহ ও মুতাকাল্লিমিন এই মত পোষণ করেন। তাদের মতে, নবুওতের মসনদের সঙ্গে এ ধরনের গুনাহও শোভনীয় নয়। তারা এ ব্যাপারে বর্ণিত কুরআনের আয়াতগুলোকে তাবিল করেন। এগুলো বলার পরে ইমাম নববি এটাকেই গ্রহণযোগ্য বলে মত দেন।[২] বদরুদ্দিন আইনি (৮৫৫ হি.) মতভেদ উল্লেখ করে বলেন, 'আমার মাজহাব হলো, নবিগণ নবুওতের আগে-পরে সগিরা-কবিরা সব ধরনের গুনাহ থেকে মাসুম। তাদের কারও কারও কাছ থেকে সগিরা গুনাহ-সদৃশ যে সামান্য কিছু বিষয় প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলো গুনাহ নয়; বরং উত্তমের বদলে অনুত্তম বলা যায়।'[৩] ইবনে হাজার আসকালানিও (৮৫২ হি.) এই মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[৪] হজরত থানভিরও এই মত।[৫]

প্রথম দলের উলামায়ে কেরাম তাদের তাবিলকে বর্জন করেন। তাদের মতে, এসব তাবিল আর রাফেজ-বাতেনি সম্প্রদায়ের তাবিলের মাঝে পার্থক্য নেই। ইবনে তাইমিয়া মনে করেন, ইসমাতে মুতলাক (অর্থাৎ সগিরা ও কবিরা সব ধরনের গুনাহ থেকে পবিত্রতার) ধারণা সূচিত হয় রাফেজিদের হাতে। তারা তাদের ইমামের ব্যাপারে এসব আকিদার সূচনা করে। নতুবা আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি আহমদ-সহ আহলে সুন্নাতের কোনো ইমাম কিংবা তাদের অনুসারী, এমনকি ইবনে কুল্লাব, আবুল হাসান আশআরি, ইবনে কাররাম-সহ বড় বড় মুতাকাল্লিম থেকেও এ ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায় না। তাই এ ব্যাপারে মুসলমানদের কাফের কিংবা ফাসেক বলা জায়েজ নেই। হ্যাঁ, ভুল-শুদ্ধ বললে সেটা ভিন্ন কথা।[৬] আমেদিও বলেছেন, শিয়ারা তাদের সগিরা থেকেও নিষ্পাপ ভাবে।[৭] রাজিও বলেছেন, শিয়ারা রাসুলদের (জ্ঞাতসারে-অজ্ঞাতসারে) সম্পূর্ণরূপে সব ধরনের গুনাহ থেকে মুক্ত মনে করে।[৮]

এর পর তারা তাদের যুক্তির জবাব দেন। তাদের মতে, আদর্শ হওয়ার জন্য সগিরা গুনাহ থেকেও পবিত্র হওয়া জরুরি নয়। হ্যাঁ, তাদের কথা সঠিক হতো, যদি

---

১. তাফসিরে ইবনে আতিয়্যাহ (১/২১১)।
২. শরহে মুসলিম, নববি (৩/৫৪)।
৩. উমদাতুল কারি, আইনি (১৮/৯)।
৪. ফাতহুল বারি (১১/১০১)।
৫. ইমদাদুল ফাতাওয়া (৫/৪১২-৪১৩)।
৬. মাজমুউল ফাতাওয়া (৪/৩২১)।
৭. আল-ইহকাম, আমেদি (১/১৭১)।
৮. ইসমাতুল আম্বিয়া, রাজি (৪০)।

গুনাহ করার পরে তারা সেটার উপর অবিচল থাকতেন। তা হলে গুনাহের ক্ষেত্রেও তাদের আদর্শ হতে হতো। কিন্তু সেটা তো হচ্ছে না। বরং নবিগণ কোনো গুনাহ করে ফেললে দ্রুত তাওবা করে ফেলেন। সেটা বরং মুমিনদের জন্য আদর্শ। আর দ্বিতীয় যুক্তির জবাবে বলেন, সগিরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া মানুষের কামালতকে নষ্ট করে না; মানুষের মর্যাদা ও স্তরকে নিচু করে না; বরং অনেক সময় তাওবা মানুষের কামালতকে আরও বাড়িয়ে দেয়। কখনও কখনও গুনাহের মাধ্যমে মানুষ গুনাহের আগের অবস্থার চেয়ে আল্লাহর আরও বেশি কাছাকাছি চলে যেতে পারে তাওবা, ইস্তিগফার ও আমলের মাধ্যমে, যেমনটা আদম আলাইহিস সালামের সঙ্গেও হয়েছিল।[১]

মোট কথা দাঁড়াচ্ছে, **আম্বিয়ায়ে কেরাম সকল প্রকারের কুফর ও কবিরা গুনাহ থেকে পবিত্র। ওহি গ্রহণ ও তাবলিগের ক্ষেত্রে সব ধরনের ভুল-ত্রুটিমুক্ত। এক্ষেত্রে তারা ভুলে যান না, ভুল করেন না, বিচ্যুতির শিকার হন না। ফলে তাদের মূল দাওয়াতি মিশন তারা শতভাগ পূর্ণতার সঙ্গে আদায় করেন, ঠিক আল্লাহ যেভাবে চেয়েছেন। এমনইভাবে সগিরা গুনাহ, যেগুলো ব্যক্তিত্বের জন্য শোভনীয় নয়, তারা সেগুলো থেকেও পবিত্র।** কিন্তু লঘু পর্যায়ের সাধারণ সগিরা গুনাহ তাদের কাছ থেকে প্রকাশ পায় কি না এটা শুরু থেকেই মতভেদপূর্ণ বিষয়। একদল আলিম এক্ষেত্রে নবিদের মাসুম ভাবেন না, আরেকদল মাসুম ভাবেন। তৃতীয় আরেক দল এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেন এবং কোনো পক্ষেই কথা বলেন না। তাদের মতে, নবিদের কাছ থেকে সগিরা গুনাহ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু শরিয়তে সুস্পষ্টভাবে এ ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি, তাই চুপ থাকা উত্তম।[২] আমেদি বলেন, এ ব্যাপারে মতানৈক্যের অবস্থা এমনই যে, সুনিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়; বরং যা বলতে হবে স্রেফ অনুমান-নির্ভর বলতে হবে।[৩]

অধমের পর্যবেক্ষণ: উভয় দলের বক্তব্য পর্যবেক্ষণের পরে অধমের মনে হয়েছে, যারা নবিগণকে সগিরা গুনাহ থেকেও পবিত্র বলেছেন, তারা সগিরা গুনাহের নিচে (زلات/سهو) সামান্য ভুল-বিচ্যুতি ইত্যাদি হয়ে থাকতে পারে বলে মত দিয়েছেন, যেমনটা ইমাম আবু হানিফা রাহি.-এর কথাতে স্পষ্ট। তিনি নবিদের সগিরা, কবিরা-সহ সব ধরনের কুফর ও মানহানিকর বিষয় থেকে মাসুম বললেও তাদের **ভুল ও বিচ্যুতি**

---

১. মাজমুউল ফাতাওয়া (১০/৩০৯)।
২. শিফা, কাজি ইয়াজ (২/১৪৪)।
৩. আল-ইহকাম, আমেদি (১/১৭১)।

(زلات/خطايا) হয়ে থাকতে পারে বলেন।[1] একইভাবে ইমাম সদরুল ইসলাম বাজদাবির কথা দ্বারাও অভিন্ন বিষয় বুঝে আসে। তিনি বলেন, 'আম্বিয়াগণ ইচ্ছাকৃত কবিরা ও সগিরা সকল গুনাহ থেকে মুক্ত। **তবে ভুলে সংঘটিত বিচ্যুতি (জাল্লাত) থেকে মুক্ত নন।**'[2] খুব সম্ভবত সগিরা গুনাহ এবং এই সামান্য ভুল-বিচ্যুতির সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য থাকার ফলেই আলিমদের মাঝে এ মতবিরোধ তৈরি হয়েছে। ফলে কেউ ওটাকে সগিরা গুনাহ ধরেছেন। কেউ গুনাহ নয়, বরং সামান্য বিচ্যুতি কিংবা উত্তম-অনুত্তম ধরেছেন। তবে এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের সকল উলামায়ে কেরাম একমত যে, নবিগণ কোনো ধরনের সগিরা গুনাহ কিংবা ভুল-বিচ্যুতির উপরও অটল থাকেন না। ফলে এটা তাদের মর্যাদার জন্য ক্ষতিকর নয়।[3]

আরও একটি ব্যাপার এখানে উল্লেখযোগ্য; তা হলো, পাঠকের কাছে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে যে, ব্যাপারটি মতভেদপূর্ণ। ফলে কেবল আবেগ দিয়ে এটাকে বিচার করা ঠিক হবে না। কারণ, প্রত্যেক আবেগের বিষয় বাহ্যিকভাবে সুন্দর হলেও ভিতরে তেমন নাও হতে পারে। যেমন: ভ্রান্ত শিয়া সম্প্রদায় নবিদের কবিরা, সগিরা, ইচ্ছাকৃত/অনিচ্ছাকৃত সব ধরনের ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে মনে করে।[4] উৎসুক পাঠক জিজ্ঞাসা করতে পারেন, শিয়া সম্প্রদায় নবিদের এত শ্রদ্ধা করে কীভাবে? বাস্তবতা হলো, তারা নবিদের জন্য নয়, বরং তাদের ইমামদের জন্য এই নীতি অবলম্বন করেছে। কারণ, তারা ইমামদের মাসুম মনে করে। সুতরাং নবিদের ক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের ভুল সাব্যস্ত করতে গেলে তাদের মতাদর্শই ভেঙে পড়বে। তাই বিষয়গুলো আবেগ নয়, নস দিয়ে বুঝতে হবে।

ফলে আহলে সুন্নাতের কেউ যদি এগুলো নিয়ে গবেষণার পরে কোনো একটা মত বেছে নেয়, তাকে গোঁড়া কিংবা গোমরাহ কোনোটাই ভাবা উচিত হবে না। হ্যাঁ, যদি কেউ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে নবিদের খাটো করার চেষ্টা করে, কিংবা তাদের ভুল-ত্রুটি দেখানোর মিশনে নামে, বুঝতে হবে সে নিফাকের রোগে আক্রান্ত।

---

১. আল-ফিকহুল আকবার (৩৭)।
২. উসুলুদ্দিন, বাজদাবি (১৭২)।
৩. মিনহাজুস সুন্নাহ, ইবনে তাইমিয়া (১/৪৭২)।
৪. ইসমাতুল আম্বিয়া, রাজি (৪০)

আসমানি গ্রন্থসমূহের উপর ঈমান

পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে সকল উম্মতের কাছে অগণিত নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। তাদের অনেককে সেসব সম্প্রদায়ের জীবনবিধান হিসেবে গ্রন্থ দান করেছেন। আল্লাহ-প্রদত্ত সেসব আসমানি গ্রন্থে বিশ্বাস করা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন,

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ مَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ مَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ.

অর্থ: 'তোমরা বলো, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবিকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, সেসবের উপর। আমরা তাদের কারও মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আজ্ঞাবহ।' [বাকারা: ১৩৬] হাদিসে জিবরিলে এসেছে, জিবরিল আলাইহিস সালাম যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি উত্তরে বললেন, 'আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসুলগণ, শেষ দিবস এবং তাকদিরের ভালো-মন্দে বিশ্বাস করা।'[১] মূলত নবি-রাসুলদের প্রতি ঈমান আনার অন্যতম একটি শর্ত হচ্ছে তাদের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থগুলোতে ঈমান আনা। একটা অপরটার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কেউ যদি সামগ্রিকভাবে এসব গ্রন্থের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করে, এগুলোকে গালগল্প মনে করে, কিংবা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত আল্লাহর কোনো নবিকে প্রদত্ত বিশেষ কোনো কিতাবের কথা প্রত্যাখ্যান করে, তবে সে সংশ্লিষ্ট নবিকে/নবিদের অস্বীকার করল। আর এর ফলে সে কাফের হয়ে যাবে।

---

১. মুসলিম (৮); তিরমিজি (২৬১০); আবু দাউদ (৪৬৯৫)।

আসমানি গ্রন্থ কতগুলো? নবিদের সংখ্যার মতো আসমানি গ্রন্থের সংখ্যাও সন্দেহাতীতভাবে জানা যায় না। তবে অনুমান করা যায় যে, এসব গ্রন্থের সংখ্যা কম হবে না। কারণ, পৃথিবীর শুরু থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আল্লাহ সকল সম্প্রদায়ের ভিতরে অগণিত-অসংখ্য নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন এবং নিশ্চিতভাবেই তাদের অনেকের উপর তিনি ছোট-বড় অনেক গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং এসব গ্রন্থের সংখ্যা কম হবে না তা সহজেই অনুমেয়। তবে কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা বলে দেয়নি, যে কারণে এ ব্যাপারে অনুমানভিত্তিক কিছু বলার সুযোগ নেই; বরং সামগ্রিকভাবে সকল নবির উপর অবতীর্ণ গ্রন্থগুলোতে ইজমালি ঈমান রাখতে হবে। পাশাপাশি যেসব গ্রন্থের কথা কুরআন-সুন্নাহে এসেছে, সেগুলো সত্যায়ন করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা কিছু আসমানি পুস্তিকা (সুহুফ) ইবরাহিম আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ করেছেন, যেমনটা তিনি কুরআনে বলেন,

إِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُوْلٰى. صُحُفِ إِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى.

অর্থ: 'নিশ্চয়ই এগুলো রয়েছে পূর্বের পুস্তিকাগুলোতে। ইবরাহিম ও মুসার সুহুফে।' [আলা: ১৮-১৯] মুসা আলাইহিস সালামের উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّآ أَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ

অর্থ: আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি, যাতে ছিল হিদায়াত ও নুর।' [মায়িদা: ৪৪] তবে তাওরাত ছাড়াও কুরআনে মুসা আলাইহিস সালামের উপর কিছু সহিফা অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, যা পিছনে ইবরাহিমের সহিফার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি অন্য কিছু আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন: আল্লাহ বলেন,

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِيْ صُحُفِ مُوْسٰى

অর্থ: 'তাকে কি জানানো হয়নি যা রয়েছে মুসার সুহুফে?' [নাজম: ৩৬] তবে এই সহিফাগুলো তাওরাত থেকে ভিন্ন কিছু নাকি তাওরাতকেই সুহুফ নামে ডাকা হয়েছে এটা অস্পষ্ট। ফলে এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত কিছু বলা যাবে না। এক্ষেত্রে ইজমালি ঈমান রাখাই যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা দাউদ আলাইহিস সালামের উপর জাবুর (গ্রন্থ) অবতীর্ণ করেছেন। তিনি বলেন,

وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا

অর্থ: 'আর আমি দাউদকে জাবুর দান করেছি।' [নিসা: ১৬৩] আরেক আয়াতে বলেন,

وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا

অর্থ: 'আর আমি দাউদকে জাবুর দান করেছি।' [ইসরা: ৫৫] ঈসা আলাইহিস সালামকে দান করেছেন ইনজিল (সুসংবাদ)। আল্লাহ বলেন,

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ.

অর্থ: 'আর আমি তাদের পরে ঈসা ইবনে মারইয়ামকে প্রেরণ করেছি। তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। আমি তাঁকে ইনজিল দান করেছি, যাতে ছিল সুপথ ও আলো, আর যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ তাওরাতের সত্যায়ন করে, আর যা ছিল খোদাভীরুদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ।'। [মায়িদা: ৪৬] সর্বশেষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন পবিত্র কুরআন। আল্লাহ বলেন,

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ.

অর্থ: 'বিশ্বস্ত ফেরেশতা এটা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে; আপনার অন্তরে; যাতে আপনি সতর্ককারীদের একজন হন; সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়। নিশ্চয়ই পূর্ববর্তী গ্রন্থে এর কথা এসেছে। [শুআরা: ১৯৩-১৯৬]

একটি হাদিসের মাধ্যমে বোঝা যায়, সকল আসমানি কিতাব রমজান মাসে নাজিল হয়েছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সহিফাগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল রমজানের প্রথম রাতে। তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছিল ষষ্ঠ তারিখ দিবাগত রাতে। ইনজিল অবতীর্ণ হয়েছিল তেরো তারিখ দিবাগত রাতে। জাবুর অবতীর্ণ হয়েছিল আঠারো তারিখ দিবাগত রাতে। কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল চব্বিশ তারিখ দিবাগত রাতে (অর্থাৎ পঁচিশতম রাতে)।[১]

এর বাইরে আর কোনো আসমানি কিতাবের কথা আমরা জানি না। হ্যাঁ, কিছু হাদিসে এসেছে, যেখানে আসমানি গ্রন্থের সংখ্যা ১০৪ খানা বলা হয়েছে।[২] কোনো

---

১. মুসনাদে আহমদ (১৭২৫৮); ইবনে আবি শাইবা (৩০৮১৪); আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (১৮৫)।
২. সহিহ ইবনে হিব্বান (৩৬১)।

কোনো গ্রন্থে এটা হাসান বসরির বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১] কিন্তু এসব বর্ণনার বিশুদ্ধতা নিয়ে মুহাদ্দিসদের আপত্তি রয়েছে। তথাপি আর কোনো আসমানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যাক বা না যাক, যেগুলোর সন্ধান পাওয়া গেছে, সেগুলোও অবিকৃত নয়, যেমনটা পূর্বে বলা হয়েছে। কারণ, আল্লাহ এসব কিতাব সংরক্ষণের দায়িত্ব নেননি। আল্লাহ কুরআন সম্পর্কে বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

অর্থ: 'নিশ্চয় আমি এই উপদেশগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি আর আমি এর সংরক্ষণকারী।' [হিজর: ৯] বিপরীতে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন,

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ.

অর্থ: 'অতএব, তাদের জন্য আফসোস যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব, তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ তাদের উপার্জনের জন্য।' [বাকারা: ৭৯] আরেক জায়গায় বলেন,

أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.

অর্থ: 'তোমরা কি আশা করো যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? অথচ তাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত অতঃপর বুঝেশুনে তা বিকৃত করে দিত এবং তারা তা অবগত ছিল।' [বাকারা: ৭৫] আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا.

অর্থ: 'তারা আল্লাহকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি, যখন তারা বলেছিল, আল্লাহ কোনো মানুষের প্রতি কিছু অবতীর্ণ করেননি। আপনি জিজ্ঞেস করুন ওই গ্রন্থ কে নাজিল করেছে যা মুসা নিয়ে এসেছিলেন আলো ও মানুষের হিদায়াতস্বরূপ, যা

---

১. সুনানে কুবরা, বাইহাকি (১৮৭২১)।

তোমরা বিভিন্ন খাতাপত্রে রেখে লোকদের জন্য প্রকাশ করছ এবং অনেক কিছু গোপন করছ...' [আনআম: ৯১]

কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে তুলনামূলক পর্যালোচনা করলেও সেসব গ্রন্থের বিকৃতি সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। কুরআনে বলা হয়েছে, এটার কথা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে। [শুআরা: ১৯৬] অথচ আজকের ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের গ্রন্থে এর কোনো উল্লেখ নেই। একইভাবে কুরআনে ঈসা আলাইহিস সালামের কণ্ঠে বলা হয়েছে, তিনি বনি ইসরাইলকে একেবারে নাম-সহ আমাদের রাসুলের আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ اِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ مُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ.

অর্থ: 'স্মরণ করুন যখন ঈসা ইবনে মারইয়াম বলেন, হে ইসরাইলের সন্তানগন, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসুল, আমার পূর্ববর্তী তওরাতের সত্যায়নকারী এবং এমন একজন রাসুলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম হবে আহমদ। অতঃপর যখন তিনি স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করলেন, তখন তারা বলল, এ তো প্রকাশ্য জাদু।' [সফ:৬] অথচ আধুনিক বাইবেলে (নতুন নিয়মে) সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুপস্থিত। যদিও কোনো কোনো মুসলিম গবেষক বাইবেলে রাসুলের নাম আবিষ্কারের দাবি করেছেন, কিন্তু সেগুলো তর্কাতীত ও সন্দেহাতীত নয়। তবে শুধু এগুলোই নয়; স্বয়ং তাদের বিভিন্ন পবিত্র গ্রন্থ এসব বিকৃতির সাক্ষ্য দেয়। গত শতাব্দ থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত অনেক পশ্চিমা গবেষক বাইবেলে বিদ্যমান বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক ভুল, অসঙ্গতি, বর্ণনার বৈপরীত্য, অন্য ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে ঋণ, সংযোজন ও বিয়োজনের কথা স্বীকার করেছেন। ফলে বিষয়টিতে লুকোছাপা নেই।[১]

কেন কুরআনকে সংরক্ষিত করা হয়েছে আর অন্যগুলোকে বিকৃতির সুযোগ দেওয়া হয়েছে, অথচ সবগুলোই আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী? এর উত্তর হলো, কুরআনকে কিয়ামত পর্যন্ত গোটা বিশ্বজগতের হিদায়াত ও জীবনবিধান হিসেবে মনোনীত করা

---

১. বিস্তারিত দেখুন: মরিস বুকাইলির বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান। নাইমা ইদরিসের 'আজমাতুল মাসিহিয়্যাহ বাইনান নাকদিত তারিখি ওয়াত তাতাওউরিল ইলমি'। আবদুর রাজি কৃত 'আল-মুতাকাদাতুদ দিনিয়্যাহ লাদাল গারব'।

হয়েছে। ফলে তা সবসময় সুসংরক্ষিত থাকা আবশ্যক। অপরদিকে আগের আসমানি গ্রন্থগুলো নির্ধারিত ভূখণ্ডের নির্ধারিত সম্প্রদায়ের কাছে নির্ধারিত সময়ের জন্য জীবনবিধান হিসেবে অবতীর্ণ করা হয়েছিল। ফলে তা সুরক্ষিত থাকা আবশ্যক নয়। বরং সেগুলো সুরক্ষিত থাকা আল্লাহর উদ্দেশ্য ও শৃঙ্খলা এবং সেসব ধর্মের মূল মেজাজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ, সেসব ধর্ম (শরিয়ত) সাময়িক ছিল। ইসলাম এসে সেগুলোকে রহিত করে দেওয়ার অপেক্ষায় ছিল। সুতরাং সেসব গ্রন্থ যদি সংরক্ষণ করা হয়, তবে সেগুলো পরবর্তী উম্মতের জন্য ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তারা ইসলাম বাদ দিয়ে সেগুলোতে ঝুলে থাকবে। আর এ কারণে দেখা যায়, বিকৃত হওয়ার পরেও আজ সেসব গ্রন্থের অনুসারীরা বিকৃত গ্রন্থগুলোই আঁকড়ে ধরে আছে।

আসমানি গ্রন্থসমূহে ঈমান আনার স্বরূপ: একজন মুসলিমকে সকল আসমানি গ্রন্থে ঈমান আনতে হবে। তবে সকল গ্রন্থের ব্যাপারে ঈমান একই স্তরের নয়। কারণ, আমরা সবার গ্রন্থের ব্যাপারে জানি না। কুরআন-সুন্নাহে মাত্র কয়েকটা গ্রন্থের বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন: মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাওরাত দিয়েছেন; দাউদ আলাইহিস সালামকে জাবুর দিয়েছেন; ঈসা আলাইহিস সালামকে ইনজিল দিয়েছেন; মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন দিয়েছেন। এই চারটি গ্রন্থ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এর বাইরে আরও কিছু নবিকে গ্রন্থ দেওয়ার কথা রয়েছে। যেমন: মুসা আলাইহিস সালাম ও ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সুহুফ (পস্তিকাসমূহ)। সবগুলোর উপর ঈমান আনতে হবে।

এক্ষেত্রে ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা অনেক নবির উপর অনেক কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আমরা সেসব কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্বাস করি। এটুকু সংক্ষিপ্ত ঈমান যথেষ্ট। সেসব কিতাবের বিস্তারিত বিষয়বস্তুর উপর ঈমান আনা প্রয়োজন নেই বরং সুযোগই নেই। কারণ, সেগুলো আমরা জানি না। সেসব কিতাবের মাঝ থেকে যেগুলো আজও বিদ্যমান রয়েছে এবং অভিন্ন শিরোনাম বহন করছে, সেগুলোকে আসমানি গ্রন্থ বলার সুযোগ নেই, যেমন ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের গ্রন্থগুলো। আল্লাহ তায়ালা এগুলো সংরক্ষণের দায়িত্ব নেননি। ফলে এগুলো সংরক্ষিত থাকেনি, যা উপরে বিস্তারিত সপ্রমাণ বলা হয়েছে। সুতরাং তাওরাত (বাইবেলের পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচ পুস্তক), জাবুর (পুরাতন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত) ও ইনজিল (নতুন নিয়মের প্রথম চার পুস্তক) নামে বাজারে যেসব বই প্রচলিত রয়েছে, সেগুলোকে আল্লাহর বাণী মনে করার কোনো সুযোগ নেই; বরং ওগুলো মানুষের লেখা। হ্যাঁ,

অসম্ভব নয় যে, তাতে দু-একটি সত্য বাক্য ও আল্লাহর ওহি থাকতে পারে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে ওগুলো মানবরচিত গ্রন্থ। তাই আমরা যখন তাওরাত, জাবুর ও ইনজিলের উপর ঈমানের কথা বলি, তখন ইহুদি-খ্রিষ্টানদের হাতে থাকা প্রচলিত বাইবেল উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহ মুসা, দাউদ ও ঈসা আলাইহিস সালামের উপর যে তাওরাত, জাবুর ও ইনজিল অবতীর্ণ করেছিলেন সেগুলো উদ্দেশ্য। তাদের হাতে বিদ্যমান গ্রন্থগুলোর ব্যাপারে আমাদের তিনটি কর্মপদ্ধতি হবে। এক. যেগুলো কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, সেগুলো গ্রহণ করব। দুই. যেগুলো কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে, সেগুলো প্রত্যাখ্যান করব। তিন. এর বাইরে যেসব ঘটনা, বিবরণ ইত্যাদি থাকবে, সে ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর মতো আমরাও নীরব থাকব। সত্য বলব না, মিথ্যাও বলব না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের আহলে কিতাবরা যা বলে, সেগুলো সত্য হিসেবে গ্রহণ করো না, মিথ্যা প্রতিপন্নও করো না; বরং বলো, আমরা আল্লাহর ফেরেশতা, কিতাব এবং রাসুলদের উপর ঈমান এনেছি। তা হলে তাদের কথা যদি সত্য হয়, সেটা তোমরা মিথ্যা বললে না; আর যদি মিথ্যা হয়, সেটা সত্য বললে না...।'[১]

বেদ ও ত্রিপিটক কি আসমানি কিতাব? একইভাবে এগুলোর বাইরে যেসব গ্রন্থ সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহে কোনো বর্ণনা নেই, অথচ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে সেগুলো আসমানি কিংবা পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত সেগুলোকেও আসমানি গ্রন্থ বলা যাবে না। যেমন: বৌদ্ধ ধর্মের 'ত্রিপিটক', হিন্দুদের 'বেদ', পারসি ধর্মের 'জিন্দাবেস্তা' ইত্যাদি। অথবা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মে বিদ্যমান অন্যান্য নবির নামে প্রচলিত গ্রন্থ। এগুলোকে আসমানি গ্রন্থ বলার সুযোগ নেই। এমনকি যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, ওগুলো মূলত একসময় আসমানি গ্রন্থ ছিল, বিশেষত হিন্দুধর্মের কিছু প্রাচীন গ্রন্থ, যেখানে তাওহিদের কথা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-সম্পর্কিত সুসংবাদ রয়েছে, তথাপি সেগুলো অক্ষত থাকেনি; বরং বিকৃতির শিকার হয়েছে। তাই ত্রিপিটক, বেদ-পুরাণে কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো কথা পাওয়া গেলেই বিনা প্রমাণে ওগুলোকে আসমানি গ্রন্থ বলা যাবে না। আমরা সকল নবি-রাসুলের উপর অবতীর্ণ সকল গ্রন্থে সাধারণভাবে বিশ্বাস রাখি। সেখানে বেদ-বাইবেল থাকতে পারে; কিন্তু আছে কি না সেটা আমাদের কাছে অজ্ঞাত।

---

১. সহিহ ইবনে হিব্বান ৬২৫৭); মুসনাদে আহমদ (১৭৪৯৮)।

অন্যান্য আসমানি গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত ঈমান আনা যথেষ্ট। কিন্তু কুরআনের ক্ষেত্রে সবিস্তার ঈমান আনতে হবে। যেমন: কুরআন আল্লাহর কালাম। সব ধরনের বিকৃতি ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন মুক্ত। আল্লাহ তায়ালা একে সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন [হিজর: ৯]। পক্ষান্তরে আগের কিতাবগুলো সেই ধর্মের অনুসারীদের সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছিল। [মায়িদা: ৪৪] ফলে সেগুলো বিকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু কুরআন অপরিবর্তিত। এখনও আমাদের সামনে বিদ্যমান কুরআন হুবহু সেই কুরআন, যা আল্লাহর রাসুলের কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল, যা লাওহে মাহফুজে লিখিত আছে। একটা বাক্য, শব্দ বা অক্ষরে পরিবর্তন ঘটেনি। এই কুরআন পৃথিবীর সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ। এর মাঝে বিদ্যমান সকল আদেশ-নিষেধ কিয়ামত পর্যন্ত গোটা মানবজাতির পূর্ণাঙ্গ ও একমাত্র জীবন-সংবিধান। আর এ কারণেই অন্য সকল আসমানি গ্রন্থে আল্লাহ তায়ালা যা-কিছু অবতীর্ণ করেছেন কুরআনে সবগুলোর নির্যাস রয়েছে। উপরন্তু এমন অনেককিছু রয়েছে, যা আগের গ্রন্থগুলোতে ছিল না। ফলে কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত গোটা মানবজাতির জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন:

وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ.

অর্থ: 'আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী, সেগুলোতে যা আছে তা ধারণকারী এবং অতিরিক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্তকারী।' [মায়িদা: ৪৮] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমাকে তাওরাতের পরিবর্তে সাতটি সুরা দেওয়া হয়েছে (প্রথম সাতটি সুরা: বাকারা থেকে আনফাল+তাওবা)। আর জাবুরের পরিবর্তে আমাকে দেওয়া হয়েছে 'মিয়িন' (তথা যেসব সুরাতে শতাধিক আয়াত রয়েছে: ইউনুস থেকে হুজুরাত অথবা কাফ পর্যন্ত)। আর ইনজিলের পরিবর্তে আমাকে দেওয়া হয়েছে মাসানি (ফাতিহা বা মিয়িনের চেয়ে ছোট সুরা)। আর 'মুফাসসাল' (হুজুরাত থেকে নাস পর্যন্ত) আমাকে অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছে।'[১]

পূর্বের আসমানি গ্রন্থগুলোতে ঈমান একজন মুসলিমকে ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে প্রশান্তি ও তৃপ্তি জোগায়। সে অনুভব করে, সে যে দ্বীনের অনুসরণ করছে সেটা কোনো নতুন ধর্ম নয়, বরং জগতের শুরু থেকে পৃথিবীর অসংখ্য নবি-রাসুল, অগণিত সম্প্রদায় এই দ্বীনের উপর ছিল। পাশাপাশি ইসলামকে অন্য ধর্মাবলম্বী জ্ঞানী লোকদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। তারা এগুলো পড়ার মাধ্যমে জানতে পারে,

---

১. মুসনাদে আহমদ (১৭২৫৬); আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (১৮৭)।

ইসলাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তৈরি করা ধর্ম নয়; বরং জগতের সকল মহাপুরুষ যে ধর্ম প্রচার করেছেন, ইসলাম সেটারই বর্ধিত ও সর্বশেষ রূপ।

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পড়ার বিধান: অন্য ধর্মের গ্রন্থ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ইসলাম বিশেষ কোনো মূলনীতি বেঁধে দেয়নি। বরং যে কোনো সাধারণ গ্রন্থ পড়ার ক্ষেত্রে যে মূলনীতি, এখানেও সেটা প্রযোজ্য। সাধারণ গ্রন্থ পড়ার ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি হলো, ভালো বিষয়বস্তুর বই পড়া যাবে, মন্দ বিষয়বস্তুর বই পড়া যাবে না। যেহেতু পৃথিবীতে শিরকের চেয়ে মন্দ কিছু নেই; আর ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে প্রচলিত সেসব গ্রন্থে যেহেতু প্রচুর শিরকি কথা-বার্তা বিদ্যমান, তাই ওগুলো এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভালো বিষয়বস্তুর বই নয়। ফলে ওগুলো পড়াও উচিত নয়। বিশেষত সাধারণ মানুষের ওসব গ্রন্থ পড়ে বিভ্রান্ত হওয়ার উচ্চ ঝুঁকি থাকে। উপরন্তু জ্ঞানের জন্য ওগুলোর চেয়ে ভালো বই আছে। দুঃখজনকভাবে তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত অনেক মুসলিম দাবিদার নিয়মিত স্রেফ কৌতূহল কিংবা স্টাইল হিসেবে বেদ-বাইবেল পড়েন, কিন্তু কুরআন খুলে দেখার সুযোগ পান না। এটা সুস্পষ্ট গোমরাহি ও দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর ইবনুল খাত্তাবের হাতে ইহুদিদের কিতাবের কিছু অংশ দেখে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হন, তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং এগুলো পড়তে বারণ করে দেন।[১] তা হলে সাধারণ মানুষ এগুলো পড়তে পারে কী করে? ইবনে আব্বাসও আহলে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গ্রন্থ পড়া কিংবা তাদের কাছে ধর্মীয় বিষয় জানতে চাওয়া কঠোরভাবে বারণ করতেন।[২]

হ্যাঁ, আলিম ও দাঈগণ দাওয়াতের উদ্দেশ্যে, খণ্ডনের উদ্দেশ্যে, সেসব গ্রন্থের অনুসারীদের সামনে সেগুলোর বাস্তবতা তুলে ধরে তাদের কুরআনের দিকে আহ্বানের লক্ষ্যে সেগুলো পড়তে পারেন, অধ্যয়ন করতে পারেন, গবেষণা করতে পারেন। তবে এর আগে কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন এবং নিজের ঈমানের উপর ব্যাপক আস্থা তৈরি করে তবেই শুরু করা যেতে পারে। পাশাপাশি দিনরাত সেগুলো নিয়ে পড়ে থাকলে ঈমানের ক্ষতি হতে পারে। তাই কুরআন-সুন্নাহকে মূল রেখে প্রয়োজন অনুপাতে দেখার সুযোগ থাকবে।[৩]

---

১. মুসনাদে আহমদ (১৫৩৮৮); মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (২৬৯৪৯)।
২. বুখারি (২৬৮৫, ৭৩৬৩)।
৩. দেখুন: ফাতহুল বারি, ইবনে হাজার (১৩/৫২৫)।

وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ، مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَرِفِينَ، وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَهُ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ غَيْرَ مُنْكِرِينَ.

আমরা আমাদের কিবলার অনুসারীদের ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম-মুমিন হিসেবে আখ্যায়িত করব, যতক্ষণ তারা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত সকল বিষয়ের স্বীকৃতি দেবে, তাঁর সকল বক্তব্য ও সংবাদকে সত্যায়ন করবে।

ব্যাখ্যা
ঈমান-কুফর-তাকফির

গুনাহগার মুসলিমের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাতের ভারসাম্যপূর্ণ আকিদা: ইমাম তহাবির উক্ত আলোচনা মূলত গুনাহগার মুসলমানের ক্ষেত্রে আমাদের আকিদা কী হবে সে ব্যাপারে। এটা সেই প্রাচীন মাসআলা, যাকে কেন্দ্র করে প্রথম যুগ থেকেই বিতর্ক তৈরি হয়েছে এবং বেশ কিছু সম্প্রদায় এতে প্রান্তিকতার শিকার হয়ে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে।

এদের মাঝে সর্বপ্রথম **খারেজি সম্প্রদায়**-এর নাম উল্লেখ করা যায়। তারা মনে করত, যে ব্যক্তি কবিরা গুনাহে লিপ্ত হবে, সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। দুনিয়াতে কাফের গণ্য হবে এবং পরকালে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের অধিবাসী হবে। অতঃপর আসে **মুতাজিলা সম্প্রদায়**। তারা কিছু ক্ষেত্রে খারেজিদের থেকে সামান্য ভিন্ন মতামত দিলো, কিন্তু মূলনীতিতে তাদের সঙ্গেই থাকল। তারা বলল, যে ব্যক্তি কবিরা গুনাহে লিপ্ত হবে, সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে, কিন্তু কুফরের মাঝে প্রবেশ করবে না। অর্থাৎ মুসলিম থাকবে না আবার কাফেরও হবে না; বরং ইসলাম এবং কুফরের মাঝামাঝি অবস্থানে থাকবে। আর যদি কবিরা গুনাহের উপরে মৃত্যুবরণ করে, তবে এক্ষেত্রে মুতাজিলাদের মতামত খারেজিদের মতোই, অর্থাৎ সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে।[১]

---

১. ইবনে আবিল ইজ (২৯৮-২৯৯)।

তাদের এই মতাদর্শ গ্রহণের কারণ হলো, তারা কুরআনে বিদ্যমান জাহান্নাম, শাস্তি ও ভীতিপ্রদর্শন-সংক্রান্ত আয়াতগুলোর ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনের শিকার হয়েছে। ফলে আল্লাহর অনুগ্রহের আশা থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অথচ তাদের এই মতাদর্শ সর্বৈব ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। খোদ কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا.

অর্থ: 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না যে তাঁর সাথে শরিক করে। এতদ্ব্যতীত সকল পাপ তিনি ক্ষমা করে দেন, যার জন্য ইচ্ছা করেন। আর যে লোক আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করল, সে যেন (তাঁর উপর) ভয়ংকর অপবাদ আরোপ করল।' [নিসা: ৪৮] এখানে স্পষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালা শিরক ব্যতীত যেকোনো অপরাধ চাইলে তাওবা ছাড়াও ক্ষমা করে দিতে পারেন। কারণ, তাওবা করলে শিরক থেকেও ক্ষমা পাওয়া যাবে। তা ছাড়া কুরআনে আল্লাহ তায়ালা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদেরও মুমিন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ.

অর্থ: 'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠ তাওবা করো। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন আর তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন...'। [তাহরিম: ৮] এখানে আল্লাহ গুনাহগারদের মুমিন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। একইভাবে স্বেচ্ছায় মানুষ হত্যার মতো জঘন্য অপরাধে জড়িত ব্যক্তিকেও মুমিন আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ

অর্থ: 'হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর নিহতদের ব্যাপারে কিসাস ফরজ করা হয়েছে। [বাকারা: ১৭৮] মুমিনদের পরস্পর বিবাদ গুনাহের কাজ। আল্লাহ তায়ালা তাদেরও মুমিন হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ

অর্থ: 'আর যদি মুমিনদের দুটো দল হানাহানিতে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদের মাঝে মীমাংসা করে দাও...।' [হুজুরাত: ৯]

হাদিসে বিষয়টি আরও স্পষ্ট। উবাদা ইবনুস সামিত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহর কাছে ছিলাম। তিনি বললেন, 'তোমরা আমার কাছে এই মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করছ যে, তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কোনোকিছু শরিক করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না; অন্যায়ভাবে কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করবে না... অতঃপর বললেন, তোমাদের যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, আল্লাহর কাছে সে এর প্রতিদান পাবে। আর যে এগুলোর মাঝে কোনো অন্যায়ে লিপ্ত হবে এবং পৃথিবীতে তার শাস্তি হয়ে যাবে, তা হলে সে শাস্তি কাফফারা হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি কেউ অন্যায় করে এবং আল্লাহ তায়ালা সেটা ঢেকে রাখেন, সেটার ফয়সালা আল্লাহর হাতে থাকবে। চাইলে তিনি শাস্তি দেবেন, চাইলে ক্ষমা করে করবেন।'[১]

রাসুলের যুগে আবদুল্লাহ নামে একজন সাহাবি ছিলেন। তাকে মদ্যপানের অভিযোগে বেশ কয়েকবার শাস্তি দেওয়া হয়। একবার শাস্তি দেওয়ার জন্য তাকে আল্লাহর রাসুলের সামনে নিয়ে আসা হলে কেউ একজন বলল, তার উপর আল্লাহর অভিশাপ। তাকে কতবার শাস্তি দেওয়া লাগে! নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা তাকে অভিসম্পাত করো না। আল্লাহর শপথ, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসে।'[২] মদ্যপান হারাম ও কবিরা গুনাহ। উক্ত হাদিসে কবিরা গুনাহকারী এই ব্যক্তিকে কাফের তো বলাই হয়নি; বরং বলা হয়েছে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসে। এর দ্বারা খারেজি সম্প্রদায়ের ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়।

তাদের ভ্রান্তির আরও একটি কারণ হচ্ছে, কুরআন-হাদিসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা, প্রকৃত মর্ম অনুধাবন না করা। সালাফের বুঝে সেগুলো না বুঝে নিজেদের বুঝে বোঝা। কারণ, কুরআন ও সুন্নাহে কিছু কাজের উপর 'কুফর' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। তারা সেগুলো বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করেছে, অথচ সেক্ষেত্রে বাহ্যিক অর্থ উদ্দিষ্ট নয়; অথবা নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে উদ্দিষ্ট। কিন্তু তারা সেগুলো উন্মুক্তভাবে গ্রহণ করেছে। ফলে তারা মুসলমানদের গুনাহের কারণে কাফের বলা শুরু করেছে। যেমন: কুরআনে আল্লাহ বলেছেন:

---

১. বুখারি (৪৮৯৪); মুসলিম (১৭০৯)।
২. বুখারি (৬৭৮০)।

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

অর্থ: 'আর যারা আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাসন করে না তারা কাফের।' [মায়িদা: ৪৪] একাধিক হাদিসে মুসলমানকে হত্যা করা কুফর বলা হয়েছে।[১] আরেকটি হাদিসে কাউকে কাফের বলে ডাকাকে কুফর বলা হয়েছে।[২] মিথ্যা বলা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, গাদ্দারি করা ও গালি দেওয়াকে প্রকৃত মুনাফিকি বলা হয়েছে।[৩] জিনা, চুরি ও মদ্যপান করার সময় কেউ মুমিন থাকে না বলা হয়েছে।[৪] নামাজ পরিত্যাগকারীকে কাফের বলা হয়েছে।[৫] গণকের কাছে গমন, স্ত্রীর পশ্চাদ্দেশে সহবাস করাকে কুফর সাব্যস্ত করা হয়েছে।[৬] আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে শপথ করাকে কুফর বলা হয়েছে।[৭] কারও বংশ তুলে অপবাদ দেওয়াকে, মৃত ব্যক্তির উপর কাঁদাকে কুফর বলা হয়েছে।[৮]

তারা এসব আয়াত ও হাদিসকে বাহ্যিক অর্থে বুঝেছে। অথচ আহলে সুন্নাতের সকল ইমামের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী, এসব নুসুসকে বাহ্যিক অর্থে কিংবা শর্তহীনভাবে বোঝা যাবে না। কুরআনের অন্যান্য আয়াত ও হাদিস দেখলেই এ কথা বুঝে আসে। যদি এসব গুনাহ কুফর হতো, তবে তাতে লিপ্ত ব্যক্তি মুরতাদ হিসেবে গণ্য হতো এবং তার শাস্তি হতো হত্যা। অন্যান্য শাস্তির বিধান রাখা হতো না। অথচ আমরা দেখতে পাই, উপরের অনেক অপরাধ (যেমন মদ্যপান, ব্যভিচার) ইত্যাদির জন্য ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি রাখা হয়েছে। তা ছাড়া অনেকগুলোর কোনো ফৌজদারি শাস্তিই নেই। একইভাবে যারা আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাসন করে না, কুরআনের তিনটি আয়াতে একবার তাদের জালেম বলা হয়েছে, একবার ফাসেক বলা হয়েছে, আরেকবার কাফের বলা হয়েছে। প্রত্যেকটির প্রয়োগক্ষেত্র ভিন্ন। নির্ধারিত কিছু পরিস্থিতিতে এমন লোক জালেম ও ফাসেক বিবেচিত হবে, কিছু অবস্থাতে কাফের বিবেচিত হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি বিষয় ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। ফলে কুফর শব্দ দেখেই মুসলমানদের কাফের বানিয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই।[৯]

---

১. বুখারি (৪৮, ৭০৭৬); মুসলিম (৬৪)।
২. বুখারি (৬১০৩); মুসলিম (৬০)।
৩. বুখারি (৩৪); ইবনে হিব্বান (২৫৪)।
৪. বুখারি (২৪৭৫); মুসলিম (৫৭)।
৫. তিরমিজি (২৬২১); ইবনে মাজা (১০৭৯)।
৬. তিরমিজি (১৩৫); মুসনাদে দারেমি (১১৭৬)।
৭. তিরমিজি (১৫৩৫); আবু দাউদ (৩২৫১); মুসতাদরাকে হাকেম (৪৬)।
৮. মুসলিম (৬৭); মুসনাদে আহমদ (১০৫৭৮)।
৯. মুসলিম (৬৭); মুসনাদে আহমদ (১০৫৭৮)।

খারেজি ও মুতাজিলাদের প্রান্তিকতার বিপরীতে মুসলমানদের মাঝে আরেকটি প্রান্তিক সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তারা ছিল **মুরজিয়া সম্প্রদায়**। তাদের মতাদর্শ ছিল, কেউ ঈমান আনার পরে কুফর বাদে যত গুনাহে লিপ্ত হোক, তাতে কিছুই হবে না; বরং সে পরিপূর্ণ মুমিন থেকে যাবে। যত গুনাহ করুক, যত অন্যায় ও অপরাধে জড়াক, মুখ থেকে কোনো কুফরি বাক্য উচ্চারণ না করলেই হবে। এতে সে পূর্ণ ঈমানদার থাকবে। তাঁর ঈমান ফেরেশতাদের ঈমানের মতো পূর্ণাঙ্গ থাকবে। অথচ এটা ভ্রান্ত আকিদা।

তাদের এই মতাদর্শ গ্রহণের কারণ হলো, তারা কুরআনে বর্ণিত জান্নাত ও আশার আয়াতগুলোর ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনের শিকার হয়েছে। ফলে আল্লাহর ক্রোধকে না দেখে কেবল তার অনুগ্রহের উপর ভরসা করে বসে রয়েছে। সাহাবাদেরও কেউ কেউ এক্ষেত্রে বিচ্যুতির শিকার হয়েছিলেন। যেমন: কুদামা ইবনে মাজউন রাজি.। তিনি মদ হারাম হওয়ার পরেও পান করেছিলেন। তিনি কুরআনের এই আয়াত দিয়ে দলিল দিতেন,

لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْۤا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّ اَحْسَنُوْا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

অর্থ: 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে, সে জন্য তাদের কোনো গুনাহ নেই, যদি ভবিষ্যতের জন্য সংযত হয়, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে। এরপর সংযত থাকে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে। এরপর সংযত থাকে এবং সৎকর্ম করে। আল্লাহ সৎকর্মীদের ভালোবাসেন।'। [মায়িদা: ৯৩] তিনি আয়াতের অর্থ ভুল বুঝেছিলেন। আয়াতে মূলত মদ্যপান হারাম হওয়ার আগে যেসব সাহাবি মদ্যপান করে নিষেধাজ্ঞা আসার আগেই ইন্তেকাল করেছেন, তাদের বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা যেহেতু নিষেধাজ্ঞা আসার আগেই ওফাত লাভ করেছেন, সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে তাওবার প্রয়োজন নেই এবং সেই মদ্যপান তাদের গুনাহের কারণ হবে না। কারণ, তাদেরটা অন্যায়ই হয়নি। কিন্তু সাহাবি কুদামা মনে করেছিলেন এটা জীবিতদের জন্যও প্রযোজ্য। ফলে তিনি এবং আবু জানদাল ইবনে সুহাইল-সহ আরও কয়েকজন উক্ত আয়াতের দলিল দিয়ে মদ্যপান হালাল মনে করেছিলেন। উমর ইবনুল খাত্তাব, আলি ইবনে আবি তালিব-সহ অন্য বিজ্ঞ সাহাবায়ে কেরাম তাদের শাস্তি দেন, ভুল ধরিয়ে দেন এবং কঠোরভাবে সতর্ক করেন।

উক্ত বর্ণনাটি আনার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, কোনো কোনো সাহাবি মুরজিয়া ছিলেন, নাউজুবিল্লাহ। উদ্দেশ্য এটা দেখানো যে, কুরআনের সকল আয়াত একত্র না করে কেবল একটা আয়াত দিয়ে দলিল দিলে সেটা অধিকাংশ সময়ই সঠিক হয় না। ফলে কয়েকজন সাহাবিও এত বড় ভুল করে ফেলেছেন। এক্ষেত্রে অন্যদের ব্যাপারে ভুলের আশঙ্কা যে কত বেশি, তা বলা বাহুল্য। ফলে কুরআনে আশা ও সুসংবাদের কোনো আয়াত দেখলেই খুশিতে বাগবাগ হয়ে সেটা নিজের মতাদর্শের বিশুদ্ধতা প্রমাণে ব্যবহার করা যথাযথ হবে না। এক্ষেত্রে মুরজিয়ারা সে কাজটাই করেছে। পাশাপাশি উক্ত হাদিস খারেজিদের বিরুদ্ধেও দলিল। কারণ, এই ক-জন লোক মদ্যপান করার পরেও কোনো সাহাবি তাদের কাফের আখ্যা দেননি।[১]

হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাজি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উম্মতে মুহাম্মাদির মাঝে দুটো সম্প্রদায়ের কথা জানি, যারা জাহান্নামে যাবে। একটি সম্প্রদায় যারা বলবে, আমাদের পূর্বের লোকজন মূর্খ ছিল। তারা দিনেরাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কেন পড়ত? অথচ নামাজ হচ্ছে মাত্র দুই ওয়াক্ত আসর ও ফজর। দ্বিতীয় সম্প্রদায় যারা বলবে, ঈমান হচ্ছে কেবল মুখের স্বীকারোক্তি। এরপরে সে ব্যভিচার করুক, হত্যা করুক (তাতে কিছু যায় আসে না)।[২]

আহলে সুন্নাত এই দুই প্রান্তিকতার মাঝামাঝি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি লালন করেন। তারা কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের ইসলাম থেকে বের করে দেন না, কাফের ঘোষণা করেন না। একইভাবে একথাও বলেন না যে, গুনাহ মানুষের ঈমানের কোনো ক্ষতি করে না। বরং আহলে সুন্নাতের মতে, গুনাহ মানুষের ঈমান দুর্বল করে দেয়। গুনাহে অব্যাহত থাকলে একসময় মানুষ কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে। দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় মৃত্যু হতে পারে।

সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি রাসুলুল্লাহর নিয়ে আসা কুরআন ও সুন্নাহে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, এগুলোতে যা এসেছে সবকিছুকে সত্য বলে মানে, নামাজ-রোজা ও ইসলামের অন্যান্য বিধান পালন করে, এরপর কোনো ধরনের গুনাহে লিপ্ত হয়, সেটা যত বড় গুনাহই হোক না কেন, তাকে আমরা ইসলাম থেকে বের করে দেবো না। হ্যাঁ, যদি দ্বীনের মৌলিক কোনো বিষয় যা প্রত্যেক মুমিনের জন্য বিশ্বাস করা অপরিহার্য,

১. আল-মুগনি, ইবনে কুদামা (৯/১২); আল-ইসাবা, ইবনে হাজার (৯/৪০-৪১); ইবনে আবিল ইজ (৩০৫)।
২. মুসতাদরাকে হাকেম (৮৩৮৮); মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩১০৫৪); তবে ইবনে আবি শাইবা আসরের জায়গায় ইশার নামাজের কথা লিখেছেন। মুরজিয়াদের আরও কিছু দলিল সামনে সামনে উল্লেখ করা হবে।

সেরকম কোনো বিষয় যদি সজ্ঞানে অস্বীকার করে, কিংবা মুখে অস্বীকার না করলেও এমন কোনো কাজ করে, যা সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার বোঝায়, তবে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে।[১] এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে।

ইমাম তহাবি এ বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সম্ভবত ইঙ্গিত দিতে চাচ্ছেন যে, মুসলমানদের ভিতরে নিজেদের কোনো বিষয়ে মতপার্থক্যের কারণে একদল আরেক দলকে যেন কাফের আখ্যা না দেয়। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষ কুরআন-সুন্নাহকে সামগ্রিকভাবে স্বীকার করে, বিস্তারিত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কিছু ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে সে গুনাহগার বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু কাফের হবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমাদের নামাজ পড়বে, আমাদের কিবলার অভিমুখী হবে, আমাদের জবাই করা প্রাণী খাবে, সে মুসলিম। তার জন্য রয়েছে আল্লাহ ও তার রাসুলের জিম্মা। সুতরাং তোমরা আল্লাহর জিম্মা নষ্ট করো না।[২]

বাহ্যিক অবস্থার উপর ফয়সালা: ইসলাম আমাদের মানুষের বাহ্যিক অবস্থার উপর ফয়সালা দিতে বলেছে; আর ভিতরের অবস্থা আল্লাহর কাছে সমর্পিত থাকবে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলকে স্বীকৃতি দেবে, ইসলাম ও ঈমানের যাবতীয় বিষয়ের উপর বিশ্বাস রাখবে, আমরা তাকে মুসলিম ও মুমিন আখ্যা দেবো। ভিতরে আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক কীরূপ, পরকালে তার কী হবে, সেটা আল্লাহর কাছে সমর্পিত থাকবে। কোনো ধ্যান-ধারণা, অনুমান, পূর্ব-বিশ্বাস ইত্যাদির উপর নির্ভর করে কারও ব্যাপারে ফয়সালা দেওয়া যাবে না। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا.

অর্থ: 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর করো, তখন যাচাই করে নাও। আর যে ব্যক্তি তোমাদের সালাম করে, তাকে বলো না যে, তুমি মুসলমান নও।' [নিসা: ৯৪] অর্থাৎ যদি কোনো কাফের ব্যক্তি মুসলিম বাহিনী দেখে তাদের সালাম দেয়, কিংবা ইসলাম গ্রহণের উপর ইঙ্গিতবাহী কিছু করে, তবে তাকে অমুসলিম মনে করে হত্যা করা যাবে না; বরং বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে তাকে মুসলিম

---

১. গজনবি (১০৯); আকহাসারি (১৮৩); সালেহ ফাওজান (১০৪-১০৫)।
২. বুখারি (৩৯১)।

গণ্য করে তার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি মানুষের সঙ্গে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল। নামাজ আদায় করে, জাকাত প্রদান করে যখন তারা এগুলো করবে, তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। তবে ইসলামের কোনো হক থাকলে ভিন্ন কথা। আর তাদের অন্তরের হিসাব থাকবে আল্লাহর উপর।'[১] উসামা ইবনে জায়দ রাজি. একবার এক কাফেরের সম্মুখীন হন। হত্যার আগমুহূর্তে সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। উসামা রাজি. মনে করেন, সে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে এটা বলেছে। তাই তাকে হত্যা করে ফেলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা জানানোর পরে তিনি বলেন, সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরেও তুমি তাকে হত্যা করে ফেললে? তিনি বললেন, আমি মনে করেছি সে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে বলেছে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে লাগলেন, তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছ? তুমি কি তার হৃদয় ফেড়ে দেখেছ? শব্দটা তিনি এতবার বললেন যে, উসামা বলেন, আমার কাছে মনে হলো, আমি যদি সেদিন মুসলমান হতাম (অর্থাৎ তা হলে সেদিনের এই ঘটনা ঘটত না)।[২]

মুসলিম ও মুমিন: ইসলাম ও ঈমান শব্দ দুটোর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। ইসলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে দ্বীনের বাহ্যিক ইবাদত-বন্দেগি, যেমন: নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি। আর ঈমান হচ্ছে অন্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যেমন: আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, নবি-রাসুল, পরকাল, তাকদিরে বিশ্বাস করা।[৩] সে হিসেবে মুসলিম হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে বাহ্যিক ইবাদতগুলো ঠিকভাবে পালন করে। আর মুমিন হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে প্রকৃত অর্থেই অন্তরে আল্লাহকে বিশ্বাস করে আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠাবান থাকে। তবে ইমাম তহাবি একত্রে দুটো শব্দ ব্যবহার করেছেন। এতে বোঝা যায়, সামগ্রিকভাবে মুসলিম ও মুমিন সমার্থক শব্দ। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে ইসলামের বিধি-বিধান পালন করবে, সে যেমন মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে, মুমিন হিসেবেও গণ্য হবে। কারও অন্তরের অবস্থা নিয়ে অমূলক সন্দেহ করা উচিত হবে না।

---

১. বুখারি (২৫); মুসলিম (২২); দারাকুতনি (৮৯৮)।
২. বুখারি (৬৮৭২); মুসলিম (৯৬)।
৩. মুসলিম (৮); তিরমিজি (২৬১০); আবু দাউদ (৪৬৯৫)।

وَلاَ نَخُوضُ فِي اللهِ وَلاَ نُمَارِي فِي دِينِ اللهِ. وَلاَ نُجَادِلُ فِي القُرْءَانِ، وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ العَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ، فَعَلَّمَهُ سَيِّدَ الـمُرْسَلِينَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ كَلَامُ اللهِ تَعَالَى، لاَ يُسَاوِيهِ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الـمَخْلُوقِينَ، وَلاَ نَقُولُ بِخَلْقِهِ، وَلاَ نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الـمُسْلِمِينَ.

আমরা আল্লাহর ব্যাপারে (অসমীচীন) চিন্তা-ভাবনায় নিজেদের ব্যাপৃত করব না। আল্লাহর দ্বীন নিয়ে বিবাদে জড়াব না। আমরা কুরআন নিয়ে বিতর্ক করব না। বরং সাক্ষ্য দেবো, এটা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের কথা; ফেরেশতা জিবরিল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি রাসুলদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটা শিখিয়েছেন। এটা আল্লাহর কথা। সৃষ্টির কথার সঙ্গে এর কোনো সাদৃশ্য নেই। আমরা 'কুরআন সৃষ্ট' এমন কথা বলি না। আমরা মুসলিম জামাতের বিরোধিতা করি না।

ব্যাখ্যা

দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ: এখানে ইমাম তহাবি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা সাধারণ মুসলমান তো বটেই, আলিম ও আহলুল ইলমের জন্যও সমানভাবে সংবেদনশীল। মূলত ইমাম তহাবি এ ধরনের পয়গাম তার বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় দিয়েছেন, যা পিছনে আমরা উল্লেখ করেছি। তিনি এখানে বলতে চেয়েছেন, আমরা আল্লাহর ব্যাপারে চিন্তাভাবনায় নিজেদের ব্যস্ত করব না। কারণ, পিছনে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি নিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিভিন্ন ধারার মতভেদ উল্লেখ করেছি। আমরা দেখেছি, এসব মতভেদকে কেন্দ্র করে কীভাবে মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন দল অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। কীভাবে এমন অনেক বিষয় যা দ্বীনের কোনো মৌলিক মাসআলা নয়, সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় নয়, দুনিয়া, কবর কিংবা হাশরে যা সম্পর্কে কাউকে প্রশ্ন করা হবে না, আমরা দেখেছি

কীভাবে মুসলিম উম্মাহ সেসবকে কেন্দ্র করে পরস্পরের বিভীষণ শত্রুতে পরিণত হয়েছে; অথচ আল্লাহ আমাদের ভাই ভাই হয়ে থাকতে বলেছেন। দ্বীনের ক্ষেত্রে বিবাদ করতে বারণ করেছেন। তাই ইমাম তহাবি এখানে বলতে চেয়েছেন যে, কুরআন ও সুন্নাহে আল্লাহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও জরুরি যেসব মাসআলা এসেছে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুর ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকব। আল্লাহর ব্যাপারে চিন্তাভাবনায় আমরা নিজেদের ব্যস্ত করব না এবং এ ব্যাপারে সব ধরনের বাড়াবাড়ি পরিত্যাগ করব। ইবনে আব্বাস রাজি.-এর সূত্রে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে, تَفَكَّرُوا فِي كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي ذَاتِ اللهِ অর্থ: 'তোমরা সবকিছু নিয়ে চিন্তাভাবনা করো, কিন্তু আল্লাহর সত্তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করো না।'[১] যেখানে সালাফ আল্লাহর সত্তা নিয়ে চিন্তাভাবনা পর্যন্ত করতে নিষেধ করেছেন, সেখানে এগুলো নিয়ে নিজেদের ভিতরে বিবাদ ও বিভেদ কতটুকু শরিয়তসম্মত? মুসলমানদের নিদারুণ দুরবস্থার সময় নিজেদের এগুলোর মাঝে ব্যস্ত রাখা কতটুকু যৌক্তিক?

মোট কথা, আল্লাহ-সংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে শুরু করে দ্বীনের কোনো ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি কিংবা বিবাদ করা যাবে না। হ্যাঁ, যারা দ্বীনের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা প্রচার করে, তাদের প্রতিবাদ ও খণ্ডন করতে দোষ নেই। কিংবা যারা আহলুল ইলম, তাদের মাঝে আল্লাহর সিফাত-কেন্দ্রিক মাসআলা নিয়ে মুবাহাসা-মুনাকাশা হতে পারে। কারণ, তা কুরআন-সুন্নাহ চর্চা ও আল্লাহর গুণাবলি বোঝার পদ্ধতি; কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা কুরআন-সুন্নাহর ন্যূনতম জ্ঞান রাখে না, তাদের সামনে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা, অন্য ধারার আলিমদের বিরুদ্ধে তাদের উসকে দেওয়া একধরনের ইলমি খেয়ানত। কারণ, একজন আলিম হিসেবে আপনার দায়িত্ব ছিল একজন সাধারণ মানুষকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়া; কিন্তু আপনি তাকে শিক্ষা দিয়েছেন এমনসব বিষয়, যেগুলো তার জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নয়; বরং তার দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য ক্ষতিকর। তাই আহলুল ইলমের জন্য এমন কাজ কখনোই শোভনীয় নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত মুসলমানরা যেন নিজেরা নিজেরা দ্বীন নিয়ে বাড়াবাড়ি-মারামারি না করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজেকে সত্য জেনেও বিতর্ক পরিহার করবে, তার জন্য জান্নাতের মধ্যখানে একটি ঘর বানানো হবে।[২]

---

১. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বাইহাকি (২/৪৬)।
২. তিরমিজি (১৯৯৩); ইবনে মাজা (৫১)।

কুরআন নিয়ে বিতর্ক বর্জন: একদিন কিছু সাহাবা কুরআনের একটি আয়াত নিয়ে বিতর্ক করছিলেন। এমন অবস্থা দেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখমণ্ডল ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন, থামো তোমরা। এভাবেই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগুলো ধ্বংস হয়েছে। তারা নবিদের ব্যাপারে মতভেদ করেছে। কিতাবের একটা আয়াতকে অপরটার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে। কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না; বরং এক আয়াত অন্য আয়াতকে সত্যায়ন করে। সুতরাং যা জানো সেটার উপর আমল করো। আর যা জানো না, তা যিনি জানেন তাঁর কাছে সঁপে দাও।'[১]

আমাদের সালাফ কুরআন নিয়ে যেকোনো বিতর্ক এড়িয়ে চলতেন। ইমাম আবু ইউসুফ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন ইমাম আবু হানিফার কাছে একদল লোক দুইজনকে ধরে নিয়ে এসে বলল, তাদের একজন বলে কুরআন মাখলুক, অন্যজন তার সঙ্গে বিবাদ করে বলে মাখলুক নয়। ইমাম বললেন, তাদের দুজনের কারও পিছনে নামাজ পড়ো না। আমি বললাম, যে কুরআনকে মাখলুক বলে, তার পিছনে নামাজ না পড়ার কারণ স্পষ্ট। কিন্তু যে কুরআনকে মাখলুক বলে না, তার পিছনে কেন নামাজ পড়া হবে না? ইমাম বললেন, তারা দুজনেই দ্বীন নিয়ে বিবাদে জড়িয়েছে। আর দ্বীন নিয়ে বিবাদে জড়ানো বিদআত।[২]

ইমাম তহাবি যে যুগে বেঁচে ছিলেন, সে যুগে কুরআন-কেন্দ্রিক বিতর্ক অনেক বেশি ছিল। এ জন্য তিনি এই সংক্ষিপ্ত আকিদার গ্রন্থেও বিভিন্ন জায়গায় বারবার কুরআনের ব্যাপারে বিশুদ্ধ আকিদা তুলে ধরেছেন। বিশেষত এক্ষেত্রে মুতাজিলাদের বিভ্রান্তি খণ্ডন করেছেন। পিছনে আমরা বলেছি, গোটা মুসলিম উম্মাহর বিপরীতে মুতাজিলারা মনে করত কুরআন মাখলুক তথা সৃষ্টি। অথচ কুরআন আল্লাহর কালাম ও তাঁর গুণ; সৃষ্টি নয়। কুরআনকে যদি সৃষ্টি বলা হয়, তবে এর অর্থ দাঁড়াবে, আল্লাহ নিজের মাঝে নিজে কিছু সৃষ্টি করেছেন। অথচ আল্লাহর গুণাবলি তাঁর সত্তার মতোই আজালি ও আবাদি—সবসময় ছিল এবং সবসময় থাকবে। এটাই সকল মুসলমানের আকিদা। সুতরাং এটাকে মাখলুক বলা মুসলমানদের আকিদার বিরোধিতা করার নামান্তর। আর সকল মুসলমানের (আমজনতা নয়; উলামা ও ফুকাহার[৩]) আকিদা ভুল

---

১. মুসনাদে আহমদ (৬৮১৭); খালকু আফআলিল ইবাদ, বুখারি (৬৩)
২. শাইবানি (২৭); ময়দানি (৯৫)।
৩. মিরকাতুল মাফাতিহ, আলি কারি (১/২৬০)।

হতে পারে না। বোঝা গেল, যারা মুসলমানদের আকিদা-বিরোধী কথা বলবে বরং তাদেরটা ভুল। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا.

অর্থ: 'যে ব্যক্তি সরল পথ স্পষ্ট হওয়ার পরেও রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুসলমানের অনুসৃত পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে, আমি তাকে ওই দিকেই ফেরাব যে দিকে সে গিয়েছে (অর্থাৎ বক্র করে দেবো)। আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। সেটা কতই না নিকৃষ্টতর গন্তব্য!' [নিসা: ১১৫] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতকে কখনোই গোমরাহির উপর ঐক্যবদ্ধ করবেন না। এরপর—দুই হাত উঁচু করে দেখিয়ে—বললেন, জামাতের উপর আল্লাহর হাত রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।[১]

ইমাম তহাবি মুসলমানদের সেই সর্বসম্মত আকিদার উপরই তাগিদ দিয়ে বলেছেন, কুরআন আল্লাহর কালাম। আল্লাহ তায়ালা লাওহে মাহফুজ থেকে ফেরেশতা জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই গ্রন্থ দীর্ঘ প্রায় তেইশ বছর ধরে প্রয়োজন অনুপাতে অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ

অর্থ: 'এটা আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে রুহুল কুদস (জিবরাইল) সত্য-সহ অবতীর্ণ করেছেন।' [নাহল: ১০২]

কুরআন যেহেতু আল্লাহর কালাম তথা তাঁর একটি গুণ, আর আল্লাহর কোনো গুণ সৃষ্টির গুণের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে না, যেমনটা আল্লাহ তায়ালা বলেন:

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

অর্থ: 'তাঁর মতো কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।' [শুরা: ১১] অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন,

---

১. তিরমিজি (২১৬৭); মুসতাদরাকে হাকেম (৭৯৩)।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

অর্থ: 'তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।' সুতরাং কুরআন কোনো মানুষের কথার সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে না। মানুষের মতো মানুষের কথাও মাখলুক। কুরআন মাখলুক নয়। মক্কার কাফেররা বলত, কুরআন মুহাম্মাদের নিজের রচনা। কখনও বলত, তিনি অন্যদের কাছ থেকে এটা শিখেছেন ইত্যাদি।[১] তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের খণ্ডনে অবতীর্ণ করলেন,

اِنْ هٰذَآ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ . سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ .

অর্থ: 'সে বলে, এটা তো নিছক মানুষের কথা। আমি শীঘ্রই তাকে সাকারে (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করব।' [মুদ্দাস্‌সির: ২৫-২৬]

কুরআনের সাত কিরাআত কি কুরআন নিয়ে বিতর্ক? কুরআন নিয়ে বিতর্ক বর্জন-প্রসঙ্গে কুরআনের একাধিক কিরাআত নিয়ে কয়েকটা কথা বলা জরুরি। বিশেষত নাস্তিকদের প্ররোচনায় অনেক তরুণ-তরুণী কুরআন নিয়ে সন্দেহ করছে। তাদের ধারণা, কুরআন যদি একটাই হয়, সুপ্রমাণিত হয় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়, তবে মুসলমানদের কুরআন পড়া নিয়ে মতভেদ কেন? কেন তারা কুরআনকে সাত কিরাআত কিংবা দশ কিরাআতে পড়ে? এসব প্রশ্ন মূলত কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞতার ফল কিংবা বিদ্বেষপ্রসূত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। নতুবা ওহি ও কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস সম্পর্কে যার ন্যূনতম ধারণা আছে, সে এমন কথা বলতে পারে না। কারণ, সকল মুসলমান জানে কিরাআতের এই বিভিন্নতা কুরআন নিয়ে বিতর্ক নয়, বরং রাসুলুল্লাহর উপর কুরআন এভাবেই একাধিক হরফে (অক্ষরে/পাঠে/শব্দে) অবতীর্ণ হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের আঞ্চলিক আরবি যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন ছিল, উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন ছিল, যেমন কোনো কোনো অঞ্চলের লোকেরা 'আইন'কে 'হা'র মতো করে উচ্চারণ করতেন (হাত্তা حتى কে আত্তা عتى বলতেন; بُعثِرَ বুসিরাকে بُحثِرَ বুহসিরা পড়তেন)। এ জন্য আল্লাহ অনুগ্রহ করে এভাবে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। সহিহ বুখারিতে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কুরআন সাত অক্ষরে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের যেভাবে সহজ লাগে সেভাবে পড়ো।' বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আল্লাহর কাছ থেকে এ-

---

১. তাফসিরে ইবনে কাসির (৮/২৭৬, ৪/৫১৮)।

রকম একাধিক পাঠ-পদ্ধতি চেয়ে নিয়েছেন।[1] ফলে অক্ষরে ও উচ্চারণে (এমনকি শব্দে) ভিন্নতা থাকলেও অর্থের মাঝে কোনো পার্থক্য ছিল না। এ কারণে প্রত্যেকটি পাঠই বিশুদ্ধ ছিল।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশে ইসলাম ছড়িয়ে পড়লে এসব পাঠ নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। তাই উসমান রাজি. কুরাইশের পাঠকে মূল ধরে কুরআন সংকলন করেন। তখন যেহেতু আরবি অক্ষরে নুকতা ছিল না, ফলে সাত পাঠের মধ্য থেকে যেগুলো কুরাইশের পাঠের কাছাকাছি ছিল (অর্থাৎ একই রসম বা শব্দরূপে যেগুলো লেখা যেত, যেমন: تبينوا/تثبتوا খেয়াল করে দেখুন, নুকতা মুছে দিলে দুটোর লেখ্যরূপ এক, অর্থও এক) সেগুলো থেকে যায়। বাকিগুলো বাদ পড়ে যায়। এভাবে সাত অক্ষরের কিছু অক্ষর বাদ পড়ে যায়, আর কিছু অক্ষর থেকে যায়। উসমানি কুরআনে বিদ্যমান এসব শব্দকে আবার বিভিন্নভাবে পাঠ করার কারণে এখান থেকে তৈরি হয় কিরাআতের ভিন্নতা, যা তাজবিদের কায়দা থেকে উৎসারিত এবং শেষে সাত ও দশ কিরাআতে এসে দাঁড়ায়। এই দশ কিরাআতের মাঝেই মূলত 'সাত অক্ষরে অবতীর্ণ' কুরআন মিশে আছে। তবে এখানে যে বিষয়টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, এগুলোর একটাও কারও ইচ্ছামতো বানানো নয়। **এমন নয় যে, মুসলমানরা পাথরে লেখা কুরআনের কিছু নকশা পেয়েছে, এর পর যার যেভাবে মনে চায় পড়েছে; বরং মুসলমানগণ এগুলো রাসুলুল্লাহর মুখ থেকে তাওয়াতুরসূত্রে গ্রহণ ও সংরক্ষণ করেছেন।** ফলে কুরআন নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কিরাআতের ভিন্নতাকে কুরআন নিয়ে বিতর্ক ভাবার সুযোগ নেই।[2]

---

১. বুখারি (২৪১৯, ৪৯৯১)।
২. বিস্তারিত দেখুন: জুরকানিকৃত 'মানাহিলুল ইরফান ফি উলুমিল কুরআন; ইবনুল জাজারিকৃত 'আন নাশর ফিল কিরাআতিল আশর'; মুহাম্মাদ ইবনে আলি আল-হাদ্দাদকৃত 'আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ ফি মা ওয়ারাদা ফি ইনজালিল কুরআন আলা সাবআতি আহরুফ মিনাল আহাদিসিন নাবাবিয়্যাহ'।

وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ، وَلَا نَقُولُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ.

গুনাহের কারণে আমাদের কিবলার অনুসারী কাউকে আমরা কাফের বলি না, যতক্ষণ না সে ওটাকে হালাল মনে করে। তবে আমরা এটাও বলি না যে, গুনাহের কারণে ঈমানের কোনো ক্ষতি হয় না।

ব্যাখ্যা

তাকফিরের তিনটি মূলনীতি: আলো বুঝতে অন্ধকার বোঝা জরুরি; কালো জানতে সাদা জানা জরুরি। নতুবা আলো-অন্ধকার বা সাদা-কালোকে কেউ গুলিয়ে ফেলতে পারে। অন্ধকারকে আলো আর কালোকে সাদা বলে চালিয়ে দিতে পারে। এ কারণে ঈমানকে গভীরভাবে জানার জন্য ঈমানের বিপরীত বস্তু কুফর কী সেটাও জানা জরুরি। তাই আকিদার গ্রন্থগুলোতে আমাদের উলামায়ে কেরাম প্রথমে ঈমানের রুকন ও মৌলিক বিষয়গুলো বর্ণনার পরে কুফর নিয়ে আলোচনা করেন। অর্থাৎ প্রথমে ঈমানের দুর্গ গড়ে তোলেন। এর পর এই দুর্গকে কীভাবে সুরক্ষিত রাখতে হবে, কী কী ভুল করলে এই দুর্গ ভেঙে পড়বে, সেসব বিষয়ে সতর্ক করেন।

কারণ, ঈমান ও আকিদা কোনো দাবি-দাওয়ার বিষয় নয়। ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতো নয়। কেউ যাচ্ছেতাই বিশ্বাস কিংবা কাজ করে এই দাবি করতে পারবে না যে, আমার ঈমান ঠিক আছে, যেহেতু আমার নাম মুসলিম কিংবা আমি মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েছি। কারণ, জন্ম নেওয়া কিংবা নামের সঙ্গে ঈমানের সম্পর্ক নেই। ঈমানের সম্পর্ক অন্তর, মুখ ও কাজের সঙ্গে। তাই এখনকার একজন মুমিন এক মুহূর্ত পরে কাফেরে পরিণত হতে পারে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা দ্রুত আমল করে নাও। অতি শীঘ্রই অন্ধকার রাতের মতো ফিতনা ঘনিয়ে আসছে। তখন সকালে এক ব্যক্তি মুমিন থাকবে, সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে; সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে, সকালে কাফের হয়ে যাবে। সামান্য দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীন বিক্রি করে

দেবে।[১] তাই নিজের এবং অন্যদের ঈমান রক্ষার জন্য, কুফর থেকে নিজে বাঁচা এবং অন্যকে বাঁচানোর জন্য কুফর-সম্পর্কে জানা আবশ্যক। পাশাপাশি কোনো মুমিনকে যেন কাফের বলা না হয়, কিংবা কোনো কাফেরকে যেন মুমিন ভাবা না হয়, সে জন্য তাকফির (কাউকে কাফের বলা) সম্পর্কে কিছু মূলনীতি জানা আবশ্যক।

ইমাম তহাবি রাহি. এই গ্রন্থে ঈমান ও কুফরের সীমারেখা নির্ধারণে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। এসব মূলনীতির মাধ্যমে খুব সহজেই ঈমান ও কুফর এবং মুমিন ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য করা যায়। এ-রকম **একটি মূলনীতি** পিছনে অতিবাহিত হয়েছে। সেটা হলো, কবিরা গুনাহের মাধ্যমে কেউ কাফের হয় না। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি ঈমানের মৌলিক বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, কিন্তু শয়তানের ধোঁকায় পড়ে বড় ধরনের কোনো গুনাহে লিপ্ত হয়, তবে তার ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কিন্তু সে কাফের হবে না। গুনাহগার ব্যক্তিকে কাফের বলা খারেজি সম্প্রদায়ের মতাদর্শ, আহলে সুন্নাতের নয়।

ঈমান ও কুফরের **দ্বিতীয় একটি মূলনীতি** যা ইমাম উপরে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ কেউ যদি কেবল গুনাহ করার ভিতরেই সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং সুস্পষ্ট কোনো গুনাহকে হালাল মনে করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। অন্য কথায়, শরিয়তের সুস্পষ্ট কোনো হারামকে হালাল মনে করলে, হালালকে হারাম মনে করলে কাফের হয়ে যাবে। কারণ, এর মাধ্যমে সে আল্লাহর শরিয়তের মাঝে অনধিকার চর্চা করছে, নিজেকে সে নিজের রব বানিয়ে আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করছে। অথচ হালাল-হারাম নির্ধারণ আল্লাহর কাজ।[২] ফলে এর মাধ্যমে সে প্রকারান্তরে আল্লাহর উপর অপবাদ দিচ্ছে। আর এগুলো সব কুফরি কাজ। ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মে পাদ্রি-পুরোহিতরা এগুলো করত। আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে বলেন,

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

অর্থ: 'তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পাদ্রি-পুরোহিতদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল।' [তাওবা: ৩১] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, তারা হালালকে হারাম বানাত আর হারামকে হালাল বানাত, মানুষ এতে তাদের অনুসরণ করত।[৩]

---

১. মুসলিম (১১৮); তিরমিজি (২১৯৫)।
২. আকহাসারি (১৮৮); তুর্কিস্তানি (১২৮)।
৩. তিরমিজি (৩০৯৫)।

ঈমান ও কুফরের **তৃতীয় আরেকটি** মূলনীতি, যা ইমাম তহাবি সামনে উল্লেখ করবেন, তা হলো, মানুষ যে বিষয়ে ঈমান আনার মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করেছে, যতক্ষণ না সেগুলোর কিছু অস্বীকার করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকটা মানুষ যেহেতু নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করে, তাই ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেসব বিষয় অস্বীকার না করে, যেসব বিষয় স্বীকারের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করেছিল। যখনই এগুলোর কোনো একটা অস্বীকার করবে, তখনই ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে। সেটা অন্তরের অস্বীকার হোক, মুখের অস্বীকার হোক, কিংবা কাজের মাধ্যমে অস্বীকার প্রকাশ করা হোক। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

তাকফিরের ক্ষেত্রে সতর্কতা: সুতরাং কেউ ইসলাম-বিধ্বংসী কোনো বাতিল আকিদা রাখলে যেমন মুরতাদ হয়ে যাবে, একইভাবে যদি এমন কোনো কথা বলে বা এমন কোনো কাজ করে যা বাতিল আকিদার নির্দেশক, তখনও দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে। তবে এটা হলো কুফর বর্ণনার স্বাভাবিক নীতি। কিন্তু তাকফিরে মুআইয়ান তথা ব্যক্তিবিশেষকে এভাবে কাফের সাব্যস্ত করা যাবে না। সেক্ষেত্রে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন অপরিহার্য। কারণ, কোন বিষয় অস্বীকার করছে, কী পরিস্থিতিতে করছে, তাকফিরের শর্তগুলো পাওয়া যাচ্ছে কি না, প্রতিবন্ধকতাগুলো অনুপস্থিত কি না—এসব বিষয় নির্ধারণ করা জরুরি। একইভাবে দ্বীনের কোন বিষয়গুলো লঙ্ঘন করছে সেটাও বোঝা জরুরি। কেউ যদি দ্বীনের কোনো সুস্পষ্ট ও সরিহ বিষয় অস্বীকার করে, অথবা অস্বীকারের মতো কাজ করে বা কথা বলে এবং সেক্ষেত্রে তাকে মাজুর ধরা না যায়, তখন সে মুরতাদ হয়ে যাবে। কিন্তু যেগুলো মতভেদপূর্ণ বিষয়, কিংবা যেগুলোতে ইজতিহাদ ও ইখতিলাফের সুযোগ রয়েছে, অথবা যাতে জাহালত/শুবুহাত ইত্যাদির অবকাশ রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে কাউকে হুট করেই কাফের ফাতাওয়া দেওয়া যাবে না; বরং এটা বিজ্ঞ আলিমসমাজ ও ফকিহদের উপর ছেড়ে দিতে হবে। তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের স্পর্শকাতরতা, ব্যক্তির অবস্থা, পারিপার্শ্বিকতা—সবকিছু যাচাই-বাছাই করে ফয়সালা দেবেন। যেমন: খারেজি, কাদারিয়্যাহ, মুতাজিলা, জাহমিয়্যাহ, মুরজিয়া, শিয়া, বিভিন্ন কবর-পূজারী বিদআতি সম্প্রদায় এবং সমকালীন বিভিন্ন মতবাদ, যেমন: সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদির অনুসারী। তারা প্রত্যেকেই অসংখ্য দল-উপদলে বিভক্ত এবং তাদের আকিদা-আচারও ভিন্ন ভিন্ন। ফলে সবাইকে একযোগে কাফের বলা যাবে না। আবার যে সম্প্রদায় সুস্পষ্ট কুফরিতে লিপ্ত, যেমন:

কাদিয়ানি ও বাতেনি সম্প্রদায় প্রভৃতি, তাদেরও প্রত্যেক সদস্যকে নাম ধরে ধরে কাফের বলা যাবে না। কারণ অনেকে শুবুহাত/তাবিলাত/জাহালত ইত্যাদির কারণে তাদের অনুসরণ করতে পারে। ফলে সেক্ষেত্রে তারা মাজুর গণ্য হবে।[১]

অতএব, নির্দিষ্ট কাউকে কিংবা কোনো সম্প্রদায়কে সরাসরি কাফের বলা জটিল ও ভয়াবহ ব্যাপার। উদাহরণস্বরূপ: খারেজিদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট হাদিস এসেছে, তারা জাহান্নামের কুকুর। তাদের হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের নিহতদের পৃথিবীর সর্বনিকৃষ্ট নিহত বলা হয়েছে।[২] অন্য হাদিসে তাদের ব্যাপারে দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের পেলে আদ জাতির মতো হত্যা করার কথা বলেছেন। ইসলামের সঙ্গে তাদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কথা বলেছেন।[৩] এতকিছু সত্ত্বেও আমাদের সালাফ (সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িন) তাদের পাইকারিভাবে কাফের বলেননি। তা হলে মুতাজিলা, মুরজিয়া ও শিয়াদের আমভাবে কাফের বলা কতটা ঝুঁকিপূর্ণ সহজে অনুমেয়। আলি রাজি.-কে খারেজিদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'তারা কি মুশরিক?' তিনি বললেন, 'শিরক থেকে তো তারা পলায়ন করেছে।' জিজ্ঞাসা করা হলো, 'মুনাফিক?' তিনি বললেন, 'মুনাফিকরা খুব কমই আল্লাহকে স্মরণ করে।' বলা হলো, 'তা হলে তারা কী?' তিনি বললেন, 'তারা বাগি (বিদ্রোহী) সম্প্রদায়, আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।'[৪] সাহাবাদের ইনসাফের স্তর দেখুন। আলি রাজি.-কে খারেজিদের বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে দীর্ঘ ও ভয়ংকর যুদ্ধ করতে হয়েছে, তাদের কারণে তিনি সীমাহীন মুসিবতের সম্মুখীন হয়েছেন; বরং শেষ পর্যন্ত এই খারেজিদের হাতেই তিনি শহিদ হয়েছেন; অথচ তাদের ব্যাপারে বক্তব্যের ক্ষেত্রে তিনি কী বিরল ও বিপুল ইনসাফের পরিচয় দিয়েছেন!

ইবনে হাজার খাত্তাবির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত যে, খারেজিরা তাদের ভ্রান্তি-সহ মুসলমানদের একটি সম্প্রদায়। তাদের সঙ্গে বিয়ে-শাদি বৈধ। তাদের জবাই করা প্রাণী খাওয়া বৈধ। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো আঁকড়ে ধরে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাফের বলা বৈধ হবে না। তাকফিরের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ। আবু মাআলিকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা

---

১. বিস্তারিত দেখুন: আল-ইসতিজকার (৮/২৬৮); মাজমুউল ফাতাওয়া (৩/৩৫৩-৩৫৪); আত তুরুকুল হুকমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়িম (১৪৬); আল-ইনসাফ, মারদাভি (১২/৪৮)।
২. সুনানে ইবনে মাজা (১৭৬); হাকেম (২৬৬৯); হুমাইদি (৯৩২); ইবনে আবি শাইবা (৩৯০৫১)।
৩. বুখারি (৩৩৪৪); মুসলিম (১০৬৪); আবু দাউদ (৪৭৬৫)।
৪. সুনানে কুবরা, বাইহাকি (১৬৮২০); মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩৯০৯৭); ফাতহুল বারি (১২/৩০০)।

করা হলে তিনি মন্তব্য করতে অসম্মতি জানান। কারণ, কোনো কাফেরকে ইসলামে ঢোকানো কিংবা মুসলিমকে ইসলাম থেকে বের করে দেওয়া অত্যন্ত ভয়াবহ ব্যাপার। গাজালি লিখেন, মানুষকে তাকফির করা থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকা উচিত। কারণ, তাওহিদের স্বীকৃতিদানকারী ও নামাজ আদায়কারীদের রক্ত হালাল বানানো অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার। বরং ভুলে একজন মুসলিমের রক্তপাতের চেয়ে এক হাজার কাফেরকে ছেড়ে দেওয়া উত্তম।[১]

ইমাম তহাবির উপরের বক্তব্যও মূলত দুই প্রান্তিকতার মাঝামাঝি আহলে সুন্নাতের অবস্থান। খারেজিরা মনে করে, কেউ কবিরা গুনাহ করলেই কাফের। হালাল মনে করা-না করার কোনো শর্ত নেই। অপরদিকে মুরজিয়ারা মনে করে, কবিরা গুনাহ করলে কোনো অসুবিধা নেই। ঈমান পরিপূর্ণ থাকবে। অথচ দুটোই গলদ। বরং হালাল মনে করা ছাড়া কবিরা গুনাহ করলে বড় ধরনের অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে; কুফর হবে না।[২]

গুনাহ ঈমানকে ক্ষতি করে: এটা মুরজিয়া সম্প্রদায়ের খণ্ডন। গুনাহ ঈমানের ক্ষেত্রে দুর্বলতা ও ত্রুটি সৃষ্টি করে। ফলে মুরজিয়াদের বক্তব্য—গুনাহ ঈমানের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না—সঠিক নয়। ইমাম তহাবির উক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে সেসব লোকের গলতি প্রমাণিত হয়, যারা ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর অনুসারীদের মুরজিয়াতুল ফুকাহা বলে। অথচ এটা তাদের উপর সুস্পষ্ট অপবাদ। কারণ হিসেবে বলা হয়, ঈমান আবু হানিফা আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত ধরেন না। মুরজিয়াদের মতো একটি ভ্রান্ত সম্প্রদায়, যারা পুণ্য কিংবা পাপকে কোনো পাত্তাই দেয় না, উম্মাহর বড় বড় ইমামকে তাদের সঙ্গে মিলিয়ে তাদেরও মুরজিয়া সাব্যস্ত করা দুঃসাহসিকতা। ইমাম আবু হানিফা ও হানাফি মাজহাবের উলামায়ে কেরাম এমন অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। জমহুর আহলে সুন্নাতের সঙ্গে বাহ্যিক ও শাব্দিক মতপার্থক্য থাকলেও ঈমানের সংজ্ঞায় মৌলিকভাবে আবু হানিফা এবং অন্যান্য ইমামের মাঝে কোনো মতপার্থক্য নেই। জমহুর আহলে সুন্নাত আমলকেও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বলেন। ফলে আমলের হ্রাস-বৃদ্ধিতে ঈমানেরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে বলেন। ইমাম আজম মনে করেন, আমল সরাসরি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, ঈমান ও আমল স্পষ্টতই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। তা ছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন জিবরাইল

১. ফাতহুল বারি (১২/৩০০)।
২. কারি মুহাম্মাদ তৈয়ব (৮৮-৮৯)।

আলাইহিস সালাম ঈমানের ব্যাপারে প্রশ্ন করেন, তিনি কেবল বিশ্বাস-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোই তুলে ধরেন। ফলে মূল ঈমানের মাঝে কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। যেমন: কেউ ঈমানের পাঁচটি রুকনের উপর ঈমান আনল, একটি রুকন অস্বীকার করল, সে কি মুমিন হবে? তার ব্যাপারে কি বলা যাবে তার ঈমান দুর্বল? নাকি ন্যূনতম যেসব বিষয়ের উপর ঈমান আনা আবশ্যক, সেগুলো সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য? বাস্তব কথা হলো, ন্যূনতম যেসব বিষয়ের উপর একজন নবির ঈমান আনতে হবে, সেসব বিষয়ের উপর একজন সাধারণ মানুষেরও ঈমান আনতে হবে। তাই বলে কি দুজনের ঈমান সমান? না, তা নয়। এইদিক থেকে সমান, কিন্তু অন্য সব দিক থেকে ভিন্ন। তা হলে মূল ঈমানের ক্ষেত্রে সবাই একমত। পার্থক্য আমলের ক্ষেত্রে। জমহুর আমলকে ঈমানের অংশ বলেন, অথচ আমল পরিত্যাগ করলে কাফের বলেন না। ঈমান কম ও দুর্বল হয়ে গেছে বলেন। ইমাম আবু হানিফাও ঈমানের শক্তি কম ও দুর্বল হয়ে গেছে বলেন, কাফের বলেন না, যেটা ইমাম তহাবি উপরে নিশ্চিত করেছেন। বিপরীতে মুরজিয়াদের মতে, আমলের কারণে ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস কিছুই ঘটে না। এর পরেও আবু হানিফা ও তাঁর শাগরিদদের মুরজিয়া বলা ইনসাফের কাজ হতে পারে না। সামনে এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত আলোচনা আসবে, ইনশাআল্লাহ।

نَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، وَلاَ نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ، وَلاَ نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، وَنَسْتَغْفِرُ لِمُسِيئِهِمْ وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ وَلاَ نُقَنِّطُهُمْ، وَالْأَمْنُ وَالْإِيَاسُ يَنْقُلَانِ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ، وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ.

আমরা সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য আল্লাহর কাছে আশা করি, তিনি তাদের ক্ষমা করে দেবেন; স্বীয় অনুগ্রহে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। কিন্তু আমরা তাদের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হয়ে যাই না। কারও ব্যাপারে জান্নাতের সাক্ষ্য দিই না। আর গুনাহগার মুমিনদের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থনা করি, তাদের ব্যাপারে আশঙ্কা করি, কিন্তু নিরাশ করি না। (ভবিষ্যৎ পরিণতি থেকে) নিশ্চিন্তভাব কিংবা নিরাশা দুটোর কোনোটাই মিল্লাতে ইসলামিয়্যাহতে সমর্থিত নয়। কিবলার অনুসারীদের হকের পথ হচ্ছে এই দুটোর মাঝে।

ব্যাখ্যা

মুমিনদের পারস্পরিক ঈমানি দায়িত্ব: কুফর ও তাকফিরের মাসআলা বর্ণনা করার পরে ইমাম তহাবি মুমিনদের পারস্পরিক কিছু ঈমানি অধিকার ও দায়িত্বের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, মুমিনরা পরস্পরকে কাফের বলবে, একদল আরেক দলকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবে, এটা সঠিক নয়। বরং মুমিনদের পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে যথাসম্ভব ঈমানের গণ্ডিতে রাখার চেষ্টা করা। যারা পুণ্যবান, তাদের ব্যাপারে জান্নাতের আশা করা। আর যারা গুনাহগার, তাদের ব্যাপারে ক্ষমাপ্রার্থনা করা। কারণ, ঈমানের অবস্থান হচ্ছে ভয় ও আশার মাঝে। নবিদের গুণাবলির ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۫ وَ وَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَ اَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَ يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّ رَهَبًا ؕ وَ كَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ.

অর্থ: ‘তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকতেন। আর তারা ছিলেন আমার কাছে বিনীত।’ [আম্বিয়া: ৯০] পুণ্যবান মুমিনদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا

অর্থ: ‘(শেষ রাতে) তাদের পার্শ্বগুলো শয্যা থেকে আলাদা হয়ে যায়। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয় ও আশা নিয়ে।’ [সাজদা: ১৬] অন্যত্র মুমিনদের ব্যাপারে বলেন,

وَ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَ ادْعُوْهُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ.

অর্থ: ‘পৃথিবীকে ঠিক করার পরে তোমরা তাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। আর তোমরা তাঁকে ডাকো ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয়ই আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।’। [আরাফ: ৫৬]

আল্লাহ হতাশা ও আশা দুটোর তুলনামূলক আলোচনা করে আশাকে শ্রেষ্ঠ দেখিয়েছেন। তিনি বলেন,

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّ قَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ: ‘যে ব্যক্তি রাতে সিজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালের আশঙ্কা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান যে এরূপ করে না? বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?’ [জুমার: ৯] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের তিন দিন আগেও বলেন, ‘তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা ব্যতীত মৃত্যুবরণ না করে।’[1]

কারও ব্যাপারে জান্নাত-জাহান্নামের সাক্ষ্য দেওয়া যাবে না: এক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে থাকতে হবে। অর্থাৎ পুণ্যবান মুমিনদের জন্য ক্ষমা ও জান্নাতের আশা করলেও তাদের ব্যাপারে জান্নাতের গ্যারান্টি দেওয়া যাবে না এবং জাহান্নাম থেকে নিরাপদ মনে করা যাবে না। কারণ, কেউ পুণ্য ও সৎকাজ করলেই জান্নাতে চলে যাবে ব্যাপারটা এমন নয়। এক্ষেত্রে কিছু মানুষ ব্যতিক্রম; যেমন: সকল নবি-রাসুল

---

১. মুসলিম ২৮৭৭); আবু দাউদ (৩১১৩); ইবনে মাজা (৪১৬৭)।

জান্নাতি, তাই তাদের ব্যাপারে জান্নাতের সাক্ষ্য দিতে হবে। নবি-রাসুল ছাড়া যেসব সৌভাগ্যবান মানুষ কুরআন কিংবা সুন্নাহ যাদের জান্নাতি হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছে; যেমন: জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন-সহ অন্য অনেক সাহাবি।[১]

এই ব্যতিক্রম মানুষজন ছাড়া আর কারও ব্যাপারে জান্নাতের সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ নয়। হ্যাঁ, আশা করা যাবে, কিন্তু নিশ্চিত সাক্ষ্য দেওয়া যাবে না। যত বড় ওলি-আউলিয়া কিংবা পির-মাশায়েখ হোন না কেন, কারও ব্যাপারে এ কথা বলা যাবে না যে, তিনি জান্নাতি। কেউ মারা গেলে 'জান্নাতবাসী হয়েছেন'—এ-জাতীয় বক্তব্য পরিহার করতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের কাউকে তার আমল মুক্তি দিতে পারবে না।' তখন একব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার আমলও না? তিনি বললেন, 'না, যদি না আল্লাহ আমাকে তাঁর অনুগ্রহের চাদরে ঢেকে নেন। তাই তোমরা যথাসাধ্য আমল করতে থাকো।'[২] জাবের থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহকে বলতে শুনেছি, 'তোমাদের কাউকে তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাবে না কিংবা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবে না, আমাকেও না, যদি না আল্লাহ আমাকে অনুগ্রহ করেন।'[৩] এর মাধ্যমে আবার 'আমল করে লাভ নেই'—এটা বোঝা যাবে না, যেমন মুরজিয়া ও কিছু ভ্রান্ত সুফি দাবিদার বলে থাকে। কারণ, স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের কথা নাকচ করে দিয়ে বলেছেন, **'তাই তোমরা যথাসাধ্য আমল করতে থাকো।'**

একইভাবে গুনাহগার মুসলমানদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা এবং তাদের ব্যাপারে আশঙ্কা থাকলেও তাদের নিরাশ করে দেওয়া যাবে না। কারণ, নিরাশা ও হতাশা ইসলামে সমর্থিত নয়। নৈরাশ্য কোনো কাজে আসে না। নিরাশ লোক কোনো কাজ করতে পারে না। এ জন্য একজন মুমিনকে জীবনের যেকোনো অন্ধকারঘন পরিস্থিতিতে আল্লাহর অনুগ্রহের একচিলতে ঝলকের অপেক্ষায় থাকতে হবে। এটা ইসলামের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সৌন্দর্যেরও অংশ। মুমিন নিজে নিরাশ হয় না, অন্যকেও নিরাশ করে না। এভাবে সবাই মিলেমিশে একটা ইতিবাচক ইসলামি সমাজ গঠিত হয়। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তার সন্তানদের নসিহত করেন,

---

১. গুনাইমি (৯৬-৯৭)।
২. মুসলিম (২৮১৬); ইবনে হিব্বান (৩৪৮); মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক (২০৫৬২)।
৩. মুসলিম (২৮১৭)।

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ.

অর্থ: 'প্রিয় পুত্ররা, যাও ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ করো। আর তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না।' [ইউসুফ: ৮৭]

'জান্নাত-জাহান্নামের জন্য ইবাদত করি না' বলা: খারেজি সম্প্রদায়ের কাজ হলো মানুষকে নিরাশ করে ফেলা, কোনো গুনাহ হয়ে গেলেই তাকে জাহান্নামি ঘোষণা করা। আর মুরজিয়াদের কাজ হলো অতিরিক্ত আশা দেওয়া, ঈমান আনলেই জান্নাতের সনদ ধরিয়ে দেওয়া। অথচ দুটোই ভুল, দুটোই প্রান্তিকতা। আহলে সুন্নাতের মাজহাব এই দুই প্রান্তিকতার মধ্যবর্তী ও ভারসাম্যপূর্ণ; আশা, মহব্বত ও ভয়ের মিশ্রণে। এটাকে সুফিয়ায়ে কেরাম কখনও কখনও এভাবে বলেন, 'আমরা আল্লাহর ভয়ে বা আশায় ইবাদত করি না, বরং ইবাদত করি তার ভালোবাসায়।' কেউ বলেন, 'জান্নাত কিংবা জাহান্নামের জন্য ইবাদত করি না, ইবাদত করি তাঁকে একনজর দেখার আশায়।' এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতেরই একটা বক্তব্য, কেবল ভাবের প্রকাশটা ভিন্ন। কিন্তু অনেকে এটা গলদ মনে করেন, মন্দ সমালোচনা করেন। বরং যারা এটা বলেন, তাদের জিন্দিক পর্যন্ত বলেন। তাদের কথা, এর মাধ্যমে নাকি তারা নিজেদের নবিদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ মনে করেন। কারণ, নবিরা আল্লাহর ভয় ও আশা নিয়ে ইবাদত করেন। তা হলে তারা এমন কী হয়ে গেছে যে, আল্লাহর ভয় ও আশায় ইবাদত করে না? প্রশ্ন হলো: এই অভিযোগ কি সঠিক?

যেসব ওলি মুস্তাহাব ও নফল আমলও ফরজ-ওয়াজিবের মতো গুরুত্ব দিয়ে আদায় করেন, মাকরুহাত থেকেও যোজন যোজন দূরে থাকেন, যাদের মূলমন্ত্র: 'হাসানাতুল আবরার সাইয়িআতুল মুকাররাবিন', তারা নিজেদের নবিদের চেয়ে উত্তম মনে করবেন এটা মাথায় আসে কী করে? বরং ওলিদের কথার গভীরে গেলে আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের মার্গের বিশাল এক উচ্চতাই কেবল অনুভব করা যায়। ফলে তারা এর মাধ্যমে ভয় ও আশা নাকচ করে দেন না। বরং ভয় ও আশার উর্ধ্বে উঠে কেবল আল্লাহর ভালোবাসার সন্ধান করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমাদের জাহান্নামের ভয় ও জান্নাতের আশার মাঝামাঝি থেকে ইবাদত করতে বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হয়, আল্লাহ যদি জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টিই না করতেন, এর পর আমাদের ইবাদত

করতে বলতেন, তবে তার ইবাদত করা আবশ্যক ছিল কি না? সবাই বলবেন, হ্যাঁ, আবশ্যক ছিল। কারণ, আল্লাহ সত্তাগতভাবেই ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত, ভালোবাসা পাওয়ার উপযুক্ত। তা হলে কেউ যদি তাঁর সত্তাকে ভালোবাসে এবং তাঁর আনুগত্য করে, তাঁর হৃদয় ও মনন জুড়ে সৃষ্টি নয়, কেবল সৃষ্টিকর্তা বিরাজ করেন, জান্নাত নয়, জান্নাতের মালিকের অনুরাগ, জাহান্নাম নয়, জাহান্নামের মালিকের সম্ভ্রম সতত জাগরূক থাকে, সমস্যা কোথায়? যেসব মানুষ আল্লাহর প্রেমে এতটা মশগুল হয়ে যান যে, তারা নিজেকে ভুলে যান, আশপাশের সবকিছু ভুলে যান; ফানা-ফিল্লাহর সেই স্তরে থাকেন, যে স্তরে আল্লাহ ছাড়া জগতের আর কিছু সম্পর্কে তাদের হুঁশ থাকে না, তখন তাদের সবটুকু নিবেদনের কেন্দ্রবিন্দু যদি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা হন, সমস্যা কোথায়? স্বয়ং কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে জান্নাত ও জাহান্নাম নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে লক্ষ্য বানাতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ.

অর্থ: 'আর মানুষের মাঝে একশ্রেণির লোক রয়েছে যারা আল্লাহর **সন্তুষ্টিকল্পে** নিজেদের জান বাজি রাখে। আল্লাহ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।' [বাকারা: ২০৭] আরেকটি আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ.

অর্থ: 'আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর **সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে** আহ্বান করে।' [কাহাফ: ২৮] এমন আয়াত কুরআনে অনেকগুলো, যেখানে আল্লাহকে ডাকা, তাঁরই ইবাদত করা, তাঁর পথে জিহাদ করার একটাই উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে, তা হলো **তাকে সন্তুষ্ট করা**। জান্নাত কিংবা জাহান্নামের কথা নেই সেখানে। বোঝা গেল, উক্ত বক্তব্য সুফিদের মনগড়া বিদআত নয়।

তা ছাড়া উক্ত বক্তব্য বড় বড় ইমাম থেকে বর্ণিত। যেমন: হুসাইন রাজি.-এর ছেলে জাইনুল আবিদিন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক সম্প্রদায় আল্লাহর ভয়ে তার ইবাদত করেছে, এটা হলো দাসদের ইবাদত। আরেক সম্প্রদায় আশা নিয়ে তার ইবাদত করেছে, এটা হল ব্যবসায়ীদের ইবাদত। আরেক সম্প্রদায় আল্লাহর ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতায় ইবাদত করেছে, এটা হলো স্বাধীন ও উত্তম মানুষের ইবাদত।'[১]

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৯/১২৩)।

ফুজাইল ইবনে ইয়াজ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কোনো এক বিজ্ঞ পুরুষ বলেছেন, আমি জান্নাতের জন্য আল্লাহর ইবাদত করতে লজ্জা পাই। কারণ, তখন আমার অবস্থা হবে সেই নিকৃষ্ট কর্মচারীর মতো, যদি তাকে বিনিময় দেওয়া হয়, তা হলে কাজ করে, আর যদি বিনিময় না দেওয়া হয়, তা হলে কাজ করে না। আমার অবস্থা তো এ-রকম যে, আল্লাহর ভালোবাসা আমাকে দিয়ে যেরকম ইবাদত করাতে পারে, তা অন্যকিছু পারে না।'[১] কুরআনের বক্তব্য আর তাদের বক্তব্যের মাঝে ফারাক কী?

হ্যাঁ, আপনি প্রশ্ন করতে পারেন উত্তম কোনটা? আমরা বলব, উত্তম যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, সাহাবাগণ করেছেন। আবু হুরাইরা রাজি. রাসুলুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি নামাজে কী বলেন? তিনি বললেন, 'তাশাহহুদ পাঠ করি। এরপর আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করি, জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই।'[২] আনাস রাজি. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশিরভাগ সময় এই দোয়া পাঠ করতেন:

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অর্থাৎ 'হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন; আখিরাতে কল্যাণ দান করুন; আর জাহান্নামের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করুন।'[৩] এর মানে এটা নয় যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে মহব্বত করতেন না। বরং তিনি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি মহব্বত করেন। বোঝা গেল, মহব্বত আর প্রার্থনার মাঝে সংঘর্ষ নেই। বরং প্রার্থনা দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ। আর আল্লাহর দাসত্ব যে যত বেশি করবে, সে তাঁর তত বেশি প্রিয় হবে। তাই আহলে সুন্নাত হিসেবে ভয়, আশা ও ভালোবাসা—তিনটি একত্রে নিয়ে পথ চলাই উত্তম ও সুপথ।

পূর্বের কথায় ফিরে আসি, সাধারণ মুসলমানদের কারও ব্যাপারে যেমন জান্নাতের নিশ্চয়তা দেওয়া যাবে না, তেমনই কাউকে জাহান্নামিও বলা যাবে না। হ্যাঁ, কুরআন-সুন্নাহে যাদের জান্নাতি বলা হয়েছে তাদের যেমন জান্নাতি বলতে হবে, তেমনই কুরআন-সুন্নাহে যাদের জাহান্নামি বলা হয়েছে তাদের জাহান্নামি হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে। যেমন: ইবলিস, ফেরাউন, নমরুদ, আবু জাহল, আবু লাহাব, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল, আমর ইবনে লুহাই আল-খুজায়ি প্রমুখ। তারা জাহান্নামি—

---

১. শুআবুল ঈমান, বাইহাকি (২/২২)।
২. আবু দাউদ (৭৯২)।
৩. বুখারি (৬৩৮৯)।

এটা শরিয়ত দ্বারা প্রমাণিত। তাই উদারতা প্রকাশ করতে গিয়ে তাদের যেমন 'জাহান্নামি নয়' বলা যাবে না, আবার কাফের ও অমুসলিমমাত্রই **জাহান্নামি** আখ্যা দেওয়া যাবে না। কারণ, কেউ হয়তো গোপনে ঈমান এনেছে যা আপনি জানেন না। কারও কাছে হয়তো ইসলামের সঠিক পয়গাম পৌঁছয়নি এবং সে হয়তো মাজুর। কাফের-মুশরিকদের নাবালেগ মৃত সন্তানদের ব্যাপারেও এই বিধান। তাই ব্যক্তিবিশেষের উপর (শরিয়ত যাদের ব্যাপারে কিছু বলেনি) জান্নাত-জাহান্নামের সাক্ষ্য দেওয়া যাবে না।

সামগ্রিকভাবে জান্নাত-জাহান্নামের সাক্ষ্য দিতে হবে: উপরের মূলনীতি ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু সামগ্রিকভাবে মুসলমানরা জান্নাতে যাবে আর কাফেররা জাহান্নামে যাবে—এটা বলা যাবে; বরং এটা বলা আবশ্যক। সাম্প্রতিক সময়ে উদারতার নামে তথাকথিত প্রগতিশীল দাবিদার মুসলিমদের মাঝে একধরনের বিচ্যুতি দেখা যায়। তারা কাফেরদের কাফের বলতে চায় না, 'অমুসলিম' বলে। 'কাফেররা জাহান্নামে যাবে'—এটা বলা অভদ্রতা ও গোঁড়ামি মনে করে। তাদের ধারণা, ইহুদি-খ্রিষ্টান ও হিন্দু-বৌদ্ধরাও জান্নাতে (স্বর্গে) যেতে পারে। কারণ, তাদের অনেকে স্রষ্টাতে বিশ্বাস করে, ভালো কাজ করে, মানুষকে সহায়তা করে ইত্যাদি। এটা হলো ইসলামি শরিয়ত-সম্পর্কে চরম অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। কিংবা জেনেবুঝে শরিয়তের মূলনীতি বাতিল করে দেবার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, আল্লাহর কাছে একমাত্র দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম ছাড়া জগতের সকল ধর্ম প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ.

অর্থ: 'আল্লাহর কাছে একমাত্র দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।' [আলে ইমরান: ১৯]

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

অর্থ: 'আর যে ইসলাম ছাড়া অন্যকিছু সন্ধান করবে, তা কখনোই তার কাছ থেকে গৃহীত হবে না। সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' [আলে ইমরান: ৮৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে কোনো ইহুদি কিংবা খ্রিষ্টান যদি আমার কথা শুনতে পায়, তদুপরি আমার উপর ঈমান না আনে, তবে সে জাহান্নামে যাবে।'[১] একইভাবে অন্যান্য পৌত্তলিক ধর্মের অনুসারী, মূর্তিপূজারী, মুশরিকরাও চিরস্থায়ীরূপে জাহান্নামে থাকবে। আল্লাহ বলেন,

---

১. মুসলিম (১৫৩); সুনানে সাঈদ ইবনে মানসুর (১০৮৪); বাজ্জার (৩০৫০); তয়ালিসি (৫১১)।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

অর্থ: 'আহলে-কিতাব ও মুশরিকদের মাঝে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির সবচেয়ে অধম'। [বাইয়িনাহ: ৬]

আরেক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কিয়ামতের দিন এক ঘোষক ঘোষণা করবে, প্রত্যেক জাতি যেন তাদের অনুসরণ করে দুনিয়াতে যাদের উপাসনা করত। তখন আল্লাহ ছাড়া যারা মূর্তি ও পাথরের পূজা করত, সকলে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। বাকি থাকবে কেবল মুসলমানগণ যারা আল্লাহর ইবাদত করত আর আহলে কিতাবের কিছু দল। তাদের মাঝে ইহুদিদের ডেকে বলা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর পুত্র উজাইরের ইবাদত করতাম। আল্লাহ বলবেন, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কোনো স্ত্রী-সন্তান নেই। তোমরা কী চাও? তারা বলবে, আমরা তৃষ্ণার্ত, আমাদের পানি পান করান। তখন তাদের বলা হবে, ওই ওখানে গিয়ে পান করো। জাহান্নামকে তখন তাদের সামনে তরঙ্গোদ্বেল মরীচিকারূপে তুলে ধরা হবে। তারা সবাই সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এরপর খ্রিষ্টানদের ডেকে বলা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে, আল্লাহর পুত্র ঈসার। তাদের বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহ কোনো স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করেননি। তখন তাদের বলা হবে, তোমরা কী চাও? তারাও আগের মতো জবাব দেবে। তাদের সঙ্গেও একই আচরণ করা হবে।'[১]

সুতরাং পথ ভিন্ন হলেও সবার গন্তব্য একই—এমন কথা বলার অর্থ পুরো শরিয়তের ভিত্তিকে বাতিল করে দেওয়া। হ্যাঁ, সকল ধর্মের কাফেরের গন্তব্য একটাই, জাহান্নাম। তা ছাড়া, কাফেরদের চরিত্র ভালো, পুণ্যের কাজ করে, তাই জান্নাতে যাবে—এমন বক্তব্যও অজ্ঞতাপ্রসূত। আল্লাহ দুনিয়াতেই তাদের ভালো কাজের বিনিময় দান করবেন। পরকালে তাদের জন্য কিছু নেই।

কাফের-মুশরিকদের ভালো কাজের বিনিময়? এখানে প্রথমেই একটি বিষয় উল্লেখ্য, তা হলো—ভালো চরিত্র আর মন্দ চরিত্রের মানদণ্ড কী? ভালো মানুষ ও খারাপ মানুষের মানদণ্ড আমাদের কাছে যেমন, আল্লাহর কাছে কি তেমন? আমরা

---

১. বুখারি (৪৫৮১)।

যেভাবে এগুলো দেখি, ইসলাম কি সেভাবে দেখে? একজন অমুসলিম যখন পরোপকারী হয়, দরিদ্রের সহায়ক হয়, আমরা তাকে প্রশংসায় ভাসিয়ে দিই; ভালো মানুষ ভাবি। এটা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা ঠিক আছে। কিন্তু আল্লাহর কাছে কি সে ভালো মানুষ? সহিহ বুখারিতে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আদম সন্তান আমার উপর মিথ্যাচার করে, অথচ তার জন্য এটা করা শোভনীয় নয়। আদম সন্তান আমাকে গালি দেয়, অথচ তার জন্য এটা করা শোভনীয় নয়। আমাকে মিথ্যাচার করার অর্থ হলো, সে বলে, তাকে পুনরুত্থিত করা হবে না, অথচ প্রথম সৃষ্টির চেয়ে পুনরুত্থান অধিক সহজ। আমাকে গালি দেওয়ার অর্থ হলো, সে বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন; অথচ আমি এক এবং অমুখাপেক্ষী। আমি কাউকে জন্ম দিইনি, কেউ আমাকে জন্ম দেয়নি। আমার সমকক্ষ কেউ নেই।'[1] এখানে অমুসলিমদের ধর্মবিশ্বাসকে আল্লাহকে গালি দেওয়া, তাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করার সমকক্ষ ধরা হয়েছে। এবার ভাবুন, যে লোক তার সৃষ্টিকর্তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তার পালনকর্তা ও রিজিকদাতাকে গালি দেয়, তার সঙ্গে বেয়াদবি করে, অনুগ্রহকারীর অকৃতজ্ঞ হয়, মানুষের প্রতি তার মমত্ববোধ ও দরিদ্রের সহায়তার কী মূল্য? যে নিজের পিতা-মাতার অকৃতজ্ঞ হয়, তাদের প্রতি অন্যায়কারী ও কৃতঘ্ন হয়, ঘরের বাইরে তার ভালো মানুষির কতটুকু দাম থাকে?

এ জন্য কাফের-মুশরিকের ভালো কাজগুলো পরকালে তাদের কোনো উপকারে আসবে না। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

অর্থ: 'আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আপনি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার স্থির করেন, তবে আপনার আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।' [জুমার: ৬৫] অন্যত্র বলেন,

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

১. বুখারি (৪৯৭৪)।

অর্থ: 'তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো জাহান্নামি। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।' [বাকারা: ২১৭] অন্যত্র জায়গায় বলেন,

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

অর্থ: 'যে ব্যক্তি ঈমানকে অবিশ্বাস করবে, তার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' [মায়িদা: ৫]

আয়েশা রাজি. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইবনে জুদআনের পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতেন। মানুষকে খাবার দিতেন। এগুলো কি পরকালে তাকে উপকৃত করবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'না, এগুলো তাকে কোনো উপকার করবে না। কারণ, সে কোনোদিন বলেনি—হে প্রভু, বিচার দিবসে আমার অপরাধগুলো ক্ষমা করে দিন।'[১] অর্থাৎ সে ঈমান আনেনি। অথচ ভালো কাজগুলো আল্লাহর কাছে গৃহীত হওয়ার এবং পরকালে সেগুলোর মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার সর্বপ্রথম শর্ত হলো ইসলাম। আল্লাহ বলেন,

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ وَلَا يَأْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ.

অর্থ: 'তাদের অর্থব্যয় কবুল না হওয়ার এ ছাড়া আর কোনো কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অবিশ্বাস করেছে। আর তারা নামাজে আসে অলসতার সাথে, ব্যয় করে সংকুচিত মনে।' [তাওবা: ৫৪] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মুসলিম ছাড়া আর কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[2] বরং গোটা পৃথিবী দিলেও রক্ষা পাবে না। আল্লাহ বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ.

---

১. মুসলিম (২১৪); ইবনে হিব্বান (৩৩১)।
২. বুখারি (৩০৬২); মুসলিম (১১১)।

অর্থ: 'যারা কাফের হয়েছে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তারা মুক্তির জন্য যদি সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও দেয়, তবুও তা গ্রহণ করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।' [আলে ইমরান: ৯১]

হ্যাঁ, আল্লাহ চাইলে কোনো কাফেরকে তাঁর কোনো কর্মের বিনিময় দিতে পারেন। যেমন: রাসুলুল্লাহর চাচা আবু তালিবের ব্যাপারে শক্তিশালী সূত্রে এবং আবু লাহাবের ব্যাপারে দুর্বল সূত্রে কিছু ব্যতিক্রম কথা এসেছে। আবু তালিবের ব্যাপারে এসেছে—তার শাস্তি কমিয়ে জাহান্নামের সবচেয়ে লঘু শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু সেই লঘু শাস্তি কী? তাকে জাহান্নামের জুতা পরিয়ে দেওয়া হবে আর তাতে তার মগজ ফুটতে থাকবে।[১] আবু লাহাব যেহেতু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুগ্ধমাতা সুয়াইবিয়াকে আজাদ করে দিয়েছিলেন, তাই জাহান্নামে প্রতি সোমবার তার শাস্তি কিছুটা কম করা হবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির এক ছিদ্র দিয়ে কিছু পানি পান করতে দেওয়া হবে। আবু লাহাব-সম্পর্কে বর্ণনাটি সুস্পষ্টভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়, বরং স্বপ্নের কথা।[২] আর স্বপ্ন কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট বর্ণনার সামনে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, কুরআনে আবু লাহাবের উপর অভিসম্পাত করে বলা হয়েছে,

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ. مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ. سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ.

অর্থ: 'ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত। ধ্বংস হোক সে নিজে। কোনো কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ কিংবা তার উপার্জন। শীঘ্রই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে।' [মাসাদ: ১-৩] তা ছাড়া, যদি এগুলো বিশুদ্ধ ধরাও হয়, তথাপি কেবল এই দুজনের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে। কারণ, অন্যদের ব্যাপারে এমন বর্ণনা আসেনি। আর সেটাও এমন ব্যতিক্রম, যা উল্লেখ করার মতো নয়। জাহান্নামের শাস্তির সামনে এমন ছাড় কিছুই নয়। কারণ, তারা জাহান্নামের আগুন থেকে কখনোই মুক্তি পাবে না।

তাই সাধারণভাবে নিয়ম হলো, ভালো কাফেরদের ভালো আমলের বিনিময় দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হবে। পরকালে তাদের জন্য কিছু নেই। আল্লাহ বলেন,

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ.

---

১. বুখারি (৬৫৬১); মুসলিম (২১৩)।
২. বুখারি (৫১০১)।

অর্থ: 'যারা পার্থিব জীবন এবং এ জীবনের চাকচিক্য কামনা করে, আমি তাদের দুনিয়াতেই আমলের প্রতিফল পূর্ণ করে দেবো এবং তাতে তাদের প্রতি একটুও হ্রাস করা হবে না।' [হুদ: ১৫] অন্যত্র বলেন,

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ يَصْلٰىهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا.

অর্থ: 'যে ব্যক্তি ইহকাল কামনা করে, আমি সেসব লোককে যা ইচ্ছা ইহকালেই দিয়ে দিই। অতঃপর তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি। তারা সেখানে নিন্দিত-বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে।' [ইসরা: ১৮] আরেক জায়গায় বলেন,

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ.

অর্থ: 'যে ব্যক্তি পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য সে ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ইহকালের ফসল কামনা করে, আমি তাকে কিছু দিয়ে দিই, কিন্তু পরকালে তার কোনো অংশ থাকবে না।' [শুরা: ২০] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কাফের যখন কোনো ভালো কাজ করে, দুনিয়াতে তাকে সেটার বিনিময় দিয়ে দেওয়া হয়। আর মুমিন যখন ভালো কাজ করে, দুনিয়ার পাশাপাশি পরকালের জন্যও সেটার পুণ্য রেখে দেওয়া হয়।'[১]

---

১. মুসলিম (২৮০৮); বাজ্জার (৭০২২)।

وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ

একজন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয় না, যতক্ষণ না সে সেসব মূলনীতি অস্বীকার করে, যেসবের স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে ঈমানে প্রবেশ করেছিল।

ব্যাখ্যা

ঈমানের ছয় রুকনের শর্ত লঙ্ঘন কুফর: পিছনে আমরা ঈমান ও কুফরের কয়েকটি মূলনীতি তুলে ধরেছি। তন্মধ্যে তৃতীয় মূলনীতিটি এখানে বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। কারণ, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি। পাশাপাশি এটি সংক্ষেপে বললে ভুল বোঝার ব্যাপক আশঙ্কা থাকে। ফলে ব্যাখ্যা দেওয়া জরুরি।

মূলনীতিটি ইমাম তহাবি উপরে উল্লেখ করেছেন। তা হলো, মানুষ যে বিষয়ে ঈমান আনার মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করে, যতক্ষণ না সেগুলোর কিছু অস্বীকার করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকটা মানুষ যেহেতু নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করে। সুতরাং সে ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেসব বিষয়কে অস্বীকার না করে, যেগুলো স্বীকারের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করেছিল। যখনই এগুলোর কোনো একটা অস্বীকার করবে, ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে।

ইমাম তহাবির উপরের কথার বাহ্যিক মানে দাঁড়ায়, প্রত্যেকটা মানুষ যেহেতু ছয়টি বিষয়ের সাক্ষ্য দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করে, যথা: আল্লাহ, ফেরেশতা, নবি-রাসুল, কিতাব, তাকদির ও পরকাল, ফলে কেউ যদি এগুলোর কোনোটা অস্বীকার করে, তবেই সে কাফের হবে। এর আগ পর্যন্ত যতকিছুই করুক, কাফের হবে না। অথবা আরও সীমিত করে বলা যায়, মানুষ যেহেতু স্রেফ কালিমা (তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য) দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করে, সুতরাং এই দুটো অস্বীকার না করলে কখনও ইসলাম থেকে বের হবে না।

যদি প্রশ্ন করা হয়, এর বাইরের কোনো বিষয় অস্বীকার কিংবা কোনো কাজই কি তা হলে মানুষকে কাফের বানায় না? উত্তর হচ্ছে—হ্যাঁ, বানায়। বরং যেসব বিষয় মানুষকে ঈমান থেকে বের করে বেঈমান বানিয়ে দেয়, ইমাম তহাবির উল্লেখ করা মূলনীতি সেগুলোর নিতান্তই সামান্য অংশ। এ কারণেই আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহর অনেক ব্যাখ্যাতা এখানে ইমামের উপর আপত্তি তুলেছেন। তাদের কথা, এই বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ, এর মাধ্যমে কুফরকে কেবল দু-একটা কারণের মাঝে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। অথচ এসব বিষয় অস্বীকারের বাইরে কুফরের অনেক কারণ রয়েছে।[১]

বাস্তবতা হলো, তহাবির কথার বাহ্যিক অর্থ ধরা হলে ভুল মনে হবে। কিন্তু আমরা যদি তাঁর কথার গভীরে যাই, তবে দেখব, তার কথা ঠিকই আছে এবং তাঁর বর্ণিত মূলনীতি যথাযথই আছে। কীভাবে? নিচে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে:

দুটি বা ছয়টি বিষয়ের স্বীকৃতি মানুষকে মুমিন বানায়। কিন্তু এই স্বীকৃতির তাৎপর্য কী? কেউ স্রেফ বলল 'আল্লাহ এক', তাতেই হয়ে যাবে, নাকি 'আল্লাহ এক' শব্দটার সকল মর্ম ও মাআনি, জরুরিয়্যাত ও লাওয়াজিমগুলোও তাতে প্রবেশ করবে? সবাই বলবেন, স্রেফ শব্দটা নয়; বরং এর মর্ম ও তাৎপর্য, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আল্লাহর সত্তা, সিফাত (গুণাবলি), হুকুক (অধিকার) ইত্যাদি-সম্পর্কিত সকল আকিদার ইজমালি স্বীকৃতি এতে অন্তর্ভুক্ত। ফলে কেউ যখন বলে, 'আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম' কিংবা 'আল্লাহ এক', তখন এর মাঝে আল্লাহ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, একমাত্র রিজিকদাতা, তিনিই জন্ম ও মৃত্যুদাতা, তিনিই ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত এই সবগুলো সাক্ষ্য ঢুকে যাবে। যদিও প্রত্যেক ব্যক্তির এটা মুখে উল্লেখ করা প্রয়োজন নেই, কিংবা সকলের আল্লাহর সবগুলো সিফাত সম্পর্কে সবিস্তার জানাও প্রয়োজন নেই। কিন্তু এগুলো তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ফলে ঈমানে ঢুকতে হলে এগুলোর তফসিলি সাক্ষ্য না দেওয়া লাগলেও কোনো সাক্ষ্যে ব্যাঘ্যাত ঘটলে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।

আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আল্লাহ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহই জীবন ও মৃত্যুদাতা, আল্লাহ সবকিছু জানেন— ইসলামে প্রবেশের জন্য একজন মানুষের এতগুলো স্বীকৃতি দেওয়া জরুরি নয়; বরং 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই'— এটুকু বলাই যথেষ্ট। কিন্তু কেউ ইসলামে প্রবেশ করার পরে যদি বিশ্বাস করে, আল্লাহ ছাড়া আরও কোনো সৃষ্টিকর্তা আছেন, কিংবা আল্লাহ কোনো বিষয় জানেন না, সে মুমিন থাকবে? যদি আল্লাহকে ইলাহ মানে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে অন্যকে শরিক করে, সে

---

১. সালেহ ফাওজান (১১৪)।

মুমিন থাকবে? সবাই এক বাক্যে উত্তর দেবেন, 'না, কখনোই মুমিন থাকবে না।' হ্যাঁ, সেই ব্যক্তিবিশেষকে কাফের বলা হবে কি না সেটা ভিন্ন বিষয়, কিন্তু কেউ এমন বিশ্বাস রাখলে ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যাবে। একই কথা প্রযোজ্য নবি-রাসুল, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, পরকাল ও তাকদির-সংক্রান্ত আকিদার ক্ষেত্রেও। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল—এতটুকু সাক্ষ্য দেওয়াই ঈমানে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল' কথাটা এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তিনি কে? কোথায় ছিলেন? কোন যুগে ছিলেন? তিনি কেন রাসুল? তাঁর ব্যাপারে কী বিশ্বাস রাখতে হবে? তাঁর মর্যাদা কেমন? তাঁর পরিবারের ব্যাপারে কী আকিদা রাখতে হবে—সবকিছু এর অন্তর্ভুক্ত। ফলে কেউ 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল' এতটুকু সাক্ষ্য দিয়ে ঈমানে ঢুকতে পারলেও ঢোকার পরে যদি বলে—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি নবি-রাসুল হিসেবে মানি, কিন্তু তাঁর চরিত্রের অমুক অমুক দিকগুলো আমার পছন্দ নয়; তাঁর এতগুলো বিয়ে আমার ভালো লাগে না; ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সঙ্গে তাঁর আচরণ সঠিক ছিল না; তিনি যুদ্ধবাজ ছিলেন; কুরআন ঠিকই আল্লাহর বাণী, কিন্তু তিনি নিজে তাতে কিছু যোগ করেছেন; তাঁর আনীত ইসলাম আমি মানি, কিন্তু তাঁর শরিয়ত ও সুন্নাত কেবল আরবদের জন্য, আমরা বাঙালিদের জন্য হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতিই অধিকতর সুন্দর ও উপযোগী ইত্যাদি, নাউজুবিল্লাহ, সে মুমিন থাকবে? সবাই এক বাক্যে বলবেন, কখনও না। কারণ কী? কারণ 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল' এই মর্মবাণী কিংবা স্বীকৃতির যে দাবি রয়েছে, সেগুলো সে সংরক্ষণ করেনি। সুতরাং সে কোনোভাবেই মুমিন থাকবে না। এই একই কথা ঈমানের অন্যান্য রুকনের বেলাতেও প্রযোজ্য।

উপরের কথার সারাংশ হচ্ছে, ঈমানের সাক্ষ্যটা বেশ ইজমালি ও সংক্ষিপ্ত হলেও এর মর্ম, তাৎপর্য, প্রভাব ও পরিধি অনেক বিস্তৃত। কথাটা উলটো করে এভাবেও বলা যায়, ঈমানের স্বীকৃতির ক্ষেত্র ও বিষয়বস্তু অনেক বেশি প্রশস্ত, গভীর ও বিস্তৃত হলেও কয়েকটা মূলনীতির ভিতরেই সবগুলো ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে সংক্ষেপে সেসব বিষয়ের স্বীকৃতি দিলেই সবগুলোর স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে যায়। কিন্তু বিস্তৃত পরিসরে কোনো একটাকে অস্বীকার করলে মূল স্বীকৃতিও অস্বীকৃত হয়ে যায়।[১] অন্য কথায়, ইসলামে প্রবেশের রাস্তা সরু। বের হওয়ার রাস্তা প্রশস্ত। ঈমানে ঢোকার পথ ছয়টা, কিন্তু বের হওয়ার পথ ষাটটা কিংবা ততোধিক। ফলে ষাটটা হোক কিংবা শতটা

১. আকহাসারি (১৯২); তুর্কিস্তানি (১৩২)।

হোক, মৌলিক স্বীকৃতি এগুলোর মাঝেই সীমাবদ্ধ। ফলে ইমাম তহাবির বক্তব্য, **একজন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয় না, যতক্ষণ না সে সেসব মূলনীতি অস্বীকার করে, যেসবের স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে ঈমানে প্রবেশ করেছিল'** এভাবেই বুঝতে হবে। কারণ, ঈমানে সে সংক্ষিপ্ত পথ দিয়ে প্রবেশ করেছিল ঠিকই, কিন্তু বের হওয়ার পথ এতটা সংক্ষিপ্ত নয়। বরং অন্যান্য বিস্তারিত সকল ব্যাখ্যা এসব মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত। ফলে কুফরের যেকোনো কারণের মূল এগুলো অস্বীকারের মাঝেই খুঁজে পাওয়া যাবে। ইসলামের যেকোনো বিষয় অস্বীকার এগুলোর যেকোনো একটাকে অস্বীকার পর্যন্ত নিয়ে যাবে।

প্রশ্ন হতে পারে, এমন কেন করা হলো? উত্তর হলো, বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কারণেই এমন করা হয়েছে। আল্লাহ মানুষকে তার সাধ্যের বাইরে চাপিয়ে দেন না। আল্লাহ মানুষের জন্য ঈমানের পথ কঠিন করতে চান না। যদি শর্ত দেওয়া হতো—ঈমান আনার জন্য কেবল কালিমা শাহাদাহ নয়, কিংবা এই ছয়টি মূলনীতি নয়; বরং এগুলোর অন্তর্ভুক্ত সবকিছু বিস্তারিত জানতে ও সাক্ষ্য দিতে হবে, আল্লাহর সকল গুণ, সকল নবি-রাসুল, পরকালের বিস্তারিত বিবরণ, তাকদিরের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে হবে, ক-জন মানুষের পক্ষে ঈমানে প্রবেশ করা সম্ভব হতো? তাই সবার জন্য বলে দেওয়া হয়েছে, 'বলুন, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল।' এতটুকু সত্য জেনে ও মেনে ঘোষণা দিলেই আল্লাহ মুমিনদের তালিকায় নাম লিখে দেবেন। এটা পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অথচ সবচেয়ে সহজ সাক্ষ্য। কিন্তু এই সাক্ষ্য দেওয়ার পরে অবস্থাভেদে প্রত্যেকের উপর অন্যান্য দায়িত্ব আসবে। কেউ যদি সাক্ষ্য দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেউ যদি আল্লাহর সিফাতের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির শিকার হয়, তবে তাকে সিফাতগুলো জেনে নিতে হবে। কেউ যদি রাসুলের ব্যাপারে, পরকালের ব্যাপারে, তাকদিরের ব্যাপারে সন্দেহে কিংবা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে, তবে সেগুলোর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা জানা ও সন্দেহ দূর করা সেই ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব হবে। এটা না করলে সে নিজেই এর জন্য দায়ী থাকবে। হতে পারে একপর্যায়ে ঈমানহারা হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি এসব বিষয় নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ফিতরতের উপর সারা জীবন কাটিয়ে দেয়, তবে সেই সংক্ষিপ্ত সাক্ষ্যই তার মুক্তির সনদ হিসেবে দাঁড়াবে।[১] ফলে এটা বান্দার উপর বোঝা নয়; বরং আল্লাহর অনুগ্রহ।

১. তিরমিজি (২৬৩৯); ইবনে মাজা (৪৩০০); ইবনে হিব্বান (২২৫)।

কর্মগত কুফর: পিছনের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, ঈমান সুরক্ষিত রাখার জন্য কালিমা বা ছয়টি রুকনের প্রত্যেকটির বিস্তারিত দাবি ও শর্তগুলো সুরক্ষিত রাখা জরুরি। কেউ যদি সেসব দাবির কোনোটা না মানে, কিংবা কোনো শর্ত লঙ্ঘন করে, তবে সে ঈমান থেকে বেরিয়ে যাবে। ইমাম তহাবি সেটাকেই **'যতক্ষণ না সে সেসব মূলনীতি অস্বীকার করে'** শব্দে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এখানেও কেউ কেউ তাকে ভুল বুঝেছেন এবং তার কথার উপর আপত্তি তুলেছেন। তাদের যুক্তি, ঈমানের এসব শর্ত ও দাবি কেবল অন্তরে বা মুখে অস্বীকার করলে ঈমান নষ্ট হবে এমন নয়, বরং কাজের মাধ্যমেও যদি সেগুলো অস্বীকার করে, তবে সে বেঈমান হয়ে যাবে। আমরা এই বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু ইমাম তহাবির কথার গভীরে গেলে দেখব, তার কথার উপর কোনো আপত্তি করা যায় না। কারণ, তিনিও এগুলোই বলেছেন।

ইমাম তহাবি এখানে 'জুহুদ' তথা অস্বীকারের কথা বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমানের এসব শর্ত ও দাবি প্রত্যাখ্যান। সুতরাং অন্তরে, মুখের বক্তব্য কিংবা কাজে, যেভাবেই প্রত্যাখ্যান হোক, সেটা 'জুহুদ' হিসেবে গণ্য হবে এবং সে ঈমান থেকে বেরিয়ে যাবে। ফলে ইমাম তহাবির কথা আর সকল আলিমের কথা একই হলো। কারণ, অস্বীকার/প্রত্যাখ্যান কেবল অন্তর বা মুখের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। বরং কাজের সঙ্গেও সম্পৃক্ত। মুখে কেউ আল্লাহর অস্তিত্ব, গুণাবলি, ফেরেশতা, নবি-রাসুল, কুরআন, তাকদির, পরকাল ইত্যাদি অস্বীকার করলে যেমন কাফের হবে, তেমনই মুখে অস্বীকার না করেও এমন কোনো কাজ করলে, যে কাজের মাধ্যমে অন্তরের অস্বীকার/প্রত্যাখ্যান স্পষ্ট বোঝা যায়, ঈমান থেকে বেরিয়ে যাবে। যেমন: কেউ বলল, আমি আল্লাহর উপর ঈমান রাখি, রাসুলুল্লাহর উপর ঈমান রাখি, কিন্তু * কাজে-কর্মে সে আল্লাহ ও রাসুলকে নিয়ে উপহাস করে * আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলকে গালি-গালাজ কিংবা তাদের সমালোচনা করে * দ্বীনের বিভিন্ন বিধান (যেমন রোজা, কুরবানি, পর্দা ইত্যাদি) নিয়ে ঠাট্টা করে * সাহাবাদের কাফের বা ফাসেক বলে * শরিয়তের হালালকে হারাম বলে * হারামকে হালাল বলে * মদ্যপানকে ফ্যাশন এবং এটা হারাম বলাকে গোঁড়ামি মনে করে * বিবাহ-পূর্ব প্রেম ভালোবাসা, বিবাহ-পরবর্তী পরকিয়া, পরনারীগমন এবং পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ককে হালাল ভাবে * এগুলো হারাম হওয়াকে পশ্চাৎপদতা মনে করে * ব্যভিচারকে বৈধ মনে করে এবং এটার বৈধতার পক্ষে আন্দোলন করে * আল্লাহর বিধানকে এই যুগের জন্য অচল মনে করে এবং মানবরচিত বিধানকে অধিক উপযোগী ও উত্তম মনে করে * শরিয়তের

শাস্তিকে—যেমন: হুদুদ ও কিসাস—বর্বর মনে করে * কুরআনের সঙ্গে বেয়াদবি করে * কুরআনের ভাষা হওয়ায় আরবিকে ঘৃণা করে * আল্লাহর ঘর মসজিদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে * আলিম-উলামা ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ইসলাম মানার কারণে ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে * মসজিদ-মাদ্রাসাসহ ইসলামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর প্রতি বিদ্বেষ রাখে * জীবনে কখনও নামাজ-রোজা, হজ-জাকাত ও কোনো প্রকারের ইবাদতের ধার ধারে না; বরং সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে * বিপরীতে শিরকের নিদর্শনগুলোকে পছন্দ করে * কাফের-মুশরিকদের সঙ্গে তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভালোবেসে অন্তরঙ্গতা রাখে এবং এক্ষেত্রে ইসলামের ওয়ালা-বারার মূলনীতিকে প্রাচীন আরব সংস্কৃতির মেয়াদোত্তীর্ণ উত্তরাধিকার ভাবে * নাস্তিক-মুরতাদ ও পৌত্তলিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখে আলিম ও তালিবুল ইলমদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে * শাতিমদের নিরাপত্তা দিয়ে নবি প্রেমিকদের বুকে গুলি চালায়, তবে সে ঈমানের দাবি সত্ত্বেও কাফের হয়ে যাবে। কারণ, সে মুখে যা দাবি করছে অন্তরে সেটা নেই। কাজে যা প্রকাশ করছে সেটাই ধর্তব্য হবে। তার মুখের দাবির কোনো মূল্য থাকবে না। যেমন: কেউ মুখে কাউকে ভালোবাসার কথা বলে, কিন্তু তার কাজেকর্মে স্রেফ ঘৃণা ও বিদ্বেষের প্রকাশ ঘটে, তবে তার মুখের কথার কোনো মূল্য নেই।[১] আল্লাহ বলেন,

وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَ نَلْعَبُ قُلْ اَ بِاللّٰهِ وَ اٰيٰتِهٖ وَ رَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ. لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ.

অর্থ: 'যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, তারা বলবে—আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং মজা করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর আয়াতের সাথে এবং তাঁর রাসুলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? কোনো অজুহাত দিয়ো না। তোমরা তো কাফের হয়ে গেছ ঈমান আনার পরে।...' [তাওবা: ৬৫-৬৬]

কাজি ইয়াজ লিখেছেন, আহলে সুন্নাতের সকল আলিমের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, যদি কেউ কুরআনের কোনো আয়াত প্রত্যাখ্যান করে, কিংবা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত ও সর্বসম্মত কোনো হাদিস অস্বীকার করে, যেমন: রজমকে অস্বীকার করা, অন্য ধর্মকে বিশুদ্ধ মনে করা ইত্যাদি, তবে সে মুখে ইসলাম দাবি করা সত্ত্বেও কাফের হয়ে যাবে। একইভাবে যদি

১. ইমদাদুল ফাতাওয়া (৫/৩৯৮); কিফায়াতুল মুফতি (১/৪৫-৫৬); ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া (২/৪৮১-৫৩৮); ফাতহুল মুলহিম (২/৫৮-৫৯); আরও দেখুন: কাশ্মীরিকৃত ইকফারুল মুলহিদিন।

কেউ মুখে মুসলিম দাবি সত্ত্বেও কাফেরদের কাজ করে, যেমন: মূর্তি বা সূর্য-চন্দ্র, ক্রুশের সামনে সিজদা করে, অথবা এমন কোনো কাজ করে যা সুস্পষ্টভাবে কাফেরদের কাজ হিসেবেই বিবেচিত হয়, কিংবা মানব হত্যা, মদ ও ব্যভিচারকে হালাল মনে করে, অথবা শরিয়তের সুস্পষ্ট কোনো বিধানকে, যেমন: নামাজের ওয়াক্ত বা রাকাআত সংখ্যা ইত্যাদি অস্বীকার করে, তবে সে কাফের হয়ে যাবে। মোট কথা, কেবল মুখে ইসলাম দাবি কর্মগত কুফরের প্রতিবন্ধক নয়।[১]

মুরজিয়াদের সংশয় নিরসন: কেউ কেউ এখানে সেসব হাদিস তুলে ধরতে পারেন, যেগুলোতে কেবল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার মাধ্যমেই জান্নাতে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে; কিংবা 'বিন্দু পরিমাণ ঈমান' থাকার কারণে জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের কথা বলা হয়েছে। তাদের কথা—পিছনে যেসব উদাহরণ উল্লেখ করা হলো—সেগুলোর মাধ্যমে কাউকে কাফের বলা কি বাড়াবাড়ি বা চরমপন্থা নয়? কারণ, অসংখ্য হাদিসে এসেছে, কারও অন্তরে দানা পরিমাণ ঈমান থাকলেও সে জান্নাতে যাবে। কেউ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বললে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন, তা হলে উপরে যাদের কথা বলা হলো, মুখে তারা ইসলাম নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করলেও, অন্তরে ও কাজেকর্মে ইসলাম ও শরিয়তের প্রতি তাদের বিতৃষ্ণা থাকলেও, দ্বীনদার মুসলিমদের প্রতি তারা বিদ্বেষ রাখলেও নিজেদের তো মুসলিম দাবি করে, এক আল্লাহকে মানে। তা হলে তাদের কেন কাফের-মুরতাদ বলা হবে? অথচ হাদিসে তাদের জান্নাতিই বলা হচ্ছে।

এটা মূলত মুসলিম উম্মাহর উপর মুরজিয়া সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার প্রভাব। সালাফের বুঝে বোঝা ইসলাম ও ঈমানের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। অনেকের ধারণা, মুরজিয়া সম্প্রদায় হাজার বছর আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বাস্তবতা হলো, মুরজিয়াদের উত্তরাধিকার আজও, বরং আরও সুন্দর রূপে আধুনিকতা, উদারতা ও প্রগতিশীলতার মোড়কে বিকিয়ে চলেছে নব্য মুতাজিলা ও মুরজিয়ারা। তাদের কাছে ইসলাম ও ঈমান অন্যান্য ধর্মের মতোই, যেমন হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম। আপনি নিজেকে হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ পরিচয় দিলে এবং তেমন একটি নাম বহন করলেই যথেষ্ট। বাস্তবে আপনি কী করেন, কী বিশ্বাস রাখেন এসব তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইহুদি-খ্রিষ্টান-সহ জগতের অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের অবস্থাও তথৈবচ। ফলে তাদের সংস্পর্শে এসে কিছু

---

১. শিফা, কাজি ইয়াজ (২/২৮৬-২৮৭)।

মুসলিম ইসলামকেও এমন ভাবতে শুরু করে। যেহেতু প্রবৃত্তির প্রবঞ্চনার ফলে আগে থেকেই তারা ইসলাম-সম্পর্কে মনে একটা ফ্রেম বানিয়ে রাখে, পরবর্তী সময়ে গবেষণার নামে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে কেবল সেসব আয়াত ও হাদিস কেটেকুটে বের করে, যেগুলো তাদের মতাদর্শকে আপাতদৃষ্টিতে সমর্থন করে। এরপর জোড়াতালি দিয়ে সেগুলোকে কোনোরকম একটা গ্রহণোগ্য সুরতে মুসলমানদের সামনে পেশ করে। এভাবে তারা নিজেদের কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী হিসেবে পেশ করতে চায়, তাদের গোমরাহিকে কুরআন-সুন্নাহ ও গবেষণার মোড়কে মুসলমানদের গেলাতে চায়। অথচ কুরআন-সুন্নাহ তাদের সকল বিচ্যুতি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

মুরজিয়াদের সকল সন্দেহের অপনোদন এই গ্রন্থে সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা সংক্ষিপ্ত কিছু কথা তুলে ধরছি। সর্বপ্রথম যে বিষয়টি স্পষ্ট হতে হবে, তা হলো—কুরআন-সুন্নাহর মূল ম্যাসেজ বিশেষ এক-দুটি আয়াত বা হাদিস দিয়ে বোঝা যায় না। বরং সবগুলো আয়াত ও হাদিস একত্র করে এরপর মর্ম বুঝতে হয়। সকল বিভ্রান্ত সম্প্রদায় প্রথম কাজটি করার ফলে বিভ্রান্ত। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে সুপথপ্রাপ্ত। তাই প্রথমেই কুরআন-সুন্নাহ কাটাকাটি ও জোড়াতালি দেওয়া বর্জন করতে হবে। সবগুলো আয়াত ও হাদিসকে সামনে রেখে ফয়সালা দিতে হবে। মুরজিয়াদের খণ্ডনে এই একটা মূলনীতিই যথেষ্ট।

তারা তাদের পক্ষে যেসব দলিল পেশ করে, তার কয়েকটি এমন—

এক. হুজাইফা ইবনুল ইয়ামানের হাদিস। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ইসলাম ক্ষয়ে যেতে থাকবে যেভাবে সুন্দর কাপড় ক্ষয়ে যায়। একপর্যায়ে রোজা, নামাজ, অন্য কোনো ইবাদত, সদকা বাকি থাকবে না। কোনো এক রাতে কুরআন উঠিয়ে নেওয়া হবে। ফলে ভূপৃষ্ঠে কুরআনের কোনে আয়াত বাকি থাকবে না। কেবল কিছু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থাকবে। তারা বলবে—আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই কালিমার উপর পেয়েছি। আমরা সেটাই বলব।' বর্ণনাকারী সিলাহ হুজাইফাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটুকু তাদের রক্ষা করবে, অথচ তাদের কাছে নামাজ-রোজা কিছু নেই? তিনবার জিজ্ঞাসা করার পরে হুজাইফা বললেন, 'হ্যাঁ, এটা তাদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে।'[১]

---

১. সুনানে ইবনে মাজা (৪০৪৯); মুসতাদরাকে হাকেম (৮৫৫৪)।

এই হাদিসটি পড়লেই, যাদের চোখ আছে, তাদের বোঝার কথা—এটা মুরজিয়াদের পক্ষে দলিল হতে পারে না। কারণ, এটা একটা বিশেষ অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এটা জনবিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপের অধিবাসী কিংবা কিয়ামতের আগমুহূর্তের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে, যখন কুরআন-সুন্নাহ কিছু থাকবে না। এটার জন্য তো বিদ্যমান লোকেরা দায়ী হতে পারে না। কারণ, তারা কালিমা পড়েছে এবং এটাই তাদের একমাত্র সামর্থ্যের বিষয় ছিল। সবকিছু থাকতে কালিমা কীভাবে যথেষ্ট হবে?

দুই. 'হাদিসুল বিতাকাহ' বা পত্রের হাদিস নামে প্রসিদ্ধ একটি বর্ণনা, যেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন, কিয়ামতের দিন একব্যক্তির আমলনামা পুরোটাই গুনাহ এবং অপরাধে ভরপুর থাকবে। কিন্তু তার কাছে একটি কাগজের টুকরা থাকবে, যেটাতে 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু' লেখা থাকবে। আর এই কাগজের টুকরাটি তার সকল (খারাপ) আমলনামার চেয়ে ভারী হয়ে যাবে এবং সে মুক্তি পাবে।[১]

তিন. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এ অবস্থায় যে, সে জানে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[২]

চার. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি বলবে—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরিক নেই। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল। ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর বান্দা, তার দাসী (মারইয়ামের) পুত্র এবং তাঁর কালিমা যা তিনি মারইয়ামের উপর ঢেলে দিয়েছেন। আরও সাক্ষ্য দেবে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য। আল্লাহ তাকে জান্নাতের আটটি দরজার যেটা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করাবেন।'[৩]

পাঁচ. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেবে যে, 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল', আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন।[৪]

---

১. তিরমিজি (২৬৩৯); ইবনে মাজা (৪৩০০); ইবনে হিব্বান (২২৫)।
২. মুসলিম (২৬)।
৩. বুখারি (৩৪৩৫); মুসলিম (২৮)।
৪. মুসলিম (২৯)।

ছয়. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির উপর জান্নাত হারাম করে দেবেন, যে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য বলবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।[১]

উপরের দুই থেকে ছয় নম্বর পর্যন্ত পাঁচটি হাদিস দিয়ে তারা প্রমাণ করতে চায় যে, কালিমা পড়াই মুক্তির জন্য যথেষ্ট, আমল আবশ্যক নয়। আমরা এর উপর কয়েকটি কথা বলব। প্রথমেই মনে রাখতে হবে, কালিমার গুরুত্ব অস্বীকারের সুযোগ নেই। নিঃসন্দেহে কালিমা গুরুত্বপূর্ণ এবং মুসলিম ও কাফেরের মাঝে পার্থক্যকারী। কিন্তু এসব হাদিসের কোথাও কি বলা হয়েছে—কালিমা পড়ে বসে থাকবে আর কোনো আমল করবে না? না, কোথাও এই কথা বলা হয়নি। বরং হাদিসের ভাষ্য দেখলে বোঝা যায়, স্রেফ কালিমার কথা বলা হয়নি। যেমন: শেষ হাদিসে বলা হয়েছে **'আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য'**। কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কালিমা পড়ে সারা জীবন সব ধরনের ইবাদত বর্জন করতে পারে? আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে কালিমা পড়ে, সে আল্লাহ কিংবা আল্লাহর রাসুলের প্রতি, দ্বীনের প্রতি বিদ্বেষ রাখতে পারে?

বাস্তবে উক্ত হাদিসগুলোর মর্ম হলো, কাফের থেকে মুমিনকে আলাদা করা, কাফেরের উপর মুমিনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা এবং মুমিন ব্যক্তি একদিন-না-একদিন জান্নাতি সেটা প্রমাণ করা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কালিমা পড়ে এই দ্বীনে প্রবেশ করবে, সে কিছু ভুল-বিচ্যুতি করলেও আল্লাহ তায়ালা তাকে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে দেবেন না; বরং এই কালিমার বরকতে সে জান্নাতি হবে। ফলে এই কালিমা আমলের ত্রুটি-বিচ্যুতি পূরণে সহায়ক হবে, কুফর ও রিদ্দতের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে না। বরং এই কালিমা তো কুফরের সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। যে ব্যক্তি অন্তর থেকে এই কালিমা পাঠ করে ও এতে বিশ্বাস রাখে, সে দ্বীন নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করতে পারে? দ্বীনের বিরোধিতা করতে পারে? যে ব্যক্তি আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে, সে আল্লাহর দেওয়া জীবনবিধানকে মধ্যযুগীয় বর্বর শাসন বলতে পারে? আল্লাহর বিধানকে আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার সঙ্গে অচল বলতে পারে? মানব রচিত শাসনকে আল্লাহর শাসনের চেয়ে উত্তম ভাবতে পারে? বোঝা গেল, এটা পড়ে থাকলেও পরবর্তী সময়ে সে কুফরিতে লিপ্ত হয়েছে, কিংবা এটা মুখে আওড়ালেও এর প্রতি আত্মসমর্পণ করেনি। আর সকল আলেমের মতে, কালিমা কেবল মুখে পড়া যথেষ্ট নয়; বরং অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে এবং আমলে পরিণত করতে হবে। সুতরাং এ ধরনের ব্যক্তি যদি

---

১. বুখারি (৪২৫); মুসলিম (৩৩)।

তাওবা করে কালিমার ছায়াতলে আশ্রয় না নেয়, তবে কেবল মুসলিম পরিবারে জন্ম, ইসলামি নাম বা পরিচয় বহন তাকে পরকালে উদ্ধার করতে পারবে না। এ জন্য সহিহ মুসলিমে বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, 'যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং **আল্লাহ ছাড়া যা-কিছুর উপাসনা করা হয় সবগুলোকে প্রত্যাখ্যান করবে**'[১]..., তার জন্য উপরের সুসংবাদগুলো প্রযোজ্য হবে। কেবল মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে জীবনভর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ করলে পরকালে এটা কোনো উপকারে আসবে না। ইবলিস কাফের কেন? সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে, সে আল্লাহকে সর্বশক্তিমান, সৃষ্টিকর্তা ও জীবনদাতা মানে। তার পরেও সে কাফের তার অহংবোধ থেকে আল্লাহর নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করার কারণে।[২]

কর্মের মাধ্যমে কুফরের প্রমাণ কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফের কালেই পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরে আবু বকর রাজি.-এর শাসনামলে আরবের বেশ কিছু গোত্র পরিপূর্ণরূপে ইসলাম থেকে বেরিয়ে মুরতাদ হয়ে যায়। কোনো কোনো গোত্র ইসলামে থাকে, কিন্তু জাকাত দিতে অস্বীকার করে। তখন আবু বকর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তারা যেহেতু ইসলামের কালিমাকে অস্বীকার করত না, নামাজ অস্বীকার করত না, কিংবা অন্যান্য বিধানকে অস্বীকার করত না, শুধু জাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল, এ জন্য অনেক সাহাবির কাছে ব্যাপারটা খটকা লাগল যে, তারা তো মুসলমান। মুসলমানদের বিরুদ্ধে কীভাবে যুদ্ধ করা যায়? স্বয়ং উমর ইবনুল খাত্তাব রাজি. আপত্তি তুললেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। কিন্তু যখন তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দেবে, তখন তারা নিজেরা ও তাদের সম্পদ সুরক্ষিত থাকবে।" সুতরাং যারা জাকাত দিতে অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কতটুকু সমীচীন হবে? আবু বকর রাজি. বললেন, 'আল্লাহর শপথ! রাসুলের যুগে যে ব্যক্তি একটি ছাগলের বাচ্চা জাকাত দিত, এখন যদি তা দিতে অস্বীকার করে, তা হলে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।' পরবর্তীকালে উমর-সহ অন্য সাহাবারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, সে সময়ে আবু বকরের সিদ্ধান্তই সঠিক ও যথাযথ ছিল। আল্লাহ তায়ালা তাঁর হৃদয় খুলে দিয়েছিলেন।[৩]

---

১. বুখারি (৪২৫); মুসলিম (৩৩)।
২. মাদারিসজুস সালেকিন, ইবনুল কাইয়িম (১/৩৪৬)।
৩. বুখারি (১৩৯৯, ৬৯২৪); মুসলিমের বর্ণনায় ছাগলের বাচ্চার বদলে রশির কথা এসেছে (২০)।

কারণ, জাকাত ইসলামের একটি ভিত্তি; কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। আর এটাকে তারা অস্বীকার করে মূলত কুরআন-সুন্নাহকেই অস্বীকার করল। যদি তারা জাকাতকে ফরজ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আদায়ে গাফিলতি কিংবা গড়িমসি করত, সেটাকে কবিরা গুনাহ কিংবা অপরাধ হিসেবে দেখা হতো; কিন্তু তারা এটাকে অস্বীকার করে বসে। ফলে বোঝা যায়, আল্লাহ ও রাসুলকে মেনে নেওয়ার এবং তাদের নির্দেশের সামনে আত্মসমর্পণের যে ঘোষণা তারা দিয়েছে, সেটা নির্ভেজাল নয়। কারণ, তাদের কর্মই প্রমাণ করছে—তারা আল্লাহ ও রাসুলকে মানে না; তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি তারা শাসক হিসেবে আবু বকর রাজি.-এর আনুগত্যও অস্বীকার করে। এভাবে দ্বীন ও রাষ্ট্র দুটোর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহে জড়ায়। ফলে সাহাবাগণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।[১]

হাফেজ হাকামি লিখেন, কর্মগত কুফরকে এ কারণে কর্মগত বলা হয়, কারণ সেটা মানুষের সামনে কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। নতুবা সেটা বিশ্বাসগত কুফরের একধরনের বহিঃপ্রকাশ। এটা তখনই একজন মানুষ থেকে প্রকাশ পায়, যখন তার অন্তর থেকে ঈমান, ইখলাস, আনুগত্য—সবকিছু দূরীভূত হয়ে যায়, ঈমানের ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট থাকে না। প্রথমে অন্তরে এগুলো তৈরি হয়, এর পর একসময় কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সুতরাং কর্মগত কুফর সন্দেহাতীতভাবে অন্তরের কুফরকে প্রমাণ করে। অন্তরে কুফর না থাকলে কেউ এমন কাজ করতে পারে না।[২]

---

১. আল-ফাসল (২/৬৬-৬৭); ফয়জুল বারি (৩/৯০-৯২)।
২. আলামুস সুন্নাহ, হাকামি (১০০)।

وَالإِيمَانُ هُوَ الإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالتَّصْدِيقُ بِالْجَنَانِ. وَجَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّرْعِ وَالبَيَانِ كُلُّهُ حَقٌّ. وَالإِيمَانُ وَاحِدٌ، وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بِالْخَشْيَةِ وَالتُّقَى وَمُخَالَفَةِ الْهَوَى وَمُلَازَمَةِ الأَوْلَى. وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَانِ، وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ أَطْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلقُرْءَانِ.

আর ঈমান হলো: মুখে স্বীকার করা, অন্তরে সত্যায়ন করা। হাদিসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যত বক্তব্য ও বিধি-বিধান বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত, সবকিছুই সত্য। ঈমান একটি একক। মূল ঈমানের ক্ষেত্রে সকল মুমিন অভিন্ন স্তরে। তবে তাদের মাঝে স্তরভেদ ঘটে আল্লাহর ভয়, তাকওয়া, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সর্বাবস্থায় উত্তম পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে। সকল মুমিন দয়াময় আল্লাহর বন্ধু। আর তাদের মাঝে সে সর্বোত্তম যে আল্লাহর সবচেয়ে বেশি অনুগত, কুরআনের কাছে সবচেয়ে বেশি সমর্পিত।

ব্যাখ্যা

ঈমানের পরিচয়: ঈমান কী? সচরাচর আমরা ঈমান বলতে বুঝি বিশ্বাস, সত্যায়ন ইত্যাদি। কোনোকিছু হৃদয়ে গভীরভাবে বিশ্বাস করা এবং মুখে তার স্বীকৃতি দেওয়ার নাম ঈমান। শরিয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব, তাঁর সত্তা, তাঁর সকল নাম, গুণ ও কর্ম, তাঁর রবুবিয়্যাহ, উলুহিয়্যাহ ও হাকিমিয়্যাহ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওত ও রিসালাত, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর আনীত ইসলামের সকল গায়েবি বিষয়, শরিয়তের সকল বিধি-বিধান **হৃদয়ের গভীর থেকে সুদৃঢ় ও সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করা, মুখে সেগুলোর স্বীকৃতি দেওয়া** এবং **কাজে পরিণত করাকে** ঈমান বলা হয়।

কুরআনের অসংখ্য আয়াত এবং অগণিত হাদিসে এসব বক্তব্য বিদ্যমান। যেমন: **হৃদয়ের বিশ্বাস**-সংক্রান্ত বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

قَالَتِ الْأَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ

অর্থ: 'বেদুইনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আপনি তাদের বলে দিন, তোমরা ঈমান আনোনি; বরং বলো আমরা ইসলাম গ্রহণ (বাহ্যিক বশ্যতা স্বীকার) করেছি। (কারণ) **এখনও তোমাদের হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করেনি।**' [হুজুরাত: ১৪] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ.

অর্থ: 'যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান আনে, তাদের আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। **তাদের হৃদয়ে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন।**' [মুজাদালা: ২২] আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ.

অর্থ: 'হে রাসুল, তাদের জন্য ব্যথিত হবেন না যারা দৌড়ে গিয়ে কুফরে পতিত হয়, যারা মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তাদের হৃদয় ঈমান আনেনি।' [মায়িদা: ৪১]

কুরআনের পাশাপাশি অসংখ্য হাদিসে হৃদয়কে ঈমানের আধার সাব্যস্ত করা হয়েছে। বিশেষত সেসব হাদিস যেখানে পরকালে সামান্য পরিমাণ ঈমানের বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ এসেছে। যেমন: একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'জান্নাতবাসী যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে আর জাহান্নামবাসী জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ বলবেন, জাহান্নাম থেকে সেসব লোকদের বের করে আনো যাদের **হৃদয়ে** এক সরষেদানা পরিমাণ **ঈমান** রয়েছে।'[১] আরেকটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যার **হৃদয়ে** সরষেদানা পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। আর যার হৃদয়ে সরষেদানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।'[২]

---

১. বুখারি (২২); ইবনে হিব্বান (২২২)।
২. মুসলিম (৯১); ইবনে হিব্বান (২২৪)।

উক্ত আয়াত ও হাদিসগুলোতে হৃদয়কে ঈমানের আধার সাব্যস্ত করা হয়েছে। বোঝা গেল, কেউ যদি ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো মুখে স্বীকার করে কিন্তু হৃদয়ে বিশ্বাস না করে, তবে সে মুমিন নয়। এমন লোককে বলা হয় মুনাফিক। আর মুনাফিকরা কাফেরদের মতো পরকালে চিরস্থায়ী জাহান্নামি [নিসা: ১৪৫]। কারণ, হৃদয়ের গভীর বিশ্বাস না থাকলে স্রেফ মুখের স্বীকারোক্তি কোনো কাজে আসবে না।

মুখের স্বীকৃতিও কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত, যেটিকে আমরা 'শাহাদাহ' নামে আখ্যায়িত করি। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আমাদের মুখে ঈমানের স্বীকৃতি দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ مَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ.

অর্থ: '**তোমরা বলো,** আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর; যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি, যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁর বংশধরের প্রতি এবং মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবিকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, সে সবকিছুর উপর। আমরা তাদের কারও মাঝে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আজ্ঞাবহ।' [বাকারা: ১৩৬] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি মানুষের সঙ্গে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি **যতক্ষণ না তারা বলে**—আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল...।'[১] ইমাম নববি এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, উক্ত হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, ঈমান সংঘটিত হওয়ার জন্য মুখে শাহাদাহ পড়া (স্বীকৃতি দেওয়া) আবশ্যক।[২]

কাজে পরিণত করাও কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ.

অর্থ: 'তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে জান-মাল দ্বারা জিহাদ করে। আর তারাই

---

১. বুখারি (৩৯২, ১৩৯৯); মুসলিম (২০, ২১)।
২. শরহে মুসলিম, নববি (১/২১২)।

সত্যনিষ্ঠ।' [হুজুরাত: ১৫] অন্য আয়াতে কীভাবে মানুষের বাহ্যিক অবস্থা ও আমলের উপর ঈমানের প্রভাব পড়ে আল্লাহ সেই ছবি এঁকেছেন এভাবে:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.

অর্থ: 'মুমিন তারা যাদের অবস্থা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, তখন তাদের হৃদয় ভীত হয়ে পড়ে। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় রবের উপর ভরসা করে।' [আনফাল: ২] আল্লাহ অন্য একটি আয়াতে বলেন,

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ

অর্থ: 'আর আল্লাহ তোমাদের ঈমান নষ্ট করার মতো নন।' [বাকারা: ১৪৩] এখানে ঈমান বলতে বিভিন্ন **আমল** উদ্দেশ্য।

রাসুলুল্লাহর একাধিক হাদিসেও বিভিন্ন আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একটা হাদিসে তিনি সাহাবায়ে কেরামের একটি প্রতিনিধি দলকে এভাবে ঈমান শিখিয়েছিলেন, "তোমরা কি জানো ঈমান কী? ঈমান হচ্ছে 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই'—এই সাক্ষ্য দেওয়া, নামাজ কায়েম করা, জাকাত প্রদান করা, গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ (আল্লাহর জন্য) প্রদান করা।"[১] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি হাদিস বিভিন্ন শব্দে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে, যেখানে তিনি বলেছেন, ঈমানের সত্তর কিংবা ষাটটিরও বেশি শাখা রয়েছে। সর্বোত্তম শাখা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সাক্ষ্য দেওয়া, আর সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে ময়লা-আবর্জনা সরিয়ে ফেলা; আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।[২]

ঈমানের সংজ্ঞা: কুরআন ও সুন্নাহর কোথাও ঈমানের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। ফলে ঈমান কীভাবে সংঘটিত হবে সেটা নিয়ে প্রচণ্ড মতবিরোধ তৈরি হয়েছে। অনেকগুলো সম্প্রদায় এক্ষেত্রে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। সমস্যা মূলত ঈমান অস্পষ্ট বিষয় এমন নয়; বরং এসব বিভ্রান্ত ফিরকা প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। ঈমানকে নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে, যাতে তারা মুমিন হিসেবেও

---

১. বুখারি (৭৫৫৬); সুনানে কুবরা, নাসায়ি (৫১৮২)।
২. মুসলিম (৩৫); ইবনে হিব্বান (১৯১)।

পরিচিতি পায় আবার প্রবৃত্তির চাহিদাও পূরণ করে যায়। ফলে ঈমানের ক্ষেত্রে তারা যে সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা প্রদান করেছে, সেগুলো ভুল ও ঈমানের অপব্যাখ্যা; যেমন মুরজিয়া ও জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়। তারা ঈমান বলতে মনে করে কেবল 'মারিফাহ' তথা আল্লাহকে জানা। এ হিসেবে ফেরাউন, আবু জাহল, আবু লাহাব, আহলে কিতাব তথা ইহুদি-খ্রিষ্টান, আরবের অনেক মুশরিকরাও মুমিন। বরং এ হিসেবে ইবলিসও মুমিন। কারণ, সে জানে আল্লাহ এক।[1]

তবে কুরআন ও সুন্নাহে সরাসরি ঈমান কীভাবে সংঘটিত হয় সে কথা না থাকায় খোদ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীরাও এক্ষেত্রে চরম মতভেদের শিকার হয়েছেন। জমহুর উলামায়ে কেরাম একভাবে এটার সংজ্ঞা দিয়েছেন; হানাফিগণ একটু অন্যভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন; আশআরিগণ আরেকটু অন্যভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। সুখের বিষয় হলো, আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন ধারার এই মতভেদ বাতিল ফিরকাগুলোর মতো নয়। কারণ, তারা মৌলিক বিষয়গুলোতে একমত। ফলে যেক্ষেত্রে মতবিরোধ করেছেন, সেগুলোর মাঝে সমতাবিধান সম্ভব। অন্য কথায়, বাতিল ফিরকাগুলোর প্রদত্ত ঈমানের সংজ্ঞা অনুযায়ী কাফেররাও মুমিন হয়ে যায়। কিন্তু আহলে সুন্নাতের প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলোয় নিজেদের মাঝে মতপার্থক্য থাকলেও কাফের তাতে মুমিন হয় না, আবার মুমিনও কাফের হয় না। ফলে এই মতবিরোধ সামান্য এবং গৌণ। কাশ্মীরি রাহি.-এর ভাষায়—এটা তাত্ত্বিক বিষয়, যেটাকে মানুষ আকিদা বানিয়ে ফেলেছে।[2] এটা অধমেরও পর্যবেক্ষণ এবং বিশুদ্ধ পর্যবেক্ষণ, ইনশাআল্লাহ। তবে একটি ধারার আলিমগণ বিষয়টি নিয়ে অতিরঞ্জিত করেন এবং নিজেরা বাদে আহলে সুন্নাতের অন্যান্য ধারাকে এক্ষেত্রে ভুল সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেন। তারা উক্ত মতবিরোধটাকে শাব্দিক মানতেই চান না; বরং মৌলিক মতভেদ সাব্যস্ত করে হানাফিদের মুরজিয়া বলেই শান্তি পান। ঈমান যেহেতু আমাদের দ্বীনের মূলকথা, এটা নিয়ে যেহেতু অনেকগুলো গোমরাহ ফিরকার উৎপত্তি ঘটেছে। স্বয়ং আহলে সুন্নাত নিজেরা এটা নিয়ে মতবিরোধ করেছেন, তাই ঈমানের সংজ্ঞা ও পরিচয়-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে একটু সবিস্তার আলোচনা করা জরুরি মনে করছি।

আহলে সুন্নাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামের মতামত: তিন ইমাম তথা মালেক, শাফেয়ি, আহমদ বিন হাম্বল-সহ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিসের মতে, ঈমান **তিনটি** বিষয়ের

---

১. ইবনে আবিল ইজ্জ (৩১৪-৩১৫)।
২. ফয়জুল বারি (১/১৩১)।

সমষ্টি—হৃদয়ের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি এবং আমলের মাধ্যমে সেই বিশ্বাসের পরিণতি। ইমাম শাফেয়ি থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন, সাহাবায়ে কেরাম এবং যে তাবেয়িদের আমরা পেয়েছি, তারা সবাই এই ব্যাপারে একমত ছিলেন যে, ঈমান হলো মুখে স্বীকৃতি (কওল), কাজে পরিণতি (আমল) ও অন্তরের সত্যায়ন (নিয়ত)। একটি ছাড়া অপরটি পূর্ণ হবে না।[১] ইমাম তিরমিজি তার সুনানে উমর ইবনে হারুন থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন, ঈমান হচ্ছে মুখের স্বীকৃতি (কওল) ও আমল।[২] বোঝা যায়, ইমাম তিরমিজিও উক্ত মত সমর্থন করেন। ইমাম বাইহাকি তার সুনানে কুবরাতে সালাফের অনেক ইমামের নাম উল্লেখ করেছেন, যারা আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন। তাদের মাঝে আনাস ইবনে মালেক, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ, ফুজাইল ইবনে ইয়াজ, হাফস ইবনে গিয়াস, ওয়াকি, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইয়াজিদ ইবনে হারুন, আবদুর রহমান ইবনে মাহদি, বুখারি, মুসলিম, আবু উবাইদ কাসিম ইবনে সাল্লামের মতো ইমামগণ রয়েছেন।[৩] হুমাইদি তাঁর মুসনাদে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ থেকে উক্ত আকিদা বর্ণনা করেছেন এবং নিজেও সেটা সমর্থন করেছেন।[৪] লালাকায়ি বুখারির সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি হিজাজ, মক্কা, মদিনা, কুফা, ওয়াসেত, ইরাক, বাগদাদ, শাম ও মিশরের হাজারের অধিক আলিমের সাক্ষাৎ পেয়েছি। (অনেকের নাম উল্লেখ করে বলেন) তাদের কাউকে এই বিষয়ে আমি মতভেদ করতে দেখিনি যে, দ্বীন (তথা ঈমান) হলো মুখের স্বীকারোক্তি ও আমল।[৫] পিছনে উল্লিখিত আয়াত ও হাদিসগুলো তাদের বক্তব্যের দলিল।

খারেজি ও মুতাজিলাদের মত: খারেজি ও মুতাজিলারা সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলে সুন্নাতের ইমামদের মতো ঈমানকে অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি এবং কাজের পরিণতি—এই তিনের সমন্বয় বলে। তাদের দলিল সেগুলোই যেগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ সালাফের দলিল। কিন্তু সমস্যা হলো, তারা আমলের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে, যা আমরা পিছনে বর্ণনা করে এসেছি। তাদের মতে, কেউ কবিরা গুনাহে লিপ্ত হলে কাফের হয়ে যায়। মুতাজিলাদের মতবাদও এমন। তারা কবিরা গুনাহকারীকে শুধু পৃথিবীতে কাফের বলে না। খারেজিদের মতো তারাও তাকে পরকালে চিরস্থায়ী জাহান্নামি বলে।

---

১. শরহুস সুন্নাহ, লালাকায়ি (৫/৯৫৬)। লালাকায়ি শাফেয়ির কিতাবুল উম্ম সূত্রে বর্ণনাটি নকল করেছেন। কিন্তু কিতাবুল উম্ম-এ অধম এমন কোনো বর্ণনা পাইনি। আল্লাহু আলাম। আকহাসারি (১৯২-১৯৩)
২. তিরমিজি (২৭৬২)।
৩. সুনানে কুবরা, বাইহাকি (২০৯৫০)।
৪. মুসনাদে হুমাইদি (উসুলুস সুন্নাহ; ১৩৩৩)।
৫. লালাকায়ি (১/১৯৩)।

কাররামিয়্যাহ ও জাহমিয়্যাহদের মত: কাররামিয়্যাহ সম্প্রদায় মনে করে, ঈমান কেবল মুখের স্বীকারোক্তি। ফলে তাদের মতাদর্শ অনুযায়ী মুনাফিকরাও মুমিন হয়ে যায়। আর জাহমিয়্যাহ তথা চরমপন্থি মুরজিয়াদের মতে, ঈমান হচ্ছে জানা। সুতরাং কেউ 'আল্লাহ আছেন' জানলেই মুমিন। এ হিসেবে পৃথিবীর অধিকাংশ কাফেরই মুমিন। কারণ, প্রত্যেকেই জানে একজন স্রষ্টা আছেন। মানা-না মানা সমান।[১]

ইমাম আবু হানিফা-আশআরি-মাতুরিদিদের মত: ইমাম আবু হানিফা, তার শাগরিদ এবং পরবর্তী হানাফি ইমামগণ, যেমন সারাখসি ও (সদরুল ইসলাম) বাজদাবির মতে, ঈমানের দুটো রুকন। এক. হৃদয়ের বিশ্বাস (তাসদিক); দুই. মুখের স্বীকারোক্তি (ইকরার)। আমল ঈমানের অংশ নয়। ইমাম মাতুরিদিও উক্ত আকিদা রাখেন।[২] **ইমাম ত্বহাবি রাহি. উক্ত মতই পোষণ করেন**। তবে পরবর্তী হানাফিদের অনেকের ব্যাখ্যা দ্বারা বোঝা যায়, তারা ঈমানের রুকন বলেন কেবল অন্তরের সত্যায়নকে। মুখের স্বীকারোক্তি বাহ্যিক বিধি-বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত রুকন; আসল রুকন নয়। ফলে সেটা মৌলিক ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, দেখা যায়, অনেক সময় মুখে কেউ ঈমানের স্বীকারোক্তি দেয়, অথচ বাস্তবে সে মুমিন নয়। আর তাদের সকলের মতে, আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইমাম আবুল হাসান আশআরির এক্ষেত্রে একাধিক মত পাওয়া যায়। কোনোটাতে বোঝা যায় তিনি ঈমান বলতে কেবল হৃদয়ের সত্যায়ন বুঝতেন।[৩] আবার কোনো গ্রন্থে তিনি জমহুরের মতো সত্যায়ন, স্বীকারোক্তি ও আমল তিনটাই বুঝতেন এবং সম্ভবত এটা তার সর্বশেষ মত।[৪] কিন্তু পরবর্তীকালে আশআরিদের মাজহাব হয় প্রথমটা, অর্থাৎ হৃদয়ের সত্যায়ন; আর স্বীকারোক্তি বাহ্যিক বিধান প্রয়োগের শর্ত। ফলে কেউ হৃদয়ে স্বীকার করে মুখে স্বীকারোক্তি না দিলেও আল্লাহর কাছে মুমিন হিসবে গণ্য হবে। সে হিসেবে **আশআরি ও (পরবর্তী) মাতুরিদিদের মতপার্থক্য শাব্দিক।**[৫] তাদের মৌলিক ও বৃহৎ পার্থক্য হচ্ছে জমহুরের সঙ্গে। কারণ, এই দুই ধারার কোনো ধারাই আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত ধরে না। তাই আমরা দুটোকে এক মাজহাব হিসেবে উল্লেখ করে আলোচনা করব।

---

১. গুআইবি (২০৪-২০৫)।
২. উসুলুদ্দিন, সারাখসি (১/৬০); উসুলুদ্দিন, বাজদাবি (১৪৮-১৫১); তাওহিদ, মাতুরিদি (৩৭৩-৩৮০); শরহুল আকাইদ, নাসাফি (৮০)।
৩. উসুলুদ্দিন, বাজদাবি (১৪৮)।
৪. আল-ইবানাহ, আশআরি (২৭)।
৫. গজনবি (১১৯); আকহাসারি (১৯৪); গুনাইমি (৯৮-৯৯); সাইদ ফুদাহ (৯৬৪)।

তাদের দলিল হচ্ছে কুরআনের সেসব আয়াত এবং রাসুলের সেসব হাদিস, যেখানে আমলকে ঈমান থেকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে; কিংবা যেখানে ঈমানকে হৃদয়ের বিশ্বাসের মাঝে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে; আমলকে ঈমান গণ্য করা হয়নি। যেমন: আল্লাহর বাণী:

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

অর্থ: 'আর যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, আপনি তাদের জান্নাতের সুসংবাদ দিন...।' [বাকারা: ২৫] আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

অর্থ: 'আর যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তারাই জান্নাতের অধিবাসী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।' [বাকারা: ৮২] আল্লাহ বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

অর্থ: 'নিশ্চয় যারা ঈমান আনে আর নেক আমল করে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত প্রদান করে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে বিনিময় রয়েছে। আর তাদের কোনো ভয় নেই। তারা দুঃখিত হবে না।' [বাকারা: ২৭৭] আল্লাহ বলেন,

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থ: 'আর যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, আল্লাহ তাদের পরিপূর্ণ বিনিময় দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ জালেমদের পছন্দ করেন না।' [আলে ইমরান: ৫৭] [নিসা: ৫৭, ১২২, ১৭৩] আল্লাহ বলেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ.

অর্থ: 'যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।' [মায়িদা: ৯] আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ.

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারা সৃষ্টিজগতের সর্বোত্তম।' [বাইয়িনাহ: ৭] আল্লাহ মুমিনদের পরিচয়ে বলেন,

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ.

'আর যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে এবং নামাজ কায়েম করে।' [বাকারা: ৩] দেখুন, এখানে ঈমান ও নামাজ তথা ঈমান ও আমল ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। আল্লাহ আরেক আয়াতে বলেন,

وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَ لَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا.

'আর যে পুরুষ অথবা নারী মুমিন অবস্থায় পুণ্য করে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে; আর তাদের কোনো জুলুম করা হবে না।' [নিসা: ১২৪] এখানে নেক আমলের সঙ্গে ঈমান থাকাকে শর্ত করে দেওয়া হচ্ছে। কারণ, ঈমান ছাড়া আমলের দাম নেই। ঈমান ও আমল এক হলে আলাদা করে ঈমান শর্ত করার যুক্তি কী?

এভাবে প্রায় অর্ধশতের বেশি আয়াতে আল্লাহ ঈমান ও আমলকে আলাদা করে উল্লেখ করেছেন। আর আলাদা করার অর্থ এই দুটো আলাদাই। কেউ যুক্তি দেখাতে পারেন—আলাদা করে উল্লেখ করলেও দুটোর হাকিকত এক। কিন্তু তাদের এমন দাবি সঠিক নয়। আল্লাহ সুরা আসরে বলেন,

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ۬ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

অর্থ: 'তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে, নেক আমল করে, পরস্পরকে সত্যের ওসিয়ত করে, পরস্পরকে সবরের ওসিয়ত করে।' [আসর: ৩] চারটি বিষয় ভিন্ন। ফলে স্পষ্ট হলো, ঈমান ও নেক আমলের হাকিকত এক নয়।

হাদিসেও দুটোকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিসে জিবরিলে এসেছে, জিবরিল আলাইহিস সালাম যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি উত্তরে বললেন, 'আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসুলগণ, শেষ দিবস এবং তাকদিরের ভালো-মন্দে বিশ্বাস করা। আর যখন ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি নামাজ-রোজা হজ-জাকাত অর্থাৎ বাহ্যিক ইবাদতের কথা বললেন। এর মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়, আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়।[১]

---

১. বুখারি (৫০); মুসলিম (৮); তিরমিজি (২৬১০); আবু দাউদ (৪৬৯৫)।

শাব্দিক মতপার্থক্য, বাস্তবিক নয়: অধমের কাছে দীর্ঘ তুলনামূলক অধ্যয়নের পরে মনে হয়েছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমদের সঙ্গে হানাফি ও কালামি ধারার ঈমানকেন্দ্রিক মতপার্থক্য কেবল শাব্দিক মতপার্থক্য, মৌলিক নয়। কারণ, জমহুরের মতে যেমন আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত, তাদের মতেও তেমন। ইমাম হালিমি বলেন, ঈমানকে যখন আনুগত্য এবং আত্মসমর্পণের অর্থ ধরা হবে, তখন আমল তার অন্তর্ভুক্ত হবে।[১] আর যখন ঈমানকে কেবল সত্যায়ন ও বিশ্বাসের অর্থে ধরা হবে, তখন আমল তাতে প্রবেশ করবে না। অনেকটা ইসলাম ও ঈমানের মতো। একদিক থেকে ভিন্ন, অন্যদিক থেকে অভিন্ন। একইভাবে এখানেও। একসঙ্গে ঈমান ও আমল উল্লেখ করা হলে দুটোর অর্থ ভিন্ন হবে, কিন্তু আলাদা উল্লেখ করা হলে অভিন্ন হবে। আমরা গভীরভাবে দেখলে উপলব্ধি করব, জমহুরের মাজহাবও এমন। কারণ, জমহুরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, কেউ যদি কোনো সাধারণ আমল ছেড়ে দেয়, তা হলে ঈমান নষ্ট হবে কি না? তারা বলবেন, 'না, ঈমান নষ্ট হবে না; তবে কমে যাবে, দুর্বল হয়ে যাবে।' অথচ তাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, কেউ যদি ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলোর ভিতর থেকে কোনো বিষয় অস্বীকার করে, তা হলে কি সে মুমিন থাকবে? তারা বলবেন, 'অবশ্যই নয়।' যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, কেউ কোনো কারণে মুখে আল্লাহকে এক বলে ঘোষণা দিলো না, কিন্তু হৃদয়ে তাকে এক বিশ্বাস করে, সে মুমিন কি না? তারা বলবেন, 'হ্যাঁ, মুমিন।' তা হলে দেখা যাচ্ছে, তারা তিনটাকে ঈমান বললেও মূল ঈমান মানেন হৃদয়েরটা। বাকি দুটোকে পরিপূরক বলেন। আবার যদি তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়, একলোক দিন-রাত ইবাদত করে, কিন্তু অন্তরে আল্লাহকে অস্বীকার করে, কিংবা মুখে (ইকরাহ ছাড়া) অস্বীকার করে, তা হলে তার বিধান কী? তারা বলবেন, 'মুরতাদ।' তা হলে বোঝা গেল, তারা মুখের স্বীকারোক্তি ও আমলকে ঈমানের দুটি রুকন বললেও তিনটির মাঝে পার্থক্য করেন, ঠিক যেমন আশআরি-মাতুরিদিরা করেন। অর্থাৎ মূল ঈমান অন্তরের বিশ্বাস। মুখের স্বীকারোক্তি দুনিয়া ও মানুষকে জানানোর উদ্দেশ্যে। আর আমল ঈমানের পূর্ণাঙ্গতা। ফলে মূল ঈমানের ক্ষেত্রে আশআরি-মাতুরিদিদের সঙ্গে জমহুরের মৌলিক বিরোধ নেই।

ইমাম ইবনে হাজার লিখেন, ঈমানের ক্ষেত্রে সালাফের বক্তব্য হৃদয়ের বিশ্বাস, মুখের স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল; এখানে সালাফ আমলকে ঈমানের বিশুদ্ধতার শর্ত ধরেননি, বরং ঈমানের পূর্ণাঙ্গতার শর্ত বলেছেন। আর এ কারণেই

১. সাইদ ফুদাহ (৯৬৬-৯৬৭)।

মূলত তারা ঈমান বাড়ে-কমে বলেছেন। মুতাজিলাদের মতে, ঈমান সালাফের কথার মতোই তিন ভিত্তির উপর দাঁড়ানো। কিন্তু মুতাজিলা ও সালাফের মাঝে পার্থক্য হলো, মুতাজিলারা আমলকে ঈমানের বিশুদ্ধতার শর্ত মনে করে, অপরদিকে সালাফ পূর্ণাঙ্গতার শর্ত মনে করেন...।'[১] আর আশআরি-মাতুরিদিদের কাছেও আমল ঈমানকে পূর্ণাঙ্গতা দেয়। আমল ছাড়া কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারে না।

ইমাম আবু হানিফা কি মুরজিয়া? যখন এটা প্রমাণিত হলো যে, ঈমানের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের সঙ্গে আশআরি-মাতুরিদিদের মতপার্থক্য শাব্দিক, মৌলিক নয়; আরও প্রমাণিত হলো যে, তাদের সবাই সর্বসম্মতিক্রমে আমলের উপর জোর দেন; আমলকে একজন মুমিনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন; তখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এটি কেবল একটি তাত্ত্বিক সংজ্ঞা, যেখানে জমহুরের সঙ্গে তাদের দ্বিমত কেবল শাব্দিক, মৌলিক নয়। ফলে এমন একটু ভিন্নতার ফলে তাদের মুরজিয়া বলা অনেক বড় জুলুম এবং অনেক বড় অপবাদ। কারণ, মুরজিয়া হলো একটি ভ্রান্ত সম্প্রদায়, যারা আমলকে কোনো পাত্তাই দেয় না। কেউ সারা জীবন কোনো আমল না করলেও তাকে পূর্ণ ঈমানদার ভাবে, তার ঈমানকে আবু বকর ও জিবরাইলের ঈমানের মতো মনে করে। তাদের সঙ্গে ইমাম আবু হানিফার মতো মানুষকে তুলনা করে মুরজিয়া বলা কতটুকু ইনসাফ? বরং পিছনের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, ইমাম আবু হানিফার মাজহাব আর জমহুরের মাজহাবের মাঝে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই। একই কথা প্রযোজ্য আশআরি ও মাতুরিদিদের ক্ষেত্রেও। আশআরি-মাতুরিদিরা অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে জমহুরের সঙ্গে একমত। কেবল আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেন না, তাও একেবারেই করেন না এমন নয়, বরং সত্যায়ন ও বিশ্বাসের অর্থে করেন না, আত্মসমর্পণের অর্থে করেন। ফলে এই দুই ধারায় আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত বড় বড় ইমাম, যারা আমলের প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন এবং এই ধারার সাধারণ মুসলমানরা যারা আমলের ক্ষেত্রে অত্যন্ত যত্নবান, তাদের মুরজিয়াদের কাতারে ফেলা মোটেই ইনসাফ নয়।

হ্যাঁ, পূর্ববর্তী আলিমদের কারও কারও কলমে ইমাম আবু হানিফাকে মুরজিয়া বলা হয়েছে, যেমন: ইমাম আবুল হাসান আশআরি। তিনি আবু হানিফাকে মুরজিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[২] কিন্তু আজ যেমন গালি হিসেবে ব্যবহার করা হয়,

---

১. ফাতহুল বারি (১/৪৬)।
২. মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন, আশআরি (১৩৮)।

সালাফের ইমামগণ আবু হানিফাকে মুরজিয়া গালি অর্থে, কিংবা ভ্রান্ত ফিরকা মুরজিয়াদের সঙ্গে তুলনা করে বলেননি; বরং ইমাম আবু হানিফা কবিরা গুনাহকারীর বিধানকে 'ইরজা' করতেন, অর্থাৎ আল্লাহর কাছে সঁপে দিতেন। সেই কারণে মুরজিয়া বলা হয়েছে। শাহরাস্তানি লিখেন, 'কেউ কেউ ইমাম আবু হানিফা ও তার সঙ্গীদের মুরজিয়াতুস সুন্নাহ বলেছেন। এর কারণ, তিনি ঈমান বলতে কেবল সত্যায়নকে বুঝতেন। তারা বুঝেছেন, তিনি আমলকে গুরুত্ব দিতেন না; অথচ আমলের ক্ষেত্রে তিনি হাদিসও বর্ণনা করেছেন। তা হলে তিনি কীভাবে আমল ছেড়ে দেবেন?

তাকে মুরজিয়া বলার আরেকটি রহস্য আছে। তা হলো, **তার যুগে যারাই মুতাজিলা ও খারেজিদের বিরোধিতা করত, তারা তাকে মুরজিয়া হিসেবে আখ্যা দিত। ফলে সম্ভবত তারাই তাকে মুরজিয়া আখ্যা দিয়েছে।'**[১] ইমাম তাফতাজানি লিখেন, 'কবিরা গুনাহের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার মতে হচ্ছে, সে আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে—চাইলে তাকে শাস্তি দিতে পারেন, চাইলে ক্ষমা করতে পারেন; **আর এটা হচ্ছে হকপন্থিদের মাজহাব, যেটিকে ইরজা বলা হয়। অর্থাৎ কবিরা গুনাহকারীর ফয়সালা আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া। আর এ কারণে ইমাম আবু হানিফাকে মুরজিয়া বলা হয়েছে। অপরদিকে বাতিল মুরজিয়া হলো তারা, যারা মনে করে গুনাহের কারণে কোনো শাস্তিই হবে না...।'**[২]

ফলে ইমাম আবু হানিফাকে বাতিল মুরজিয়াদের মতো মনে করা কিংবা খোঁচা দেওয়া অসততা ও অনৈতিকতা চর্চা। পূর্ববর্তী আলিমদের যারা ইমাম আবু হানিফাকে মুরজিয়া বলেছেন, উপরের অর্থে বলেছেন। যদিও এটা অনুচিত হয়েছে, তথাপি অপবাদ নয়। যেমন: উসমান রাজি.-এর শাহাদাতের পরে যখন সাহাবাদের মাঝে জটিলতা তৈরি হলো, বিভিন্ন দলে তারা ভাগ হয়ে পড়লেন, তখন কিছু সাহাবি কোনো দলে না গিয়ে চুপ থাকলেন, অপেক্ষা করলেন। এটাকেও ইতিহাসে ইরজা হিসেবে নাম দেওয়া হয়েছে। ফলে সেসব সাহাবিও মুরজিয়া হন।[৩] কিন্তু তারা আর ভ্রান্ত মুরজিয়া কি এক? বরং শাব্দিক অর্থের প্রতি লক্ষ করেও সাহাবাদের কি 'মুরজিয়া' নাম দেওয়া শোভনীয় হবে? তাই মুসলিম উম্মাহর সংকটময় এই যুগে হকপন্থি ইমাম ও আহলে সুন্নাতের অনুসারী মুসলমানদের মুরজিয়া বলা বন্ধ করা দরকার। শাইখ

১. আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, শাহরাস্তানি (১/১৪১)।
২. শরহুল মাকাসিদ, তাফতাজানি (২/২৩৮)।
৩. তাহজিবুল আসার, তাবারি (২/৬৫৯)।

ইবনে আবিল ইজ লিখেন, এক্ষেত্রে ইমাম **আবু হানিফা এবং আহলে সুন্নাতের অন্যান্য ইমামের মাঝে যে মতবিরোধ রয়েছে, সেটা মৌলিক মতভেদ নয়, বরং শাব্দিক মতভেদ।** কারণ, উভয় দলই বলেন, ঈমানের সঙ্গে আমল জরুরি। আবার উভয় দলই বলেন, কবিরা গুনাহকারী কাফের নয়, বরং সে আল্লাহর ইচ্ছাধীন—চাইলে তিনি শাস্তি দেবেন, চাইলে ক্ষমা করে দেবেন।[১] শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভিও এটাকে স্রেফ শাব্দিক মতভেদ আখ্যা দিয়েছেন।[২] কাশ্মীরি এটাকে 'জুলুম' সাব্যস্ত করেছেন।[৩]

ঈমান কি বাড়ে-কমে? এটা মূলত পিছনের মাসআলা অর্থাৎ ঈমানের সংজ্ঞার সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি মাসআলা। ফলে ওখানে যে মতানৈক্য ছিল, এখানেও একই মতানৈক্য দেখা যাবে। জমহুর সালাফ, ইমাম আশআরি এবং অনেক আশআরিগণ মনে করেন, ঈমান বাড়ে ও কমে। যেমন: সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ, ফুজাইল ইবনে ইয়াজ, হাফস ইবনে গিয়াস, ওয়াকি, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইয়াজিদ ইবনে হারুন, আবদুর রহমান ইবনে মাহদি, বুখারি, মুসলিম, আবু উবাইদ কাসিম ইবনে সাল্লাম, হুমাইদি, শাফেয়ি, আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহাওয়াই প্রমুখ।[৪] সহিহ মুসলিমের একটি অধ্যায়ের শিরোনামই এমন: 'ঈমান বাড়ে ও কমে'।[৫] বরং সুনানে ইবনে মাজাতে এটা ইবনে আব্বাস, আবু হুরাইরা ও আবুদ দারদার বক্তব্য বলা হয়েছে।[৬] ইমাম শাফেয়ি থেকেও একাধিক বর্ণনায় এসেছে, তিনি ঈমান বাড়ে ও কমে বিশ্বাস করতেন। ইবনে হাজার এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে, বড় বড় ইমামদের মতামত উল্লেখ করে জমহুরের মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[৭]

এক্ষেত্রে তাদের দলিল কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বিভিন্ন হাদিসের বাহ্যিক অর্থ। যেমন,

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَـٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ.

---

১. ইবনে আবিল ইজ (৩১৫-৩২০)।
২. আত-তাফহিমাত (১/২৮)।
৩. ফয়জুল বারি (১২৯)।
৪. সুনানে কুবরা, বাইহাকি (২০৯৫০); মুসনাদে হুমাইদি (উসুলুস সুন্নাহ; ১৩৩৩); আল ইবানাহ, আশআরি (২৭)।
৫. সহিহ মুসলিম (৪৯)।
৬. সুনানে ইবনে মাজা (৭৪, ৭৫)।
৭. ফাতহুল বারি (১/৪৭)।

'আর যখন কোনো সুরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সুরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বৃদ্ধি করেছে? অতএব, যারা ঈমানদার এ সুরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা আনন্দিত হয়।' [তাওবা: ১২৪] অন্যত্র বলেন:

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ.

অর্থ: 'তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাজিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়...।' [ফাতহ: ৪] অন্য জায়গায় বলেন,

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖۗ وَّ قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

অর্থ: 'যাদের লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম, তাদের ভয় করো, তখন তাদের বিশ্বাস আরও বেড়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি উত্তম অভিভাবক।' [আলে ইমরান: ১৭৩] অন্যত্র বলেন,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ.

অর্থ: 'মুমিন তারা যাদের অবস্থা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয়, তখন তাদের হৃদয়গুলো ভীত হয়ে পড়ে। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় রবের উপর ভরসা করে।' [আনফাল: ২]

হাদিসের ক্ষেত্রে তারা সেসব হাদিস দিয়ে দলিল পেশ করেন, যেসব হাদিসে হৃদয়ে বিন্দু পরিমাণ ঈমান থাকার কথা বলা হয়েছে। তাদের যুক্তি হলো, এক সরষেদানা পরিমাণ থাকার অর্থ হলো, এভাবে ঈমান কমে গিয়েছে। আর যে বস্তু কমে, তা বাড়েও। যেমন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যার অন্তরে সরষেদানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর যার অন্তরে সরষেদানা পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।[১] এখানে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না—এর অর্থ হচ্ছে স্থায়ীভাবে প্রবেশ করবে না। নতুবা গুনাহের কারণে

১. আবু দাউদ (৪০৯১)।

আল্লাহ চাইলে জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারে। শাফায়াত-সংক্রান্ত লম্বা হাদিসে এসেছে, যখন আল্লাহর রাসুল এক শ্রেণির এমন মুমিনের জন্য সুপারিশ করবেন, যাদের আল্লাহ তায়ালা ইতোমধ্যে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছেন। আল্লাহ তাকে বলবেন, ঠিক আছে, যান। আপনি সেখান থেকে যার হৃদয়ে বিন্দু থেকে বিন্দু, বিন্দু থেকে বিন্দু পরিমাণ ঈমান আছে, তাকেও বের করে নিয়ে আসুন।[১] এখানে আমলের কথা বলা হয়নি। সম্পূর্ণ ঈমানের কথা বলা হয়নি; বরং অণু পরিমাণ ঈমানের কথা বলা হয়েছে। বোঝা গেল, ঈমান বাড়ে-কমে। আরেকটি প্রসিদ্ধ হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো অন্যায় দেখে, তখন সেটা যেন হাত দ্বারা প্রতিহত করে। যদি হাত দ্বারা প্রতিহত করতে না পারে, তবে যেন মুখ দিয়ে প্রতিহত করে। আর যদি তাও না পারে, তবে যেন হৃদয় দিয়ে প্রতিবাদ করে। আর এটাই হল সর্বনিম্ন ঈমান।[২] বোঝা গেল, সর্বোচ্চ ঈমানও আছে।

অপরদিকে ইমাম আবু হানিফা, মাতুরিদি ও কিছু আশআরি মনে করেন, মূল ঈমান কমা-বাড়ার সুযোগ নেই।[৩] মুমিনের আমল ও তাকওয়ার ভিত্তিতে তাদের মর্যাদা, আল্লাহর নৈকট্য কমে-বাড়ে; কিন্তু মূল ঈমান কমে-বাড়ে না। তাদের দলিল: কারণ ন্যূনতম যেসব বিষয়ে ঈমান আনা অপরিহার্য, যেসব বিষয়ে ঈমান না আনলে কাউকে মুমিন বলা যায় না এবং যেসব বিষয়ে ঈমান আনামাত্রই কাউকে মুমিন বলা যায়, সেসব বিষয়ে একজন নবির যেমন ঈমান আনতে হয়, একজন সাধারণ মানুষেরও ঈমান আনতে হয়; আর তা হলো কালিমা বা ঈমানের ছয় রুকন তথা আল্লাহ, ফেরেশতা, নবি-রাসুল, আসমানি কিতাব, আখিরাত দিবস, তাকদির। এগুলোর উপর সবার ঈমান আনতে হয়। নবি থেকে শুরু করে একজন মূর্খ মুমিন—সকলের জন্য একই সাক্ষ্য দিতে হয়। এখানে কারও জন্য কোনো কমবেশি নেই।

হ্যাঁ, সাক্ষ্যের মান ও গভীরতা তো সমান হবে না। ফলে ঈমানের মূল বিষয়ে সব মানুষ সমান হলেও শক্তি-সামর্থ্য ও নুরের ক্ষেত্রে সমান নয়। রাসুলদের ঈমানের ধারেকাছেও সাধারণ মানুষের ঈমান পৌঁছতে পারে না। ইবাদত, আনুগত্য ও তাকওয়ার ভিত্তিতে মুমিনদের মর্যাদা কমেবাড়ে। যে যত বেশি তাকওয়ার অধিকারী, তার ঈমান তত মজবুত, সে তত আল্লাহর কাছাকাছি। তার ঈমানের নুর ও স্বচ্ছতা, শক্তি ও ঔজ্জ্বল্য তত বেশি। এটাকেই ইমাম তহাবি বলেছেন, '**ঈমান একটি একক**

---

১. বুখারি (৭৫১০)।
২. মুসলিম (৪৯); ইবনে হিব্বান (৩০৬)।
৩. গুনাইমি (৯৯-১০০)।

মূল ঈমানের ক্ষেত্রে সকল মুমিন অভিন্ন স্তরে। তবে তাদের মাঝে স্তরভেদ ঘটে আল্লাহর ভয়, তাকওয়া, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং সর্বাবস্থায় উত্তম পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে।' পিছনে ঈমান হ্রাসবৃদ্ধি-সংক্রান্ত যত আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে, তারা সেগুলোকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ মূল ঈমান বাড়ে বা কমে না। বরং ঈমানের শক্তি ও পূর্ণাঙ্গতা বাড়ে ও কমে।[১]

আবু হানিফা রাহি. বলেন, আমাদের ঈমান ফেরেশতাদের ঈমানের মতো এ বিবেচনায় যে, আমরা আল্লাহর একত্ববাদ এবং রবুবিয়্যাতের উপর ঈমান রাখি, আল্লাহর পক্ষ থেকে যেগুলো আমাদের কাছে এসেছে, সেগুলোর উপর ঈমান রাখি। এগুলো সেসব বিষয় যেগুলোতে ফেরেশতারাও ঈমান রাখেন, নবি-রাসুলগণও রাখেন। তাই এই দিক থেকে আমাদের ঈমান তাদের ঈমানের মতো। কিন্তু ঈমানের সওয়াব, ইবাদত ইত্যাদির ক্ষেত্রে তারা আমাদের চেয়ে অনেক অনেক শ্রেষ্ঠ। এটা মূল ঈমানের অতিরিক্ত বিষয়। আল্লাহ তায়ালা যেভাবে তাদের নবুওতের মাধ্যমে পৃথিবীর সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, একইভাবে ইবাদত ও পুণ্যের ক্ষেত্রেও তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তারা পৃথিবীতে আল্লাহর বিশ্বস্ত বান্দা। ইবাদত ও আল্লাহভীরুতার ক্ষেত্রে পৃথিবীর কোনো মানুষ তাদের ধারেকাছেও যেতে পারবে না।[২]

এই মতভেদের ফলাফল কী? **প্রকৃতপক্ষে এটাও প্রথম মতভেদের মতো শাব্দিক, মৌলিক মতভেদ নয়।** ফলে এই মতভেদেরও মুফিদ ফলাফল নেই। জমহুর উলামায়ে কেরাম ঈমানকে শরীরী বস্তু মনে করেন না; বরং এটা বিমূর্ত ও অশরীরী অবস্থা। ফলে ঈমান বাড়া ও কমার যে ব্যাখ্যা তারা দেন, সেটার মাঝে আর আশআরি-মাতুরিদিদের ব্যাখ্যার মাঝে মৌলিক তফাত নেই। সাহাবি উমাইর ইবনে হাবিব ইবনে খুমাশা রাজি. ঈমান বাড়াকমার ব্যাখ্যায় বলেছেন, যখন আমরা আল্লাহর জিকির করি, তাকে ভয় পাই, সেটাকে ঈমান বাড়া বলে। আর যখন তাকে ভুলে যাই, গাফেল থাকি, সেটাকে ঈমান কমা বলে।[৩] **ইবনে মাসউদ-সহ কয়েকজন সাহাবি থেকে বর্ণিত আছে, তারা দোয়া করতেন—হে আল্লাহ, আমার ঈমান বাড়িয়ে দিন। স্পষ্টই যে, ঈমান তিনি এনেছেন, এখানে বাড়ানোর কিছু নেই। আল্লাহ যা বাড়াবেন, সেটা হচ্ছে ঈমানের নুর, বরকত ও শক্তি।**[৪]

---

১. গজনবি (১২৩); আকহাসারি (১৯৫-১৯৬)।
২. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম (১৪-১৫)।
৩. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩০৯৬৩)।
৪. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক (৬৬৬২); ইবনে আবিল ইজ্জ (৩২৭)।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, যেসব বিষয়ে ঈমান আনতে হয়, সেসব বিষয়ে পৃথিবী ও আকাশবাসীর ঈমান বাড়ে-কমে না; বরং যিনি ঈমান আনেন, তার ইয়াকিন ও সত্যায়নের দিক থেকে বাড়ে-কমে। বিশ্বের সকল মুমিন ঈমান ও তাওহিদের ক্ষেত্রে এক। তাদের মাঝে পার্থক্য আমলের ক্ষেত্রে।'[১] উল্লেখ্য, আমল বলতে এখানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল এবং হৃদয়ের আমল (তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, ইখলাস ইত্যাদি) দুটোই উদ্দেশ্য। আর জমহুর যখন ঈমান কমা-বাড়ার কথা বলেন, তারা এগুলোকেই উদ্দেশ্য নেন। সুতরাং তাদের মাঝে **মতপার্থক্য মৌলিক নয়, শাব্দিক**। মোল্লা আলি কারিও এটাকে ইমাম রাজির উদ্ধৃতি দিয়ে শাব্দিক মতপার্থক্য বলেছেন।[২] জফর আহমদ উসমানিও একই কথা বলেন।[৩] কাশ্মীরি বলেন, উভয় পক্ষের বক্তব্যই নিজস্ব জায়গায় সঠিক। কিন্তু ইখতিলাফ-পাগল মানুষজন এসে দুই দলকে দুই প্রান্তে নিয়ে যায় এবং বিভেদ ঘটায়।[৪] শাব্বির আহমদ উসমানি বলেন, ন্যায়নিষ্ঠ মুহাক্কিকমাত্রই উক্ত মাসআলাতে গভীর দৃষ্টি দিলে অনুভব করবেন, তাতে বিবাদের পরিমাণটা বেশি নয় এবং সেটাও শাব্দিক।[৫]

অধমেরও মনে হয়, **এটা শাব্দিক মতভেদ।** আবু বকর রাজি.-এর ঈমান গোটা উম্মাহর ঈমানের সমান। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি এমন সব বিষয়ে ঈমান রাখেন, যা গোটা উম্মাহ রাখে না; বরং আবু বকর যেগুলোতে ঈমান রাখেন, আমরা সবাই সেগুলোতে ঈমান রাখি। ফলে মূল ঈমানের মাঝে পার্থক্য নেই। কিন্তু আমাদের সবার ঈমানের চেয়ে আবু বকর রাজি.-এর ঈমান ভারী। কারণ, তার ইয়াকিন, সততা, নিষ্ঠা ও ইবাদতের সামনে আমাদের সবকিছু তুচ্ছ। এভাবে বুঝলে অযথাই ইমাম আবু হানিফা ও তার অনুসারীদের গলদ বলার দরকার হয় না। হ্যাঁ, কোনো ভ্রান্ত সম্প্রদায় যদি আমলকে পাত্তা না দেয় এবং ইমামের বক্তব্য দিয়ে যুক্তি দেয়, সেটা তার সমস্যা। এ জন্য সে নিন্দাযোগ্য, ইমাম নন।

হাদিস অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সতর্কবাণী: মুসলিম বিশ্বে সম্প্রতি একটি ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, যারা আল্লাহর রাসুলের সুন্নাহ অস্বীকার করে, কিন্তু মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য আল্লাহর কুরআনকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার

---

১. ফিকহুল আকবর (৫৫)।
২. শরহে ফিকহিল আকবর, আলি কারি (২৫৭-২৫৮)।
৩. ইলাউস সুনান (১৯/২৩৫)।
৪. ফয়জুল বারি (১/১৩৮-১৪০)।
৫. ফাতহুল মুলহিম (১/৪০৩)।

করে। অর্থাৎ মুসলমানরা যেহেতু সুন্নাহকে ছেড়ে দেওয়ার কথা বললে তাদের প্রত্যাখ্যান করবে, এ জন্য তারা সুন্নাহকে সরাসরি নিশানা বানায় না, বরং কুরআন আঁকড়ে ধরার প্রতি গুরুত্ব দেয়। কেবল কুরআনকেই মুক্তির সনদ বলে ঘোষণা করে। এতে সাধারণ মানুষ তাদের প্রতারণার জালে ফেঁসে যায়। কুরআনের গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে যে তারা সুন্নাহ অস্বীকার করছে, সাধারণ মানুষ সেটা বুঝতে পারে না। তবে এদের অস্তিত্ব নতুন নয়। অনেক আগ থেকেই এরা মুসলিম সমাজে বিভিন্ন নামে বিদ্যমান; অথচ সুন্নাহ ছাড়া কেবল কুরআনের মাধ্যমে ইসলাম দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। কেউ সুন্নাহ ছাড়া আল্লাহর ইবাদত করতে পারবে না, আল্লাহর দাসত্ব করতে পারবে না। কারণ, কুরআন ও সুন্নাহ দুটোই আল্লাহর ওহি। একটি কুরআনে লিপিবদ্ধ হয়েছে, আরেকটি লিপিবদ্ধ করা হয়নি। কুরআন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলছে,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى

অর্থ: 'আর তিনি প্রবৃত্তির অনুসরণে কথা বলেন না।' [নাজম: ৩] কুরআনের অপর আয়াতে এসেছে,

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

অর্থ: 'রাসুল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ করো; আর যা থেকে বারণ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।' [হাশর: ৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাহ অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে সতর্ক করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তিনি বলেন, 'মনে রেখো, আমাকে কুরআন দেওয়া হয়েছে এবং কুরআনের সঙ্গে সমপরিমাণ দেওয়া হয়েছে। সাবধান! অতি শীঘ্রই এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা পেট পুরে খেয়ে চেয়ারে চিত হয়ে বলবে, তোমাদের জন্য কুরআনই যথেষ্ট। তাতে যা-কিছু হালাল পাও, সেগুলোকে হালাল মনে করো। আর তাতে যা-কিছু হারাম পাও, সেগুলোকে হারাম মনে করো।'[১] এ কারণে ইমাম তহাবি তাদের খণ্ডনে বলেছেন, **'হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যত বক্তব্য ও বিধি-বিধান বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত, সবকিছুই সত্য।'** এগুলোকে অস্বীকার করা যাবে না।

১. আবু দাউদ (৪৬০৪); মুসনাদে আহমদ (১৭৪৪৭)।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে এ সম্প্রদায় অসংখ্য মানুষকে গোমরাহ করছে, হাদিসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তুলছে। তাই তাদের ভ্রান্তির ব্যাপারে কথা বলা দরকার। তাদের ভুলগুলো তাদের ও সাধারণ মুসলমানদের জানানো দরকার। তারা কুরআন মানে, অথচ কুরআন তাদের কাছে অবতীর্ণ হয়নি, আল্লাহর রাসুলের মাধ্যমেই এসেছে। একটাকে গ্রহণ করে আরেকটা অস্বীকার করার মানে কী? কুরআন আকাশ থেকে ছাপা হয়ে আসেনি। সাহাবায়ে কেরাম কুরআন সংকলন করেছেন। হাদিসও তারা বর্ণনা করেছেন। একটাকে স্বীকার করে আরেকটা অস্বীকার করা বৈপরীত্য। আল্লাহ তাদের হিদায়াতের আলো দিন। কুরআন ও সুন্নাহ দুটোকেই গ্রহণ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের রাজপথে ওঠার তাওফিক দিন।

খবরে ওয়াহেদ হাদিস কি আকিদার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য? এখানে আরেকটি বিষয়ের দিকেও ইঙ্গিত করা জরুরি। তা হলো, কোন ধরনের হাদিস আকিদার ক্ষেত্রে দলিল হতে পারে? একদল আলিমের মতে, সব ধরনের বিশুদ্ধ হাদিস। সুতরাং শর্ত হলো হাদিসটি বিশুদ্ধ হওয়া। এর পর সেটা মুতাওয়াতির (অনেকের বর্ণনা) কিংবা ওয়াহিদ (এক/দুই ব্যক্তির বর্ণনা) হোক, তাতে কিছু যায়-আসে না। বিশুদ্ধ হাদিস পাওয়া গেলেই সেটা আকিদা-সহ সকল বিষয়ে গ্রহণযোগ্য।[১] আরেক দল আলিমের মতে, কেবল মুতাওয়াতির হাদিস আকিদার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, খবরে ওয়াহিদ আকিদার ক্ষেত্রে দলিল নয়। কারণ, এটা 'ইলমে ইয়াকিন' (তথা সুনিশ্চিত জ্ঞান)-এর পর্যায়ে নয়।[২]

প্রথম দলের বক্তব্যের পর্যালোচনা: প্রথম দল বলছেন, খবরে ওয়াহিদ মানেই এক ব্যক্তির বর্ণনা নয়, প্রত্যেকটি তাবাকাতে (স্তরে) একাধিক ব্যক্তি থাকতে পারেন, যা আহলুল ইলম জানেন। তা ছাড়া তাদের প্রত্যেককে অনেকগুলো ক্যাটাগরিতে উত্তীর্ণ হতে হয়। প্রত্যেক বর্ণনাকারীর মাঝে অনেকগুলো শর্ত (যেমন: আদালত তথা দ্বীনদারি, জবত তথা মজবুতির সঙ্গে হাদিস সংরক্ষণ, আস্থা ও নির্ভরতার পাত্র হওয়া, আলিম ও ফকিহ হওয়া, বর্ণিত হাদিসটি কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে কোনোভাবে সাংঘর্ষিক

---

১. এগুলো উলুমুল হাদিসের পরিভাষা। এই শাস্ত্রে হাদিস বর্ণনকারীর সংখ্যা অনুপাতে হাদিসকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করা যায়: এক. মুতাওয়াতির। অর্থাৎ এমন বৃহৎ একদল মানুষের মাধ্যমে হাদিসটি বর্ণিত হয়, যাদের সকলকে সাধারণত মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা অসম্ভব। দুই. খবরে ওয়াহেদ। অর্থাৎ এক, দুই, তিন বা ততোধিক মানুষের মাধ্যমে বর্ণিত হাদিস। অন্য কথায়, মুতাওয়াতির বাদে সবগুলোকেই মোটা দাগে খবরে ওয়াহেদ বলা হয়। এগুলোর সংখ্যা অনুপাতে আবার ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। বিস্তারিত দেখতে পারেন: তাইসির মুসতালাহিল হাদিস, ড. মাহমুদ তহহান।

২. উসুলুল বাজদাবি (কাশফুল আসরারের মাতন) (২/৩৭০)।

না হওয়া ইত্যাদি) বিদ্যমান থাকতে হয়। ফলে সেটা গ্রহণের ব্যাপারে সন্দেহ অমূলক ও বর্জনীয়। তাদের মতে, চার ইমাম-সহ প্রথম যুগের সকল সালাফ খবরে ওয়াহিদ গ্রহণ করতেন। যদি কোনো বিশেষ হাদিসকে বর্জন করে থাকেন, সেটা বিশেষ কারণে। সামগ্রিকভাবে খবরে ওয়াহিদ সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। যেমন: প্রত্যেক আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।[১] হাদিসটি প্রায় সকল মুসলমান জানে। অথচ পরিভাষায় এটাও খবরে ওয়াহিদ।

কুরআন ও সুন্নাহে এক ব্যক্তির বর্ণনা/সংবাদ/ঘোষণা ইত্যাদি গ্রহণের অসংখ্য নজির রয়েছে। যেমন আল্লাহ সুরা ইয়াসিনে বলেছেন,

وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ.

অর্থ: ‘অতঃপর শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা রাসুলদের অনুসরণ করো।’ [ইয়াসিন: ২০] এরপর আল্লাহ বলেন,

وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ. اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ. قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ.

অর্থ: ‘আপনি তাদের কাছে সে জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন, যখন সেখানে রাসুলগণ আগমন করেছিলেন। আমি তাদের নিকট দুজন রাসুল প্রেরণ করেছিলাম, কিন্তু তারা তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। তখন আমি তাদের শক্তিশালী করলাম তৃতীয় একজনের মাধ্যমে। তারা সবাই বললেন, আমরা তোমাদের কাছে রাসুল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। তারা বলল, তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ, রহমান আল্লাহ কিছুই নাজিল করেননি। তোমরা মিথ্যা বলছ।’ [ইয়াসিন: ১৩-১৫] উক্ত আয়াতটি উল্লেখ করে ইমাম শাফেয়ি লিখেন, ‘আল্লাহ তায়ালা এখানে দুইজন এরপর তিনজন পাঠিয়েছেন; কিন্তু তিনি একজনও পাঠিয়েছেন। একাধিক পাঠানোর অর্থ এটা নয় যে, একজনের সংবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।’[২]

কুরআনের বাইরে একাধিক হাদিস থেকে একজনের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন: কিবলা পরিবর্তন-সংক্রান্ত বিধান অবতীর্ণ হলে এক সাহাবি

১. উমর ইবনুল খাত্তাব থেকে বর্ণিত, বুখারির প্রথম হাদিস।
২. রিসালাহ, শাফেয়ি (১/৪৩৭)।

সর্বপ্রথম কুবার লোকদের জানান। তারা তখন নামাজ পড়ছিলেন। কিন্তু সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে নামাজের ভিতরেই তারা শামের (বাইতুল মাকদিস) দিক থেকে কাবার দিকে ঘুরে যান।[১] কারও মনে এই সংশয় আসেনি যে, এক ব্যক্তির কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। একইভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সাহাবিকে একাকী দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায় সেই একজন সাহাবির কাছ থেকে তাদের দ্বীন, ঈমান ও আমল সবকিছুই গ্রহণ করেছে। যদি তারা এক ব্যক্তির উপর সন্দেহ করত এবং বলত যে, এক ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়, তা হলে তো তাদের কাছে কালিমাই পৌঁছত না, যেমন মুআজ বিন জাবালকে ইয়ামানে পাঠানোর ঘটনা।[২] একইভাবে আবদুল কায়সের প্রতিনিধি দলের প্রত্যেক সদস্যকে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ।[৩] এসব ক্ষেত্রে আমল ও ঈমানকে আলাদা করা হয়নি; বরং এক ব্যক্তির কাছ থেকে ঈমান ও আমল দুটোই গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া যুক্তিরও দাবি হচ্ছে, দ্বীনের সকল বিষয় সবার কাছে একাধিক ব্যক্তির মাধ্যমে পৌঁছানো সম্ভব নয়। খবরে ওয়াহিদ বাদ দিলে আকিদার অনেক বিষয়ই বাদ দিয়ে দিতে হবে। কারণ, আকিদা-সংক্রান্ত মুতাওয়াতির হাদিস অপ্রতুল। তা ছাড়া সাহাবাদেরও প্রত্যেকে যদি প্রত্যেকের হাদিসকে এই যুক্তিতে বাদ দিয়ে দিতেন যে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে শোনেননি, তবে আকিদার ক্ষেত্রে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা তৈরি হতো এবং সাহাবাদের সবার আকিদা এক হতে পারত না।

ঈমানের অনেক বিষয়, যেমন কবরের প্রশ্ন, কবরের শাস্তি, রাসুলের শাফায়াত-সংক্রান্ত অনেক হাদিস, মিজান, পুলসিরাত, রাসুলের অনেক মুজিজা, তাকদিরের বিভিন্ন বিষয়, ফেরেশতা-সংক্রান্ত বিভিন্ন আকিদা, কিয়ামতের আলামত-সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনা, মিরাজ ইত্যাদি-সহ আকিদার অনেক মাসআলা খবরে ওয়াহেদ দ্বারা সাব্যস্ত এবং উম্মাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। ফলে খবরে ওয়াহেদ বর্জন করলে এসব আকিদাও বর্জন করতে হবে। স্বয়ং সহিহ বুখারির ঈমান, আম্বিয়া, তাওহিদ, তাকদির এসব অধ্যায়ের হাদিসগুলো খবরে ওয়াহিদ। এগুলো বর্জন করলে কী অবস্থা তৈরি হবে?

---

১. বুখারি (৪০৩, ৪৪৯১)।
২. বুখারি (১৩৯৫, ১৪৯৬)।
৩. বুখারি (৫৩, ৮৭)।

দ্বিতীয় দলের বক্তব্যের পর্যালোচনা: প্রথমেই মনে রাখতে হবে, তারা খবরে ওয়াহিদকে অস্বীকার করেন না, যেমনটা একদল সমকালীন আলিম দাবি করেন।[১] একইভাবে তারা যখন বলেন, খবরে ওয়াহিদ ইয়াকিনের স্তরে নয়, বরং 'জন্ন'-এর স্তরে, তাদের এই 'জন্ন'-এর অর্থ স্রেফ ধারণা উদ্দেশ্য নয়, যেমনটা অনেকে মনে করে থাকেন; বরং তাদের উদ্দেশ্য হলো, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা সেই ইয়াকিন অর্জিত হয় না যা 'মুতাওয়াতির' হাদিস দ্বারা অর্জিত হয়। এটা স্রেফ ধারণা নয়; বরং ইয়াকিনের কাছাকাছি এবং সত্য হওয়ার প্রবল সম্ভাবনাসম্পন্ন ধারণা।'[২] ফখরুল ইসলাম বাজদাবি এটাকে 'ইলমু গালিবির রাই' বলে আখ্যা দিয়েছেন।[৩]

আফসোসের বিষয় হলো, তাদের ব্যাপারে প্রথম পক্ষের অনেকে প্রচারণা চালান যে, তারা খবরে ওয়াহিদকে ঢালাওভাবে প্রত্যাখ্যান করেন; কিন্তু সেটা বাস্তবসম্মত নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস বর্ণনার পরে কেউ কীভাবে বলতে পারে 'আমি রাসুলের কথা মানি না'? তা হলে বোঝা গেল, তাদের আপত্তি রাসুলের উপর নয়, বরং **দীর্ঘ মানব-লাইনের উপর**। তারা যেটা করেন সেটা হচ্ছে, মুতাওয়াতির এবং খবরে ওয়াহেদকে সমস্তরে রাখেন না। বিশাল একটি দলের মাধ্যমে বর্ণিত তথ্য আর এক ব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণিত তথ্য কি এক পর্যায়ের হতে পারে? এ কারণে মুতাওয়াতির যেখানে ইয়াকিন ও ইসমাতের প্রমাণ, ওয়াহিদ সেটার প্রমাণ নয়। বর্ণনাকারী এখানে নিষ্পাপ নন; সকল ভুল, বিচ্যুতি ও মানবিক দুর্বলতার উর্ধ্বে নন। তা ছাড়া প্রথম দল যেসব উদাহরণ দেন, সেগুলোও সর্বত্র সঠিক নয়। যেমন: তারা সাহাবাদের উদাহরণ দেন যে, সাহাবাগণ খবরে ওয়াহিদকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করতেন, তারা কোনো সন্দেহ করতেন না। প্রশ্ন হয়, আমরা কি হাদিস কেবল সাহাবাদের থেকেই পেয়েছি? সাহাবাগণ সবাই তো বিশ্বাসযোগ্য ও আস্থার পাত্র। আল্লাহ তাদের এই সনদ দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী বর্ণনাকারীরা? কয়েক শতাব্দ পর্যন্ত হাদিস একজনের পরে একজন বর্ণনা করেই চলেছেন। তাদের সকলের তথ্য আমাদের হাতে আছে। কিন্তু তারা নবি কিংবা সাহাবা কোনোটাই নন। তারা মাসুমও নন। ফলে যে-কেউ যেকোনো জায়গায় বিচ্যুতির শিকার হতে পারেন না, এটা বলা যায় না। তারা বলেন, আমরা দাবি করি না যে, তারা ভুল-বিচ্যুতি করেছেনই, তথাপি তারা ভুল-বিচ্যুতির আশঙ্কার বাইরে নন। ফলে এটাকে ইয়াকিনের সেই স্তরে রাখতে পারি না,

---

১. তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ, মাতুরিদি (৫/৫১০); শরহে নুখবাতিল ফিকার, আলি কারি (২১৮)।
২. ফাতহুল মুলহিম, শাব্বির আহমদ উসমানি (১/২৩)।
৩. উসুলুল বাজদাবি (২/৩৮৮)।

যেখানে কুরআন ও (হাদিসে) মুতাওয়াতিরকে রাখতে পারি। এটাতে বিশ্বাস রাখা উজুবের সেই পর্যায়ে থাকে না, যেটা থাকে তাওয়াতুরের ক্ষেত্রে।[১]

যেহেতু ইয়াকিন ও ইফাদার ক্ষেত্রে মুতাওয়াতির ও খবরে ওয়াহিদ এক পর্যায়ের নয়, তাই তাওয়াতুরের মাধ্যমে প্রমাণিত আকিদাকে তারা যেভাবে মুলজিম (আবশ্যক) মনে করেন, খবরে ওয়াহিদের ক্ষেত্রে সেভাবে মুলজিম মনে করেন না। তাদের মতে, আকিদা কোনো চাট্টিখানি কথা নয়; মানুষের বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত। যেকোনো জায়গায় ভুল হয়ে যেতে পারে। জরুরি নয় যে, সেটা সাহাবাদের তবকায় হবে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। যেমন: মুসনাদে আহমদে নবিদের সংখ্যা-সম্পর্কিত আবু জর রাজি.-এর সূত্রের একটি হাদিস। হাদিসটির সনদ এমন: আহমদ ইবনে হাম্বল, ইয়াজিদ ইবনে হারুন, আবদুর রহমান মাসউদি, আবু উমর শামি, উবাইদ ইবনে খাশখাশ, আবু জর গিফারি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।[২] খেয়াল করে দেখুন, আহমদ বিন হাম্বল আর আবু জর গিফারি রাজি.-এর মাঝে চারজন মানুষ। এই চারজন মানুষ কেমন ছিলেন সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। কারণ, একেক সনদে একেক মানুষ থাকবেন। যারা দুর্বল হিসেবে পরিচিত, তাদের কথা বাদ। ধরুন এই চারজন মানুষ নির্ভরযোগ্য হিসেবেই প্রমাণিত। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর কোথাও কি তাদের নিষ্পাপ হওয়ার গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে? কুরআন-সুন্নাহর কোথাও কি বলা হয়েছে, এই চারজন মানুষ ভুল করতে পারেন না, বিচ্যুতির শিকার হতে পারেন না? প্রথম ধারার আলিমগণ নবিদের ক্ষেত্রেও বিশ্বাস করেন, তারা সগিরা-কবিরা গুনাহ করতে পারেন, তা হলে এই চারজনের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য কী? তারা তো সগিরা-কবিরা সব গুনাহ করতে পারেন। অনেকে করেছেনও। হাদিস বানিয়েছেনও। তর্কের খাতিরে গুনাহের কথা বাদ দিলাম। তারা তো ভুলও করে থাকতে পারেন, হয়তো নিজের জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে। এবার এই হাদিসের বাইরে আসুন। আকিদা বিষয়ে যতগুলো খবরে ওয়াহেদ আছে, সবগুলোতে এ-রকম চারজন, পাঁচজন, কোথাও সাতজন-আটজন পর্যন্ত মানুষ পাওয়া যাবে সনদে, যাদের কেউ নবি কিংবা সাহাবি নন। ফলে কেউ যদি বলে, 'আমি আমলের ক্ষেত্রে তাদের বর্ণনাগুলো গ্রহণ করলেও ঈমান ও আকিদার ক্ষেত্রে একটু সতর্কতা অবলম্ব করতে চাই, আমি তাদের মিথ্যুক বলি না, তারা নিশ্চিতভাবে ভুল করেছেনই তাও বলি না। কিন্তু বলি, আকিদার

---

১. তাওহিদ, মাতুরিদি (৮-৯)।
২. মুসনাদে আহমদ (২১৯৫৩)।

ক্ষেত্রে আমি এই বর্ণনাকে সে পর্যায়ে রাখব না, যে পর্যায়ে কুরআন ও মুতাওয়াতির হাদিসকে রাখব। আমি এ ধরনের হাদিসের মাধ্যমে মুসলমানদের কাফের বা গোমরাহ বলব না, কারণ কোথাও কারও ভুল হয়ে থাকলে সেটা সর্বনাশের কারণ হবে।' এই কথাগুলোই দ্বিতীয় দলের আলিমগণ এভাবে বলেন যে, আকিদার ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহিদের উপর নির্ভর করা যায় না, কিংবা ইয়াকিনের ফায়দা দেয় না। এর অর্থ খবরে ওয়াহিদকে উড়িয়ে দেওয়া নয়, বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য যে আকিদা নিয়ে এসেছেন, সেটার সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিত করা।[১]

উক্ত কথার কারণে কাউকে হাদিস অস্বীকারকারী বলা যায় না, সাহাবাদের মিথ্যুক সাব্যস্তকারী বলা যায় না; বরং যারা এই পর্যায়ের হাদিস, কুরআন ও মুতাওয়াতির সবগুলোকে এক পর্যায়ে রেখে সবগুলোতে বর্ণিত বিষয়ে সমানভাবে বিশ্বাস রাখে এবং সেই বিশ্বাসের আলোকে মুসলমানদের কাফের-মুশরিক আর গোমরাহ ফাতাওয়া দেয়, তাদের ভুল বলতে হয়।

তারা এ ব্যাপারে যুক্তি দেন, এগুলোর মাধ্যমে সাহাবাদের বিরোধিতা করা হচ্ছে। কারণ, তাদের মতে, সাহাবাদের যুগে খবরে ওয়াহেদ অস্বীকার ছিল না। তাই এটা বিদআত। সাহাবারা আমলের হাদিস গ্রহণ করে আকিদার হাদিস বর্জন করতেন না; বরং তারা দুটোকেই গ্রহণ করতেন, তাই এমন পার্থক্য বিদআত। অথচ বাস্তবতা বিপরীত। স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ কিংবা ইবনে উমর এসে ইমাম বুখারি বা আহমদ বিন হাম্বলকে হাদিস শুনিয়ে যাননি। বরং তাদের মাঝে রয়েছে দীর্ঘ মানব-লাইন (সনদ)। ফলে দ্বিতীয় পক্ষের আলিমদের আপত্তির জায়গা সাহাবাগণ নন, দীর্ঘ মানব-লাইন তাদের আপত্তির জায়গা। আর 'এটা সাহাবাদের যুগে ছিল না, তাই সাহাবাগণ কারও বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করেননি'—এমন যুক্তি এখানে খাটে না।

উপরন্তু সাহাবাগণ 'খবরে ওয়াহিদ প্রত্যাখ্যান করতেন না'—এমন বক্তব্যও সঠিক নয়। আকিদা পরের কথা, আমলের ক্ষেত্রেও আমরা সাহাবাদের দেখি, কেউ কিছু বললেই হুট করে গ্রহণ করেন না, বরং সেটার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিতেন। যেমন: আবু বকর রাজি.-এর কাছে এক নারী মিরাসে দাদির অংশের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে কুরআনে এ সম্পর্কিত কোনো আয়াত না পেয়ে এবং নিজেও কোনো হাদিস না জানার কারণে আবু বকর রাজি. সাহাবাদের জিজ্ঞাসা করেন। মুগিরা ইবনে শুবা বলেন,

---

১. শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (১৭১)।

আমি রাসুলুল্লাহকে দেখেছি এক-ষষ্ঠাংশ দিতে। আবু বকর রাজি. বললেন, আর কেউ ছিল? তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাও সেটার সাক্ষ্য দেন। আবু বকর তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন।[১] একইভাবে আবু মুসা আশআরি রাজি. যখন রাসুলুল্লাহ থেকে উমর রাজি.-এর সামনে একটি হাদিস বর্ণনা করেন, উমর রাজি. বলেন, এটার প্রমাণ দাও, নতুবা তোমাকে শাস্তি পেতে হবে। তখন আবু সাইদ খুদরি রাজি. সাক্ষ্য দেন।[২]

খেয়াল করুন, হাদিসগুলো বর্ণনা করছেন সাহাবাগণ, যাদের ব্যাপারে কুরআন সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছে। এর পরেও আবু বকর কিংবা উমর হুট করে সেগুলো গ্রহণ না করে নিশ্চিত হয়ে নেওয়াকে দ্বীন ও আমানতের দাবি মনে করেছেন। তারা অন্য সাহাবাদের মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছেন কিংবা অবিশ্বাস করেছেন—এমন নয়; বরং তারা মানুষ হিসেবে ভুল করতে পারেন, এমন আশঙ্কা মাথায় রেখে আরও সুনিশ্চিত হতে চেয়েছেন। এই যদি হয় সাহাবাদের ব্যাপারে সাহাবাদের কর্মপন্থা, তাদের যদি দুইশো বছর পরে পাঁচ-ছয় জন মানুষের লম্বা সনদে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো হাদিস বর্ণনা করা হতো, তারা কী করতেন? তা হলে সাহাবাদের আদর্শ কোনটা? মাহমুদ ইবনুর রবি' আল-আনসারি একবার ইতবান ইবনে মালেক রাজি.-এর কাছ থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করলেন। যাদের কাছে হাদিসটি বর্ণনা করছিলেন, ঘটনাক্রমে তাদের মাঝে আবু আইউব আনসারিও ছিলেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ! তুমি যা বললে সেটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও বলে থাকবেন বলে আমি মনে করি না।' মাহমুদ পরবর্তীকালে মদিনায় গিয়ে ইতবান রাজি.-এর কাছ থেকে হাদিসটি আবারও শুনে নিশ্চিত হন।[৩] এখান থেকে আমাদের বোঝানো উদ্দেশ্য আবু আইউব আনসারি রাজি. নিজে হাদিসটি না শোনাতে সরাসরি প্রতিবাদ করেছেন।

শুধু এতটুকু নয়, সাহাবায়ে কেরামও মানবিক ভুলত্রুটির উর্ধ্বে ছিলেন না। ফলে তাদেরও ভুল হয়েছে। অন্যরা সেগুলো সংশোধন করেছেন। যেমন: আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজি. সুরা ফালাক ও নাসকে কুরআনের অংশ মনে করতেন না।[৪] অন্য সকল সাহাবি তার কথা প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ, এই দুটো সুরা সর্বসম্মতিক্রমে কুরআনের অংশ। ফলে ইবনে মাসউদ তার রায় থেকে সরে আসেন এবং তার

---

১. মুসনাদে আহমদ (১৮২৬৩)।
২. মুসলিম (২১৫৩)।
৩. বুখারি (১১৮৫); মুসলিম (৩৩)।
৪. বুখারি (৪৯৭৭)।

ব্যক্তিগত কুরআনের কপিতে সুরা দুটো সংযুক্ত করেন। আয়েশা রাজি. কাছের পুরুষ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করার সুবিধার্থে বড় মানুষকে দুগ্ধ পান করিয়ে দুধের সন্তানের সম্পর্ক গড়া বৈধ ভেবেছিলেন। সকল উম্মাহাতুল মুমিনিন তার বিরোধিতা করেন।[১] মুতআ বিয়ে প্রথমে বৈধ ছিল, পরে অবৈধ করা হয়। অবৈধ করার পরেও ইবনে আব্বাস রাজি. কিছুকাল জায়েজ মনে করতেন। হয়তো তিনি অবৈধ হওয়ার কথা জানতেন না। সকল সাহাবি তাকে ভুল বলেন এবং তিনি মতামত পরিবর্তন করেন।[২] গারানিকের ঘটনায়ও একাধিক সাহাবি মুশরিকদের ইসলামে আনার জন্য সুরা নাজমের মাঝে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক দুই আয়াত বৃদ্ধি এবং পরবর্তীকালে সেগুলো মানসুখ করে দেওয়ার কথা বলেন। স্বয়ং ইবনে তাইমিয়াও এটাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।[৩] কারণ, সাইদ ইবনে জুবাইর, কাতাদা, জুহরি-সহ একাধিক সনদ বিশুদ্ধ। এর মানে, তারা এগুলো বলেছেন। কিন্তু উম্মাহর মুহাক্কিক ইমামগণ এসব বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করেন।[৪] কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহি পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মাসুম, অথচ সনদ কিন্তু সঠিকই।

তা হলে সাহাবায়ে কেরামের কেউ পরবর্তীকালে কোনো হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে নিজের অজান্তে ও অজ্ঞাতসারে ভুল করতে পারেন না—এমন গ্যারান্টি নেই। ইমাম বুখারি ও মুসলিম পর্যন্ত আসার আগে বাকি লোকগুলোর অবস্থা তো অবশ্যই যাচাইযোগ্য। হ্যাঁ, তবুও দ্বিতীয় ধারার আলিমগণ এগুলোকে অজুহাত বানিয়ে হাদিস প্রত্যাখ্যান করেন না। বরং এসব হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আকিদাগুলোকে তারা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন। ফলে দেখা যাবে, বিশেষত পরকাল-সম্পর্কিত অনেক আকিদা, যেগুলো খবরে ওয়াহেদ দ্বারা প্রমাণিত, সেগুলোতে ঈমান আনার ক্ষেত্রে প্রথম দল আর দ্বিতীয় দলের মাঝে কোনো মতভেদ নেই। এখানেই তাদের মাঝে আর হাদিস অস্বীকারকারীদের মাঝে ফারাক। হাদিস অস্বীকারকারীরা এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনার উপর ভিত্তি করে পুরো হাদিসের ভিতকেই ধসিয়ে দিতে চায়; সাহাবা ও রাবিদের ব্যাপারে অযথা সন্দেহ করে হাদিসকেই অস্বীকার করে। সেটা সুস্পষ্ট গোমরাহি। অপরদিকে ফুকাহা ও মুতাকাল্লিমিন স্রেফ ভুল হওয়ার সম্ভাবনাকে স্বীকার করেন এবং খবরে ওয়াহেদকে কুরআন বা মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে রাখেন না, বরং কিছু শর্ত সংযুক্ত

---

১. সুনানে ইবনে মাজা (১৯৪৭); মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক (১৩৮৮৬)।
২. তিরমিজি (১১২১)।
৩. মিনহাজুস সুন্নাহ, ইবনে তাইমিয়া (১/৪৭১, ২/৪০৯)।
৪. শিফা, কাজি ইয়াজ (২/১২৬); তাফসিরে ইবনে কাসির (৫/৩৮৭)।

করেন, যাতে করে হাদিসের সম্ভ্রম সুরক্ষিত থাকে। আর আকিদার ক্ষেত্রে বলেন, আমরা এটাকে ইয়াকিনের সেই পর্যায়ে রাখব না, যে পর্যায়ে কুরআন ও মুতাওয়াতিরকে রাখি।[১] সদরুল ইসলাম বাজদাবি রাহি. লিখেন, আমরা হাদিস খবরে ওয়াহিদ হলেও প্রত্যাখ্যান করা বৈধ মনে করি না। কারণ, সেটা সত্য হবার সম্ভাবনা আছে।[২] ফলে তাদের হাদিস অস্বীকারকারী বলার সুযোগ নেই। এমন নীতি বিপজ্জনকও নয়; বরং সামনে যা-কিছু বিদ্যমান, বিনা যাচাইয়ে সেগুলোর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেগুলোতে কুরআনের মতো সন্দেহাতীত বিশ্বাস রাখা বিপজ্জনক। সেই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে মুসলমানদের কাফের, মুশরিক ও গোমরাহ বলা আরও অধিক বিপজ্জনক। জাহাবি লিখেন, যখন কোনো হাদিস দুইজন সিকাহ বর্ণনা করেন, সেটা একজনের বর্ণনা থেকে অধিকতর শক্তিশালী। কারণ, একজন মানুষ ভুলে যেতে পারেন, ভুল করতে পারেন। এ কারণেই উলামায়ে কেরাম একাধিক সনদে হাদিস বর্ণনার উপর উৎসাহিত করেন। কারণ, তাতে 'জন্ন'-এর স্তর ছাড়িয়ে 'ইয়াকিন'-এর স্তরে ওঠা যায়।[৩]

অধমের পর্যবেক্ষণ: উপরের কথার উপসংহার টেনে অধমের বক্তব্য হলো, ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান হচ্ছে দুটোর মাঝামাঝি। একদিকে যেমন খবরে ওয়াহেদ ও মুতাওয়াতিরকে এক ভাবা এবং এক স্তরে রাখা যৌক্তিক নয়, অপরদিকে অযথা হাদিস বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে সন্দেহ করাও উচিত নয়। কারণ, ইসলামের ইতিহাসে মুহাদ্দিসগণ হাদিসের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে যে বিরল নজির স্থাপন করেছেন, তা মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও নেই। ফলে শুধু শুধু সন্দেহ তৈরির দরজা খুলে দেওয়া অনুচিত। বরং অতীত ও বর্তমানে বুদ্ধিজীবী দাবিদার যেসব মুতাজিলা ও হাদিস অস্বীকারকারী ব্যক্তির উদ্ভব ঘটেছে, যারা বিভিন্ন সময় আকিদার বিভিন্ন বিষয় বিজ্ঞান কিংবা যুক্তির সঙ্গে সাংঘর্ষিক দাবি করে প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা মূলত খবরে ওয়াহেদ মানা যাবে না কিংবা প্রশ্নাতীত নয়—এই যুক্তি দেখিয়েই এসব কাজ করেছে। বর্তমানেও অনেক শাইখ মানুষ ফিতান ও মালাহিম-সংক্রান্ত হাদিস এবং মুরতাদ হত্যার হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করছেন। তাদের যুক্তিও একই—খবরে ওয়াহেদ দিয়ে আকিদা সাব্যস্ত করা যাবে না। এভাবে ইমামগণ যে উদ্দেশ্যে আকিদার ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহেদ গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতার কথা বলেছেন, সেই উদ্দেশ্যের অপব্যবহার করছে কিছু মানুষ। তাই এ ব্যাপারে আমাদের কর্মপদ্ধতি হবে নিম্নরূপ:

---

১. দেখুন: উসুলুস সারাখসি (১৫৩-১৫৮); মারিফাতুল হুজাজিশ শরইয়্যাহ, বাজদাবি (১২৩-১২৫)।
২. উসুলুদ্দিন, বাজদাবি (৩৯)।
৩. তাজকিরাতুল হুফফাজ (১/১১)।

আমরা খবরে ওয়াহিদের মাধ্যমে প্রমাণিত আকিদাকে কুরআন কিংবা তাওয়াতুরের পর্যায়ে রাখব না, আবার বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত হলে এবং কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হলে সেগুলোতে অযথা সন্দেহও করব না, অস্বীকার করব না। একইভাবে মুতাওয়াতির সনদে প্রমাণিত কোনো মৌলিক আকিদা অস্বীকার করা কুফর। বিপরীতে খবরে ওয়াহিদের মাধ্যমে প্রমাণিত কোনো আকিদায় কেউ সন্দেহ করলে সেটাকে কুফর বলা যাবে না। তাই বিপরীত মানহাজের ব্যাপারে কথা বলার সময় এসব পার্থক্য আমাদের মাথায় রাখতে হবে। যেন কারও লঘু অপরাধের কারণে তাকে কাফের-মুশরিক কিংবা গোমরাহ ফাতাওয়া দেওয়া থেকে বাঁচা যায়।

সকল মুমিন আল্লাহর ওলি (বন্ধু): সকল মুমিন তার ঈমানের কারণে আল্লাহর বন্ধু, প্রিয় ও অনুগ্রহভাজন। ঈমানের তারতম্যের কারণে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কে তারতম্য ঘটে। কিন্তু ঈমানের বদৌলতে কুরআন-হাদিসে মুমিনদের সামগ্রিকভাবে আল্লাহর বন্ধু বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ. لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

অর্থ: 'মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোনো ভয়ভীতি আছে, না তারা দুঃখিত হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং ভয় করেছে, তাদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহর কথার কখনও হেরফের হয় না। এটাই হলো মহা সফলতা।' [ইউনুস: ৬২-৬৪] আল্লাহ বলেন,

وَ مَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَ هُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَا كَانُوْۤا اَوْلِيَآءَهٗ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗۤ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ: 'তাদের কেন আল্লাহ শাস্তি দেবেন না, অথচ তারা মসজিদে হারামে যেতে বাধা দান করে? তারা আল্লাহর বন্ধু নয়; আল্লাহর বন্ধু তো কেবল মুত্তাকিগণ। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।' [আনফাল: ৩৪] অন্য আয়াতে বলেন,

اِنَّ وَلِيِّـۧ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আমার বন্ধু হলেন আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। বস্তুত তিনিই সৎকর্মশীল বান্দাদের পাশে থাকেন।' [আরাফ: ১৯৬] অন্য আয়াতে বলেন,

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

অর্থ: 'আল্লাহ তাদের বন্ধু যারা ঈমান আনে।' [বাকারা: ২৫৭]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলির সঙ্গে শত্রুতা করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। ফরজের চেয়ে আর কোনো বিষয়ের মাধ্যমে বান্দা আমার অধিক নিকটবর্তী হতে পারে না। আর বান্দা নফলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, এমনকি একপর্যায়ে আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। সুতরাং আমি যখন তাকে ভালোবেসে ফেলি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শোনে; তার চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে; তার হাত হয়ে যাই, যা দ্বারা সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে।'[১]

প্রমাণিত হলো, যারাই আল্লাহকে ভয় করবে, শরিয়তের বিধি-নিষেধ মেনে চলবে, তারাই আল্লাহর ওলি। হ্যাঁ, আল্লাহর ওলিরা সবাই সমস্তরের নয়। কিন্তু ইসলামে কোনো পাদ্রি-পুরোহিত শ্রেণি নেই, যারা সাধারণ মানুষ ও আল্লাহর মাঝে মধ্যস্থতা করবে। বরং ইসলামে সবাই সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত। সবার জন্য বেলায়াতের দরজা খোলা। এটা বিশেষ গোপন কিংবা লুক্কায়িত মারিফাতের ভাণ্ডার নয়। যেকোনো মুমিনমাত্রই আল্লাহকে ভয় করবে, শরিয়তের আদেশ-নিষেধ, কুরআন-সুন্নাহ মেনে চলবে, সে আল্লাহর ওলি হিসেবে গণ্য হবে—আল্লাহ তার পাশে থাকবেন, তাকে ভালোবাসবেন, সহায়তা করবেন। আর তাদের মাঝে সে সর্বোত্তম, যে আল্লাহর সবচেয়ে বেশি অনুগত, কুরআনের কাছে সবচেয়ে বেশি সমর্পিত। ইবনে হাজার আসকালানি ওলির অর্থ করতে গিয়ে বলেন, 'আল্লাহর ওলির অর্থ হচ্ছে, যিনি আল্লাহকে জানেন, তাঁর আনুগত্যে অবিচল এবং ইবাদতে নিষ্ঠাবান থাকেন।'[২] তাফতাজানি লিখেন, 'ওলি হচ্ছেন যিনি আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলিকে জানেন, সাধ্যমতো আনুগত্যে অবিচল থাকেন, গুনাহ থেকে দূরে থাকেন, ভোগবিলাস এড়িয়ে চলেন।'[৩] দেখা যাচ্ছে, ইমামদের কেউ ওলি হওয়ার জন্য কাশফ-কারামত ইত্যাদির শর্ত করেননি। হজরত গঙ্গুহি বলেছেন, 'কাশফ কামালতের দলিল নয়।'[৪] তাই বরং কুরআন-সুন্নাহ মানা, আল্লাহর নির্দেশ পালন করাই বেলায়াতের পথ। প্রত্যেক মুমিন আল্লাহর ওলি হতে পারে। কারামত-সম্পর্কিত অধ্যায়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আসবে, ইনশাআল্লাহ।

---

১. বুখারি (৬৫০২); বাইহাকি (সুনানে কুবরা) (৬৪৮৬); মুসনাদে আবু ইয়ালা (৭০৮৭)।
২. ফাতহুল বারি (১১/৩৪২)।
৩. শরহুল আকায়েদ, নাসাফি (৯২)।
৪. ফাতাওয়ায়ে রশিদিয়া (৮৩)।

وَالإِيمَانُ هُوَ الإِيمَانُ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى. وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ، لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَى مَا جَاءُوا بِهِ.

ঈমান হলো: আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, রাসুল, শেষ দিবসে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং এ কথা বিশ্বাস করা যে, তাকদিরের ভালোমন্দ, পছন্দ-অপছন্দ সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে। আমরা এই সবকিছুর উপর ঈমান রাখি। আমরা আল্লাহর প্রেরিত রাসুলদের মাঝে কোনো পার্থক্য করি না। তাদের সবার আনীত পয়গামকে সত্য বলে মানি।

ব্যাখ্যা

ঈমানের রুকন ছয়টি: ঈমানের সংজ্ঞা বর্ণনার করার পরে ইমাম তহাবি রাহি. ঈমানের রুকন তথা যেসব বিষয়ের উপর ইজমালি ঈমান আনা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য, সেগুলো বর্ণনা করছেন। আর সেগুলো হলো: আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানি গ্রন্থ, নবি, রাসুল, আখিরাত, তাকদিরের ভালোমন্দ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে—এ মর্মে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

এটা মূলত কুরআন-হাদিস থেকে উৎসারিত। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ.

অর্থ: 'সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং প্রকৃত সৎকাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর, কিতাবের উপর এবং নবিদের উপর।' [বাকারা: ১৭৭] হাদিসে জিবরিলে এসেছে, জিবরিল আলাইহিস সালাম যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি উত্তরে বললেন, 'আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসুলগণ, শেষ দিবস এবং তাকদিরের ভালোমন্দে বিশ্বাস করা।'[১] পিছনে এগুলোর কিছু আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে। সামনে আরও কিছু আলোচনা আসবে, ইনশাআল্লাহ।

নবি-রাসুলগণ মুসলিম জাতির গুরুত্বপূর্ণ বন্ধন: এটা ইসলামের সত্যতার অন্যতম প্রমাণ। আল্লাহ তায়ালা গোটা জগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সবার জীবনের প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করেছেন। আর দ্বীন ও জীবনব্যবস্থার মতো এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় মানুষের হাতে ছেড়ে দেবেন, কিংবা তাদের এ ব্যাপারে বিশৃঙ্খল অবস্থায় রাখবেন, এটা হতেই পারে না। একেক জাতিকে একেক ধর্ম দেবেন, এটা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। ফলে যখন আমরা জানতে পারি আল্লাহর কাছে জীবনব্যবস্থা ও দ্বীন একটিই, যুগে যুগে সকল সম্প্রদায়ের কাছে তিনি সেই একমাত্র দ্বীন সহকারে বার্তাবাহক তথা নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন, আর মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ কর্তৃক আনীত দ্বীন সেই অভিন্ন দ্বীনেরই সর্বশেষ রূপ, তখন আমরা এর বিশাল বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে পারি।

মানুষের জন্য আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত জগতের একমাত্র ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহ কুরআনের একাধিক জায়গায় বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো পথে আল্লাহকে পাওয়া যাবে—এ-রকম চিন্তা কল্পনাতেও স্থান দেওয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

অর্থ: 'আল্লাহর কাছে একমাত্র দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।' [আলে ইমরান: ১৯] অন্য আয়াতে বলেন,

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

অর্থ: 'যে ইসলাম ছাড়া অন্যকিছু সন্ধান করবে, তা কখনোই তার কাছ থেকে গৃহীত হবে না। আর সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' [আলে ইমরান: ৮৫] ফলে পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, ইসলাম কোনো নতুন ধর্ম নয়; বরং ইসলাম হলো গোটা মানবজাতির ধর্ম, জগতের একমাত্র ধর্ম। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

১. বুখারি (৫০); মুসলিম (৮); তিরমিজি (২৬১০); আবু দাউদ (৪৬৯৫)।

ইসলামের প্রবর্তক নন; বস্তুত জগতের কেউই ইসলামের প্রবর্তক নয়। জগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা এই ধর্মের সৃষ্টিকর্তা; সকল নবি-রাসুল এই ধর্মের প্রচারক।

ইসলামের সূচনা জগতের সূচনা থেকে। পৃথিবীর প্রথম মানুষ ছিলেন ইসলামের সর্বপ্রথম নবি ও প্রচারক। প্রথম যুগের সকল মানুষ ছিল মুসলমান। এর পর যুগে যুগে যখন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, মানুষ বিভিন্ন গোত্র-সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, নতুন নতুন ভাষা, বর্ণ, জাতি ও গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে, আল্লাহ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে নবি-রাসুল প্রেরণ করেন। প্রত্যেক নবি পূর্বের নবির সত্যায়নকারী এবং পরের নবির সুসংবাদদাতা হিসেবে আসতেন। অর্থাৎ তারা সবাই ছিলেন এক দ্বীনের অনুসারী, একই দ্বীনের প্রচারক ও বার্তাবাহক এক তাসবিহের দানার মতো। হ্যাঁ, স্থান-কাল, মানুষের রুচি, সামর্থ্য ইত্যাদি বিবেচনায় তাদের আলাদা আলাদা শরিয়ত তথা বিধিবিধান ছিল, কিন্তু মৌলিক বিষয়গুলোতে, আকিদা ও ঈমানের ক্ষেত্রে তারা সকলে একই পরিবারের সদস্য। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নবিগণ একই পিতার সন্তানের মতো; তাদের মা (অর্থাৎ শরিয়ত) ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু সবার দ্বীন এক ও অভিন্ন।'[১] এই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষে আসেন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। তিনি সর্বশেষ নবি ও রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

যেহেতু আল্লাহর মনোনীত দ্বীন একটা এবং সকল নবি ও রাসুল একই দ্বীনের প্রচারক, সুতরাং এটা সহজেই বুঝে আসে যে, আমাদের মুসলমান হিসেবে সকল নবি-রাসুলের উপর ঈমান আনতে হবে। এক্ষেত্রে নবি-রাসুলের কোনো জাতি, বর্ণ, গোষ্ঠী ও ভূখণ্ড নেই। সবাই এক দ্বীনের সূত্রে বাঁধা। সবাই এক আল্লাহর সৃষ্টি, এক আদমের সন্তান, এক দ্বীনের অনুসারী। এভাবে ইসলাম জগতের সবচেয়ে বড় ঐক্যের রজ্জু। একজন আরব মুমিন ভারত, আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ-সহ পৃথিবীর সকল ভূখণ্ডে আল্লাহ যেসকল নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন, তাদের নাম জানা থাকুক-না থাকুক, তাদের ব্যাপারে কোনো ধরনের তথ্য-উপাত্ত থাকুক-না থাকুক সে তাদের সবাইকে বিশ্বাস করে। একইভাবে একজন চীনা মুসলমান বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকাতে যত নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন, সবার উপর তার ঈমান আনতে হবে, সবাইকে ভালোবাসতে হবে এবং সম্মান করতে হবে। এভাবে গোটা জগতের সকল মুসলমান সকল নবি-রাসুলকে ভালোবাসে, সম্মান করে,

১. বুখারি (৩৪৪৩); সহিহ ইবনে হিব্বান (৬১৯৪)।

শ্রদ্ধা করে। এ ব্যাপারে নবিদের ভিতরে কোনো ধরনের পার্থক্য করে না, যেমনটা ইহুদি এবং খ্রিষ্টানরা করে থাকে। ইহুদিরা কেবল তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে বর্ণিত কিছু নবির উপর ঈমান আনে, অন্যদের প্রত্যাখ্যান করে। তারা মালাখিকে সর্বশেষ নবি মনে করে। ফলে ঈসা ও মুহাম্মাদ আলাইহিমাস সালামকে অস্বীকার করে। অপরদিকে খ্রিষ্টানরা পূর্ববর্তী নবিদের বিশ্বাস করলেও, আল্লাহকে বিশ্বাস করলেও তারা ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বলে এবং সর্বশেষ নবি মানে। ফলে তারাও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করে। কিন্তু মুসলমানগণ আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে যুগে যুগে গোটা পৃথিবীর সকল নবি এবং রাসুলের উপর ঈমান আনে। সবার ব্যাপারে এই একই ধরনের বিশ্বাস রাখে যে, তারা সকলে সব ধরনের কবিরা-সগিরা গুনাহ ও নৈতিক অধঃপতন থেকে মুক্ত। দুনিয়ার সবচেয়ে পরিপূর্ণ মানবগোষ্ঠী। এক্ষেত্রে মুসা আলাইহিস সালাম যেমন, ঈসা আলাইহিস সালামও তেমন, তেমন নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইসলামে 'আমাদের নবি, তাদের নবি' বলতে কিছু নেই; ইসলামে সবাই মুসলমানদের নবি। কারণ আদম, ইবরাহিম, মুসা, ঈসা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের দ্বীন একটাই। বরং যদি কেউ মনে করে, কেবল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নবি, মুসা ও ঈসা আলাইহিস সালাম অন্য কারও নবি এবং এ যুক্তিতে তাদের উপর ঈমান না আনে, তবে সে কোনো নবি-রাসুলের উপরই ঈমান আনল না।

মুসলমানরা নবিদের এতটা সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে এবং ভালোবাসে, যা তাদের অনুসারী দাবিদাররাও করে না। যেমন ইহুদী-খ্রিষ্টানরা বিভিন্ন নবির ব্যাপারে এমন জঘন্য বিশ্বাস রাখে, যা সাধারণ মানুষের ব্যাপারেও রাখা যায় না। তারা সেগুলো তাদের পবিত্র গ্রন্থে স্থান দিয়েছে এবং সেগুলো নিয়মিত পাঠ করে, চর্চা করে। বিপরীতে মুসলিম জাতি সকল নবিকে পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার সেই শিখরে স্থান দিয়েছে, যেখানে স্থান দিয়েছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। মুসলিমরা মুসা আলাইহিস সালামকে ইহুদিদের চেয়ে, ঈসা আলাইহিস সালামকে খ্রিষ্টানদের চেয়ে বেশি ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। তাদের পক্ষে কথা বলে। তাদের অনুসারী দাবিদারদের পক্ষ থেকে আরোপিত সকল অপবাদ থেকে তাদের পবিত্র ঘোষণা করে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, নবি-রাসুলদের এই আন্তঃসম্পর্ক মানব ইতিহাসে এক নজিরবিহীন সম্পর্ক, এক স্থায়ী ও শাশ্বত সম্পর্ক। তবে অন্যান্য ধর্মের মানুষ সেটা ভুলে গেছে। এক্ষেত্রে ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের সঙ্গে ইসলামের কিছু সামঞ্জস্য থাকার কারণ হলো,

এই দুই জাতি তুলনামূলকভাবে নতুন এবং তারা তাদের কিতাবের কিছু অংশ এবং কিছু ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ করেছে। ফলে ইসলামের সঙ্গে বিভিন্ন নবির ইতিহাস এবং অন্য অনেক মূলনীতিতে কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়। বিপরীতে অন্যান্য সম্প্রদায় অনেক পুরনো এবং তারা তাদের নবিদের শিক্ষাদীক্ষা, আসমানি গ্রন্থ—সবকিছু ভুলে গিয়েছে; তাদের ধর্মপ্রবর্তকদের দাওয়াতের রূপরেখা বিস্মৃত হয়ে গেছে। এ কারণে সেসব ধর্মের সঙ্গে ইসলাম এবং এই দুই ধর্ম তথা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মিল নেই। উদাহরণস্বরূপ বৌদ্ধ ধর্মের কথাই ধরা যাক। বৌদ্ধধর্মের একটা মূলনীতি রয়েছে যে, পৃথিবীতে ধারাবাহিকভাবে একের পর এক বুদ্ধ এসেছেন এবং আসবেন। গৌতম বুদ্ধ হলো সেই বুদ্ধ আসার ধারাবাহিকতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একজন বুদ্ধ কিংবা সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ। জরথুস্ত্রবাদেও কাছাকাছি বিশ্বাস রয়েছে। তারা বিশ্বাস করে—জরথুস্ত্র সেই অনেক মহাপুরুষের একজন।

খেয়াল করে দেখুন, তাদের এই ধারণাটা কিন্তু ইসলাম, ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্মের নবিদের ধারণার খুব কাছাকাছি। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, তাদের কাছে সত্য নবিগণ এসেছিলেন, কিতাব এসেছিল। সেখান থেকে তারা এগুলো শিখেছে, কিন্তু পরবর্তীকালে ভুলে গিয়েছে। যা-ই হোক, আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই। আমাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, নবুওতের এই ধারণা গোটা পৃথিবীর সমস্ত জাতির ভিতরে বিদ্যমান। কোনো কোনো জাতি এর কিছুটা সংরক্ষণ করতে পেরেছে (যেমন ইহুদি ও খ্রিষ্টান), আর অধিকাংশ জাতি পুরোপুরি ভুলে গিয়েছে এবং নবিদের খোদার আসনে বসিয়ে দিয়েছে (যেমন পৌত্তলিক জাতিগোষ্ঠীগুলো)।

ইমাম তহাবির বক্তব্য: **'আমরা আল্লাহর প্রেরিত রাসুলদের মাঝে কোনো পার্থক্য করি না'** দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে— আমরা সবার প্রতি ঈমান রাখি যে, তারা সবাই আল্লাহর নবি ও রাসুল ছিলেন, সত্যবাদী ছিলেন। তারা সকলে তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন; আল্লাহর পয়গাম মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এই ব্যাপারে আমরা সবার প্রতি পূর্ণ ও অভিন্ন বিশ্বাস রাখি। সবাইকে ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাদের মর্যাদার ভিতরে পার্থক্য করি। সবার মাঝে পার্থক্য না করার অর্থ এই নয় যে, সবাই এক স্তরের ছিলেন। হ্যাঁ, তারা সামগ্রিকভাবে গোটা পৃথিবীর সবচেয়ে পরিপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ মানুষ। কিন্তু তাদের নিজেদের ভিতরে মর্যাদাগত পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

অর্থ: 'এই রাসুলগণ আমি তাদের অনেককে অনেকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।' [বাকারা: ২৫৩] অন্যত্র বলেছেন,

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا

অর্থ: 'আমি কতক নবিকে কতক নবির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।' [ইসরা: ৫৫]

রাসুলদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন পাঁচজন: নুহ, ইবরাহিম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তাদের বলা হয় 'উলুল আজমি মিনার রুসুল' তথা দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রাসুল। উক্ত পাঁচজনের মাঝে সর্বসম্মতিক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেন, 'আমি কিয়ামতের দিন সকল আদম সন্তানের নেতা। সর্বপ্রথম আমার কবর বিদীর্ণ হবে। আমি সর্বপ্রথম সুপারিশকারী, সর্বপ্রথম আমার সুপরিশ গ্রহণ করা হবে।'[১] আরেকটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা ইসমাইল আলাইহিস সালামের সন্তানদের থেকে কিনানাকে বাছাই করেছেন। কিনানা থেকে কুরাইশকে নির্বাচিত করেছেন। কুরাইশ থেকে বনু হাশিমকে বেছে নিয়েছেন। বনু হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন।'[২] আরেকটি হাদিসে তিনি বলেন, 'যদি মুসা জীবিত থাকতেন, আমার অনুসরণ না করে তার উপায় ছিল না।'[৩]

---

১. মুসলিম (২২৭৮); তিরমিজি (৩১৪৮)।
২. মুসলিম (২২৭৬); তিরমিজি (৩৬০৬)।
৩. মুসনাদে আহমদ (১৪৮৫৬); মুসনাদে আবু ইয়ালা (২১৩৫)।

وَأَهْلُ الكَبَائِرِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي النَّارِ لاَ يَخْلُدُونَ إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحِّدُونَ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ بَعْدَ أَنْ لَقُوا اللهَ عَارِفِينَ مُؤْمِنِينَ، وَهُمْ فِي مَشِيئَتِهِ وَحُكْمِهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ وَعَفَا عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ، كَمَا ذَكَرَ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي النَّارِ بِعَدْلِهِ ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ مِنْهَا بِرَحْمَتِهِ وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى تَوَلَّى أَهْلَ مَعْرِفَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِي الدَّارَيْنِ كَأَهْلِ نُكْرَتِهِ الَّذِينَ خَابُوا مِنْ هِدَايَتِهِ وَلَمْ يَنَالُوا مِنْ وِلاَيَتِهِ. اللَّهُمَّ يَا وَلِيَّ الإِسْلاَمِ وَأَهْلِهِ ثَبِّتْنَا عَلَى الإِسْلاَمِ حَتَّىٰ نَلْقَاكَ بِهِ.

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের কবিরা গুনাহকারীরা তাওবা না করে মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নামে যাবে, কিন্তু তাওহিদের উপর মৃত্যু হওয়ায় জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না; বরং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখা অবস্থায় মৃত্যুর ফলে তারা আল্লাহর এখতিয়ারাধীন থাকবে। চাইলে তিনি তাদের নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেবেন যেমনটা তিনি বলেছেন, ‘আল্লাহ তাঁর সঙ্গে কৃত শিরককে ক্ষমা করবেন না, শিরক ছাড়া বাকি সবকিছু ক্ষমা করে দেবেন।’ আর চাইলে তিনি ইনসাফপূর্বক তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এর পর নিজ অনুগ্রহে এবং তাঁর অনুগত বান্দাদের সুপারিশে সেখান থেকে বের করে জান্নাতে পাঠাবেন। কারণ, আল্লাহ তায়ালা তাঁর মারিফাতপ্রাপ্ত বান্দাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ফলে তারা তাদের মতো হতে পারে না যারা তাকে চেনে না, তাঁর হিদায়াত থেকে বিমুখ হয়েছে এবং তাঁর বন্ধুত্ব থেকে বঞ্চিত থেকেছে। হে ইসলাম এবং মুসলমানদের বন্ধু ও অভিভাবক, আপনি আমাদের ইসলামের উপর অটল রাখুন, যাতে এটা নিয়েই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি।

ব্যাখ্যা

কবিরা ও সগিরা গুনাহের পরিচয় ও বিধান: কবিরা শব্দের অর্থ হল বড়। সে হিসেবে কবিরা গুনাহের অর্থ হল বড় গুনাহ। আর সগিরা মানে ছোট। সে হিসেবে সগিরা গুনাহের অর্থ হলো ছোট বা লঘু গুনাহ। কবিরা গুনাহ হলো শিরকের চেয়ে ছোট আর সগিরার চেয়ে বড়। কিন্তু এর সংজ্ঞা ও সংখ্যা নির্ধারণে সালাফের আলিমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কারণ কুরআন-সুন্নাহে এর সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা কিংবা সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। ফলে আলিমগণ নিজ নিজ ইজতিহাদ অনুযায়ী ফয়সালা দিয়েছেন।

মুহাক্কিক আলিমদের বক্তব্য অনুযায়ী, কবিরা গুনাহ হচ্ছে সেসব গুনাহ, যেগুলোর ব্যাপারে শরিয়তে নির্ধারিত শাস্তি (হুদুদ/কিসাস) রয়েছে, অথবা যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে অসন্তুষ্টি কিংবা জাহান্নামের শাস্তির হুমকি দেওয়া হয়েছে, অথবা যে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা করেছেন।[১] যেমন: একটি হাদিসে তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দেয়, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।'[২] আরেকটি হাদিসে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।'[৩] এর দ্বারা বোঝা গেল, ধোঁকা দেওয়া এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলন করা কবিরা গুনাহ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিসে বলেছেন, 'তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কর্ম থেকে বেঁচে থাকো।' সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, সেগুলো কী?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা, জাদু করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং সরল-সহজ সতীসাধ্বী নারীকে অপবাদ দেওয়া।'[৪]

বিভিন্ন হাদিসে কবিরা গুনাহের তালিকা দেওয়া হয়েছে। অনেক আলিম সেগুলোকে একত্র করেছেন। একত্র করলে সেগুলোর সংখ্যা সত্তরের আশেপাশে হয়। ইবনে আব্বাস রাজি. সেগুলোর সংখ্যা বলেছেন সত্তরটির কাছাকাছি।[৫] কিছু কবিরা

---

১. ফাতহুল বারি (১২/১৮৪)।
২. মুসলিম (১০১); ইবনে মাজা (২২২৫)।
৩. বুখারি (৬৮৭৪); মুসলিম (৯৮)।
৪. বুখারি (২৭৬৬); মুসলিম (৮৯)।
৫. বুখারি (২৭৬৬); মুসলিম (৮৯)।

গুনাহ হলো: * আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করা। * মানুষ হত্যা করা। * জাদু করা। * নামাজ পরিত্যাগ করা। * জাকাত পরিত্যাগ করা। * রমজানের রোজা না রাখা। * সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ না করা। * মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া। * আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা। * ব্যভিচার করা। * সমকামিতায় লিপ্ত হওয়া। * সুদের লেনদেন করা। * ঘুষ খাওয়া। * জুলুম করা। * আল্লাহ কিংবা আল্লাহর রাসুলের ব্যাপারে মিথ্যা বলা। * যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা। * প্রতারণা করা। * মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। * মদ্যপান করা। * জুয়া খেলা। * সতী নারীকে অপবাদ দেওয়া। * গনিমতের সম্পদ আত্মসাৎ করা। * চুরি করা। * ডাকাতি করা। * মিথ্যা কসম খাওয়া। * যেকোনো উপায়ে হারাম সম্পদ ভক্ষণ করা। * আত্মহত্যা করা। * পুরুষ নারীর রূপ ধারণ করা আর নারী পুরুষের রূপ ধারণ করা। * ঘরের নারীদের রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া। * গণকের কাছে যাওয়া এবং তাদের সত্যায়ন করা। * জুলুম করা। * গালি দেওয়া। * অহংকার করা। * পুরুষ কর্তৃক রেশমের কাপড় ও স্বর্ণালংকার পরিধান করা। * আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে জবেহ করা। * নিজের বংশপরিচয় ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করে অন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। * মন্দভাবে ঝগড়া-বিবাদ করা। * ওজনে কম দেওয়া। * ইচ্ছাকৃত জামাত পরিত্যাগ করা। * কোনো সাহাবিকে গালি দেওয়া। * বারবার এক ধরনের সগিরা গুনাহ করেই যাওয়া।[১]

ইমাম হালিমি বলেন, প্রত্যেকটি গুনাহের সগিরা এবং কবিরা দুটি রূপ রয়েছে। ফলে সগিরা গুনাহ কখনও কখনও কবিরা গুনাহে রূপান্তরিত হয়ে যায়, আবার কবিরা গুনাহ 'ফাহিশা' তথা আরও জঘন্য গুনাহে রূপান্তরিত হয়ে যায়। যেমন: অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা কবিরা গুনাহ। কিন্তু যদি পিতা, সন্তান অথবা কাছের কোনো আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করা হয়, তা হলে এটা জঘন্য পর্যায়ের গুনাহ (ফাহিশা)। অপরদিকে লাঠি দিয়ে খোঁচা দেওয়া কিংবা হালকা বাড়ি দেওয়া সগিরা গুনাহ, কিন্তু জোরে আঘাত করে আহত করা কবিরা গুনাহ। ভিক্ষুককে কোনো কারণ ছাড়া ফিরিয়ে দেওয়া সগিরা গুনাহ, কিন্তু অপমানের সঙ্গে ফিরিয়ে দেওয়া কবিরা গুনাহ।[২]

কবিরা গুনাহের বিধান পিছনে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে। খারেজি ও মুতাজিলাদের মতে, কবিরা গুনাহকারী কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামি। মুরজিয়াদের

১. সকল কবিরা গুনাহ কুরআন-সুন্নাহর দলিলসহ দেখুন: আল-কাবায়ের, ইমাম জাহাবি। আরও দেখুন: আজ-জাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ইবনে হাজার হাইতামি।
২. আল-মিনহাজ, হালিমি (১/৩৯৬-৩৯৯)।

মতে কবিরা গুনাহ কোনো সমস্যা নয়। আহলে সুন্নাতের মতে কবিরা গুনাহ একটা বড় অপরাধ, কিন্তু কুফর নয়। তবে হালাল মনে করলে কুফর। কবিরা গুনাহ থেকে মুক্তির উপায় হলো একনিষ্ঠ হয়ে কায়মনোবাক্যে তাওবা করা, কৃতকর্মের উপর লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে না করার উপর দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া। তা হলে আশা করা যায় আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ.

অর্থ: 'তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন, পাপসমূহ মার্জনা করেন। আর তিনি তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।' [শুরা: ২৫] যদি কেউ তাওবা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করে, তবে সে আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে। চাইলে তিনি তাকে নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে জান্নাত দিতে পারেন। চাইলে জাহান্নামে দিতে পারেন। শাস্তি শেষ হলে সেখান থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে জান্নাত দেওয়া হবে।

কবিরাহ গুনাহ সীমিত হলেও সগিরা গুনাহ অনেক বেশি; বরং খুব কম মানুষই সগিরা গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে। এ জন্য আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাওবা ছাড়াই বান্দার পুণ্য ও ভালো কাজে খুশি হয়ে এ-জাতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ বলেন,

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ.

অর্থ: 'যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, যদি তোমরা সেসব বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো, তবে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবো।' [নিসা: ৩১] যেমন: পরিপূর্ণরূপে সুন্দরভাবে ওজু করা, বেশি বেশি মসজিদের দিকে হেঁটে যাওয়া, এক নামাজের পর আরেক নামাজের জন্য অপেক্ষা করা ইত্যাদি। একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে মুসলিম ব্যক্তি ফরজ নামাজের সময় হলে সুন্দর করে ওজু করে, এরপর অত্যন্ত বিনয় ও খুশুর সঙ্গে নামাজ আদায় করে, সেটা তার পূর্বের সমস্ত গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়, কবিরা গুনাহ না করার শর্তে। আর এটা সবসময়ের জন্য।'[১] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এক জুমা থেকে আরেক জুমার মধ্যবর্তী সকল গুনাহের কাফফারাস্বরূপ, কবিরা গুনাহ না করার শর্তে।'[২]

---

১. মুসলিম (২২৮); ইবনে হিব্বান (১০৪৪)।
২. মুসলিম (২২৮); ইবনে হিব্বান (১০৪৪)।

পৃথিবীতে মুমিন ও কাফেরের পার্থক্য: দেখা যাচ্ছে, কবিরা গুনাহ একটি বড় ধরনের গুনাহ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু শরিয়তে এরচেয়েও বড় ধরনের অপরাধ রয়েছে, আর সেটা হলো কুফর ও শিরক। কুফর ও শিরকের মাধ্যমে মানুষ ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য হলেও ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় না, যদি না এটাকে হালাল মনে করে। বরং তার ঈমানের ভিতরে অসম্পূর্ণতা তৈরি হয়, ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। এ জন্য তাকে তাওবা করতে হয়। তাওবা করলে আবার ঈমান শক্তিশালী হয়ে যায়। এ কারণেই আহলে সুন্নাত কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফের বলেন না; বরং তাকে ফাসেক অর্থাৎ গুনাহগার ও পাপী বিবেচনা করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে—যেমনটা আগে বলা হয়েছে—বেশ কিছু সম্প্রদায় বিভ্রান্ত হয়েছে। তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ভারসাম্যপূর্ণ আকিদা ছেড়ে প্রান্তিকতার শিকার হয়েছে। শরিয়াহর মধ্যপন্থা ছেড়ে দু-দিকে চলে গেছে। এ-রকম দুটো প্রান্তিক দল হলো খারেজি ও মুতাজিলা সম্প্রদায়। তারা কবিরা গুনাহকে কুফরের মতো মনে করে। ফলে কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। খারেজিরা তাকে সরাসরি কাফের বলে। আর মুতাজিলারা মুমিন বলে না, আবার কাফেরও বলে না; বরং দুটোর মাঝামাঝি রাখে। তবে পরকালে উভয় দলের মতেই কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফের ও মুশরিকদের মতো চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে। এই প্রান্তিকতার ঠিক বিপরীতে আরেকটি প্রান্তিকতা রয়েছে। সেটা হচ্ছে মুরজিয়া সম্প্রদায়। তাদের মতে ঈমানই যথেষ্ট। ঈমানের পরে কিছু করার দরকার নেই, ইবাদত করার প্রয়োজন নেই। গুনাহ থেকে বিরত থাকারও জরুরত নেই। কারণ, সকল মুমিন সমান। একজন চরম পাপাচারী ব্যক্তির ঈমানও জিবরাইলের ঈমানের মতো। যত অন্যায়-অপরাধ করুক, ঈমানের কিছু হয় না। এটা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি। আহলে সুন্নাতের অবস্থান এই দুই প্রান্তিকতার মাঝামাঝি। তারা একদিকে কবিরা গুনাহকে কুফরের মতো মনে করেন না, কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফের-মুশরিক বলেন না। অপরদিকে এটাও বলেন না যে—কবিরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ঈমান নবিদের ঈমানের মতো; কিংবা একজন মানুষ যতই গুনাহ করুক, তার ঈমানের কোনো ক্ষতি হয় না; বরং তারা বলেন—কবিরা গুনাহ ঈমানের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। যদি তাওবা না করে মৃত্যুবরণ করে, তবে পরকালে সে ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে থাকবে। চাইলে তিনি শাস্তি দিতে পারেন, আবার চাইলে ক্ষমাও করতে পারেন। এটা শুধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাহর জন্য প্রযোজ্য নয়, যেমনটা তহাবির বক্তব্য থেকে

কেউ বুঝতে পারে, বরং সকল নবির মুমিন উম্মতের জন্য প্রযোজ্য। তবে তারা যেহেতু বিদ্যমান নেই, তাই ইমাম কেবল এই উম্মতের কথা উল্লেখ করেছেন।[১]

পরকালে মুমিন ও কাফেরের পার্থক্য: কবিরা গুনাহ করার পরে কোনো মুসলিম যদি তাওবা ছাড়া মৃত্যুবরণ করে, তবে সে আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে থাকবে—চাইলে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন, চাইলে শাস্তিও দিতে পারেন; কিন্তু শাস্তির ক্ষেত্রে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হতে হবে না। বরং নির্ধারিত সময় কিংবা সময়ের আগেই আল্লাহর অনুগ্রহে কিংবা কারও সুপারিশে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে পারে। কারণ, তার কাছে এমন একটি সম্পদ রয়েছে, যা কাফের ও মুশরিকদের কাছে নেই। কাফের-মুশরিকরা আল্লাহকে জানে না, আল্লাহকে চেনে না, তাকে রব ও অভিভাবক বলে স্বীকার করে না, তার একত্ববাদের স্বীকৃতি দেয় না। বিপরীতে একজন মুমিন কবিরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহকে চেনে, জানে এবং মানে। ফলে সে কাফের ও মুশরিকদের মতো হতে পারে না। আল্লাহ কুরআনের একাধিক আয়াতে বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔

অর্থ: 'নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না যে তাঁর সাথে কাউকে শরিক করে। এ ছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরিক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়।' [নিসা: ১১৬] ফলে আল্লাহ চাইলে তাকে শাস্তি না দিয়েও জান্নাত দিতে পারেন। বিপরীতে কাফেররা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে। সেখান থেকে কখনও বের হবে না।

আল্লাহকে বিশ্বাস করে এমন একজন মানুষের সঙ্গে আল্লাহ সেই আচরণ করতে পারেন না যা একজন অবিশ্বাসীর সঙ্গে করবেন। একজন মানুষ যখন আল্লাহর উপর ঈমান আনে, নিজেকে আল্লাহর কাছে সঁপে দেয়, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে, তাঁর উপরই ভরসা করে, তাঁকে ভয় করে, তাঁকে ভালোবাসে, তাঁর কাছ থেকে আশা করে, তাকে কীভাবে তিনি তার মতো বানাবেন যে এগুলো করে না? মানুষ ভুল করে। আল্লাহ মানুষকে ফেরেশতাদের মতো করে বানাননি, বরং পরীক্ষার জন্য এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। মানুষকে প্ররোচিত করতে পারে এ-রকম অনেক বস্তু আল্লাহ পৃথিবীতে মজুদ রেখেছেন। উদ্দেশ্য বান্দার পরীক্ষা নেওয়া। ফলে যদি কেউ মূল তাওহিদ ঠিক

---

১. শাইবানি (২৮-২৯); গুনাইমি (১০৬); সালেহ ফাওজান (১২২-১২৩)।

রাখে, কিন্তু কিছু গুনাহ হয়ে যায়, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। বিপরীতে একজন কাফের যে আল্লাহকে চেনে না, আল্লাহর উপর ভরসা করে না, আল্লাহকে ভালোবাসে না, আল্লাহর দেওয়া জীবন, তাঁর দেওয়া সকল অনুগ্রহ ও নিয়ামত ভোগ করার পরেও তাকে অস্বীকার করে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ কোনো ধরনের অনুগ্রহ করবেন না এবং তাকে চিরস্থায়ী জাহান্নামে ফেলবেন। এমন কাফের ব্যক্তির সঙ্গে মুমিনের আর কুফরের সঙ্গে তাওহিদের তুলনা করা বেমানান। এটাকেই ইমাম তহাবি বলেছেন, **কারণ, আল্লাহ তায়ালা তাঁর মারিফাতপ্রাপ্ত বান্দাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ফলে তারা তাদের মতো হতে পারে না যারা তাকে চেনে না, তাঁর হিদায়াত থেকে বিমুখ হয়েছে এবং তাঁর বন্ধুত্ব থেকে বঞ্চিত থেকেছে।** আল্লাহ বলেন,

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَ مَمَاتُهُمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ.

অর্থ: 'যারা অসৎকর্ম করে, তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের সে লোকদের মতো মনে করব, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু কি সমান হবে? তাদের দাবি কত মন্দ!' [জাসিয়াহ: ২১] অন্য জায়গায় আল্লাহ নিজেকে মুমিনদের বন্ধু ও অভিভাবক হিসেবে উল্লেখ করে বলেন,

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ اَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ.

অর্থ: 'এটা এ কারণে যে, আল্লাহ মুমিনদের বন্ধু আর কাফেরদের কোনো বন্ধু নেই।' [মুহাম্মাদ: ১১]

জাবের রাজি. থেকে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট হাদিস বর্ণিত আছে, 'আমার শাফায়াত আমার উম্মতের কবিরা গুনাহকারীদের জন্য।'[১] উবাদা ইবনুস সামিত থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহর কাছে ছিলাম। তিনি বললেন, 'তোমরা আমার কাছে এই মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করছ যে, তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কোনোকিছু শরিক করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, অন্যায়ভাবে কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করবে না...' অতঃপর বললেন, 'তোমাদের যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান পাবে। **আর যে এগুলোর মাঝে কোনো অন্যায়ে লিপ্ত হবে এবং পৃথিবীতে তার শাস্তি হয়ে যাবে, তা হলে সেটা (শাস্তি) কাফফারা হিসেবে গণ্য**

১. সহিহ ইবনে হিব্বান (৬৪৬৭); আবু দাউদ (৪৭৩৯); তিরমিজি (২৪৩৫)।

হবে। আর যদি কেউ অন্যায় করে এবং আল্লাহ তায়ালা সেটাকে ঢেকে রাখেন, তা হলে এর ফয়সালা আল্লাহর হাতে থাকবে। চাইলে তিনি শাস্তি দেবেন, চাইলে ক্ষমা করে করবেন।'[১]

তবে মুমিন গুনাহগারকে শাস্তি দেওয়া বা ক্ষমা করা সম্পূর্ণই আল্লাহর এখতিয়ার। এখানে অন্য কারও হাত নেই। চাইলে তিনি ক্ষমা করবেন; সেটা হবে অনুগ্রহ। এটা একান্তই তাঁর অধিকার। তিনি ক্ষমা করে দিলে তাতে কারও কিছু বলার নেই। আবার চাইলে তিনি ক্ষমা নাও করতে পারেন; এটা হবে তাঁর ইনসাফ। কারণ, যে ব্যক্তি শাস্তি পাচ্ছে, সে মূলত তার কর্মফলের কারণেই শাস্তি পাচ্ছে। সে যদি গুনাহ না করত, আল্লাহ তাকে শাস্তি দিতেন না।

বি.দ্র.: উপরে ইমাম তহাবি মুমিনদের **'আহলে মারিফাত'** হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ এই বক্তব্যের উপর আপত্তি করেছেন। তাদের কথা, মারিফাত মানে চেনা। সে হিসেবে এটার অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহকে শুধু চিনলেই মুমিন হওয়া যাবে; অথচ এটা ভুল, মুরজিয়াদের আকিদা। কারণ, ইবলিসও আল্লাহকে চেনে। সে হিসেবে অর্থ দাঁড়াবে ইবলিসও মুমিন।[২]

বাস্তবে এটার উপর আপত্তি করা যায় না। কারণ, এখানে মারিফাত বলতে আল্লাহকে কেবল চেনার কথা বলা হয়নি। তা হলে পুরা বইয়ে ইমাম তহাবি এতক্ষণ পর্যন্ত কী বললেন? বরং এখানে মারিফাত হলো আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পরিভাষা, যা ঈমান, আমল, আনুগত্য, মহব্বত, ইশক, ফিদা, কুরবানি—সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে।[৩]

নামাজ পরিত্যাগকারী কি কাফের? উপরে আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত মত উল্লেখ করা হয়েছে যে, কবিরা গুনাহের মাধ্যমে মানুষ কাফের হয় না, বরং অপরাধী ও গুনাহগার হিসেবে বিবেচিত হয়। তাওবা না করে মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে থাকবে—চাইলে তিনি ক্ষমা করবেন, চাইলে শাস্তি দেবেন। পিছনে আমরা বর্ণনা করেছি যে, ঈমানের কোনো মৌলিক বিষয় হৃদয় থেকে, মুখে কিংবা কাজের মাধ্যমে অস্বীকার ছাড়া কেউ ঈমান থেকে বের হয় না। অন্য কথায়, গুনাহ কুফর নয়; বরং এটা হলো খারেজি ও মুতাজিলাদের মাজহাব। তারা কবিরা গুনাহকে কুফর মনে করে। প্রশ্ন হয়, তা হলে নামাজ পরিত্যাগকারীর বিধান কী? অনেক আলিম নামাজ

---

১. বুখারি (৪৮৯৪); মুসলিম (১৭০৯)।
২. ইবনে আবিল ইজ (৩৬৪); সালেহ ফাওজান (১২৬)।
৩. আকহাসারি (২০০)।

পরিত্যাগকারীকে কাফের বলেন কীভাবে? অথচ নামাজ পরিত্যাগ একটি কবিরা গুনাহ, যা কুফর হতে পারে না। নাকি এখানে অন্য কোনো কারণ আছে? এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ বক্তব্য কী?

প্রথম কথা হলো, নামাজের অস্তিত্ব ও জরুরতকে অস্বীকার করে যদি কেউ নামাজ না পড়ে, যেমন বলে: নামাজ পড়ারই দরকার নেই; সকল আলিমের মতে সে কাফের।[১] কেননা সে দ্বীনের একটি মৌলিক বিষয় অস্বীকার করেছে। ফলে এখানে নামাজ পরিত্যাগকারী কাফের এটা নিয়ে দ্বিমত নেই। কথা হলো, অস্বীকার নয়, যদি অলসতাবশত মাঝে মাঝে পরিত্যাগ করে, তবে সেটার কী বিধান? এটা নিয়েই মতভেদ তৈরি হয়েছে।

ইমাম আহমদ রাহি. থেকে বর্ণিত, তিনি নামাজ পরিত্যাগকারীকে কাফের বলতেন। এ কারণে সমকালীন অনেক আলিম নামাজ পরিত্যাগকারীকে কাফের বলেন। তাদের দলিল প্রসিদ্ধ হাদিসসমূহ, যেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ ত্যাগ করাকে কুফর বলেছেন। কিন্তু ইবনে বাত্তাহ-সহ অনেকে এটাকে হাম্বলি মাজহাবের গ্রহণযোগ্য রায় নয় বলে মত দিয়েছেন। এর বাইরে বাকি তিন ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও শাফেয়ি-সহ (এবং আহমদ রাহি.-এর একটি মত) সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম নামাজ পরিত্যাগকে বড় গুনাহ মনে করেন; পরিত্যাগকারীকে কাফের বলেন না। তাদের মতে, হাদিসে কাফের বলা হয়েছে ভয়াবহতা বোঝাতে, যেমন আরও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে কাফের বলা হয়েছে। তবে যারা কাফের বলেননি, তারাও (হদ হিসেবে) হত্যা করার পক্ষে রায় দিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা রাহি. বলেছেন, তাকে হত্যাও করা হবে না, বরং আমৃত্যু বন্দি করে রাখা হবে এবং বেত্রাঘাত করা হবে। কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—মুরতাদ, বিবাহিত ব্যভিচারী ও হত্যাকারী ছাড়া অন্য কারও রক্ত হালাল নয়।' ইমাম আজম ছাড়াও দাউদ ইবনে আলি-সহ ইরাক ও হিজাজের অসংখ্য আলিমের মত এটা।[২]

তা ছাড়া অলসতাবশত নামাজ পরিত্যাগকারীকে কাফের বললে সেটা আহলে সুন্নাত নয়, খারেজিদের মাজহাব হয়ে যায়। কারণ, খারেজিরাও আমল পরিত্যাগ

---

১. আল-ইসতিজকার, ইবনে আবদুল বার (১/২৩৫); রদ্দুল মুহতার (১/৩৫২)।
২. আত-তামহিদ, ইবনে আবদুল বার (৪/২৪০); আল-মুগনি, ইবনে কুদামা (২/৩২৯-৩৩২); ইমদাদুল আহকাম (১/১১৩)।

করলে কাফের বলে। এর মাধ্যমে নবিজির বর্ণিত সেসব হাদিস বাতিল হয়ে যায়, যেগুলোতে হৃদয়ে বিন্দু পরিমাণ আমল থাকলে জাহান্নাম থেকে বের করে আনার কথা বলা হয়েছে। তা ছাড়া নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, তার উপর নামাজ (জানাজা) পড়ো।[1] ফলে হাদিসে নামাজ পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে কুফর শব্দটি প্রকৃত কুফর নয়, ঠিক যেমন ব্যভিচার, মদ্যপান, চুরি, মুসলমানের সঙ্গে যুদ্ধ, বংশপরিচয়ে অপবাদ-সহ বিভিন্ন কাজকে হাদিসে কুফর বলা হলেও আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মতিক্রমে সেগুলোতে প্রকৃত অর্থে কুফর বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। ওগুলোতে কুফরের অর্থ যা, এখানেও তা-ই। এখানে বাহ্যিক অর্থ ধরলে ওখানেও ধরতে হবে। আর সেটা আহলে সুন্নাত নয়; বরং খারেজিদের মাজহাব। তাই বলে ইমাম আহমদ এবং এ মতের আলিমগণ খারেজি—এমন নয়; বরং তারা সুন্নাহ ও সালাফের বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেন। ফলে জটিলতা তৈরি হয়েছে। সাহাবাদের মাঝে আলি, ইবনে আব্বাস, আবুদ দারদা, জাবের-সহ অনেক সাহাবি থেকে নামাজ পরিত্যাগকারীকে কাফের বলার বর্ণনা রয়েছে।[2] ইবনে কুদামা সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামের মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সালাফের আমল এর উপরই। তা ছাড়া, সর্বসম্মতিক্রমে নামাজ ছুটে গেলে সেটা কাজা করতে হয়। যদি নামাজ ছেড়ে দেওয়া কুফর হতো, তবে কাজার প্রশ্ন আসত না। কারণ, যে কাফের হয়ে গেছে, সে কাজা করবে কীভাবে?[3]

তবে কেউ যদি সারা জীবন একেবারেই নামাজ না পড়ে, অন্য কথায়, সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে এবং চূড়ান্তভাবে বিমুখ থাকে, তবে সে কাফের। কারণ, এতে ইসলামের প্রতি তার পৃষ্ঠপ্রদর্শন, অজ্ঞতা, অবজ্ঞা, দাম্ভিকতা ও অহংকার প্রকাশ পায়। আল্লাহর উপর ঈমান রাখে এমন কোনো লোক এটা করতে পারে না। তাই প্রত্যেক মুসলিমের নিয়মিত নামাজ আদায় করা উচিত। কারণ, মুসলিম অথচ নামাজ পড়ে না—এই দুটো বিষয় একত্রে যায় না।

হিদায়াতের উপর অবিচল থাকার উপায়: অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু মৌলিক আকিদা এবং সেক্ষেত্রে বিভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলোর বিভ্রান্তি ও বিচ্যুতি উল্লেখ করার পরে ইমাম তহাবি এখানে দূরদর্শিতা, নিষ্ঠা ও বুদ্ধিমত্তার এক বিরল নজির রেখেছেন। আল্লাহর

---

১. দারাকুতনি (১৭৬১); আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (১৩৬২২)।
২. আত-তামহিদ, ইবনে আবদুল বার (৪/২২৫)।
৩. আল-মুগনি (২/৩৩২)।

কাছে তিনি দোয়া করেছেন আল্লাহ যেন সর্বদা হকের উপর, সত্যের পথে অটল রাখেন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা নিজের সীমাবদ্ধতাকে জানা ও মনে রাখা। নিজের অবস্থা দেখে অহংকার ও আত্মতুষ্টিতে না ভোগা। বিভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলোর দিকে তাকিয়ে নিজেকে নিয়ে খুশি না থাকা। আশপাশের মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে আর নিজে সত্যের উপর আছে—এটা নিয়ে আহ্লাদিত না হওয়া; বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা এবং তাঁর কাছে সত্যের উপর অবিচল থাকার দোয়া করা। আমি তাওহিদ জানি, বিশুদ্ধ আকিদা রাখি, আমার কোনো ভয় নেই—এই ধরনের চিন্তা মনে স্থান দেওয়া যাবে না। কারণ, মানুষের অবস্থা সদা পরিবর্তনশীল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনদের এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এমন একটা সময় আসবে যখন মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে; স্যন্ধায় মুমিন থাকবে সকালে কাফের হয়ে যাবে।'[১]

সুতরাং আল্লাহ-প্রদত্ত হিদায়াতে দম্ভে না ভোগা উচিত। আল্লাহর নবি ইবরাহিম, যিনি পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন,

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ

অর্থ: 'হে আল্লাহ, আমাকে এবং আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।' [ইবরাহিম: ৩৫] ইবরাহিম আলাইহিস সালাম হলেন একত্ববাদীদের নেতা, একা একজন উম্মাহ। কুরআনে তাকে একত্ববাদীদের ইমাম হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ সেই ইবরাহিম আলাইহিস সালাম দোয়া করছেন আল্লাহ যেন তাকে মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা করেন। তিনি এটা বলেননি যে, আমি মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা পেয়ে গেছি। কারণ, তিনি জানতেন, কার মৃত্যু কীভাবে হয় সেটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। কেউ সারা জীবন ভালো কাজ করে মৃত্যুর আগ মুহূর্তে জাহান্নামের কাজ করে জাহান্নামে চলে যেতে পারে; আবার কেউ সারা জীবন জাহান্নামের কাজ করে মৃত্যুর আগ মুহূর্তে জান্নাতের কাজ করে জান্নাতে যেতে পারে।[2] ইউসুফ আলাইহিস সালামকেও দেখি আমরা ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুর দোয়া করতে, অথচ তিনি আল্লাহর একজন নবি ও রাসুল। তিনি বলেন,

---

১. মুসলিম (১১৮); তিরমিজি (২১৯৫)।
২. তিরমিজি (২১৩৭)।

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ.

অর্থ: 'হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে রাজ্য দিয়েছেন। আমাকে বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যার জ্ঞান দিয়েছেন। হে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা, দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই আমার বন্ধু ও অভিভাবক। আমাকে ইসলামের উপর মৃত্যুদান করুন এবং পুণ্যবানদের সঙ্গে মিলিত করুন।' [ইউসুফ: ১০১] এ জন্য সবসময় নিজের ঈমানের প্রতি যত্নবান থাকতে হয়। আল্লাহর কাছে সবসময় হিদায়াত প্রার্থনা করতে হয়।

ইবলিস কখনও আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করেনি, আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার করেনি, তথাপি সে সকল কাফের-মুশরিক ও জাহান্নামের অধিবাসীদের ইমাম হয়ে গেছে। কারণ, সে অহংকার করেছে, দাম্ভিকতা দেখিয়েছে, নিজেকে আল্লাহর নির্দেশের উর্ধ্বে মনে করেছে। এই অহংকারের ফলাফল ছিল নিদারুণ করুণ। সুতরাং মানুষের এখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে যে, হিদায়াতের কারণে অহংকারী না হয়ে আল্লাহর কাছে আরও বিনীত হয়ে হিদায়াতের পথে অটল থাকার দোয়া করতে হবে। যেমন: কুরআনে আল্লাহ আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন,

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ.

অর্থ: 'হে আমাদের পালনকর্তা, হিদায়াত দানের পরে আপনি আমাদের হৃদয়গুলো বক্র করে দেবেন না। আপনার পক্ষ থেকে আমাদের অনুগ্রহ দান করুন। আপনিই সবকিছুর দাতা।'। [আলে ইমরান: ৮]

وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ ، وَعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ. وَلَا نُنَـزِّلُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا، وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بِنِفَاقٍ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى .

আমরা আহলে কিবলার অন্তর্ভুক্ত সৎ-অসৎ সকলের পিছনে নামাজ আদায় এবং সকলের মৃত্যুর পরে জানাজা পড়া শরিয়তসম্মত মনে করি। তাদের কাউকে আমরা জান্নাতি-জাহান্নামি সাব্যস্ত করি না। বাইরে প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত তাদের কারও বিরুদ্ধে আমরা কুফর, শিরক কিংবা মুনাফিকির সাক্ষ্য দিই না। সকলের ভিতরের অবস্থা আমরা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করি।

ব্যাখ্যা

সকল মুসলমানের পিছনে নামাজ আদায়: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে, তার উপর (জানাজা) নামাজ পড়ো। আর যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে, তার পিছনে (অর্থাৎ ইমামতিতে) নামাজ পড়ো।"[১] আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিসে এসেছে: 'তোমরা প্রত্যেক সৎ-অসৎ-এর পিছনে নামাজ আদায় করো। তোমরা প্রত্যেক সৎ-অসৎ-এর উপর (জানাজা) নামাজ আদায় করো। তোমরা প্রত্যেক সৎ অসৎ-এর সঙ্গে জিহাদ করো।'[২] এই হাদিসগুলোর সনদ দুর্বল। কিন্তু এগুলোর ভিত্তি ও বাস্তব প্রয়োগ সাহাবা ও সালাফের মাঝে ছিল, তাই উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে সকল মুসলমান বলতে দুটো শ্রেণি:

এক. সাধারণ গুনাহগার মুসলমান। যেমন: কোনো মসজিদের ইমাম যদি বিদআতি কিংবা অন্য কোনো অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকে, তবুও তার পিছনে নামাজ

১. দারাকুতনি (১৭৬১)।
২. সুনানে কুবরা, বাইহাকি (৬৯৩৩); আল মুজামুল আওসাত, তাবারানি (৬১১১)।

আদায় করা যাবে যতক্ষণ মুসলিম ও মুমিন থাকে। ইমাম বুখারি তার সহিহে একটা হাদিসের শিরোনাম লিখেছেন, 'ফিতনাগ্রস্ত ও বিদআতির পিছনে নামাজ আদায়'। হাসান বসরি রাহি. বলতেন, 'তুমি বিদআতির পিছনে নামাজ পড়বে। তার বিদআত তার কাঁধে।'[১] ফলে যেকোনো ইমামের পিছনে নামাজ আদায় করা যাবে। কারও পিছনে নামাজ আদায়ের জন্য তার সম্পর্কে জানা আবশ্যক নয়। যাকে সামনে পাবে, তার পিছনে নামাজ আদায় করবে। এক্ষেত্রে ইমামকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা, তার ভিতরের খবর তলিয়ে দেখা, কিংবা তাকে জিজ্ঞাসা করা 'আপনার আকিদা কী'— এগুলো সালাফের মানহাজ নয়। বরং এমন করা বিদআত। যদি কেউ 'অন্যায়কারী ও গুনাহগার ইমামের পিছনে নামাজ পড়তে হবে' সে চিন্তা থেকে জামাত ত্যাগ করে একা একা নামাজ আদায় করে, সে বরং বিদআতি। কারণ, সাহাবাগণ সবার পিছনে নামাজ আদায় করতেন। হ্যাঁ, ভালো মানুষ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বিদআতির পিছনে নামাজ পড়া মাকরুহ।[২] যদি বিদআতি ইমামের পিছনে নামাজ পরিত্যাগের ফলে তার ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিংবা তাকে অন্যভাবে ঠিক করা যায়, তবে সে ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু তাকে ঠিক করতে গিয়ে জুমা-জামাত নষ্ট করা যাবে না। বরং এক্ষেত্রে রুখসতের উপর আমল করবে। আর যদি বিকল্প ব্যবস্থা থাকে, যেমন: দুই মসজিদ পাশাপাশি হয় এবং এক মসজিদের ইমাম সৎ ও পুণ্যবান হয়, অন্য মসজিদের ইমাম বিপরীত হয়, সেক্ষেত্রে আহলে সুন্নাতের পিছনে নামাজ পড়াই উত্তম।[৩]

দুই. শাসকগোষ্ঠী। ইসলামের প্রথম শতাব্দগুলোতে শাসকই ইমাম হয়ে নামাজ পড়াতেন। সকল শাসক দ্বীনদারির এক পর্যায়ে ছিলেন না, বরং তাদের কেউ ধর্মপ্রাণ মুসলিম ছিল, আবার কেউ ফাসেক ও পাপাচারী ছিল। তথাপি আমাদের সালাফে সালেহিনের কেউ ফাসেক শাসকের পিছনে নামাজ আদায় বর্জন করেননি। কারণ, শাসকের পিছনে নামাজ আদায় সে সময়ে নিষ্ঠা, আনুগত্য ও বিদ্রোহ থেকে দূরে থাকার প্রমাণ বহন করত। তাদের পিছনে নামাজ পরিত্যাগ বিদ্রোহের ইঙ্গিত করত। আর অধিকাংশ সালাফ শাসকের বিরুদ্ধে কেবল জুলুম কিংবা গুনাহের কারণে বিদ্রোহ জায়েজ মনে করতেন না; বরং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইসলামের উপর থাকে, ততক্ষণ তাদের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। এ কারণে তারা সৎ-অসৎ সব শাসকের পিছনে

---

১. বুখারি (৬৯৫)।
২. আল-মাবসুত, সারাখসি (১/৪০)।
৩. ইবনে আবিল ইজ (৩৬৮-৩৬৯)।

নামাজ পড়তেন।[১] এটা মূলত রাসুলুল্লাহর একটি ভবিষ্যদ্বাণী এবং সেটার অনুসরণ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের ইমাম হয়ে এক সম্প্রদায় নামাজ পড়বে (বাজ্জার এর বর্ণনায় এসেছে, আমার পরে এমন কিছু শাসক আসবে, যারা তোমাদের ইমাম হয়ে নামাজ পড়বে)। যদি তারা ঠিক করে, তবে তাদেরটা শুদ্ধ তোমাদেরটাও শুদ্ধ। আর যদি তারা ভুল করে, তবে তোমাদেরটা শুদ্ধ, তাদেরটা তাদের ঘাড়ে।'[২]

ফলে আমরা দেখতে পাই, আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও আনাস ইবনে মালিকের মত সাহাবাগণ হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পিছনে নামাজ পড়তেন, অথচ তারা হাজ্জাজের চেয়ে অনেক উত্তম ছিলেন। অধিকন্তু হাজ্জাজ ছিল চরম জালেম এবং সে কারণে ফাসেক। তবুও শাসক হিসেবে তার পিছনে সাহাবাগণ নামাজ আদায় করেছেন।[৩] বরং তাদেরও আগে উসমান রাজি.-কে যখন ফিতনা সৃষ্টিকারীরা ঘেরাও করে রেখেছিল, তখন তাদেরই একজন ইমাম হয়ে উপস্থিত মুসলমানদের নামাজ পড়াল। উবাইদুল্লাহ ইবনে আদি উসমানকে অভিযোগের সুরে বললেন, আপনি থাকতে এই ফিতনাবাজরা ইমাম হয়ে নামাজ পড়ায়? উসমান বললেন, 'নামাজ হলো সবচেয়ে ভালো কাজ। সুতরাং যখন কেউ ভালো কাজ করে, তখন তার সঙ্গে থাকো। আর যখন খারাপ কাজ করে, তখন তাকে পরিত্যাগ করো।'[৪] ইবনে মাসউদ রাজি. ওয়ালিদ ইবনে উকবার পিছনে নামাজ আদায় করতেন। সে মদ্যপান করত। একদিন ফজরের নামাজ চার রাকাত পড়ে ফেলল। শেষ করে বলল, আরও বাড়াব? ইবনে মাসউদ বললেন, 'বাড়তি ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছি।'[৫] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজি.-এর বড় বড় শাগরিদ মুখতার ইবনে আবু উবাইদের পিছনে জুমার নামাজ পড়তেন।[৬] এটা ইমাম আবু হানিফারও মাজহাব।[৭]

সকল মুসলমানের উপর (জানাজা) নামাজ আদায়: এটাও উপরের মূলনীতি থেকে উৎসারিত। সালাফের সবাই সকল মুসলমানের উপর জানাজা পড়া বৈধ মনে করতেন; বরং মৃত্যু-পরবর্তী অধিকার মনে করতেন। এ কারণে কেউ ঈমান নিয়ে

---

১. সালেহ ফাওজান (১২৭-১২৮)।
২. বুখারি (৬৯৪); বাজ্জার (৮১৪)।
৩. সালেহ ফাওজান (১২৭-১২৮)।
৪. বুখারি (৬৯৫)।
৫. মাজমুউল ফাতাওয়া (২৩/৩৫৩)।
৬. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৫৫৪০)।
৭. শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (২২৮); তুর্কিস্তানি (১৪১)।

মৃত্যুবরণ করলে তার জানাজা পড়তে হবে। যত গুনাহ করে মৃত্যুবরণ করুক সেটা বিবেচ্য নয়। কেননা গুনাহের মাধ্যমে মানুষ কাফের হয় না। আর কাফের না হওয়ার শর্তে গুনাহ করলেও সে মুসলমানই। তাই তার জানাজা পড়তে হবে। বিপরীতে খারেজিদের মতে যেহেতু কবিরা গুনাহকারী কাফের, ফলে তাদের মতে কবিরা গুনাহকারীর জানাজা পড়া যাবে না। এটা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি। হ্যাঁ, যদি কেউ কাফের, মুরতাদ বা মুশরিক হয়ে যায়, সর্বসম্মতিক্রমে তার জানাজা পড়া হবে না। কেননা সে ইসলামের বাইরে। একইভাবে কারও মুনাফিক হওয়া যদি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়, তবে তার জানাজাও পড়া হবে না। এ কারণে আমরা দেখি, হুজাইফা রাজি. যার জানাজা পড়তেন না, উমর রাজি.-ও তার জানাজা পড়তেন না। কারণ, হুজাইফা রাজি.-কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিকদের ব্যাপারে জানিয়েছিলেন, যা অন্য কাউকে জানাননি।[১]

তবে মুসলিম শাসক (খলিফা) এবং নেতৃস্থানীয় উলামায়ে কেরাম ভালো মনে করলে কিছু গুনাহগারের নামাজ পড়বেন না, যাতে করে মানুষ সতর্ক হয়। যেমন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আত্মহত্যাকারীর জানাজার নামাজ পড়েননি।[২] ইমাম নববি উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেন: 'মালেক, আবু হানিফা, শাফেয়ি-সহ জমহুরের কাছে আত্মহত্যাকারী এবং অন্যান্য গুনাহগারের জানাজা পড়া বৈধ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েননি যাতে আর কেউ এমন করার সাহস না পায়। তাই নেতৃস্থানীয়গণ ফাসেকদের জানাজা পড়বেন না।'[৩] তা ছাড়া বিদ্রোহী, ডাকাত-সহ কিছু কিছু ব্যক্তির জানাজা পড়ার ব্যাপারে ইমামগণ আপত্তি করেছেন। কারণ, জানাজার মানে হচ্ছে দোয়া ও ইস্তিগফার। আর এসব মানুষ লানত পাওয়ার উপযুক্ত। ফলে তাদের জানাজা পড়া হবে না।[৪]

চরমপন্থি সেকুলার, ইসলাম, মুসলিম ও উলামাবিদ্বেষী প্রগতিশীল, ধর্মহীন লেখক-বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোকদের জানাজাও শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ পড়বেন না। অন্যরা পড়বে বাহ্যিক মুসলিম পরিচয় হিসেবে। আর যদি কারও ধর্মহীনতা সুস্পষ্ট রিদ্দাহর পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তবে তার কোনো জানাজা পড়া হবে না। কারণ, যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় দ্বীন-ধর্মের ধার ধারত না, মৃত্যুর পরে তার মাথায় দ্বীন-ধর্ম চাপিয়ে

---

১. ইবনে আবিল ইজ (৩৬৯)।
২. মুসলিম (৯৭৮)।
৩. শরহে মুসলিম, নববি (৭/৪৭)।
৪. তুর্কিস্তানি (১৪১)।

দেওয়ার যুক্তি নেই। ফলে তার পথ সে দেখবে। আলিমগণ সাধারণ মানুষকে এসব ফাতাওয়া জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ.

অর্থ: 'আর তাদের মধ্য থেকে কারও মৃত্যু হলে আপনি তার উপর কখনও (জানাজা) নামাজ পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহ ও তার রাসুলকে অস্বীকার করেছে এবং ফাসেক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে।' [তাওবা: ৮৪]

মুসলমানকে তাকফির করা নিষিদ্ধ: পিছনে আমরা তাকফির তথা মুসলমানকে কাফের বলা নিষিদ্ধ-সংক্রান্ত কিছু কথা উল্লেখ করেছি এবং মুসলমানদের কাউকে জান্নাতি বা জাহান্নামি সাক্ষ্য দেওয়া যে নিষিদ্ধ সেটাও উল্লেখ করেছি। বিষয়টির প্রচণ্ড গুরুত্বের কারণে ইমাম তহাবি এখানে আবারও সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। এটা ইমাম তহাবির দরদ ও দূরদর্শিতার প্রমাণ। কারণ, এগুলো সেই বিষয় যুগে যুগে যা মুসলিম উম্মাহর উপর ঝড়-তুফানের দুয়ার খুলে দিয়েছে। পরস্পরকে কাফের বলা, জাহান্নামের সনদ ধরিয়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মাহ অবর্ণনীয় কোন্দল ও অন্তর্কলহে লিপ্ত হয়েছে। ফলে তারা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং কাফেররা একসময় তাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। এ কারণে ইমাম তহাবি মুসলিম-সমাজের ভিতরে ধর্মীয় বিশৃংখলা উসকে দিতে পারে এ-রকম প্রত্যেকটা দরজা শক্ত হাতে বন্ধ করে দিয়েছেন। বারবার ঘুরেফিরে এগুলো সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।

আহলে সুন্নাতের মানহাজ অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে মুমিনদের জান্নাতি এবং কাফেরদের জাহান্নামি বলা বৈধ। কিন্তু নির্দিষ্ট করে কাউকে জান্নাতি অথবা জাহান্নামি বলা বৈধ নয়। সুতরাং কোনো মুসলিম যত বেশি গুনাহ করুক, যদি সুস্পষ্ট কুফুরে লিপ্ত না হয়, তবে তাকে জাহান্নামি বলা যাবে না। কারণ, তার পরিণতি কী হয় আমরা জানি না, একমাত্র আল্লাহ জানেন। হাদিসে এসেছে, 'কেউ জীবনভর জান্নাতের আমল করতে থাকে। এর পর যখন জান্নাত এবং তার মাঝে মাত্র এক হাত বাকি থাকে, ভাগ্যলিপি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং তার সর্বশেষ আমল হয় জাহান্নামিদের; ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। আবার কেউ সারা জীবন জাহান্নামের আমল করে। পরিশেষে যখন তার মাঝে ও জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাত দূরত্ব থাকে, ভাগ্যলিপি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, তার জীবনের শেষ আমল হয় জান্নাতিদের; ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করে।'[১]

---

১. বুখারি (৩২০৮, ৭৪৫৪); মুসলিম (২৬৪৩); তিরমিজি (২১৩৭)।

যেহেতু আমাদের কারও শেষ পরিণতি জানা নেই, তাই একজন মুসলিম যত গুনাহ করুক, আমরা তাকে জাহান্নামি বলব না। কারণ, অসম্ভব নয় যে, মৃত্যুর আগে সে তাওবা করে জান্নাতি হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে। একইভাবে আমরা কারও বাহ্যিক বুজুর্গি দেখেই জান্নাতের সনদ দিয়ে দেবো না। যত বেশি আমল করুক, যত বড় ওলি হোক, আমরা তাকে মুক্তি ও নাজাতের সার্টিফিকেট দেবো না। হ্যাঁ, শরিয়তে যাদের ব্যাপারে জান্নাতের ঘোষণা এসেছে, যেমন: চার খলিফা, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবা (আশারায়ে মুবাশশারা), অন্য আরও যেসব সাহাবার ব্যাপারে আল্লাহর রাসুল জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, আমরা তাদের জান্নাতি বিশ্বাস করব।

তা হলে আমাদের করণীয় কী? মুসলমানের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা হচ্ছে দ্বীনদারি, আনুগত্য, ঈমান ও ইসলামের উপর থাকা। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের ব্যাপারে আমরা সুধারণা রাখব, প্রত্যেককে আমরা মুমিন ভাবব; কাউকে আমরা কাফের-মুশরিক অথবা মুনাফিক বলব না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার কথা বা কর্মের মাধ্যমে সেগুলো সুস্পষ্টভাবে ফুটে না ওঠে। এমনকি যখন কারও কথা বা কর্মের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে কুফর ফুটে উঠবে, তখনও সাধারণ মানুষ তাকে কাফের বলবে না; বরং বিজ্ঞ আলিমগণ এ ব্যাপারে পরামর্শ, গবেষণা ও চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন। কারণ, একজন মুমিনকে কাফের বলা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। পিছনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে নিরাপদ ও বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে মুসলমানদের পিছনে না পড়া। কেননা আমাদের সকল মুসলমানের পিছনে পড়ে তাদের ভিতর থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সবকিছু বের করার দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। বরং আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নিজের হিসাবের প্রতি যত্নবান থাকতে, অন্যদের বাহ্যিক অবস্থা বিচার করতে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত বাহ্যিকভাবে কাউকে মুমিন দেখব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তার ব্যাপারে সুধারণা রাখব। সকলের ভিতরের অবস্থা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করব। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'হে লোকসকল, যারা মুখে ঈমান এনেছে, অথচ ঈমান এখনও তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলমানদের গিবত করো না; মুসলমানদের পিছনে লেগো না। কারণ, যে মুসলমানদের পিছনে লাগে, আল্লাহ তার পিছনে লাগবেন। আর আল্লাহ যার পিছনে লাগবেন, তাকে সবার সামনে অপদস্থ করে ছাড়বেন।'[১]

---

১. আবু দাউদ (৪৮৮০); তিরমিজি (২০৩২)।

وَلاَ نَرَى السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ.

শরয়ি বিধানের বাইরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত কারও বিরুদ্ধে আমরা তরবারি উত্তোলন বৈধ মনে করি না।

ব্যাখ্যা

মুসলমানের রক্ত সুরক্ষিত: ইসলামে মানুষের রক্ত অত্যন্ত সম্মানিত। আল্লাহ তায়ালা একজন নিরপরাধ মানুষের হত্যাকে গোটা মানবজাতির হত্যার সঙ্গে তুলনা করেছেন। একজনের প্রাণ বাঁচানোকে গোটা মানবজাতির প্রাণ বাঁচানোর সদৃশ আখ্যা দিয়েছেন।

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا.

[মায়িদা: ৩২]। ইসলাম ছাড়া জগতের আর কোনো ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব কিংবা জাতীয় নেতা মানব প্রাণের এতটা মূল্যায়ন করতে পারেনি।

ইসলামে মুসলমানের রক্ত আরও পবিত্র ও সুরক্ষিত। আল্লাহ তাঁর দ্বীনের মাধ্যমে এই সুরক্ষা নিশ্চিত করেছেন। সুতরাং কোনো মুসলমানের রক্ত ঝরানো জায়েজ নয়। কোনো মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَ مَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهٗ وَ اَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا.

অর্থ: 'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো মুমিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতে সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন, তাকে অভিসম্পাত করেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।' [নিসা: ৯৩]

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিসে বলেছেন: 'আমি মানুষের সঙ্গে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয়—আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল। আর নামাজ আদায় করে, জাকাত প্রদান করে। যখন তারা এগুলো করবে, **তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার কাছ থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে।** তবে ইসলামের কোনো হক থাকলে ভিন্ন কথা। তাদের অন্তরের হিসাব থাকবে আল্লাহর উপর।'[১] সুতরাং যে ব্যক্তি ইসলামকে তার জীবনবিধান হিসেবে স্বীকার করে কালিমার সাক্ষ্য দেয় এবং তার কাছ থেকে সুস্পষ্ট ইসলামবিরোধী কোনোকিছু প্রকাশ না পায়, তবে তার রক্ত ঝরানো হারাম। কোনোভাবে তার উপর সীমালঙ্ঘন করা যাবে না, রক্তপাত করা যাবে না, হত্যা করা যাবে না। বিদায় হজের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্মান ও সম্ভ্রম ততটা সম্মানিত ও মর্যাদাময়, ঠিক যেমন এই শহরে (মক্কায়) এই মাসে (জুলহজ) এই দিনটি (১০ তারিখ কুরবানির দিন) মর্যাদাময়।'[২] অর্থাৎ এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা যাবে না। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, 'একজন **মুমিনের মর্যাদা আল্লাহর কাছে কাবার মর্যাদার চেয়েও বেশি।'** ইবনে উমর থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা তাওয়াফ করছিলেন আর বলছিলেন, 'তুমি কত সুন্দর! তোমার ঘ্রাণ কত সুন্দর! তুমি কত মহান! তুমি কত মর্যাদাময়! তবে সেই সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! মুমিনের মর্যাদা, তার সম্পদ ও রক্তের মর্যাদা আল্লাহর কাছে তোমার মর্যাদার চেয়েও বেশি।'[৩] অপর একটি হাদিসে এসেছে, 'একজন মুসলিম নিহত হওয়ার চেয়ে গোটা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর কাছে অধিক তুচ্ছ।'[৪]

সুরক্ষা বিনষ্ট হওয়ার কারণসমূহ: মুসলিমের রক্ত নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকার ক্ষেত্রে ইমাম তহাবি উপরে একটি শর্ত আরোপ করেছেন। তা হলো, 'শরয়ি বিধানের

---

১. বুখারি (২৫); মুসলিম (২২); দারাকুতনি (৮৯৮)।

২. বুখারি (৬৭); মুসলিম (১৬৭৯, ১২১৮); আবু দাউদ (১৯০৫)।

৩. সুনানে ইবনে মাজা (৩৯৩২); আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (১০৯৬৬)। শুআবুল ঈমান বাইহাকি ইবনে আব্বাসের সূত্রে মারফু (৩৭২৫)। তিরমিজি এটা ইবনে উমর থেকে মাওকুফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন (২০৩২)। মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাকে এটা আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে মাওকুফ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে (২০২৬০)।

৪. তিরমিজি (১৩৯৫); ইবনে মাজা (২৬১৯); এ প্রসঙ্গে একটা বর্ণনা রয়েছে, মুমিনের প্রাণের চেয়ে আল্লাহর কাছে কাবা ধ্বংস হয়ে যাওয়া তুচ্ছ। ইমামগণ এই শব্দে হাদিসটিকে অপ্রমাণিত বলেছেন [আল-মাকাসিদুল হাসানাহ, সাখাবি ৫৪১]। কিন্তু এটার অর্থ প্রমাণিত, যেমনটা পূর্বের হাদিসে আমরা দেখেছি। তা ছাড়া এ হাদিস দ্বারাও সেটা প্রমাণিত। যখন গোটা দুনিয়া আল্লাহর কাছে তুচ্ছ, কাবা তো দুনিয়ার মাঝেই।

বাইরে'। অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত নিরাপদ, কিন্তু সে যদি এমন কোনো কাজ করে, যা আল্লাহর আইন ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ হওয়ার কারণে ইসলামে নিষিদ্ধ হয়, জীবন ও জগতের স্বাভাবিক বিকাশ ও শৃঙ্খলার জন্য যেসব নিয়ম-নিজাম ও বিধিবিধান সংরক্ষণ করা জরুরি, সেগুলোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, তখন এই সুরক্ষা নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে সেসব নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার ফলে তার রক্তপাত বৈধ হবে। কারণ, মুসলমানের রক্ত পবিত্র বলে সে যা ইচ্ছা তা-ই করবে, কিন্তু তাকে হত্যা করা যাবে না, এটা হতে পারে না। এভাবে জীবন ও জগৎ টিকতে পারবে না। যে-কেউ ইসলামের নাম দিয়ে যা খুশি তা-ই করবে। এ জন্য মুসলমানের রক্ত ততক্ষণ পর্যন্ত সুরক্ষিত থাকবে, যতক্ষণ সে নিজে সুরক্ষিত রাখবে। সে যদি এমন কাজ করে, যেগুলো তার রক্তের সুরক্ষা ভেঙে দেয়, তখন তাকেও হত্যা করা হবে, যাতে একজনের রক্তপাতের মাধ্যমে হাজার জনের রক্ত সুরক্ষিত রাখা সম্ভব হয়, অল্প ক্ষতির বিনিময়ে বৃহত্তর ক্ষতি থেকে মানবজাতি রক্ষা পায়। এটা হলো ইসলামের বাস্তবোচিত ও বিজ্ঞানময় নীতি।

একটি হাদিসে এসেছে, 'তিন ব্যক্তি ছাড়া কোনো মুসলমানের রক্ত হালাল নয়: এক. বিবাহিত ব্যভিচারী। দুই. হত্যার বিনিময়ে হত্যা। তিন. মুরতাদ তথা ইসলাম ত্যাগকারী।'[১] সুতরাং কোনো বিবাহিত ব্যক্তি যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাকে পাথর মেরে (রজম) হত্যা করা হবে। কারণ, এই একজনকে হত্যার মাধ্যমে হাজারও মানুষ, সংসার, জীবন ও জগৎ সুরক্ষিত থাকবে। একইভাবে কেউ কোনো মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে এবং নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ তাকে হত্যার দাবি করলে হত্যাকারীকেও হত্যা করা হবে। কারণ, এটা অন্যদের জীবনের কারণ হবে। আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ: 'হে ঈমানদারগণ, তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কিসাস গ্রহণ ফরজ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলে, দাস দাসের বদলে এবং নারী নারীর

১. বুখারি (৬৮৭৮); মুসলিম (১৬৭৬)।

পরিবর্তে। অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা ক্ষমা করে দেওয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালোভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এর পরও যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। হে বুদ্ধিমানগণ, কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পারো।' [বাকারা: ১৭৮-১৭৯] অন্য আয়াতে বলেন,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

অর্থ: 'আর আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমসমূহের বিনিময়ে সমান জখম। আর যে ক্ষমা করে, সেটা তার গুনাহের কাফফারা হবে। যেসব লোক আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানানুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই জালেম।' [মায়িদা: ৪৫] সর্বশেষ কেউ ইসলাম থেকে ঘৃণা ও বিদ্বেষবশত বেরিয়ে গেলে সেটা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ গণ্য হবে এবং তাকে হত্যা করা হবে। যাতে হাজারও মানুষের ঈমান সুরক্ষিত থাকে।

এই ব্যতিক্রমের আওতায় আরও কিছু ব্যক্তি প্রবেশ করবে। যেমন: বিদ্রোহ করা; কেউ যদি নিজে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও অন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, জনজীবনে ত্রাস সৃষ্টি করে, পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তবে তাকে হত্যা করা হবে। কারণ, সে মুসলমানদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে চাচ্ছে, মুসলমানদের ভিতরে বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে চাচ্ছে এবং মুসলমানদের শাসককে হত্যা করতে দাঁড়িয়েছে। ফলে তাকে হত্যা করা হবে, যাতে তার হাত থেকে সবাই নিরাপদে থাকে, উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি সুরক্ষিত থাকে। আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰىهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ إِلٰٓى أَمْرِ اللهِ.

অর্থ: 'যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর সীমালঙ্ঘন

করে, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।' [হুজুরাত: ৯] একইভাবে ডাকাতদেরও হত্যা করতে হবে। কেননা তাদের হত্যা না করলে তারা মানুষ হত্যা করবে। সুতরাং গণমানুষের সুরক্ষা এবং তাদের ফিতনার দরজা চিরতরে বন্ধ করার জন্য এসব অনিষ্টতা সমূলে উপড়ে ফেলা হবে। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

অর্থ: 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং ভূপৃষ্ঠে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে, অথবা শূলে চড়ানো হবে, অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে, অথবা দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে। এটা হলো তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।' [মায়িদা: ৩৩]

ইসলামে মুরতাদের বিধান: 'ইরতিদাদ' বা 'রিদ্দাহ' হলো ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়া। মুরতাদ হলো, যে ব্যক্তি জন্মগতভাবে কিংবা যেকোনো উপায়ে জীবনের একটা সময় ইসলামের উপর থাকার পরে ইসলাম ত্যাগ করে। এই ত্যাগ যেকোনো উপায়েই হতে পারে। **অন্তরে,** যেমন আল্লাহকে অবিশ্বাস করা, কুরআন আল্লাহর কিতাব অস্বীকার করা। **মুখে,** যেমন আল্লাহ কিংবা আল্লাহর রাসুলকে গালি দেওয়া। **কর্মে,** যেমন কুরআন-হাদিস কিংবা মসজিদে লাথি দেওয়া, মূর্তির সামনে সিজদা করা। কিংবা **বর্জনের** মাধ্যমেও হতে পারে। যেমন: ইসলামের সকল বিধান চূড়ান্তভাবে বর্জন করা। সুতরাং যে ব্যক্তি সজ্ঞানে, সুস্থ ও বালেগ অবস্থায়, স্বেচ্ছায় এ ধরনের কাজ করবে এবং তার উপর হুজ্জত কায়েম হয়ে যাবে (অর্থাৎ জানানো ও বোঝানোর পরেও না ফিরবে), সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে, মুরতাদ গণ্য হবে।

ইসলামে মুরতাদের সাধারণ শাস্তি হত্যা। এটা আলিমদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।[১] বরং তারা মুরতাদের গোসল, কাফন-দাফন করতেও নিষেধ করেছেন। হাসকাফি (১০৮৮ হি.) লিখেন, মুরতাদকে কুকুরের মতো কোনো একটা গর্তে ফেলে দেওয়া

১. তিরমিজি (১৪৫৮); আত-তামহিদ (৫/৩০৬); আল-মুগনি (৯/৩); আহসানুল ফাতাওয়া (৬/৩৬৯-৩৮২)।

হবে।[1] কারণ, এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট একাধিক বিশুদ্ধ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। সহিহ বুখারিতে রয়েছে: 'যে ব্যক্তি তার ধর্ম (তথা ইসলামকে) বদল করে, তাকে হত্যা করে দাও।'[2] অন্য এক হাদিসে এসেছে, 'তিন ব্যক্তি ছাড়া কোনো মুসলমানের রক্ত হালাল নয়: এক. বিবাহিত ব্যভিচারী। দুই. হত্যার বিনিময়ে হত্যা (কিসাস)। তিন. মুরতাদ তথা ইসলাম ত্যাগকারী ও মুসলমানদের জামাতের উপর বিদ্রোহকারী।'[3]

সমকালীন যুগে এক শ্রেণির তথাকথিত ভদ্র ও উদার মুসলমান মুরতাদ হত্যাকে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও উগ্রবাদ মনে করে। বরং তাদের কেউ কেউ বুখারি-মুসলিমের হাদিসের বিশুদ্ধতা নিয়েও আপত্তি করে। কেউ কেউ তাতে রাজনীতির গন্ধও পায়। তাদের মতে, ইসলামের মতো উদার দ্বীনের সঙ্গে এটা যায় না। কারণ কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ অর্থ: 'তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার।' [কাফিরুন: ৬] অন্য আয়াতে বলেন, لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ অর্থ: 'ধর্মে কোনো জোরজবরদস্তি নেই।' [বাকারা: ২৫৬] অন্য আয়াতে বলেন, فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ অর্থ: 'সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনবে, আর যার ইচ্ছা কুফরি করবে।' [কাহাফ: ২৯] সুতরাং কেউ মুরতাদ হতে চাইলেও তাকে জোর করে ইসলামে থাকতে হবে, মুরতাদ হলে হত্যা করতে হবে এসব কি ধর্মান্ধতা ও চরমপন্থা নয়? ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ নয়? যেহেতু কুরআন মানুষকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দিচ্ছে, হাদিস সেটার সঙ্গে সাংঘর্ষিক; আর কুরআন-হাদিস কখনও সাংঘর্ষিক হতে পারে না। সুতরাং বোঝা গেল, এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসগুলো সঠিক নয়। ফলে মুরতাদকে হত্যা করাও যথাযথ নয়। আমরা সংক্ষেপে তাদের কথার স্থূলতা প্রমাণ করব।

নিঃসন্দেহে ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ উদারতার ধর্ম, কল্যাণকর বাক্-স্বাধীনতার ধর্ম। ফলে ইসলাম জোর করে কাউকে মুসলিম বানানোর পক্ষপাতী নয়। একইভাবে কেউ যদি ইসলাম ত্যাগ করে, তবে তাকেও জোর করে ইসলামে ধরে না রাখাই যৌক্তিক। ফলে মুরতাদকে শাস্তি না দেওয়াই যৌক্তিক। তা হলে মুরতাদের শাস্তি হত্যা কেন?

মুরতাদকে হত্যা করা হয় মূলত **ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ফলে।** কারণ, ইসলাম আল্লাহর একমাত্র জীবনব্যবস্থা। এটা কোনো দোকান বা সংগঠন নয় যে, যার মনে চায় এখানে ঢুকবে, যার মনে চায় বের হবে। বরং এটা জগতের একমাত্র বিশুদ্ধ

---

১. রদ্দুল মুহতার (২/২৩০)।
২. বুখারি (৩০১৭, ৬৯২২); ইবনে হিব্বান (৪৪৭৫); হাকেম (৬৩৫১)।
৩. বুখারি (৬৮৭৮); মুসলিম (১৬৭৬)।

ধর্ম। একজন মানুষ একটা বিশুদ্ধ বস্তু (কোনো বিকল্প না থাকা অবস্থায়) ত্যাগ করার অর্থ হচ্ছে সেটাকে অশুদ্ধ বলে ঘোষণা করা। জগতের সকল মানুষ কোনো-না-কোনো একটা বিশ্বাসের উপর থাকে। নাস্তিকদেরও বিশ্বাস রয়েছে। ফলে ইসলাম ত্যাগ করার অর্থ হলো, ইসলামের বিশুদ্ধতাকে প্রত্যাখ্যান করে অন্য কোনো ধর্মবিশ্বাস কিংবা মতাদর্শকে ইসলামের চেয়ে অধিকতর শুদ্ধ বলা। তা ছাড়া এই দরজা উন্মুক্ত করা হলে ইসলামের শত্রুরা এটাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে। পরিচিত ও প্রভাবশালী লোকগুলো একদিন বলবে, 'আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম।' পরের দিন বলবে, 'ইসলাম সঠিক ধর্ম নয়, তাই আমরা এটা প্রত্যাখ্যান করলাম।' এতে অসংখ্য মানুষের ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হবে, অসংখ্য মানুষ ইসলাম থেকে সরে যাবে। এটা ইসলামের উপর আঘাত। আর ইসলামের উপর আঘাতের কারণে, ইসলামকে অন্যায়ভাবে অশুদ্ধ সাব্যস্ত করার কারণে, ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণে তাকে হত্যা করা হবে।[১]

বিষয়টি অন্যভাবে বুঝুন। কেউ মনে মনে ইসলাম ত্যাগ করল, তাকে কি হত্যা করা হবে? না, তাকে হত্যা করা হবে না। কারণ, তার ইসলামত্যাগের বিষয়টা কেউ জানেই না। কেউ প্রকাশ্যে এমন কোনো কাজ করল যা কুফরির দিকে ইঙ্গিত করে, কিন্তু সে মুখে নিজেকে মুসলিম দাবি করল। তাকে কি হত্যা করা হবে? না, তাকেও হত্যা করা যাবে না। কারণ, বাহ্যিক অবস্থার উপর ফয়সালা করা হবে এবং তার কুফরি কাজকে ব্যাখ্যার সুযোগ দেওয়া হবে। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের যুগেও এমন ঘটেছে। কিছু উদাহরণ:

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুলরা সুস্পষ্ট কাফের ও মুরতাদ ছিল। হ্যাঁ, বাইরে ইসলাম প্রকাশ করাতে তাদের মুনাফিক বলা হতো। কিন্তু আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল তো তাদের কুফর ও রিদ্দাহ সম্পর্কে জানতেন। তবুও তাদের হত্যা করেননি। একইভাবে জুলখুওয়াইসিরাহ। সে আল্লাহর রাসুলের ইনসাফ নিয়ে অপবাদ দিয়েছিল, সেটাও ইরতিদাদ ছিল। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করেননি। উমর রাজি. তাদের প্রত্যেককে হত্যা করতে চাইলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'না, থাক। মানুষ তাতে বলবে মুহাম্মাদ তার সঙ্গীদের হত্যা করে।'[২] তা হলে দেখা যাচ্ছে, তারা হত্যার উপযুক্ত ছিল, কিন্তু মানুষের মাঝে

১. ইমদাদুল ফাতাওয়া (৬/২১৬)।
২. বুখারি (৩৫৮১, ৪৯০৫); মুসলিম (১০৬৩, ২৫৮৪)।

শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আরও একজন মরুচারী বেদুইন ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পরের দিন সে এসে রাসুলুল্লাহকে বলে, আমার বাইয়াত উঠিয়ে নিন (মানে আমি মুসলিম থাকতে চাই না)। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যাখ্যান করলেন। এভাবে তিনবার করার পরেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যাখ্যান করেন। সে চলে যায়। যাওয়ার পরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মদিনা হলো (কামারের) হাপরের মতো—ভালোটা রাখে, খারাপটা দূর করে দেয়।'[১] উক্ত ব্যক্তিও মুরতাদ ছিল, কিন্তু রাসুল তাকে হত্যা করেননি। কারণ, সে নিরীহভাবে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিল। উমর রাজি.-এর যুগেও এমন ঘটনা ঘটেছে। সে যুগে ছয় ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে মুশরিকদের সঙ্গে যোগ দেয়। একটা সময় পরে একদিন আনাস রাজি.-কে তিনি তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। আনাস বলেন, তারা যুদ্ধে নিহত হয়েছে। উমর রাজি. বলেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আনাস বলেন, আমিরুল মুমিনিন, তাদের নিহত হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল? (অর্থাৎ হয়তো মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে, নয়তো তাদের হাতে ধরা পড়ে মুরতাদ হিসেবে)। উমর রাজি. বললেন, 'হ্যাঁ, ছিল। আমার ইচ্ছা ছিল তাদের কাছে ইসলাম পেশ করব। যদি অস্বীকৃতি জানায়, তবে জেলে পুরে রাখব।'[২] এখানেও খেয়াল করুন, ইসলামের উদ্দেশ্য এক কোপে মুরতাদকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া নয়; বরং উদ্দেশ্য তাকে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে আনা কিংবা দ্বীন ও মুসলমানদের তার ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। উমর ইবনে আবদুল আজিজের যুগে কিছু মানুষ মুরতাদ হলে তিনি তাদের জিজইয়া বৃদ্ধি করে দিতে বলেন, হত্যা নয়।[৩]

এসব ঘটনার বিপরীতে আবার আমরা রাসুলুল্লাহকে দেখি উরানিয়্যিনের প্রসিদ্ধ ঘটনায় তাদের প্রচণ্ড ক্রোধের সঙ্গে হত্যা করা হয়।[৪] কারণ, তারা কেবল মুরতাদ হয়নি, বরং মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। একইভাবে ইবনে খাতালকে কাবার পাশে হত্যা করা হয়। কারণ, সে মুরতাদ হয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, সে কবিতায় ইসলাম ও রাসুলুল্লাহর সমালোচনা করত। মানুষ যখন তাকে মুরতাদ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করত,

---

১. বুখারি (১৮৮৩); মুসলিম (১৩৮৩)।
২. সুনানে কুবরা, বাইহাকি (১৬৯৮৯); মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক (১৮৬৯৬)। মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩৩৪০৬)। আরও বিস্তারিত দেখুন: শরহে মাআনিল আসার (৫১০৫)
৩. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক (১৮৭১৩, ১৮৭১৪)।
৪. বুখারি (২৩৩, ৫৬৮৫); আবু দাউদ (৪৩৬৪)।

সে বলত—ওটা তোমাদের ধর্মের চেয়ে ভালো ধর্ম নয়।[১] আবু বকর রাজি.-ও রিদ্দাহর যুদ্ধে জাকাত অস্বীকারকারীদের হত্যা করেছেন। কারণ, তারা কেবল অস্বীকার করে ক্ষান্ত থাকেনি, বরং গোটা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে হুমকিস্বরূপ ছিল।[২]

বোঝা গেল, কেবল মুরতাদ হওয়ার কারণে (বাহ্যত যদিও কারণ এটাই) বাস্তবে কাউকে হত্যা করা হচ্ছে না। বরং ইসলামের বিরোধিতা, মুসলমানদের ঈমানের পথে প্রতিবন্ধকতা, আল্লাহ ও রাসুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আর মুসলিম সমাজে বিশৃঙ্খলার দায়ে মূলত মুরতাদকে হত্যা করা হয়। আর এখানেই পিছনের সেসব আয়াত বুঝতে হবে যেগুলোতে ধর্মীয় স্বাধীনতা, ঈমান ও কুফরের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহও মুরতাদকে হত্যাসংক্রান্ত হাদিসে 'মুসলমানদের জামাত পরিত্যাগকারী' (অর্থাৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী দুশমনের সঙ্গে আঁতাঁতকারী) শর্তটা যোগ করেছেন। কারণ, মুরতাদরা সাধারণত এটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকে না; এতটা নিষ্পাপ, নিরীহ ও ভদ্র হয় না। তারা বেশ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ইসলাম পরিত্যাগের ঘোষণা করে, ইসলামের ভিতরে বিভিন্ন ভুল ও অশুদ্ধি আবিষ্কারের পিছনে নিজের পরবর্তী জীবন উৎসর্গ করে। এতে একদিকে যেমন ইসলাম তাদের অন্যায্য আক্রমণের শিকার হয়, অপরদিকে অন্য মুসলিমরা ইসলামের মাঝে সন্দেহ করতে শুরু করে। এসব সন্দেহ বাড়তে বাড়তে অনেক মুসলিম একসময় ইসলামত্যাগের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলে সমাজে অযথাই ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী দলের সংখ্যা ভারী হতে থাকে। অপরদিকে যেসব অমুসলিম ইসলামে প্রবেশের পরিকল্পনা করে, তাদের পরিকল্পনা বাধাগ্রস্ত হয়, তারা মুরতাদদের কলমে ইসলামের এমন কুৎসিত রূপ দেখে, যা ইসলামের প্রতি তাদের অনুরাগ ও আকর্ষণ ধ্বংস করে ফেলে। এক কথায়, একটা মুরতাদ কেবল নিজে ইসলাম থেকে বেরিয়ে ক্ষান্ত থাকে না, বরং সে নিজেকে ইসলামের এক বিশাল শত্রুতে পরিণত করে, হাজার হাজার মানুষের ইসলামের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। লাখো মুসলিমের ঈমান নষ্ট করে। এটা আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিদ্রোহ। এটা ধর্মীয় স্বাধীনতার সুস্পষ্ট সীমালঙ্ঘন, এটা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা। আর

---

১. বুখারি (১৮৪৬); মুসলিম (১৩৫৭); মাগাজিতে ওয়াকেদ এটা ইবনে খাতাল এবং মিকইয়াস ইবনে সুবাবা দুজনের ঘটনাতে উল্লেখ করেছেন। (২/৮৫৯, ২/৮৬২)। আস-সারিমুল মাসলুল (১২৮)-এ ইবনে তাইমিয়া এটাকে ইবনে খাতালের ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর বালাজুরি (আনসাবে ১১/৪১) এটাকে হিলাল ইবনে আবদুল্লাহর ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ব্যক্তি যেই হোক, মূল ঘটনা প্রমাণিত। ইবনে খাতাল এবং মিকইয়াস দুজন কেবল মুরতাদ হয়েই ক্ষান্ত হয়নি, দুজনই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমালোচনা করত।

২. ইলাউস সুনান (১২/৬৩৩)।

উপরের সবগুলো অপরাধের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। সুতরাং ইসলামকে গোঁড়া বলা হবে কোন যুক্তিতে? ধর্মীয় স্বাধীনতার সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। কারণ, কাফেরকে জোর করে ইসলামে ঢুকতে কিংবা না ঢুকলে হত্যা করার কথা কেউ বলেনি। এটা হলো ইসলামের উপর অপবাদ ও বিদ্রোহের শাস্তি।

কারও একটি দেশের নাগরিগত্ব ভালো না লাগলে সে আরও উন্নত দেশে চলে যাক, কিন্তু সেখানে গিয়ে যদি তার সবসময়ের কাজ হয় জন্মভূমির **অন্যায় সমালোচনা,** তবে কি সেটা বাক্-স্বাধীনতা হিসেবে দেখা হবে, নাকি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ গণ্য হবে, যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড? কারও কোনো প্রতিষ্ঠান ভালো না লাগলে সে উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করতেই পারে। এটা তার অধিকার। কিন্তু যদি সে তার জীবনের মিশন বানিয়ে নেয় উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্যায্য ও মিথ্যা সমালোচনা, তবে কি সেটা বাক্-স্বাধীনতা হবে? এ কারণেই মুরতাদ মানে হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী, পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। আর এসবের শাস্তি হচ্ছে হত্যা। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

অর্থ: 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং ভূপৃষ্ঠে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি এই যে, তাদের হত্যা করা হবে, অথবা শূলে চড়ানো হবে, অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে, অথবা দেশ থেকে বিতাড়িত করা হবে। এটা হলো তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।' [মায়িদা: ৩৩]

যেহেতু কেউ ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া মানেই এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, সত্য জেনে সেটাকে ছুড়ে ফেলা, এ কারণে নিরীহ আর বিদ্রোহী মুরতাদের মাঝে পার্থক্য করা হবে না। কারণ, দরজা খুলে দিলে প্রত্যেকে নিজেকে নিরীহ দাবি করবে এবং গোপনে ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করবে। তাই সকল মুরতাদকে হত্যা করা হবে। কারণ, সে সত্যকে সত্য জানার পরেও প্রত্যাখ্যান করেছে, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, কুরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। ইসলামের চৌদ্দশ বছরের সকল আলিম ও ইমামগণকে মিথ্যুক, প্রতারক অপবাদ দিয়েছে। এই অপরাধে তাকে হত্যা করা হবে। এ কারণে আমরা দেখতে পাই, সাহাবাদের যুগে এমন একাধিক

মুরতাদকে হত্যা করা হয়েছে, যারা প্রকাশ্যে ইসলাম বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে দুশমনের সঙ্গে আঁতাঁত করেনি। তবে তারা যেহেতু ইসলাম অস্বীকার করেছে, জেনেবুঝে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাই তাদের উপর কোনো আস্থা রাখা যাবে না। তাওবা না করলে হত্যা করা হবে। নীরব থাকার যুক্তিতে ছেড়ে দেওয়া হবে না। যেমন আবু মুসা আশআরি রাজি.-এর কাছে এক ব্যক্তিকে বাঁধা অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'কী হয়েছে?' জানানো হয়, সে ইহুদি ছিল, এর পর মুসলমান হয়েছে, এর পর আবার ইহুদি হয়ে গেছে। তখন মুআজ বিন জাবাল রাজি. সেখানে উপস্থিত হন। তাকে বসতে বলা হলে তিনি বলেন, 'তাকে হত্যার আগে বসব না; আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের নির্দেশ। এর পর তাকে হত্যা করা হয়।[১] একইভাবে উমর রাজি.-এর যুগে এক ব্যক্তি খ্রিষ্টান হয়ে গেলে তাকে হত্যা করা হয়।[২] আমর ইবনুল আস উমর রাজি.-এর কাছে একবার চিঠি লিখেন, 'এক ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে গেছে।' উমর রাজি. জবাবে লিখেন, 'তাওবা করতে বলো। তাওবা করলে কবুল করো। নতুবা গর্দান উড়িয়ে দাও।'[৩] এসব বর্ণনায় দেখা যায়, রাষ্ট্র বা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কোনো শর্ত নেই; বরং মুরতাদ হওয়ার কারণেই তাদের হত্যা করা হয়েছে।

এভাবে মুরতাদের ব্যাপারে ইসলামের ইতিহাসে আমরা দুই ধরনের আমল তথা কর্মপদ্ধতি পাই: একটা হলো তাকে হত্যা করা, আরেকটা হলো শাসক কর্তৃক হত্যার পরিবর্তে ভিন্ন কোনো শাস্তি দেওয়া। ফলে মুরতাদ নিরীহ হোক কিংবা ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী হোক, উভয় অবস্থাতেই বিষয়টি দায়িত্বশীলদের হাতে সোপর্দ করা হবে। তারা তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মুরতাদকে কে শাস্তি দেবে? উম্মাহর সর্বসম্মত রায় অনুযায়ী, মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক (খলিফা) কিংবা তার পক্ষ থেকে নিযুক্ত দায়িত্বশীল, যেমন কাজি প্রমুখ, উক্ত শাস্তি কার্যকর করবে, অন্য কেউ নয়। এটা হানাফি মাজহাবেরও রায়।[৪] উমর রাজি. তার সকল গভর্নরের নিকট নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'আমি ছাড়া কাউকে যেন হত্যা করা না হয়।'[৫] ইবনে রজব লিখেন, 'ইমাম কিংবা তাদের দায়িত্বশীলদের কাজে নাক গলানো উচিত নয়। ফলে তাদের কাজ নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া যাবে না।

১. বুখারি (৬৯২৩, ৭১৫৭); মুসলিম (১৮২৪)।
২. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩৩৪০৮)।
৩. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩৩৪১৩)।
৪. বাদায়েউস সানায়ে, কাসানি (৭/৫৭)।
৫. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (২৮৪৮৯)।

তারা যদি নিজেদের দায়িত্ব পালনে গাফিলতি করে, সেজন্য তারা আল্লাহর কাছে দায়ী থাকবে।'[১]

মুসলিম সমাজের ব্যক্তিবিশেষের জন্য মুরতাদকে হত্যা করা সঠিক নয়। কারণ, এটা দায়িত্বশীলদের কর্তব্যে অনধিকার চর্চা। পাশাপাশি সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পথ। যে-কেউ নিজের প্রতিপক্ষকে হত্যা করে বলবে সে মুরতাদ ছিল। এভাবে ফিতনার দরজা উন্মুক্ত হবে। তা ছাড়া ইসলামে কেউ মুরতাদ হলেই হুট করে তাকে হত্যা করা হবে এমন নয়। বরং তাকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া, তাওবার সুযোগ দেওয়া-সহ অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করে সর্বশেষে আসবে হত্যার প্রসঙ্গ। বরং ইবরাহিম নাখয়ি রাহি. তো মনে করতেন, সবসময়ের জন্য তাকে তাওবা করতে বলা হবে। অর্থাৎ মুরতাদ হলে তাওবা করতে বলা হবে। তাওবা করলে ছেড়ে দেওয়া হবে। আবার মুরতাদ হলে আবার তাওবা করতে বলা হবে এমন। সুফিয়ান সাওরি রাহি. বলেন, 'এটা আমাদের মাজহাব।'[২] হানাফি মাজহাবেও বারবার তাওবার সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।[৩] ইমাম কারখি বলেন, 'আমাদের সকলের বক্তব্য হচ্ছে, সবসময় তাকে তাওবার সুযোগ দেওয়া হবে। হ্যাঁ, ইমাম আবু ইউসুফ থেকে বর্ণিত, যদি অনেকবার (مرارا) তাওবা করে ও তাওবা ভঙ্গ করে, তবে তাকে গুপ্তহত্যা করা হবে।'[৪] এখন যদি এগুলোর আগেই কেউ হুট করে তাকে হত্যা করে, তবে তার কাছে তাওবা চাওয়া হবে কখন? অথচ তাওবা চাওয়ার আগে তাকে হত্যা করা জমহুরের মত অনুযায়ী নিষিদ্ধ।[৫] তা ছাড়া কেউ মুরতাদ হওয়ার পরে যদি তাওবা করে ফেলে এবং আশেপাশের লোকজন জানে, কিন্তু হত্যাকারীর সেটা জানা না থাকে, তবে তো নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা হলো। এমন হলে উলটো তার মাথায় শরয়িভাবে হত্যার শাস্তি চাপবে। এ জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে এমন কাজ করার আগে শতবার ভাবতে হবে।

উপরন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে শাসক যদি মনে করেন নির্দিষ্ট কোনো মুরতাদ হত্যার উপযুক্ত নয়, বরং তাকে অন্য কোনো শাস্তি দেওয়া হবে, সেটাও দেওয়া যেতে পারে। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুরতাদ বেদুইনকে ছেড়ে

---

১. মাজমু' রাসায়িলি ইবনে রজব (২/৬০৮)।
২. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক (১৮৬৯৭)।
৩. আল-খারাজ, আবু ইউসুফ (১৯৭); কিফায়াতুল মুফতি (১/৫৭)।
৪. তাবয়িনুল হাকায়িক (৩/২৮৪); রদ্দুল মুহতার (৪/২২৫, ২৩১)।
৫. মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা, তহাবি (৩/৫০১); ইলাউস সুনান, উসমানি (১২/৫৯৯, ৬০২)।

দিয়েছেন।[১] উমর রাজি. তাদের জেলে ঢোকানোর কথা বলেছেন।[২] উমর ইবনে আবদুল আজিজ একদল মুরতাদের ব্যাপারে হত্যা না করে জিজইয়া বৃদ্ধি করে ছেড়ে দিতে বলেছেন ইত্যাদি।[৩] এগুলোর মাধ্যমে বোঝা যায়, মুরতাদের শাস্তি হদ নয়, বরং তাজির। কারণ, হদ হলে তাওবার মাধ্যমে হদ রহিত হয় না; অথচ মুরতাদের শাস্তি তাওবা করলে রহিত হয়। তা ছাড়া হদ নারী-পুরুষ সবার জন্য সমান; অথচ হানাফি মাজহাব ও সুফিয়ান সাওরির মতে নারী মুরতাদকে হত্যা করা হয় না।[৪] একারণে হানাফি মাজহাব অনুযায়ী মুরতাদের শাস্তি হদ নয়, বরং তাজির। ফলে মুসলমানদের শাসক (খলিফা) অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন। **অর্থাৎ সেক্ষেত্রে হত্যা থেকে শুরু করে উপরে কিংবা নিচের দিকে অন্যান্য শাস্তিও প্রযোজ্য হতে পারে,** ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাধারণ মানুষের জন্য যেগুলো নির্ণয় ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তাই এটা দায়িত্বশীলদের কাছে সোপর্দ করে দেওয়া অপরিহার্য। জফর আহমদ উসমানি রাহি. লিখেন, 'মুরতাদকে হত্যা করা শাসক কিংবা তার প্রতিনিধির কাজ, অন্য কেউ করবে না।'[৫]

কথা হলো, ফিতনা ও অধঃপতনের যুগে যেখানে মুরতাদকে শাস্তি দেওয়া দূরের কথা, তাদের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হয়, মুরতাদের অপকর্মকে বাক্-স্বাধীনতা আখ্যা দিয়ে সেগুলোকে সমর্থন করা হয়, সুরক্ষিত রাখা হয়, এমন অবস্থায় আমাদের কী করণীয়? আমাদের করণীয় হলো: সবর করা, সাধ্যমতো দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ করা, বিদ্যমান বেদনাদায়ক বাস্তবতা পরিবর্তনের চেষ্টা করা, শাসক গোষ্ঠীর উপর মুরতাদের শাস্তি বাস্তবায়নের জন্য চাপ সৃষ্টি করা, রিদ্দাহর বিরুদ্ধে ব্যাপক সামাজিক ও দ্বীনি আন্দোলন গড়ে তোলা, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত মুসলমানের সন্তানদের প্রতি লক্ষ রাখা, তাদের দ্বীন ও ঈমান সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং মুরতাদদের জ্ঞানগত লড়াইয়ে পরাজিত করা।

---

১. বুখারি (১৮৮৩); মুসলিম (১৩৮৩)।
২. সুনানে কুবরা, বাইহাকি (১৬৯৮৯); মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক (১৮৬৯৬); মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩৩৪০৬); আরও বিস্তারিত দেখুন: শরহে মাআনিল আসার (৫১০৫)।
৩. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক (১৮৭১৩, ১৮৭১৪)।
৪. আল-খারাজ, আবু ইউসুফ (১৯৭); তিরমিজি (১৪৫৮); রদ্দুল মুহতার (৪/২৪৫)।
৫. ইলাউস সুনান (১২/৬৪১)।

তথাপি প্রশ্ন আসে, যদি কোনো গাইরতসম্পন্ন মুসলিম কোনো মুরতাদকে হত্যা করে এবং প্রকৃতপক্ষেই নিহত ব্যক্তি মুরতাদ প্রমাণিত হয়, তখন কী হবে? আলিমদের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে না। কারণ, ইসলামের দৃষ্টিতে মুরতাদের রক্ত মূল্যহীন।[১] ফলে তাকে হত্যা করা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না। হ্যাঁ, মুসলিম দায়িত্বশীল চাইলে তাজির (অন্যান্য শাস্তি) দিতে পারেন, কিন্তু তাকে হত্যার বদলে হত্যা করার সুযোগ নেই। ইমাম তহাবি লিখেন, 'আমাদের উলামায়ে কেরামের মতে, মুরতাদকে তাওবার সুযোগ দেওয়া হবে। সুতরাং কেউ যদি তাওবার আগেই হত্যা করে ফেলে, তবে তার কাজটি ঠিক হলো না; কিন্তু তার উপর কোনো শাস্তি আসবে না।'[২]

তবে আমরা পিছনে যেমন বলেছি, উত্তম হলো কারও ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ-জাতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করা। কারণ, তার যেকোনো শুবাহ-সংশয় থাকতে পারে, কিংবা সে যেকোনো সময় তাওবা করে ফেলতে পারে, যা হত্যাকারীর অজানা থাকতে পারে, কিংবা কেউ অন্যায় সুযোগ নিতে পারে। ফলে প্রতিপক্ষকে মুরতাদ আখ্যা দিয়ে হত্যা করা শুরু হলে বিশৃঙ্খলা বাড়বে। তাই শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য শাসক চাইলে শাস্তি দিতে পারে। এ কারণে ইবনে মুফলিহ লিখেন, 'যদি কেউ মুরতাদকে হত্যা করে ফেলে, তবে তাতে হত্যাকারীকে হত্যা করা যাবে না। হ্যাঁ, হাতে আইন তুলে নেওয়ার অপরাধে শাস্তি দেওয়া হবে।'[৩]

শাতিমে রাসুলের বিধান: শাতিম অর্থ গালিগালাজকারী। সে হিসেবে শাতিমে রাসুল শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালিগালাজকারী, রাসুলের সমালোচক, অপবাদদাতা ইত্যাদি। কোনো মুসলমান আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিলে উম্মাহর সর্বসম্মত মত অনুযায়ী মুরতাদ হয়ে যাবে। ফলে এটা মূলত আগের মাসআলাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু দুটি কারণে এটাকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়: **এক.** মুরতাদ কেবল মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অর্থাৎ কাফের তো মুরতাদ হয় না। বিপরীতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালিদাতা এক্স-মুসলিম মুরতাদও হতে পারে, আবার প্রকৃত কাফের তথা খ্রিষ্টান, হিন্দু কিংবা অন্য কোনো বিধর্মীও হতে পারে। **দুই.** রিদ্দাহর চেয়ে

---

১. বুখারি (৬৮৭৮); মুসলিম (১৬৭৬)।
২. মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা, তহাবি (৩/৫০১)।
৩. আল-ফুরু', ইবনে মুফলিহ (৯/৩৬৮)।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেওয়ার অধিকতর ভয়াবহতা এবং এর শাস্তির প্রচণ্ডতা। কারণ, রিদ্দাহ (মুরতাদ হওয়া) কেবল ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিপরীতে রাসুলকে গালিগালাজ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কোনো কাফের মুসলিম না হলে তার কোনো শাস্তি নেই। কিন্তু কোনো কাফের রাসুলকে গালি দেবে সেটা সহ্য করা হবে না। আবার কোনো মুসলিম মুরতাদ হয়ে গেলে মুসলিম শাসক তার প্রাপ্য ফয়সালা দেবেন। কারণ, এখানে সে নিজে কুফরি করেছে, অন্যের হক সম্পৃক্ত নয়। বিপরীতে রাসুলুল্লাহকে গালিগালাজ একদিকে কুফরি, অন্যদিকে সরাসরি অন্যের হকের সঙ্গে সম্পৃক্ত—পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও নিষ্পাপ মানুষটির মানহানি ও তাকে কষ্ট দেওয়া। ফলে বিষয়টি মুরতাদ হওয়ার চেয়েও অনেক বেশি জঘন্য। কারণ, এখানে অপরাধ দুটো—কুফর ও রাসুলকে কষ্টদান। তাই যদি কোনো ব্যক্তি রাসুলুল্লাহকে গালি দেয়, তবে সর্বাবস্থায় তাকে হত্যা করা হবে, চাই মজা করে দিক কিংবা বাস্তবে, প্রকাশ্যে দিক কিংবা গোপনে, হালাল মনে করে দিক কিংবা হারাম মনে করে; রাসুলের আনীত দ্বীন ও বিধান বিশ্বাস করেও কেউ তাকে গালি দিলে সে কাফের হয়ে যাবে।[১]

মুসলমানদের সকল আলিমের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাতিমে রাসুলের সাধারণ শাস্তি হলো হত্যা।[২] একাধিক হাদিস দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত। যেমন:

এক. একটি হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কাব বিন আশরাফের ব্যাপারটা কে দেখবে? কারণ, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে কষ্ট দিয়েছে।' তখন সাহাবি মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কি চান আমি তাকে হত্যা করি? রাসুল বললেন, 'হ্যাঁ।' তারা ইহুদি কাবকে হত্যা করে ফেলেন।[৩] এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, রাসুলকে গালিদাতা মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম হোক, তাকে হত্যা করা হবে। তবে হানাফি মাজহাব অনুযায়ী জিম্মি (তথা মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) হলে হত্যা করা হবে না।

---

১. তাফসিরে কুরতুবি (৮/৮২); আসসারিমুল মাসলুল, ইবনে তাইমিয়া (৫১২); আস সাইফুল মাসলুল, সুবকি (১৩১)।
২. আল-খারাজ, আবু ইউসুফ (১৯৯); শিফা, কাজি ইয়াজ (২/২১৫); আস-সাইফুল মাসলুল, সুবকি (১১৯-১২১)।
৩. বুখারি (৩০৩১); মুসলিম (১৮০১)।

দুই. আলি রাজি. থেকে বর্ণিত, 'এক ইহুদি নারী আল্লাহর রাসুলকে গালি দিত এবং তাঁর সমালোচনা করত। তখন এক ব্যক্তি তার শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই নারীর রক্তকে বাতিল বলে ঘোষণা করেন।'[১] উক্ত বর্ণনাটি অন্ধের হাদিস নামেও প্রসিদ্ধ, যেখানে বলা হয়েছে—একজন অন্ধ সাহাবির একটি দাসী ছিল। সে আল্লাহর রাসুলকে গালিগালাজ করত। না করার পরেও ফিরত না। তখন অন্ধ সাহাবি তাকে হত্যা করে ফেলেন। রাসুলুল্লাহকে বলার পরে তিনি সেই নারীর রক্ত বাতিল ঘোষণা করেন।[২] ইবনে সাদ তার তাবাকাতে অন্ধ সাহাবিকে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাজি. বলে সাব্যস্ত করেন এবং পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন।[৩]

তিন. মক্কায় ইবনে খাতালের দুজন দাসী ছিল। তারা আল্লাহ-রাসুলের সমালোচনা করে গান গাইত। মক্কা বিজয়ের পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের হত্যার নির্দেশ দেন; অথচ সে সময়ে মক্কায় অসংখ্য কাফের ছিল যারা বছরের পর বছর আল্লাহর রাসুলের বিরোধিতা করেছে, তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিরাপত্তা দেন। বিপরীতে এই দুই নারীকে, যারা তাঁর ব্যক্তিগত সম্মানে আঘাত হেনেছিল, হত্যার নির্দেশ দেন।[৪]

চার. আবু বকর, উমর, ইবনে আব্বাস, উমর ইবনে আবদুল আজিজ—সবার মত হচ্ছে শাতিমে রাসুলকে হত্যা করা।[৫]

শাতিমের শাস্তি কে বাস্তবায়ন করবে? মুরতাদের মতো শাতিমের শাস্তিও খলিফা ও মুসলিম শাসক কিংবা তাদের পক্ষ থেকে নিযুক্ত দায়িত্বশীলগণ বাস্তবায়ন করবেন। সাধারণ মানুষের আইন হাতে তুলে নেওয়া নিষিদ্ধ। তবে কোনো সাধারণ মুসলিম যদি তাকে হত্যা করে ফেলে, তার বিধান মুরতাদ হত্যার মতোই, যা পিছনে উল্লেখ করা হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের মত বিবেচনা করলে এক্ষেত্রে তার কোনো অপরাধই

---

১. আবু দাউদ (৪৩৬২); সুনানে বাইহাকি কুবরা (১৩৫০৬)।
২. আবু দাউদ (৪৩৬১), সুনানে বাইহাকি কুবরা (১৩৫০৬), উল্লেখ্য, কেউ কেউ উক্ত নারীকে গর্ভবতী মনে করেন এবং তাদের ধারণা গর্ভবতী শিশু-সহ নারীকে হত্যা করা যাবে। এটা ভুল ধারণা। নারীটি গর্ভবতী ছিল এমন কোনো বর্ণনা নেই। যারা এটা বলেন, তারা হাদিসের অর্থ ভুল বোঝেন। তা ছাড়া ইসলামে একজনের দোষে আরেকজনকে হত্যা করা বৈধ নয়।
৩. তাবাকাতে ইবনে সাদ (৪/১৫৮)।
৪. আস-সারিমুল মাসলুল, ইবনে তাইমিয়া (১২৮)।
৫. আস-সাইফুল মাসলুল, সুবকি (১২৩-১২৪)।

নেই। কারণ, তাদের মতে শাতিম তাওবা করুক বা না করুক, তাকে হত্যা করা হবে। ফলে তাকে যে-কেউ হত্যা করে ফেলতে পারে। আর হানাফিদের মতেও তাওবার আগে কেউ হত্যা করে ফেললে সেটা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে না। হ্যাঁ, আইন হাতে তুলে নেওয়ার অপরাধে শাসক চাইলে তাকে তাজির (সাধারণ শাস্তি) দিতে পারে। তাই পিছনে যেমন বলা হয়েছে, সাধারণ মুসলিমদের এমন কর্ম থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকাই উত্তম। কারণ, এগুলোর সঙ্গে অনেকগুলো হক ও শর্ত জড়িত থাকে, যেগুলো সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহকিক করা অসম্ভব।

শাতিমকে তাওবার সুযোগ দেওয়া হবে? মালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বলি মাজহাবের গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী, তাকে তাওবার সুযোগ দেওয়া হবে না। বরং তার আগেই হত্যা করা বৈধ। সুতরাং তাওবার আগে হত্যা করা হলে কাফের অবস্থায় হত্যা করা হবে। তার উপর জানাজা পড়া হবে না। তার জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করা হবে না। মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে না। আর যদি কেউ নিষ্ঠার সঙ্গে প্রকৃত অর্থেই তাওবা করে, লজ্জিত হয় এবং ভুল স্বীকার করে, তা হলে তার তাওবা কবুল করা হবে, কিন্তু তার হত্যা রহিত হবে না। কারণ, রাসুলুল্লাহকে গালি দেওয়ার সঙ্গে দুটি বিষয় জড়িত: **এক**. শরয়ি বিষয়। তাওবা করলে সেটা ক্ষমা হয়ে যাবে। **দুই**. রাসুলের ব্যক্তিগত অধিকার, যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না; বরং রাসুলের ক্ষমার উপর নির্ভরশীল। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করবেন কি না সেটা অজ্ঞাত। ফলে তাওবা কবুল করা হলেও মৃত্যুদণ্ড ক্ষমা করা হবে না; বরং তাওবা কবুল করা হবে পাশাপাশি তাকে হত্যা করা হবে। পার্থক্য এটুকু যে, হত্যার পরে তাকে মুসলমানদের মতোই জানাজা ও দাফন করা হবে।[১] ইমাম মালেক বলেন, 'কেউ আল্লাহর রাসুলকে গালি দিলে—সে মুসলিম হোক কিংবা কাফের হোক—তাকে তাওবার সুযোগ দেওয়া হবে না।'[২]

হানাফি মাজহাব অনুযায়ীও কোনো মুসলিম রাসুলুল্লাহকে গালি দিলে কাফের হয়ে যাবে। তবে তাকে হত্যা করার বিষয়টি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কারণ, হানাফি মাজহাব অনুযায়ী তাকে তাওবার সুযোগ দেওয়া হবে। ইমাম শাফেয়িরও একটি মত এমন। সুতরাং যদি তাওবা করে ফেলে, তবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আর তাওবা না

১. শিফা, কাজি ইয়াজ (২/২১৬); ফাতহুল বারি (১২/২৮১) মাজমু' ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলি ইবনে উসাইমিন (২/১৫১)।
২. সিয়ারু আলামিন নুবালা, জাহাবি (৭/১৮২)।

করলে হত্যা করা হবে।[১] ইমাম আবু ইউসুফ রাহি.-এর বক্তব্য অনুযায়ী শাতিমের বিধান মুরতাদের মতোই, অর্থাৎ তাকে তাওবার সুযোগ দেওয়া হবে। যদি তাওবা না করে, তবে হত্যা করা হবে। আর যদি তাওবা করে, তবে সে গুনাহ এবং হত্যা দুটোর হাত থেকেই বেঁচে যাবে।[২] ইমাম তহাবিও উক্ত মত পোষণ করেন। তার মতে, কোনো মুসলিম রাসুলকে গালি দিলে মুরতাদ হয়ে যাবে (ফলে তার বিধান মুরতাদের বিধানের মতোই)।[৩] কোনো কোনো হানাফি আলিমের মত জমহুরের মতের মতো। মোল্লা খসরু লিখেন, তাকে তাওবার সুযোগ না দিয়েই হত্যা করা হবে। কারণ, তাদের মতে তখন তাকে হত্যা করা হবে 'হদ' হিসেবে। আর হদ তাওবা কিংবা শাসকের ইচ্ছায় বাতিল করা যায় না। ফলে সে যদি ধরা পড়ার আগেও তাওবা করে নিজে আত্মসমর্পণ করে, তবুও তাকে হত্যা করা হবে। কিন্তু আল্লাহকে গালি দিয়ে তাওবা করলে তাওবা গ্রহণ করা হবে।[৪] হাসকাফি লিখেন, রাসুলকে গালি দিলে কাফের হয়ে যাবে এবং তাকে হদ হিসেবে হত্যা করা হবে। তার তাওবা কবুল করা হবে না। তবে আল্লাহকে গালি দিলে তাওবা কবুল করা হবে। কেননা আল্লাহর হক তিনি ক্ষমা করেন। কিন্তু রাসুলকে গালি দেওয়া বান্দার হক, যা তিনি ক্ষমা করেন না।[৫] কাশ্মীরিও মতভেদ উল্লেখ করে লিখেছেন, 'তার তাওবা একেবারেই কবুল করা হবে না।[৬] কিন্তু হানাফি মাজহাবের নির্ভরযোগ্য মতামত হলো প্রথমটি, অর্থাৎ মুরতাদের মতো শাতিমেরও তাওবা কবুল করা হবে। ইবনে আবিদিন এটাকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। আর বাজ্জাজি, মোল্লা খসরু-সহ যারা হাম্বলি ও মালেকিদের মতো মতামত দিয়েছেন, তাদের ভুল সাব্যস্ত করেছেন।[৭]

অধমের মত: এখানে সকলের মত যুক্তিযুক্ত হলেও হানাফি মাজহাবের মতটিই সুন্দর ও অগ্রগণ্য। কারণ, তাতে দ্বীন ও দুনিয়া, শরিয়ত ও ইনসানিয়্যাত দুটোর প্রতিই খেয়াল রাখা হয়েছে। আমরা যদি কুরআনের আয়াতগুলো খেয়াল করি, তবে দেখতে পাব, সেখানে তাওবার আয়াতগুলো মানবজীবনের সকল দিক অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ,

---

১. রদ্দুল মুহতার (৪/২৩৩)। ইলাউস সুনান (১২/৬৪২-৬৪৩)।
২. আল-খারাজ, আবু ইউসুফ (১৯৯)।
৩. শরহে মুখতাসারুত তহাবি, জাসসাস (৬/১৪১)।
৪. দুরারুল হুককাম, মোল্লা খসরু (১/২৯৯-৩০০)।
৫. রদ্দুল মুহতার (৪/২৩২)।
৬. ইকফারুল মুলহিদিন (বাশায়ের) (৯৩)।
৭. রদ্দুল মুহতার (৪/২৩৩-২৩৫)।

মানুষমাত্রই ভুল করে। ফলে মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি তাঁর তাওবার চাদরও সদা বিস্তৃত করে রেখেছেন। আল্লাহ বলেন,

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

অর্থ: 'হে আমার বান্দাগণ, তোমরা যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করেন। তিনি মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' [জুমার: ৫৩] অন্য আয়াতে বলেন,

اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ۚ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

অর্থ: 'কিন্তু যারা তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা বদলে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' [ফুরকান: ৭০] আরেক জায়গায় বলেন,

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ اَصْلَحُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ: 'অতঃপর যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে, এরপর তাওবা করে এবং (নিজেদের) সংশোধন করে নেয়, আপনার পালনকর্তা এসবের পরে তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু।' [নাহল: ১১৯] উক্ত আয়াতগুলো তাওবার ক্ষেত্রে ব্যাপক, অর্থাৎ যত বেশি ও যত বড় গুনাহ করুক, কেউ যখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, তখন আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন।

তাছাড়া হাদিসে এসেছে, ইসলাম পূর্বের সবকিছু মিটিয়ে দেয়।[১] সুতরাং কোনো ব্যক্তি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলকে গালি দিলেও সে যখন তাওবা করবে তখন নও মুসলিম গণ্য হবে এবং তার অতীতের সমস্ত অপরাধ মুছে যাবে। ফলে তাকে হত্যা না করাই উচিত।

---

১. মুসলিম (১২১); সহিহ ইবনে খুজাইমা (২৫২৫)।

প্রথম দল এক্ষেত্রে যুক্তি দেন, আল্লাহকে গালি দিয়ে তাওবা করলে হত্যা করা হবে না। কারণ, আল্লাহ নিজের সকল হক ক্ষমা করে দিতে পারেন। তিনি চিরঞ্জীব। অপরদিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিলে সেটা তাঁর হক; আর তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। সুতরাং তাওবা করলেও মৃত্যুর হাত থেকে সে বাঁচতে পারবে না। এমন যুক্তি দুর্বল। কারণ, আল্লাহকে গালি দেওয়া নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসুলকে গালি দেওয়ার চেয়েও জঘন্য। আল্লাহকে গালি দিয়ে যখন ক্ষমা পাওয়া যায়, নিহত হতে হয় না, তা হলে রাসুলুল্লাহকে গালি দেওয়ার পরে তাওবা করলে কেন হত্যা করা হবে? তাদের কথা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত নেই, তাই তাঁর হক ক্ষমা করা সম্ভব নয়। এমন যুক্তি শক্তিশালী নয়। কারণ, বান্দার হক যদিও বান্দার ক্ষমার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু কেউ যদি একনিষ্ঠভাবে তাওবা করে, নেক আমল করে এবং সেই ব্যক্তির জন্য দোয়া-খাইরাত করে, তবে আল্লাহ চাইলে সেগুলো ক্ষমা করে দিতে পারেন।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরুন এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে জুলুম করল বা কষ্ট দিলো। অতঃপর মাজলুম ব্যক্তি মারা গেল। এখন যদি জালেম ব্যক্তি তাওবা করে, তবে তার অধিকার কীভাবে ফিরিয়ে দেবে? কারণ, মাজলুম তো মারা গেছে এবং তার কোনো উত্তরাধিকারীও নেই। এক্ষেত্রে সকল আলিমের সর্বসম্মত মত হলো, বেশি বেশি তাওবা ও ইস্তিগফার করবে, মৃতের জন্য দোয়া করবে, তার পক্ষ থেকে সদকা করবে। তা হলে আশা করা যায় কিয়ামতের দিন মাজলুম ব্যক্তি জালেমকে ক্ষমা করে দেবে। বিশেষত সে নিজে যখন ক্ষমা পেয়ে যাবে। সাধারণ মুসলিমদের বেলায় যদি এটা হয়, রাসুলুল্লাহর বেলায় কেন হবে না? কেউ ভুল করে আল্লাহর রাসুলকে গালি দিলে সেটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ; কিন্তু সে যখন তাওবা করে ফেলল, তখন তাকে হত্যা করে কার লাভ? বরং সেও তো কোনো পুণ্যের সুযোগ পেল না; অথচ তাকে বাঁচিয়ে রাখা হলে সে হয়তো সারা জীবন আল্লাহর রাসুলের উপর সালাত-সালাম পাঠ করে কাটিয়ে দিত, তাঁর সুন্নাহ জিন্দা করার পিছনে জীবন ওয়াকফ করে দিত। আর এভাবে হয়তো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দিন তাকে ক্ষমা করে দিতেন।

وَلاَ نَرَى الـخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلاَةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا، وَلاَ نَدْعُو عَلَيْهِمْ، وَلاَ نَنْـزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ، وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ، وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلاَحِ وَالـمُعَافَاةِ.

আমাদের শাসক ও নেতৃবৃন্দ জালেম হলেও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ মনে করি না। তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করি না। তাদের আনুগত্য লঙ্ঘন করি না। গুনাহের নির্দেশ দেওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের আনুগত্য মূলত আল্লাহর আনুগত্য হিসেবে অনিবার্য (ফরজ) মনে করি। আমরা তাদের শুদ্ধি ও সংশোধনের জন্য দোয়া করি।

ব্যাখ্যা

শাসক-সম্পর্কিত আকিদা

শাসকের প্রতি কর্তব্য ও তাদের আনুগত্যের সীমারেখা: কুরআন-সুন্নাহে শাসকের আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ

অর্থ: 'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আল্লাহর রাসুলের আনুগত্য করো, আর তোমাদের দায়িত্বপ্রাপ্তদের।' [নিসা: ৫৯] কিন্তু তাদের আনুগত্য শর্তহীন নয়। ফলে কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতির আলোকে আনুগত্য করতে হবে। এর মাঝে সবচেয়ে বড় মূলনীতি হচ্ছে—যেমনটা ইমাম তহাবি উপরে উল্লেখ করেছেন—**'গুনাহের নির্দেশ দেওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের আনুগত্য মূলত আল্লাহর আনুগত্য হিসেবে অনিবার্য (ফরজ) মনে করি।'** ফলে আল্লাহ ও দ্বীনের অবাধ্য হয়ে, হালাল-হারামের পরোয়া না করে, আখিরাত জলাঞ্জলি দিয়ে শাসকের আনুগত্য করা যাবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'পছন্দ হোক অপছন্দ হোক,

সর্বাবস্থায় মুসলমানের কর্তব্য হলো (দায়িত্বশীলদের) কথা শোনা ও তাদের আনুগত্য করা, যতক্ষণ না কোনো গুনাহের নির্দেশ দেওয়া হয়। যদি গুনাহের নির্দেশ দেওয়া হয়, তা হলে কোনো আনুগত্য নেই।'[১] সুতরাং শাসক যখন প্রকৃত মুসলিম হবে, শরিয়াহ বাস্তবায়নকারী হবে, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শাসন করবে, ইনসাফের ঝান্ডা বুলন্দ রাখবে, মানুষের জন্য কল্যাণকামী হবে, তখন আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল মুসলিমের উপর এমন শাসকের আনুগত্য ওয়াজিব। কারণ, তখন তার আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্য হিসেবে বিবেচিত হবে। এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের কারও কোনো দ্বিমত নেই। একইভাবে মুসলিম শাসক যদি সুস্পষ্ট কুফরে লিপ্ত হয়—কিছু শর্তসাপেক্ষে যেগুলো সামনে আসবে—তার বিরুদ্ধে সকল মুসলমানদের সাধ্যমতো বিদ্রোহ করা এবং তাকে অপসারণ জরুরি। এ ব্যাপারেও মুসলমানদের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই।

জালিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নিষিদ্ধ: কিন্তু শাসক যদি জালেম হয়? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনও তাদের আনুগত্য করতে বলেছেন এবং বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেছে। বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে জানতেন ভবিষ্যতে এমনই হবে। ফলে তিনি আগে থেকেই মুসলানদের জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেন। একাধিক হাদিস দেখে মনে হবে, তিনি সাহাবায়ে কেরামকে জুলুম সহ্য ও সবরের জন্য একরকম মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে বলেন। এটা ধর্ম হিসেবে ইসলামের উপযোগিতা ও ভারসাম্যের প্রমাণ। জগৎ ও জীবনের প্রতি বাস্তবোচিত দৃষ্টিভঙ্গি। কারণ, দমন-পীড়ন, জুলুম-নিষ্পেষণ, সাধারণের অধিকার হরণ, স্বেচ্ছাচারিতা ও রাজনৈতিক স্বার্থপরতা ইত্যাদি প্রাচীন কাল থেকেই শাসন ও শাসকের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আল্লাহর রাসুল ও খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়টা হবে ব্যতিক্রম। তারা চলে যাবার পরে শাসন ব্যবস্থা আবার ঘুরে যাবে। সময় যত গড়াবে অত্যাচার ও অত্যাচারীর সংখ্যা বাড়বে। ফলে তরবারিকেই যদি অত্যাচার প্রতিহতের একমাত্র সমাধান মনে করা হয়, তবে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। পৃথিবী মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে। এ কারণে যথাসম্ভব সবর করা, ব্যক্তি ও দলগত পর্যায়ে অত্যাচার সহ্য করে গোটা উম্মাহ ও মানুষকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা শ্রেয়।

---

১. বুখারি (৭১৪৪)। আবু দাউদ (২৬২৬); তিরমিজি (১৭০৭)।

■ আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'শীঘ্রই তোমাদের মাঝে এমন আমির নিয়োগ দেওয়া হবে, যাদের তোমরা চিনবে এবং যাদের চিনবে না। যে ব্যক্তি (তাদের কৃতকর্ম) অপছন্দ করবে, সে দায়মুক্ত থাকবে। আর যে প্রতিবাদ করবে, সে (আল্লাহর অসন্তোষ থেকে) নিরাপদে থাকবে। আর যে সন্তুষ্ট হবে এবং অনুসরণ করবে সে (ধ্বংস হয়ে যাবে)।' সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, **'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন, 'না। 'যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নামাজ কায়েম করে।'**[1]

■ আরেকটি হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের সর্বোত্তম শাসক হচ্ছে তারা, যাদের তোমরা ভালোবাসো, তারাও তোমাদের ভালোবাসে; যাদের জন্য তোমরা দোয়া করো, তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করে। আর তোমাদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট শাসক হচ্ছে যাদের তোমরা অপছন্দ করো, তারাও তোমাদের অপছন্দ করে। যাদের তোমরা অভিশাপ দাও, তারাও তোমাদের অভিশাপ দেয়। সাহাবাগণ বললেন, **হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব না? তখন তিনি বললেন, 'না। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মাঝে নামাজ কায়েম করে। আর তোমরা যদি শাসকের মাঝে আল্লাহর অবাধ্য কোনোকিছু দেখো, তবে তার কাজ ঘৃণা করো। কিন্তু আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করো না।'**[2]

■ সহিহাইনে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি শাসকের মাঝে অপছন্দনীয় কিছু দেখে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কারণ, যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করল, সে যেন জাহিলি মৃত্যুবরণ করল।'[3]

■ হুজাইফা ইবনুল ইয়ামানের সূত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার পরে এমন শাসকরা আসবে যারা আমার বাতলে দেওয়া সুপথ গ্রহণ করবে না, আমার সুন্নাহর অনুসরণ করবে না। তাদের মাঝে এমন সব ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, যারা দেখতে মানুষের মতো হবে, কিন্তু তাদের হৃদয় হবে শয়তানের মতো' (অর্থাৎ মানবরূপী শয়তান)। হুজাইফা বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি তখন থাকলে কী করব? তিনি বললেন, 'শাসকের কথা শুনবে, **আনুগত্য করবে।**

---

১. মুসলিম (১৮৫৪); আবু দাউদ (৪৭৬০); তিরিমিজি (২২৬৫)।
২. মুসলিম (১৮৫৫); তিরমিজি (২২৬৪); ইবনে হিব্বান (৪৫৮৯)।
৩. বুখারি (৭০৫৪, ৭১৪৩); মুসলিম (১৮৪৯)।

যদি সে তোমার পিঠের চামড়া উঠিয়ে ফেলে, তোমার ধন-সম্পদ কেড়ে নেয়, তবুও তার কথা শুনবে, মানবে।'[১]

- সালামা ইবনে ইয়াজিদ বলেন, হে আল্লাহর নবি, আমাদের মাঝে যদি এমন শাসক আসে, যারা আমাদের থেকে তাদের হক ঠিকই বুঝে নেয়, কিন্তু আমাদের হক থেকে বঞ্চিত করে, তা হলে এ ব্যাপারে আপনি কী নির্দেশ দেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো জবাব দিলেন না। তিনি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করেন। রাসুলুল্লাহ তখনও চুপ থাকেন। তখন সাহাবি আশআস ইবনে কায়স তাকে টান দিয়ে বলেন (অন্য বর্ণনায় স্বয়ং রাসুলুল্লাহ বলেন), 'তাদের কথা শুনবে ও আনুগত্য করবে। কেননা তাদের হিসাব তাদের দিতে হবে। তোমাদের হিসাব তোমাদের দিতে হবে।'[২]

শাসকের সঙ্গে সালাফের কর্মপদ্ধতি: মূলত এসব নসের কারণেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সালাফ সবরের পথ অবলম্বন করেছেন। ফলে শাসক যদি জালেম ও পাপী হয়, মুসলমানদের উপর অত্যাচারী ও তাদের হক বিনষ্টকারী হয়, তবু তারা নীরব থাকাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। হ্যাঁ, কুফরের পর্যায়ে পৌঁছে গেলে তখন সর্বসম্মতিক্রমে বিদ্রোহ বৈধ হবে। কিন্তু জুলুম যতই হোক, বিদ্রোহকে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠজন বৈধ বলেননি। এখানে প্রথমে আমরা ইমামদের কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করব, এরপর এ ব্যাপারে পর্যালোচনা তুলে ধরব।

- ইমাম আবুল হাসান আশআরি লিখেন, 'আহলে সুন্নাতের আকিদা হলো, শাসকের কল্যাণের জন্য দোয়া করা, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করা, ফিতনার সময় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা।'[৩]

- বাকিল্লানি লিখেন, 'সংখ্যাগরিষ্ঠ আহলে সুন্নাত এবং মুহাদ্দিসের মতে, জুলুমের কারণে শাসককে পদচ্যুত করা কিংবা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ নয়; বরং তাকে নসিহত করা এবং অন্যায় কাজে তার আনুগত্য বর্জন করা ওয়াজিব।'[৪]

- ইমাম তহাবিও জালেমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বৈধ মনে করতেন না, যা তার উপরের বক্তব্যে সুস্পষ্ট: **'আমাদের শাসক ও নেতৃবৃন্দ জালেম হলেও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ মনে করি না। তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করি না। তাদের আনুগত্য**

---

১. মুসলিম (১৮৪৭); সুনানে কুবরা, বাইহাকি (১৬৭১৪)।
২. মুসলিম (১৮৪৬); তিরমিজি (২১৯৯)।
৩. মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন, আশআরি (২৯৫)।
৪. তামহিদ, বাকিল্লানি (৪৭৮)।

লঙ্ঘন করি না। গুনাহের নির্দেশ দেওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের আনুগত্য মূলত আল্লাহর আনুগত্য হিসেবে অনিবার্য (ফরজ) মনে করি। আমরা তাদের শুদ্ধি এবং সংশোধনের জন্য দোয়া করি।'

- ইমাম আবুল ইউসর বাজদাবি বলেন, 'শাসক ফাসেক হলে তার জন্য তাওবার দোয়া করা ওয়াজিব। **বিদ্রোহ বৈধ নয়। এটা ইমাম আবু হানিফার মাজহাব।** কারণ, শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে ফিতনা ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীতে ফ্যাসাদ তৈরি হয়।'[১]

- ইমাম নববি লিখেন, 'ফিসক ও জুলুমের কারণে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হারাম। এ ব্যাপারে একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আর এ কারণে ফুকাহা, মুহাদ্দিসিন, মুতাকাল্লিমিন এক কথায় সকল আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত মত হলো, ফিসক, জুলুম ও অপরাধের কারণে শাসককে অপসারণ করা যাবে না, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েজ হবে না। হাজ্জাজ-সহ অন্যান্য জালিমের উপর তাবেয়িদের বিদ্রোহ কেবল জুলুমের কারণে ছিল না; বরং তারা আল্লাহর শরিয়তকে পরিবর্তন করে ফেলেছিল, এ জন্য তারা বিদ্রোহ করেছেন। আমাদের কিছু আলিম থেকে এটা বৈধ প্রমাণিত আছে, কিন্তু সেটা ইজমার বিপরীত। তাই জালেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সর্বসম্মতভাবে নিষিদ্ধ প্রমাণিত হলো।'[২] অর্থাৎ নববির কাছে এটা ইজমা।

- ইবনে হাজার আসকালানি ইবনে বাত্তালের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন, 'এর মাধ্যমে জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা প্রমাণিত হয়। সকল ফকিহ জবরদখলকারী শাসকের আনুগত্য ও তার সঙ্গে জিহাদ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একমত। এমন শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেয়ে তার আনুগত্য করাই উত্তম। কারণ, তাতে মুসলমানদের রক্তপাত রক্ষা করা যায়।'[৩]

- শামসুদ্দিন রমলিও জালেম শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করাকে আহলে সুন্নাতের ইজমা বলেছেন। কারণ তাতে উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশি।[৪]

- আকহাসারি লিখেন, 'শাসকের বিরুদ্ধে জুলুমের কারণে বিদ্রোহ করা যাবে না। কারণ, জুলুমের ভিতরে যত ক্ষতি, বিদ্রোহের ক্ষতি তারচেয়ে অনেক বেশি। এ

---

১. উসুলুদ্দিন, বাজদাবি (১৯৮)।
২. শরহে মুসলিম, নববি (১২/২২৯)।
৩. ফাতহুল বারি, ইবনে হাজার (১৩/৭)।
৪. গায়াতুল বায়ান, রমলি (১৫)।

কারণে সবর করতে হবে। মনে করতে হবে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের কর্মফলে তাকে আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। জনগণ যদি শাসকের জুলুম থেকে রক্ষা পেতে চায়, আগে নিজেদের মাঝে জুলুম পরিত্যাগ করতে হবে।'[১]

- ফলে বড় বড় সাহাবা ও তাবেয়িদের দেখি জুলুমের সময় শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করতে। যেমন: আবদুল্লাহ ইবনে উমর, সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব, আলি ইবনুল হুসাইন হাররার ঘটনার সময় ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বারণ করেন। আবার যখন হুসাইন রাজি. কুফার দিকে অগ্রসর হন, তখন ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাসের মতো সাহাবাগণ তাকে বারণ করেন। তাদের আশঙ্কা ছিল তিনি শাহাদাত বরণ করবেন। একইভাবে ইবনে আশআসের বিদ্রোহের সময় হাসান বসরি, মুজাহিদ প্রমুখ তার সঙ্গে যোগদান করতে নিষেধ করেন। শাবি বলতেন, এ এক এমন ফিতনা যাতে আমরা ডানে-বামে কোনো দলেই নই। হাজ্জাজের ব্যাপারে হাসান বসরি বলতেন, হাজ্জাজ আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আজাব। ফলে সেটাকে তোমাদের হাত দ্বারা ঠেলতে যেয়ো না; বরং তোমরা আল্লাহর কাছে এটাকে সরিয়ে নেওয়ার দোয়া করো। তলক ইবনে হাবিব বলতেন, ফিতনাকে তাকওয়া দ্বারা মোকাবিলা করো।[২]

- ইবনে কাসির লিখেন, হুসাইন রাজি. যখন কুফার দিকে বের হচ্ছিলেন, তখন তার পছন্দের ও জ্ঞানী মানুষজন সবাই তাকে যেতে না করেন। ইবনে আব্বাস রাজি. তাকে অনেকভাবে বোঝান, কিন্তু তিনি যাওয়াকেই অগ্রাধিকার দেন।[৩]

সংশয়ের অপনোদন: উপরের হাদিসগুলো এবং সালাফের বক্তব্য থেকে কী বোঝা যায়? একদল আলিম বুঝেছেন, সালাফ সর্বসম্মতিক্রমে জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে সুস্পষ্ট হারাম, অবৈধ ও বিশৃঙ্খলা মনে করতেন। ফলে শাসক যত বড় জালেমই হোক, যত অত্যাচার করুক, যত অন্যায় ও অনাচার করুক, সুস্পষ্ট কুফর পাওয়া যাওয়ার আগ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। এক্ষেত্রে তারা এতটাই অতিরঞ্জিত করেন যে, আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের মতো কুরআন-সুন্নাহর অমোঘ নীতিও তথাকথিত শান্তিনীতির কাছে লঘু ও গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। কারণ, তারা সামান্য অন্যায়ের প্রতিবাদকেও বিদ্রোহ মনে করেন, শাসকের অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে একটু আওয়াজ উঠলেই খারেজি আখ্যা দেন।

---

১. আকহাসারি (২০৩)।
২. মিনহাজুস সুন্নাহ, ইবনে তাইমিয়া (৪/৫২৯-৩০)।
৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসির (৮/১৭২)।

বাস্তবেও কি তা-ই? প্রকৃতপক্ষেই কি শাসকের প্রতি সালাফের সবার এক ও অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল? জালেমের জুলুমের প্রতিবাদ মানেই কি খারেজিপনা? সালাফের কেউ কি জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি? সহজে উত্তর, না; বরং পিছনে অন্যান্য জায়গায় যেভাবে নিজেদের মতকে সালাফের সবার মত বলে দাবি করা হয়েছে, এখানেও তা-ই হয়েছে। এটা ঈমানের কোনো মৌলিক বিষয় নয়, প্রতিনিয়ত চর্চিত কোনো ইবাদত নয়; বরং এটা দুনিয়া পরিচালনা ও রাজনীতি। ফলে এখানে মতভেদ হবেই। বরং উম্মতে মুহাম্মাদির সর্বোত্তম প্রজন্মের মাঝেও এগুলো নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে, সেখানে পরবর্তী যুগে তো আরও বেশি হয়েছে। ফলে হাজার হাজার সাহাবি, তাবেয়ি, তাবে-তাবেয়ি সবাই একইরকম রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতেন—এটা বলা দুঃসাহসিকতা। আর শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দূরের কথা, বরং তার অন্যায়ের বৈধ সমালোচনা (নাহি আনিল মুনকার) যা কুরআন-সুন্নাহে অপরিহার্য করা হয়েছে, সেটাকেও বিদ্রোহ বলে আখ্যা দেওয়া এবং খারেজিদের কাজ বলা মূলত মুরজিয়াদের মতাদর্শ। সালাফের অনুসরণের দাবিদার অনেকেই এমন অসুস্থ মতাদর্শে আক্রান্ত।

ইবনে হাজাম লিখেন, 'কেউ কেউ এটাকে (জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করাকে) ইজমা বলেছেন; অথচ এটা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি। কারণ, সালাফের অনেকেই এর বিরোধিতা করেছেন। হাররার ঘটনার দিন শীর্ষস্থানীয় সাহাবাগণ ইয়াজিদ ইবনে মুআবিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর ও তাঁর সঙ্গে থাকা বড় বড় সাহাবাও ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। হাসান বসরি ও প্রথম সারির তাবেয়িগণ হাজ্জাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন। সুতরাং এটা ইজমা হয় কী করে?'[১] বরং ইবনে হাজাম এটাকে আলি, আয়েশা, তালহা, জুবাইর, আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর, মুহাম্মাদ ইবনে হাসান ইবনে আলি, হাররার ঘটনায় যোগদানকারী সাহাবি ও তাবেয়ি, হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগদানকারী সকল সাহাবি ও তাবেয়ি কিংবা তাদের সমর্থনকারী, যেমন: আনাস ইবনে মালিক, আবু হানিফা, মালেক ও শাফেয়ির মাজহাব বলেছেন। তারা কেউ কথার মাধ্যমে আবার কেউ সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিদ্রোহ করেছেন।[২]

১. মারাতিবুল ইজমা, ইবনে হাজাম (১৭৮)।
২. আল-ফাসল, ইবনে হাজাম (৪/১৩২)।

কেবল ইবনে হাজাম নন, অনেকেই এ মত সমর্থন করেছেন। অর্থাৎ শাসক জালেম হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যায়। তবে কেউ কেউ স্রেফ জালেম নয়, বরং প্রচণ্ড জালেম হওয়ার শর্ত দিয়েছেন। যেমন: ইয়াজিদ ইবনে মুআবিয়া ও হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের জুলুম ছিল সীমাছাড়া। ফলে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ ঘোষণা দিয়েছেন।[১] হ্যাঁ, এ ব্যাপারে সালাফ জুলুমের পরিমাণ-সহ বিদ্রোহের জন্য কিছু শর্ত নির্ধারণ করেছেন। **কিন্তু কেউ বলেননি যে, ইয়াজিদ ঠিক ছিল আর হুসাইন রাজি. তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী (বাগি) ছিলেন।**[২]

এমন আরেকজন সালাফ হলেন ইবনে আব্বাস রাজি.-এর মাওলা ইকরিমা রাহি.। শাসক-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সালাফের অনেকে তার ব্যাপারে কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি সিকাহ ও নির্ভরযোগ্য তাবেয়ি। ফলে ইমাম বুখারি ও মুসলিমের মতো ইমামরাও তার বর্ণিত হাদিস গ্রহণ করেছেন। সমকালীন কিছু লোক ইকরিমার হাদিসে সন্দেহ করেন। কারণ, তিনি মুরতাদ হত্যা-সংক্রান্ত হাদিস বর্ণনা করেছেন। এদের ধারণা, তিনি যেহেতু খারেজি মতাদর্শে প্রভাবিত ছিলেন, তাই এমন হাদিস বর্ণনা করেছেন। এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং এই ইমামের প্রতি অপবাদ, ইকরিমার ব্যাপারে সালাফের কথার অপব্যাখ্যা। ইবনে হাজার আসকালানি ও জাহাবি-সহ সকল মুহাক্কিক সেটার সাক্ষ্য দিয়েছেন। আসলে এদের কাছে তাঁর অপরাধ হলো তিনি জালেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে সমর্থন করতেন।[৩]

আবু বকর জাসসাস এ ব্যাপারে আবু হানিফা রাহি.-এর মাজহাব প্রসঙ্গে বলেন, **'জালেমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফার মাজহাব প্রসিদ্ধ।'** বরং তিনি সক্রিয়ভাবে মুহাম্মাদ আন-নাফসুজ জাকিয়্যাহ-সহ বিভিন্ন বিদ্রোহ ও বিদ্রোহকারীকে সহায়তা করেন। জাসসাস মনে করেন, যারা ইমাম আবু হানিফার নামে ভিন্ন কোনো মত প্রচার করেছে, তারা হয়তো ভুল করেছে, নতুবা মিথ্যা বলেছে।[৪] কিন্তু পরবর্তীকালে হানাফিদের মাঝে এই ধারা অব্যাহত থাকেনি। পিছনে আমরা ইমাম তহাবি ও বাজদাবির বক্তব্য উল্লেখ করেছি। তাতে সেটা স্পষ্ট হওয়ার কথা। এর কারণ একটু পরে উল্লেখ করা হচ্ছে।

---

১. আল-আওয়াসিম, ইবনুল উজির (৮/৭৫)।
২. আল-আওয়াসিম, ইবনুল উজির (৮/৭৮)।
৩. ফাতহুল বারি (১/৪২৮); সিয়ারু আলামিন নুবালা (রিসালা) (৫/৩৪)।
৪. আহকামুল কুরআন, জাসসাস (১/৮৬-৮৭)।

ইমাম মালেকের কথা দ্বারা বোঝা যায়, তিনি জালেমের বিরদ্ধে বিদ্রোহ করা পছন্দ করতেন না, আবার নাজায়েজও মনে করতেন না। কিন্তু তিনি প্রত্যাশা করতেন আল্লাহ যেন তাকে সরিয়ে দেন। তিনি বলতেন, শাসক যদি উমর ইবনে আবদুল আজিজের মতো হয়, তবে তাকে সাহায্য করতে হবে, তার পক্ষে যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু তেমন না হলে তাকে ছেড়ে দাও। আল্লাহ অন্য কোনো জালেমের মাধ্যমে এই জালেমকে শায়েস্তা করবেন। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, ইমাম মালেক জালেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীকেও জালেম বুঝতেন।[১] পরবর্তীকালে সম্ভবত তিনি জালিমের বিরুদ্ধে আরও দৃঢ় হন। ফলে যখন মুহাম্মাদ আন-নাফসুজ জাকিয়্যাহ আবু জাফর মানসুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তখন তিনি তার হাতে বাইয়াত নেওয়ার ফাতাওয়া দেন। কেউ বলল, 'আমরা তো মানসুরের হাতে বাইয়াত নিয়েছি।' তিনি বলেন, 'সেটা জোরজবরদস্তি ছিল। আর জোর করে বাইয়াত হয় না।'[২] এভাবে দেখা যাচ্ছে, ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম মালেক দুজনই মানসুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সমর্থন করেন।

যখন ইবনে আশআস হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তার সঙ্গে এক-দুইজন নয়, চার হাজার তাবেয়ি সে বিদ্রোহে শরিক হন। তাদের মাঝে প্রথম সারির তাবেয়ি, যেমন: সাইদ বিন জুবাইর, আবদুর রহমান ইবনে আবি লাইলা প্রমুখ, ছিলেন। আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের বিরুদ্ধেও তাবেয়িরা যুদ্ধ করেন।[৩]

সুতরাং সকল সালাফ জালেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার বিপক্ষে—এমন বলার সুযোগ নেই। বরং তারা দুটি মতের উপর ছিলেন: একদল জালেমের বিরুেদ্ধে বিদ্রোহ জায়েজ মনে করতেন। তারা এটাকে আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার হিসেবে দেখতেন। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ সালাফ এটাকে নাজায়েজ মনে করতেন। তারা মূলত রাসুলুল্লাহর নিষেধাজ্ঞা, বিদ্রোহপরবর্তী বিশৃঙ্খলা, মুসলমানদের বিভক্তি ও পারস্পরিক হানাহানির সুযোগে কাফেরদের আগ্রাসন ইত্যাদি আশঙ্কা সামনে রেখে নিষেধ করতেন।[৪]

কেউ আপত্তি করতে পারে, যারা জালেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বৈধতা দিয়েছেন, তারা তো শর্তহীন দেননি। তা হলে প্রথম দলের কথা ভুল কোথায়? এর উত্তর হলো,

---

১. শরহু মুখতাসারি খলিল, খারাশি (৮/৬০)।
২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসির (১০/৯০)।
৩. আহকামুল কুরআন, জাসসাস (১/৮৮)।
৪. আত-তানকিল, মুআল্লিমি (১/২৮৮)।

শর্তহীন বিদ্রোহ কেবল জালেম কেন, কাফেরের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ শাসক যদি সুস্পষ্ট কুফরিতে লিপ্ত হয়, সেখানেও বিদ্রোহ শর্তহীন নয়। ফলে জালিমের ক্ষেত্রে তো আরও বেশি শর্ত প্রযোজ্য হবে—এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রথম দল মনে করেন, জালিমের বিরুদ্ধে কোনোভাবেই বিদ্রোহ করা যাবে না, বরং নীরব থাকতে হবে—শর্ত পাওয়া গেলেও নয়, শর্তহীনভাবে তো নয়ই; অথচ এটা ভুল। বরং সুযোগ ও সামর্থ্য থাকলে কেবল কাফের নয়, প্রচণ্ড জালেমের বিরুদ্ধেও—একদল সালাফের মতে—বিদ্রোহ করা যাবে। জুয়াইনি লিখেন, যখন শাসক অবাধ্যতা অব্যাহত রাখবে এবং সীমালঙ্ঘন করে যাবে, মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হবে, জীবন, সম্পদ ও সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তা ব্যাহত হবে, জালিমরা সফল হয়ে উঠবে, সাধারণ মানুষ নিজেদের উদ্ধারের কোনো পথ খুঁজে পাবে না, সর্বত্রই ব্যাপক নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে, তখন সেটার লাগাম টেনে ধরা চাই। কেননা শাসকের উদ্দেশ্যই হচ্ছে এগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করা। সুতরাং ক্ষমতার সিংহাসনে তার উপস্থিতি যদি উলটো দিকে নিয়ে যায়, তখন অবশ্যই তার লাগাম টেনে ধরতে হবে। মানুষকে এভাবে অসহায় ছেড়ে দেওয়া যাবে না। সুতরাং তাকে যদি ফেরানো যায়, তবে তো মহা সাধুবাদ; আর যদি সেটা না হয়, তবে অবস্থার প্রতি তাকাবে। যদি ফলাফল সাময়িক বিশৃঙ্খলার চেয়ে বেশি হয়, তবে সেটুকু মানার জন্য প্রস্তুত হবে। আর যদি বিপরীত হয়, তবে জুলুম সহ্য করবে।[১]

সালাফ ও খালাফ: প্রশ্ন আসতে পারে, ইমাম আবু হানিফার মানহাজ যদি হয় জালেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা—যেমনটা জাসসাস বলেছেন—তা হলে ইমাম তহাবি কীভাবে বললেন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না? উত্তর দুইভাবে দেওয়া যেতে পারে: **এক**. এখানে জুলুম বলতে ইমাম তহাবি লঘু জুলুম উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর ইমাম আবু হানিফা যে জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বলেছেন, সেটা প্রচণ্ড জুলুম। ফলে দুই কথায় কোনো সংঘাত নেই। **দুই**. সময়ের ব্যবধান। ইমাম আবু হানিফা যে শতাব্দে ছিলেন, সেটা ছিল দ্বন্দ্বমুখর এক শতাব্দ। উমাইয়া-আব্বাসীয়দের টানাপোড়েন একদিকে, অপরদিকে শিয়া-সুন্নি জটিলতা, অধিকন্তু নবি-পরিবারের সদস্যদের ভিন্নধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি, কিছু শাসক ও তাদের গভর্নরের সীমাহীন জুলুম গোটা পরিবেশকে অশান্ত

---

১. গিয়াসুল উমাম, জুয়াইনি (১০৬-১০৭)।

করে রেখেছিল। ফলে মুসলিমগণ স্বভাবতই এই জুলুম থেকে মুক্তি চাইতেন সেটা কঠিন পথে হলেও। কিন্তু ফলাফল কী হয়েছে? বিদ্রোহ কি ভালো ফল বয়ে এনেছে?

আমরা দেখি, জালিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে একাধিক হাদিস ও সতর্কবাণী থাকতেও তাদের কাছে বিদ্যমান দলিলের মাধ্যমে তারা বিদ্রোহ করেছেন। মূলত তারা জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে 'নাহি আনিল মুনকার' হিসেবে গণ্য করতেন। ফলে এটা তাদের ইজতিহাদ, যেটাকে অবৈধ বলার সুযোগ নেই। কিন্তু তা উম্মাহর জন্য এবং তাদের নিজেদের জন্য কোনো ইতিবাচক ফল বয়ে এনেছে? আনেনি। আমরা দেখেছি, আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর, হুসাইন ইবনে আলির মতো সাহাবাদের চরম বেদানায়কভাবে হত্যা করা হয়েছে। মদিনাবাসী ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে সাহাবি ও তাবেয়ি-সহ সেখানে গণহত্যা চালানো হয়েছে। ইরাকে আবদুল মালিক ও হাজ্জাজের উপর বিদ্রোহকারী ইবনুল আশআস ও তাঁর সঙ্গে বিদ্যমান সবাই, খোরাসানে বিদ্রোহকারী ইবনুল মুহাল্লাব ও তার সঙ্গে বিদ্যমান সবাই করুণভাবে পরাজিত ও নিহত হয়েছেন। জায়দ ইবনে আলিকে মাঝপথে ছেড়ে গিয়েছে তাঁর সঙ্গীরা। উমাইয়াদের সরিয়ে আব্বাসীয়রা এসেছে, কিন্তু জুলুম বন্ধ থাকেনি। মদিনা ও বসরাতে যারা খলিফা আবু জাফর মানসুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তারা সবাই পরাজিত হন। এসব বিদ্রোহে অসংখ্য মানুষ নিহত হয়। ফলে তাদের মাধ্যমে—ইবনে তাইমিয়ার ভাষায়—দ্বীন ও দুনিয়ার কেউ উপকৃত হয়নি।[১]

বরং ইমাম আবু হানিফা রাহি.-এর বক্তব্যে গভীর দৃষ্টি দিলে বোঝা যায়, জাসসাসের কথা সঠিক নয়; কিংবা প্রথমদিকে ইমামের মাজহাব ছিল সেটা। পরবর্তী সময়ে ইমামও পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছিলেন। আবু মুতি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, যেসব মানুষ সৎ কাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজের নিষেধ করে এবং সেটার জন্য জামাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাদের কাজ কি সঠিক মনে করেন? ইমাম বললেন—না। কারণ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ওয়াজিব হলেও তারা যেটা করে তাতে উপকারের চেয়ে অপকার বেশি। তাতে রক্ত ঝরে; হারামকে হালাল বানানো হয়; মানুষের ধন-সম্পদ নষ্ট হয়। এ কারণে আল্লাহ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

---

১. মিনহাজুস সুন্নাহ, ইবনে তাইমিয়া (৪/৫২৮)।

وَاِنۡ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ اقۡتَتَلُوۡا فَاَصۡلِحُوۡا بَیۡنَهُمَا ۚ فَاِنۡۢ بَغَتۡ اِحۡدٰىهُمَا عَلَى الۡاُخۡرٰی فَقَاتِلُوا الَّتِیۡ تَبۡغِیۡ حَتّٰی تَفِیۡٓءَ اِلٰۤی اَمۡرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنۡ فَآءَتۡ فَاَصۡلِحُوۡا بَیۡنَهُمَا بِالۡعَدۡلِ وَاَقۡسِطُوۡا ؕ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الۡمُقۡسِطِیۡنَ.

অর্থ: 'যদি মুমিনদের দুটি দল পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর আক্রমণ করে, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দেবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।' [হুজুরাত: ৯] ফলে মুসলমানদের জামাতের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করবে, তাদের তরবারি দিয়ে শায়েস্তা করা হবে। **শাসক যদি জালেমও হয়, নিজেরা ন্যায়ের উপর থাকবে, ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত দলের সঙ্গে থাকবে** (বিদ্রোহীদের সঙ্গে থাকবে না)। **কারণ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাদের (শাসকদের) কেউ ইনসাফ করুক কিংবা জুলুম করুক, তোমাদের তাতে ক্ষতি নেই। তোমাদের পুণ্য তোমাদের জন্য, তাদের জুলুম তাদের কাঁধে।**[১]

এভাবে একদিকে প্রথম সময়ের বিদ্রোহগুলো যখন ব্যর্থ হয়, এর ক্ষতি, অনিষ্ট এবং অপকারিতা সামনে আসে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়, অপরদিকে আব্বাসীয় খেলাফত সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইমামগণ জুলুম ইসুতে শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করাকেই অগ্রাধিকারযোগ্য মনে করেন। এ কারণেই ইমাম তহাবি, বাজদাবি-সহ পরবর্তী সময়ে হানাফি-মাতুরিদি ধারার সকল আলিম বিদ্রোহ না করার পক্ষে। ইমাম মাতুরিদি তো জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে খারেজিদের সিফাত হিসেবে অভিহিত করেছেন।[২] ইবনে আবদুল বার বলেন, বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। তবে শাসক জালেম হলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা চাই। কারণ, তাতে নিরাপত্তা ভীতিতে পরিণত হয়, মুসলমানের রক্তপাত ঘটে, পৃথিবীতে বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে। এরচেয়ে জুলুম ও অন্যায় সহ্য করাই উত্তম। অভিজ্ঞতাও বলে, দুটো অপছন্দের বিষয় সামনে

---

১. আল ফিকহুল আবসাত (৪৪); বিস্তারিত দেখুন অধমকৃত ইমাম আবু হানিফার আকিদা গ্রন্থে।

২. তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ, মাতুরিদি (১/১০৪)।

থাকলে যেটা বেশি ক্ষতিকর সেটাকেই বর্জন করা উচিত।[১] ইমাম নববি বলেন, ওটা প্রথম যুগে ছিল। পরবর্তীকালে আহলে সুন্নাত জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করার ব্যাপারে একমত হয়।[২]

মোট কথা, জালেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ কি না ব্যাপারটি প্রথম যুগে মতভেদপূর্ণ ছিল। অধিকাংশ সাহাবি ও তাবেয়ি জালিমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সঠিক মনে করতেন না। তবে অনেকে সরাসরি বিদ্রোহ করেছেন। হুসাইন, ইবনুজ জুবাইর-সহ নবি-পরিবারের সকলের কর্ম উক্ত দৃষ্টিতে দেখা হবে।[৩] **কিন্তু পরবর্তীকালে যখন দেখা গেল এগুলো ভালো কোনো ফলাফল বয়ে আনে না, তখন সালাফের সর্বসম্মত মত হলো জালেমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা।** এভাবেই বুঝতে হবে ইমাম তহাবি-সহ অন্যদের মতামত। কারণ, সময়ের ফারাকটা অনেক। ফলে যদি রক্তপাত ও বড় ধরনের ফিতনা ছাড়া জালেমকে সরিয়ে দেওয়া যায়, তবে সেটা করা উচিত। আর যদি রক্তপাত ছাড়া সম্ভব না হয়, তবে জমহুরের মতে থাকা উচিত। কারণ, তাতে প্রচুর রক্তপাত হয় এবং উপকারের চেয়ে অপকার বেশি হয়। উপরন্তু বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার দিকে তাকালেও জমহুরের মতকেই সর্বাধিক সঠিক, সবেচেয় যুক্তিযুক্ত এবং উম্মাহর জন্য কল্যাণকর মনে হবে। হানাফি ও মাতুরিদি আলিম আবু হাফস গজনবি লিখেন, 'শাসক হওয়ার জন্য নিষ্পাপ হওয়া শর্ত নয়। ফলে জুলুম করলেই শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। কারণ, এর ফলে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়, মুসলমানদের মাঝে অনিষ্ট ও হানাহানির সূচনা হয়। এটা বরং খারেজিদের মাজহাব।'[৪] ইবনে হাজার আসকালানি লিখেন, 'জালেমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা সালাফের একটি প্রাচীন মাজহাব। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন দেখা গেল এতে হিতে বিপরীত হয়, তখন সেটা বর্জন করার উপর সবাই একমত হয়েছেন। হাররা ও ইবনুল আশআস-সহ অন্যান্য বিদ্রোহের ঘটনায় চিন্তাশীলদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।'[৫]

কেবল বিদ্রোহ নয়, বরং জালিম শাসকের উপর বদদোয়াও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ফলে স্বয়ং ইমাম তহাবি বদদোয়া করতে নিষেধ করে দোয়ার কথা বলেছেন।

---

১. আল-ইসতিজকার, ইবনে আবদুল বার (৫/১৬); আল-আওয়াসিম, ইবনুল উজির (৮/১৮); ইলাউস সুনান (১২/৬৫৭)।
২. শরহে মুসলিম, নববি (১২/২২৯)।
৩. নাইলুল আওতার, শাওকানি (৭/২০৮)।
৪. গজনবি (১২৯); গুনাইমি (১১০)।
৫. তাহজিবুত তাহজিব, ইবনে হাজার (২/২৮৮)।

অনেকের মনে হতে পারে, এগুলো দরবারি আলিমদের বক্তব্য। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। বরং এগুলো অভিজ্ঞ ইমামদের কথা। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ-সহ যারা এসব বক্তব্য দিয়েছেন, তারা জীবনের দীর্ঘ সময় জালিমের জেলখানাতেই কাটিয়েছেন। ইমাম আহমদ শাসকের হাতে প্রচণ্ড নির্যাতনের শিকার হয়েও বলেছেন, আমি তার (শাসকের) জন্য দিনরাত তাওফিক, হিদায়াত ও আল্লাহর পক্ষ থেকে নুসরতের দোয়া করি এবং এটা আমার দায়িত্ব (ওয়াজিব) মনে করি।[১] তাদের আগে ফুজাইল ইবনে ইয়াজ বলে গেছেন, 'আমার কাছে যদি কবুল হওয়ার মতো একটি দোয়া থাকত, তবে আমি সেটা শাসকের জন্য করতাম।'[২] ফলে যে শাসক ইসলামকে বাস্তবায়ন করবেন, আল্লাহ দ্বীন ও উম্মাহকে হেফাজত করবেন। জালেম হলেও উম্মাহর কাছে এগুলো তার প্রাপ্য। কারণ, জালেম শাসকের বিরুদ্ধে বদদোয়ায় উম্মাহর কল্যাণ নাকি অকল্যাণ তা জানা নেই। হতে পারে বদদোয়ার ফলে সে শাসক ধ্বংস হবে, কিন্তু তার পরে আরও বেশি জালেম কেউ আসবে। তাই বদদোয়ার পরিবর্তে দোয়া করাই অধিকতর কল্যাণকর।[৩] এ কারণে আনাস ইবনে মালেক রাজি.-এর কাছে তাবেয়িদের একটি প্রতিনিধি দল এসে হাজ্জাজের জুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে আনাস বলেন, 'তোমরা সবর করো। কারণ, তোমাদের প্রত্যেকটা পরবর্তী সময় পূর্বের সময়ের চেয়ে বেশি খারাপ হবে যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের রবের সাক্ষাতে চলে যাবে। আমি এ কথা তোমাদের নবিকে বলতে শুনেছি।'[৪]

---

১. আস-সুন্নাহ, খাল্লাল (১/৮৩)।
২. উক্ত বক্তব্যটি ইবনে উসাইমিন-সহ সমকালীন অনেক আলিম ইমাম আহমদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন। দেখুন: মাজমু ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল, ইবনে উসাইমিন (৯/৪৭৭); কিন্তু সেটা প্রমাণিত নয়। ইমাম আহমদ থেকে প্রমাণিত বক্তব্য উপরে আমরা উল্লেখ করেছি। এটা বরং ফুজাইলের বক্তব্য। আবু নুআইম এটাকে তার থেকেই বর্ণনা করেছেন। দেখুন: হিলইয়াতুল আউলিয়া (৮/৯); আল্লাহ ভালো জানেন।
৩. গজনবি (১৩০); তুর্কিস্তানি (১৪৩); আকহাসারি (২০৪)।
৪. বুখারি (৭০৬৮); তিরমিজি (২২০৬)।

وَنَتبِعُ السُّنَّةَ وَالـجَمَاعَةَ ، وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالـخِلَافَ وَالفُرْقَةَ، وَنُحِبُّ أَهْلَ العَدْلِ وَالأَمَانَةِ وَنُبْغِضُ أَهْلَ الـجَوْرِ وَالـخِيَانَةِ، وَنَقُولُ اللهُ أَعْلَمُ فِيمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ.

আমরা সুন্নাত এবং জামাতের অনুসরণ করি। বিচ্ছিন্নতা, মতানৈক্য ও বিভেদ এড়িয়ে চলি। ন্যায়পরায়ণ ও আমানত রক্ষাকারীদের আমরা পছন্দ করি। জালেম এবং খেয়ানতকারীদের ঘৃণা করি। আর যখন কোনো বিষয় আমাদের কাছে অস্পষ্ট লাগে আমরা বলি, 'আল্লাহই অধিক জানেন।'

ব্যাখ্যা

কিছু বিবিধ আকিদা

সুন্নাহ অনুসরণ, বিদআত বর্জন: সুন্নাহ হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ। বিপরীতে বিদআত হলো দ্বীনের মাঝে নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া জিনিস উদ্ভাবন। মুসলিম জীবনে বিশুদ্ধ ঈমান ও তাওহিদ চর্চার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো সুন্নাহর অনুসরণ, বিদআত বর্জন। কারণ, সুন্নাহ দ্বীনকে সুরক্ষিত রাখে, জীবন্ত রাখে। বিপরীতে বিদআত দ্বীনকে দুর্বল করে ফেলে, নিষ্প্রাণ করে দেয়। যখনই মুসলিম উম্মাহর মাঝে একটা বিদআতের প্রচলন ঘটে, তাদের থেকে একটি সুন্নাহ উঠে যায়। বিদআত ভালো নিয়তে করলেও সেগুলো মানুষকে আল্লাহর কাছে নেয় না, বরং আল্লাহ ও তাঁর দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তাই প্রত্যেক মুসলিমের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে হবে, বিদআত বর্জন করতে হবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসংখ্য হাদিসে সুন্নাহ অনুসরণের গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন এবং বিদআত থেকে সতর্ক করেছেন। যেমন: একটি হাদিসে তিনি বলেন, 'তোমাদের ভিতর যারা বেঁচে থাকবে, তারা অতি শীঘ্রই অনেক মতভেদ

দেখতে পাবে। সুতরাং তোমাদের কর্তব্য হলো, আমার সুন্নাহ এবং খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা। এটাকে তোমরা মজবুতভাবে ধরে রেখো, এটার সঙ্গে দাঁত কামড়ে পড়ে থেকো। আর তোমরা নব উদ্ভাবিত বিষয় থেকে সাবধান থেকো। কারণ, প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত বিষয় বিদআত; আর প্রত্যেক বিদআত গোমরাহি; আর প্রত্যেক গোমরাহির পরিণতি জাহান্নাম।'[১]

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকটি হাদিসে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করল যা আমাদের নয়, সেটা প্রত্যাখ্যাত।'[২] উলামায়ে কেরাম উক্ত হাদিসকে বিদআতের সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য ও পুণ্য লাভের উদ্দেশ্যে এমন কোনো ইবাদত করা, যা কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির আলোকে উত্তীর্ণ নয়, সেটা বিদআত হিসেবে গণ্য হবে। এমন কাজ কাউকে আল্লাহর কাছে নিয়ে যেতে পারে না, বরং দূরে সরিয়ে দেয়। এমন কাজের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পুণ্য মেলে না, বরং অসন্তোষ ও শাস্তি অবধারিত হয়।

অনেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসার নাম করে এমন অনেক কাজ করেন, যেগুলো কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফের আমলে নেই। এগুলো তারা বেশ আবেগ, আগ্রহ, নিষ্ঠা ও মহব্বতের সঙ্গেই করে থাকেন। কিন্তু তাতে কি আল্লাহর রাসুলের ভালোবাসা আদৌ অর্জিত হয়? কাউকে ভালোবাসার অর্থ আমার যেভাবে মনে চায় সেভাবে ভালোবাসা নয়, বরং যাকে ভালোবাসছি তার ভালোলাগা-মন্দলাগা দেখা। সেটা না দেখে যদি নিজের মতো করে ভালোবাসতে যাই, তাতে হিতে বিপরীত হবে। রাসুলুল্লাহর ক্ষেত্রেও একই কথা। আল্লাহর রাসুলকে ভালোবাসার সর্বোচ্চ প্রমাণ হলো তাঁকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করা, জীবনের সর্বত্র সবসময় তার আদর্শ অনুসরণ করা, তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। এটা প্রকৃত ভালোবাসা। এতেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট হবেন। সেটা না করে নিজের ইচ্ছামতো প্রথা-পার্বণ আবিষ্কার করা, আল্লাহর রাসুলের সুন্নাহ ছেড়ে বিদআতে লিপ্ত হওয়া রাসুলের ভালোবাসা নয়, তার অসন্তোষের কারণ।

তা ছাড়া রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসার নামে বিভিন্ন প্রথা-পার্বণে নিজেকে জড়ানোর আগে সালাফ তথা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন, তাবে-

---

১. আবু দাউদ (৪৬০৭); তিরমিজি (২৬৭৬); ইবন মাজা (৪৩); ইবনে হিব্বান (৫)।
২. বুখারি (৭৩৫০); মুসলিম (১৭১৮)।

তাবেয়িনের জীবনের প্রতিও আমাদের একটু নজর বুলিয়ে নেওয়া উচিত। তারা হলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে কাছের মানুষ, উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্ম। সালাফে সালেহিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যতটা ভালোবেসেছেন, সেটা পৃথিবীর আর কোনো প্রজন্মের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যত উত্তমভাবে অনুসরণ করেছেন, সেটা পৃথিবীর আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। বরং তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি করেননি। এমন কোনো ক্ষুদ্র আমলও বাদ দেননি যার মাধ্যমে রাসুলুল্লাহকে ভালোবাসা যায়, তাকে অনুসরণ করা যায়। সুতরাং আমরা আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি আমল করার সময় দেখব সালাফ সেটা করেছেন কি না। কারণ, সালাফ যে কাজ করেননি, সে কাজ সুন্নাহ হতে পারে না। সালাফ যে পথে হাঁটেননি, সে পথে আল্লাহ ও রাসুলকে পাওয়া যেতে পারে না। যদি সত্যিই এসব কাজের মাধ্যমে আল্লাহ ও রাসুলকে পাওয়া যেত, তবে সালাফ আমাদের আগে করতেন। তারা যেহেতু এগুলো থেকে বিরত থেকেছেন, আমাদেরও বিরত থাকতে হবে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজি. বলেন, 'তোমাদের ভিতর যে-কেউ অনুসরণ করতে চায়, তবে যেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের অনুসরণ করে। কারণ, তারা এই উম্মতের সবচেয়ে পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী, সর্বাপেক্ষা গভীর জ্ঞানের অধিকারী, লৌকিকতা থেকে সবচেয়ে দূরে, সবচেয়ে বেশি হিদায়াতপ্রাপ্ত, সর্বাপেক্ষা ভালো অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। তারা সেই সম্প্রদায় আল্লাহ তায়ালা যাদের তাঁর নবির সোহবতের জন্য মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা মনে রেখো। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো। কারণ, তারা সিরাতে মুস্তাকিমের উপর অটল ছিলেন।'[১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ইহুদিরা একাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়েছে। খ্রিষ্টানরা বাহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়েছে। আমার উম্মত তিয়াত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে। সবগুলো ফিরকা জাহান্নামে যাবে, কেবল একটি জান্নাতে যাবে।' জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তারা কারা, হে আল্লাহর রাসুল?' তিনি বললেন, 'যারা আমি ও আমার সাহাবাদের পথে থাকবে।'[২] কোথাও কোথাও উক্ত হাদিসের

১. জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহি, ইবনে আবদুল বার (২/১৯৮)।
২. তিরমিজি (২৬৪১); ইবনে মাজা (৩৯৯২); আবু দাউদ (৪৫৯৬)।

অংশবিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে, 'অতি শীঘ্রই আমার উম্মতের মাঝে এমন সম্প্রদায় বের হবে, প্রবৃত্তি তাদের সেভাবে তাড়িয়ে বেড়াবে যেভাবে জলাতঙ্ক রোগ আক্রান্ত ব্যক্তিকে তাড়িয়ে বেড়ায়।'[১]

মুসলমানদের ঐক্যের আবশ্যকতা: ঐক্য এমন একটি বিষয় যা মুসলিম জাতির স্থিতি, বিকাশ ও সংহতি বজায় রাখে, মুসলমানদের জন্য দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় কল্যাণ বয়ে আনে। ঐক্য যেমন মুসলমানদের ঈমান-আকিদাকে সুরক্ষিত রাখে, পার্থিব জগতেও মুসলমানদের শক্তিশালী করে, সমৃদ্ধ করে, মুসলিম উম্মাহকে মজবুত ও বিজয়ী করে। এ কারণে আকিদার কিতাবগুলোতে আহলে সুন্নাতের ঐক্যের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا.

অর্থ: 'তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ করো; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেছ।' [আলে ইমরান: ১০৩] অনৈক্য মুসমানদের পার্থিবভাবে কীভাবে ক্ষতি করে এবং তাদের দুর্বল করে দেয় সে প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ.

অর্থ: 'আর তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের নির্দেশ মান্য করো। পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। তাতে তোমরা ব্যর্থ হবে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে।' [আনফাল:৪৬] আজকে মুসলিম জাতি গোটা পৃথিবীর তাবৎ জাতির সামনে বিড়ালের মতো হয়ে থাকার অন্যতম একটি কারণ হলো তাদের অভ্যন্তরীণ কোলাহল, হানাহানি ও অন্তর্দ্বন্দ্ব। অথচ সবাই এক ধর্মের অনুসারী, এক তাওহিদের সাক্ষ্যদাতা, এক কুরআন-সুন্নাহর মানুষ। অনৈক্য কেবল দুনিয়া নয়, মুসলমানদের ঈমানকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে এটাকে পার্থিব বিষয় কিংবা ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন,

---

১. আবু দাউদ (৪৫৯৭)।

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا.

অর্থ: 'যে ব্যক্তি সরল পথ স্পষ্ট হওয়ার পরেও রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুসলমানের অনুসৃত পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে, আমি তাকে ওই দিকেই ফেরাব, যে দিকে সে গিয়েছে (অর্থাৎ বক্র করে দেবো)। আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। সেটা কতই না নিকৃষ্টতর গন্তব্য!' [নিসা: ১১৫] অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ.

অর্থ: 'তিনি তোমাদের জন্য সেই দ্বীন নির্ধারণ করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নুহকে। আর যা আমি ওহি করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহিম, মুসা ও ঈসার প্রতি এ মর্মে যে, **তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করো এবং তাতে মতভেদ করো না।** [শুরা: ১৩] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতকে কখনোই গোমরাহির উপর ঐক্যবদ্ধ করবেন না।' এরপর—দুই হাত উঁচু করে দেখিয়ে—বললেন, 'জামাতের উপর আল্লাহর হাত রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।'[১]

ঐক্য বিনির্মাণের কৌশল: মুসলমানদের ঐক্য ধরে রাখার সর্বোত্তম উপায় হলো শাখাগত বিষয় নিয়ে মতভেদ পরিহার করা। উম্মাহর কোটি কোটি সদস্য সব বিষয়ে একমত থাকা সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক নিয়মও এর সঙ্গে যায় না। স্বয়ং সাহাবাগণ বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ করেছেন। কিন্তু তারা জানতেন কোন বিষয়ে মতভেদ করা যাবে আর কোন বিষয়ে মতভেদ করা যাবে না, কতটুকু মতভেদ করা যাবে কতটুকু করা যাবে না। এ কারণে তাদের মাঝে মতবিরোধ থাকলেও বিচ্ছিন্নতা ও হানাহানি ছিল না। তারা উম্মাহর বৃহত্তর ইসুর সামনে নিজেদের ক্ষুদ্র মতভেদগুলোর প্রতি ভ্রূক্ষেপই করতেন না। কিন্তু আজকের মুসলিম উম্মাহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে মতভেদের সামনে উম্মাহর বৃহত্তর সর্বসম্মত বিষয়গুলো খেয়ালই করে না। ঈমানের ক্ষেত্রে, কুফরের ক্ষেত্রে, ফরজ ও ওয়াজিবের ক্ষেত্রে—সব জায়গায় আহলে সুন্নাত একমত। বরং দ্বীনের প্রায়

১. তিরমিজি (২১৬৭); মুসতাদরাকে হাকেম (৭৯৩)।

পঁচানব্বই ভাগের বেশি বিষয়ে আহলে সুন্নাতের সকল মুসলিম একমত। কিন্তু আফসোসের বিষয় এই, সর্বসম্মত পঁচানব্বই ভাগ বিষয়ের চেয়ে তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো মতভেদপূর্ণ পাঁচ ভাগ, যেগুলোর বেশিরভাগই অগুরুত্বপূর্ণ। ফলে নফল, মুস্তাহাব, মাকরুহ ও মুবাহের মতো বিষয়গুলো নিয়ে তাদের মাঝে যুদ্ধ যুদ্ধ রব লেগে যায়। এসব বিষয় নিয়ে তারা একদল আরেক দলকে একটু ছাড় দিতে চায় না। মসজিদ, মাদরাসা, সেমিনার—সর্বত্র কেবল এগুলো নিয়েই আলোচনা। তাদের দেখলে মনে হবে, এগুলোই ইসলামের মূল বাণী, এগুলোর জন্যই আল্লাহ কুরআন পাঠিয়েছেন। প্রায়শই বিভিন্ন ইসুকে কেন্দ্র করে তাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত দেখবেন; দেখবেন কীভাবে একদল আরেক দলের মসজিদ-মাদরাসা ভেঙে দিচ্ছে, জান ও মালের ক্ষতি করছে, পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট করছে, নিজেরা মারামারি করে জাহিল ও ধর্মহীন লোকদের কাছে বিচারের জন্য যাচ্ছে। এরচেয়ে বড় লাঞ্ছনার কথা আর কী হতে পারে? মুস্তাহাব ও নফল নিয়ে নিজেদের এসব মারামারির ভিড়ে দ্বীন ও উম্মাহর পিঠ কখন দুশমনের জন্য উদোম হয়ে গেছে, সেটা খবর রাখারও সময় পায় না আজকের মুসলমানরা। সামান্য মতপার্থক্যের কারণে এক মুসলিম তার অপর মুসলিম ভাইকে ইহুদি-খ্রিষ্টান ও মুশরিকদের চেয়েও বড় দুশমন মনে করে। আহলে সুন্নাতের একজন আরেকজনকে ততটুকু ছাড় দেয় না, যতটা ছাড় তারা খ্রিষ্টান মিশনারি, শিয়া, কাদিয়ানি, হিন্দু ও নাস্তিকদের দেয়।

তাই সুন্নাত ও জামাত দুটো রক্ষার জন্য ছাড় দিতে হবে। মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলোর পরিবর্তে সর্বসম্মত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে জোর দিতে হবে। দ্বীন ও উম্মাহর অভিন্ন শত্রুদের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতে হবে। যেসব বিষয়ে কোনো অঞ্চলে উম্মাহ একটি সুন্নাতের উপর থাকে, জামাতের সুরক্ষার জন্য সেখানে নতুন একটি বিপরীত মত সৃষ্টি অনুচিত। যেমন: কোনো অঞ্চলে মুসলিম উম্মাহ বুকের নিচে হাত বাঁধে। ফিতনার আশঙ্কা থাকলে সেখানে বুকের উপরে হাত বাঁধা অনুচিত। কোনো স্থানের মুসলিমরা তারাবি বিশ রাকাত পড়ে। বিশৃঙ্খলার ভয় থাকলে সেখানে আট রাকাতের মতাদর্শ প্রচার করা অসঠিক। কারণ, তাতে উম্মাহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, জামাত নষ্ট হবে; অথচ সুন্নাত ও জামাত দুটোই দরকার। বরং মুসলমানদের প্রচলিত একটি সুন্নাতকে অপর একটি সুন্নাতের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বীনের চেয়ে নিজেকে ফোকাসের উদ্দেশ্য ও লৌকিকতার শিকার হওয়ার আশঙ্কা বেশি। তাই এ-জাতীয় কাজ বর্জনীয়। আমার উদ্দেশ্য যদি দ্বীনই হয়, তবে মুসলমানরা তো দ্বীনের উপর আছেনই, তা হলে

কেন বিশৃঙ্খলা তৈরি করব? এমনকি যদি আমার আমলটি প্রচলিত আমলের চেয়ে উত্তম হয়, তবুও ফিতনার আশঙ্কা থাকলে আমি তাদের বিরোধিতা করব না। একটু উত্তম আমল প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে মুসলমানদের মাঝে বিভেদের আগুন ছড়িয়ে দেওয়া, মুসলমানদের জামাত তথা ঐক্য ধ্বংস করে দেওয়া ইসলামের কাজ নয়। এমন উত্তমের চেয়ে অনুত্তমের উপর থাকা ঢের মঙ্গলজনক। হ্যাঁ, সংঘাতটা যদি উত্তম-অনুত্তমের পরিবর্তে ঈমান ও কুফরের, সুন্নাত ও বিদআতের হয়, তখন ঈমান ও সুন্নাহর শিবিরে থেকে কুফর ও বিদআতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অপরিহার্য।

আল্লাহ অনৈক্যকে মুশরিকদের কাজ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন,

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ.

অর্থ: 'আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা তাদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং দলে-দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উল্লসিত।' [রুম: ৩১-৩২] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'হিদায়াতপ্রাপ্তির পরে কোনো সম্প্রদায় ততক্ষণ পর্যন্ত গোমরাহ হয় না, যতক্ষণ না বিবাদ-বিতর্কে জড়ায়। এরপর তিনি কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ

অর্থ: 'তারা আপনার সামনে যে উদাহরণ উপস্থাপন করে, তা কেবল বিতর্কের জন্যই করে।'[১] [জুখরুফ: ৫৮]

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও শত্রুতা: মহব্বত তথা ভালোবাসা প্রাকৃতিক বিষয়। আল্লাহ তায়ালা কেবল মানুষ নয়, পৃথিবীর সকল সৃষ্টির হৃদয়ে ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন। এই ভালোবাসা ও হৃদ্যতার উপরই পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে। যদি সৃষ্টির ভিতরে পারস্পারিক ভালোবাসা না থাকত, তবে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা তৈরি হতো. পৃথিবীতে সৃষ্টির বিকাশ ব্যাহত হতো।

ভালোবাসা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন: প্রাকৃতিক ভালোবাসা। এগুলোতে মৌলিকভাবে পাপ-পুণ্য নেই। পুণ্যের জায়গাতে ব্যবহার করলে পুণ্য, পাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে পাপ। যেমন: সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের ভালোবাসা, বাবা-মায়ের প্রতি

১. তিরমিজি (৩২৫৩); ইবনে মাজা (৪৮); মুসনাদে আহমদ (২২৫৯৪)।

সন্তানের ভালোবাসা। স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন ও অন্য আত্মীয়দের পারস্পরিক ভালোবাসা। এগুলো আল্লাহর জন্য হলে তাতে পুণ্য আছে, কিন্তু অপাত্রে হলে তাতে পাপও রয়েছে। একইভাবে জাগতিক বিভিন্ন বিষয়, যেমন: খাবার, পোশাক, স্থান ও সময়ের প্রতি মানুষের ভালোবাসা; এগুলোও ভালো হলে তাতে পুণ্য রয়েছে, খারাপ হলে তাতে পাপ রয়েছে।

তবে এসব ভালোবাসা প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক। মানুষের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির তাতে বেশ প্রভাব রয়েছে। ফলে এগুলো কখনও স্বার্থপূর্ণ, আবার কখনও নিঃস্বার্থ হয়ে থাকে। তাই এটা সর্বশ্রেষ্ঠ ভালোবাসা নয়। বরং সর্বশ্রেষ্ঠ ভালোবাসা হচ্ছে আল্লাহকে ভালোবাসা। যে সত্তা আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, অস্তিত্বে এনেছেন, আপনাকে সুন্দর রূপ ও দেহাবয়ব দিয়েছেন, হাজারও অনুগ্রহে আপনার জীবন সমৃদ্ধ করেছেন, প্রতিটি নিঃশ্বাসে, প্রতিটি মুহূর্তে আপনি যার মুখাপেক্ষী, যিনি আপনাকে সুরক্ষিত রাখেন, আপনার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করেন, তিনি আপনার ভালোবাসার সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত। ফলে প্রত্যেক মুমিনের জন্য আল্লাহকে ভালোবাসা অপরিহার্য। এই ভালোবাসা জগতের সকল ভালোবাসার উর্ধ্বে। এই ভালোবাসার সামনে জগতের সবার ভালোবাসা, সকল ভালোবাসা ম্লান। কুরআনে আল্লাহর ভালোবাসাকে ঈমান ও কুফরের মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ.

অর্থ: 'আর এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনই ভালোবাসা পোষণ করে, যেমন ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, আল্লাহর প্রতি তাদের ভালোবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশি।' [বাকারা: ১৬৫] মুমিনদের এই ভালোবাসার কারণে আল্লাহ তাদেরও ভালোবাসেন, মহব্বত করেন। পরকালে তিনি তাদের জান্নাত দান করবেন। দিদাদের সৌভাগ্য ও সুযোগ দেবেন। বিপরীতে কাফেররা যেসব মূর্তি ও ব্যক্তিকে ভালোবাসে, যাদের পূজা করে, কিয়ামতের দিন সবাই তাদের অস্বীকার করবে। আল্লাহ বলেন,

وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ.

অর্থ: 'যখন মানুষকে হাশরে একত্র করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হবে এবং তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে।' [আহকাফ: ৬] অন্য আয়াতে বলেন,

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ.

অর্থ: 'তিনি বললেন, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা রক্ষার জন্য তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে প্রতিমাগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ। এর পর কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে লানত করবে। তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না।' [আনকাবুত: ২৫]

এই ভালোবাসা আপনাকে এবং আপনার অন্য সকল ভালোবাসাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আপনি আল্লাহকে ভালোবাসলে আল্লাহ যা ভালোবাসেন আপনিও তা-ই ভালোবাসবেন, আল্লাহ যা ঘৃণা করেন আপনিও তা ঘৃণা করবেন, আল্লাহ যাকে ভালোবাসতে বলেন আপনি তাকে ভালোবাসবেন, আল্লাহ যার থেকে দূরে থাকতে বলেন আপনি তার থেকে দূরে থাকবেন, তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। এটাকে বলা হয় আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা রাখা। ফলে আপনার ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু হবে মুমিনগণ, আর আপনার ঘৃণার পাত্র হবে কাফেররা। তাওহিদবাদীদের ইমাম ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এখানেও আমাদের আদর্শ। তিনি আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতার বিরল নজির স্থাপন করেছেন। আল্লাহ বলেন,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ.

অর্থ: 'তোমাদের জন্য ইবরাহিম ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করো, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের অস্বীকার করলাম। তোমাদের ও আমাদের মাঝে শুরু হলো চিরশত্রুতা, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।' [মুমতাহিনা: ৪]

মুমিনদের প্রতি কীভাবে ভালোবাসা রাখতে হয় আল্লাহ আমাদের সে দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন,

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ: 'আর যারা তাদের পরে আগমন করেছে তারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের এবং ভ্রাতাদের যারা আমাদের অগ্রে ঈমান এনেছে, ক্ষমা করুন। আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।' [হাশর: ১০] কাফেরদের ঘৃণার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ.

অর্থ: 'হে মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তারা তা অস্বীকার করেছে।' [মুমতাহিনা: ১] অন্য এক আয়াতে কাফেরদের প্রতি বিদ্বেষ মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করে বলেন,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْۤا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অর্থ: 'যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদের আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা নিকটাত্মীয় হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদের শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রেখো, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।' [মুজাদালাহ: ২২]

এ ভালোবাসাটা স্রেফ ইহকালের নয়, বরং পরকালের সঙ্গেও সম্পৃক্ত। পরকালে শুধু এই ভালোবাসাই কাজে আসবে। পার্থিব স্বার্থের জন্য পৃথিবীতে যারা একে অপরকে ভালোবেসেছে, সেখানে তারা শত্রু হয়ে যাবে। আর যারা ঈমানের ভিত্তিতে একে অপরকে ভালোবেসেছে, তাদের বন্ধন অটুট থাকবে, তারা একে অপরের উপকারে আসবে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন মুমিন ও কাফেরদের বন্ধুত্বের ব্যাপারে বলেন,

اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ.

অর্থ: 'বন্ধুবর্গ সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, তবে মুত্তাকিগণ নয়।' [জুখরুফ: ৬৭] অপরদিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনদের ভালোবাসার সুফল সম্পর্কে বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন বলবেন, তারা কোথায় যারা আমার জন্য একে অপরকে ভালোবাসে? তাদের আজ আমার ছায়ায় ছায়া দান করব যেদিন আমার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া নেই।'[১] আরেক হাদিসে এসেছে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহর এমন কিছু বান্দা রয়েছে, যাদের জন্য কিয়ামতের দিন নুরের মিম্বার প্রস্তুত করা হবে, অথচ তারা নবি নন শহিদও নন; বরং নবি ও শহিদগণ তাদের দেখে ঈর্ষা করবেন।' সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারা কারা?' তিনি বললেন, 'যারা আল্লাহর জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে।'[২] অন্য একটি হাদিসে বলেছেন, 'সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার ছায়ায় ছায়া দেবেন যেদিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না: এক. ন্যায়পরায়ণ শাসক। দুই. সেই যুবক যে আল্লাহর ইবাদতের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে। তিন. সেই লোক যার হৃদয় সর্বদা মসজিদের সঙ্গে লেগে থাকত। চার. **সেই দুজন মানুষ যারা আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবেসেছে, আল্লাহর জন্য তারা মিলিত হয়েছে, আল্লাহর জন্য বিচ্ছিন্ন হয়েছে।** পাঁচ. সেই লোক যাকে সুন্দরী ও সম্ভ্রান্ত কোন নারী ডেকেছে, কিন্তু সে জবাবে বলেছে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। ছয়. সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর জন্য এমনভাবে দান করেছে যে, তার বাম হাত জানতে পারেনি ডান হাত কী দান করেছে। সাত. সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে নির্জনে ডেকেছে আর যাতে তার চোখের অশ্রু ঝরেছে।'[৩] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তিনটি বিষয় যার মাঝে থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করবে: যে আল্লাহ ও তাঁর

১. মুসলিম (২৫৬৬); ইবনে হিব্বান (৫৭৪)।
২. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (৩৪৩৪); তিরমিজি (২৩৯০); মুসনাদে আহমদ (২২৫০৬)।
৩. বুখারি (৬৬০, ১৪২৩); মুসলিম (১০৩১)।

রাসুলকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসবে, ফলে তার কাছে তাদের দুজনের চেয়ে আর কেউ প্রিয় হবে না। যে অন্যকে কেবল আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে। আর যাকে আল্লাহ কুফর থেকে রক্ষা করার পরে সেখানে ফিরে যাওয়াকে ততটা অপছন্দ করবে, যতটা আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।'[১]

অনেকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য বিদ্বেষকে নফল ইবাদত মনে করে। কারও কারও ধারণা, এটা অলি-আওলিয়া ও বুজুর্গদের কাজ; সাধারণ মানুষের এগুলো না হলেও চলে। অথচ বাস্তবতা এমন নয়, বরং এটা ঈমান ও কুফরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এখানে ভলোবাসা ঠিক থাকলে একজন মানুষ নবি, নবি-রাসুল ও পুণ্যবানদের সঙ্গে জান্নাতে স্থান পেতে পারে। আবার এখানে জটিলতার ফলে জাহান্নামে কাফেরদের সঙ্গে থাকতে হতে পারে। শরিয়তে এটাকে 'ওয়ালা-বারা' বলা হয়। আজকের মুসলমানরা এটা না বোঝার ফলে উদভ্রান্তের মতো ঘুরছে। কাকে ভালোবাসবে আর কার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে—এমন কোনো মূলনীতি নেই তাদের কাছে। ফলে খারাপ মানুষদের ভালোবাসছে, ভালো মানুষদের প্রতি বিদ্বেষ রাখছে। পার্থিব স্বার্থের জন্য অশিক্ষিত, অসভ্য, জালেম, খেয়ানতকারী, মিথ্যুক ও পাপী লোকদের পছন্দ করছে, তাদের সান্নিধ্যে সময় কাটাচ্ছে। অপরদিকে ধর্মপ্রাণ, আমানতদার ও সত্যবাদী লোকদের ঘৃণা করছে, তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখছে। অথচ হওয়ার দরকর ছিল উলটো। এরচেয়েও জঘন্য হলো যারা মুসলমানদের বাদ দিয়ে কাফেরদের বেশি ভালোবাসে, যাদের কাছে মুমিনদের চেয়ে নাস্তিক, খ্রিষ্টান ও পৌত্তলিকরা বেশি প্রিয়, পর্দাশীন নারী যাদের কাছে ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র, নগ্ন-অর্ধনগ্নরা সম্মানের পাত্র, প্রগতিশীলতার প্রতীক, ধর্মহীন মানুষ যাদের আত্মার আত্মীয়, জীবনের আদর্শ, অপরদিকে আলিম ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দেখলে যাদের গায়ে কাঁটা দেয়, ইসলামের নিদর্শনাবলির চেয়ে কুফরের নিদর্শনাবলি যাদের কাছে বেশি প্রিয়, বরং যাদের সমস্ত ভালোবাসার মানদণ্ড হলো বস্তুবাদী স্বার্থ। স্বার্থ উদ্ধার হলে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় কাফেরকে তারা ভালোবাসতে দ্বিধা করে না। আর স্বার্থ না থাকলে মুমিন-মুসলমানকে ঘৃণা করতে দ্বিধাবোধ করে না। এমন ভালোবাসা যুগপৎ ঈমান ও নৈতিকতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ঈমানের ভিত্তিতে ভালোবাসা হারানোর ফলেই আজ উম্মাহ ভালোবাসার মিসকিন।

---

১. বুখারি (১৬, ২১); মুসলিম (৪৩)।

'আল্লাহ ভালো জানেন' বলার অভ্যাস গড়ুন: আজ মুসলিম উম্মাহ যেসব রোগে আক্রান্ত অথচ মুমিনদের যেগুলো থেকে অনেক দূরে থাকা উচিত ছিল তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জ্ঞানগত অহংকার। আজ সবাই জানে, সবকিছু জানে। আমাদের প্রত্যেকে আজ একেকজন জ্ঞানের সাত-সমুদ্দুর। ফলে অনলাইনে অফলাইনে টেলিভিশনের পর্দায় ওয়াজের মঞ্চে মাদরাসায় মসজিদে রাস্তায় বা মাঠে আপনি যাকে যেকোনো জায়গায় যেকোনো প্রশ্ন করবেন, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেয়ে যাবেন। এমন মানুষ খুব কমই পাওয়া যাবে যাদের প্রশ্ন করার পরে বলবে, 'আমি জানি না' অথবা 'আল্লাহ ভালো জানেন'। অথচ এটা ইসলামের দীক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিশেষত আকিদার ক্ষেত্রে কথা বলায় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন জরুরি ছিল। অথচ আজ আকিদা নিয়ে যার যা ইচ্ছা বলে বেড়াচ্ছে।

ইসলাম আমাদের না জেনে অনুমানভিত্তিক ও আন্দাজের উপর ভর করে কোনোকিছু বলতে বারণ করেছে। পবিত্র কুরআনে একাধিক আয়াতে বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

অর্থ: 'আপনি বলুন, আমার পালনকর্তা কেবল অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গুনাহ, অন্যায়-অত্যাচার। আর (হারাম করেছেন) আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি। আর (হারাম করেছেন) আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জানো না।' [আরাফ: ৩৩] অন্য আয়াতে বলেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.

অর্থ: 'যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সেটার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয় এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।' [ইসরা: ৩৬]।

আমরা যদি আল্লাহর রাসুলের সিরাত এবং সালাফের জীবনের দিকে দৃষ্টি দিই, সেখানে এই দীক্ষার সুস্পষ্ট বাস্তবায়ন দেখব। এমনকি আল্লাহর রাসুলকে অনেক সময় প্রশ্ন করা হলে তিনি ওহির অপেক্ষা করতেন। যতক্ষণ ওহি না আসত, তিনি জবাব দিতেন না, আন্দাজে কিছু বলতেন না। সুরা কাহাফে এসেছে, কাফেররা যখন আল্লাহর

রাসুলকে জিজ্ঞাসা করল আসহাবে কাহাফ কত দিন তাদের গুহাতে অবস্থান করেছিল, তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে বলতে বলেন,

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ.

অর্থ: 'আপনি বলুন, আল্লাহ ভালো জানেন তারা কতদিন তথায় অবস্থান করেছে। আকাশ ও জমিনের সকল অদৃশ্যের জ্ঞান তার কাছে।' [কাহাফ: ২৬] আবার যখন তাদের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় আল্লাহ বলেন,

قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ

অর্থ: 'আপনি বলে দিন, তাদের সংখ্যা সম্পর্কে আমার প্রতিপালক ভালো জানেন।' [কাহাফ: ২২] একইভাবে সাহাবায়ে কেরামকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে, তারা না জানলে সবসময় বলতেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভালো জানেন।' বরং অনেক সময় জানলেও বলতেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভালো জানেন।' এমন একটা ঘটনাও পাওয়া যায় না, যেখানে তারা আন্দাজে কোনো উত্তর দিয়েছেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন পৃথিবীর সর্বোত্তম শিক্ষক, আর তারা ছিলেন সর্বোত্তম শিক্ষার্থী।

পরবর্তী যুগেও এই সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য অব্যাহত ছিল। ইমাম মালেক থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি অনেক দূর থেকে তার কাছে এসে চল্লিশটি প্রশ্ন করল। ইমাম মালেক সেগুলোর ভিতর থেকে মাত্র কয়েকটির উত্তর দিলেন। আর বাকিগুলোর ক্ষেত্রে বললেন, 'আমি জানি না'। লোকটি বলল, আমি এতদূর থেকে এসেছি আর আপনি বলছেন 'আমি জানি না'? ফিরে গিয়ে আমার কওমকে কী জবাব দেবো? তিনি বললেন, 'বলবে, মালেক জানে না। মালেকের ছাত্র ইবনে ওয়াহব বলেন, অধিকাংশ সময়ই তাকে বলতে শুনতাম 'আমি জানি না'। তাকে যতবার 'আমি জানি না' বলতে শুনেছি, ওগুলো লিখলে সব খাতাপত্র ভরে যেত।'[১] অর্থাৎ আমাদের সালাফ 'জানি না' শব্দ বলতে কোনোরকম কুণ্ঠিত হতেন না, লজ্জা পেতেন না। কারণ, তারা প্রকৃত অর্থেই জ্ঞানী ছিলেন। ফলে নিজেদের সীমাবদ্ধতা জানতেন। ইমাম মালেক বলতেন, 'আমি জানি না' বলা হচ্ছে আলিমের ঢালস্বরূপ। যখন সে এটা খুইয়ে ফেলবে, তার মাথা খোয়াবে।[২]

---

১. জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহি, ইবনে আবদুল বার (২/১১৭)।
২. আল-ইনতিকা, ইবন আবদুল বার (৩৭)।

কিন্তু বর্তমানে প্রকৃত জ্ঞানীর সংখ্যা কমে যাওয়াতে জ্ঞানীর ভাবধরা মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। এ জন্য 'জানি না' এ-রকম উত্তর সচরাচর শোনাই যায় না। অথচ মুমিনদের এর বিপরীত হওয়া দরকার ছিল। বিশেষ করে আকিদা এবং ফিকহ তথা মাসআলাগুলোতে সুনিশ্চিত জবাব না জানলে 'আল্লাহ ভালো জানেন' এটাই বলা উচিত। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হলো, কেবল আলিম-সমাজ নন, বরং সাধারণ শিক্ষিত মানুষ, যাদের দ্বীন সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানটুকু নেই, তারাও কুরআন-সুন্নাহর বিভিন্ন জটিল বিষয়ে যাচ্ছেতাই বলে যাচ্ছেন। বরং মূর্খ রাজনীতিক, দ্বীন সম্পর্কে যাদের সর্বনিম্ন অক্ষরজ্ঞানটুকুও নেই, দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে ফাতাওয়া দেয়, জায়েজ-নাজায়েজ ঘোষণা করে। এগুলো একটা জাতির নৈতিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত পরিণতি প্রকটভাবে তুলে ধরে। বিনয় মানুষের জ্ঞান বাড়ায়। যে যত বেশি নত হবে, আল্লাহ তাকে তত বেশি উন্নত করবেন। ফলে দেখা যায়, যারা মানুষের সামনে 'জানি না' বলার অভ্যাস গড়েন, মানুষ তাদের পিছনে সম্মান করে, তাদের উপর আস্থা রাখে। আর যারা না জেনেও জানার ভাব নেয়, আন্দাজে উত্তর দেয়, মানুষ তাদের ওজন বুঝে ফেলে। একসময় তারা অপদস্থ হয়।

وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ.

আমরা সুন্নাহর আলোকে ঘরে ও সফরে মোজার উপর মাসাহ জায়েজ মনে করি।

ব্যাখ্যা

মোজার উপর মাসাহ আহলে সুন্নাতের নিদর্শন: এটি একটি ফিকহি মাসআলা, তথাপি আহলে সুন্নাতের আকিদার অধিকাংশ গ্রন্থেই মাসআলাটি আলোচিত হয়। কারণ, কিছু বিভ্রান্ত সম্প্রদায় এটাকে অস্বীকার করে; অথচ এটা মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তাদের খণ্ডনের লক্ষ্যে এবং তাদের বিভ্রান্তি থেকে আহলে সুন্নাতকে পৃথক করার উদ্দেশ্যে ইমামগণ আকিদার কিতাবে এটা নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। ফলে এটা ফিকহি মাসআলা হওয়া সত্ত্বেও আহলে সুন্নাত ও আহলে বিদআতের আকিদার পরিচয়নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। যারা এটাকে স্বীকার করবে, তারা আহলে সুন্নাত; যারা অস্বীকার করবে, তারা আহলে বিদআত।

যেসব সম্প্রদায় মোজার উপর মাসাহ অস্বীকার করে, তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে খারেজি ও শিয়া-রাফেজি সম্প্রদায়।[১] তারা বলে, মোজার উপর মাসাহ করার সুযোগ নেই; শরিয়তে এমন কিছু আসেনি; বরং পায়ের উপর মাসাহ করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিষয় অস্বীকার করে তারা কয়েকটি বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়: **এক**. মোজার উপর মাসাহ-সংক্রান্ত একাধিক বিশুদ্ধ হাদিস (যা মুতাওয়াতির তথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত) অস্বীকার করে। **দুই**. ওজুতে পা ধোয়াসংক্রান্ত আয়াতের অপব্যাখ্যা করে পা মাসাহ করার কথা বলে। **তিন**. যেসব সাহাবি মোজার উপর মাসাহ করেছেন, সেগুলোকে পা মাসাহের কথা বলে চালিয়ে দেয়। **চার**. সেসব সাহাবির হাদিস দিয়ে দলিল দেয়, যারা প্রথমে না জানার কারণে পা মাসাহের কথা বলেছেন।

১. আস-সুন্নাহ, মারওয়াজি (১০৩)।

পরবর্তী সময়ে তারাও পা ধৌত করেন। **পাঁচ.** ওজুতে পা ধোয়ার বদলে মাসাহ করে। এভাবে তারা সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে বিদআতে লিপ্ত হয়েছে।

আহলে সুন্নাতের সকল ধারার আলিমদের মতে, পা ধোয়া এবং মাসাহ করতে চাইলে মোজার উপর মাসাহ করা (সরাসরি পায়ের উপর নয়) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। হাসান বসরি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি সত্তরজন সাহাবিকে পেয়েছি, যাদের প্রত্যেকেই মোজার উপর মাসাহ করতেন। আবু বকর, উমর, উসমান, আলি, আহলে বদর, আহলে হুদাইবিয়াহ, অন্যান্য মুহাজির ও আনসার—সবাই মোজার উপর মাসাহ করতেন।'[১] ইমাম কারখি বলেন, 'যে ব্যক্তি মোজার উপর মাসাহ অস্বীকার করে, তার ব্যাপারে আমার কুফরের ভয় হয়।'[২]

তারা আরবি ব্যাকরণকে ঢাল বানিয়ে এবং সালাফের কিছু মানুষের বক্তব্য দিয়ে তাদের মতামতকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ.

অর্থ: 'হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নামাজের জন্য প্রস্তুত হও, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত করো। মাথা মাসাহ করো, আর পদযুগল (ধৌত করো) গোড়ালি-সহ।' [মায়িদা:৬] উক্ত আয়াতে পা ধোয়ার কথা মাথা মাসাহের পরে এসেছে امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ। কিন্তু পায়ের ক্ষেত্রে 'ধোয়া' শব্দটি উচ্চারণ করা হয়নি, প্রয়োজনও নেই। কারণ, সেটার 'আতফ' হবে মুখমণ্ডল ও হাতের উপর, মাথার উপর নয়। দু-একজন বাদে সকল সাহাবি ও তাবেয়ি-সহ সকল মুসলমান কুরআনের আয়াতটিকে এভাবে পড়েছেন এবং ওজুতে পা ধোয়া বুঝেছেন। সাহাবায়ে কেরাম ওজু, মোজার উপর মাসাহ ইত্যাদি বিষয় নিজেরা নিজেরা কুরআন-হাদিস পড়ে কিংবা আরবি ব্যাকরণের নিয়ম ধরে শেখেননি। কারও কাছ থেকে শুনে শেখেননি; বরং তারা আল্লাহর রাসুলকে বছরের পর বছর ওজু করতে দেখেছেন। তাকে মুখ, হাত ও পা ধুতে এবং মাথা মাসাহ করতে দেখেছেন। দেখে দেখে শিখেছেন। একাধিক সাহাবি থেকে হাদিসে এসেছে, 'আমি কি তোমাদের সেভাবে

১. আল-ইসতিজকার, ইবনে আবদুল বার (১/২১৭)।
২. গজনবি (১৩৩)।

ওজু করে দেখাব না যেভাবে আমি রাসুলুল্লাহকে ওজু করতে দেখেছি?' কিংবা 'এটা রাসুলুল্লাহর ওজু।'[১]

হ্যাঁ, ইবনে আব্বাস রাজি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন 'আমি কুরআনে দেখি দুটো অঙ্গ ধোয়া (মুখ ও হাত) এবং দুটো অঙ্গ মাসাহ (মাথা ও পা)-এর কথা।' কারণ, তিনি 'পা'কে মাথার উপর 'আতফ' করতেন। কিন্তু সেটা বাস্তবতা না জানার ফলে। যখন জানতে পারেন, তখন তিনি অন্যদের মতো পা ধোয়ার কথা বলেন।[২] বরং সহিহ বুখারিতে খোদ তাঁর ওজুর কথা এসেছে। তিনি দুই পা ধুয়ে বলেন, আমি রাসুলুল্লাহকে এভাবে ওজু করতে দেখেছি।[৩] একইভাবে আনাস, রিফায়াহ প্রমুখ সাহাবি থেকেও পা মাসাহের কথা এসেছে। কিন্তু সেগুলো তখনকার, যখন তারা ধোয়ার কথা জানতেন না। পরবর্তীকালে তারা মত পরিবর্তন করে ধোয়ার কথা বলেন।[৪] আলি রাজি. এবং অন্যান্য সাহাবি থেকে পা মাসাহের যেসব বর্ণনা এসেছে, সেটা ধোয়ার বদলে, সরাসরি পা মাসাহ নয়। বরং মোজার উপর মাসাহ।[৫] যারা ওজুতে পা ধৌত করে না, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের পায়ের গোড়ালিকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করেছেন।[৬] ফলে ওজুতে পা না ধুয়ে মাসাহ করা সাহাবা ও মুসলমানদের ইজমার খিলাফ।[৭] কাসানি (৫৮৭ হি.) লিখেন, সকল সাহাবা ও ফকিহের কাছে মোজার উপর মাসাহ জায়েজ। ইবনে আব্বাস থেকে সামান্য ব্যতিক্রম বর্ণনা পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এটা রাফেজিদের মাজহাবে পরিণত হয়েছে।[৮]

শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার লিখেন, মুতাওয়াতির সূত্রে রাসুলুল্লাহর ওজুর বর্ণনা পাওয়া যায়। তাতে স্পষ্ট যে, তিনি তার দুই পা ধৌত করেছেন। একজন সাহাবি থেকেও এর বিপরীত বর্ণনা প্রমাণিত নয়। হ্যাঁ আলি, ইবনে আব্বাস, আনাস—এই তিনজন থেকে বিপরীত (পা মাসাহের) বর্ণনা এসেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা তাদের মত পরিবর্তন করে সকল সাহাবার মতো মত দিয়েছেন। আবদুর রহমান ইবনে আবি

---

১. মুসলিম (২৩৫, ২৪৬); বুখারি (১৪০, ১৮৬,১৯৩৪); আবু দাউদ (১১৪); ইবনে খুজাইমা (১৬); (১৩৬১)।
২. সুনানে কুবরা, বাইহাকি (৩৪০)।
৩. বুখারি (১৪০)।
৪. বিস্তারিত দেখুন: শরহুল মুহাজ্জাব, নববি (১/৪২১)।
৫. ইবনে মাজা (৪৬০); সুনানে কুবরা, বাইহাকি (১৪১১)।
৬. বুখারি (৬০, ১৬৩); মুসলিম (২৪১)।
৭. শরহুল মুহাজ্জাব (১/৪১৭)।
৮. বাদায়েউস সানায়ে (১/৭)।

লাইলা বলেন, রাসুলুল্লাহর সাহাবাগণ পা ধোয়ার ব্যাপারে একমত ছিলেন। ইমাম ত্বহাবি ও ইবনে হাজম রাহি. মনে করেন, প্রথমে মাসাহ বৈধ ছিল। পরবর্তীকালে সেটা মানসুখ (রহিত) হয়ে যায়।[১] সুতরাং পা ধোয়া অপরিহার্য। মাসাহ করতে হলে সরাসরি পা মাসাহ নয়, বরং মোজার উপর মাসাহ করতে হবে।

উল্লেখ্য, শরিয়তের বিধানমতে, পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করলে মুকিম তথা বাড়িতে থাকাকালীন একটানা এক দিন এক রাত মাসাহ করা যাবে; আর সফরে থাকা অবস্থায় তিন দিন তিন রাত মাসাহ করা যাবে। বিস্তারিত ফিকহের গ্রন্থাবলিতে দেখা যেতে পারে।

১. ফাতহুল বারি (১/২৬৬)।

وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ مَعَ أُولِي الأَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ لاَ يُبْطِلُهُمَا شَيْءٌ وَلاَ يَنْقُضُهُمَا.

মুসলিম শাসকদের অধীনে—তারা সৎ কিংবা অসৎ হোক—কিয়ামত পর্যন্ত হজ এবং জিহাদ অব্যাহত থাকবে। কোনোকিছুই এ দুটোকে বাতিল করতে পারবে না, নাকচ করতে পারবে না।

ব্যাখ্যা

জিহাদ ও কিতাল

জিহাদ ইসলামের চূড়া: জিহাদ ইসলামের প্রথম সারির ইবাদতগুলোর একটি। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। হক ও হক্কানিয়্যাতের দুর্গ সুরক্ষার অতন্দ্র প্রহরী। তাওহিদ, সত্য, ইনসাফ ও ইনসানিয়্যাতের রক্ষাকবচ। সকল নবি-রাসুলের সুন্নাহ ও আদর্শ। যতদিন জিহাদ থাকবে, ততদিন পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন, সত্য ও ন্যায়ের বিজয় অব্যাহত থাকবে। যখন মুসলমানরা জিহাদ ছেড়ে দেবে, আল্লাহ তাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন; জীবন ও জগতের সর্বত্র তারা পরাজিত হবে; আল্লাহর দ্বীনের ঝান্ডা অবনত হয়ে যাবে; শয়তান ও তার অনুসারীদের পতাকা উঁচু হবে; সত্য ও সততা, ন্যায় ও ইনসাফের পরাজয় ঘটবে; পৃথিবীর সর্বত্র বিশৃঙ্খলা বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে। কারণ, জগতের একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য হলো, কেবল মিষ্টি কথা কিংবা সোহাগের মাধ্যমে সকল অন্যায় রোখা সম্ভব নয়। ফলে দুষ্টের দমনে জিহাদের আবশ্যকতা কেবল ধর্মীয় নয়, মানবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রমাণিত।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে মুসলমানদের জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি মুমিনদের সরাসরি জিহাদে নামার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ: 'তোমরা বের হয়ে পড়ো স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে। এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পারো।' [তাওবা: ৪১] জিহাদকে আল্লাহ তায়ালা কল্যাণকর ও লাভজনক সওদা উল্লেখ করে সেটার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহ বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ. تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ: 'হে মুমিনগণ, আমি কি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেবো, যা তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বোঝো।' [সফ: ১০-১১] মুমিনদের প্রাণকে আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। ফলে তাদের কর্তব্য হলো আল্লাহর পথে তা উৎসর্গ করা। এই পবিত্র সওদা-প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

অর্থ: 'আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে, অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হলো মহা সাফল্য।' [তাওবা: ১১১] মুজাহিদদের প্রকৃত মুমিন উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْۤا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ.

অর্থ: 'আর যারা ঈমান এনেছে, নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়েছে, আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদের আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে, তাঁরাই হলো সত্যিকার মুমিন। তাঁদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজিক।' [আনফাল: ৭৪] আল্লাহ তাঁর নিজের কাছে মুজাহিদদের মর্তবা উল্লেখ করে বলেন,

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ.

অর্থ: যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে, আর তারাই সফলকাম।' [তাওবা: ২০] মুজাহিদদের ভালোবাসা-প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন:

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ.

অর্থ: 'আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সিসাঢালা প্রাচীর।' [সফ: ৪] অন্যত্র বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ.

অর্থ: 'হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনীত হবে এবং কাফেরদের প্রতি দুর্বিনীত হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কার ভয় পাবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।' [মায়িদা: ৫৪]

পৃথিবীর মাজলুম মানুষের সুরক্ষার জন্য মুসলমানদের আল্লাহ ডেকে বলেন,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا.

অর্থ: 'তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের এই অত্যাচারী জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করুন। আর আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করে দিন। আর একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করে দিন।'

[নিসা: ৭৫] এটি কুরআনের একটি মহা মাহাত্ম্যপূর্ণ আয়াত, যা পৃথিবীর সব ভূখণ্ডের সকল মুসলিমকে এক পরিবারের মতো বানিয়ে দিয়েছে; সবার দায়িত্ব সবার কাঁধে বন্টন করে দিয়েছে। এ আয়াতের আলোকে ফিলিস্তিন কিংবা সিরিয়ার একটি মুসলিম শিশুকে সুরক্ষার দায়িত্ব বর্তাবে আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও তাজিকিস্তানের মুসলমানদের উপর; উইঘুর, কাশ্মীর কিংবা আরাকানের এক বোনকে সুরক্ষার দায়িত্ব যাবে সৌদি আরব, মিশর ও মরক্কোর মুসলমান ভাইদের কাঁধে। কারণ, গোটা পৃথিবী মুসলমানদের। ভৌগোলিক, জাতিগত ও ভাষাগত সীমাবদ্ধতা জাহেলিয়্যাতের প্রাচীর। মুসলমানদের এগুলো আলাদা করতে পারে না।

জিহাদের শ্রেষ্ঠত্ব, মুজাহিদদের মর্যাদা, কিতালের গুরুত্ব, জিহাদ ও কিতালের প্রতি সাধারণ মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এত অধিক সংখ্যক হাদিস বর্ণিত হয়েছে যে, সেগুলো উল্লেখ করতে গেলে কয়েক খণ্ডের বই হয়ে যাবে। আমরা তাই এখানে মাত্র কয়েকটা হাদিস উল্লেখ করছি, যাতে মুসলিম-অমুসলিমের মাঝে সমানভাবে বিদ্যমান জিহাদফোবিয়ার এই যুগে জিহাদের শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে ওঠে।

- মুআজ ইবনে জাবাল থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া হলো আল্লাহর পথে জিহাদ করা।'[১]

- আবু হুরাইরা রাজি. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসুলের কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা জিহাদের সমপর্যায়ের।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এমন আমল নেই। একজন মুজাহিদ আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে যাওয়ার পরে তুমি কি পারবে মসজিদে গিয়ে কোনোরকম বিশ্রাম ছাড়া একটানা নামাজ পড়তে এবং ভাঙা ছাড়া একটানা রোজা রাখতে?' তখন সে বলল, 'এটা কে পারবে?' আবু হুরাইরা বলেন, 'মুজাহিদের বাঁধা ঘোড়া যখন একটু হাঁটাহাঁটি করে, এর বিনিময়েও তার পুণ্য লেখা হতে থাকে।'[২]

- আরেক হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর ঈমান আনবে, নামাজ কায়েম করবে, রমজানের রোজা রাখবে, তাকে আল্লাহ নিজ দায়িত্বে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, চাই

১. মুসনাদে আহমদ (২২৪৭৫); আল মুজামুল কাবির (৭৮৮৫)।
২. বুখারি (২৭৮৫); সুনানে কুবরা, নাসায়ি (৪৩২১)।

সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক, অথবা নিজের জন্মভূমিতে বসে থাকুক।' তখন সাহাবারা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, তা হলে আমরা কি মানুষকে এ ব্যাপারে সুসংবাদ দেবো না?' তিনি বললেন, 'জান্নাতের একশোটি স্তর রয়েছে। আল্লাহ সেগুলো তার পথে জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করেছেন। দুটি স্তরের মাঝে দূরত্ব আকাশ ও মাটির ব্যবধান পরিমাণ। যখন তোমরা আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করো, তখন ফিরদাউস প্রার্থনা করো। কেননা সেটা মধ্যবর্তী এবং সর্বোচ্চ জান্নাত। আর তার উপরে রয়েছে আল্লাহর আরশ।'[১]

- আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহর পথে এক সকাল কিংবা এক সন্ধ্যা কাটানো গোটা দুনিয়া এবং এর মাঝে যা-কিছু রয়েছে ,তারচেয়ে উত্তম।'[২]

- আরেকটি হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য এত নিয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছেন যে, মৃত্যুর পরে পুরা দুনিয়া দিয়ে দেওয়া হলেও কেউ দুনিয়াতে ফেরত আসতে চাইবে না। তবে শহিদ এর ব্যতিক্রম। কারণ, শাহাদাতের মর্যাদা এত বেশি যে, শহিদ জান্নাতে থেকেও পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে এসে আবার শহিদ হতে চাইবে।'[৩]

- আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি, 'যদি মুমিনদের একটি দল না থাকত, যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চায়, কিন্তু আমি তাদের বাহন দিতে পারি না (ফলে তারা অংশগ্রহণ করতে পারে না), তবে আমি আল্লাহর পথে জিহাদকারী কোনো দলের সঙ্গে বের হওয়া থেকে বিরত থাকতাম না। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আমি তো চাই যে, আমি আল্লাহর পথে শহিদ হব, আবার জীবিত হব; আবার শহিদ হব, আবার জীবিত হব; আবার শহিদ হব, আবার জীবিত হব, আবার শহিদ হব।'[৪]

- অন্য হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে বান্দার দুই পা আল্লাহর পথের ধুলোয় ধূসরিত হয়, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।'[৫]

---

১. বুখারি (২৭৯০); বাজ্জার (৮৭১১); ইবনে হিব্বান (৪৬১১)।
২. বুখারি (২৭৯২); মুসলিম (১৮৮০)।
৩. বুখারি (২৭৯৫); তিরমিজি (১৬৪৩)।
৪. বুখারি (২৭৮২, ৭২২৭); মুসনাদে হুমাইদি (১০৭০); বাজ্জার (৭৬৭০)।
৫. বুখারি (২৮১১); সুনানে কুবরা, বাইহাকি (১৮৫৮৬)।

- জিহাদে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে ঘোড়াও আল্লাহর কাছে সম্মানিত প্রাণী। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ঘোড়ার কপালের কেশগুচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ রাখা হয়েছে।'[১] এই হাদিসের মাধ্যমে এটাও বোঝা যায়, আল্লাহর বান্দারা কিয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধে ঘোড়া ব্যবহার করবেন। আর জিহাদও কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।
- জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাজি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দল সত্যের পথে যুদ্ধ করে বিজয়ী থাকবে।'[২]
- জিহাদ পরিত্যাগ করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যখন তোমরা সুদভিত্তিক লেনদেন করবে, গরুর লেজ ধরে চাষাবাদে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, জিহাদ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর এমন লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন, যা থেকে পরিত্রাণ পাবে না, যতক্ষণ না তোমাদের দ্বীনের পথে ফিরে আসবে।'[৩]

জিহাদের অর্থ ও প্রকারভেদ: জিহাদ শব্দের শাব্দিক অর্থ শ্রম দেওয়া, চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যয় করা, সংগ্রাম করা। আল্লাহর পথে ব্যয়িত সব ধরনের সংগ্রাম ও কষ্ট-ক্লেশকে জিহাদ বলা হয়। সে হিসেবে জিহাদের অর্থ বেশ ব্যাপক এবং প্রকারভেদও অনেক। আল্লাহ ও বান্দার মাঝে যা-কিছু অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে, সেসব লঙ্ঘন করে আল্লাহর পথে এগিয়ে যাওয়ার নামই জিহাদ। সুতরাং নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের নাম জিহাদ, শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নাম জিহাদ, দ্বীনের জন্য সম্পদ ব্যয় করা জিহাদ, ইলমের মাধ্যমে ইসলামের দুশমনকে পরাজিত করা জিহাদ, দ্বীনের জন্য মুখে সংগ্রাম করা জিহাদ, লেখালিখি করা জিহাদ, কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে যুদ্ধ করা জিহাদ। আর এ কারণে জিহাদের অর্থের ক্ষেত্রে সালাফের একেক রকম বক্তব্য পাওয়া যায়। বস্তুত জিহাদ এই সবগুলো অর্থকেই ধারণ করে।[৪]

সময় ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে একেক জিহাদের গুরুত্ব ও মান একেক রকম। বরং ব্যক্তিভেদেও জিহাদের বিধান ও গুরুত্ব ভিন্ন ভিন্ন হবে। কখনও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ গুরুত্বপূর্ণ; বরং এটা অন্যান্য জিহাদের উপক্রমণিকা। কারও আত্মা যদি বিশুদ্ধ

---

১. বুখারি (২৮৪৯); মুসলিম (৯৮৭, ১৮৭১)।
২. মুসলিম (১৯২৩); আবু দাউদ (২৪৮৪)।
৩. আবু দাউদ (৩৪৬২); বাজ্জার (৫৮৮৭)।
৪. বাদায়েউস সানায়ে (৭/৯৭)।

ও সুস্থ না থাকে, প্রবৃত্তি যদি নিয়ন্ত্রণে না থাকে, তবে সে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে কীভাবে? তাই হালাল-হারাম মেনে চলা, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা করাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।[১] এ কারণে ইবনে মাসউদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, সময়মতো নামাজ আদায় করা, মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচরণ করা। তৃতীয় পর্যায়ে বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা।[২] ইবনে মাসউদ নামাজে অবহেলা করতেন, কিংবা মাতা-পিতার অবাধ্য ছিলেন, তাই তাকে এমন বলেছেন—এ ধরনের ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট গলদ। বরং অন্যান্য আমলও যে গুরুত্বপূর্ণ সেটা বোঝানো উদ্দেশ্য। যে ঠিক মতো নামাজ পড়ে না, মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচারণ করে না, সে কীভাবে তরবারির জিহাদ করবে, কিংবা তার সে জিহাদের কী মূল্য? তা ছাড়া জিহাদের জন্য নামাজ আসেনি, বরং নামাজ প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ এসেছে। ফলে নামাজ লক্ষ্য, জিহাদ উপলক্ষ্য। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি রাহি. লিখেছেন, জিহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ একটি প্রকার হচ্ছে মানুষের জাহির ও বাতিন সংশোধন করা। এটাই সকল নবির কাজ।[৩]

কখনও আবার কেবল মুখ ও কলমের জিহাদই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসুলকে বলেন,

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا.

অর্থ: 'আর আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না, বরং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর জিহাদ করুন।' [ফুরকান: ৫২] এখানে জিহাদ বলতে দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে কাফেরদের পরাজিত করা উদ্দেশ্য। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সর্বোত্তম জিহাদ হলো অত্যাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলা।[৪]

কিন্তু যখন স্বাভাবিকভাবে জিহাদ শব্দটা ব্যবহার করা হবে, তখন এর দ্বারা তরবারির জিহাদই উদ্দেশ্য হবে। কারণ, সকল প্রকারের জিহাদের মাঝে তরবারির জিহাদ সর্বোত্তম। এতে অন্য সব ধরনের কুরবানি অন্তর্ভুক্ত; বরং জগতের সর্বাপেক্ষা প্রিয় জীবনটাই এখানে বাজি ধরা হয়। দুর্গম পাহাড়ে কিংবা বিজন মরুভূমিতে দুশমনের

---

১. ফাতহুল বারি (১১/৩৩৮); আহসানুল ফাতাওয়া (১/৫৫০)।
২. বুখারি (২৭৮২)।
৩. আত-তাফহিমাত (২/১০৩)।
৪. আবু দাউদ (৪৩৩৫); তিরমিজি (২৩৪৬)।

বিধ্বংসী ড্রোনের জন্য অপেক্ষমাণ মুজাহিদ, আর নিজ ঘরে স্ত্রী-সন্তানদের পাশে গায়ে কম্বল জড়িয়ে কলম কিংবা কী-বোর্ড চাপা মুজাহিদ সমান হতে পারে না।

জিহাদের বিধান: পূর্বে আমরা যেমনটা বলেছি, আল্লাহ তায়ালা জিহাদ তথা কিতালের বিধান দিয়েছেন প্রয়োজন-সাপেক্ষে। অর্থাৎ দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন পূরণে জিহাদ একটি হাতিয়ার, দ্বীন জিহাদের হাতিয়ার নয়। ইমাম আবু হানিফা রাহি. বলেন, জিহাদ মুসলমানদের উপর ওয়াজিব... যখন প্রয়োজন।[১] তাই জিহাদ মানুষের প্রাণ রক্ষার জন্য বৈধ করা হয়েছে, ধ্বংসের জন্য নয়। কারণ, হত্যা ও রক্তপাত মৌলিকভাবে আল্লাহর পছন্দনীয় নয়। আল্লাহ বলেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا.

অর্থ: 'যে ব্যক্তি হত্যার বিনিময় (কিসাস) কিংবা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ব্যতীত একটি প্রাণকে হত্যা করল, সে যেন গোটা মানবজাতিকে হত্যা করল। আর যে একটি প্রাণকে বাঁচাল, সে যেন গোটা মানবজাতিকে বাঁচাল। [মায়িদা: ৩২] তবে দ্বীন জীবনের চেয়ে কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেনই তার দাসত্বের জন্য। ফলে দ্বীনের প্রতিষ্ঠা মানবজীবনের প্রথম উদ্দেশ্য। দ্বীন ব্যতীত মানবজীবন অর্থহীন। ফলে এই দ্বীন প্রতিষ্ঠার সামনে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, তারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপরাধে অপরাধী হবে। আর কিছু প্রাণের জন্য যেহেতু দ্বীন নষ্ট হতে পারে না, পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে না, তাই বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দেওয়া হবে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের হত্যা করা হবে। আল্লাহর রাসুল বলেছেন, 'আমি মানুষের সঙ্গে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল, আর নামাজ আদায় করে, জাকাত প্রদান করে। যখন তারা এগুলো করবে, তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। তবে ইসলামের কোনো হক থাকলে ভিন্ন কথা। আর তাদের অন্তরের হিসাব থাকবে আল্লাহর উপর।'[২]

উপরের আলোচনায় স্পষ্ট যে, জিহাদ আল্লাহর মনোনীন দ্বীন ও এ দ্বীনের অনুসারীদের সুরক্ষার হাতিয়ার। এ কারণে জিহাদের বিধানকে উলামায়ে কেরাম

---

১. শরহুস সিয়ারিল কাবির, সারাখসি (১৮৭)।
২. বুখারি (২৫); মুসলিম (২২); দারাকুতনি (৮৯৮)।

সাধারণভাবে/মৌলিকভাবে **ফরজে কিফায়াহ** বলেন। অর্থাৎ উম্মাহর সবার জিহাদ করতে হবে না। বরং একদল করলে গোটা উম্মাহর পক্ষ থেকে দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে।[১] এটা তখনকার বিধান, যখন মুসলিম রাষ্ট্র ও মুসলিমরা শক্তিশালী থাকবে। এ অবস্থায় খলিফা প্রতি বছর একবার বা দুইবার মুজাহিদদের কিছু দল দুশমনের বিরুদ্ধে পাঠাবেন। তারা পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে আল্লাহর দ্বীনের পতাকা বুলন্দ করবেন। দুশমনদের অন্তরে ইসলামের সম্ভ্রম ও মুসলিমদের প্রভাব ছড়িয়ে দেবেন, তাদের আতংকিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত রাখবেন। মুসলমানরা তাদের দ্বীন কিংবা দায়িত্ব থেকে গাফিল নয় এটা বুঝিয়ে দেবেন। পরিভাষায় এটাকে **জিহাদুত তলব/জিহাদুল ফাতহ/ইকদামি** বা **আক্রমণাত্মক জিহাদ** বলা হয়।[২] এ ধরনের জিহাদে হত্যা কিংবা যুদ্ধই মুখ্য নয়, বরং শত্রুকে তিনটি প্রস্তাব দেওয়া হবে: **এক**. ইসলামের দাওয়াত। **দুই**. ইসলাম অস্বীকার করলে জিজইয়ার মাধ্যমে বশ্যতা স্বীকার। **তিন**. প্রথম দুটো প্রত্যাখ্যান করলে যুদ্ধ। ইবনে আব্বাস রাজি. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো সম্প্রদায়কে ইসলামের দিকে ডাকার আগে যুদ্ধ করেননি।[৩] এর মাধ্যমে বোঝা যায়, এখানে মুখ্য হচ্ছে আল্লাহর দ্বীন, যুদ্ধ নয়। তাই এমন সাধারণ অবস্থায় সকল মুসলিমের উপর এমন জিহাদ ফরজ নয়। বরং দু-একটা দল যদি আদায় করে, তবে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। আর যদি কেউ আদায় না করে, তবে সবাই গুনাহগার হবে।[৪]

দুশমনরা যত ভয়ংকর ও আগ্রাসী হয়ে উঠবে, ধীরে ধীরে জিহাদের পরিসর তত বিস্তৃত হবে। অর্থাৎ পূর্ণ নিরাপত্তার সময় কেবল দু-একটি দলের পক্ষ থেকে জিহাদ করলেই হয়ে যাবে। কিন্তু যখন কোনো ভূখণ্ডের মুসলিম সীমানা আক্রান্ত হবে এবং সেখানের মুসলমানদের পক্ষে শত্রুর মুকাবিলা করা সম্ভব না হবে, তখন আশেপাশের মুসলমানদের উপর তাদের সহায়তা করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। কারণ, তখন একটি দলের মাধ্যমে উদ্দেশ্য পূর্ণ হচ্ছে না। ফলে অন্যদের উপরও ধীরে ধীরে ফরজ হতে থাকবে। এটাকে পরিভাষায় **জিহাদুদ দিফা** বা **প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ** বলা হয়। এক্ষেত্রে আক্রান্ত সীমানা এবং তার আশেপাশের লোকদের উপর জিহাদ **ফরজে আইন** (তথা সবার উপর ফরজ) হয়ে পড়বে। আর যারা তুলনামূলক দূরে থাকবে, তাদের উপর

---

১. শরহুস সিয়ারিল কাবির, সারাখসি (১৮৯); আল-মুগনি, ইবনে কুদামা (৯/১৯৬)।
২. দেখুন: আল-হাবিল কাবির, মাওয়ারদি (১৪/১১২-১১৩)।
৩. মুসনাদে আহমদ (২০৮১); আল মুজামুল কাবির, তাবারানি (১১১৫৯)।
৪. বাদায়েউস সানায়ে (৭/৯৭)।

তখনও ফরজে কিফায়াহ হিসেবে বিবেচিত হবে। লড়াইয়ের পরিধি যত বৃদ্ধি পাবে, ফরজে কিফায়াহ থেকে ফরজে আইনের পরিধিও বিস্তৃত হবে। ফলে যদি পুরো উম্মাহ আক্রান্ত হয়, তবে গোটা উম্মাহর প্রত্যেকের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যাবে। আর কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে শত্রু আক্রমণ করলে সেখানের নারী-পুরুষ প্রত্যেকের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যায়। তখন ইমাম (শাসক) সবাইকে জিহাদের জন্য ডাক দেন। এটাকে বলা হয় **'নাফিরে আম'**। এটা জিহাদের চূড়ান্ত অবস্থা। এমন অবস্থায় শাসকের অনুমতি থাকা জরুরি নয়, বরং শাসক থাকাও জরুরি নয়। কেউ কারও অনুমতি নেওয়া জরুরি নয়; বরং যে যেভাবে পারবে শত্রুকে প্রতিহত করবে।[১]

জিহাদের ক্ষেত্রে দুটি দল বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে: **এক**. যারা এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। ফলে এটাকেই উসিলার পরিবর্তে দ্বীনের মূল (গায়াহ) ধরে নিয়েছে। জিহাদের শর্ত এবং শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বিধি-বিধান লঙ্ঘন করেছে; বরং জিহাদের নামে মুসলমানদের গলায় ছুরি চালিয়েছে, মুসলমানদের ঘর-বাড়ি, লোকালয় ধ্বংস করে দিয়েছে। শত্রুদের বিরুদ্ধেও জিহাদের মূলনীতির তোয়াক্কা করেনি। বরং এটাকে মানুষ জবাই ও তাজা রক্তের তৃষ্ণা মেটানোর মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। উম্মাহর মাসলাহা-মাফসাদার খেয়াল করেনি; ফলে দু-চারজন শত্রুকে হত্যা করলেও হাজার হাজার নিরপরাধ মুসলমান-হত্যার দুয়ার খুলে দিয়েছে। **দুই**. দুশমনের প্রোপাগাণ্ডায় বিভ্রান্ত হয়ে যারা জিহাদ-ফোবিয়ার শিকার হয়েছে, জিহাদকে সন্ত্রাস বানিয়ে দিয়েছে, মুজাহিদদের সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়েছে; অথচ দ্বীনের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা শূন্য। মাসলাহাতের দোহাই দিয়ে নিজেদের পিঠ বাঁচিয়েছে, হিকমতের নাম করে নিজেরা জালিমের পকেটে থেকেছে। কিন্তু যখন কেউ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছে, তাকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যা দিয়েছে। জিহাদকে কেবল দিফায়ি বানানোর মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং বিভিন্ন শর্তের নাম করে উম্মাহর সামনে জিহাদের দরজা পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে। অবস্থা এমন হয়েছে, তাদের অনুসারী একটা প্রজন্ম দাঁড়িয়ে গেছে, যাদের জিহাদের কথা শুনলে ঠিক তেমনই গায়ে কাঁটা লাগে, যেমন লাগে ইসলামের শত্রুদের। মুজাহিদদের নাম শুনলেই বিরক্তিতে তাদের ভ্রু কুঁচকে যায়। দ্বীনের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধানের প্রতি নিফাকি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে অমুসলিম, ইসলামি নামধারী সেকুলার এবং এই শ্রেণির দ্বীনদার লোকগুলো অভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

---

১. তাফসিরে কুরতুবি (৩/৩৮); হিদায়া (২/৩৭৮); আহকামুল কুরআন, জাসসাস (৪/৩১২); তাতারখানিয়া (৭/৮-৯); ফাতহুল বারি (৬/৩৭); আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, ইবনে তাইমিয়া (৫/৫৩৮); রদ্দুল মুহতার (৪/১২২-১২৪); ইলাউস সুনান (১২/১১)।

জিহাদের জন্য কি শাসক শর্ত?: জিহাদ এলোপাতাড়ি হত্যা, রাহাজানি, খুন কিংবা বিশৃঙ্খলার নাম নয়; বরং এটা ইসলামি শরিয়াহর একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাময় ইবাদত। ফলে এটা বাস্তবায়নের জন্য বেশকিছু শর্ত রয়েছে:

এক. নিয়ত ও উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ করা। অর্থাৎ জিহাদ একমাত্র আল্লাহর জন্য, আল্লাহর দ্বীনের কালিমা বুলন্দ করার জন্য হতে হবে। পার্থিব কোনো স্বার্থে জিহাদ করলে সেটা আল্লাহর পথের জিহাদ হবে না। পরকালে এমন মুজাহিদের জন্য পুণ্য নেই, শাস্তি রয়েছে। কারণ, আল্লাহর পথে জিহাদ না হলে সেটা অনর্থক মারামারি ও রক্তপাতে পরিণত হবে। সেক্ষেত্রে মুসলিমের জিহাদ আর অমুসলিমের সন্ত্রাসবাদের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকবে না।

দুই. মুজাহিদদের মাঝে জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য ব্যক্তিগত পর্যায়ের শর্তগুলো বিদ্যমান থাকা। যেমন বালেগ হওয়া, সুস্থ ও সমর্থ হওয়া, মাতা-পিতার অনুমতি থাকা ইত্যাদি।

তিন. ইমামের তত্ত্বাবধানে জিহাদ করা। ইমাম ছাড়া জিহাদ বৈধ নয়। কারণ, ইমাম ছাড়া জিহাদ বিশৃঙ্খলার পথ উন্মুক্ত করে, মুসলমানদের মাঝে ফিতনার দরজা খুলে দেয়। যার যখন ইচ্ছা, যার বিরুদ্ধে ইচ্ছা যুদ্ধের ডাক দেবে, তাদের লোকালয়ে গিয়ে তরবারি চালাবে; এ কারণে জিহাদের ডাক দেবেন খলিফা বা তার নির্ধারিত প্রতিনিধি। তারা জিহাদের আয়োজন করবেন, নেতৃত্ব দেবেন।

প্রশ্ন হলো, সকল জিহাদে কি ইমামের অনুমতি প্রয়োজন? অনেক আলিম জিহাদের ক্ষেত্রে ইমামের অনুমতির শর্ত নিয়ে অতিরঞ্জন করেন। ফলে তারা ইমাম ছাড়া কোনো প্রকারের জিহাদ কল্পনা করতে পারেন না।[১] এটা গলদ। আবার অনেকে ইমামের শর্তকে একেবারে মূল্যহীন মনে করেন। ফলে তাদের দৃষ্টিতে কোনো জিহাদেই কোনো ইমাম বা অনুমতি দরকার নেই; এটাও গলদ।

হক উভয় মতাদর্শের মাঝামাঝি। অর্থাৎ উপরে জিহাদের যেসব প্রকারভেদ উল্লেখ করা হয়েছে, সবগুলোর বিধান ও শর্ত অভিন্ন নয়। বরং প্রকারভেদ হিসেবে শর্ত ও বিধান ভিন্ন। মুহাক্কিক আলিমদের মতে, **জিহাদুত তলব তথা আক্রমণাত্মক জিহাদে ইমামের অনুমতি থাকা প্রয়োজন।** যদিও কুরআন-সুন্নাহে এ প্রকারের জিহাদের মাঝে সরাসরি ইমামের শর্তের উপস্থিতি পাওয়া যায় না, কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ

---

১. সালেহ ফাওজান (১৪৮)।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খুলাফায়ে রাশেদিনের ইতিহাস দেখলে সুস্পষ্ট যে, খলিফার পরামর্শ, প্রস্তুতি ও অনুমতি ছাড়া আক্রমণাত্মক জিহাদ হতো না। বরং খলিফাই ঠিক করতেন মুজাহিদদের কোথায় পাঠানো হবে, কখন পাঠানো হবে, কতজন পাঠানো হবে। দু-একজন সাহাবির ব্যতিক্রম কিছু ঘটনা থাকলেও রাসুলুল্লাহর গোটা জীবন, সকল সাহাবার সচরাচর আমল বাদ দিয়ে দু-একটা ঘটনা দলিলযোগ্য নয়। আর দলিল হিসেবে গ্রহণ করা হলেও উত্তম কিংবা সাধারণ আমল বলা সম্ভব নয়। কারণ, এগুলো পরবর্তী সময়ে যে বিশৃঙ্খলার জন্ম দেবে না, সেটা বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ পাশের রাষ্ট্রের সঙ্গে বড় কোনো মাসলাহাতের কারণে ইমাম 'আহদ' তথা কোনো একটা চুক্তি করেছেন; আর চুক্তির ক্ষেত্রে ইসলামের সরল ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হচ্ছে চুক্তি রক্ষা করতে হবে। সুতরাং তাদের উপর হুট করে চোরাগুপ্তা আক্রমণ করা যাবে না। এখন যদি এ ধরনের জিহাদে ইমামের অনুমতির শর্ত না রাখা হয়, যে-কেউ গিয়ে চুক্তিবদ্ধ পক্ষের উপর আক্রমণ করবে, যা মুসলমানদের পক্ষ থেকে গাদ্দারি হিসেবে বিবেচিত হবে। মোট কথা, এ প্রকারের জিহাদে ইমামের অনুমতি ও ইমামের পরামর্শের প্রয়োজন হবে।

ইবনে কুদামা রাহি. লিখেন, জিহাদ ইমাম এবং তার ইজতিহাদের উপর নির্ভরশীল।[১] জফর আহমদ উসমানি রাহি. ইলাউস সুনানে লিখেছেন, 'জিহাদের জন্য ইমাম শর্ত। যদি মুসলমানদের ইমাম না থাকে, তবে 'উজলাহ' তথা নিঃসঙ্গতা অবলম্বন করবে। বিষয়টি... হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত। সুতরাং যদি মুসলমানদের ইমাম না থাকে, তবে জিহাদ নেই...।[২] কেবল ইমাম নয়, সন্তানের জন্য মাতা-পিতার অনুমতি লাগবে। ইমাম মুহাম্মাদ রাহি. লিখেন, মাতা-পিতার অনুমতি ছাড়া জিহাদে যাওয়া উচিত নয়। কারণ, মাতা-পিতার আনুগত্য ফরজে আইন।[৩] স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতি লাগবে; দাসের জন্য মনিবের অনুমতি লাগবে। কারণ, এটা সবার জন্য ফরজ নয়। আর নফল কাজ করতে গেলে অভিভাবকের অনুমতি নিতে হয়।[৪] ইমাম তহাবি রাহি.-এর বক্তব্যও তা-ই: **মুসলিম শাসকদের অধীনে—তারা সৎ কিংবা অসৎ হোক—কিয়ামত পর্যন্ত হজ এবং জিহাদ অব্যাহত থাকবে।**

---

১. আল-মুগনি (৯/২০২)।
২. ইলাউস সুনান (১২/৪)।
৩. শরহুস সিয়ারিল কাবির, সারাখসি (১৮৩)।
৪. কোনো কোনো আলিম মনে করেন, এই প্রকারের জিহাদেও অনুমতির দরকার নেই। তারা সাহাবি আবু বাসির, আবু জান্দাল রাজি.-এর ঘটনা দিয়ে দলিল দেন। কিন্তু আমাদের কাছে যেটা অগ্রাধিকারযোগ্য তা উপরে লেখা হয়েছে। এক-দুইজন সাহাবির আমল সকল সাহাবি ও গোটা উম্মাহর আমলের বিপরীতে দলিল হতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকারের জিহাদ অর্থাৎ জিহাদুদ দিফা তথা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ ফরজে আইন। অর্থাৎ দুশমন যখন কোনো ভূখণ্ডের মুসলিমদের উপর আক্রমণ করবে, তখন তাদের প্রত্যেকের উপর জিহাদ ফরজ হয়ে যাবে। প্রত্যেকে যে যার সাধ্যানুযায়ী দুশমনের আক্রমণ প্রতিহত করবে। **এমন প্রকারের জিহাদের জন্য কারও অনুমতির অপেক্ষায় বসে থাকার প্রয়োজন নেই।** কারণ, এটা সবার উপর ওয়াজিব। পিতার উপর যেমন ওয়াজিব, তেমন সন্তানের উপরও ওয়াজিব। ফলে এখানে পিতার অনুমতি নিষ্প্রয়োজন। একইভাবে এই জিহাদে ইমামের শর্তও নিষ্প্রয়োজন। কারণ, কোনো মুসলিমের প্রাণ কিংবা সম্পদ আক্রান্ত হলে তাকে প্রতিহত করতে বলা হয়েছে। একাধিক হাদিসে এসেছে, কেউ যদি নিজের জান-মাল সুরক্ষার জন্য যুদ্ধ করে নিহত হয়, তবে সে শহিদ হিসেবে গণ্য হবে।[১] ব্যক্তিগত সম্পদ রক্ষার জন্য কেউ মারা গেলে যদি শহিদ হয়, মুসলিম ভূখণ্ড, মসজিদ-মাদরাসা এবং মুসলিম নারী-শিশুরা কাফেরদের আক্রমণের শিকার হলে সেখানে প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করা কতটা জরুরি ও মর্যাদাময় সেটা সহজেই বুঝে আসে। পাশাপাশি ব্যক্তিগত জান-মালের উপর আক্রমণ প্রতিহত করতে যেমন ইমামের অনুমতি প্রয়োজন হয় না, একইভাবে প্রতিরক্ষামূলক জিহাদে ইমামের অনুমতি শর্ত নয়। ইমাম যদি থাকে এবং জিহাদের শৃঙ্খলা বিধান করে, তবে তার অধীনে জিহাদ করতে সমস্যা নেই। কিন্তু ইমাম যদি না থাকে, তবে জিহাদ বন্ধ থাকবে না; বরং উম্মাহর সবাই দুশমনের প্রতিটা আঘাতের পালটা জবাব দিয়ে তাদের প্রতিহত করবে। ইবনে তাইমিয়া রাহি.-এর মত এটাই। শাইখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব রাহি.-এর পৌত্র শাইখ আবদুর রহমান আলে শাইখও এক্ষেত্রে ইমামের শর্ত দেওয়ার প্রচণ্ড সমালোচনা করেছেন।[২]

ইমাম তহাবির কথার ব্যাখ্যা: ইমাম তহাবির বক্তব্য '**মুসলিম শাসকদের অধীনে—তারা সৎ কিংবা অসৎ হোক—কিয়ামত পর্যন্ত হজ এবং জিহাদ অব্যাহত থাকবে**'-এর দুটো অর্থ হতে পারে:

এক. পূর্বের আলোচনার ধারাবাহিকতা। ইতঃপূর্বে আমরা দেখেছি, ইমাম তহাবি শাসকদের সঙ্গে মুসলমানদের কর্মপন্থা কী হবে সেটা আলোচনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, সৎ হোক অসৎ হোক, জালেম হোক ন্যায়নিষ্ঠ হোক, মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা যাবে না; বরং তাদের শুদ্ধির জন্য দোয়া করতে হবে, সবর

---

১. বুখারি (২৪৮০); মুসলিম (১৪১); তিরমিজি (১৪১৮)।
২. আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, ইবনে তাইমিয়া (৫/৫৩৮); আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ (৮/১৯৯)।

করতে হবে। সেই ধারাবাহিকতায় এখানে বলা হচ্ছে, মুসলিম শাসক সৎ হোক অসৎ হোক, তাদের ঝান্ডাতলে জিহাদ করতে হবে। কারণ, তারা মুসলমানদের বৈধ অভিভাবক। ব্যক্তিজীবনে সৎ-অসৎ হলেও দ্বীন ও উম্মাহর সুরক্ষার দায়িত্ব তাদের কাঁধে। ফলে তারা যখনই জিহাদের ডাক দেবে, মুসলমানদের সে ডাকে সাড়া দেওয়া কর্তব্য। জুলুমের অজুহাতে শাসকের জিহাদের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। কারণ, তাতে খোদ দ্বীন ও উম্মাহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এবং যুগে যুগে সেটা হয়েছেও। শাসক ফাসেক ছিল, জালেম ছিল, কিন্তু জিহাদের ক্ষেত্রেও প্রথম সারিতে ছিল। বর্তমানের শাসকদের মতো তারা জিহাদকে ঘৃণা করত না। যেমন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের কথাই ধরা যাক। ইতিহাসের কুখ্যাত জালিমদের একজন তিনি। বড় বড় তাবেয়ি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, যা পিছনে বলা হয়েছে; অথচ ভারতবর্ষের মুসলমানদের ঈমান কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই মানুষটির কাছেই ঋণী। কারণ, তিনিই বারবার পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতে সেনা অভিযান পরিচালনা করেছেন। শেষ পর্যন্ত তারই পরামর্শ ও নির্দেশনাতে আমির মুহাম্মাদ বিন কাসিম রাহি. ভারতে ইসলামের বিজয় সূচিত করেন। তখনকার মুসলিমগণ যদি বলতেন, যেহেতু হাজ্জাজ জালিম, তাই তার অধীনে আমরা জিহাদ করব না, তা হলে কেমন হতো? কেবল খেলাফতের ভিতরে নয়, অন্যান্য ভূখণ্ডের মুসলিমগণও বিদ্যমান শাসকদের অধীনে যুদ্ধ করেছেন। সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযান, মুহাম্মাদ ঘুরির ভারত বিজয় থেকে শুরু করে শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর পর্যন্ত ভারতের মুসলিম শাসকগণ কেউ খলিফা ছিলেন না, নিষ্পাপ ছিলেন না; কিন্তু মুসলমানগণ তাদের অধীনে যুদ্ধ করেছেন। কেউ বলেননি যে, তারা জালিম, তাই তাদের অধীনে যুদ্ধ করব না। তারা ভারতের বড় বড় অঞ্চল ইসলামের জন্য জয় করেছেন। এসব যুদ্ধের অধিকাংশই ইকদামি জিহাদ ছিল। বাংলাতেও ইসলামের প্রকৃত সূচনা হয়েছিল ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজি রাহি.-এর ইকদামি জিহাদের মাধ্যমে।

এভাবে ইকদামি জিহাদ যুগে যুগে ইসলামের আলো গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছে। মুসলমানগণ যদি কেবল দিফায়ি জিহাদের মাঝে বসে থাকতেন, ইসলাম তা হলে কেবল জাজিরাতুল আরবেই থেকে যেত। এগুলোর পিছনে রাজা-বাদশাহদের কী উদ্দেশ্য ছিল সেটা আল্লাহর কাছে সোপর্দ রইল, কিন্তু এর মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ যে উপকৃত হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং পশ্চিমা উপনিবেশের উত্থানের আগ পর্যন্ত জিহাদ মুসলিম শাসকদের কাছে একটি স্বীকৃত

দায়িত্ব ছিল এবং শাসকদের অধীনে যুদ্ধ করা তখন একটা স্বাভাবিক বিষয় ছিল। খারেজিরা ছাড়া আর কেউ এটা অস্বীকার করত না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রত্যেক শাসকের সঙ্গে তোমাদের উপর জিহাদ ওয়াজিব, চাই সে সৎ হোক বা অসৎ হোক।[১]

দুই. জিহাদের জন্য শাসক শর্ত। কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ শাসকের ঝান্ডাতলে থাকবে। সুতরাং জিহাদ করতে হলে শাসকের অনুমতিক্রমে তার নির্দেশনাতে করতে হবে। যদি এ অর্থ ধরা হয়, তবে তা উন্মুক্তভাবে গ্রহণ করা যাবে না; বরং পিছনে প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী গ্রহণ করতে হবে।

জিহাদ সবসময় চলমান থাকবে: প্রশ্ন হতে পারে, ইমাম তহাবির 'জিহাদ অব্যাহত থাকবে' বক্তব্যের অর্থ কী? তা ছাড়া একাধিক হাদিসে এসেছে, উম্মতের একটি দল সবসময় আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে থাকবে। যেমন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার নবুওতপ্রাপ্তি থেকে শুরু করে উম্মতের সর্বশেষ দলের দাজ্জালের বিরুদ্ধে কিতাল পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত থাকবে। কোনো জালেমের জুলুম, আদিলের আদল এটাকে বাতিল করতে পারবে না।'[২] মুসলিম শাসকদের অধীনে বর্তমানে যেহেতু ইকদামি জিহাদ করা সম্ভব নয়, আবার বিভিন্ন দেশ পারস্পরিক চুক্তিবদ্ধ থাকায় দিফায়ি জিহাদেরও প্রয়োজন হচ্ছে না, কিংবা প্রয়োজন হলেও উম্মাহর দুর্বলতা ও গাফিলতির কারণে বাস্তবায়িত হচ্ছে না, তা হলে জিহাদ কোথায়? মুহাক্কিক আলিমদের মতে হাদিসের অর্থ হলো, কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদের বিধান বলবৎ থাকবে। জিহাদ কখনও রহিত (মানসুখ) হবে না।[৩] প্রয়োজন হলে এবং শর্তাবলি বিদ্যমান থাকলে মুসলিম উম্মাহ জিহাদ করবে। শর্ত বিদ্যমান না থাকলে অপেক্ষা করবে। এ জন্যই আকিদার কিতাবে হজ ও জিহাদকে একত্রে উল্লেখ করা হয়। অথচ হজ প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে পালিত হয় না, বরং নির্দিষ্ট সময়ে, শর্তের ভিত্তিতেই পালিত হয়। একই কথা জিহাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

---

১. সুনানে কুবরা, বাইহাকি (১৮৫৪৯)।
২. আবু দাউদ (২৫৩২); সুনানে সাইদ ইবনে মানসুর (২৩৬৭)।
৩. মিরকাত, আলি কারি (৬/২৪৫৩)।

وَنُؤْمِنُ بِالكِرَامِ الكَاتِبِينَ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ، وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الـمَوْتِ الـمُوَكَّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ العَالَمِينَ، وَبِعَذَابِ القَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، وَسُؤَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَدِينِهِ وَنَبِيِّهِ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ. وَالقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الـجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النِّيرَانِ.

আমরা কিরামান কাতিবিন (ফেরেশতাদের) প্রতি ঈমান রাখি। আল্লাহ তায়ালা তাদের আমাদের পর্যবেক্ষণের কাজে নিয়োজিত করেছেন। আমরা মৃত্যুর ফেরেশতার প্রতি ঈমান রাখি, আল্লাহ তায়ালা যাকে গোটা জগদ্বাসীর প্রাণ নেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন। আমরা কবরের আজাবে বিশ্বাস করি এর উপযুক্ত লোকদের জন্য। আমরা আল্লাহর রাসুল এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে একাধিক হাদিসে বর্ণিত কবরে মুনকার-নাকিরের 'তোমার রব কে', 'তোমার দ্বীন কী' এবং 'তোমার নবি কে' উক্ত তিনটি প্রশ্নে ঈমান রাখি। কবর হয়তো জান্নাতের একটি বাগান, নয়তো জাহান্নামের একটি গর্ত।

ব্যাখ্যা

পরকালের উপর ঈমান

কিরামান কাতিবিন: মুসলমানদের আকিদার মধ্য থেকে ফেরেশতা-সংক্রান্ত একটি আকিদা হলো 'কিরামুন কাতিবুন' তথা সম্মানিত লেখক ফেরেশতাগণকে বিশ্বাস করা। আল্লাহ কুরআনের একাধিক আয়াতে তাদের কথা আলোচনা করেছেন:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِينَ . كِرَامًا كَاتِبِينَ. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ.

অর্থ: 'অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছেন সম্মানিত লেখকবৃন্দ; তারা জানেন যা তোমরা করো।' [ইনফিতার: ১০-১২] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন,

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

অর্থ: 'যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে, সে যে কথাই উচ্চারণ করে, সেটা সংরক্ষণের জন্য তার কাছে নিযুক্ত রয়েছে সদা প্রস্তুত প্রহরী।' [কাফ: ১৭-১৮]

বুখারি ও মুসলিমে আবু হুরাইরা রাজি. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মাঝে দিন ও রাতে পালাক্রমে ফেরেশতাদের বিভিন্ন দল আসতে থাকেন। তারা ফজর ও আসরের নামাজে মিলিত হন। এরপর যারা তোমাদের মাঝে রাত যাপন করেছিলেন, তারা আল্লাহর কাছে চলে যাযন। তাদের প্রভু তাদের জিজ্ঞাসা করেন, অথচ তিনি তাদের ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো জানেন, তোমরা আমার বান্দাদের কী অবস্থায় রেখে এসেছ? জবাবে তারা বলেন, আমরা নামাজরত অবস্থায় তাদের কাছে গিয়েছিলাম, আবার নামাজরত অবস্থায় তাদের রেখে এসেছি।[১]

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ.

অর্থ: 'তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে। আল্লাহর নির্দেশে তারা তাদের হেফাজত করে।' [রাদ: ১১] উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির রাহি. লিখেন, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একদল প্রহরী ফেরেশতা বান্দার কাছে পালাক্রমে আগমন করেন; রাতে একদল, দিনে একদল। তারা মানুষকে বিপদ ও দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করেন। আরেক দল ফেরেশতা বান্দার ভালোমন্দ আমল লিপিবদ্ধ করার জন্য আগমন করেন; একদল রাতে, আরেক দল দিনে; একজন ডানে, আরেকজন বামে; ডানের জন পুণ্য লিখেন, বামের জন পাপ লিখেন। আরও দুজন প্রহরী ফেরেশতা থাকেন মানুষের সঙ্গে; একজন সামনে, আরেকজন পিছনে। তারা মানুষকে সুরক্ষিত রাখেন। এভাবে মানুষ দিনে চারজন ও রাতে চারজন ফেরেশতা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, যাদের দুজন আমল লিপিবদ্ধের কাজ করেন, অন্য দুজন প্রহরার কাজ করেন।[২]

কিরামাত কাতিবিন ফেরেশতাগণ মানুষের কেবল কথা ও কর্মকে লিখেন না, বরং নিয়তের কথাও জানেন এবং লিখেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের এ ক্ষমতা দিয়েছেন। সহিহ

---

১. বুখারি (৫৫৫, ৭৪২৯); মুসলিম (৬৩২)।
২. তাফসিরে ইবনে কাসির (৪/৩৭৫); সালেহ ফাওজান (১৪৯)।

মুসলিমের হাদিসে এসেছে, আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (হাদিসে কুদসিতে) 'আল্লাহ বলেছেন, যখন আমার বান্দা কোনো পুণ্য করার ইচ্ছা করে, তখন সেটা করার আগেই আমি তার পুণ্য লিপিবদ্ধ করি। আর যখন সে সেটা করে, তখন দশ গুণ বাড়িয়ে দিই। আর যখন কোনো পাপ করার ইচ্ছা করে, তখন সেটা করার আগ পর্যন্ত আমি লিখি না। কিন্তু যখন করে ফেলে, তখন কেবল একটি পাপই লিখি। আল্লাহর রাসুল বলেন, ফেরেশতারা আল্লাহকে বলেন—হে প্রভু, আপনার অমুক বান্দা খারাপ কাজের ইচ্ছা করেছে; অথচ আল্লাহ তায়ালা তাদের চেয়ে ভালো জানেন। তিনি বলেন, তোমরা তাকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকো। যদি সেটা করে, তবে একটি খারাপ কাজ লিখো। আর যদি না করে, তবে তার জন্য একটি পুণ্য লিখো। কারণ, সে আমার জন্যই ছেড়ে দিয়েছে। আল্লাহর রাসুল বলেন, যখন তোমাদের কারও ইসলাম সুন্দর হয়, তখন তার প্রত্যেকটি পুণ্যের বিনিময় দশ গুণ থেকে সাতশো গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আর প্রত্যেকটি পাপ যতটুকু করে ততটুকুই লেখা হয়। এভাবে একসময় সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।'[১] আবু উমামা থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, 'মানুষ কোনো পাপ করলে বাম কাঁধের ফেরেশতা সেটা না লিখে **ছয় ঘণ্টা** পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। যদি এ সময়ে সে লজ্জিত হয়ে তাওবা করে, তবে সেটা লিখেন না। যদি তাওবা না করে, তখন একটি পাপই লিখেন।'[২]

---

১. মুসলিম (১২৯); ইবনে হিব্বান (৩৭৯); মুসনাদে আহমদ (৮২৮২)।

২. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (৭৭৬৫, ৭৭৮৭); এখানে **ছয় ঘণ্টা** বলতে কি প্রচলিত ঘণ্টা উদ্দেশ্য? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কি আমাদের প্রচলিত সময়ের হিসাব বিদ্যমান ছিল? বিভিন্ন হাদিস ও ইতিহাসের গ্রন্থে আমরা আরব ও মুসলিম সভ্যতার এক ব্যাপক সমৃদ্ধি লক্ষ করি। আশ্চর্যের বিষয় হলো, যেখানে ভারতে মুঘল যুগেও দেখা যায় তারা প্রাচ্য রীতিতে 'প্রহর'-এর ভিত্তিতে দিনরাত গণনা করতেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাগণ তাদের যুগে আধুনিক 'ঘণ্টা'র হিসাব করতেন। তাদের দিনরাত আমাদের মতোই ২৪ ঘণ্টা ছিল। তবে আধুনিক সময়ের সঙ্গে সেটার একটু পার্থক্য রয়েছে। তারা দিন ও রাতকে বারো ঘণ্টা করে বিভক্ত করতেন। দিনের হিসাব শুরু করতেন সূর্যোদয় থেকে। আর রাতের হিসাব সূর্যাস্ত থেকে। ফলে তাদের সময়ে যদি কেউ বলত দিন ৫টার সময় সাক্ষাৎ হবে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হতো আমাদের সকাল ১০ টা। আমাদের বিকাল ৫টা তাদের হিসেবে ছিল দিন প্রায় ১১টা। কেউ যদি বলত রাত ১টা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হতো মাগরিবের কিছু সময় পরে। বর্তমান সময়ের সঙ্গে আরেকটু পার্থক্য ছিল। দিন ও রাতের বারো ঘণ্টা যেহেতু তাদের কাছে আলাদা আলাদা ছিল, এ কারণে গ্রীষ্ম ও শীতে দিনরাত হ্রাসবৃদ্ধির ফলে ঘণ্টাও বাড়ত-কমত। দিনের ঘণ্টাগুলো গরমকালে বৃদ্ধি পেয়ে ৭০ মিনিটের কাছাকাছি পৌঁছত। আর রাতের ঘণ্টাগুলো ৫০ মিনিটে পৌঁছত। অপরদিকে শীতের দিন ঠিক উলটো হতো। কিছু উদাহরণ দেখা যাক: জাবের রাজি.-এর প্রসিদ্ধ হাদিসে এসেছে, 'জুমার দিন বারোটি ঘণ্টা রয়েছে... তার ভিতরে এমন একটি ঘণ্টা (সাআহ) রয়েছে, যাতে আল্লাহ দোয়া কবুল করেন। তোমরা আসরের পরে সর্বশেষ ঘণ্টায় সেটা অন্বেষণ করো। [আবু দাউদ ১০৪৮] খেয়াল করুন, দিনের বারো ঘণ্টা যেহেতু মাগরিবের মাধ্যমে শেষ হয়ে যায়, তাই সেটাকে সর্বশেষ ঘণ্টা বলা হয়েছে। জুমার দিন আগে আগে মসজিদে গমন-সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন প্রথম ঘণ্টায় অথবা বলুন ১টার সময় মসজিদে আসবে, সে যেন একটি উট কুরবানি করল। আর যে ২টার সময় আসবে, সে যেন গরু কুরবানি

মৃত্যু ও মৃত্যুর ফেরেশতা: মানুষের যখন জীবনকাল ফুরিয়ে মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তখন আল্লাহ তায়ালা তার রুহ গ্রহণের জন্য একদল ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তাদের প্রধানকে বলা হয় 'মালাকুল মাওত' তথা মৃত্যুর ফেরেশতা, আমাদের দেশে যিনি 'আজরাইল' নামে পরিচিত। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর কোথাও তাকে এ নামে ডাকা হয়নি; বরং এটা বনি ইসরাইলের বর্ণনা থেকে গৃহীত। তাই এমন নাম পরিত্যাগ করা উচিত।

সৃষ্টির মৃত্যুদানে ঠিক কতজন ফেরেশতা নিয়োজিত কুরআন-সুন্নাহে দ্ব্যর্থভাবে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না। কোনো কোনো আয়াতে বোঝা যায় তিনি একজন ফেরেশতা। যেমন: আল্লাহ বলেন,

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ.

'অর্থ: 'আপনি বলুন, তোমাদের ওফাত দান করে মৃত্যুর ফেরেশতা, যাকে তোমাদের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে।' [সাজদা: ১১] আবার কোনো কোনো আয়াত দেখলে বোঝা যায় তারা একাধিক ফেরেশতা। যেমন: আল্লাহ বলেন,

حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ.

অর্থ: 'আর যখন তোমাদের কারও মৃত্যু চলে আসে, তখন আমার দূতগণ তাকে মৃত্যুদান করে, আর তারা ত্রুটি করে না।' [আনআম: ৬১] আল্লাহ বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْۤ اَنْفُسِهِمْ

অর্থ: 'আর যাদের ফেরেশতারা এমন অবস্থায় মৃত্যুদান করে, যখন তারা নিজেদের উপর অত্যাচার করছিল...।' [নিসা: ৯৭] অন্যত্র বলেন,

---

করল। যে ৩টার সময় আসবে, সে যেন একটি মেষ কুরবানি করল। আর যে ৪টার সময় আসবে, সে যেন একটি মুরগি কুরবানি করল। আর যে ৫টার সময় আসবে, সে যেন একটি ডিম কুরবানি করল। অতঃপর যখন ইমাম মিম্বরে আরোহণ করে, তখন ফেরেশতারা তার খুতবা শোনার জন্য বসে যান...। [বুখারি ৮৮১, মুসলিম ৮৫০] হাদিসে ৫টার পরে আর কিছু বলা হয়নি। কারণ, সূর্যোদয় যদি আজকের ৬টায় ধরা হয়, তা হলে ৫টা হয় বর্তমান ১১টায়। সে হিসেবে ১১টা থেকে ১২ টার কিছু সময় আগ পর্যন্ত এলে আগে আসার পুণ্য পাওয়া যায়। এর পরই জুমার নামাজের জন্য ইমাম মিম্বরে আরোহণ করেন। ইমাম নববি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬টার পরপরই মিম্বরে আরোহণ করতেন। [শরহে মুসলিম ৬/১৩৬] সাহাবি ও তাবেয়িদের জীবনীতেও আমরা এর সাক্ষ্য পাই। আবদুল্লাহ ইবনে কুরত রাজি. বলেন, 'আমি জুমার দিন ১০টার সময় আসরের পরে ইয়ারমুক থেকে রওয়ানা হলাম।' [ফুতুহুশ শাম: ১/১৬৬] অর্থাৎ বর্তমান সময়ে বিকাল প্রায় ৪টার দিকে। উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহি-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি জোহর পড়তেন ৮টার সময়, আর আসর পড়তেন ১০টায়। [আত-তামহিদ ৮/৯৬] আরও দেখুন: মাআরিফুস সুনান, ইউসুফ বানুরি (২/২৫-২৬)। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ

অর্থ: 'ফলে যখন আমার দূতগণ তাদের কাছে মৃত্যুদান করতে চলে আসে...।' [আরাফ: ৩৭] আলিমগণ এসব বর্ণনার মাঝে সমন্বয় বিধান করেছেন, যা আমরা প্রথমে লিখেছি সেভাবে। অর্থাৎ মূলত একজন ফেরেশতাই মানুষের রুহ গ্রহণ করে থাকেন, কিন্তু তার পাশাপাশি অন্য ফেরেশতাগণ সহায়ক হিসেবে থাকেন। ফলে কুরআন-সুন্নাহে কোনো অসমাঞ্জস্যতা নেই। মুজাহিদ রাহি. থেকে বর্ণিত, মৃত্যুর ফেরেশতার সামনে পুরো দুনিয়াটা একটা থালার মতো। তিনি সেখান থেকে যার সময় ঘনিয়ে আসে, তাকে মৃত্যুদান করেন।[১]

মৃত্যুর স্বরূপ: মৃত্যু মানবজীবনের এক বিস্ময়কর ব্যাপার। জন্মের চেয়েও মৃত্যু বেশি বিস্ময়কর। পৃথিবীতে জন্মে একটা মানুষ জীবিত হয় না, বরং জীবিত হয়েই জন্মগ্রহণ করে। জীবিত অবস্থায় কয়েক মাস মায়ের গর্ভে থাকে। তার আত্মীয়-স্বজন সবাই জানে সে জীবিত। ফলে এই নতুন মেহমানের জন্য ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করে। ধীরে ধীরে একদিন সে পৃথিবীর আলো-বাতাসে চোখ মেলে। বিপরীতে একজন জীবিত মানুষ লম্বা সময় সবার সঙ্গে সময় কাটায়, গল্প করে, সুখে-দুঃখে পথ চলে, জীবনে বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করে, গল্প বলে, এর মাঝে হঠাৎ একদিন চিরকালের জন্য থমকে দাঁড়ায়, চোখ বন্ধ করে ফেলে। যে মানুষটি বছরের পর বছর কথা বলত, গল্প বলত, হঠাৎ চিরদিনের জন্য নীরব হয়ে যায়। জীবনের খেলাঘরের সব খেলা তার জন্য সেখানেই শেষ হয়ে যায়। ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পরিজন কিছুদিন কান্নাকাটি করে ভুলে যায়। পৃথিবীতে তার জীবনের অধ্যায় সমাপ্ত হয়। কিন্তু আল্লাহ তাকে ভোলেন না। কারণ, মাটির নিচে যে তার জন্য প্রস্তুতি চলছে এক নতুন জীবনের।

মৃত্যুর সময় মানুষ বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়। এগুলো এমন অভিজ্ঞতা, যা পৃথিবীর কোনো জীবিত মানুষ আজ পর্যন্ত জানতে পারেনি। যারা জানতে পারে, তারা কাউকে বলার সুযোগ পায়নি। কিন্তু আমরা রাসুলের মাধ্যমে এগুলো সম্পর্কে অনেককিছু জানতে পাই। আমরা জানতে পাই, মৃত্যুর সময়ই প্রত্যেকটি মানুষ বুঝে ফেলে তার সারা জীবনের কর্মের পরিণতি কী হতে যাচ্ছে। ফলে তাকে কবর কিংবা হাশর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না। পুণ্যবান হলে তার সুখের যাত্রা মুমূর্ষু অবস্থা থেকেই শুরু হয়, আর পাপী হলে দুর্ভাগ্যের যাত্রাও তখন থেকেই।

---

১. তাফসিরে তাবারি (২০/১৭৫); আকহাসারি (২১১-২১২); সালেহ ফাওজান (১৫০)।

বারা বিন আজেব রাজি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে একজন আনসারি সাহাবির জানাজা পড়ার জন্য বের হলাম। কবরের কাছে পৌঁছে দেখলাম তখনও সেটা খনন সম্পন্ন হয়নি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বসলেন। আমরাও তার চতুষ্পার্শে নীরবে বসে গেলাম, যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে ছিল। আল্লাহর রাসুলের হাতে একটি কাঠের টুকরা ছিল। তিনি সেটা দিয়ে মাটিতে কিছু রেখা টানছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠিয়ে বলেন, 'তোমরা কবরের শাস্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো।' কথাটি দুইবার অথবা তিনবার বললেন। অতঃপর বললেন, 'যখন মুমিন বান্দা দুনিয়া থেকে পরকালের দিকে যাত্রা শুরু করে, তখন শুভ্র বদনের ফেরেশতাদের একটি দল আকাশ থেকে নেমে আসে। তাদের মুখমণ্ডল সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করতে থাকে। তাদের হাতে থাকে জান্নাতের কাফন, জান্নাতের কর্পূর। তারা তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বসে যায়। অতঃপর মৃত্যুর ফেরেশতা আগমন করে তার মাথার কাছে বসে বলেন—হে পবিত্র আত্মা, তুমি আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বেরিয়ে আসো।' আল্লাহর রাসুল বলেন, 'তখন পানির পাত্র থেকে পানির ফোঁটা যেভাবে বেরিয়ে আসে, তার রুহ ওভাবে শরীর থেকে বেরিয়ে আসে। ফেরেশতারা সেটা গ্রহণ করে ঊর্ধ্বজগতে চলে যান। প্রত্যেক আকাশের ফেরেশতারা তাকে স্বাগত জানান, তার পরিচয় জানতে চান। রুহ বহনকারী ফেরেশতাগণ তার নাম, তার পিতার নাম-সহ সুন্দর করে পরিচয় দেন। এভাবে সপ্ত আকাশ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। তখন আল্লাহ বলেন, ঊর্ধ্ব জগতে (ইল্লিয়্যিনে) আমার বান্দার আমলনামা লিখে ফেলো। এর পর তাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করো। কেননা আমি তাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি এবং মাটিতে ফিরিয়ে দেবো, অতঃপর মাটি থেকে আবার পুনরুত্থিত করব। আল্লাহর রাসুল বলেন, এরপর তাকে দেহের মাঝে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তখন কবরে দুইজন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে কিছু প্রশ্ন করেন...। আর যখন কোনো কাফের দুনিয়া থেকে আখিরাতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকে, তখন কৃষ্ণ চেহারার অধিকারী একদল ফেরেশতা জাহান্নামের কাপড় নিয়ে তার নিকট অবতীর্ণ হয়। তারা তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বসে যায়। অতঃপর মৃত্যুর ফেরেশতা আগমন করে তার মাথার কাছে বসেন এবং তাকে বলেন—হে অপবিত্র আত্মা, আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং ক্রোধের দিকে বের হয়ে আয়! তখন তার আত্মা শরীরের ভিতরে ছোটাছুটি করতে থাকে। মৃত্যুর ফেরেশতা সেটাকে এমনভাবে টেনে বের করেন, যেভাবে ভেজা কাপড়ের ভিতর থেকে লোহা

টেনে বের করা হয়। এরপর তিনি সেটাকে ধরে সঙ্গে সঙ্গে সেই জাহান্নামের কাপড়ের ভিতরে রাখেন। সেখান থেকে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। এরপর তাকে নিয়ে উর্ধ্বজগতে গমন করেন। সকল ফেরেশতা তার বদনাম করে। একপর্যায়ে তাকে দুনিয়ার আকাশে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তার জন্য আকাশের দরজা খোলা হয় না; বরং আল্লাহ তায়ালা বলেন, ভূপৃষ্ঠের সর্বনিম্ন স্তরে তার নাম লিখে দাও। তখন তার আত্মাকে সেখান থেকে ছুড়ে ফেলা হয়। এরপর সেটাকে দেহের মাঝে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তার কবরে দুইজন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে কিছু প্রশ্ন করেন...।'[১]

উক্ত হাদিস দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মৃত্যুর আগ মুহূর্তে মানুষ ফেরেশতাদের দেখতে পায়, ফেরেশতাদের কথা শুনতে পায়; শুধু কিছু বলতে পারে না, কাউকে জানাতে পারে না। পবিত্র কুরআনও এটার সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ.

অর্থ: "নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ', অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, 'তোমরা ভয় করো না। চিন্তা করো না। আর তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো'।" [ফুসসিলাত: ৩০] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّٰلِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَٰتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَٰٓؤُا لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ.

অর্থ: 'সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা দাবি করে, 'আমার প্রতি ওহি অবতীর্ণ হয়েছে', অথচ তার প্রতি কোনো ওহি আসেনি? আর যে বলে, আমিও নাজিল করব যেমন আল্লাহ নাজিল

১. মুসতাদরাকে হাকেম (১০৮); মুসনাদে আহমদ (১৮৭৬৬); তয়ালিসি (৭৯১)।

করেছেন। যদি আপনি দেখতেন যখন জালিমরা মৃত্যুযন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, তোমাদের আত্মাগুলো বের করে দাও। আজ তোমাদের লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহ থেকে অহংকার করতে। তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ, যেমন আমি প্রথমবার তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তোমাদের যা দিয়েছিলাম, সেসব পশ্চাতেই রেখে এসেছ। আমি তো তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদের দেখছি না যাদের সম্পর্কে তোমরা বিশ্বাস করতে যে, তারা তোমাদের অংশীদার। বস্তুত তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের বিশ্বাস উবে গেছে।' [আনআম: ৯৩-৯৪]

এই যে মৃত্যুর সময় এত কিছু ঘটে, এত কথা, এত চিৎকার, এত সুসংবাদ ও এত হুমকি—সবকিছু মুমূর্ষু অবস্থার সেই নিরীহ মানুষটিকেই বহন করতে হয়। তার আশেপাশে বসে থাকা প্রিয়জন তার জন্য কাঁদে, দোয়া পড়ে, কিন্তু তারা কিছুই জানতে পায় না। বিজ্ঞান আজ কত অগ্রসর! কিন্তু রুহ, রুহের প্রস্থান, মৃত্যুর সময়ে ঘটে যাওয়া এত ঘটনা সম্পর্কে আজও আমরা কিছুই জানি না। তবে যাদের চোখ আছে, তারা হয়তো কিছুটা উপলব্ধি করতে পারেন। আল্লাহ বলেন,

فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ. وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ.

অর্থ: 'অতঃপর যখন কারও প্রাণ কণ্ঠাগত হয় এবং তোমরা তাকিয়ে থাকো, তখন আমি তোমাদের চেয়ে তার অধিক নিকটে থাকি, কিন্তু তোমরা দেখো না।' [ওয়াকিয়া: ৮৩-৮৫] অন্য আয়াতে আল্লাহ আরও স্পষ্ট করে বলেন,

كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ. وَقِيْلَ مَنْ رَاقٍ. وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمَسَاقُ.

অর্থ: 'কখনও নয়। যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে এবং বলা হবে, কে ঝাড়বে এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যাবে, বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে। (পায়ের) গোছা গোছার সাথে লেগে যাবে। সেদিন আপনার পালনকর্তার নিকট সবকিছু নীত হবে।' [কিয়ামাহ: ২৬-৩০]

মৃত্যু কী? মৃত্যু মানে কি সব শেষ হয়ে যাওয়া? এ এমন এক রহস্য, যা পৃথিবীতে মানুষের যাত্রার সূচনা থেকে মানুষকে অস্থির করে রেখেছে, আজ একবিংশ শতাব্দে

এসেও মানুষ যার কূল-কিনারা করতে পারেনি। মানুষ চাঁদে পা রেখেছে। লাখ-লাখ মাইল দূরের গ্রহে মানুষের জ্ঞান বিস্তৃত হয়েছে; অথচ তার সামনে একটা জীবন্ত মানুষ হঠাৎ কেন নিথর নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে, মানুষ বলতে পারে না! যারা আল্লাহতে, ধর্মে বিশ্বাস করে না, যারা চোখে দেখার বাইরে কোনো কিছুতে আস্থা রাখে না বলে দাবি করে, তাদের কাছে মৃত্যু মানে সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়া। কিন্তু ইসলাম (এবং সাথে জগতের অন্য বড় ধর্মগুলো) জানিয়েছে, মৃত্যু মানে শেষ হয়ে যাওয়া নয়। মৃত্যু কেবল স্থানান্তর। মৃত্যু জীবনের কেবল একটি ধাপ। জীবনের অস্থায়ী পর্ব শেষ করে স্থায়ী পর্বে গমনের নাম মৃত্যু। ফলে মৃত্যু ঠিকানা নয়, স্টেশন। মৃত্যুর পরে কবর, হাশর-সহ এ-রকম আরও কিছু স্টেশনের মধ্য দিয়ে মানুষ যেতে থাকে। সবশেষে জান্নাত কিংবা জাহান্নামে গিয়ে চিরস্থায়ী জীবন শুরু করে। কারণ, এগুলো যদি না-ই থাকে, তবে এই বিশাল জগৎ ও জীবন অর্থহীন। পশুর মতো কিছুদিন বেঁচে থেকে খেয়েদেয়ে, যার যেভাবে ইচ্ছা ভোগ করে, জুলুম পীড়ন করে কোনোভাবে মরলেই সব শেষ—এটা হতে পারে না। এসব দৃশ্যমান না হলেও বোধের বাইরে নয়। তাই আপনার সামনে দুটো অপশন। হয় বুদ্ধিমানের মতো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কথা অনুযায়ী এগুলোতে বিশ্বাস রেখে মুক্তি পাবেন, নয়তো নির্বোধের মতো এগুলো অস্বীকার করে চিরস্থায়ী শাস্তি বেছে নেবেন।

মুনকার ও নাকিরের প্রশ্ন: মৃত্যুর পরে কাফন-দাফন শেষ করে মানুষ যখন চলে যায়, মৃত ব্যক্তিকে তখনই জীবিত করা হয়। সে মানুষের চলে যাওয়ার আওয়াজ শুনতে পায়। তখন তার কবরে কৃষ্ণবর্ণ ও নীল চোখ বিশিষ্ট দুজন ফেরেশতা আগমন করেন। তাদের একজনকে বলা হয় মুনকার অন্যজনকে নাকির। তারা তাকে উঠিয়ে বসান এবং তিনটি প্রশ্ন করেন। তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কী? রাসুলুল্লাহকে দেখিয়ে বলেন, তিনি কে? যদি মুমিন হয়ে থাকে, তবে সে বলে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল। তখন ফেরেশতাদ্বয় বলেন, ওই দেখো জাহান্নাম। আল্লাহ সেটার বদলে তোমাকে জান্নাত দিয়েছেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমরা জানতাম তুমি এটাই বলবে। তখন তার কবরকে সত্তর হাত চওড়া ও প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। কবরকে আলোকিত করা হয়। তাকে বলা হয়, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। সে বলে, আমি কি পৃথিবীতে গিয়ে আমার পরিবারকে জানাতে পারি? তারা বলেন, তুমি নব বরের মতো ঘুমাও। তোমার সবচেয়ে প্রিয়জন আল্লাহ পুনরুত্থান দিবসে তোমাকে জাগাবেন।

আর যদি কবরের লোকটি কাফের বা মুনাফিক হয় তবে বলে, আমি কিছুই জানি না। মানুষকে বলতে দেখে আমিও বলতাম; আমি কিছুই জানি না। তখন একটি গদা দিয়ে তার দুই কানের মাঝখানে প্রচণ্ড আঘাত করা হয়। সে এত জোরে চিৎকার করে, জিন ও মানুষ ছাড়া তার আশেপাশের সকল প্রাণী শুনতে পায়। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ফেরেশতাদ্বয় বলেন, আমরা জানতাম তুমি এটাই বলবে। তখন কবরকে চাপ দিতে বলা হয়। কবর তাকে এমনভাবে চাপ দেয়, তার পাঁজরের হাড়গুলো একটি অপরটির মাঝে ঢুকে যায়। এভাবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তাকে শাস্তি দেওয়া হয়।[১]

কবরের শান্তি ও শাস্তি: কবর কেবল একটি মাটির ঘর নয়। এটা মানুষের সুখ ও দুঃখের সংসার। কারও জন্য এটা জান্নাতের সবুজ বাগান। কারও জন্য জাহান্নামের আগুনে ভরা গর্ত। মানুষ সারা জীবন যা করেছে, সে কর্মফল ভোগ করা শুরু হবে এখান থেকেই। কবর জান্নাত ও জাহান্নামের সূচনাবিন্দু। এটার জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থানে লাশ থাকা জরুরি নয়। বরং কেউ প্রাণীর খাদ্যে পরিণত হোক, পুড়ে ছাই হয়ে যাক, মাটিতে মিশে যাক—তাকে এই বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হবে। শরিয়তের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় 'আলমে বারজাখ' তথা অন্তরালের দুনিয়া।

অতীতে মুক্তমনা দার্শনিক এবং বর্তমানে নিজেদের অতি পণ্ডিত দাবিদার সেকুলাররা কবর তথা মৃত্যুপরবর্তী এই 'বারজাখী' জীবনের বাস্তবতা অস্বীকার করে। কারণ, তাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মানদণ্ড হচ্ছে বিবেকবোধ। যা যুক্তির পরাকাষ্ঠায় উত্তীর্ণ, সেটা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। যা উত্তীর্ণ নয়, তা গ্রহণেযাগ্য নয়। তাদের যুক্তি, মানুষকে কবরে রাখলে আমরা দেখি তার কিছুই হয় না, কিছুদিন পরে শরীর পচেগলে শেষ হয়ে যায়। অথবা অনেক সময় মানুষ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সুতরাং কবরে কীভাবে শান্তি বা শাস্তি হবে? এ বক্তব্য এতটাই স্থূল যে, খণ্ডন নিষ্প্রয়োজন। আমরা যা চোখে দেখি, সেটাই বাস্তব, আর যা দেখি না, সেটাই অবাস্তব এমন নয়। আল্লাহকে তো আমরা দেখি না, তবে কি আল্লাহর অস্তিত্ব নেই? ফেরেশতা দেখি না, ফেরেশতার অস্তিত্ব নেই? জান্নাত ও জাহান্নাম দেখি না, তাই জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব নেই? বরং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ব্যথা হলেও তো আমরা দেখি না। তা হলে এগুলো নেই? আমরা রুহ দেখি না, তা হলে রুহ নেই? বাস্তবতা হলো, সবকিছু দেখার প্রয়োজন হয় না, অনুভবেও বোঝা যায়। আমাদের মনের সুখ-দুঃখ, হৃদয় ও শরীরের

---

১. বুখারি (১৩৩৮); তিরমিজি (১০৭১); মুসলিম (২৮৭০); আবু দাউদ (৪৭৫১); ইবনে হিব্বান (৩১১৭); বাজ্জার (৮৪৬২)।

ব্যথা আমরা অনুভব করি। রুহ আমরা অনুভব করি। আল্লাহ, ফেরেশতা, জান্নাত-জাহান্নাম আমরা অনুভব করি। এগুলো থাকার অপরিহার্যতা বুঝি। তবে যেহেতু এগুলো আমাদের উপলব্ধির বাইরে, তাই এ ব্যাপারে আমরা আল্লাহর জ্ঞান তথা ওহির মুখাপেক্ষী। আল্লাহ আমাদের যা জানিয়েছেন, ততটুকু আমরা গ্রহণ করি। যা জানাননি, সেসব ব্যাপারে নীরব থাকি। ইমাম আবু হানিফা রাহি. বলেন, 'যে ব্যক্তি কবরের আজাব অস্বীকার করবে, সে পথভ্রষ্ট জাহমিয়্যাহ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[১]

কুরআন থেকেই কবরের শাস্তি প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ.

অর্থ: 'আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের মজবুত বাক্য দ্বারা শক্তিশালী করেন, পার্থিব জীবনে এবং পরকালে। আর আল্লাহ জালেমদের পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন।' [ইবরাহিম: ২৭] উক্ত আয়াতটিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে মুনকার-নাকির কর্তৃক তিন প্রশ্ন দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন।[২] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ۚ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۟ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ.

অর্থ: 'অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং ফেরাউনের গোত্রকে শোচনীয় আজাব গ্রাস করল। সকালে-সন্ধ্যায় তাদের (জাহান্নামের) আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে যে, ফেরাউনের গোত্রকে কঠিনতর আজাবে ছুড়ে ফেলো।'। [গাফের ৪৫-৪৬]

উপরে মুনকার ও নাকির-সম্পর্কিত হাদিসের শেষে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষেই মানুষের জন্য তার জবাবের ভিত্তিতে জান্নাতের সমাদর কিংবা জাহান্নামের শাস্তি শুরু হয়ে যাবে। ইমাম তিরমিজি উক্ত হাদিসটির শিরোনাম দিয়েছেন 'কবরের শাস্তি-সম্পর্কিত হাদিস'। কারণ, সে সময়ে হয়তো কবরের

১. শাইবানি (৩৬)।
২. তিরমিজি (৩১২০); সুনানে কুবরা, নাসায়ি (১১২২৯)।

আজাব অস্বীকারকারী একটি দলের অস্তিত্ব ছিল, তাই তিনি হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন—আলি, জায়দ ইবনে সাবেত, ইবনে আব্বাস, বারা বিন আজেব, আবু আইউব আনসারি, আনাস ইবনে মালেক, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, আবু সাইদ খুদরি রাজি.—প্রত্যেকেই কবরের আজাব সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।[১]

- ইমাম বুখারি রাহি. তাঁর সহিহ গ্রন্থের জানাজা অধ্যায়ে কবরের আজাব-সম্পর্কিত একাধিক হাদিস উল্লেখ করেছেন। নবিজির প্রিয় স্ত্রী আয়েশা রাজি. বলেন, আল্লাহর রাসুল নামাজের মাঝে দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই, দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে গুনাহ ও ঋণে ফেঁসে যাওয়া থেকে আশ্রয় চাই।'[২]

- অন্য একটি হাদিসে আয়েশা রাজি. বলেন, এক ইহুদি নারী আল্লাহর রাসুলের কাছে এসে কবরের শাস্তির কথা বর্ণনা করে। তখন রাসুল বলেন, আল্লাহ তোমাকে কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। তখন আয়েশা রাজি. রাসুলুল্লাহকে কবরের শাস্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, কবরে শাস্তি রয়েছে।' আয়েশা রাজি. বলেন, এর পর থেকে রাসুলুল্লাহ যখনই নামাজ পড়তেন, কবরের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।[৩]

- সহিহ মুসলিমের একটি বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা রাজি. বলেন, আমার কাছে মদিনার দুজন ইহুদি (নারী) এসে বলল, কবরে মানুষকে শাস্তি দেওয়া হয়। আমি তখন তাদের কথা বিশ্বাস করিনি। তারা চলে যাওয়ার পরে আল্লাহর রাসুল এলে আমি তাকে বলি, হে আল্লাহর রাসুল, মদিনার দুজন ইহুদি আমার কাছে এসেছিল। তারা মনে করে, কবরে মানুষকে শাস্তি দেওয়া হয়। তখন তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তারা সত্য বলেছে। কবরে মানুষকে শাস্তি দেওয়া হয়। চতুষ্পদ জন্তু সেগুলো শুনতে পায়।' আয়েশা রাজি. বলেন, এর পর থেকে আমি সবসময় খেয়াল করতাম, তিনি কবরের আজাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।[৪]

---

১. তিরমিজি (১০৭১)।
২. বুখারি (৮৩২, ৬৩৭৬); কেবল আয়েশা থেকে নয়, আবু হুরাইরা ও আনাস-সহ অনেক সাহাবি থেকে উক্ত দোয়াটি বর্ণিত হয়েছে। দেখুন: মুসলিম (৫৮৮, ২৭০৬)
৩. বুখারি (১৩৭২)।
৪. মুসলিম (৫৮৬)।

• জায়দ ইবনে সাবেত রাজি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বনু নাজ্জারের একটি বাগানে খচ্চরের উপর আরোহী ছিলেন। আমরা তার সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ খচ্চরটি লাফিয়ে উঠল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পড়ে যাবার উপক্রম হলো। আমরা খেয়াল করলাম, সেখানে পাঁচ/ছয়টি কবর ছিল। তিনি বললেন, 'এগুলো কাদের কবর কেউ জানো?' এক ব্যক্তি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি জানি।' তিনি বললেন, 'তারা কবে মারা গেছে?' লোকটি বললেন, 'তারা মুশরিক অবস্থায় মারা গেছে।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এই উম্মতকে কবরে শাস্তি দেওয়া হয়। যদি আমার এই আশঙ্কা না থাকত যে, তোমরা দাফন করা বন্ধ করে দেবে, তবে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম তিনি যেন তোমাদের কবরের আজাব শুনিয়ে দেন যা আমি শুনি।' অতঃপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরা জাহান্নামের শাস্তি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো।' সাহাবাগণ বললেন, আমরা জাহান্নামের শাস্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তিনি বললেন, 'তোমরা কবরের আজাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।' সাহাবাগণ বললেন, আমরা কবরের আজাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরনের ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।' সাহাবাগণ বললেন, আমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরনের ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। রাসুল বললেন, 'তোমরা দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।' তারা বললেন, আমরা দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।[১]

• পিছনে উল্লিখিত বারা বিন আজেব রাজি.-এর লম্বা হাদিসের শেষে এসেছে, ...অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইবার অথবা তিনবার বললেন, 'তোমরা কবরের শাস্তি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।' (জারিরের হাদিসে এসেছে) অতঃপর তিনি বললেন, 'মানুষ যখন দাফন শেষ করে চলে যায়, তখন মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। অতঃপর তার কবরে দুজন ফেরেশতা এসে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার রব কে? (মুমিন হলে) সে বলে, আমার রব আল্লাহ। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার দ্বীন কী? সে বলে, আমার দ্বীন ইসলাম। (রাসুলকে দেখিয়ে) তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি কে? অথবা যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে, তিনি কে? সে বলে, তিনি আল্লাহর রাসুল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়,

১. মুসলিম (২৮৬৭, ২৮৬৮)।

কীভাবে জানো? সে বলে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি এবং তাতে ঈমান এনেছি, সত্যায়ন করেছি। তখন আকাশ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করে বলেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তোমরা তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও, এবং জান্নাতের দিকে তার কবর থেকে একটি দরজা খুলে দাও। জান্নাত থেকে তার কবরে বাতাস ও প্রশান্তি আসতে থাকবে এবং তার কবরটি দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যাবে। আর (কাফের হলে) যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমার রব কে? সে বলবে, হায়! আমি জানি না। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমার দ্বীন কী? সে বলবে, হায়! আমি জানি না। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে, তিনি কে? সে বলবে, হায়! আমি জানি না। তখন আকাশ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করবেন, সে মিথ্যা বলেছে। তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও। তার কবর থেকে জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। তখন জাহান্নামের গরম ও বিষবাষ্প সেখানে আসতে থাকবে এবং তার কবরটিকে এমনভাবে সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে যে, তার পাঁজরের হাড়গুলো একটি অপরটির ভিতরে ঢুকে যাবে। (অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, তখন তার কবরে একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে নিয়োগ দেওয়া হবে। তার হাতে একটি লোহার হাতুড়ি থাকবে। যদি সেই লোহার হাতুড়ি দিয়ে একটি পাহাড়ে আঘাত করা হয়, তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। ফেরেশতা সেই লোহার হাতুড়ি দিয়ে তাকে এমনভাবে আঘাত করতে থাকবেন, যা ভূপৃষ্ঠে বিদ্যমান কেবল মানুষ ও জিন ছাড়া সকল প্রাণী শুনতে পাবে। আঘাতের প্রচণ্ডতায় সে মাটি হয়ে যাবে। তার ভিতরে পুনরায় রুহ দেওয়া হবে এবং একই রকমের শাস্তি অব্যাহত থাকবে।'[১]

- উসমান ইবনে আফফান রাজি. যখনই কোনো কবরের পাশ দিয়ে যেতেন, কেঁদে কেঁদে দাড়ি ভিজিয়ে ফেলতেন। তাকে বলা হলো, জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনায়ও তো আপনি এত কাঁদেন না। এটা নিয়ে এত কাঁদার রহস্য কী? তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল বলেছেন, কবর পরকালের প্রথম মনজিল। এখান থেকে কেউ ছাড়া পেয়ে গেলে পরবর্তী সকল মনজিল তার জন্য সহজ। আর এখানে ধরা খেয়ে গেলে পরবর্তী সকল মনজিল তার জন্য কঠিন। উসমান বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি কবরের চেয়ে ভয়ংকর কোনো দৃশ্য দেখিনি।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় মৃতকে দাফন করার পরে বলতেন,

---

১. আবু দাউদ (৭৪৫৩); বুখারি (১৩৩৮)।

'তোমরা মৃতের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো এবং তার অবিচলতার দোয়া করো। কারণ, এখন তাকে প্রশ্ন করা হবে।'[১]

কবরের শাস্তি আত্মিক নাকি দৈহিক? প্রশ্ন হতে পারে, অনেক সময় মৃতের লাশ ফ্রিজে সংরক্ষণ করা হয়, মমি করে রেখে দেওয়া হয়। তা হলে তার শাস্তি হবে কী করে? উত্তরে আমরা বলব, এগুলো সব গায়েবি বিষয়। আমাদের এগুলো উপলব্ধি করার সামর্থ্যই দেওয়া হয়নি। মানুষ তো নিজের শরীরে বিদ্যমান রুহ দেখতে পায় না, ফলে এগুলো দেখার ক্ষমতা রাখবে কীভাবে? তা ছাড়া বোধগম্য না হওয়ার যুক্তিতে কবরের শাস্তিকে অস্বীকার করা হলে আল্লাহ, ফেরেশতা, রুহ, জান্নাত, জাহান্নাম কোনোটিতেই বিশ্বাস করা অপরিহার্য হবে না। সবগুলোকেই কোনো-না-কোনো যুক্তিতে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। তাই এসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো মানুষের কাজ নয়। মানুষের কাজ আমল করা, অনুগত হওয়া। আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়া, কুরআন-সুন্নাহে যা এসেছে, যতটুকু এসেছে, সেটুকুতে বিশ্বাস রাখা; এর বাইরে যুক্তির হাল না চালানো। কবরের শাস্তি স্রেফ আত্মিক না দৈহিক, এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহে হুবহু এমন শব্দে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না। তাই এ ব্যাপারে নীরব থাকা শ্রেয়। তা ছাড়া মৃত্যুপরবর্তী জীবন পার্থিব জীবনের মতো নয়। ফলে এখানে আমরা যেভাবে কল্পনা করি, ওখানেও তেমন হবে সেটা জরুরি নয়।

তবে নসগুলো বিশ্লেষণ করলে সন্দেহাতীতভাবে বোঝা যায়, কবর ও জাহান্নামের শাস্তি আত্মিক এবং দৈহিক দুটোই। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা।[২] তাদের দলিল, যেমন উপরে একটি হাদিসে এসেছে, 'অতঃপর তার আত্মা দেহের মাঝে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।'[৩] অন্য হাদিসে এসেছে, মুনকার নাকির প্রশ্ন করার জন্য কবরে এলে তাকে বসানো হয়, এরপর প্রশ্ন করা হয়।[৪] রুহকে কেন বসাতে হবে? আর দেহের উপরই যদি শাস্তি না হয়, তবে রুহ কবরে কেন থাকবে? আর কবরেই কেন আসতে হবে ফেরেশতাদের? আর কিছু হাদিসে এসেছে, কবরের চাপে বুকের হাড়গুলো একটি অপরটির মাঝে ঢুকে যায়। ফেরেশতা হাতুড়ি দিয়ে দুই কানের মাঝে আঘাত করেন।[৫]

---

১. সুনানে ইবনে মাজা (৪২৬৭); মুসতাদারাকে হাকেম (১৩৭৭); সুনানে কুবরা, বাইহাকি (৭১৬৪)।
২. আকহাসারি (২১৬); গুনাইমি (১১৭)।
৩. হাকেম (১০৮); মুসানদে আহমদ (১৮৭৬৬); তয়ালিসি (৭৯১)।
৪. বুখারি (১৩৭৪); মুসলিম (২৮৭০)।
৫. বুখারি (১৩৩৮); তিরমিজি (১০৭১); মুসলিম (২৮৭০); আবু দাউদ (৪৭৫১); ইবনে হিব্বান (৩১১৭); বাজ্জার (৮৪৬২)।

তা ছাড়া কুরআনের অসংখ্য আয়াতে কিয়ামতের দিন মানুষের হাড়গোড় একত্র করে পুনরুত্থিত করার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ. بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ.

অর্থ: মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করব না? অবশ্যই। বরং আমি তার আঙুলগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম।' [কিয়ামাহ: ৩-৪] আল্লাহ আরও বলেন,

قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

অর্থ: সে বলে, কে জীবিত করবে অস্থিসমূহ যখন সেগুলো পচেগলে যাবে? বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলো সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত। [ইয়াসিন: ৭৮-৭৯] যদি আত্মাই যথেষ্ট হয়, তা হলে অযথা হাড়গোড় একত্র করে শরীর সৃষ্টি করার কী দরকার? আত্মার উপর হিসাব, শাস্তি বা শান্তি প্রয়োগ করলেই তো হয়। এতে স্পষ্ট বোঝা যায়, শাস্তি আত্মা ও দেহ দুটোর উপরেই হয়। এটাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সালাফের মতামত।

হ্যাঁ, আল্লাহ চাইলে কখনও কখনও কেবল আত্মার উপরও শাস্তি দিতে পারেন, আত্মার উপরও শান্তি হতে পারে। যেমন: একটি হাদিসে এসেছে, মুমিনের রুহ কখনও কখনও জান্নাত থেকে ঘুরে আসবে।[১] এবং তা বিচার দিবসের আগেই। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ, শরীর ও আত্মার মাঝে আত্মাই মূল। শরীর না থাকলেও আত্মা থাকে। ফলে আত্মার উপর শাস্তি বা শান্তি দিলে সেটা মানুষের উপরই দেওয়া হয়।

কিন্তু এগুলো অদৃশ্যের বিষয়। কুরআন-সুন্নাহে যেভাবে এসেছে সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। এক্ষেত্রে মনগড়া কথা বলা যাবে না। অস্বীকারও করা যাবে না। ইমাম তহাবিও শাস্তি কিংবা শান্তি দেহ ও আত্মা দুটোর উপরই বিশ্বাস করেন। এ জন্য বলেছেন, **কবর হয়তো জান্নাতের একটি বাগান, নয়তো জাহান্নামের একটি গর্ত।** এটি হাদিস হিসেবে যদিও দুর্বল, কিন্তু বক্তব্য সত্য। কারণ, স্রেফ আত্মার উপর শাস্তি বা শান্তি হলে কবরের সঙ্গে সেটাকে সীমাবদ্ধ রাখা নিষ্প্রয়োজন। পৃথিবীর অনেক মানুষকে কবরই দেওয়া হয় না। ফলে বোঝা যায়, আল্লাহ তাকে নির্দিষ্ট কোনো স্থানে রেখে কবরের মতো তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেবেন।

---

১. ইবনে মাজা (৪২৭১); ইবনে হিব্বান (৪৬৫৭)।

প্রশ্ন হতে পারে, দেহ যদি পুড়ে যায় বা পচে যায়, অথবা যদি ফ্রিজে সংরক্ষণ করা হয়, তবে কীভাবে তাতে শাস্তি হবে? প্রথম কথা হলো, দেহ যদি ছাই হয়ে গিয়ে থাকে, কিংবা মানুষের সামনে সংরক্ষিত থাকে, তবে আল্লাহর জন্য অসম্ভব নয় যে, তিনি আরেকটা দেহ সৃষ্ট করে সেটাতে শাস্তি দেবেন, কিংবা এই দেহেই শাস্তি দেবেন, তথাপি মানুষ দেখতে পাবে না। দ্বিতীয় কথা হলো, এমন প্রশ্ন করলে পিছনে কবর-সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা যায়। যেমন: কবর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত কীভাবে প্রশস্ত হয়, অথচ আশেপাশে তো কবর থাকে? জান্নাত কিংবা জাহান্নামের দিকে কবরের দরজা কীভাবে খোলা হয় আশেপাশে যদি নদী বা লোহার প্রাচীর থাকে? কবরে হাতুড়ি দিয়ে কীভাবে পিটানো হয়, কবর তো অনেক ছোট থাকে? বুকের হাড়গুলো একটি অপরটির মাঝে কীভাবে ঢুকে যায়? আমরা তো কোনো কারণে লাশ উত্তোলন করলে কবরে কোনো রক্ত দেখি না। কবরে জান্নাতের বিছানা কীভাবে বিছানো হয়, অথচ কবরে তো কিছুই পাওয়া যায় না? প্রতিদিন এত মানুষ মারা যায়! দুজন ফেরেশতা এতজনের কবরে কীভাবে যান? বরং মালাকুল মাওত এতজনের প্রাণ একসঙ্গে কীভাবে নেন? ইত্যাদি।

এভাবে প্রশ্ন করতে থাকলে ইসলামের সবকিছু অস্বীকার করতে হবে; অথচ মুমিন হওয়ার সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে অদৃশ্যে দৃঢ় বিশ্বাস করা। এটা না করলে কেউ মুমিনই হতে পারবে না। এটা এমন একটি পথ, যার সর্বশেষ গন্তব্য হচ্ছে আল্লাহকে অস্বীকার করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের একবার বলেন, 'অতি শীঘ্রই মানুষ তোমাদের সবকিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। একসময় তারা বলবে, সবকিছু তো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তা হলে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে কে?'[১] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি কারও মাথায় এসব প্রশ্ন আসে, সে যেন শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং এসব থেকে বিরত থাকে।[২]

এসব প্রশ্ন থেকে কেন বিরত থাকতে বলা হয়েছে? কারণ, এগুলো ভুল প্রশ্ন। এমন প্রশ্ন হয় না। যিনি সৃষ্টিকর্তা তাকে কেউ সৃষ্টি করতে হবে এমন জরুরি নয়। ধরুন, একজন মানুষ খাবার রান্না করেন। ফলে তিনি রাঁধুনি। তাকেও কি কারও রাঁধতে হবে? একজন মানুষ পড়েন। তাকেও কি কারও পড়তে হবে? ফলে কারও যদি আল্লাহর উপর খাঁটি ও নির্ভেজাল দৃঢ় ঈমান থাকে, তার কবর, কবরের দৈহিক শাস্তি, জান্নাত,

---

১. মুসলিম (১৩৫); মুসনাদে আহমদ (১১১১৩)।
২. বুখারি (৩২৭৬)।

জাহান্নাম কোনোকিছুতে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় না। কারণ, সে আল্লাহর ক্ষমতা এবং নিজের অক্ষমতা জানে না। আর যে আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে না তার মনেই এসব খুঁতখুঁতানি আসে। বস্তুত যে যত বিনয়ী এবং নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন, সে তত গভীর ঈমানের অধিকারী। আর যে নিজেকে যত বড় পণ্ডিত মনে করে, সে তত নির্বোধ, ঈমান থেকে তত দূরে। পরকালে জান্নাত ও জাহান্নামকে কেবল আত্মিক সুখ-দুঃখ হিসেবে ব্যাখ্যা করা মূলত হিন্দু, বৌদ্ধসহ বিভিন্ন পৌত্তলিক ধর্মের বিশ্বাস। অতীতের মুসলিম দার্শনিক ও যুক্তিবাদীরা এবং সমকালীন তথাকথিত বুদ্ধিজীবীগণ যখন কুরআন-সুন্নাহকে নিজেদের মতো করে অপব্যাখ্যা করেছে, আল্লাহ তাদের কুরআন-সুন্নাহর নুর থেকে বঞ্চিত করে পৌত্তলিক বিশ্বাসের কুয়াতে নাকানি-চুবানি খাইয়েছেন। বরং তাদের কেউ কেউ তো পুনরুত্থানকে অস্বীকার পর্যন্ত করেছে। তাই এ ব্যাপারে যত নীরব থাকা হবে, ততই মঙ্গল।

হিসাবের আগে শাস্তি কেন? প্রাচীন মুতাজিলা ও তাদের উত্তরাধিকার বহনকারী সমকালীন অনেকের যুক্তি হলো, পরকালে হিসাব-নিকাশের আগে কবরে শাস্তি দেওয়ার অর্থ কী? কারও ব্যাপারে ফয়সালা দেওয়ার আগে তাকে শাস্তি দেওয়া জুলুম নয় কি? তাদের কথা শুনলে মনে হয়, কবরে শাস্তি মানুষ কিংবা জিন দেয়। অথবা ফেরেশতাদের যাদের পেটাতে মনে চায়, কবরে এসে পিটিয়ে যায়। কারণ, তারা যদি একটু খেয়াল করে দেখত কবরে শাস্তি আল্লাহর নির্দেশে হচ্ছে, আল্লাহ জানেন পরকালে তার কীভাবে বিচার হবে এবং ফলাফল কী হবে। ফলে যে জান্নাতি কবর থেকেই তাকে জান্নাতের সমাদর শুরু করবেন, আর যে জাহান্নামি হবে কবর থেকেই তার শাস্তি শুরু করবেন। তা ছাড়া পরকালে বিচারের আগে পুরস্কার-তিরস্কার জুলুম হবে কীভাবে? শুধু কবর নয়, আল্লাহ তো অনেক সময় মানুষের কর্মফল দুনিয়াতেই দিয়ে দেন।

وَنُؤْمِنُ بِالبَعْثِ وَجَزَاءِ الأَعْمَالِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَالعَرْضِ وَالحِسَابِ وَقِرَاءَةِ الكِتَابِ وَالثَّوَابِ وَالعِقَابِ وَالصِّرَاطِ وَالمِيزَانِ، والمِيزان يُوزَن فِيه أَعْمَال المؤْمِنِين مِنَ الخَيْر والشَّرّ، والطَّاعَةِ والمَعْصِيَةِ.

আমরা কিয়ামতের দিন পুনরুত্থান এবং আমলের প্রতিদান পাওয়ার বিশ্বাস রাখি। বিশ্বাস রাখি আমলনামা উপস্থাপন, হিসাব-নিকাশ, আমলনামা পড়া, সাওয়াব, শাস্তি, পুলসিরাত ও মিজানের ব্যাপারে। মিজানে মুমিনের ভালোমন্দ, আনুগত্য-অবাধ্যতা সব ধরনের আমল ওজন করা হবে।

ব্যাখ্যা

পরকাল থাকার প্রয়োজনীয়তা: এটা সেই আকিদা যা মানুষকে মানুষ বানায়। জীবনের সকল অপূর্ণতা, সকল অপ্রাপ্তি, সকল দুঃখ-বেদনা ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়। তুফান ও ঝঞ্ঝাঘন জীবন-সাগরে আশার আলো দেখায়। মানুষকে বোঝায়—তোমার এই জীবন তো ক্ষণস্থায়ী। এখানে তুমি কয়েক দিনের মেহমান। তোমার ঠিকানা অন্যত্র। এখানে বেড়াতে এসেছ। সুতরাং কী পেলে আর কী না পেলে সেটা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং নিজ নিড়ে ফিরে যাবার আগে কী নিয়ে যাচ্ছ সেটা গুরুত্বপূর্ণ। এ জীবন তো কয়েক দিনের। এখানের সুখ যেমন ক্ষণিকের, এখানের দুঃখও অস্থায়ী, ম্রিয়মাণ। সুতরাং এগুলোর পিছনে পড়ার, এগুলো নিয়ে ভাবার সময় কোথায়? দুই চোখ বন্ধ হওয়ার পরে যে লম্বা সফর শুরু হবে সে সময়ের প্রস্তুতি নিতে হবে না? সে পথের পাথেয় জোগাতে হবে না? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার আর দুনিয়ার কী সম্পর্ক? আমি তো এখানে ক্ষণিকের মুসাফির, যে প্রচণ্ড রৌদ্রদাহে কয়েক মুহূর্ত গাছের ছায়ায় বসে। এরপর উঠে নিজ পথে চলতে শুরু করে।[১]

১. তিরমিজি (২৩৭৭); ইবনে হিব্বান (৬৩৫২)।

এটা সেই আকিদা, জগতের অসংখ্য মানুষ অজ্ঞতা ও অহংকারবশত যা অস্বীকার করেছে। তারা দুনিয়াকেই বড় করে দেখেছে। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসের ভিতরে ডুবে গিয়ে নিজের গন্তব্য ভুলে গেছে। মনে করেছে এটাই জীবন—এটাই শুরু এবং এটাই শেষ। সুতরাং যত পারো ভোগ করো; যত পারো, যেভাবে পারো জীবনকে লুফে নাও। নীতি-নৈতিকতা, ন্যায়-অন্যায়, জুলুম-ইনসাফ—এগুলোর কোনো মূল্য নেই। এগুলো মানুষের বানানো। যেহেতু চোখ বন্ধ হলেই সব শেষ, সুতরাং এতকিছু দেখার সময় কোথায়? ডানবাম চেনার সুযোগ কোথায়? বরং যা পারো, যত পারো কেবল নাও, খাও, আনন্দ ও উল্লাস করো। এভাবে তারা পথকেই গন্তব্য মনে করেছে। স্টেশনকে বাড়ি মনে করে মাঝপথে নৌকা ডুবিয়ে দিয়েছে।

এটা কীভাবে গন্তব্য হতে পারে? এখানে কোনো শিশু মায়ের পেটে থাকতেই মারা যায়, কেউ মৃতই জন্ম নেয়। কেউ ত্রিশ বছর পরিশ্রম করে নিজেকে গড়ে ক্যারিয়ারের শুরুতেই পৃথিবীকে বিদায় জানায়। এখানের সবলরা দুর্বলদের গিলে খায়। উঁচু তলার লোকজন নিচু তলার লোকদের সুখ-সমৃদ্ধি কেড়ে নেয়। এখানে সামান্য স্বার্থের জন্য একজন আরেকজনকে হত্যা করে কেটে টুকরো-টুকরো করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। এখানে কয়েকটা টাকার জন্য পথ চেয়ে থাকা কোনো মায়ের সন্তানকে কেউ হত্যা করে মাটিতে পুঁতে ফেলে। সামান্য মনোমালিন্য কিংবা মতভেদের কারণে কে বা কারা কোনো এক নিঝুম রাতে জানালার ধারে হারিকেনের টিমটিমে আলোর সামনে অপেক্ষমাণ নববধূর স্বপ্নপুরুষের জীবন-প্রদীপ চিরদিনের জন্য নিভিয়ে দেয়। এখানে জোর যার মুল্লুক তার। নিরপরাধ মানুষ এখানে জেলে পচে মরে। অপরাধীরা বুক ফুলিয়ে ভূপৃষ্ঠে অহংকার করে চলে। এভাবে একদিন পৃথিবীটা শেষ হয়ে যাবে। সবাই মরে যাবে।

কিন্তু তাতেই সবকিছু শেষ হয়ে যাবে? হাজার শতাব্দের এত ঋণ, এত জুলুম, এত হানাহানি, এত রক্তপাত, এত প্রতারণা, এত গাদ্দারি, এত এত অন্যায়-অনাচার যার ভারে পৃথিবী কুঁকড়ে মরেছে, সে এভাবেই সবকিছু ভুলে যাবে? যে মহান সত্তা সযতনে এই সুন্দর পৃথিবী ও সুন্দর সৃষ্টিকে আবাদ করার জন্য মানুষ পাঠালেন, এই লম্বা বিনাশ ও ধ্বংসযজ্ঞ তিনি এমনিতেই ছেড়ে দেবেন? অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যাকারীর কিছুই হবে না? রক্তের তুফান বইয়ের দেওয়া দানবরা কোনো জবাবদিহির সম্মুখীন হবে না? মানুষের মুখের খাবার নিয়ে উল্লাসকারী পশু ক্ষুধার জ্বালা টের পাবে না? নিপীড়ক নিপীড়িতের ব্যথা বুঝবে না? ধর্মকে একপাশে রেখে সুস্থ

বিবেকবোধও তো এমন জঘন্য কথা বলতে পারে না। তা হলে দুর্বলের দোষ কী? এখানে ভালো ও ভদ্র মানুষ হওয়ার সার্থকতা কী? এখানে তা হলে ইতর না হয়ে শরিফ হলে লাভ কী? যেহেতু সবার পরিণতি নিঃশেষের সঙ্গে মিশে যাওয়া, তা হলে বৈধ-অবৈধ, ন্যায়-অন্যায়, ডানবাম, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, বিবেক—এগুলোর চিন্তা করে লাভ কী? যা ইচ্ছা তা করাই তো ভালো।

যদি যা ইচ্ছা তা-ই করা যায়, তা হলে মানুষ আর পশুর মাঝে পার্থক্য কী? সবল হলেই যদি দুর্বলকে আক্রমণ করা যায়, তবে জঙ্গলের শ্বাপদ আর সৃষ্টির সেরা মানুষের মাঝে ফারাক কী? যার সঙ্গে ইচ্ছা যদি তার সঙ্গে থাকা যায়, যেভাবে ইচ্ছা মনের খাহেশ পূরণ করা যায়, তবে শূকর-কুকুর থেকে মনুষ্য নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে কেন? যদি ন্যায়-অন্যায় কিছু না থাকে, তবে মানুষ অন্যায়কে ঘৃণা করে কেন? যদি অপরাধের চিরায়ত শাস্তি না থাকে, তবে অপরাধী নীরবে কাঁদে কেন? যদি সীমালঙ্ঘন দূষণীয় না হয়, তবে সীমালঙ্ঘনের পরে মানুষ মনস্তাপে ভোগে কেন? আল্লাহ সত্য বলেছেন,

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ.

অর্থ: 'আমি আকাশ-মাটি ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোনোকিছু অযথা সৃষ্টি করিনি। এটা কাফেরদের ধারণা। অতএব, কাফেরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।' [সাদ: ২৭] অন্যত্র বলেছেন,

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ.

অর্থ: 'আমি আকাসমূহ ও মাটি আর এতদুভয়ের মাঝে যা-কিছু আছে, সেগুলো ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।' [দুখান: ৩৮] আরেক জায়গায় মানুষের বিবেককে প্রশ্ন করেছেন,

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ.

অর্থ: 'তোমরা কি মনে করেছ আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি আর তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?' [মুমিনুন: ১১৫]

এইসব 'কেন'র উত্তর হলো, এই জীবনই শেষ নয়; এই পৃথিবী ঠিকানা নয়; মৃত্যু সবকিছুর সমাপ্তি নয়; বরং মৃত্যুর পরে এমন কিছু থাকা উচিত যেখানে পৃথিবীর সকল অতৃপ্তি তৃপ্তির পথ খুঁজে পায়। এমন একটা দিন থাকা উচিত যেদিন নিহত তার হত্যার

বদলা নিতে পারে, যেখানে মজলুম জালেমের কাছ থেকে তার অধিকার বুঝে নিতে পারে। এমন একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত যাতে দুর্বল সবলের প্রতি জমে থাকা সহস্র বছরের ঋণ শোধ করে নিতে পারে। যেখানে সন্তান হারানো মাতা, স্বামী হারানো স্ত্রী তাদের প্রিয়জনের বিচায় পায়। যেখানে প্রত্যেককে তাদের কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হয়। যাতে ভালো মানুষ তার ভালো কাজের প্রতিদান পায়, মন্দ লোক তার কর্মের যথাযথ বিচার পায়। আর সেটাই আখিরাত, পরকাল, পুনরুত্থান, হাশর, নাশর, হিসাব, জান্নাত ও জাহান্নাম। এটা সেই দিন, যেদিন জগতের সকল সৃষ্টিকে তাদের সৃষ্টিকর্তার সামনে উপস্থিত হতে হবে। তিনি তাদের প্রত্যেকের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেবেন, পুণ্যবানদের প্রতিদান দেবেন। পাপাচারীদের পাপের শাস্তি দেবেন, কারও প্রতি সেদিন একবিন্দু জুলুম করা হবে না। এমনকি অবলা পশুপাখির পাওনাও তাদের পুর্ণরূপে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। শিংবিশিষ্ট যে ছাগলটি শিংহীন ছাগলকে গুঁতা দিয়েছিল, সে গুঁতা মেরে নিজ পাওনা বুঝে নেবে।[১] যেই স্রষ্টা ছাগলের পাওনা বুঝিয়ে দেবেন, তিনি মানুষকে ছাড়বেন কী করে? আল্লাহ বলেন,

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۫ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ.

অর্থ: 'যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল আর যারা জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, আমি কি তাদের উভয়কে সমান গণ্য করব? আমি কি আল্লাহভীরুদের দুরাচারীদের সমান মনে করব?'। [সাদ: ২৮]

কুরআনের একাধিক জায়গায় পরকালের অস্তিত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يُّحْيِ َۧ الْمَوْتٰى ؕ بَلٰۤى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

অর্থ: 'তারা কি জানে না যে, আল্লাহ যিনি আকাশসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর সৃষ্টিতে কোনো ক্লান্তি বোধ করেননি, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? কেন নয়? নিশ্চয় তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।' [আহকাফ: ৩৩] মৃতকে জীবিত করা তার জন্য সহজ উল্লেখ করে বলেন,

---

১. মুসতাদরাকে হাকেম (৮৮১৪); আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি (৫৪৮৩)।

أَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى أَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ بَلٰى وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ.

অর্থ: 'যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনিই কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।' [ইয়াসিন: ৮১] অন্যত্র বলেন,

أَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى أَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى.

অর্থ: 'সেই সত্তা (আল্লাহ) কি মৃতদের জীবিত করতে সক্ষম নন?' [কিয়ামাহ: ৪০] এগুলো যারা অস্বীকার করবে তাদের হুমকি দিয়ে বলেন,

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا ؕ وَعْدَ اللهِ حَقًّا ؕ إِنَّهٗ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالْقِسْطِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ أَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ.

অর্থ: 'তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে তোমাদের সবাইকে। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তিনিই সৃষ্টি করেছেন প্রথমবার, আবার পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। তাদের বদলা দেওয়ার জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে ইনসাফের সাথে। আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে ফুটন্ত পানি এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। কারণ, তারা কুফরি করত।' [ইউনুস: ৪] সৃষ্টি ও পুনরুত্থানকে তাঁর বিশেষ ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ উল্লেখ করে বলেন,

أَمَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ؕ ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللهِ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

অর্থ: 'বলো তো কে প্রথমবার সৃষ্টি করেন অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন? এবং কে তোমাদের আকাশ ও মাটি থেকে রিজিক দান করেন? আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো।' [নামল: ৬৪]

পরকালের ব্যাপারে বিভিন্ন জাতির বিশ্বাস: পৃথিবীর শুরু থেকে আল্লাহ সকল সম্প্রদায়ের মাঝে নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। প্রত্যেক নবি-রাসুল তাদের সম্প্রদায়কে ইহকাল-উত্তর পরকাল, পুনরুত্থান, হাশর, হিসাব-নিকাশ ইত্যাদি সম্পর্কে অবশ্যই

সতর্ক করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ সম্প্রদায় সেগুলো ভুলে গিয়েছে বা অস্বীকার করেছে। অনেক সম্প্রদায়ের সেসব বিশ্বাসের মাঝে বিকৃতি প্রবেশ করেছে। আবার অনেক সম্প্রদায় সেগুলো অনেকাংশে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ফলে মানুষের পুনরুত্থানকেন্দ্রিক বিশ্বাস বেশ বিচিত্র এবং এক্ষেত্রে মানুষ একাধিক ভাগে বিভক্ত।

পৃথিবীর কিছু সম্প্রদায় তাদের ভাষায় অদেখা কোনোকিছুতে বিশ্বাস করে না। ফলে পুনরুত্থান বলতেও কোনোকিছু আছে বলে স্বীকার করে না। তাদের মতে, দুনিয়ার জীবনই শুরু ও শেষ। মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সুতরাং মৃত্যুর পরে কিছু নেই। সেটা নিয়ে ভাবনারও অর্থ নেই। যত পারো ফূর্তি করে নাও। এরা সাধারণত নাস্তিক তথা স্রষ্টায় বিশ্বাসী নয়। কারণ, যে সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে সে জানে, যিনি একবার সৃষ্টি করেছেন তিনি আবারও সৃষ্টি করতে পারবেন। এরা রূহ বা আত্মায়ও বিশ্বাস নয়। কারণ, সেটা দেখা যায় না। ফলে তাদের কাছে মৃত্যু মানে সবকিছুর সমাপ্তি। কুরআন ও ইসলামি পরিভাষায় এরা 'দাহরিয়্যিন' (তথা বস্তুবাদী) নামে পরিচিত। আল্লাহ কুরআনে তাদের ব্যাপারে বলেছেন:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ.

অর্থ: 'তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো জীবন; আমরা এখানেই মরি ও বাঁচি। মহাকালই আমাদের ধ্বংস করে। বস্তুত তাদের এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞান নেই। তারা তো কেবল অনুমান করে কথা বলে।' [জাসিয়া: ২৪]

এদের কোনো কোনো সম্প্রদায় আল্লাহকে বিশ্বাস করত, কিন্তু মৃত্যুপরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করত না; যেমন মক্কার মুশরিকরা। আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেন,

إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ.

অর্থ: 'আমাদের মৃত্যু তো কেবল একটাই। আমরা পুনরুত্থিত হব না।' [দুখান: ৩৫]

আবার অনেক সম্প্রদায় মৃত্যুকে সম্পূর্ণ বিনাশ মনে করে না। তবে মৃত্যুপরবর্তী পরিণতি নিয়ে তারা বিভ্রান্ত ও বিকৃত বিশ্বাসে লিপ্ত। এসব সম্প্রদায় সাধারণত সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করে এবং আত্মার মাঝেও বিশ্বাস করে। কেউ একজন যেহেতু তাদের সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং মৃত্যুর পরে তিনি তাদের পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম,

অথবা মৃত্যুর পরে জীবন চলমান থাকতে সক্ষম—তারা এটাতে বিশ্বাস রাখে। তবে এই পুনরায় সৃষ্টি কিংবা জীবন অব্যাহত থাকার ব্যাখ্যা তারা বিভিন্নভাবে দেয়। এদের সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগ হলো আহলে কিতাব (ইহুদি-খ্রিষ্টান) এবং এগুলোর কাছাকাছি বিভিন্ন ধর্ম। তারা পরকালে বিশ্বাস করে, পুনরুত্থান-সহ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ঈমান রাখে। সেগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিকৃত হয়ে গেলেও অনেককিছু ইসলামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন পুরাতন বাইবেলে এসেছে: 'আর মাটির ধূলিতে নিদ্রিত লোকদের মধ্যে অনেকে জাগরিত হবে। কেউ কেউ অনন্ত জীবনের উদ্দেশে এবং কেউ কেউ লজ্জার ও অনন্ত ঘৃণার উদ্দেশে।' [দানিয়াল: ১২:২] ঈসা বলেন, 'আমার পিতার বাড়িতে অনেক বাসস্থান আছে, যদি না থাকত, তোমাদের বলতাম; কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছি।' [ইউহোন্না: ১৪:২]

দ্বিতীয় ভাগ হলো হিন্দু, বৌদ্ধ-সহ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন পৌত্তলিক ধর্মের অনুসারী, যারা পুনর্জন্ম, মোক্ষ, নির্বাণ ইত্যাদি-সহ বিভিন্নভাবে পরকালের ব্যাখ্যা দেয়। অসম্ভব নয় যে, এসব সম্প্রদায়ের কাছে আসা নবিদের শিক্ষাকে তারা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারেনি। ফলে নবিগণ তাদের পুনরুত্থান ও মৃত্যুপরবর্তী জীবনকে যেভাবে বুঝিয়েছেন, সেটা না বুঝে কিংবা হারিয়ে ফেলে এসব মতবাদ আবিষ্কার করেছে এবং এর মাধ্যমে সেই রহস্য ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছে।

আর কিছু সম্প্রদায় আল্লাহকে বিশ্বাস করে, আত্মায় বিশ্বাস করে। ফলে আল্লাহকে যেমন সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করে, তাকে পুনরুত্থানকারী হিসেবেও বিশ্বাস করে। কিন্তু পুনরুত্থানের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তারা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। তারা হচ্ছে মুসলমানদের কিছু বিভ্রান্ত সম্প্রদায়, যারা ইতিহাসে ঈমানের চেয়ে যুক্তিকে আগে রেখেছে। তারা ভ্রান্ত দার্শনিকগণ (ফালাসিফা)। তাদের যুক্তি তাদের বলেছে, মানুষ মরে গেলে পচে যায়, সবকিছু নিঃশেষ হয়ে যায়। সুতরাং মানুষের শরীরকে আবার নতুন করে গড়া সম্ভব নয়। বিপরীতে মানুষের আত্মা চিরন্তন। এর কোনো মৃত্যু নেই। ফলে পুনরুত্থান হবে, কিন্তু সেটা আত্মিকভাবে, দৈহিকভাবে নয়। তাদের ধারণা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কোনো নবি দৈহিক পুনরুত্থানের কথা বলেননি।[১]

১. কারি মুহাম্মাদ তৈয়্যব (১১৯); বিস্তারিত দেখুন: ইবনে সিনা কৃত 'আল-আজহাবিয়্যাহ ফিল মাআদ' গ্রন্থ।

বিশুদ্ধ ইসলামের পতাকাবাহী তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সকল অনুসারী পরকাল সম্পর্কে ঠিক সেই বিশ্বাস রাখে, যুগে যুগে সকল নবি-রাসুল যেই বিশ্বাসের দাওয়াত নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন, আল্লাহ যেই বিশ্বাসের কথা কুরআনে অবতীর্ণ করেছেন, হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম মুসলমান যেটাকে সুসংরক্ষিত রেখেছে। পরকালের ব্যাপারে আহলে সুন্নাতের আকিদা হলো—যেমন ইমাম তহাবি বলেছেন—**আমরা কিয়ামতের দিন পুনরুত্থান এবং আমলের প্রতিদান পাওয়ার বিশ্বাস রাখি। বিশ্বাস রাখি আমলনামা উপস্থাপন, হিসাব-নিকাশ, আমলানামা পড়া, সাওয়াব, শাস্তি, পুলসিরাত ও মিজানের ব্যাপারে। মিজানে মুমিনের ভালোমন্দ, আনুগত্য-অবাধ্যতা সব ধরনের আমল মাপা হবে।** অর্থাৎ এই পৃথিবী একদিন আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করে দেবেন। তখন গোটা বিশ্বজগতে আল্লাহ ছাড়া যা-কিছু আছে, সব ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ সকল সৃষ্টিকে একটি বিশেষ দিনে পুনরায় জীবিত করবেন। সেই দিনটি কিয়ামত দিবস হিসেবে পরিচিত। এদিন আল্লাহ গোটা সৃষ্টিকে জীবিত করে একটি জায়গায় সশরীরে সমবেত করবেন, যাকে বলা হয় হাশর। সেখানে মানুষ ও জিন-সহ গোটা সৃষ্টির বিচার করবেন। পৃথিবীতে কৃত তাদের সকল কর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেবেন। অতঃপর মানুষ ও জিন ছাড়া সকল প্রাণীকে মাটিতে পরিণত করবেন। আর এই দুই জাতির ভিতরে মুমিন-মুসলমানদের জান্নাত দান করবেন, অবিশ্বাসী কাফের ও মুশরিকদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

পরকাল সকল নবি-রাসুলের দাওয়াত: তাওহিদের মতোই পুনরুত্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস। ঈমানের রুকনগুলোর মাঝে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুকন। বরং এটা তাওহিদের বিশ্বাসের পরিপূরক। কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করবে তাকে পরকাল, পুনরুত্থান, বিচার, জান্নাত-জাহান্নাম—এগুলোতেও বিশ্বাস করতে হবে। ফলে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, পৃথিবীতে প্রেরিত সকল নবি-রাসুল পুনরুত্থানের ব্যাপারে তাদের উম্মাহকে বলে গিয়েছেন, যদিও অন্যান্য সম্প্রদায় নবিদের নিয়ে আসা সেসব বিশ্বাস সুরক্ষিত রাখতে পারেনি, তবে কুরআন-সুন্নাহ থেকে আমরা সেগুলো জানতে পারি।

আদম আলাইহিস সালামকে পৃথিবীতে পাঠানোর সময় আল্লাহ তাকে বলে দেন,

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ . قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ.

অর্থ: 'তিনি বলেন, তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। তোমাদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে বাসস্থান এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমরা সেখানে থাকবে। তিনি বললেন, তোমরা সেখানেই জীবিত থাকবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুত্থিত হবে।' [আরাফ: ২৪-২৫] বরং ইবলিসও পরকাল সম্পর্কে বিশ্বাস করে। সে আল্লাহর উদ্দেশে সৃষ্টির শুরুতে বলেছিল,

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِيْ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ . قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ . إِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ.

অর্থ: 'সে বলল—হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন—তোমাকে অবকাশ দেওয়া হলো, সেই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত।' [হিজর: ৩৬-৩৮] নুহ আলাইহিস সালাম তাঁর সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলেন,

وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا . ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا.

অর্থ: 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মৃত্তিকা থেকে উদ্‌গত করেছেন। অতঃপর তাতে ফিরিয়ে নেবেন এবং আবার পুনরুত্থিত করবেন।' [নুহ: ১৭-১৮] ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বলেন,

وَالَّذِيْۤ أَطْمَعُ أَنْ يَّغْفِرَ لِيْ خَطِيْۤـَٔتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ.

অর্থ: 'আর যার কাছে আমি আশা করি যে, তিনি বিচারের দিন আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষম করে দেবেন।' [শুআরা: ৮২] অন্যত্র তিনি দোয়া করেন,

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ.

অর্থ: 'হে আমাদের পালনকর্তা, হিসাবের দিবসে আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন।' [ইবরাহিম: ৪১]

আল্লাহ তায়ালা মুসা আলাইহিস সালামকে লক্ষ্য করে বলেন,

إِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعٰى . فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى.

অর্থ: 'কিয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন রাখছি যাতে প্রত্যেকেই তার কৃতকর্ম অনুসারে ফল লাভ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে তা থেকে নিবৃত্ত না করে। তা হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।' [তহা: ১৫-১৬] মুসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতে স্বয়ং

ফেরাউন সম্প্রদায়ের কিছু লোক মুমিন হয়ে যায়। তার বক্তব্য শুনলেও বোঝা যায় মুসা আলাইহিস সালাম তাওহিদ এবং পরকাল দুটোর দাওয়াতই দিয়েছেন। আল্লাহ সে সম্পর্কে বলেন,

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗۤ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ.

অর্থ: 'ফেরাউন গোত্রের এক মুমিন ব্যক্তি—যে তার ঈমান গোপন রাখত—সে বলল, তোমরা কি একজনকে এ জন্য হত্যা করবে যে, তিনি বলেন আমার পালনকর্তা আল্লাহ? অথচ তিনি তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণ-সহ তোমাদের নিকট আগমন করেছেন। যদি তিনি মিথ্যাবাদী হন, তবে সেটার দায়ভার তার কাঁধেই। আর যদি তিনি সত্যবাদী হন, তবে তিনি যে (শাস্তির) কথা বলছেন, তার কিছু-না-কিছু তোমাদের স্পর্শ করবেই। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী মিথ্যুককে পথপ্রদর্শন করেন না।' [গাফের: ২৮] বরং পরকালে সকল কাফেররা স্বীকার করবে যে, তাদের কাছে প্রেরিত রাসুলগণ তাদের পরকাল ও পুনরুত্থান সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। আল্লাহ বলেন,

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰۤى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ.

অর্থ: 'হে জিন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসুলগণ আগমন করেননি, যারা তোমাদের আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করতেন এবং তোমাদের আজকের এ দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে সতর্ক করতেন? তারা বলবে, আমরা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলাম। পার্থিব জীবন তাদের প্রতারিত করেছে। তারা নিজেদের বিরুদ্ধে স্বীকার করে নিয়েছে যে, তারা কাফের ছিল।' [আনআম: ১৩০] অন্যত্র বলেন,

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَاۤ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ.

অর্থ: 'কাফেরদের জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে, তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের প্রহরীরা তাদের বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসুলগণ আসেননি, যারা তোমাদের নিকট তোমাদের রবের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করতেন এবং তোমাদের এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে সতর্ক করতেন? তারা বলবে, হ্যাঁ, এসেছিলেন। কিন্তু কাফেরদের উপর (আল্লাহর) শাস্তির বিধান অবধারিত হয়ে গেছে।' [জুমার: ৭১]

এভাবে আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত গোটা পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের কাছে তাদের নবি-রাসুলগণ পরকালের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু তারা সেগুলো গ্রহণ করেনি বা হারিয়ে ফেলেছে এবং এক পর্যায়ে পরকালকে অস্বীকার করে সেখানে বিভিন্ন বিভ্রান্ত আকিদা ঢুকিয়েছে। কাফেরদের মিথ্যা কসম ও তার খণ্ডনে আল্লাহ বলেন,

وَ اَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ ؕ بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ: 'তারা আল্লাহর নামে কঠোর শপথ করে বলে যে, আল্লাহ মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। অবশ্যই (করবেন)। এটা আল্লাহর দৃঢ় প্রতিশ্রুতি। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।' [নাহল: ৩৮] কাফেররা মনে করত, মানুষ পচেগলে নিঃশেষ হয়ে গেলে আল্লাহ তাদের জীবিত করতে পারবেন না। আল্লাহ তাদের খণ্ডনে বলেন,

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا. قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا. اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ؕ قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ؕ قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا

অর্থ: 'তারা বলে, যখন আমরা বিচূর্ণ অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি নতুন করে সৃজিত হয়ে উত্থিত হব? আপনি বলুন, তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহা, অথবা এমন কোনো বস্তু, যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন। এর পরেও তারা বলবে, আমাদের কে পুনর্বার সৃষ্টি করবে? আপনি বলে দিন, যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তারা আপনার সামনে মাথা নাড়বে এবং বলবে, এটা কবে হবে? বলুন, হবে খুব শ্রীঘ্রই।' [ইসরা: ৪৯-৫১] অন্যত্র তাদের খণ্ডনে বলেন,

وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ۚ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ۚ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا . ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا . اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۚ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا.

অর্থ: 'আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন সে-ই সঠিক পথপ্রাপ্ত, আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাদের জন্য আপনি আল্লাহ ছাড়া কোনো সাহায্যকারী পাবেন না। আমি কিয়ামতের দিন তাদের অন্ধ, মূক ও বধির অবস্থায় তাদের মুখের উপর টেনেহিঁচড়ে সমবেত করব। জাহান্নাম তাদের আবাসস্থল। যখনই (আগুন) নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে, আমি তার শিখা আরও বাড়িয়ে দেবো। এটাই তাদের শাস্তি। কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে এবং বলেছে, আমরা যখন শীর্ণ ও বিচূর্ণ অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি আমরা নতুনভাবে সৃজিত হয়ে উত্থিত হব? তারা কি দেখেনি, যে আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের মতো মানুষও সৃষ্টি করতে সক্ষম? তিনি তাদের জন্য স্থির করেছেন একটি নির্দিষ্ট সময়, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবুও জালেমরা কেবল অস্বীকারই করল।' [ইসরা: ৯৭-৯৯]

একইভাবে ফালাসিফা (দার্শনিকরা)-সহ যারা পরকালকে কেবল আত্মিক পুনরুত্থান মনে করেছে, তারাও বিভ্রান্ত। বরং তাদের বিভ্রান্তি বেশ দুঃখজনক। তারা আল্লাহ তায়ালাকে বিশ্বাস করে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানে, কুরআন-সুন্নাহে বিশ্বাস রাখে। এর পর নিজেদের বুদ্ধির দম্ভে শারীরিক পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে। অথচ কুরআন-হাদিস এ-সম্পর্কিত নুসুসে ভরপুর। তারা এক্ষেত্রে সে যুগের বিজ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে দলিল দিয়েছে। অথচ এক্ষেত্রে যে তারা প্রচণ্ড স্ববিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে, সেটা দেখতে পায়নি। তারা মনে করেছে, মানুষ মরে গেলে শরীর পচে যায়। একপর্যায়ে সেটা মাটিতে মিশে নিঃশেষ হয়ে যায়। সুতরাং এগুলোকে আবার একত্র করা সম্ভব নয়। যে আল্লাহ অনস্তিত্ব থেকে সবকিছু অস্তিত্বে এনেছেন, তিনি নিঃশেষ হওয়া শরীরকে পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না? বরং দ্বিতীয়বার জীবিত করা আরও সহজ নয় কি? যিনি গোটা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন, তিনি ক্ষুদ্র মানুষকে জীবিত করতে পারবেন না? যিনি আত্মা সৃষ্টি করেছেন এবং পুনরুত্থিত করবেন, তিনি শরীর পুনরুত্থিত করতে পারবেন না? এমন হাস্যকর কথা পৃথিবীতে আর

নেই। ঈজি রাহি. বলেন, সকল সম্প্রদায়ের লোক দেহগত পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে, দার্শনিকরা ছাড়া। কারণ, তারা এটাকে অস্বীকার করে।[১] যারা দেহগত পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে, ইমাম গাজালি রাহি. তাদের সুনিশ্চিত কাফের আখ্যা দিয়েছেন।[২]

তারা যুক্তিকে কুরআন-সুন্নাহর উপর প্রাধান্য দিয়েছে। ফলে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنٰهُ أَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

অর্থ: 'আমি যখন কোনোকিছু করার ইচ্ছা করি, তখন তাকে কেবল এতটুকুই বলি যে, হয়ে যাও। সুতরাং তা হয়ে যায়।' [নাহল:৪০] আল্লাহর জন্য দেহ-সহ পুনর্জীবিত করা কঠিন হয় কী করে? তিনি তো সেটা চোখের পলকে করতে পারেন। আল্লাহ বলেন,

وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِالْبَصَرِ.

অর্থ: 'আমার কাজ তো এক মুহূর্তে চোখের পলকের মতো।' [কামার: ৫০] গোটা দুনিয়ার সবকিছুর সৃষ্টি আল্লাহর কাছে একজনকে সৃষ্টির মতোই। তিনি বলেন,

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ.

অর্থ: 'তোমাদের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান তো মাত্র একটি প্রাণের সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের সমানই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।' [লুকমান: ২৮] যুক্তিবাদী এসব নির্বোধ মানুষকে আল্লাহ তার অতীত স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, অনস্তিত্ব থেকে সৃষ্টি করতে পারলে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কঠিন কেন হবে? তিনি বলেন,

وَيَقُوْلُ الْإِنْسَانُ ءَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا.

অর্থ: 'মানুষ বলে, আমার মৃত্যু হলে পরে আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব? সে কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতঃপূর্বে সৃষ্টি করেছি, অথচ সে তখন কিছুই ছিল না?' [মারইয়াম: ৬৬-৬৭]

---

১. বিস্তারিত দেখুন: আল-মাওয়াকিফ, ঈজি (৩৭২-৩৭৪)।
২. ফয়সালুত তাফরিকাহ, গাজালি (৫২)।

তা ছাড়া পৃথিবীতেও এমন ঘটনা ঘটেছে। যেমন: কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আসহাবে কাহাফের তিনশো নয় বছর পর তাদের দৈহিকভাবে জীবিত করেছেন। [কাহাফ: ২৫] একইভাবে কুরআনে গাধার ঘটনা, যেটাকে আল্লাহ একশো বছর পরে জীবিত করেন। অথচ সেটা মরে হাড়গুলোও ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছিল। [বাকারা: ২৫৯] তা হলে পরকালে তিনি কেন মানুষকে দেহ-সহ জীবিত করতে পারবেন না? বরং এ ধরনের কথা কুফর।

পরকালের সফর-কবর থেকে জান্নাত পর্যন্ত: কুরআন-সুন্নাহে কিয়ামত দিবস-সংক্রান্ত আলোচনা বেশ দীর্ঘ ও বিস্তারিত, যা সংক্ষিপ্ত এই গ্রন্থে সবিস্তারে আনা সম্ভব নয়। ফলে আমরা এখানে কেবল কুরআন-হাদিসনির্ভর কিছু মৌলিক কথার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকব, ইনশাআল্লাহ।[১]

পৃথিবীর সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে আল্লাহ তায়ালা শিঙার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা ইরসাফিল আলাইহিস সালামকে শিঙায় ফুঁক দিতে বলবেন। তিন ফুঁক দিলে গোটা জগৎসংসার ধ্বংস হয়ে যাবে। এমনকি জিবরাইল আলাইহিস সালাম, ইসরাফিল আলাইহিস সালাম এবং সর্বশেষে মৃত্যুর ফেরেশতা নিজেও মৃত্যুবরণ করবেন।[২] তখন গোটা চরাচরে বাকি থাকবেন কেবল চিরঞ্জীব ও মহা-মহীয়ান বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালা, যেমন ছিলেন সৃষ্টির পূর্বে। তখন তিনি বলবেন, 'আজ রাজত্ব কার?' পরে তিনি নিজেই জবাব দেবেন, 'মহা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর।' [গাফের: ১৬] অতঃপর তিনি সর্বপ্রথম ইসরাফিলকে জীবিত করবেন। নির্ধারিত একটা সময় পরে ইসরাফিল আবার শিঙায় ফুঁক দেবেন। তখন সবাই পুনরায় জীবিত হয়ে যাবে এবং যার যার কবর থেকে উঠে হাশরের ময়দানের দিকে ছুটতে থাকবে। আল্লাহ বলেন,

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ . مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ . فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ . وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ .

---

১. উল্লেখ্য, কুরআন-সুন্নাহে কিয়ামত দিবসের ঘটনাপরম্পরার ধারাবাহিক কোনো বর্ণনা আসেনি। ফলে এখানে আমরা যে ধারাবাহিকতা উল্লেখ করেছি সেটা ইজতিহাদি বিষয়। কোনোটা আগেপরে হতে পারে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

২. ইমাম ইবনে কাসির রাহি.-সহ অনেক আলিম ইসরাফিল আলাইহিস সালামের মৃত্যুর কথাও বলেছেন (তাফসিরে ইবনে কাসির ৭/১০৬)। কিন্তু এটা অকাট্য বিষয় নয়। কারণ, কুরআনের অন্য আয়াত দেখলে বোঝা যায়, আল্লাহ তায়ালা কিছু সৃষ্টিকে এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবেন [জুমার: ৬৮]। কিন্তু তারা কারা সেটা কুরআন-হাদিসে সুস্পষ্ট নয়। উলামায়ে কেরাম মনে করেন আরশ, জান্নাত, জাহান্নাম এবং ইসরাফিল আলাইহিস সালাম। আল্লাহ ভালো জানেন।

অর্থ: 'তারা বলে, তোমরা সত্যবাদী হলে বলো এই ওয়াদা কবে বাস্তবায়িত হবে। তারা কেবল একটা ভয়ংকর নিনাদের অপেক্ষা করছে, যা তাদের আঘাত করবে তাদের পারস্পরিক বাকবিতণ্ডার সময়ে। ফলে তারা ওসিয়তও করতে সক্ষম হবে না, না পারবে তাদের পরিবারের কাছে ফিরে যেতে। আর (তখন) শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে, সঙ্গে সঙ্গে তারা কবর থেকে উঠে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে।' [ইয়াসিন: ৪৮-৫১]

কিয়ামতের দিন মানুষ তিনভাবে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে: একদল পায়ে হেঁটে, আরেক দল বাহনে চড়ে, আরেক দল মুখে ভর দিয়ে আসবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, মুখে ভর দিয়ে কীভাবে আসবে? তিনি বললেন, যিনি তাদের পায়ে হাঁটিয়েছেন, তিনি তাদের মুখে হাঁটাতেও সক্ষম।[১] সবাই নগ্নপদ, নগ্নশরীর ও খতনাবিহীন অবস্থায় উপস্থিত হবে। আয়েশা রাজি. রাসুলুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেন, কেউ কি কারও দিকে তাকাবে না? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ব্যাপারটা এত ভয়ংকর হবে যে, একজন আরেকজনের দিকে তাকানোর সুযোগই পাবে না।[২]

কিয়ামতের দিন অত্যন্ত ভয়ংকর একটি দিন হবে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এর ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَ مَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَ لٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ.

অর্থ: 'হে লোকসকল, তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই কিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী গর্ভপাত করে ফেলবে। মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল, অথচ তারা মাতাল নয়। বস্তুত আল্লাহর শাস্তি অনেক কঠিন।' [হজ: ১-২] কুরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ এ দিনটিকে 'হৃদয় ও চোখ উলটে যাওয়ার দিন' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন,

১. তিরমিজি (৩৪৪৮); তয়ালিসি (২৬৯৪); মুসনাদে আহমদ (৮৮৩১)।
২. বুখারি (৬৫২৭); মুসলিম (২৮৫৯)।

يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ

[নুর: ৩৭]। সেদিন প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। মানুষ প্রিয়জনদের থেকে পলায়ন করবে। আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ . وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ . وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ . لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ.

অর্থ: যেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাইয়ের কাছ থেকে, মাতা-পিতা এবং স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে, সেদিন প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকবে।' [আবাসা: ৩৪-৩৭]

এই কঠিন অবস্থায় তারা হাশরের ময়দানে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করবে। হাশরের দিনটি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। [মাআরিজ: ৪] আর আল্লাহর কাছে একদিন আমাদের একহাজার বছর। [হজ: ৪৭] একদিকে অপেক্ষা, অপরদিকে হিসাবের আশঙ্কা, মানুষের ভিড়, সূর্যের কাছে আসার কারণে গরম ও পিপাসায় তাদের ছাতি ফেটে যাওয়ার উপক্রম হবে। মুসলিমের হাদিসে এসেছে, সূর্য মানুষের এক মাইল দূরে থাকবে।[১] ঘাম বাড়তে থাকবে—কারও থাকবে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত, কারও ঘাম হবে হাঁটু পর্যন্ত, কারও কোমর পর্যন্ত, কারও কাঁধ পর্যন্ত, কারও কান পর্যন্ত; আবার কেউ পুরোটাই ঘামে ডুবে যাবে।[২] একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, প্রায় চল্লিশ বছর এভাবে মানুষ দাঁড়িয়ে হিসাবের অপেক্ষা করবে।[৩] কিন্তু আল্লাহর কাছের বান্দাদের জন্য এটা সহজ হবে। কারণ, একদিকে তাদের ছায়া দেওয়া হবে। তাদের জন্য এটা হবে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঝুলে পড়ার পর থেকে অস্ত যাওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত।[৪]

তখন আল্লাহ তায়ালা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাউজে কাওসার দান করবেন। তিনি সেখান থেকে তাঁর সুন্নাহর পথে অবিচল উম্মতকে পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করবেন। সকল নবিকে হাউজ দেওয়া হবে। তারাও তাদের প্রকৃত অনুসারীদের পান করাবেন।[৫] তখনও অপেক্ষা চলতে থাকবে। একপর্যায়ে মানুষ

---

১. মুসলিম (২৮৬৪)।
২. বুখারি (৪৯৩৮); মুসলিম (২৮৬২, ২৮৬৪)।
৩. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (৯৭৬৩)।
৪. ইবনে হিব্বান (৭৩৩৩); মুসনাদে আবু ইয়ালা (৬০২৫)।
৫. তিরমিজি (২৪৪৩); আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (৬৮৮১)।

অস্থির হয়ে বিভিন্ন নবির কাছে গিয়ে আল্লাহর কাছে হিসাব শুরুর সুপারিশ করতে বলবে। নবিগণ অপারগতা প্রকাশ করবেন। সবশেষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলে তিনি সম্মতি জানাবেন। তিনি আল্লাহর আরশের কাছে এসে সিজদায় পড়ে কান্নাকাটি করবেন। আল্লাহ তাকে দরখাস্ত পেশ করার অনুমতি দিলে তিনি হিসাব শুরু করার আরজি পেশ করবেন। আল্লাহ সেটা গ্রহণ করবেন।

তখন প্রত্যেককে আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে এবং তার সামনে প্রত্যেকের আমলনামা পেশ করা হবে। এটাকে 'আরজ' বলা হয়। অনেককে আল্লাহ তায়ালা এটুকু করেই মুক্তি দিয়ে দেবেন। এ জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় দোয়া করতেন। اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا অর্থ: 'হে আল্লাহ, আমার সহজ হিসাব নিন।' সহজ হিসাব মানে শুধু আল্লাহর সামনে উপস্থাপিত হবে। আল্লাহ প্রত্যেকের আমলনামার দিকে তাকাবেন। তখন সবাই প্রচণ্ড আতঙ্কিত থাকবে। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে অনেকের আমলমানায় কেবল দৃষ্টি দিয়ে ছেড়ে দেবেন, হিসাব চাইবেন না। তারাই প্রকৃত সৌভাগ্যবান। কিন্তু আল্লাহ যাদের কাছে হিসাব চাওয়া শুরু করবেন, তারা আটকে যাবে।[১] আল্লাহ নিজে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করবেন। তাঁর মাঝে এবং বান্দার মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না। প্রত্যেকে সেগুলোর জবাব দেবে। কিছু মানুষ নিজেকে বাঁচানোর জন্য স্বয়ং আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যা বলবে। আল্লাহ বলেন,

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

অর্থ: 'আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্র করব, অতঃপর যারা শিরক করেছিল তাদের বলব, যাদের তোমরা অংশীদার বলে ধারণা করতে, তারা কোথায়? তখন তাদের কুফরের একটিই পরিণতি হবে যে, তারা বলবে—হে আমাদের প্রতিপালক, আল্লাহর কসম, আমরা মুশরিক ছিলাম না। দেখুন, কীভাবে তারা মিথ্যা বলছে নিজেদের বিপক্ষে? এবং তারা আপনার প্রতি যেসব মিথ্যা অপবাদ দিত, সবই উধাও হয়ে গেছে।' [আনআম: ২২-২৪]

এভাবে তারা বিভিন্ন অজুহাতে পার পাওয়া চেষ্টা করবে। কুরআনের মতো হাদিসেও এসেছে, তারা আল্লাহর সামনে সরাসরি মিথ্যা বলবে—হে আল্লাহ, আমি

১. ইবনে খুজাইমা (৮৪৯); ইবনে হিব্বান (৭৩৭২)।

তো নামাজ-রোজা করতাম।[1] আল্লাহ বলবেন—ঠিক আছে, আমি সাক্ষ্য উপস্থিত করছি। তখন তারা মনে মনে ভাববে, কে সাক্ষ্য দেবে? অতঃপর তাদের মুখে সিল মেরে দেওয়া হবে। তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। মানুষের শরীরের হাড়, মাংস, উরু ইত্যাদি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।[2] কুরআনে আল্লাহ সেই চিত্র এভাবে অঙ্কন করেছেন:

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

অর্থ: 'আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেবো। আর তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে। তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।' [ইয়াসিন: ৬৫]

আল্লাহ সেদিন নবিদেরও জিজ্ঞাসা করবেন। নবিরা তাদের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন কি না, সে ব্যাপারে জানতে চাইবেন। আল্লাহ বলেন:

فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ.

অর্থ: 'অতএব, আমি অবশ্যই তাদের জিজ্ঞেস করব যাদের কাছে রাসুল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব রাসুলগণকে।' [আরাফ: ৬] কাফেররা এটাও অস্বীকার করবে। তারা বলবে, আমাদের কাছে আপনার পক্ষ থেকে কেউ আসেনি। অথচ তাদের কাছে নবিগণ এসেছেন। তারা নবিগণকে কষ্ট দিয়েছে; কাউকে হত্যা করেছে। আর কিয়ামতের দিন বলবে কেউ আসেনি। তখন উম্মতে মুহাম্মাদি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে বলবে—তারা মিথ্যা বলছে। তাদের কাছে নবিগণ এসেছেন। তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে—তোমরা কীভাবে জানলে? তারা বলবে—কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে।[3] অন্যত্র বলেন,

فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ. عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থ: 'অতএব, আপনার পালনকর্তার কসম! আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসা করব, যা তারা করত সে ব্যাপারে।' [হিজর: ৯২-৯৩]

কারও যেন আল্লাহর ব্যাপারে জুলুমের চিন্তা না থাকে, তাই সবার আমলনামা সবার হাতে দেওয়া হবে। প্রত্যেককে সেটা পড়তে বলা হবে। আল্লাহ বলেন,

---

১. মুসলিম (২৯৬৮); ইবনে হিব্বান (৪৬৪২)।
২. ইবনে হিব্বান (৪৬৪২)।
৩. বুখারি (৭৩৪৯)।

اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا.

অর্থ: 'পাঠ করো তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট।' [ইসরা: ১৪] প্রত্যেকে নিজের আমলনামা নিজে পড়বে এবং কাফেররা আতঙ্কিত হয়ে বলবে,

وَ وُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَ يَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰىهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ؕ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا.

অর্থ: 'আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে তার কারণে আপনি অপরাধীদের ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবে—আফসোস, এ কেমন আমলনামা! ছোটবড় কোনোকিছুই যে বাদ দেয়নি, সবকিছু লিখে রেখেছে! তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না।' [কাহাফ: ৪৯]

যাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তাদের হিসাব সহজ হবে:

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ . فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا.

[ইনশিকাক:৭-৮], আর যাদের বাম হাতে দেওয়া হবে, তাদের হিসাব কঠিন হবে। তারা বলবে—হায়, যদি এটা না দেওয়া হতো!

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتٰبَهٗ بِشِمَالِهٖ ۙ فَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِیْ لَمْ اُوْتَ كِتٰبِيَهْ.

[হাক্কাহ: ২৫]। কিন্তু তখনও সবাই আতঙ্কিত থাকবে। কারণ, কিতাব পড়েও বুঝতে পারবে না আমলনামায় কোনটা বেশি হবে, কোনটা কম হবে।

অতঃপর মিজান তথা দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। কুরআনের একাধিক আয়াতে মিজানের কথা এসেছে। [আরাফ: ৮-৯, আম্বিয়া: ৪৭] এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসগুলো মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে।[১] এটা বাস্তবিক দাঁড়িপাল্লা এবং এর দুটো পাল্লা থাকবে। খারেজি, রাফেজি এবং কিছু মুতাজিলা এটাকে অস্বীকার করে।[২] তাদের কথা ভুল। তবে এর রূপরেখা কী হবে আল্লাহ তায়ালা ভালো জানেন। তাতে প্রত্যেকের আমল মাপা হবে। মানুষ ও জিন ছাড়া সকল পশু-পাখির উপস্থিত ফয়সালা করে তাদের

১. বুখারি (২০৯৭, ৬৪০৬, ৬৫৬৩); মুসলিম (৭১৫); আবু দাউদ (৪৭৯৯); মুসতাদরাকে হাকেম (৮৮৩৭)।
২. শাইবানি (৩৭); গুনাইমি (১১৯)।

মাটিতে পরিণত করা হবে। তাদের দেখে কাফেররা আফসোস করতে থাকবে এবং মাটি হতে চাইবে। [নাবা: ৪০] আল্লাহ অনেক মানুষকে সেদিন হিসাব ছাড়াই জান্নাত দান করবেন। তাদের কোনো হিসাবই হবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ আমাকে ওয়াদা দিয়েছেন—আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার মানুষকে কোনো প্রকারের হিসাব ও আজাব ছাড়াই জান্নাত দান করবেন। তাদের মাঝে কারা অন্তর্ভুক্ত থাকবে আল্লাহ ভালো জানেন। তবে বিভিন্ন হাদিসে তাদের কিছু গুণা বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন: তারা আল্লাহর উপর ভরসা করবে। জাহেলি যুগের বিভিন্ন প্রথা, যেমন ঝাড়ফুঁক, কুলক্ষণ-সুলক্ষণ ধরা, আগুনে ছ্যাঁক দেওয়া ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকে।[১]

অতঃপর আল্লাহর অনুগ্রহ এবং মানুষের আমলের ভিত্তিতে মানুষকে আলাদা করে ফেলা হবে। মুমিনদের একসঙ্গে করা হবে। প্রত্যেক মুমিন উম্মত তাদের নবির পতাকাতলে সমবেত হবে। কাফেরদের অন্যপাশে একত্র করা হবে। সকল কাফের ও মুশরিক এক জায়গাতে থাকবে। তাদের নেতৃত্বে থাকবে শয়তান এবং অন্যান্য কাফের নেতা।[২] আল্লাহ বলবেন,

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ.

অর্থ: 'একত্র করো জালেমদের, তাদের দোসরদের এবং তারা যাদের ইবাদত করত তাদের।' [সাফফাত: ২২] সেখান থেকেই তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। প্রথমে নিক্ষেপ করা হবে মুশরিক ও পৌত্তলিকদের। এরপর ইহুদি-খ্রিষ্টানদের। এভাবে কাফের-মুশরিকদের ফয়সালা হয়ে যাবে।

তখন এমন কিছু লোকের বিচার হবে, যাদের কাছে কোনো নবি আসেনি। তারা বলবে—হে আল্লাহ, আমাদের কাছে কোনো নবি আসেনি। আর আল্লাহ নবি পাঠানো ছাড়া কাউকে শাস্তি দেন না। আল্লাহ বলেন,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا.

অর্থ: 'আমি রাসুল পাঠানোর আগ পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দিই না।' [ইসরা: ১৫] কিংবা যারা তাদের হুকুমে থাকবে, যেমন: মুশরিকদের শিশু বাচ্চা যে বালেগ হওয়ার

---

১. বুখারি (৬৪৭২); মুসলিম (২১৮); তিরিমিযী (২৪৩৭)।
২. ইবনে হিব্বান (৪৬৪২)।

আগেই মৃত্যুবরণ করেছে, অথবা বর্তমান সময়েও বিজন ও পৃথিবী-বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপে নিরক্ষর ও বয়োবৃদ্ধ কোনো মানুষ যে ইসলাম সম্পর্কে কখনও চেষ্টা করেও জানতে সক্ষম হয়নি। আল্লাহ তাদের কিয়ামতের দিন পরীক্ষা নেবেন। যে আল্লাহর নির্দেশ পালন করবে, সে মুক্তি পাবে। আর যে অবাধ্য হবে, সে জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ কাউকে বিন্দু পরিমাণ জুলুম করবেন না।[১]

এভাবে হাশরের মাঠে তখন থাকবে কেবল মুমিনগণ। তাদের সঙ্গে থাকবে মুনাফিকরা। অতঃপর জাহান্নামের উপর পুল (সিরাত) স্থাপন করা হবে। এটা হবে চুলের চেয়েও চিকন, তরবারির চেয়েও ধার।[২] এর স্বরূপ আল্লাহ ভালো জানেন। আমাদের কাজ হলো বিশ্বাস করা। কাফের-মুশরিকরা পুল পার হবে না। কারণ, তাদের আগেই জাহান্নামে ফেলা হবে। তখন উপস্থিত মুমিন ও মুনাফিকদের পুল পার হওয়ার জন্য বলা হবে। আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا.

অর্থ: 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে সেখানে পৌঁছবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফায়সালা।' [মারইয়াম: ৭১] পুলের জায়গাটা ঘোর অন্ধকার থাকবে।[৩] তাই সেখানে পথচলার জন্য সবাইকে আলো দেওয়া হবে। মুমিনদের মাঝে সর্বপ্রথম উম্মতে মুহাম্মাদি এটা পার হবে। সবার আগে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুল পার হবেন। তিনি পার হওয়ার পরে তার উম্মত পার হওয়া শুরু করবে। প্রত্যেকে নিজের আমল অনুযায়ী প্রদত্ত আলোতে সামনে অগ্রসর হতে থাকবে। কেউ বিজলির গতিতে পার হবে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ পাখির গতিতে, কেউ আবার হামাগুড়ি দিয়ে। আর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুলের পাড়ে দাঁড়িয়ে বলবেন, 'আল্লাহ রক্ষা করুন। আল্লাহ রক্ষা করুন।'[৪] পুণ্যবান মুমিনদের আল্লাহ তায়ালা আলো ও তাওফিক দান করবেন। তারা দ্রুতই পার হয়ে যাবে। গুনাহগার কিন্তু আল্লাহর ক্ষমার সৌভাগ্য লাভ করেছে—এমন মানুষজন কম আলোতে ধীরে ধীরে পার হবে। কিন্তু যেসব মুমিনকে আল্লাহ ক্ষমা না করে জাহান্নামে দেওয়ার ফয়সালা করেছেন, তারা পার হতে পারবে না। পুল থেকে নিচে জাহান্নামে পড়ে যাবে।

---

১. ফাতহুল বারি (৩/২৪৬)।
২. মুসলিম (১৮৩); ইবনে হিব্বান (৭৩৭৭)।
৩. মুসলিম (৩১৫); ইবনে খুজাইমা (২৩২)।
৪. মুসলিম (১৯৫); মুসতাদরাকে হাকেম (৮৮৪৭)।

মুনাফিকরা যখন পার হতে যাবে, হঠাৎ তাদের আলো নিভে যাবে এবং তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।[1]

পুল পার হয়ে সকল মুমিন জান্নাতের সামনে গিয়ে একত্র হবেন। আল্লাহ তাদের অন্তর থেকে সব ধরনের হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেবেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন।[2] তাঁর সঙ্গে দরিদ্র মুহাজির, আনসার ও উম্মাহর দরিদ্র মানুষজন আগে প্রবেশ করবেন। ধনীরা তাদের পরে প্রবেশ করবে।[3]

---

১. মুসলিম (১৯১)।
২. মুসলিম (১৯৭); মুসনাদে আহমদ (১২৫৯২)।
৩. তিরমিজি (২৩৫৪); ইবনে মাজা (৪১২৪)।

وَالْـجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ لاَ تَفْنَيَانِ أَبَدًا وَلاَ تَبِيدَانِ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ الْـجَنَّةَ وَالنَّارَ قَبْلَ الْـخَلْقِ وَخَلَقَ لَهُمَا أَهْلًا، فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى الْـجَنَّةِ فَضْلًا مِنْهُ وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى النَّارِ عَدْلاً مِنْهُ، وَكُلٌّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فُرِغَ لَهُ وَصَائِرٌ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ. وَالْـخَيْرُ وَالشَّرُّ مُقَدَّرَانِ عَلَى العِبَادِ.

জান্নাত এবং জাহান্নাম আল্লাহর সৃষ্টি করা দুটো মাখলুক। এ দুটো কখনও ধ্বংস হবে না, বিলীন হবে না। আল্লাহ তায়ালা অন্যান্য সৃষ্টির আগে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন, এরপর এগুলোর জন্য বাসিন্দা তৈরি করেছেন। সুতরাং তিনি যাকে চান নিজ অনুগ্রহে জান্নাত দান করেন। আর যাকে চান ইনসাফের ভিত্তিতে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যান। যাকে যেজন্য তৈরি করা হয়েছে সে তা-ই করবে, যাকে যেখানের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সে সেদিকেই যাবে। ভালো এবং মন্দ (আল্লাহর পক্ষ থেকে) মানুষের জন্য নির্ধারিত।

ব্যাখ্যা

জান্নাতের পরিচয়: জান্নাত আল্লাহর একটি সৃষ্টি। তাঁর প্রিয় মুমিন বান্দাদের চিরস্থায়ী আবাস হিসেবে তিনি এটা তৈরি করেছেন। বিশ্বজগৎ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে মুমিনগণ তথায় চিরকাল অবস্থান করবে। আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী, জান্নাত বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে, যা উপরে ইমাম তহাবি রাহি. বলেছেন: **'আল্লাহ তায়ালা অন্যান্য সৃষ্টির আগে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন।'** কেবল মুতাজিলা ও কাদারিয়্যাহ সম্প্রদায়ের কেউ কেউ বলে, জান্নাত-জাহান্নাম এখন বিদ্যমান নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ সৃষ্টি করবেন।[১] তাদের কথা ভুল। কুরআনে আল্লাহ বলেন: {أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ} অর্থ: 'মুত্তাকিদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।' [আলে ইমরান: ১৩৩] তা ছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাত দেখেছেন। জান্নাতে ভ্রমণ করেছেন। মিরাজের রাতে তিনি সিদরাতুল মুনতাহার পাশে 'আদন জান্নাত' দেখেছেন,

১. ইবনে আবিল ইজ (৪২০)।

তাতে প্রবেশ করেছেন। সেটার ছাদ ছিল মুক্তার আর মাটি ছিল মিশকের।[১] তা ছাড়া পূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি, পুণ্যবান ব্যক্তি যখন মারা যায় এবং তাকে কবরে রাখা হয়, তখন জান্নাতের দিকে তার কবরের একটি দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং জান্নাতের আলো-বাতাস তার কবরে আসতে থাকে।[২] এর দ্বারাও বোঝা যায়, জান্নাত বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে। তা ছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশায় জান্নাতের ফল ধরেছেন এবং সাহাবাদের বলেছেন, যদি তা তোমাদের জন্য নিয়ে আসতাম, তবে চিরকাল খেতে পারতে।[৩] আরেক হাদিসে তিনি বলেছেন, আমি যা দেখেছি যদি তোমরা তা দেখতে, তবে বেশি কাঁদতে কম হাসতে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, কী দেখেছেন, হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, আমি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছি।[৪] তবে জান্নাতের অবস্থান কোথায় সেটা আমাদের জানা নেই। কুরআনে জান্নাতকে উপরে [মুতাফফিফিন: ১৮] এবং হাদিসে সপ্তম আকাশে বলা হয়েছে।[5] কিন্তু এর অর্থ আমরা যেভাবে উপরের দিকে একটার পর একটা বিল্ডিংয়ের ফ্লোর কল্পনা করি, তেমন হওয়া জরুরি নয়। বরং এগুলোর প্রকৃত অবস্থান আল্লাহ ভালো জানেন। গোটা মহাবিশ্ব এতটাই বড় যে, এগুলোর কোথাও থাকা অসম্ভব নয়।

প্রথমেই আমাদের যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে তা হলো, জান্নাতের যেসব বিবরণ কুরআন-হাদিসে এসেছে, সেগুলো আমাদের বোঝানোর জন্য সহজ করে বলা হয়েছে। নতুবা জান্নাতে আল্লাহ যা রেখেছেন তা মানুষের কল্পনারও বাইরে। আল্লাহ বলেন,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءً

অর্থ: 'কেউ জানে না তার জন্য কৃতকর্মের ফলস্বরূপ চোখ শীতলকারী কী কী প্রতিদান লুক্কায়িত আছে।' [সাজদা: ১৭] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দাদের জন্য (জান্নাতে) যা প্রস্তুত করে রেখেছি, তা কোনো চোখ দেখেনি, কান শুনেনি, কোনো মানুষের কল্পনাতেও উদিত হয়নি।'[৬] ইবনে আব্বাস রাজি. বলেন, 'জান্নাতের উপকরণের সঙ্গে দুনিয়ার

---

১. বুখারি (৩৩৪২); মুসলিম (১৬৩)।
২. আবু দাউদ (৪৭৫৩); মুসনাদে আহমদ (১৮৮৩২)।
৩. বুখারি (৭৪৮, ১০৫২); মুসলিম (৯০৭)।
৪. মুসলিম (৪২৬); ইবনে খুজাইমা (১৬০২); মুসনাদে আহমদ (১২১২২)।
৫. মুসতাদরাকে হাকেম (৮৭৯৫)।
৬. বুখারি (৩২৪৪); মুসলিম (২৮২৪)।

উপকরণের মিল কেবল নামের ক্ষেত্রেই, অন্যকিছুতে নয়।'[১] সুতরাং জান্নাতের এসব বিবরণ শুনে ওগুলো পৃথিবীর মতো হালকা মনে করা কিংবা ওগুলোতে সন্দেহ করা—যেমনটা এক শ্রেণির প্রগতিশীল দাবিদাররা করে—অন্যায্য ও অন্যায়। এই বইয়ে জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। তাই সংক্ষেপে কিছু বিবরণ তুলে ধরা হচ্ছে। পূর্বে বলা হয়েছে, কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ শেষ করার পরে সকল মুমিন একত্র হবেন। অতঃপর তারা পুল (সিরাত) পার হয়ে জান্নাতের সামনে আসবেন। সেখান আল্লাহ তাদের হৃদয় থেকে সকল হিংসা-বিদ্বেষ মুছে ফেলবেন। অতঃপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করা শুরু করবেন। সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতঃপর তার দরিদ্র উম্মতগণ। তাদের পরে প্রবেশ করবে ধনীরা। ধনীরা দরিদ্রদের ৫০০ বছর পরে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২] অন্যান্য উম্মত পৃথিবীতে আগে এলেও জান্নাতে উম্মতে মুহাম্মাদির পরে প্রবেশ করবে।[৩] জান্নাতবাসী জান্নাতে সর্বোত্তম আকৃতি এবং সবচেয়ে সুন্দর দেহাবয়ব নিয়ে প্রবেশ করবে। তাদের চোখে সুরমা থাকবে। সবাই ভরা যৌবনে থাকবে। বয়স থাকবে ত্রিশ থেকে তেত্রিশের মাঝামাঝি। পুরুষের সেখানে দাড়ি থাকবে না। কারও গায়ে লোম থাকবে না।[৪] সবাই আদম আলাইহিস সালামের আকৃতিতে থাকবে। কোনো বর্ণনায় সেটাকে ষাট হাত লম্বা ও ছয় হাত প্রস্থ বলা হয়েছে।[৫] জান্নাতে কারও পোশাক পুরোনো হবে না। কারও যৌবনে ভাটা পড়বে না।[৬]

আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে, জান্নাতবাসী পূর্নিমার চাঁদের মতো চমকাতে থাকবে। তাদের থুথু, শ্লেষ্মা তৈরি হবে না। মলত্যাগের প্রয়োজন হবে না। কেউ ঘুমাবে না, নিদ্রা যাবে না, অসুস্থ হবে না, মৃত্যুবরণ করবে না। শারীরিক সব ধরনের রোগ থেকে মুক্ত থাকবে। তাদের ব্যবহৃত পেয়ালাগুলো হবে সোনার। চিরুনি হবে সোনা ও রুপার। সুগন্ধি হবে ঘৃতকুমারী গাছের। ঘাম হবে মিশকের মতো। তাদের কারও মাঝে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। সবাই এক হৃদয়ে লীন থাকবে।[৭]

---

১. তাফসিরে তাবারি (১/৩৯১)।
২. তিরমিজি (২৩৫৪); ইবনে মাজা (৪১২৪)।
৩. বুখারি (৮৭৬); মুসলিম (৮৫৫)।
৪. তিরমিজি (২৫৪৫); মুসনাদে আহমদ (৮০৪৮); মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩৫১৪০)।
৫. মুসনাদে আহমদ (৮০৪৮); মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩৫১৪০)।
৬. তিরমিজি (২৫৩৯); দারেমি (২৮৬৩)।
৭. বুখারি (৩০৮৩, ৩২৪৫); মুসলিম (২৮৩১, ২৮৩৪, ২৮৩৭); ইবনে মাজা (৯৬); তিরমিজি (৩৬৫৮); আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি (৯১৯)।

জান্নাতে কী আছে? আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের জন্য পরকালে যে আবাসস্থল তৈরি করেছেন সেটাকে জান্নাত বলা হয়। ফলে মুমিনদের আবাস্থল হিসেবে সেটি একটি জায়গা; কিন্তু সেখানে বিভিন্ন স্তর রয়েছে, মর্যাদার তারতম্য রয়েছে। সে হিসেবে জান্নাত একাধিক। অর্থাৎ একটি বিশাল স্থানের মাঝে একাধিক বাগান, একাধিক প্রাসাদ ও আবাসস্থল। যেমন 'সিম্ফনি অব দ্য সিজ' কিংবা যেকোনো বিলাসবহুল জাহাজের মাধ্যমে এটা বোঝা যায়। যদিও অদৃশ্যের বিষয় আমাদের জানা নেই, তবুও কিছুটা হয়তো অনুধাবন করা সহজ। এ ধরনের জাহাজ মূলত জাহাজ হিসেবে একটিই, কিন্তু ভিতরের স্তরভেদ হিসেবে পুরাই ভিন্ন ভিন্ন জগৎ বিদ্যমান তাতে। এ কারণে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে জান্নাতকে একাধিক (তথা বহুবচন) হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে; আবার কোথাও দুটোর কথা বলা হয়েছে; জান্নাতের একাধিক নাম ও দরজার কথাও বলা হয়েছে। মোট আটটি দরজার কথা এসেছে।[১] খুব সম্ভবত এগুলো মূল জান্নাতে প্রবেশের দরজা। কারণ, আকাশ ও জমিনের মতো প্রশস্ত এত বড় জান্নাতে একাধিক দরজা থাকাই যুক্তিযুক্ত। এর পর সেখান থেকে যে যার স্তরে ও নির্ধারিত বালাখানায় চলে যাবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জান্নাতের মাঝে অনেকগুলো জান্নাত রয়েছে।'[২] অর্থাৎ মৌলিক বস্তু হিসেবে জান্নাত একটিই, কিন্তু গুণাবলি ও স্তর তারতম্যে জান্নাত অনেকগুলো। প্রত্যেকে তার ঈমান, তাকওয়া, আমল এবং আল্লাহর অনুগ্রহে সেখানে ভিন্ন ভিন্ন স্তর লাভ করবে। সবচেয়ে উন্নত স্তর হলো ফিরদাউস। এর পরে অন্যান্য জান্নাত। হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, এগুলো একটা অপরটার নিচে হবে। ফলে নিম্নস্তরের লোকজন উপরে তাকিয়ে উচুঁ স্তরের লোকদের দেখতে পাবে। আর উপরের লোকজন নিচের লোকদের দেখতে আসবে। এটা মোটেই ইনসাফ-বিরুদ্ধ নয়। কারণ, নবি-রাসুল, সাহাবা, ওলি-আউলিয়া ও প্রকৃত মুমিনগণ যারা দ্বীনের জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন, সবকিছু বিসর্জন দিয়েছেন, তাদের আল্লাহ যা দেবেন, দুনিয়াতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ন্যূনতম আমল করে কিংবা কোনোরকম গা বাঁচিয়ে জান্নাতে প্রবেশকারীকেও তা-ই দেবেন—সেটা হতে পারে না। তবে জান্নাতবাসীর পরস্পরের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। [হিজর: ৪৭] তারা সবাই একটি হৃদয়ের মতো থাকবে।[৩] আর হিংসা-বিদ্বেষ থাকার সুযোগও নেই। কারণ,

১. বুখারি (৩৪৩৫); মুসলিম (২৮)।
২. বুখারি (২৮০৯); সুনানে কুবরা, বাইহাকি (১৮৬১১)।
৩. বুখারি (৩০৭৩); মুসলিম (২৮৩৪); সিফাতুল জান্নাহ, আবু নুআইম (২/২৫৯); হাদিল আরওয়াহ, ইবনুল কাইয়িম (৫১)।

সবশেষে যে ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দেওয়া হবে, সে জান্নাতে ঢোকার আগেই বলবে, আমাকে আল্লাহ যা দিয়েছেন, তা পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাউকে দেননি।[১]

জান্নাতের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহে যা-কিছু বর্ণনা এসেছে, সেগুলো একান্তই মানুষকে বোঝানোর জন্য। নতুবা এর স্বরূপ উপলব্ধির ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি মানুষকে। তাই যখন আমরা জান্নাতের বর্ণনা পড়ব, সেগুলোকে পৃথিবীর বস্তুনিচয়ের মতো কল্পনা করব না। জান্নাতের প্রশস্ততা সম্পর্কে বলা হয়েছে আকাশ-জমিনের প্রশস্ততার মতো। এগুলো কত বড় আল্লাহ ভালো জানেন। আল্লাহ বলেন,

وَسَارِعُوٓا إِلَىٰ مَغۡفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ.

অর্থ: 'তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও, যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও জমিন, যা তৈরি করা হয়েছে মুত্তাকিদের জন্য।' [আলে ইমরান: ১৩৩]

জান্নাতের অবকাঠামো সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে—এর একটি ইট সোনার, অপরটি রুপার।[২] দুই ইটের গাঁথুনি দেওয়া হয়েছে মিশকের মাধ্যমে। জান্নাতের কঙ্কর ও নুড়িগুলো মোতি ও ইয়াকুতের। মাটি জাফরানের।[৩] জান্নাতের প্রাসাদ এবং তাঁবুগুলো সোনা-রুপা ও মণিমুক্তার দ্বারা নির্মিত।[৪] জান্নাতে অসংখ্য সবুজ বাগান, নদী-নহর, ঝরনা-প্রস্রবণ থাকবে। [হিজর: ৪৫, ইনসান: ৫-৬, নাবা: ৩১-৩২, মুতাফফিফিন: ২২-২৮] সেসব নদীর কোনোটা মিষ্টি পানির, কোনোটা দুধের, কোনোটা মদের এবং কোনোটা মধুর হবে। [মুহাম্মাদ: ১৫] জান্নাতে সব ধরনের ফল-ফুল থাকবে। [রহমান: ৫২, ওয়াকিআ: ২৭-৩২] জান্নাতের বাগানের গাছগুলো একশত বছরের পথ সমান দীর্ঘ ও বড় থাকবে।[৫] জান্নাতে পাখি, মাছ, ষাড়, ঘোড়া, উট-সহ

---

১. মুসলিম (১৮৭)।
২. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমি জান্নাতে প্রবেশ করে একটি স্বর্ণের প্রাসাদ দেখতে পাই। জিজ্ঞাসা করলাম, এটি কার জন্য? আমাকে বলা হলো, উমর ইবনুল খাত্তাবের জন্য।' কথাগুলো বলার পরে তিনি উমরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইবনুল খাত্তাব, তোমার গাইরতের কথা চিন্তা করে আমি সেখানে ঢুকিনি।' উমর অশ্রুসিক্ত হয়ে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার ক্ষেত্রেও আমিও গাইরত দেখাব?' (বুখারি: ৭০২৪); ইবনে হিব্বান (৫৪); পথভ্রষ্ট ও কাফের শিয়ারা বলে, যে জান্নাতে উমর থাকবে, সে জান্নাতে তারা ঢুকবে না। তারা এমন জান্নাতে ঢুকতে চায়, যেখানে উমর নয়; ইবলিস, ফেরাউন, নমরুদ ও আবু লাহাবরা থাকবে।
৩. তিরমিজি (২৫২৬)।
৪. বুখারি (৭০২৪); মুসলিম (২৮৩৮)।
৫. বুখারি (৩২৫১); মুসলিম (২৮২৬)।

বিভিন্ন পশুপাখিও থাকবে। তবে সেগুলো পৃথিবীর মতো নয়। সেখানের ঘোড়া উড়বে। উড়ন্ত ঘোড়ার পিঠে চড়ে মানুষ যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াতে পারবে।[১]

জান্নাতে মানুষ সবকিছু করার অনুমতি পাবে। সেখানে মদ্যপান ও স্বর্ণালংকার হালাল হবে। কেবল মদের পেয়ালা নয়, মানুষ চাইলে মদের নদীতে সাঁতরাতে পারবে। [মুহাম্মাদ: ১৫][২] রেশম, সোনা-রুপা যা ইচ্ছা পরিধান করতে পারবে। জান্নাতে গানও শোনা যাবে। হুরগণ পুরুষদের এত মধুর কণ্ঠে গান (গজল) শোনাবেন যা পৃথিবীর কেউ কখনও শোনেনি। তবে সেসব গানে অশ্লীলতা থাকবে না। আল্লাহর তাসবিহ-তাহলিল থাকবে।[৩] দুনিয়ার জীবন স্মরণ করে ওখানে কেউ কেউ দুনিয়ার কাজ করতে চাইবে। যেমন: হাদিসে এসেছে, জান্নাতে এক ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চাষাবাদের অনুমতি চাইবে। আল্লাহ তাকে বলবেন, তুমি যা চেয়েছ সবকিছু পাওনি? সে বলবে, হ্যাঁ, কিন্তু আমি চাষাবাদ করতে চাই। তখন সে জমিতে চাষ করবে এবং বীজ বপন করবে। মুহূর্তে সেই বীজ বড় হয়ে যাবে; কাটা হয়ে পাহাড়ের মতো স্তূপে পরিণত হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে বলবেন, বনি আদম, কোনোকিছুই তোমাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না।[৪] কেউ কেউ জান্নাতে বাচ্চাও নিতে চাইবে। ফলে মুহূর্তে সে গর্ভবতী হবে। এরপর গর্ভের সন্তান জন্ম নিয়ে বড় হয়ে যাবে।[৫] জান্নাতে নারী-পুরুষ সবাই রাসুলুল্লাহ ও অন্য নবিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে, কথাবার্তা বলতে পারবে। [নিসা: ৬৯]

পরিবারের সবাই জান্নাতে গেলে মানুষ একসঙ্গেই থাকবে। তবে কারও স্তর উঁচুনিচু হলে আল্লাহ চাইলে নিজ অনুগ্রহে নিচু স্তরের কাউকে তাদের আত্মীয়দের সঙ্গে উঁচু স্তরে দিতে পারেন। যেসব সন্তান ছোটবেলা মারা গিয়েছিল, তারাও বাবা-মায়ের সঙ্গে শিশু অবস্থাতেই থাকবে—আল্লাহ ভালো জানেন। বরং সেই শিশু বাচ্চার সুপারিশে আল্লাহ তার সঙ্গে বাবা-মাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সেখানে তারা একত্রে থাকবে। [রাদ: ২৩, গাফের: ৮, জুখরুফ:৭০, তুর: ২১][৬] কারও মতে, তারাও বড় হয়ে ত্রিশ বছরের তরুণ-তরুণীতে পরিণত হবে। মূল কথা হচ্ছে, তারা একত্রে থাকবে এবং

---

১. তিরমিজি (২৫৪৩); তয়ালিসি (৮৪৩)।
২. বুখারি (৫৫৭৫, ৫৬৩৩, ২০০৩); মুসলিম (২০৬৭); তিরমিজি (১৮৬১); আবু দাউদ (৩৭২৩)।
৩. আল-মুজামুস সগির, তাবারানি (৭৩৪); আল-আওসাত (৪৯১৭)।
৪. বুখারি (২৩৪৮, ৭৫১৯)।
৫. তিরমিজি (২৫৬৩); ইমাম তিরমিজি হাদিসটি উল্লেখ করে লিখেন, তবে অনেকের মতে জান্নাতে সন্তান নেওয়ার নিয়ম থাকবে না। ফলে কেউ সন্তান নিতে চাইবে না। ইবনে মাজা (৪৩৩৮)।
৬. মুসলিম (২৬৩৫)।

গল্পগুজব, হাসি-আহ্লাদ ও সৌভাগ্যে জীবন-যাপন করবে।[১] পরিবারের বাইরে জান্নাতবাসী দুনিয়ার প্রিয় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গাতে মিশবে, একসঙ্গে বসবে, গল্প করবে; দুনিয়ার বিভিন্ন কথা মনে করবে।[২] আল্লাহ বলেন,

وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ . قَالُوْۤا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْۤ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ . فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ . اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ.

অর্থ: 'তারা একে অপরের মুখোমুখি বসে কথা বলবে। তারা বলবে, আমরা ইতঃপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া করেছেন এবং আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। নিশ্চয়ই আমরা পূর্বেও আল্লাহকে ডাকতাম। তিনি সৌজন্যশীল পরম দয়ালু।' [তুর: ২৫-২৮]

তবে চাওয়ার সীমাবদ্ধতা আছে। সেখানে মানুষ এমন কিছু চাইবে না, যা শোভনীয় নয়। যেমন কারও বাবা-মা বা ভাইবোন জাহান্নামে গেলে তাদের জান্নাতে আনতে চাইবে না। কারণ, সেটা আল্লাহর নির্দেশের বাইরে। পৃথিবীতে এখন মনে হতে পারে, তাদের জান্নাতে না আনতে পারলে তাদেন মন জান্নাতে গিয়েও খুশি হবে না। বাস্তবতা এমন নয়। কারণ, পৃথিবীর দৃষ্টিভঙ্গি আর আখিরাতের দৃষ্টিভঙ্গি এক নয়। এখন আমাদের ভালোবাসা ও নাড়ির টানের যে মানদণ্ড, পরকালেও তা সেভাবে থাকবে জরুরি নয়। এ কারণে আমরা পরকালে দেখব, ভাই ভাইয়ের কাছ থেকে পলায়ন করবে। মানুষ মাতা-পিতা, স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে পলায়ন করবে। [আবাসা: ৩৪-৩৬] একইভাবে সামনে দেখব কীভাবে জাহান্নামিরা তাদের ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী-সন্তানকে সামনে পেলে তাদের সেখানে রেখে নিজে জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে। [মাআরিজ: ১১-১৪] এটা কি মহব্বত? ফলে এখানের সঙ্গে ওখানের অবস্থা মেলানো সঠিক নয়। কুরআনের অন্য কিছু আয়াত দেখলেও বোঝা যায়, জান্নাতিরা তাদের পরিচিত জাহান্নামিদের সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তাদের দেখবে। কিন্তু তারা তাতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়ে বরং উলটো তাদের দোষারোপ করবে এবং নিজেরা যে রক্ষা পেয়েছে আল্লাহর কাছে তার জন্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করবে। আল্লাহ বলেন,

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ . قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّيْ كَانَ لِيْ قَرِيْنٌ . يَّقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ . ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ . قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ

১. আত-তাফসিরুল কাবির, রাজি (২৮/২১১)।
২. বুখারি (৬১৬৮); মুসলিম (২৬৩৯)।

فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ . قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ . وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ . اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ . اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ . اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ . لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ .

অর্থ: 'অতঃপর তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তাদের একজন বলবে, আমার এক সঙ্গী ছিল; সে বলত, তুমি কি বিশ্বাস করো যে, আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখন আমরা প্রতিফল প্রাপ্ত হব? আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি তাকে উঁকি দিয়ে দেখতে চাও? অতঃপর সে উঁকি দিয়ে তাকে জাহান্নামের মাঝখানে দেখতে পাবে। বলবে, আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে। আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ না হলে আমিও যে গ্রেফতারকৃতদের সাথেই উপস্থিত হতাম। এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমরা শাস্তি প্রাপ্তও হব না। নিশ্চয় এই মহা সাফল্য। এমন সাফল্যের জন্য পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত।' [সাফফাত: ৫০-৬১]

একইভাবে যা ইচ্ছা তা-ই চাইবে বলে অন্যায় প্রার্থনা করা হবে না। যেমন: ব্যভিচার করা, পরকীয়া বা সমকামিতায় লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি। এ কারণেই এমন সব আশা করা নিষেধ যার মাঝে সীমালঙ্ঘন লুক্কায়িত। যেমন: দুনিয়াতে কোনো তরুণ কোনো তরুণীকে (অবৈধভাবে) ভালোবাসত। তরুণীর বিয়ে হয়ে গেলে সে সারা জীবন অবিবাহিত থেকে যায় কিংবা বিবাহ করেও জান্নাতে তাকে পাওয়ার আশা করে। কারণ, সে শুনেছে—জান্নাতে সবকিছু পাওয়া যাবে। এ ধরনের আশা কিংবা চিন্তা সীমালঙ্ঘন। যেহেতু সে বিবাহিতা, সুতরাং জান্নাতে তাকে পাওয়ার জন্য তার স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া বা তার আগে স্বামীর মৃত্যু হওয়া (এরপর তাকে বিয়ে করা) অথবা স্বামীর জাহান্নামে যাওয়া জরুরি। এ তিনটির কোনো একটা হলেই কেবল সে জান্নাতে তাকে বিয়ে করতে পারবে। অথচ কোনো মুসলমানের জন্য এমন কামনা বৈধ নয়। তা ছাড়া অন্যের স্ত্রীকে নিয়ে চিন্তাভাবনাও বৈধ নয়। এসব বিষয় মনে রাখতে হবে। তা ছাড়া জান্নাতে এসব বিষয়ের কথা মানুষের মনেও থাকবে না। বিশুদ্ধ হাদিসে এসেছে, আল্লাহ মুমিনদের জান্নাতে প্রবেশ করানোর পরে জিজ্ঞাসা করবেন—তোমাদের আর কিছু লাগবে? তারা সবাই বলবে, আপনি আমাদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেননি? আমাদের জান্নাত দেননি? সুতরাং আমাদের আর কিছু লাগবে না।

তখন আল্লাহ পর্দা খুলে দেবেন। তারা রাব্বুল আলামিনকে দেখতে পাবে। **আল্লাহর দিকে তাকানোর চেয়ে জান্নাতে অধিকতর প্রিয় আর কিছু থাকবে না।**[১]

জান্নাতবাসী প্রত্যেকে প্রত্যেকের বোধগম্য ভাষায় কথা বলবে। তবে নির্ধারিত কোনো ভাষা আছে কি না আল্লাহ ভালো জানেন। জাহান্নামের ভাষা ফারসি আর জান্নাতের ভাষা আরবি এই মর্মে যেসব কথা প্রচলিত, এমনকি যেসব হাদিস বর্ণনা করা হয়, যেগুলো হাকেম, তাবারানি-সহ বিভিন্ন ইমাম বর্ণনা করেছেন, উলামায়ে কেরাম সেগুলোকে জাল বলেছেন।[২] খুব সম্ভবত আরব ও পারস্য সভ্যতার সংঘাতের ফল এসব বর্ণনা।

জান্নাতের হুর: জান্নাতে আল্লাহ তায়ালা পুরুষদের জন্য শ্বেতশুভ্র মুক্তোর মতো সুন্দর [ওয়াকিয়া: ২২-২৩] ইয়াকুত ও মারজানের মতো রূপবতী [রহমান: ৫৮] কুমারী ও অস্পৃষ্ট [ওয়াকিয়া: ৩৫-৩৬] নারী তৈরি করে রেখেছেন। শুভ্রতার পাশাপাশি তারা হবেন কালো আনত-নয়না, ডাগর চোখের অধিকারিনী। অত্যধিক সৌন্দর্য ও লাবণ্যের কারণে তাদের অস্থির মাঝে কী আছে তাও হাড়, মাংস ও চামড়ার উপর থেকে দেখা যাবে। তাদের কেউ দুনিয়াতে উঁকি দিলে পুরো দুনিয়া আলোকিত হয়ে যেত, সৌরভে ভরে যেত।[৩] শারীরিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি চারিত্রিকভাবেও তারা হবেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী, মঙ্গলময়ী, কল্যাণীয়া। [রহমান: ৭০] আল্লাহ তাদের সঙ্গে জান্নাতের পুরুষদের বিয়ে দেবেন। ফলে তারা তাদের স্ত্রী হবে এবং কেবল স্বামীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্যকোনো পুরুষের দিকে চোখ তুলেও তাকাবে না। [বাকারা: ২৫, রহমান: ৫৬, ৭২, দুখান: ৫৪, তুর: ২০] জান্নাতে কেউ অবিবাহিত থাকবে না।[৪] ফলে হুরদের দেহপসারিণী হওয়ারও প্রশ্ন ওঠে না, যেমন অনেক নাস্তিক প্রচার করে থাকে। পরকীয়া, অজাচার কিংবা দুনিয়ার মতো অন্যান্য কুৎসিত কর্মও নেই জান্নাতে। অবিশ্বাসীরা ইসলামকে আঘাত করতে গিয়ে বলে, কুরআনে হুরদের বুকের রগরগে সাইজ বর্ণনা করা হয়েছে। [নাবা: ৩১-৩৩] বাস্তব কথা হলো, এখানে শাব্দিক অর্থ বুকের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও ব্যাবহারিক অর্থে বুকের সাইজের কোনো প্রসঙ্গ নেই। যারা এমন অনুবাদ করেছেন সেটা ভুল। বরং এখানে নিছক বয়সের স্তর তথা তরুণী বোঝানো উদ্দেশ্য।[৫]

---

১. মুসলিম (১৮১)।
২. মুসতাদরাকে হাকেম (৭০৯২); আল-মুজামুল আওসাত (৫৫৮৯); আল-মাওজুআত, ইবনুল জাওজি (২/৪১)।
৩. মুসনাদে আহমদ (১২৬৮৭); ইবনে হিব্বান (৭৩৯৯)।
৪. মুসলিম (২৮৩৪); আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি (৬৪৩)।
৫. আত-তাহরির ওয়াত তানবির, তাহের ইবনে আশুর (৩০/৪৪)।

জান্নাতে কতজন হুর দেওয়া হবে? প্রথম কথা হলো, এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কোনো বর্ণনা নেই। উপরন্তু সবাইকে নির্দিষ্ট সংখ্যার হুর দেওয়া হবে এমন নয়, বরং প্রত্যেকে আমল অনুযায়ী লাভ করবেন। আল্লাহর পথে শহিদগণ লাভ করবে সত্তর বা বাহাত্তরজন হুর। প্রত্যেক সাধারণ মানুষ দুইজন হুর লাভ করবে। কেউ এর বেশিও লাভ করবে। কাউকে একশোজন হুরও দেওয়া হবে।[১] সঙ্গে দুনিয়ার স্ত্রীগণও থাকবে। তবে যদি কাউকে তালাক দিয়ে থাকে কিংবা স্বামী মারা যাওয়ার পরে তার স্ত্রী অন্যকে বিয়ে করে ফেলে, তবে সে থাকবে না। অর্থাৎ যেসব স্বামী-স্ত্রী দুজন বিবাহ অবস্থায় মারা যায় এবং তারা দুজনই জান্নাতে যায়, তা হলে একসঙ্গে থাকবে। কোনো নারীর একাধিক বিয়ে হলে সর্বশেষ স্বামীর সঙ্গে থাকবে।[২] সঙ্গে তাদের সন্তান-সন্ততিও থাকবে। [তুর: ২১] আর যদি কোনো নারী কুমারী বা তালাকপ্রাপ্তা অবস্থায় মারা যায়, অথবা তার স্বামী জাহান্নামে যায়, তবে সে জান্নাতে যেসব কুমার পুরুষ প্রবেশ করবে, তাদের যে-কাউকে পছন্দ করবে, তাকে বিয়ে করতে পারবে। কারণ, জান্নাতে সকলের সকল ইচ্ছা পূর্ণ করা হবে। [ফুসসিলাত: ৩১][৩] জান্নাতে সকল নারী কুমারী হিসেবে থাকবে। একটি হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, সহবাসের পরে আবার প্রত্যেক নারী কুমারী হয়ে যাবে।[৪] আর যারা পৃথিবীতে তৃতীয় লিঙ্গ (হিজড়া) হিসেবে থাকবে, পরকালে তারা নারী বা পুরুষ হিসেবেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তৃতীয় লিঙ্গ থাকবে না। কারণ, পৃথিবীতেও তারা মূলত নারী বা পুরুষই। কিন্তু শারীরিক জটিলতার কারণে মানুষের কাছে সেটা অস্পষ্ট থাকে। বিপরীতে জান্নাতবাসী সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক ত্রুটিমুক্ত হবেন।[৫]

প্রশ্ন হতে পারে, জান্নাতের হুরগণ যদি এত সুন্দরী থাকে, তা হলে পৃথিবীতে মুমিন স্ত্রীগণ তো তাদের সামনে কিছুই নয়। এটা তো তাদের মনঃকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বাস্তবতা এমন নয়। বরং কুরআন-হাদিসে যদিও মুমিন নারীদের রূপের কথা বলা হয়নি, তবে কুরআন-সুন্নাহর দিকে গভীরভাবে তাকালে বোঝা যায়, মুমিন নারীগণ যদি স্বামীদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করেন, তবে তারা হুরদের চেয়েও

১. বুখারি (৩২৫৪); মুসলিম (১৮৮); তিরমিজি (১৬৬৩); সুনানে সাইদ ইবনে মানসুর (২৫৬২); মুসনাদে আহমদ (১৭৪৫৫) বাজ্জার (১০০৭২); মুসনাদে আবু ইয়ালা (২৪৩৬); আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি (৭১৮)।
২. সুনানে কুবরা, বাইহাকি (১৩৫৫২); আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি (৩১৩০)।
৩. দেখুন রুহুল মাআনি (১৩/১৩৪)।
৪. সহিহ ইবনে হিব্বান (৭৪০২)।
৫. তাফসিরে কুরতুবি (৫/২)।

অধিকতর রূপবতী, চরিত্রবান, পরিপূর্ণ ও উত্তম হবেন।[১] ফলে হুরদের চেয়ে স্বামীর বেশি ভালোবাসা লাভ করবেন। তা ছাড়া মুমিন নারী জান্নাতে প্রবেশ করে নিজে সুখ ও সৌভাগ্য উপভোগ করবেন, অপরদিকে হুরদের কেবল অন্যের সেবার জন্য তৈরি করা হয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়ার মুমিন নারীরা জান্নাতের মালিক হবেন, বিপরীতে হুরগণ জান্নাতের মাঝে বিদ্যমান অনেক উপহারের মাঝে নিজেরা একটি উপহারমাত্র। ফলে স্ত্রীগণ হুরদের সর্দার হবেন। হুরগণ তাদের ও তাদের স্বামীদের সেবায় নিয়োজিত থাকবেন। একইভাবে দুনিয়াতে একাধিক স্ত্রী থাকলে যেমন তাদের মাঝে হিংসা, বিদ্বেষ, গাইরত ইত্যাদি থাকে, জান্নাতে এগুলোর অস্তিত্বও থাকবে না। কারণ, মানসিক ও দৈহিক সব দিক থেকেই পুরুষ সামর্থ্যবান হবেন। একদিকে সেখানে প্রত্যেক পুরুষকে একশো পুরুষের শক্তি দেওয়া হবে।[২] অপরদিকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশের আগে সবার হৃদয় থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দেবেন। ফলে দুনিয়ার স্ত্রীগণ সেখানে হুরদের প্রতি অথবা (একাধিক স্ত্রী) নিজেদের মাঝে কোনো বিদ্বেষ অনুভব করবে না। কিংবা নারীরাও পুরুষের মতো একাধিক স্বামী কামনা করবে না; বরং প্রত্যেকে যে যার অবস্থা নিয়ে পরম সৌভাগ্যে বসবাস করবে এবং সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর প্রশংসায় রত থাকবে। আল্লাহ বলেন,

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۖ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

অর্থ: 'তাদের অন্তরের সকল বিদ্বেষ আমি বের করে দেবো। তাদের তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে। তারা বলবে: আল্লাহ শোকর, যিনি আমাদের এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। যদি আল্লাহ আমাদের পথপ্রদর্শন না করতেন, আমরা কখনও পথ পেতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রাসুল আমাদের কাছে সত্য কথা নিয়ে এসেছিলেন। আর তখন তাদের ডেকে বলা হবে: এটি জান্নাত। তোমরা এর উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের কর্মের প্রতিদানস্বরূপ।' [আরাফ: ৪৩]

জান্নাতের গিলমান: জান্নাতে অন্যান্য উপহারের মাঝে মুমিনদের জন্য চিরস্থায়ী শিশু-কিশোররা থাকবে, যাদের গিলমান বলা হয়। তারা জান্নাতিদের বিভিন্ন সেবা

১. মুসলিম (২৮৩৩); বাজ্জার (৬৯৭৩)।
২. তিরমিজি (২৫৩৬); মুসনাদে তয়ালিসি (২১২৪)।

করবে। তারা মণি-মুক্তোর মতো সুন্দর হবে। [ওয়াকিয়া: ১৭, ইনসান: ১৯]। কিন্তু এই বাচ্চাগুলো কারা? ইমামগণ বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। কারও মতে, তারা শিশুকালে মারা যাওয়া মুসলমানদের সন্তান। কারও মতে, তারা কাফেরদের সন্তান।[১] কিন্তু এক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বক্তব্য হলো, আল্লাহ হুরদের মতো তাদেরও জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের সেবার জন্য সৃষ্টি করেছেন।

উল্লেখ্য, জান্নাত ও জান্নাতবাসী সব ধরনের অপরাধ, অনৈতিকতা, চারিত্রিক স্খলন ও কুৎসিত কর্ম থেকে পবিত্র। [তুর: ২৩] ফলে জান্নাতে ব্যাভিচার, সমকামিতা ইত্যাদির স্থান নেই। গিলমানের সৃষ্টি সেবার জন্য, যৌনকর্মের জন্য নয়। হ্যাঁ, জান্নাতে মানুষ যা চাইবে তা-ই করার অনুমতি থাকবে। কিন্তু সমকামিতা, অজাচার ইত্যাদি কলঙ্কজনক ও কুৎসিত কর্ম জান্নাতবাসীর হৃদয়ে উদিতই হবে না। কারণ, জান্নাতবাসীর হৃদয় পবিত্র করেই তাদের জান্নাতে ঢোকানো হবে।

ফলে আহলে সুন্নাতের কোনো আলিম এ ব্যাপারে কোনো কথাই বলেননি। কারণ, এটা সুস্থ রুচিবোধ বিরুদ্ধ কাজ। জান্নাতে সমকামিতার মতো ঘৃণ্য কাজের কথা চিন্তাও করা যায় না। তা ছাড়া জান্নাতে মানুষের মলত্যাগের প্রয়োজন হবে না। তা হলে কিশোরদের সঙ্গে সমকামিতার সুযোগ কোথায়? পুরো মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে আবু আলি নামক এক মুতাজিলি গিলমানদের সঙ্গে সমকামিতা করা যাবে বলে মত দিয়েছিল। এই লোক দ্বীনদারির ধার ধারত না। সেই যুগের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ছিল। আলিমগণ তাকে কঠোরভাবে খণ্ডন করেছেন।[২] বর্তমান সময়ে অনেক নাস্তিক মনে করে থাকে, আরবদের যৌনতার সুড়সুড়ি দেওয়ার জন্য জান্নাতে গিলমান দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বাস্তবতা হলো, আরবদের মাঝে সমকামিতার অস্তিত্বও ছিল না। শুধু আরব নয়; বরং কুরআনের মাধ্যমে প্রমাণিত, লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের আগে পৃথিবীর কোনো জাতি এমন ঘৃণ্যকর্মে লিপ্ত হয়নি। এ কারণে ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক একবার বলেছিলেন, যদি আল্লাহ তায়ালা কুরআনে লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের কথা না উল্লেখ করতেন, তবে আমি কোনো দিন জানতামই না পুরুষ পুরুষের উপর উঠতে পারে।[৩]

---

১. তাফসিরে বাগাবি (৫/৭)।
২. আল-মুনতাজাম, ইবনুল জাওজি ১৬/২৪৮-২৪৯।
৩. তাফসিরে ইবনে কাসির ৩/৩৯৯।

আল্লাহর দিদার: যদিও জান্নাত সব ধরনের নিয়ামতে ভরপুর থাকবে, সেখানে মানুষের সকল ইচ্ছা পূর্ণ হবে, কিন্তু জান্নাতের সর্বোচ্চ নিয়ামত হলো আল্লাহর তায়ালার সাক্ষাৎ। আল্লাহ জান্নাতবাসী সম্পর্কে বলেন,

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ.

অর্থ: 'তারা সেখানে যা চাইবে, তা-ই পাবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক।' [কাফ: ৩৫] আলি ইবনে আবি তালিব এবং আনাস বিন মালিক রাজি. থেকে বর্ণিত, 'আরও অধিক' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 'আল্লাহ তায়ালার দর্শন।'[১] আরেক জায়গায় আল্লাহ বলেন,

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ.

অর্থ: 'যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারচেয়েও অধিক কিছু।' [ইউনুস: ২৬] এখানে অধিক কিছু বলতে আল্লাহর দর্শন বোঝানো হয়েছে। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতের এই ব্যাখ্যা করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন, 'জান্নাতিগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের বলবেন, তোমরা আরও কিছু চাও? তারা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারা আলোকিত করেননি? আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'অতঃপর আল্লাহ তায়ালা পর্দা তুলে নেবেন। তখন তাদের কাছে আল্লাহর দিকে তাকানোর চেয়ে অধিকতর প্রিয় কিছুই হবে না।'[২] প্রশ্ন হতে পারে, জান্নাতবাসী কতবার আল্লাহকে দেখতে পাবে? ঢোকার পরে এই একবারই? আনাস ইবনে মালেক রাজি.-এর একটি হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, প্রতি সপ্তাহে একবার তথা শুক্রবার দিন জান্নাতবাসী আল্লাহকে দেখতে পাবে। এ জন্য তারা সপ্তাহভর শুক্রবারের অপেক্ষা করবে।[৩] তবে সবার জন্য সপ্তাহে একদিন হওয়া জরুরি নয়। কারণ, জান্নাতে সবাই সমান স্তরে থাকবে না। তাই আল্লাহ চাইলে তার প্রিয় বান্দাদের শুক্রবারের বাইরেও দেখা দিতে পারেন। তা ছাড়া জান্নাতবাসী আল্লাহর সঙ্গে কথা বলবে—উপরে এমন অনেক হাদিস অতিবাহিত হয়েছে। কুরআনে

---

১. তাফসিরে তাবারি (২২/৩৬৭-৩৭০); তাফসিরে ইবনে কাসির (৭/৩৮০)।
২. মুসলিম (১৮১); তিরমিজি (২৫৫২); ইবনে মাজা (১৮৭)।
৩. আল মুজামুল আওসাত, তাবারানি (৬৭১৭); মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৫৫৬০)।

এসেছে, আল্লাহ তাদের সালাম দেবেন। [ইয়াসিন: ৫৮] আল্লাহ আমাদের জান্নাতের অধিবাসী হওয়ার তাওফিক দিন।

জাহান্নামের পরিচয়: জাহান্নাম আল্লাহর একটি সৃষ্টি। তিনি এটা তার অবাধ্য ও তাকে অস্বীকারকারী মানুষ ও জিনদের চিরস্থায়ী শাস্তির জায়গা হিসেবে তৈরি করেছেন। জগৎ ধ্বংস হওয়ার পরে তিনি হিসাব নিয়ে কাফের-মুশরিক জিন ও মানুষকে সেখানে ছুড়ে ফেলবেন। তারা সেখান থেকে আর কখনও বের হতে পারবে না। তবে গুনাহগার মুমিনগণ নির্ধারিত সময়ের শাস্তি ভোগ করার পরে বেরিয়ে আসবে।

আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী, জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ.

অর্থ: 'আর তোমরা জাহান্নামকে ভয় করো যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।' [আলে ইমরান: ১৩১] তা ছাড়া পিছনে আমরা হাদিসে দেখেছি, মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পরে কাফের হলে জাহান্নামের দিকে তার কবর থেকে একটি দরজা খুলে দেওয়া হয়। ফলে তার কবরে জাহান্নামের বিষবাষ্প ও শাস্তি আসতে থাকে। যদি জাহান্নাম বর্তমানে বিদ্যমান না-ই থাকে, তবে তো এটা সম্ভব নয়।[১] তা ছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশায় জাহান্নাম দেখেছেন এবং বলেছেন—এমন ভয়ানক দৃশ্য কখনও দেখিনি। সেখানে নারীদের সংখ্যা বেশি ছিল। এর কারণ হিসেবে তিনি তাদের অকৃতজ্ঞ হওয়ার কথা বলেছেন। অর্থাৎ বছরের পর বছর কোনো নারীকে সবকিছু দেওয়ার পরে যদি একদিন না দেওয়া যায়, সে সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেলে, সারা জীবনে তোমার কাছ থেকে কিছুই পেলাম না।[২] আরেক হাদিসে তিনি বলেছেন, 'আমি যা দেখেছি যদি তোমরা তা দেখতে, তবে বেশি কাঁদতে কম হাসতে। সাহাবগণ জিজ্ঞাসা করলেন, কী দেখেছেন, হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, আমি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছি।'[৩]

জাহান্নামের অবস্থান: জান্নাতের মতো জাহান্নামেরও অনেক নাম রয়েছে এবং অনেকগুলো দরজা রয়েছে। মূল জাহান্নাম একটিই, কিন্তু সেটা অনেকগুলো স্তরে

১. আবু দাউদ (৪৭৫৩); মুসনাদে আহমদ (১৮৮৩২)।
২. বুখারি (১০৫২); মুসলিম (৯০৭)।
৩. মুসলিম (৪২৬); ইবনে খুজাইমা (১৬০২); মুসনাদে আহমদ (১২১২২)।

বিভক্ত। কিন্তু এর অর্থ আমরা যেভাবে উপরের দিকে একটার পর একটা বিল্ডিংয়ের ফ্লোর কল্পনা করি, তেমন হওয়া জরুরি নয়; বরং এগুলোর প্রকৃত অবস্থান আল্লাহ ভালো জানেন।

গোটা মহাবিশ্ব এতটাই বড় যে, এগুলোর কোথাও থাকা অসম্ভব নয়। তবে জাহান্নামের অবস্থান কোথায় সেটা আমাদের জানা নেই। কুরআনে জাহান্নামকে মাটির সর্বনিম্ন স্তরে [মুতাফফিফিন: ৭] বলা হয়েছে। হাদিসেও মাটিতে (আরদ) বলা হয়েছে।[১] অনেকে এর মাধ্যমে বুঝেছেন জাহান্নাম আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহের মাটির ভিতরে। তারা কুরআন-সুন্নাহে 'উপর' বলতে যেমন সোজা আমাদের মাথার উপর কল্পনা করেছেন, একইভাবে জাহান্নাম ভূপৃষ্ঠে বলায় তারা আমাদের পায়ের নিচের মাটি কল্পনা করেছেন। অথচ এটা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি। কারণ, বিশ্বে মাটি বলতে কেবল আমাদের গ্রহই নয়, এমন অযুত-নিযুত কোটি-কোটি গ্রহ রয়েছে। কুরআন-হাদিসের কোথাও এর স্থান আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহকে বলা হয়নি। উপরের ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে মূলত পৃথিবীর সাইজ না জানা এবং পৃথিবীকে একটা সাত তলা বিল্ডিংয়ের মতো কল্পনা করার ফলে। ফলে তারা মনে করেছেন নিচের দিকে সপ্তম তলাতে জাহান্নাম; অথচ আজ আমরা জানি পৃথিবী গোল। ফলে এটা ফ্লোরের মতো নয়। তা ছাড়া পৃথিবীর ব্যাসও আমরা জানি। এটা এতটাই ক্ষুদ্র যে, এক পাশ দিয়ে ঢুকলে আরেক পাশ দিয়ে বের হওয়া সম্ভব। ফলে পৃথিবীকে সাত তলা ভাগ করে সপ্তম তলাতে জাহান্নাম রয়েছে ভাবা অদ্ভুত। তা ছাড়া গোটা বিশ্বজগতের তুলনায় পৃথিবী এতটাই ক্ষুদ্র ও নগণ্য যে, পৃথিবীতে জাহান্নাম থাকার প্রশ্নও ওঠে না।

বরং হাদিসে জাহান্নাম ও জাহান্নামিদের যেই প্রকাণ্ড আকারের কথা পাওয়া যায়, তা পৃথিবীর মতো ক্ষুদ্র গ্রহে হওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে না। যেমন: হাদিসে এসেছে, জাহান্নামির এক কাঁধ থেকে অন্য কাঁধের দূরত্ব হবে দ্রুতগামী সওয়ারির তিন দিনের অতিক্রম করার মতো পথ।[২] আরেকটি হাদিসে এসেছে, জাহান্নামির একটা দাঁতের সাইজ হবে উহুদ পাহাড় পরিমাণ বিশাল। আর তার চামড়ার পুরুত্ব হবে তিন রাতের পথ।[৩] এই যদি হয় একজন জাহান্নামির আকৃতি এবং জাহান্নামির সংখ্যা জান্নাতিদের তুলনায় প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বই জন হয়,[৪] তবে জাহান্নামের বিশালতা

১. মুসতাদরাকে হাকেম (৮৭৯৫)।
২. বুখারি (৬৫৫১); মুসলিম (২৮৫২)।
৩. মুসলিম (২৮৫১); ইবনে হিব্বান (৭৪৮৭)।
৪. বুখারি (৩৩৪৮); মুসলিম (২২২)।

মানুষের মাথায় হিসাব করা সম্ভব? এত প্রকাণ্ড জাহান্নামকে ১২,৭৪২ কি.মি. ব্যাসার্ধের পৃথিবী নামক ছোট গ্রহের ভিতরে ঢোকানোর যুক্তি কী? আরেকটি হাদিসে এসেছে, জাহান্নামের উপর থেকে যদি একটা পাথর ফেলা হয়, তবে নিচে পৌঁছতে সত্তর বছর সময় লাগে।[১] আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের জানাচ্ছে, পৃথিবীর এক পাশ দিয়ে যদি কোনো মানুষ ভূগর্ভে লাফ দেয়, অন্য পাশে পৌঁছতে প্রায় আটত্রিশ মিনিট সময় লাগবে। ফলে এটার মাঝে জাহান্নামের অবস্থান নির্ধারণ করা অযৌক্তিক, বিশেষত যখন কুরআন-সুন্নাহ সেটা নির্ধারণ করে দেয়নি।

তাই বরং জাহান্নাম রয়েছে, কিন্তু কোথায় রয়েছে আল্লাহ ভালো জানেন। আধুনিক বিজ্ঞান মহাবিশ্বের সাইজ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। আর তাও কেবল পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বের (Observable Universe) বাইরে কী আছে অদ্যাবধি মানুষের কল্পনার বাইরে। সুতরাং জাহান্নাম থাকলেই সেটাকে খুঁজে পেতে হবে জরুরি নয়। মহাবিশ্বের অসংখ্য গ্রহের যেসব বর্ণনা আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছে, তা কুরআন-হাদিসে বর্ণিত জাহান্নামের বর্ণনার চেয়ে মোটেই কম ভয়ংকর নয়।

জাহান্নামের শাস্তির বর্ণনা: প্রথমেই আমদের যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে, জাহান্নামের যেসব বিবরণ কুরআন-হাদিসে এসেছে, সেগুলো আমাদের বোঝানোর জন্য সহজ করে বলা হয়েছে। নতুবা জাহান্নাম যতটা ভয়ংকর আর আল্লাহ তাতে যত মর্মন্তুদ শাস্তি রেখেছেন, সেটা মানুষের কল্পনারও বাইরে। জিবরাইল আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম দেখতে পাঠালে তিনি দেখেছিলেন সেটা তুফানের মতো এক অংশ আরেক অংশের উপর ভেঙে পড়ছে। অতঃপর তিনি বললেন—আল্লাহ, আপনার ইজতের শপথ! এর কথা শুনলে কেউ এখানে ঢুকতে চাইবে না।[২] সুতরাং জাহান্নামের এসব বিবরণ শুনে ওগুলো পৃথিবীর মতো হালকা মনে করা কিংবা ওগুলোতে সন্দেহ করা—যেমন এক শ্রেণির তথাকথিত প্রগতিশীল দাবিদাররা করে—অন্যায্য ও অন্যায়। এই বইয়ে জাহান্নাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়, তাই সংক্ষেপে কিছু বিবরণ তুলে ধরা হচ্ছে।

জাহান্নাম এমন একটি জায়গা, যা আল্লাহ সব ধরনের মর্মন্তুদ শাস্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করে রেখেছেন। সেখানে এত পরিমাণ শাস্তি রাখা হয়েছে, যা মানুষ সইবে তো দূরের কথা, কল্পনাও করতে পারে না। জাহান্নাম একদিকে আগুন দিয়ে ভরে রাখা হয়েছে,

---

১. মুসলিম (২৮৪৪); তিরমিজি (২৫৭৫)।
২. আবু দাউদ (৪৭৪৪); তিরমিজি (২৫৬০); ইবনে হিব্বান (৭৩৯৪)।

যা দুনিয়ার আগুনের তুলনায় সত্তর গুণ তীব্র।[১] এগুলো জাহান্নামিদের ঝলসে দেবে। আল্লাহ বলেন,

كَلَّا اِنَّهَا لَظٰى. نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى.

অর্থ: 'কখনোই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি, যা চামড়া ঝলসে দেবে।' [মাআরিজ: ১৫-১৬] অন্যত্র বলেন,

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَ هُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ.

অর্থ: 'আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। ফলে তারা বীভৎস আকার ধারণ করবে।' [মুমিনুন: ১০৪] বরং মানুষ হবে জাহান্নামের ইন্ধন। আল্লাহ বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

অর্থ: 'হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যার দায়িত্বে রয়েছেন পাষাণ হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অমান্য করেন না, বরং তাঁর আদেশ অনুযায়ীই সবকিছু করেন।' [তাহরিম: ৬] একইভাবে জাহান্নামে এত ঠাণ্ডার উপকরণ রাখা হয়েছে, যা মানুষকে বরফ বানিয়ে ফেলবে। হাদিসে পৃথিবীতে যে ঠাণ্ডা তৈরি হয় সেটাকে জাহান্নামের একটি নিঃশ্বাস বলা হয়েছে।[২]

প্রশ্ন হতে পারে, মানুষ ও পাথরকে কেন জাহান্নামের ইন্ধন বানানো হয়েছে? মানুষের অপরাধ আছে স্পষ্ট, পাথরের কী অপরাধ? পাথরকে ইন্ধন বানানো অপরাধের কারণে নয়, বরং আলিমদের মতে, সেগুলো বিশেষ ধরনের এক দাহ্য পাথর (গন্ধক)।

---

১. বুখারি (৩২৬৫); মুসলিম (২৮৪৩)।

২. বুখারি (৫৩৬); মুসলিম (৬১৭)। পৃথিবীর গরম ও ঠান্ডাকে জাহান্নামের দুটো নিঃশ্বাস বলা হয়েছে। আকল-পূজারী কিছু লোক এগুলো অস্বীকার করে। বিপরীতে মুহাক্কিক আলিমগণ এগুলো সত্যায়ন করেন। কারণ, এগুলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। হ্যাঁ, এসব হাদিস বাহ্যিক অর্থের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে নাকি তাবিল করা হবে, সেটা নিয়ে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। কিন্তু গ্রীষ্ম ও শীতের ক্ষেত্রে জাহান্নামের প্রভাবকে তারা অস্বীকার করেননি। তাদের মতে, জগতের প্রত্যেকটা বিষয়ের একটা বাহ্যিক কার্যকারণ রয়েছে, আরেকটা অন্তর্নিহিত। গ্রীষ্ম-শীতের বাহ্যিক কারণ মূলত সূর্য ও পৃথিবীর অবস্থান ইত্যাদি। কিন্তু অভ্যন্তরীণ কার্যকারণ যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। বাহ্যিক কার্যকারণ যেহেতু যুক্তি ও বিবেক দিয়েও বোঝা যায়, তাই কুরআন-সুন্নাহ সেগুলো উল্লেখ করেনি। কিন্তু যা যুক্তি ও অনুভবের বাইরে, সেগুলো উল্লেখ করেছে। বিস্তারিত দেখুনঃ মাআরিফুস সুনান, ইউসুফ বানুরি (২/৫১-৫৪)।

অধিক দাহ্য হওয়ার কারণে সেগুলোকে ইন্ধন বানানো হয়েছে। কুরআনে বিভিন্ন পাথর সম্পর্কে এসেছে, সেগুলো আল্লাহর ভয়ে ফেটে যায়, গড়িয়ে পড়ে। [বাকারা: ৭৪] এর মাধ্যমে কেউ কেউ মনে করতে পারে, পাথরের আমাদের মতো জীবন আছে। ফলে জাহান্নামে দিলে পাথর যন্ত্রণা পাবে ইত্যাদি। অথচ বাস্তবতা বিপরীত। বরং পাথর স্বাভাবিকভাবে জড়বস্তু। কিন্তু আল্লাহর ভয়ে গড়িয়ে পড়া এগুলো আল্লাহ তার কুদরতের মাধ্যমে করতে পারেন। কুরআন-সুন্নাহে এসেছে, আল্লাহর সঙ্গে আকাশ ও মাটি কথা বলে। [ফুসসিলাত: ১১] তা হলে এগুলো কি জীবিত প্রাণী? কুরআনে এসেছে, পৃথিবীর সকল বস্তু আল্লাহর তাসবিহ পড়ে। [ইসরা: ৪৪] তা হলে জগতে জড়বস্তু বলতে কিছু নেই? বাস্তবতা হলো, এগুলো আমাদের পরিভাষায় জড়বস্তুতই। তাদের কথা বলা ও তাসবিহের স্বরূপ আল্লাহই ভালো জানেন। ফলে পাথরকে পোড়ানো পাথরের জন্য মোটেই যন্ত্রণাদায়ক নয়, বরং পাথর যত পুড়বে তত জ্বলতে থাকবে। কারণ, সেই পাথরের ধর্মই জ্বলা। যদি পাথরের ব্যথার কথা আসে, তবে তো জাহান্নামের নিজেরও ব্যথা পাওয়া কথা। কারণ, কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত, জাহান্নাম কথা বলে, [ক্বাফ: ৩০] জাহান্নাম নিঃশ্বাস ছাড়ে।[১] তা হলে জাহান্নামে আগুন থাকলে তো জাহান্নামও ব্যথা পাবে। বিপরীতে জিন আগুনের তৈরি। ফলে তাদের ব্যথা না পাওয়ার কথা, অথচ জিনরাও জাহান্নামের আগুনে মাটির মানুষের মতোই যন্ত্রণা ভোগ করবে। তাই বাস্তবতা হলো, আমাদের জন্য আগুন যেমন যন্ত্রণাদায়ক, জগতের সকলের জন্য এটা তেমন যন্ত্রণাদায়ক হওয়া আবশ্যক নয়। এসব বিষয়ে আমাদের একটি মূলনীতি মনে রাখাই যথেষ্ট: আল্লাহ কখনোই কারও প্রতি জুলুম করেন না। [কাহাফ: ৪৯]

তা ছাড়া জাহান্নাম বড়-বড় অন্ধকার গর্ত, পাহাড়-পর্বত, বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছু, হাতুড়ি-গদা, শিকল-বেড়ি ইত্যাদি দিয়ে পরিপূর্ণ। জাহান্নামের সাপ-বিচ্ছুর বর্ণনায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'জাহান্নামে উটের ঘাড়ের মতো সাপ রয়েছে। সেগুলো একবার দংশন করলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত এর বিষে লাফাতে থাকবে। জাহান্নামে খচ্চরের মতো বিচ্ছু রয়েছে। একবার দংশন করলে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বিষ অনুভব করবে।'[২] জাহান্নামে মৌমাছি ছাড়া সব ধরনের পোকা-মাকড় থাকবে।[৩]

---

১. বুখারি (৫৩৬); মুসলিম (৬১৭)।
২. মুসনাদে আহমদ (১৭৯৮৯)।
৩. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (১০৪৮৭); মুসনাদে আবু ইয়ালা (৪২৩১)।

জাহান্নামের খাবার অত্যন্ত বিস্বাদ। সেখানের পানি এতটাই গরম যা নাড়িভুঁড়ি গলিয়ে দেয়। আল্লাহ বলেন,

لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ . فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ . فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ . فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ . هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ.

অর্থ: 'তোমরা অবশ্যই ভক্ষণ করবে জাক্কুম বৃক্ষ। সেটা দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। এরপর পান করবে ফুটন্ত পানি। পান করবে তৃষ্ণার্ত উটের মতো। কিয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।' [ওয়াকিয়া: ৫২-৫৬] অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ . طَعَامُ الْاَثِيْمِ . كَالْمُهْلِ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ . كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ . خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ . ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ.

অর্থ: 'নিশ্চয়ই জাক্কুম বৃক্ষ পাপীর খাদ্য হবে। গলিত তাম্রের মতো তা পেটে ফুটতে থাকবে, যেমন ফোটে উত্তপ্ত পানি। তোমরা একে ধরো এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে। এরপর তার মাথার উপর ঢেলে দাও ফুটন্ত পানির শাস্তি।' [দুখান: ৪৩-৪৮]

এই জাক্কুমের তিক্ততা অনুভব করা যায় রাসুলুল্লাহর হাদিস থেকে। তিনি বলেন, 'যদি জাক্কুম থেকে একটি ফোঁটা পৃথিবীতে পড়ত, তবে গোটা পৃথিবীবাসীর জীবন-যাত্রা বিনষ্ট হয়ে যেত। তা হলে তাদের উপায় কী হবে জাক্কুমই যাদের খাবার?'[১] আল্লাহ অন্যত্র এর সঙ্গে আরও কিছু শাস্তি উল্লেখ করে বলেন,

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُّصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ . يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ . وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ . كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ.

অর্থ: 'এই দুই বিবাদী, তারা তাদের পালনকর্তাকে নিয়ে বিতর্ক করে। অতএব, যারা কাফের তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরি করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে। ফলে তাদের পেটে যা-কিছু আছে, সব এবং গায়ের চামড়া গলে যাবে। তাদের জন্য রয়েছে লোহার হাতুড়ি। তারা যখনই যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ

---

১. তিরমিজি (২৫৮৫); ইবনে মাজা (৪৩২৫)।

হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদের তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। (এবং বলা হবে) আস্বাদন করো দহনের শাস্তি।' [হজ: ১৯-২২]

জাহান্নামিদের পুঁজ পান করতে দেওয়া হবে। আল্লাহ বলেন,

مِنْ وَرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ. يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَّمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ.

অর্থ: 'তার পিছনে রয়েছে জাহান্নাম। তাতে তাকে পুঁজ মেশানো পানি পান করানো হবে। সে ঢোক গিলে সেটা পান করতে চাইবে, কিন্তু গিলতে পারবে না। প্রত্যেক দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু ছুটে আসবে, কিন্তু সে মরবে না। তার পশ্চাতেও রয়েছে কঠিন শাস্তি।' [ইবরাহিম: ১৬-১৭]

জান্নাতে যেমন স্তর রয়েছে, জাহান্নামেও তেমন স্তর রয়েছে। জান্নাতের স্তরগুলো যত উপরে হবে, তত মর্যাদাময় ও শ্রেষ্ঠ হবে। বিপরীতে জাহান্নামের স্তর যত নিচে, তত কঠিন ও মন্দ এবং সেখানে শাস্তি তত ভয়ংকর হবে। কুরআনে মুনাফিকদের অবস্থানস্থল সম্পর্কে বলা হয়েছে,

إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا.

অর্থ: 'নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা থাকবে দোজখের সর্বনিম্ন স্তরে।' [নিসা: ১৪৫]

জাহান্নামে সবার শাস্তি এক ধরনের হবে না; বরং প্রত্যেকে নিজ নিজ অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি পাবে। আগুন কারও পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত থাকবে, কারও হাঁটু পর্যন্ত, কারও কোমর পর্যন্ত, আবার কারও গলা পর্যন্ত।[১] সবচেয়ে কম শাস্তি হবে যার, তাকে আগুনের জুতা পরিয়ে দেওয়া হবে যাতে তার মাথার ঘিলু টগবগ করে ফুটতে থাকবে। সে মনে করবে সেটাই সবচেয়ে বেশি শাস্তি। অথচ সেটা সবচেয়ে কম শাস্তি।[২]

জাহান্নামিদের শাস্তি বেশি হওয়ার জন্য তাদের শারীরিক আকৃতিও বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে, যেখানে জান্নাতিদের আকৃতি হবে ষাট হাত, জাহান্নামিদের আকৃতি অকল্পনীয় রকমের বড় হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিসে বলেছেন, জাহান্নামির এক কাঁধ থেকে অন্য কাঁধের দূরত্ব হবে দ্রুতগামী সওয়ারির তিন

---

১. মুসতাদরাকে হাকেম (৮৮৩৮); আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (৬৯৯৪)।
২. বুখারি (৬৫৬১); মুসলিম (২১৩)।

দিনের অতিক্রম করার মতো পথ।[১] আরেকটি হাদিসে এসেছে, জাহান্নামির একটা দাঁতের সাইজ হবে উহুদ পাহাড় পরিমাণ বিশাল। আর তার চামড়ার পুরুত্ব হবে তিন রাতের পথ।[২] শরীরের সাইজ যত বড় হয়, দহন-যন্ত্রণা তত মারাত্মক হয়, শাস্তি তত বেশি প্রচণ্ড হয়। তাই জাহান্নামিদের এত প্রকাণ্ড করে তৈরি করা হবে। এত বড়-বড় দেহধারী অগণিত অসংখ্য মানুষ নিয়েও জাহান্নামের তৃপ্তি মিটবে না। সে আল্লাহর কাছে বলবে আরও আছে? তখন আল্লাহ জাহান্নামে তাঁর 'পা' রাখবেন আর তাতে সে বলবে 'হয়েছে, হয়েছে'।[৩] কিন্তু পুড়লেই শেষ নয়। বরং যখনই এক চামড়া পুড়ে যাবে, আল্লাহ নতুন চামড়া সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا.

অর্থ: 'যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করবে, আমি নিঃসন্দেহে তাদের আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আমি তা অন্য চামড়া দিয়ে বদলে দেবো, যাতে তারা শাস্তি আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী।' [নিসা: ৫৬]

জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার চেষ্টা: জাহান্নামিরা জাহান্নামের নিদারুণ শাস্তিতে নিক্ষিপ্ত হবার পরে সবকিছু দিয়ে হলেও সেখান থেকে বের হতে চাইবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ۗ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

'যখন (জাহান্নামের) শাস্তি দেখবে, যদি প্রত্যেক জালিম (পাপী) আত্মার কাছে গোটা পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু থাকে, এগুলোর বিনিময়েও সে নিজের মুক্তি চাইবে আর গোপনে গোপনে অনুতাপ করবে। তাদের জন্য সিদ্ধান্ত হবে ন্যায়সঙ্গত এবং তাদের উপর জুলম হবে না।' [ইউনুস: ৫৪] সেদিন কেউ কারও দিকে তাকাবে না। তাই জাহান্নামিরা নিজের পরিবার-পরিজনকে বিসর্জন দিয়ে হলেও সেখান থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে। আল্লাহ বলেন,

---

১. বুখারি (৬৫৫১); মুসলিম (২৮৫২)।
২. মুসলিম (২৮৫১); ইবনে হিব্বান (৭৪৮৭)।
৩. বুখারি (৪৮৪৮); মুসলিম (২৮৪৬)।

يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ . وَ صَاحِبَتِهِ وَ اَخِيهِ . وَ فَصِيلَتِهِ الَّتِي تُـؤْوِيهِ . وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ . كَلَّا اِنَّهَا لَظٰى.

অর্থ: 'তারা একে অপরকে দেখতে পাবে। অপরাধী সেদিনের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য নিজের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, ভাই এবং নিজের সম্প্রদায়কে তার জায়গায় পণস্বরূপ রাখতে চাইবে। বরং গোটা পৃথিবীর সবাইকে রেখে নিজে বাঁচতে চাইবে। কখনোই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি।' [মাআরিজ: ১১-১৫]

যখন দেখবে এভাবে কাজ হবে না, তখন বারবার আল্লাহর কাছে আবেদন করবে আরেকটিবার সুযোগ দেওয়ার জন্য। কিন্তু আল্লাহ সে কথায় গুরুত্ব দেবেন না। তিনি বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ . وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا رَبَّنَا اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ

অর্থ: 'আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের সেখানে মৃত্যুর অনুমতি থাকবে না যে তারা মৃত্যুবরণ করবে। আর তাদের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। সেখানে তারা চিৎকার করে বলতে থাকবে—হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের (একবার) বের করে দিন। আমরা সৎকাজ করব। আগে যা করেছি তা আর করব না। (আল্লাহ বলবেন) আমি কি তোমাদের এতটা বয়স দিইনি, যাতে উপদেশ গ্রহণ করার মতো ব্যক্তি তা করতে পারত? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতএব, আস্বাদন করো। জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।'। [ফাতির ৩৬-৩৭] অন্য আয়াতে তাগিদ করে বলছেন,

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ . وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

অর্থ: 'যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা তাদের পালনকর্তার সামনে অবনত মস্তকে বলবে—হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা তো সবকিছু দেখলাম ও শ্রবণ

করলাম। এখন আমাদের (আবার দুনিয়াতে) পাঠিয়ে দিন, আমরা সৎকর্ম করব। আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছি। (আল্লাহ বলেন) আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে হিদায়াত দিতাম; কিন্তু আমার এ উক্তি অবধারিত হয়ে গেছে যে, আমি জিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব। অতএব, এ দিবসের সাক্ষাৎ ভুলে যাওয়ার মজা উপভোগ করো। আমিও তোমাদের ভুলে গেলাম। তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে স্থায়ী শাস্তি ভোগ করো।' [সাজদা: ১২-১৪] তারা আবারও অনুরোধ করবে একটাবার বের করার জন্য। কিন্তু আল্লাহ বলবেন, চুপ থাকো:

رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ. قَالَ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ.

অর্থ: 'হে আমাদের পালনকর্তা, এখান থেকে আমাদের বের করে দিন। আমরা যদি পুনরায় আগের পথে ফিরে যাই, তবে জালিম গণ্য হবো। আল্লাহ বলবেন, তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাকো এবং আমার সাথে কোনো কথা বলো না।'। [মুমিনুন: ১০৭-১০৮]

যখন তারা দেখবে কোনো অনুরোধ কাজে আসছে না, তখন জাহান্নামের প্রহরীদের কাছে সুপারিশ চাইবে। বলবে,

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ. قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا بَلٰى قَالُوْا فَادْعُوْا وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ

অর্থ: 'যারা জাহান্নামে আছে তারা জাহান্নামের রক্ষীদের বলবে, আপনাদের পালনকর্তাকে একটু বলুন, তিনি যেন আমাদের থেকে মাত্র একটা দিনের শাস্তি লাঘব করে দেন। প্রহরীরা বলবেন, তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণাদি-সহ তোমাদের রাসুলগণ আসেননি? তারা বলবে হ্যাঁ, এসেছিলেন। প্রহরীরা বলবেন, তা হলে তোমরাই (আল্লাহকে) ডেকে বলো। বস্তুত কাফেরদের ডাকাডাকি নিস্ফলই হয়।'। [গাফের: ৪৯-৫০] যখন দেখবে এভাবেও কাজ হবে না, তখন প্রহরীদের সরদার মালেক ফেরেশতাকে ডেকে বলবে তদের মৃত্যু দিতে, যাতে এই শাস্তি থেকে রক্ষা পায়। আল্লাহ বলেন,

وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ.

অর্থ: 'তারা ডেকে বলবে—হে মালেক, আপনার পালনকর্তা আমাদের খতম করে দিক। তিনি বলবেন, (তা সম্ভব নয়) নিশ্চয় তোমরা চিরকাল থাকবে'। [জুখরুফ: ৭৭]

জান্নাত ও জাহান্নাম ধ্বংসহীন: জান্নাতে যারা যাবে, তারা চিরকাল তথায় থাকবে। কখনও সেখান থেকে বের হবে না। তাদের সৌভাগ্য শেষ হবে না। একইভাবে জাহান্নামে যারা যাবে, সেসব কাফের-মুশরিকও কখনও সেখান থেকে বের হবে না। জাহান্নাম কখনও শেষ হবে না। এভাবে জান্নাত ও জাহান্নাম দুটোই আল্লাহর চিরস্থায়ী সৃষ্টি। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বসম্মত আকিদা। জাহমিয়্যাহরা এই আকিদা অস্বীকার করে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সালাফ জান্নাত-জাহান্নাম চিরস্থায়ী হওয়ার ব্যাপারে একমত। হ্যাঁ, দু-একজন ব্যক্তি থেকে বক্তব্য পাওয়া যায় যে, তারা জান্নাতকে চিরস্থায়ী বললেও জাহান্নামকে চিরস্তায়ী বলেননি। বরং তারা মনে করতেন জাহান্নাম একদিন থাকবে না।[১] কিন্তু এগুলো দুর্বল এবং কুরআন-সুন্নাহ ও উম্মাহর ইজমার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বক্তব্য। ফলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনে আরাবি মনে করতেন, জাহান্নামের শাস্তি নির্দিষ্ট একটা মেয়াদে হবে। অতঃপর জাহান্নামিদের প্রকৃতি জাহান্নামের মতো হয়ে যাবে। প্রকৃতির এই সামঞ্জস্যের ফলে জাহান্নাম শান্তিতে পরিণত হবে। ফলে জান্নাত আর জাহান্নামের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকবে না।[২] এটা সর্বৈব গলদ ও জঘন্য বক্তব্য। কোনোভাবেই এর পক্ষে সাফাই গাওয়া সম্ভব নয়।

ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িম প্রথমে জাহান্নাম ধ্বংস হয়ে যাবে মনে করতেন। তবে **সম্ভবত** তারা পরবর্তীকালে সেই মত ত্যাগ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের মতের দিকে ফিরে আসেন।[৩] এ কারণে ইমাম তহাবি রাহি. লিখেছেন,

---

১. শাইবানি (৩৮); আকহাসারি (২২৩); গুনাইমি (১২০)।

২. ফুসুসুল হিকাম (৯৪)। ইবনে হাজার উক্ত মত উল্লেখ করে কারও নাম না নিয়ে বলেন, 'এটা কিছু তাসাওউফ নামধারী জিন্দিকের বক্তব্য (ফাতহুল বারি ১১/৪২১)। হজরত থানভিকে উক্ত বক্তব্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি লম্বা জবাব দেন। যার সারকথা—উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। অতঃপর তিনি আদ-দুররুল মুখতারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, উক্ত (ফুসুস) কিতাবের এসব অধ্যায় পড়া উচিত নয়। কারণ, যদিও তাবিল করলে এগুলোকে টেনেটুনে ঠিক করা যায়, কিন্তু এমন তাবিল করলে শরিয়তের আর কিছুই থাকবে না। সবকিছু তাবিল করা যাবে, যা নিতান্তই 'সাফসাতাহ'। (রদ্দুল মুহতার ৪/২৩৮); ইমদাদুল ফাতাওয়া (৫/৪৩৫-৪৩৬)।

৩. হাদিল আরওয়াহ, ইবনুল কাইয়িম (৩৫২, ৩৬৪); শিফাউল আলিল, ইবনুল কাইয়িম (২৬০)। ইবনুল কাইয়িম হাদিল আরওয়াহ, শিফাউল আলিল-সহ একাধিক কিতাবে জাহান্নাম ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা বললেও অন্য কিছু কিতাব, যেমন: আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব, তরিকুল হিজরাতাইন ইত্যাদি গ্রন্থে বোঝা যায় তিনি তার মত পরিবর্তন করেছেন, যদিও সেগুলো সুস্পষ্ট নয়। একইভাবে ইবনে তাইমিয়ার কিতাবগুলোতে জাহান্নামও স্থায়ী হওয়ার বক্তব্য রয়েছে (যেমন মাজমুউল ফাতাওয়া ১৮/৩০৭)। এগুলোর উপর ভিত্তি করে তার অনুসারীরা বলেন, 'তিনি জাহান্নাম অস্থায়ী হওয়ার কথা বলেননি। এটা তার উপর অপবাদ।' কিন্তু এমন বক্তব্যই বরং অপবাদ। শাইখ ইবনে তাইমিয়া তার জীবদ্দশায় একাধিক গ্রন্থে জাহান্নামকে অস্থায়ী বলেছেন। ইবনুল কাইয়িম সেটা নিজে লিখেছেন। কিন্তু সম্ভবত আলিমদের প্রতিবাদের মুখে সেই মত পরিত্যাগ করেন। তাই তার কিতাবে সেগুলো পাওয়া যাওয়া জরুরি নয়। তাদের সমকালীন আলিম ইমাম তকিউদ্দিন সুবকি শাইখ ইবনে তাইমিয়ার উক্ত মতের খণ্ডনে 'আল-ইতিবার বি-

'জান্নাত এবং জাহান্নাম আল্লাহর সৃষ্টি করা দুটো মাখলুক। এ দুটো কখনও ধ্বংস হবে না, বিলীন হবে না।'

কুরআনের একাধিক আয়াতে আল্লাহ জান্নাত ও জাহান্নামের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করেছেন। ফলে জান্নাত ও জাহান্নাম ধ্বংসহীন হওয়া চূড়ান্ত ও সন্দেহাতীত সত্য। জান্নাতের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ.

অর্থ: 'বলুন, আমি কি তোমাদের এসবের চাইতেও উত্তম বিষয়ের সন্ধান বলব? যারা আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহর নিকট তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবহমান। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পবিত্র সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি।' [আলে ইমরান: ১৫] অন্যত্র বলেন,

وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا.

অর্থ: 'আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এমন সব জান্নাতের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। তারা তথায় চিরকাল থাকবে...।' [তাওবা: ৭২] জাহান্নামের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

---

বাকায়িল জান্নাতি ওয়ান-নার'-শীর্ষক কিতাবও লিখেছেন। তিনি না বললে সুবকি তার বিরুদ্ধে আস্ত একটা কিতাব কেন লিখবেন? বরং সম্প্রতি বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থাগারে 'রিসালাহ ফি বাকায়িল জান্নাহ ওয়া ফানায়িন নার' নামে ইবনে তাইমিয়ার একটি পাণ্ডুলিপি উদ্ধার হয়েছে, যাতে একেবারে স্পষ্টভাবেই তিনি জাহান্নাম ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পক্ষে কথা বলেছেন। তবে দুঃখজনক হলো, ব্যক্তিকেন্দ্রিক গোঁড়ামিতে আক্রান্ত কিছু লোক তাদের ভুলকেও শুদ্ধ গণ্য করতে চান। ফলে তারা এই পুস্তিকার নাম পুরো বদলে দিয়ে লিখেছেন 'আর-রাদ্দু আলা মান কালা বি-ফানায়িল জান্নাহ ওয়ান-নার'। এটাতে বর্ণিত বিভিন্ন বক্তব্যকে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বরং গোঁড়ামির দুঃখজনক উদাহরণ হলো, একদল আলিম বলে বেড়ান, 'জাহান্নামকে ধ্বংসশীল ও অস্থায়ী বলা বিদআত নয়। এটা মতভেদপূর্ণ মাসআলা।' এমন একটি সর্বসম্মত মাসআলাকে মতভেদপূর্ণ বলা বরং বিদআত। ত্বহাবিয়্যাহর ব্যাখ্যাতা ইবনে আবিল ইজ এটার প্রথম প্রবক্তা। পরবর্তীকালে অনেকে তাকে অনুসরণ করেছেন। শাইখ মুকবিল ইবনে হাদি নিজে স্বীকার করেছেন, 'জাহান্নামকে ধ্বংসশীল বলার মাসআলাতে ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়্যিমের পদস্খলন হয়েছে' (মুকাদ্দিমাতু বুলুগিল মুনা ১১)। এরও আগে শাইখ সানআনি উক্ত মাসআলায় তাদের দুজনকে খণ্ডন করে 'রাফউল আসতার'-শীর্ষক স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখেছেন। শাইখ আলবানিও এটাকে ভুল বলে খণ্ডন করেছেন। সুতরাং এটা অস্বীকারের সুযোগ নেই। হ্যাঁ, যেহেতু বলা হয়ে থাকে যে, তারা প্রত্যাবর্তন করেছেন, তাই এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা চাই। আমাদের উদ্দেশ্য হোক ব্যক্তিবিশেষের ভুলের পেছনে না লাগা, বরং ভুল থেকে ফিরে এলে তাকে স্বাগত জানানো। তা ছাড়া উক্ত মাসআলাতে যদি কোনো আলিম দলিলের ভিত্তিতে মতভেদ করেন, তাকে কাফের, পথভ্রষ্ট বলেও গালি না দেওয়া চাই। কারণ দলিলের ভিত্তিকে কেউ এমন কথা বললে সেটা কুফরি হবে না। সুতরাং কারও ভুলটাকে যেমন শুদ্ধ না বলা উচিত, আবার কারও ভুলকে তার উপর আক্রমণের হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার না করা উচিত।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ.

অর্থ: 'তারা তথায় চিরকাল থাকবে। তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না। তাদের দিকে তাকানোও হবে না।' [বাকারা: ১৬২] আল্লাহ অন্যত্র জাহান্নামের ব্যাপারে বলেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا.

অর্থ: 'আল্লাহ মুনাফিক নারী-পুরুষ এবং কাফেরদের জাহান্নামের শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তারা তথায় চিরকাল থাকবে।' [তাওবা: ৬৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'জান্নাতিগণ জান্নাতে চলে গেলে এবং জাহান্নামিদের জাহান্নামে ছুড়ে ফেলা হয়ে গেলে আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুকে একটি সাদাকালো মেষের আকৃতি দান করবেন। এরপর জান্নাতি ও জাহান্নামিদের ডেকে বলবেন, তোমরা একে চেনো? সবাই বলবে, হ্যাঁ, এটা তো মৃত্যু। তখন সবার সামনে সেটোকে জবেহ করা হবে। অতঃপর জান্নাতিদের বলা হবে, চিরকাল থাকো। আজ থেকে কোনো মৃত্যু নেই। জাহান্নামিদের বলা হবে, এখানে চিরকাল থাকো। আজ থেকে কোনো মৃত্যু নেই।'[১] উল্লেখ্য, এখানে মৃত্যু বলতে আবার মৃত্যুর ফেরেশতা নন। বরং মৃত্যু বিষয়টাকেই আল্লাহ মেষের রূপ দান করে শেষ করে দেবেন। এটা আল্লাহর জন্য মোটেও অসম্ভব নয়।

অতীতে ও সমকালীন সময়ে অনেকেই এ ব্যাপারে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। বিশেষত বর্তমানে তথাকথিত উদারমনা মুসলমান বুদ্ধিজীবীগণ মনে করেন, কাফেরদের চিরকাল জাহান্নামে থাকা দৃষ্টিকটু কিংবা মানবতা বিরোধী। কারণ, অস্থায়ী জীবনের কুফরের জন্য স্থায়ী শাস্তি দেওয়া কি জুলুম নয়?

উপরে উল্লেখ করা আয়াত ও হাদিসগুলো তাদের খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট, যেখানে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, সবাই চিরস্থায়ীভাবে জান্নাত ও জাহান্নামে থাকবে। রইল জুলুম প্রসঙ্গ। অর্থাৎ অস্থায়ী জীবনের কুফরের কারণে স্থায়ী শাস্তি কেন হবে? প্রথম কথা হলো, এর উত্তর আল্লাহ ভালো জানেন। আমরা সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারব না। তিনি প্রজ্ঞাময়। তিনি কাউকে একবিন্দু জুলুম করেন না। সুতরাং কাফেরদের উপরও তিনি জুলুম করবেন না এটা নিশ্চিত। দ্বিতীয়ত এর উত্তর আল্লাহ নিজে কুরআনে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন,

---

১. বুখারি (৪৭৩০); মুসলিম (২৮৪৯)।

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.

অর্থ: 'বরং তারা আগে যা গোপন করত তা তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যদি তাদের পুনরায় পাঠানো হয়, তবুও তা-ই করবে যা করতে তাদের নিষেধ করা হয়েছে। নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।' [আনআম: ২৮]

আল্লাহ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সবকিছু জানেন। ফলে তিনি এটাও জানেন যে, কাফেরদেকে জাহান্নাম থেকে বের করে দুনিয়াতে পাঠালে তারা আবারও কুফরি করবে। সুতরাং যতবার পাঠানো হবে, ততবার কুফরি করবে। যেহেতু তাদের কুফরি স্থায়ী, সুতরাং তাদের শাস্তিও হবে স্থায়ী। তা ছাড়া কর্মের সময়ের সঙ্গে শাস্তির সময়ের মিল থাকা জরুরি নয়। যেমন: কেউ যদি কাউকে এক মুহূর্তে হত্যা করে ফেলে, তখন কি এ কথা বলা যাবে যে, এক মুহূর্তের একটা কাজের জন্য তাকে কেন হত্যা করা হচ্ছে কিংবা যাবজ্জীবন জেলে রাখা হচ্ছে? না, কখনোই না। কারণ, কাজটা কতক্ষণ অব্যাহত ছিল সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়; গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কাজটা কতটা ভয়াবহ।

অনেককে প্রশ্ন করতে দেখা যায়, জান্নাত ও জাহান্নামের পরে কী? একটানা কোটি কোটি বছর জান্নাতের নিয়ামত ভোগ করতে করতে তো একঘেয়েমি চলে আসতে পারে। একইভাবে কোটি কোটি বছর শাস্তি পেতে পেতে আর গায়ে নাও লাগতে পারে। তা হলে এভাবে চলমান থাকার অর্থ কী? এর চেয়ে আবার দুনিয়াতে পাঠালে নতুন করে বাঁচা, নতুন অভিজ্ঞতা নেওয়ার সুযোগ হতো। এসব প্রশ্নকে আমরা তুচ্ছ করে দেখছি না। কিন্তু আমরা কেবল মানুষকে মানুষের সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি। গোটা সৃষ্টিকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। জীবন ও মৃত্যু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আল্লাহই জানেন ভালো হবে। কোনটা সুন্দর হবে তিনিই বলতে পারেন। যদি একঘেয়েমি কিংবা এ-জাতীয় বিষয় আসার সুযোগ হতো এবং সেক্ষেত্রে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠালে ভালো হতো, তবে তিনি সেটাই করতেন। কিন্তু তিনি যেহেতু স্থায়িত্বের ফয়সালা করেছেন, বোঝা গেল সৃষ্টির নিয়মের ক্ষেত্রে এটাই পারফেক্ট। আমাদের কাছে আজ সুখ-দুঃখ ও ক্লান্তি-বিরক্তির যে মানদণ্ড, জরুরি নয় যে জান্নাতেও এগুলো বিদ্যমান থাকবে, ফলে আমরা বিরক্ত হয়ে যাব সেখানে থাকতে থাকতে। আমরা মানুষ, আমাদের সীমাবদ্ধ ব্রেইনে যেটা ভাবছি সেটাই কেন সঠিক মনে করছি? একটা মানুষ মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থাতে যদি তাকে এই দুনিয়ার সবকিছু খুলে বলা হতো, সে কতটুকু উপলব্ধি করত? রুহের জগতে আমাদের থেকে সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে আমরা কতটুকু মনে রেখেছি? ফলে

পরকালে আমাদের মানসিকতা কেমন হবে, আমরা কীভাবে চিন্তা করব, সেটা এই জগতের চিন্তাশক্তির সঙ্গে মেলানো সঠিক নয়। তা ছাড়া আমরা পিছনে বলে এসেছি, জান্নাতে মানুষ যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারবে। দুনিয়াতে এসে তার যেসব কাজ করার ইচ্ছা, সেগুলো সে জান্নাতে বসেই নির্বিঘ্নে করতে পারবে। চাইলে আল্লাহ জান্নাতেই তার জন্য দুনিয়ার সকল উপকরণের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। সে উড়তে পারবে, চলতে পারবে, ঘুরতে পরবে, রোমান্স ও রোমাঞ্চের অভিজ্ঞতা নিতে পারবে। কোনো বাধা নেই, কোনো নিষেধ নেই। তা হলে দুনিয়ায় আসতে হবে কেন? বস্তুত একজন মুমিনের সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো নিজের সীমাবদ্ধতাকে জানা, নিজেকে আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া। জান্নাত অর্জন ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার দোয়া করা, চেষ্টা করা, এ জন্য আমল করা।

জান্নাত আল্লাহর অনুগ্রহ আর জাহান্নাম ইনসাফ: পিছনে এটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, মানুষ নিজের আমলের মাধ্যমে জান্নাতে যেতে পারবে না। যত পুণ্যের কাজ করুক, মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত এই জীবনের নিয়ামতগুলোর কৃতজ্ঞতাও আদায় করে শেষ করতে পারে না। সেখানে জান্নাতের উপযুক্ত কী করে হবে? ফলে কারও আমল তাকে জান্নাতে নিতে পারবে না, বরং আল্লাহর অনুগ্রহ জান্নাতে নেবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের কাউকে তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাবে না। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনাকেও না? তিনি বললেন, আমাকেও না, তবে আল্লাহ যদি তাঁর অনুগ্রহ এবং রহমতের চাদরে আমাকে ঢেকে নেন। সুতরাং তোমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকো।[১]

জাহান্নামে নিক্ষেপ আল্লাহর জুলুম নয়, বরং ইনসাফ। কারণ আল্লাহ প্রত্যেকটি মানুষকে পৃথিবীতে স্বাধীন করে তৈরি করেছেন। তাকে ডানবাম বোঝার ক্ষমতা দিয়েছেন। বারবার নবি-রাসুল ও আসমানি কিতাব পাঠিয়ে সতর্ক করেছেন। এর পরেও সে সবকিছু উপেক্ষা করে নিজের জন্য অন্যায়ের পথ বেছে নিয়েছে। সুতরাং মুমিন হওয়ার কারণে তাকে ক্ষমা করে দিলে সেটা আল্লাহর অনুগ্রহ। কিন্তু যদি ক্ষমা না করে শাস্তি দিতে চান, কাফেরদের যদি চিরকাল জাহান্নামে রাখেন, সেটা তার ইনসাফ। কারণ, তাদের কর্মের মাধ্যমেই তারা এর উপযুক্ত হয়েছে। এ জন্য ইমাম তহাবি লিখেছেন, **'সুতরাং তিনি যাকে চান নিজ অনুগ্রহে জান্নাত দান করেন; আর যাকে চান ইনসাফের ভিত্তিতে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যান।'** তবে ইমাম তহাবির পরবর্তী বাক্য

---

১. বুখারি (৫৬৭৩); মুসলিম (২৮১৬)।

'যাকে যেজন্য তৈরি করা হয়েছে সে তা-ই করবে, যাকে যেখানের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সে সেদিকেই যাবে। ভালো এবং মন্দ (আল্লাহর পক্ষ থেকে) মানুষের জন্য নির্ধারিত'—এর মাধ্যমে মানুষ বাধ্য এটা বোঝা যাবে না। এ ব্যাপারে আমরা পিছনে লম্বা আলোচনা করেছি। যার নির্যাস ছিল, আল্লাহ কাউকে প্রথমেই জান্নাত-জাহান্নামের জন্য ঠিক করে এরপর সৃষ্টি করেছেন—এমন নয়। এমন হলে এখানে মানুষের কোনো দায় থাকে না। কারণ, আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা কারও নেই। ফলে নবি-রাসুল পাঠানো, কিতাব অবতীর্ণ করা, আদেশ-নিষেধ প্রদান করার কোনো অর্থ থাকে না; বরং এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তাঁর ইলমের মাধ্যমে সৃষ্টির আগেই জেনে নিয়েছেন কে জান্নাতি হবে আর কে জাহান্নামি। ফলে তিনি তাদের জন্য সেটাই লিখেছেন। দুনিয়াতে এসে এখন তারা তা-ই করবে যা লেখা হয়েছে। বিপরীতটা করতে পারবে না। কারণ, আল্লাহর লেখা পরিবর্তন হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রে যদি কেউ জাহান্নামে যায়, তবে সেটা আল্লাহ লিখে রেখেছেন তাই গিয়েছে বলা গেলেও **লেখার কারণে** গিয়েছে এমন বলা যাবে না। বরং নিজের কর্মের কারণে গিয়েছে। আল্লাহ কাউকে জুলুম করেন না।

وَالاسْتِطَاعَةُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الفِعْلُ مِن نَحْوِ التَّوْفِيقِ الذِي لاَ يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ الـمَخْلُوقُ بِهِ فَهِيَ مَعَ الفِعْلِ، وَأَمَّا الاسْتِطَاعَةُ مِنْ جِهَةِ الصِّحَّةِ وَالوُسْعِ وَالتَّمَكُّنِ وَسَلاَمَةِ الآلاَتِ فَهِيَ قَبْلَ الفِعْلِ، وَبِهَا يَتَعَلَّقُ الـخِطَابُ، وَهِيَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

সামর্থ্য দুই প্রকারের—এক প্রকারের সামর্থ্য যা কাজের ঘটক হিসেবে পরিগণিত এবং ঘটার জন্য অপরিহার্য। এটা আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত; যেমন তাওফিক দান। এমন সামর্থ্য বান্দার দিকে সম্পৃক্ত করা বৈধ নয়। আরেক প্রকারের সামর্থ্য কাজের কার্যকারণ (ঘটক নয়)। যেমন সুস্থতা, সক্ষমতা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, উপায়-উপকরণ বিদ্যমান থাকা। এটা বান্দার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং শরিয়তের আদেশ-নিষেধ এই প্রকারের সামর্থ্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়ে থাকে। কুরআনে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে চাপিয়ে দেন না।'

ব্যাখ্যা

তাকদির সম্পর্কে আরও কিছু জরুরি আলোচনা

সামর্থ্যের প্রকারভেদ: সামর্থ্য দুই ধরনের—একটা হচ্ছে তাওফিক যা আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত। আরেকটা হচ্ছে শারীরিক সুস্থতা, দৈহিক সামর্থ্য, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও উপায়-উপকরণ ঠিক থাকা। এটা বান্দার সঙ্গে সম্পৃক্ত। পৃথিবীর সকল কাজ করার জন্য এই দুটি সামর্থ্যের দরকার হয়। মানুষের সুস্থতা, শারীরিক সক্ষমতা সবকিছু থাকার পরেও যদি আল্লাহর তাওফিক না থাকে তবে সে কাজটি হবে না। আবার আল্লাহর তাওফিক দেওয়ার অর্থ হলো তিনি শারীরিক সুস্থতা দান করবেন, উপায়-উপকরণও প্রস্তুত করে দেবেন। সুতরাং বান্দার সকল কাজ এই দুই সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল।

শরিয়তের আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম মৌলিকভাবে দ্বিতীয় প্রকারের (বাহ্যিক) সামর্থ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ কেউ যদি শারীরিকভাবে সুস্থ ও সবল থাকে,

শরিয়তের পক্ষ থেকে তার উপর নামাজ, রোজা, হজ ইত্যাদির মতো বিধান আরোপিত হয়। কিন্তু কেউ যদি অসুস্থ থাকে, তবে এসব বিধান আরোপিত হয় না। কারণ, হজে যাওয়ার উপকরণ না থাকলে হজ ফরজ হয় না। চোখ না থাকলে চোখের পর্দা ফরজ হয় না। বিবেকবুদ্ধি ঠিক না থাকলে (অন্য কথায় পাগল হলে) শরিয়তের কোনো নির্দেশই প্রযোজ্য হয় না ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে, দ্বিতীয় প্রকারের সামর্থ্য কাজের আগে বিদ্যমান থাকা জরুরি। যদি বিদ্যমান থাকে, আল্লাহ কাজের নির্দেশ দেবেন। বিদ্যমান না থাকলে আল্লাহ সে কাজের নির্দেশ দেবেন না। আর প্রথম প্রকারের (সুপ্ত) সামর্থ্য কাজের সময় বিদ্যমান থাকা জরুরি। ফলে শারীরিক সুস্থতা ও উপকরণ আগে থেকে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কাজটি ঠিক করার সময় আল্লাহর তাওফিক না থাকলে কাজটি সম্পাদিত হবে না।[১]

ইমাম তহাবির উক্ত বক্তব্য মূলত আহলে সুন্নাতের মানহাজ অনুযায়ী তাকদিরকে বোঝা এবং কাদারিয়্যাহ-মুতাজিলাদের খণ্ডন করার জন্য আনা হয়েছে। তাদের দাবি হলো, আল্লাহ মানুষকে আগে থেকেই সামর্থ্য দিয়ে রাখেন। ফলে মানুষ যা করবে তার জন্য সে দায়ী এবং সে-ই তার কর্মের একমাত্র স্রষ্টা। আলাদাভাবে তাকদির নিষ্প্রয়োজন। পাশাপাশি আল্লাহ মানুষকে ভালোমন্দ দুটো তাওফিকই দিয়ে রাখেন। কল্যাণের কাজে আলাদা তাওফিক দরকার নেই। অপরদিকে আহলে সুন্নাতের বক্তব্য হলো, সামর্থ্য দুই প্রকারের। একটা সামর্থ্য আল্লাহ আগে থেকেই দিয়ে রাখেন। আরেকটা সামর্থ্য কাজের সময় সংঘটিত হয়। যেমন: কারও সুস্থ হাত আছে, সে হাত নাড়াচ্ছে। হাত সুস্থ ও সবল থাকা একটা সামর্থ্য, এটা আল্লাহ আগে থেকেই তাকে দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু হাতটি যখন নাড়াচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে আরেকটা সামর্থ্য দরকার হয় যাকে বলা হয় তাওফিক। এটা না থাকলে হাত সুস্থ ও সবল থাকার পরেও নাড়ানো সম্ভব নয়। এভাবে বান্দা তার কাজে পূর্ণ স্বাধীন নয়, আবার পূর্ণ পরাধীনও নয়। বরং বান্দার ইচ্ছা ও স্বাধীনতা আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে। আল্লাহ বলেন,

وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ

অর্থ: 'আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে তোমরা কোনো ইচ্ছা করতে পারো না।' [ইনসান: ৩০] একই কথা আরেক জায়গায় তাগিদ করেন,

---

১. ইবনে আবিল ইজ (৪৩৫-৪৩৬); সালেহ ফাওজান (১৬২)।

وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَنْ يَشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থ: 'বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে তোমাদের কোনো ইচ্ছা নেই।' [তাকভির: ২৯] আল্লাহ আরও বলেন,

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ

অর্থ: 'হে লোকসকল, তোমরা সবাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী।' [ফাতির: ১৫]

ঠিক এ কারণেই বান্দা যখন পুণ্যের কাজ করে, তখন সে প্রতিদান পাওয়ার উপযুক্ত হয়। গুনাহের কাজ করলে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা তাকে বাহ্যিক সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে শরিয়তের আদেশ-নিষেধ প্রদান করেন। কেউ সুস্থ থাকলে তাকে বিভিন্ন ইবাদতের নির্দেশ দেন; সুস্থ না থাকলে দেন না। হ্যাঁ, কাজটি করার জন্য তাওফিক অবশ্যই দরকার হবে, কিন্তু সেটা কাজ সংঘটিত হওয়ার সময়। আর বান্দার জানা নেই যে, তাকে আল্লাহ তাওফিক দেবেন কি দেবেন না। ফলে আল্লাহ তাওফিক দেননি এই ছুতোয় কাজ না করে বসে থাকতেও পারবে না, বরং সে কাজ শুরু করে দেবে। আল্লাহ তাওফিক দিলে কাজটি সম্পাদিত হয়ে যাবে এবং সে নিজের সামর্থ্য ব্যয় করার জন্য প্রতিদান পাবে। যদি আল্লাহ তাওফিক না দেন, কাজটি সম্পাদিত হবে না। তবে এক্ষেত্রে সে নিন্দাযোগ্য কিংবা অপরাধীও বিবেচিত হবে না। কারণ, সে তার দায়িত্ব আদায় করেছে। আল্লাহ বলেন,

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

অর্থ: 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে চাপিয়ে দেন না।' [বাকারা: ২৮৬]

وَأَفْعَالُ العِبَادِ خَلْقُ اللهِ وَكَسْبٌ مِنَ العِبَادِ. وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللهُ تَعَالَى إِلاَّ مَا يُطِيقُونَ، وَلاَ يُطِيقُونَ إِلاَّ مَا كَلَّفَهُمْ، وَهُوَ تَفْسِيرُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. نَقُولُ: لاَ حِيلَةَ لأَحَدٍ، وَلاَ حَرَكَةَ لأَحَدٍ وَلاَ تَحَوُّلَ لأَحَدٍ عَنْ مَعْصِيَةِ اللهِ إِلاَّ بِمَعُونَةِ اللهِ، وَلاَ قُوَّةَ لأَحَدٍ عَلَى إِقَامَةِ طَاعَةِ اللهِ وَالثَّبَاتِ عَلَيْهَا إِلاَّ بِتَوفِيقِ اللهِ.

বান্দার সকল কাজ আল্লাহর সৃষ্টি, কিন্তু বান্দার হাতের কামাই। আল্লাহ মানুষকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপিয়ে দেননি। একইভাবে মানুষ ততটুকুই সাধ্য রাখে যতটুকু আল্লাহ তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। এটাই 'লা হাওয়া ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'র অর্থ। ফলে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কারও কোনো উপায় নেই, নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। তাঁর সাহায্য ছাড়া গুনাহ থেকে বাঁচার পথ নেই, তাঁর আনুগত্য করা এবং আনুগত্যে অবিচল থাকার সুযোগ নেই।

ব্যাখ্যা

আল্লাহর সৃষ্টি বান্দার উপার্জন—তাকদির রহস্যের উদ্‌ঘাটন: এটা পূর্বের মূলনীতি থেকে প্রাপ্ত ফলাফল। তাকদিরকে সহজ করে বোঝানোর জন্য এবং এক্ষেত্রে যারা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে তাদের মাঝে আর আহলে সুন্নাতের মাঝে পার্থক্য তুলে ধরার জন্য ইমাম তহাবি রাহি. এটা নিয়ে তুলনামূলক লম্বা আলোচনা করছেন। পিছনে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সামর্থ্য দুই প্রকারের। একটা হলো কাজ সম্পদানের আগে তথা বান্দার শারীরিক সুস্থতা, সক্ষমতা ও উপকরণ বিদ্যমান থাকা; আরেক প্রকারের সামর্থ্য হচ্ছে কাজ সম্পাদনের সময় আল্লাহর দেওয়া তাওফিক। এভাবে প্রত্যেকটা কাজ সম্পন্ন হওয়ার জন্য দুই সামর্থ্য প্রয়োজন হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত সামর্থ্য বা তাওফিক হলো কাজের মূল ঘটক, অর্থাৎ মূল কাজটা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। পাশাপাশি বান্দার শারীরিক সক্ষমতা কাজের অনুঘটক, অর্থাৎ বান্দার চাওয়াতে (এখতিয়ারে) কাজটি হয়েছে, সে না চাইলে কেউ তাকে বাধ্য করত না। এভাবে দুটো সামর্থ্য মিলেই কাজটি সম্পন্ন হয়। আর এভাবে আমাদের প্রত্যেকটা কাজ একদিকে

আল্লাহর সৃষ্টি ও ইচ্ছার বাইরে নয়, আবার আমাদের নিজেদের ইচ্ছা ও সংশ্লিষ্টতা এবং উপার্জনের (কাসব) বাইরে নয়। অন্য কথায়, আল্লাহ কাজটি সৃষ্টি না করলে সেটা অস্তিত্বেই আসত না। আবার আমরা না করলে আল্লাহ জোর করে করাতেন না; কাজটি প্রকাশ পেত না। সুতরাং আল্লাহর মূল কাজ সৃষ্টি এবং আমাদের সেটা বাস্তবায়ন দুটি মিলেই প্রত্যেকটা কাজ সম্পাদিত হয়। এটাকেই ইমাম তহাবি রাহি. বলেছেন, **'বান্দার সকল কাজ আল্লাহর সৃষ্টি, কিন্তু বান্দার উপার্জন বা হাতের কামাই (কাসব)।'** কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ

অর্থ: 'তারা এক সম্প্রদায় যারা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা কামাই করেছে তা তাদের জন্য এবং তোমরা যা কামাই করেছ তা তোমাদের জন্য।' [বাকারা: ১৩৪] আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন,

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

অর্থ: 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতীত চাপিয়ে দেন না। সে ভালো যা-কিছু কামাই করে সেটা তার জন্য, আর মন্দ যা-কিছু কামাই করে সেটার দায়ভার তার উপরই।' [বাকারা: ২৮৬]

জাবরিয়্যাহ সম্প্রদায় এই দুই সামর্থ্য কিংবা আল্লাহ ও বান্দার দুটি পক্ষের সমন্বয় বুঝতে পারেনি। সৃষ্টি ও উপার্জন দুটোর পার্থক্য ধরতে পারেনি। তারা মনে করেছে সবকিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এখানে মানুষের কোনো দায় নেই। তারা যদি বুঝত যে, মূল কাজটি আল্লাহর সৃষ্টি হলেও এবং আল্লাহপ্রদত্ত সামর্থ্য ছাড়া কাজটি না হলেও কাজটি মানুষ নিজের ইচ্ছাতে করেছে, কেউ তাকে বাধ্য করেনি, আল্লাহ তার উপর চাপিয়ে দেননি; এমন হয় না যে, সে একটা জিনিস স্বেচ্ছায় না করা সত্ত্বেও হয়ে যাচ্ছে; যেমন: সে সামনের দিকে যেতে চাচ্ছে না, কিন্তু শরীর তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে—এমন হয় না; আর হলেও সেটা তাকলিফের মাঝে পড়ে না। এটা বুঝলে জাহমিয়্যাহরা সবকিছু আল্লাহর উপর চাপিয়ে নিজেদের পরাধীন ও পুতুল মনে করত না। তাদের মাজহাব সুস্পষ্ট ভ্রান্ত। কারণ, তাতে আল্লাহকে জালেম সাব্যস্ত করা হয়। ফলে তারা তাকদির মেনে নিয়েও বাড়াবাড়ির কারণে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। আহলে সুন্নাতের মত হলো, আল্লাহ সকল কাজের সৃষ্টিকর্তা ঠিকই, কিন্তু কাজটি বান্দা নিজে করে। ফলে এর দায়-দায়িত্বও তার। নতুবা কেউ কথা বললে বলতে হবে—সে

নয়, আল্লাহ কথা বলেছেন। কেউ খেলে বলতে হবে—আল্লাহ খেয়েছেন। কেউ চুরি করলে বলতে হবে—আল্লাহ করেছেন। নাউজুবিল্লাহ।[১]

আবার কাদারিয়্যাহ (ও মুতাজিলা) সম্প্রদায়ও এই দুই প্রকার সামর্থ্য বুঝতে পারেনি। সৃষ্টি ও উপার্জন দুটোর পার্থক্য করেনি। ফলে তারা মনে করেছে, মানুষের সবকিছু মানুষের হাতে। মানুষ তার কাজগুলোকে সৃষ্টি করছে, আল্লাহর কিছুই করার নেই। মানুষ তার ভাগ্যের ও কর্মের স্রষ্টা। অথচ তারা যদি বুঝত, মানুষের সব সামর্থ্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহপ্রদত্ত সামর্থ্য না থাকলে কোনো কাজ করা সম্ভব নয়, বাহ্যিকভাবে মানুষ নিজের ইচ্ছায় কাজটি করলেও মূল কাজটি আল্লাহর সৃষ্টি—সে যেটা করেছে সেটা কেবলই এখতিয়ার ও হাতের বাস্তবায়ন (কাসব), তা হলে তারা মানুষকে তার কর্মের স্রষ্টা বলত না। আর মানুষকে কর্মের স্রষ্টা বলা মানে তাকে সৃষ্টিকর্তা বলা, আল্লাহ ও মানুষ দুজন সৃষ্টিকর্তা সাব্যস্ত করা। এ কারণেই তাদের এ উম্মতের অগ্নিপূজারী বলা হয়েছে।[২]

এভাবেই ইমাম তহাবি-বর্ণিত আহলে সুন্নাতের উক্ত মূলনীতিটি মনে রাখলে তাকদির সম্পর্কে আর কোনো জটিলতাই থাকে না। কাদারিয়্যাহ ও জাবরিয়্যাহ সম্প্রদায়ের ভ্রান্তির মাঝখানে অবস্থিত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশুদ্ধ আকিদা সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের সকল কর্ম সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তিনি তাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। ফলে মানুষ চাইলে বাজারে যায়, নিজ ইচ্ছাতে মসজিদে যায়। চাইলে খেতে পারে, না চাইলে না খেয়ে থাকে। সবকিছু তার স্বাধীনতা। কিন্তু মানুষের স্বাধীনতা আল্লাহর ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে। ফলে চাইলে মানুষ সবকিছু পারে না। আর আল্লাহ মানুষকে ততটুকুই জিজ্ঞাসা করবেন যতটুকু সে পারে, যেগুলো তার সামর্থ্যের অধীনে; আর যেগুলো তার সামর্থ্যের বাইরে, সেগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না।

আল্লাহ মানুষকে সাধ্যের অতীত চাপিয়ে দেন না: পিছনে এ সম্পর্কে একাধিক জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ‌ۚ

অর্থ: 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতীত চাপিয়ে দেন না।' [বাকারা: ২৮৬] কারণ, সাধ্যের বাইরে চাপিয়ে দিলে তার কাছে সে ব্যাপারে কৈফিয়ত চাওয়া যায় না।

---

১. ইবনে আবিল ইজ (৪৩৯); আকহাসারি (২২৯-২৩০)।
২. তাবারানি, আল-মুজামুস সাগির (৮০০); আল-আওসাত (৫৩০৩)।

আল্লাহ মানুষকে এখতিয়ার ও কামাইয়ের ক্ষমতা দিলেও মানুষের ক্ষমতা সীমিত। আর পরকালে যেহেতু প্রত্যেকটা কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন, তাই স্বাভাবিকভাবেই সাধ্যের বাইরে চাপিয়ে দেবেন না। কারণ, সাধ্যের অতীত চাপিয়ে দিলে আমরা সেটা করতে সক্ষম হতাম না। তখন আল্লাহ আমাদের কাছে জবাবদিহি চাইলে সেটা জুলুম হিসেবে পরিগণিত হতো। ফলে আল্লাহ আমাদের সাধ্যের ভিতরেই সকল বিধি-নিষেধ প্রদান করেন। তাই সেগুলো অমান্য করলে এর দায়ভার আমাদের কাঁধেই। আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তার ইচ্ছাতেই সবকিছু হয় বলে নিজেদের অপরাধ ঢাকার সুযোগ নেই। কারণ, কাজটা মূলত আল্লাহর সৃষ্টি হলেও কামাই করেছি আমার দুই হাতে। আমি না করলে আল্লাহ জোর করে করাতেন না।

মানুষ ততটুকুই সাধ্য রাখে যতটুকু আল্লাহ তাকে দায়িত্ব দেন: উক্ত বক্তব্যের অর্থ কী? উক্ত বক্তব্যটি বেশ জটিল। প্রাচীন ব্যাখ্যাতাগণ, যেমন গজনবি, শাইবানি, তুর্কিস্তানি, এটার কোনো ব্যাখ্যাই করেননি। ইবনে আবিল ইজ বলেছেন, বাক্যটি দুরূহ। কিন্তু সমকালীন একদল ব্যাখ্যাতা এটাকে সরাসরি ভুল সাব্যস্ত করেছেন। তাদের যুক্তি হলো, আল্লাহ যতটুকু দায়িত্ব দিয়েছেন মানুষ এর বেশি করার সাধ্য রাখে। যেমন: আমাদের উপর প্রতি বছর ত্রিশটি রোজা ফরজ করা হয়েছে; অথচ আমরা চল্লিশটি রোজা পালনের সাধ্য রাখি। আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন; আমরা এর বেশি আদায়ের সামর্থ্য রাখি। কিন্তু তিনি অনুগ্রহ করে সাধ্যের চেয়েও অনেক কম দায়িত্ব আমাদের দিয়েছেন। সুতরাং 'মানুষ ততটুকুই সাধ্য রাখে যতটুকু আল্লাহ তাকে দায়িত্ব দেন' কথাটি সঠিক নয়।[১]

কিন্তু তাদের এই বক্তব্যও সঠিক নয়। ইমাম তহাবির কথার কথা বলেছেন কিংবা অজ্ঞাতসারে বলেছেন এমন নয়। বরং উক্ত বাক্যটিকে তিনি 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'র অর্থ ও ব্যাখ্যা হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। এভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি বক্তব্য তিনি না বুঝেই বলে দেবেন ব্যাপারটা এমন নয়। সুতরাং তার বক্তব্যকে না বুঝে কিংবা আক্ষরিক অর্থ ধরে ভুল সাব্যস্ত করা সঠিক নয়। এ কারণে সমকালীন মুহাক্কিক ব্যাখ্যাতাগণ ইমাম তহাবির বক্তব্যকে ভুল বলেননি; বরং তারা সেটাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বিশেষত শাইখ আবদুল হাররি ও শাইখ সাইদ ফুদাহ তারা উক্ত বক্তব্যকে সঠিক করার জন্য বেশ কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আবদুল্লাহ হারারি ইমাম তহাবির ব্যাক্যটি অন্যভাবে পড়ে অর্থ করেছেন, যা অধমের

---

১. সালেহ ফাওজান (১৬৫)।

কাছে সঠিক মনে হয়নি। সাইদ ফুদাহ এখানে তাকলিফের বিস্তৃত অর্থ ধরে ব্যাখ্যা করেছেন।[১] অধমের সেটা ভালো লেগেছে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ মনে হয়নি।

অধমের ধারণা, ইমাম তহাবির উক্ত বক্তব্যের অর্থ তার বক্তব্যের মাঝেই বিদ্যমান। ফলে নিজেদের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা যুক্ত করার দরকার হবে না। আরেকবার ইমাম তহাবির বক্তব্যে দৃষ্টি দেওয়া যাক। তিনি লিখেছেন, **'আল্লাহ মানুষকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপিয়ে দেননি, একইভাবে মানুষ ততটুকুই সাধ্য রাখে যতটুকু আল্লাহ তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। এটাই 'লা হাওয়া ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'র অর্থ।** এখানে প্রথমে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'র অর্থ দেখুন। কারণ, এর মাঝেই ইমাম তহাবির বক্তব্যের অর্থ লুক্কায়িত। এটার অর্থ আল্লাহ ছাড়া কোনো উপায় নেই, আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি নেই। কিন্তু আমরা কি এর শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করি? না, করি না। কারণ, আল্লাহ ছাড়া উপায় আছে। কেউ যদি আপনার সামনে দুটো উপায় বলে দেয়, আপনি চাইলে যেকোনোটা গ্রহণ করতে পারেন। আল্লাহ ছাড়া শক্তি আছে—আমার শক্তি, আপনার শক্তি, রাজনীতিক নেতার শক্তি, রাষ্ট্রপতির শক্তি, জনগণের শক্তি। অন্য কথায়, আল্লাহ ছাড়া অনেক শক্তি আছে। তা হলে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'র অর্থ কি ভুল? না, বরং এটার শাব্দিক অর্থ তোলা ভুল, মর্মার্থ ভুল নয়। এটার মর্মার্থ হলো, প্রকৃতপক্ষে আমরা পৃথিবীতে যত শক্তি-সামর্থ্য, উপায়-উপকরণ দেখি না কেন, বাস্তবে সেসব আল্লাহর মুখাপেক্ষী। আল্লাহ চাইলে সেসব উপায়-উপকরণ ও শক্তি আমাদের উপকার করবে। আল্লাহ না চাইলে কারও কোনো উপকার করার সাধ্য নেই। সুতরাং সকল উপায়-উপকরণের মালিক আল্লাহ তায়ালাই।

এবার দৃষ্টি দিন ইমাম তহাবির বক্তব্যে। ইমাম বলেন, 'আল্লাহ মানুষকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ চাপিয়ে দেননি, একইভাবে মানুষ ততটুকুই সাধ্য রাখে যতটুকু আল্লাহ তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন।' বাহ্যিকভাবে তো দেখা যাচ্ছে আল্লাহ আমাদের যতটুকু দায়িত্ব দিয়েছেন আমরা তারচেয়ে বেশি সাধ্য রাখি। কিন্তু গভীরে গেলে আমরা দেখব, আল্লাহ আমাদের যতটুকু দায়িত্ব দিয়েছেন আমরা তারচেয়ে বেশি সাধ্য রাখি না। কীভাবে? এখানে তাকলিফ তথা দায়িত্ব বলতে যদি ফরজ-ওয়াজিব মনে করি তবেই সমস্যা। বরং এখানে তাকলিফ অর্থ জীবনের সবকিছু, সকল কাজ, সকল নির্দেশ ও নির্দেশনা। যেমন: 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা' কেবল ইবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। এখানে তাকলিফ বলতে আমাদের ইবাদত, আমাদের সমাজ, আমাদের

১. সাইদ ফুদাহ (১২১৩)।

রাষ্ট্র, পারিবারিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন—সবকিছু অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ আমাদের সাধ্য আর আল্লাহর বিধান দুটো এক সমান্তরাল রেখায় অবস্থিত। আল্লাহ আমাদের সাধ্যের অতীত যেমন কিছু চাপিয়ে দেন না, তেমনই আমরা আল্লাহর নির্দেশের অতীত কিছু করতে পারি না। আল্লাহ আমাদের উপর যা-কিছু ফরজ করেছেন, এটুকুই আমাদের সাধ্যে আছে। হ্যাঁ, ব্যতিক্রম থাকবে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে সকল মানুষ ততটুকুই পারে, যেটুকু আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের পারিবারিক দায়িত্ব আমরা ততটুকুই পারব, যতটুকু আল্লাহ আল্লাহ করতে বলেছেন। এমনকি দায়িত্বের বাইরে আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মানবিক গুণাবলি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও আমরা ততটুকু সাধ্য রাখি যতটুকু আল্লাহ আমাদের থেকে চান। কারণ, তিনি যদি আমাদের থেকে আরও বেশি চাইতেন, আমাদের আরও বেশি সামর্থ্যবান করে সৃষ্টি করতেন। সেটা না করে আমাদের এখন যেটুকু সামর্থ্য আছে, ঠিক এটুকু সামর্থ্য আমাদের আল্লাহ কেন দিলেন? কারণ, তিনি আমাদের যতটুকু দায়িত্ব (কেবল নামাজ-রোজা নয়) দেবেন, এরচেয়ে আর বেশি সামর্থ্যের দরকার হবে না। এভাবে দেখলে ইমাম তহাবির কথার ভিতরে কোনো ভুল নেই। বরং 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা'র ভিতরে যেই গভীর মর্ম রয়েছে, ইমাম তহাবির কথার ভিতরেও গভীর মর্ম রয়েছে।

উক্ত ব্যাখ্যা লেখার পরে আমরা আকহাসারির ব্যাখ্যায় দেখলাম তিনি লিখেছেন, এটার অর্থ হচ্ছে তাওফিক, শরিয়তের বিধি-নিষেধ নয়, যা বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি আমাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যাই দাঁড়ায়। আলহামদুলিল্লাহ।[১]

সুতরাং প্রমাণিত হলো, আমাদের জীবন ও জগতের সবকিছু আল্লাহর নিয়ন্ত্রণের অধীন, আল্লাহপ্রদত্ত সামর্থ্য ও তাকদিরের অধীন। তাই ইমাম তহাবি বলেছেন, **'আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কারও কোনো উপায় নেই, নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই; তাঁর সাহায্য ছাড়া গুনাহ থেকে বাঁচার পথ নেই, তাঁর আনুগত্য করা এবং আনুগত্যে অবিচল থাকার সুযোগ নেই।'** ইমাম তহাবির এই বক্তব্যও শাব্দিকভাবে ধরা যাবে না। তাতে জাহমিয়্যাহ ও জাবরিয়্যাহদের আকিদা প্রবেশ করবে। বরং এর মর্ম হলো, আমাদের শারীরিক সক্ষমতা, সুস্থতা, উপায়-উপকরণ সবকিছু আছে, কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে সামর্থ্য (তাওফিক) ও সৃষ্টি অনুপস্থিত থাকলে কোনোকিছুই সংঘটিত হবে না। সুতরাং সবকিছুর মূল আল্লাহ তায়ালা। তিনি চাইলে সব হয়; তিনি না চাইলে কিছুই হয় না।

---

১. আকহাসারি (২৩০)

وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ. غَلَبَتْ مَشِيئَتُهُ الْمَشِيئَاتِ كُلَّهَا، وَغَلَبَ قَضَاؤُهُ الْحِيَلَ كُلَّها. يَفعَلُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ أَبَدًا، تَقَدَّسَ عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَحَيْنٍ، وَتَنَـزَّهَ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَشَيْنٍ ﴿لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْنَ﴾

সবকিছু তাঁর ইচ্ছা, জ্ঞান, ফয়সালা এবং নির্ধারণ অনুযায়ীই সম্পাদিত হয়। তাঁর ইচ্ছা সকল ইচ্ছার উপর বিজয়ী। তাঁর ফয়সালা সকল কলাকৌশল, উপায়-উপকরণের উর্ধ্বে। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করেন; কিন্তু তিনি কাউকে কখনও জুলুম করেন না। 'তিনি যা করেন সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হন না, কিন্তু তারা জিজ্ঞাসিত হবে।'

ব্যাখ্যা

আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোনোকিছু হয় না: এটা পূর্ববর্তী আলোচনার তাগিদ। অর্থাৎ আমাদের আল্লাহ তায়ালা পরাধীন করে বানানি, কিন্তু একেবারে স্বাধীনও নয়। আল্লাহ আমাদের থেকে সকল ইচ্ছাশক্তি ছিনিয়ে নেননি, আবার আমাদের সবকিছু করার মতো ক্ষমতাও দেননি। আল্লাহ সবকিছুর সষ্ট্রা; কিন্তু আমাদের স্বেচ্ছায় ভালোমন্দ বেছে নেওয়ার সামর্থ্য দিয়েছেন। আল্লাহ আমাদের ইচ্ছা দিয়েছেন, কিন্তু সেই ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে। এভাবে দুটো প্রান্তিকতার মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় গোটা সৃষ্টি বিদ্যমান। সৃষ্টি সুশৃঙ্খলভাবে চলমান থাকার জন্য এই ভারসাম্য অপরিহার্য। আল্লাহ মানুষকে তার ইচ্ছার অধীন করে, মানুষের সামর্থ্যকে তার কুদরতের উপর নির্ভরশীল করে সৃষ্টি করার পরেও মানুষ আজ নিজের হাতে পৃথিবী ধ্বংস করছে। আল্লাহর বানানো মানুষ ধ্বংস করছে। ইচ্ছা ও সামর্থ্যের তুচ্ছ একটা অংশ পাওয়ার পরেও মানুষ যদি এই পর্যায়ের সীমালঙ্ঘন করে, তবে পুরো ক্ষমতা ও সামর্থ্য দিয়ে দিলে মানুষ কতটা বিধ্বংসী হয়ে উঠত কল্পনা করা যায়?

এ কারণে জগতের সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছা, তাঁর জ্ঞান ও নির্ধারণ অনুযায়ী সম্পন্ন হওয়া জরুরি। তিনি যেহেতু সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, সকল ইচ্ছার উপর তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়িত হওয়া জরুরি। তাই জগতের সবকিছু সামগ্রিকভাবে তার ইচ্ছা ও সৃষ্টি অনুযায়ীই হয়। মৌলিকভাবে তার ইচ্ছার বাইরে কিছুই হয় না। হ্যাঁ, তার ইচ্ছার অধীনে আমাদের ইচ্ছার অস্তিত্ব রয়েছে।

কেউ পূর্বের প্রশ্ন আবারও তুলতে পারেন, আমাদের ইচ্ছাটা যেহেতু তার ইচ্ছার অধীনেই, তবে চূড়ান্তভাবে তো তাঁর ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হচ্ছে, আমাদের ইচ্ছা নয়। তিনি যদি সেটা ইচ্ছা না করতেন, তবে তো বাস্তবায়িত হতো না। তা হলে আমাদের দায় কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত লম্বা। কিন্তু অত্যন্ত খাটো করেও এটার উত্তর দেওয়া যায়। আর ইমাম তহাবি সেটাই করেছেন। তিনি এক কথায় উত্তর দিয়েছেন, 'আল্লাহ কাউকে জুলুম করেন না।' এর মানে, আপনাকে তাকদির সম্পর্কে সবকিছু বোঝানোর পরেও যদি আপনার মনে খটকা থাকে, আল্লাহর সৃষ্টি ও আপনার উপার্জন (কাসব), আল্লাহর দেওয়া তাওফিক এবং আপনার সামর্থ্য—এ সবকিছু তুলে ধরার পরেও যদি আপনার মনে হয় আপনি বাধ্য, আপনি পরাধীন, আপনার কিছু করার ক্ষমতা নেই; যদি ভাবেন, আপনার জীবন ও ইবাদত সবকিছু আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করছেন, সুতরাং আপনাকে পরকালে কেন শাস্তি দেওয়া হবে? তবে একটি মূলনীতিই আপনার সকল কুমন্ত্রণার ঔষধ। তা হলো 'আল্লাহ কাউকে জুলুম করেন না।'

এই একটি বাক্য আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর, আপনার সকল সন্দেহ ও অস্থিরতার চিকিৎসা। আপনি পরাধীন হোন, আপনার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অধীন হোক, আপনার জীবন অন্যের মাধ্যমে পরিচালিত হোক, আপনার জীবনের চাবি আপনার হাতে না থাকুক, অর্থাৎ তাকদির নিয়ে আপনার মনে যত ধোঁয়াশাই তৈরি হোক, আপনি যদি আপনার হৃদয়ে বসিয়ে নিতে পারেন যে, আল্লাহ কাউকে বিন্দুমাত্র জুলুম করেন না, তবে আপনার সব জটিলতা দূর হয়ে যাবে। তাকদির নিয়ে লম্বা লম্বা গবেষণা পড়তে হবে না। বরং তাকদির সম্পর্কে কিছু না জেনেও আপনি তাকদিরের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি প্রশান্তির অধিকারী হবেন। কারণ, যখনই আপনার মনে কোনো বিষয় খটকা লাগবে, আপনি বলবেন, আল্লাহ কাউকে জুলুম করেন না। এর মানে আপনার-আমার বুঝতে ভুল হচ্ছে। বুঝতে যেহেতু ভুল হচ্ছে, তাই এ ব্যাপারে নীরব থাকতে হবে। কারণ, আল্লাহ মানুষকে কেন জুলুম করবেন? মানুষ কি তার প্রতিপক্ষ?

মানুষ কি তার রাজত্বে ভাগ বসাবে? মানুষকে কি তিনি মনের খাহেশ মেটাতে তৈরি করেছেন? মানুষকে কি তিনি নিজের কোনো স্বার্থে তৈরি করেছেন? কখনও নয়। আল্লাহ এ সবকিছুর উর্ধ্বে। মানুষকে তিনি মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। গোটা জগতে আল্লাহর সমকক্ষ আর কেউ নেই। তাঁর কোনো শরিক নেই। ফলে তিনি কাউকে জুলুম করা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। জুলুম তার ব্যাপারে কল্পনাতেও স্থান দেওয়া যায় না। ফলে তাকদির না বুঝলে আল্লাহ আপনাকে জুলুম করেন না—এটুকু বুঝেই নীরব থাকতে হবে। কিন্তু আপনি যদি এখানে মনগড়া কথা বলেন, সেটা সীমালঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হবে। এর জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কারণ, আল্লাহ যা করেন সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার কেউ নেই, কিন্তু মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

وَفِي دُعَاءِ الْأَحْيَاءِ وَصَدَقَاتِهِمْ مَنْفَعَةٌ لِلْأَمْوَاتِ

জীবিতদের দোয়া ও সদকার মাধ্যমে মৃতরা উপকৃত হয়

ব্যাখ্যা

দোয়া-সম্পর্কিত কিছু আকিদা

মৃতের ইসালে সওয়াব: ইসলামের সৌন্দর্য, উপযোগিতা, সর্বজনীনতা ও মানবিকতার যেসব গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই আকিদাটি। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বসম্মত আকিদা। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর নিজের স্বার্থের জন্য তৈরি করেননি; তিনি মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য তৈরি করেছেন। এতে মানুষের লাভ, আল্লাহর নয়। একটি লম্বা হাদিসে (কুদসিতে) আল্লাহ বলেন, 'হে আমার বান্দাগণ, তোমরা আমার ক্ষতি পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না যে, আমার ক্ষতি করবে; আর না তোমরা আমার উপকার পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে যে, আমার উপকার করবে। যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানুষ-সহ জগতের সকল মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো মানুষটির মতো হয়ে যাও, সেটা আমার রাজত্ব সামান্য বৃদ্ধি করবে না। হে আমার বান্দাগণ, যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানুষ-সহ জগতের সকল মানুষ ও জিন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ লোকটির মতো হয়ে যাও, সেটা আমার রাজত্ব সামান্য হ্রাস করবে না।'[১]

কিন্তু মানুষকে যেহেতু তিনি স্বাধীনতা দিয়েছেন, ফলে সকল মানুষ তার ইবাদত করবে না এটা তিনি জেনেছেন। যারা অবাধ্য হবে, তাদের শাস্তির জন্য তিনি জাহান্নাম তৈরি করেছেন। অর্থাৎ জাহান্নামকে তিনি সৃষ্টি করেছেন অবাধ্যদের শাস্তির প্রয়োজনে, জাহান্নামের প্রয়োজনে মানুষকে সৃষ্টি করেননি। তাই তিনি জান্নাতের পথ সহজ করে দিয়েছেন। বিভিন্ন সময় ও সুযোগে তিনি মানুষকে জান্নাতের কাছাকাছি

---

১. মুসলিম (২৫৭৭); মুসতাদরাকে হাকেম (৭৭০১)।

যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। যেমনটা পিছনে আমরা উল্লেখ করেছি, আল্লাহ একটি পুণ্যের বিনিময় বান্দার নিয়তের কারণে দশ গুণ থেকে সাতশো গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন। বিপরীতে একটি পাপ করলে একটিই লিখেন। অর্থাৎ পাপের ক্ষেত্রে একে এক, অথচ পুণ্যের ক্ষেত্রে একে সাতশো।[১] একইভাবে হাদিসে এসেছে, মানুষ কোনো পাপ করলে বাম কাঁধের ফেরেশতা সেটা না লিখে ছয় ঘন্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। যদি এ সময়ে সে লজ্জিত হয়ে তাওবা করে, তবে সেটা আর লিখেন না। আর যদি তাওবা না করে, তখন একটি পাপই লিখেন।[২]

এভাবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আল্লাহ মানুষকে জান্নাতে যাওয়ার পথ প্রশস্ত রেখেছেন। মানুষ যেন ছোট থেকে ছোট কোনো সুযোগও নষ্ট না করে, তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষুদ্র মাধ্যমগুলোকেও সে সফলভাবে ব্যবহার করে—ইসলাম এটা নিশ্চিত করেছে। এমন একটি সুযোগ হচ্ছে যা ইমাম তহাবি উপরে উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ জীবিত কর্তৃক মৃতের জন্য দোয়া করা।

দুনিয়া মানুষের পরীক্ষাক্ষেত্র। দুনিয়ার জীবন ইবাদত ও পুণ্যের জায়গা। সে হিসেবে স্বাভাবিক নিয়ম হলো, দুনিয়া ছেড়ে গেলে ইবাদতও বন্ধ হয়ে যাবে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষ যা করবে, সেটাই তার বলে গণ্য হবে। মৃত্যুর পরে তার কিছুই করার ক্ষমতা থাকবে না। তার পুণ্য বাড়বে না। কিন্তু আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল। তাঁর রহমত ক্রোধের উপর সদা বিজয়ী। ফলে তিনি চান মৃত্যুর পরেও মানুষ উপকৃত হোক, কবরে থেকেও মানুষের পুণ্য বাড়ুক, অপরাধ মার্জিত হোক। ইসলামে এর অনেকগুলো পথ রয়েছে। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো দোয়া, অর্থাৎ পৃথিবীতে জীবিত কেউ যখন মৃতের জন্য দোয়া করে, আল্লাহ তায়ালা সেই দোয়া কবুল করেন, মৃতের কষ্ট লাঘব করেন, তার মর্যাদা বুলন্দ করেন। এটাকেই ইমাম তহাবি বলেছেন, **'জীবিতদের দোয়া ও সদকার মাধ্যমে মৃতরা উপকৃত হয়।'**

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিসে বলেছেন, মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়, কেবল তিনটি আমল অব্যাহত থাকে: **এক**. সাদাকায়ে জারিয়া। **দুই**. এমন ইলম যার মাধ্যমে মানুষ উপকৃত হয়। **তিন**. নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।[৩] অর্থাৎ দুনিয়াতে সাদাকায়ে জারিয়া তথা

---

১. মুসলিম (১২৯); ইবনে হিব্বান (৩৭৯); মুসনাদে আহমদ (৮২৮২)।
২. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (৭৭৬৫, ৭৭৮৭)।
৩. মুসলিম (১৬৩১); আবু দাউদ (২৮৮০); তিরমিজি (১৩৭৬)।

মানবহিতকর কোনো কাজ (পুল, পথ, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) রেখে যাওয়া, ইলম তথা বই-পুস্তক বা ছাত্র-ছাত্রী রেখে যাওয়া, পুণ্যবান সন্তান রেখে যাওয়া। এই সবকিছুর ফলাফল একটাই, তা হলো—জীবিত সাধারণ মানুষ যারা তার রেখে যাওয়া প্রতিষ্ঠান, বই-পুস্তক থেকে উপকৃত হবে, তার জন্য দোয়া করবে। নেক সন্তান তার পিতার জন্য দোয়া করবে। ফলে যেকোনো উপায়ে জীবিত ব্যক্তি যদি মৃতের জন্য দোয়া করে, আল্লাহ মৃতের কবরে সেটা পৌঁছিয়ে দেন। মৃত্যুর পরে সে কবরে থেকেও ইবাদতের সওয়াব পেতে থাকে।

কুরআন কারিমে আল্লাহ তায়ালা আমাদের মৃতদের জন্য দোয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। এটাকে মুমিনদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন,

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ: 'আর যারা তাদের পরে আগমন করেছে তারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের এবং ভ্রাতাদের যারা আমাদের অগ্রে ঈমান এনেছে, ক্ষমা করুন। আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।' [হাশর: ১০] এর দ্বারা বোঝা যায়, মৃতের জন্য জীবিতদের দোয়া উপকারী। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেউ মারা গেলে তার দাফনকার্য শেষ করে বলতেন, 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ইস্তিগফার করো এবং তার অবিচলতা কামনা করো। কারণ, এখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।'[১] অন্য হাদিসে বলেন, যখন তোমরা মৃত ব্যক্তির উপর নামাজ আদায় করো, তার জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে দোয়া করো।[২]

তাই আমরা মৃতের উপর যে জানাজার নামাজ পড়ি সেটাও মূলত মৃতের জন্য দোয়াই। আয়েশা রাজি. থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, 'যদি একশত মানুষ কোনো ব্যক্তির জানাজা পড়ে, আল্লাহ সে ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের সুপারিশ কবুল করেন।'[৩] ইবনে আব্বাস থেকে আরেকটি হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যদি চল্লিশজন মুসলমান, যারা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে

---

১. মুসতাদরাকে হাকেম (১৩৭৬); সুনানে কুবরা, বাইহাকি (৭১৬৪)।
২. আবু দাউদ (৩১৯৯); ইবনে মাজা (১৪৯৭)।
৩. মুসলিম (৯৪৭); সুনানে কুবরা, নাসায়ি (২১৩১)।

শরিক করে না, কোনো মৃত ব্যক্তির জানাজা পড়ে, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের সুপারিশ কবুল করেন।'[1] সংখ্যার পার্থক্য থাকার কারণ হলো, যত সংখ্যার কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, রাসুল তত সংখ্যার দোয়া কবুল হওয়ার কথা বলেছেন। তাকে চল্লিশ ও একশোর কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তাই তাদের কথা বলেছেন। ইবনে বাত্তাল বলেন, আল্লাহর রাসুলকে যদি এর কম সংখ্যার কথা জিজ্ঞাসা করা হতো, খুব সম্ভবত তখনও তিনি তাদের দোয়া কবুল হওয়ার কথা বলতেন।[2] মোট কথা, সংখ্যা যত কমবেশি হোক, উদ্দেশ্য হচ্ছে মৃত মুমিনদের জন্য জীবিত মুমিনদের দোয়া উপকারী। আল্লাহ চাইলে এর মাধ্যমে মৃতের সগিরা-কবিরা যেকোনো গুনাহ মাফ হতে পারে। জানাজায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা যত বেশি হবে, দোয়াও তত বেশি হবে। তাই জানাজার সংখ্যা বৃদ্ধি অবশ্যই কল্যাণকর। কিন্তু জানাজার সংখ্যা নিয়ে গর্ব করা, কিংবা সংখ্যা বেশি হলেই মৃত ব্যক্তিকে জান্নাতি বলে ঘোষণা করা বৈধ নয়। কারণ জানাজা একটি দোয়া; দোয়া করা আমাদের দায়িত্ব। কবুল করা-না করা আল্লাহর মর্জির উপর নির্ভরশীল।

দোয়ার মতো মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সদকাও তার জন্য উপকারী। সাদ বিন উবাদা রাজি.-এর মাতা ইন্তিকাল করলে সাদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, মায়ের পক্ষ থেকে আমি যদি কিছু সদকা করি, তাতে তিনি উপকৃত হবেন?' রাসুল বললেন, 'হ্যাঁ।' তখন সাদ বিন উবাদা মায়ের পক্ষ থেকে কিছু বাগান সদকা করে দেন।[3] উক্ত হাদিসটি উল্লেখ করার পরে ইবনে আবদুল বার রাহি. লিখেন, 'উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মৃতের পক্ষ থেকে জীবিত মানুষ সদকা করতে পারেন, বরং সদকা করা মুস্তাহাব। সাদ বিন উবাদার হাদিসটি এবং এ-সংক্রান্ত অন্যান্য হাদিস আলিমদের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং এর উপর আমল প্রচলিত। ...এসব হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, জীবিতরা মৃতদের জন্য সম্পদ সদকা করতে পারেন এবং এটা আলিমদের সর্বসম্মত মত...।'[4]

জীবিতদের দোয়ার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির উপকৃত হওয়ার মাঝে হজ এবং অন্য অনেক ইবাদত অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যদি কেউ তার মৃত কোনো আত্মীয়-স্বজনের নামে

---

১. মুসলিম (৯৪৮); ইবনে হিব্বান (৩০৮২); মুসনাদে আহমদ (২৫৫০)।
২. শরহুল বুখারি, ইবনে বাত্তাল (৩/৩০২)।
৩. ইবনে হিব্বান (৩৩৫৪); সুনানে কুবরা, নাসায়ি (৬৪৪৪); (মুসলিম ১০০৪)।
৪. আল-ইসতিজকার (৭/২৫৭-২৫৮)।

হজ করে, তবে তার কবরে হজের পুণ্য পৌঁছবে। বুখারির বর্ণনায় এসেছে, এক নারী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, 'আমার মা হজের মানত করেছিলেন। কিন্তু পূর্ণ করার আগেই ওফাতলাভ করেছেন। আমি সেটা করতে পারব?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যদি তার উপর ঋণ থাকত, তুমি আদায় করতে না?' সে বলল, 'হ্যাঁ।' রাসুল বললেন, 'তা হলে এগুলোও আদায় করো। কেননা আল্লাহর ঋণ (তথা ইবাদত) আদায়ের আরও বেশি উপযুক্ত।'[১]

তবে ইবাদতের প্রকার নিয়ে আলিমদের মাঝে কিছুটা মতানৈক্য দেখা যায়। অর্থাৎ মৃতের জন্য জীবিতদের দোয়া, সদকা, হজ ও কুরবানির বৈধতা এবং এর মাধ্যমে মৃতের উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। কিন্তু নামাজ, রোজা, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির ইত্যাদির ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কোনো কোনো আলিম এগুলোর সওয়াব পৌঁছবে না বলে মনে করেন। তাদের দলিল হলো, হাদিসে সুস্পষ্টভাবে যা এসেছে এর বাইরে যাওয়া যাবে না।[২] তবে মাজহাবের জমহুর তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম মনে করেন, সকল ইবাদতের সওয়াব পৌঁছবে। তাদের দলিল হচ্ছে—সদকা, দোয়া ও হজ প্রত্যেকটি ইবাদত। সুতরাং এগুলোর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং নামাজ, রোজা, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির সকল ইবাদত এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং মৃতের প্রতি সকল ইবাদতের ইসালে সওয়াব করা যাবে। এটাই অগ্রগণ্য এবং অধিকতর বিশুদ্ধ, ইনশাআল্লাহ।[৩]

তবে পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, দোয়া ও সদকা কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই। ফলে মতভেদপূর্ণ বিষয়ের পরিবর্তে কেউ যদি সর্বসম্মত মতের উপর আমল করতে চায়, সেটা বরং আরও ভালো। এ কারণেই আমরা ইমাম তহাবি রাহি.-কে দেখি কেবল সর্বসম্মত বিষয় দুটোই উল্লেখ করেছেন, মতভেদপূর্ণ বিষয়গুলো উল্লেখ করেননি। তা ছাড়া হুজুরদের ডেকে কুরআন পড়িয়ে অর্থ ব্যয় করার চেয়ে সেই অর্থটা মৃতের পক্ষ থেকে মাদ্রাসায় দেওয়াই তো বরং উত্তম। মৃতের পক্ষ থেকে অর্থ সদকা করা, তার নামে মসজিদ-মাদ্রাসা করা, মুজাহিদদের সাহায্য করা, কুরআন ওয়াকফ করা, ইসলামি কিতাবাদি প্রকাশ করা, টিউবওয়েল বসানো, বৃক্ষরোপণ কিংবা সাঁকো নির্মাণ-সহ সবকিছুই করা যাবে। তবে মাদ্রাসা-সংশ্লিষ্ট কাজে

---

১. বুখারি (১৮৫২, ৭৩১৫); মুসলিম (১১৪৮)।
২. সালেহ ফাওজান (১৬৯)।
৩. দেখুন: রদ্দুল মুহতার (২/২৪৩); শরহে মুসলিম, নববি (১/৯০)।

সদকা, ইলম, দরিদ্রের সাহায্য-সহ একাধিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই এদিকে অধিক দৃষ্টি রাখা উত্তম।[১]

এগুলো করার সামর্থ্য না থাকলে দোয়া করবে। কারণ, এই সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কবরে দোয়া পৌঁছানো। আর সেটা অর্থ ছাড়াই করা সম্ভব। এটাই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব। পাশাপাশি দোয়া করা সহজও বটে। সবসময় অর্থের মাধ্যমে সবার জন্য মৃতদের পক্ষ থেকে সদকা করা সম্ভব হয় না। ফলে অনেকে কিছুই করেন না। আবার অনেকে মৃতদের জন্য এত বেশি সদকা করেন যে, নিজের জন্য করার ফুরসত পান না। অথচ ক-দিন পরে তারও সেই জায়গাতেই যেতে হবে। তাই মধ্যমপন্থা হলো সাধারণভাবে মৃতদের জন্য দোয়া করা। আর নিজের কবরের জন্য দোয়া, সদকা-সহ সবকিছু করা। তবে মাঝে মাঝে যদি মৃতদের জন্যও দান-সদকা করা যায়, সেটা নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম। অর্থাৎ প্রত্যেকে প্রত্যেকের সামর্থ্য ও সুবিধা অনুযায়ী করবে।

উল্লেখ্য, দোয়া-সদকা অন্য কথায় ঈসালে সওয়াব কবুল হওয়ার জন্য অন্যান্য ইবাদতের মতো সর্বপ্রধান শর্ত হলো, ইখলাস তথা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা এবং শরিয়তসম্মত পন্থায় করা। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে যদি দুনিয়ার সুনাম-সুখ্যাতি, মৃতের স্মৃতি অম্লান রাখা-সহ পার্থিব উদ্দেশ্য থাকে, কিংবা শরিয়তবিরুদ্ধ কিছু করা হয়, তবে যত কিছুই করা হোক না কেন মৃতের কাছে এর কানাকড়িও পৌঁছয় না। মৃতের কবরে ফুল দেওয়া, বড় মাজার ও গম্বুজ তৈরি করা, মৃতের জন্য ভাস্কর্যের নামে মূর্তি বানানো, স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা ইত্যাদি একবোরেই নিষ্ফল কর্ম; বরং বড় ধরনের গুনাহ। তাই সচেতন মুমিনের জন্য এসব কুসংস্কার ও পাপে নিজের শ্রম ও অর্থ নষ্ট না করা কাম্য।

---

১. দেখুন: ইমদাদুল ফাতাওয়া, আশরাফ আলি থানভি (২/৬৭)।

وَاللّٰهُ تَعَالَى يَسْتَجِيبُ الدَّعَوَاتِ وَيَقْضِي الْـحَاجَاتِ، وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَلاَ يَمْلِكُهُ شَيْءٌ، وَلاَ غِنَى عَنِ اللّٰهِ تَعَالَى طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ اسْتَغْنَى عَنِ اللّٰهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَقَدْ كَفَرَ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الْـحَيْنِ.

আল্লাহ তায়ালা দোয়া কবুল করেন, প্রয়োজন পূর্ণ করেন। তিনিই সবকিছুর মালিক; কেউ তাঁর মালিক নয়। এক মুহূর্তও তাঁর অমুখাপেক্ষী হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি নিজেকে এক মুহূর্তও আল্লাহ থেকে অমুখাপেক্ষী ভাববে, সে কাফের এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ব্যাখ্যা

দোয়া কবুলের মালিক আল্লাহ তায়ালা: পিছনে বলা হয়েছে, জীবিত ব্যক্তিদের দোয়া মৃতদের উপকার করে। কিন্তু এর অর্থ এমন নয় যে, দোয়া নিজে নিজেই উপকার করে কিংবা জীবিতরা মৃতদের কিছু করার ক্ষমতা রাখে; বরং আল্লাহ দোয়া কবুল করেন; আল্লাহ উপকার করেন; আল্লাহ প্রয়োজন পূর্ণ করেন; আল্লাহ ক্ষমা করেন। মানুষ কেবল দোয়াই করতে পারে, এর বাইরে আর কিছু করার সক্ষমতা রাখে না। আল্লাহকে দোয়া কবুলের জন্য বাধ্য করতে পারে না; বরং কবুল করা-না করা সম্পূর্ণ আল্লাহর এখতিয়ার।

কিন্তু আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মুমিনদের দোয়া কবুলের সুসংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং যদি কোনো অন্যায় কিংবা অন্যায্য দোয়া না হয়, দোয়াতে সীমালঙ্ঘন না থাকে, তবে আল্লাহ বান্দার দোয়া কবুলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْۤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ.

অর্থ: 'তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। আর যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকার করে, তারা শীঘ্রই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' [গাফের: ৬০] অন্যত্র বলেন,

وَ اِذَا سَاَلَکَ عِبَادِیۡ عَنِّیۡ فَاِنِّیۡ قَرِیۡبٌ ؕ اُجِیۡبُ دَعۡوَۃَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلۡیَسۡتَجِیۡبُوۡا لِیۡ وَ لۡیُؤۡمِنُوۡا بِیۡ لَعَلَّهُمۡ یَرۡشُدُوۡنَ.

অর্থ: 'আর আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটেই। যখন কেউ আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই। কাজেই তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে। এতে তারা সুপথপ্রাপ্ত হবে।' [বাকারা: ১৮৬] অসহায়ের সহায় একমাত্র আল্লাহ। তিনি বলেন,

اَمَّنۡ یُّجِیۡبُ الۡمُضۡطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَ یَکۡشِفُ السُّوۡٓءَ

অর্থ: 'বলো তো কে অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন?' [নামল: ৬২] আল্লাহ ছাড়া আর কেউ দোয়া কবুলের ক্ষমতা রাখে না। ফলে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ডাকা শিরক। আল্লাহ বলেন,

اِنۡ تَدۡعُوۡهُمۡ لَا یَسۡمَعُوۡا دُعَآءَکُمۡ ۚ وَ لَوۡ سَمِعُوۡا مَا اسۡتَجَابُوۡا لَکُمۡ ؕ وَ یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ یَکۡفُرُوۡنَ بِشِرۡکِکُمۡ.

অর্থ: 'তোমরা তাদের ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শোনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের **শিরক** অস্বীকার করবে।' [ফাতির: ১৪] অন্য আয়াতে বলেন,

قُلِ ادۡعُوا الَّذِیۡنَ زَعَمۡتُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ ۚ لَا یَمۡلِکُوۡنَ مِثۡقَالَ ذَرَّۃٍ فِی السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِی الۡاَرۡضِ وَ مَا لَهُمۡ فِیۡهِمَا مِنۡ شِرۡکٍ وَّ مَا لَهٗ مِنۡهُمۡ مِّنۡ ظَهِیۡرٍ.

অর্থ: 'বলুন, তোমরা তাদের আহ্বান করো যাদের উপাস্য মনে করতে আল্লাহ ব্যতীত। তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অণু পরিমাণ কোনোকিছুর মালিক নয়। এতে তাদের কোনো অংশ নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহর সহায়কও নয়।' [সাবা: ২২]

দোয়া কেন কবুল হয় না? স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ মুমিনের সকল দোয়া কবুল করেন। তবে দোয়া কবুলের কিছু শর্ত রয়েছে, কিছু আদাব রয়েছে; কবুলের পথে কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যদি শর্ত ও আদাবগুলো পূর্ণ করা হয়, প্রতিবন্ধকতাগুলো

থেকে বেঁচে থাকা যায়, তবে সেই দোয়া কবুলের ব্যাপারে আল্লাহর উপরে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলো প্রযোজ্য। আর যদি শর্তগুলো লঙ্ঘিত হয়, প্রতিবন্ধকতা দাঁড়িয়ে থাকে, তবে সেসব দোয়া কবুল হয় না। তাই দোয়ার পাশাপাশি সেগুলোর দিকেও লক্ষ রাখতে হবে। কারণ দোয়া হলো তরবারির মতো। কিন্তু তরবারি থাকলেই কাটা যায় না। তরবারিতে ধার থাকতে হয়, জায়গামতো আঘাত করতে হয়। সেটা না করতে পারলে তরবারি কোনো কাজে আসে না। দোয়া কবুলের কিছু প্রতিবন্ধকতা হলো:

এক. দোয়া কবুলের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হলো দোয়ায় ইখলাস তথা নিষ্ঠা না থাকা। মানুষকে দেখানোর জন্য দোয়ায় সুন্দর সুন্দর শব্দ চয়ন করা, অথচ দোয়াকারীর অন্তর সেগুলোর মর্ম থেকে গাফেল। শুধু শুধু অতিরিক্ত কান্নার ভান করা অথবা অযথা জোরে জোরে চ্যাঁচামেচি করা, অথচ সেখানে কান্না নিষ্প্রয়োজন কিংবা হৃদয়ের কান্না অনুপস্থিত। আল্লাহ বলেন,

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

অর্থ: 'তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাকো কাকুতিমিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।' [আরাফ: ৫৫]

দুই. দোয়ায় সীমালঙ্ঘন করা। অর্থাৎ এমন দোয়া করা, যেগুলো অন্যায় তথা কুরআন-সুন্নাহে আসা মূলনীতিবিরুদ্ধ। যেমন: কোনো গুনাহ করার তাওফিক কামনা করা, আরেকজনের স্ত্রী/সম্পদকে নিজের করতে চাওয়া, অন্যের সর্বনাশের দোয়া করা, পৃথিবীতে চিরস্থায়ী থাকার জন্য দোয়া করা, কাফেরের জন্য ক্ষমা চাওয়া আর মুসলমানের জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নামের দোয়া করা, সবার আগে জান্নাতে প্রবেশের দোয়া করা (কারণ রাসুলুল্লাহ সবার আগে প্রবেশ করবেন) ইত্যাদি।

তিন. গাফেল হয়ে দোয়া করা; ফলে কী দোয়া করছে নিজেও জানে না। অমুখাপেক্ষী হয়ে এমনভাবে দোয়া করা, যেন নিজের কোনো প্রয়োজনই নেই। এমন দোয়া কবুলের কোনো সম্ভাবনা নেই। হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমরা দোয়া করো, তখন এভাবে দোয়া করো না, 'হে আল্লাহ, আপনি চাইলে ক্ষমা করুন, আপনি চাইলে দান করুন।' বরং মিনতি সহকারে এবং অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো। কারণ, আল্লাহকে বাধ্য করার কেউ নেই।[১] আরেকটি হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহর

---

১. বুখারি (৬৩৩৮); মুসলিম (২৬৭৯)।

কাছে দোয়া কবুলের দৃঢ় ইয়াকিন রেখে দোয়া করো। জেনে রাখো, আল্লাহ গাফেল ও উদাসীন হৃদয়ের দোয়া কবুল করেন না।'[১]

চার. আল্লাহর সঙ্গে দোয়ার আদব রক্ষা না করা। অর্থাৎ এমনভাবে দোয়া করা, যাতে মনে হয় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা নয়, আল্লাহকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। বিশেষত সংঘবদ্ধ দোয়ায় অনেককে জোরে জোরে মাইকে হাঁক ছাড়তে দেখা যায়। বোঝা যায় না দোয়া করছে নাকি ধমক দিচ্ছে; অথচ দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে অন্যতম শর্ত হচ্ছে বিনয় ও নিজেদের প্রয়োজন প্রকাশ, আল্লাহকে নির্দেশ নয়।

পাঁচ. হারাম সম্পদ ভক্ষণ করা। এটা দোয়া কবুলের পথে অন্যতম বড় প্রতিবন্ধক। সুতরাং হারাম কামাই, হারাম চাকুরির হারাম বেতন, সেসব বেতনে গড়া বাড়িতে বসে, সেই বেতনে কেনা খাবার পেটে রেখে, সেই বেতনে কেনা জামা ও টুপি গায়ে জড়িয়ে যত দোয়া করা হোক, সেগুলো কবুল হবে না। কারণ, হারাম সবকিছু অপবিত্র। আর আল্লাহ নিজে পবিত্র। তাই তিনি অপবিত্রকে গ্রহণ করেন না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিসে হালাল ভক্ষণের নির্দেশ-সম্পর্কিত কয়েকটি আয়াত পড়ে বলেন, 'ধুলোমলিন এলোকেশী দীর্ঘ পথে ভ্রমণ করা এক মুসাফির দুই হাত আকাশের দিকে তুলে বলে, হে আমার রব, হে আমার রব; অথচ তার খাবার হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম, তার শরীর হারামে গড়া। এমন ব্যক্তির দোয়া কীভাবে কবুল হবে?'[২] হাদিসের মর্ম হলো মুসাফির ব্যক্তির দোয়া কবুলের বিশেষ ওয়াদা রয়েছে। কিন্তু যেহেতু এ ব্যক্তির সবকিছু হারামে গড়া; ফলে সেটা দোয়া কবুলের পথে প্রতিবন্ধক।

ছয়. দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করা। দোয়া করার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা কবুলের জন্য অপেক্ষা করা, কবুলের কোনো আলামত না দেখা গেলে বিরক্ত হওয়া বা ভেঙ্গে পড়া ইত্যাদি। কয়েকবার দোয়া করে কবুল হওয়ার লক্ষণ দেখা না গেলে দোয়া ছেড়ে দেওয়া। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমাদের দোয়া কবুল করা হতে থাকে যতক্ষণ না কেউ বলে, 'আমি দুআ করেছি, কিন্তু আমার দোয়া কবুল করা হয়নি'।"[৩] আরেকটি হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ বিরক্ত হন না। বিরক্ত তো তোমরা হও।'[৪]

---

১. তিরমিজি (৩৪৭৯); মুসতাদরাকে হাকেম (১৮২৩); বাজ্জার (১০০৬১)।
২. মুসলিম (১০১৫); তিরমিজি (২৯৮৯); দারেমি (২৭৫৯)।
৩. বুখারি (৬৩৪০); মুসলিম (২৭৩৫)।
৪. বুখারি (৪৩, ১১৫১); মুসলিম (৭৮২, ৭৮৫)।

দোয়া কবুলের উপায়: যেসব বিষয় দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

এক. ইখলাস তথা নিষ্ঠার সঙ্গে দোয়া করা। আল্লাহ কুরআনের একাধিক আয়াতে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন,

فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ

অর্থ: 'তোমরা আল্লাহর জন্য দ্বীনের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে তাঁকে ডাকো।' [গাফের: ১৪] সুতরাং দোয়ার সময় মনে রাখতে হবে, আল্লাহ দোয়া কবুলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাই আমি দোয়া করছি। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ দোয়া কবুল করার, প্রয়োজন পূর্ণ করার কিংবা কোনো উপকার করার সামর্থ্য রাখে না। আল্লাহই একমাত্র দোয়া কবুলকারী। তা ছাড়া দোয়ার মাঝে সব ধরনের লৌকিকতা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। লোকদেখানো দোয়া করা যাবে না।

দুই. বিনয় ও নম্রতার সঙ্গে দোয়া করা, আল্লাহর কাছে আশা ও ভয় নিয়ে দোয়া করা, আল্লাহকে দোয়া কবুলের জন্য বাধ্য মনে না করা। আল্লাহ বলেন,

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

অর্থ: 'তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাকো কাকুতিমিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।' [আরাফ: ৫৫] নবিদের বড় একটি বৈশিষ্ট্য ছিল বিনয়-নম্রতা ও মিনতির সঙ্গে আল্লাহর কাছে দোয়া করা। আল্লাহ বলেন,

اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ؕ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ.

অর্থ: 'তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত। আশা ও ভীতি সহকারে আমার কাছে দোয়া করত। আর তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।' [আম্বিয়া: ৯০]

তিন. আগ্রহ নিয়ে বারবার দোয়া করা, একই দোয়া একাধিকবার পুনরাবৃত্তি করা; বিরক্ত, অতিষ্ঠ না হওয়া; নিজের অভাব ও মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা। হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার করে দোয়া করা, তিন বার করে ইস্তিগফার করা পছন্দ করতেন।[১]

চার. নিরাশ না হওয়া; বরং বিভিন্নভাবে নিজের মুখাপেক্ষিতা ও দুর্বলতা তুলে ধরা। কুরআনে জাকারিয়া আলাইহিস সালামের বৃদ্ধ বয়সে দোয়া করার যে চিত্র

---

১. আবু দাউদ (১৫২৪); ইবনে হিব্বান (৯২৩); সুনানে কুবরা, নাসায়ি (১০২১৮)।

এসেছে, তা প্রত্যেক মুমিনের জন্য বেশ আশা জাগানিয়া। তিনি সারা জীবন নিঃসন্তান ছিলেন। তার স্ত্রী বন্ধ্যা ছিলেন। জীবনের সকল বসন্ত পার করার পরে যখন যৌবন পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে, তখন তার হৃদয় সন্তানের জন্য বেচাইন হয়ে ওঠে। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। নিভৃতে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। শুরু করেন এমন কিছু বাক্য দিয়ে, যাতে দুনিয়ার সকল বিনয় ও মিনতি ঢেলে দেওয়া হয়েছে। ফলে আল্লাহ তার দোয়া কবুলও করেন। তার দোয়ার সূচনা ছিল এমন:

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا. إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَآءً خَفِيًّا. قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَآءِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا. يَّرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. يٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ اسْمُهُ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَّهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا. قَالَ رَبِّ أَنّٰى يَكُونُ لِي غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا. قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا.

অর্থ: 'এটা আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা জাকারিয়ার প্রতি, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিলেন **নিভৃতে।** তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার অস্থি দুর্বল হয়ে গেছে; বার্ধক্যে মস্তক সুশুভ্র হয়েছে; হে আমার পালনকর্তা, **তবুও আপনার কাছে দোয়া করা থেকে আমি কখনও নিরাশ হইনি।** আমি আশঙ্কা করি আমার পর আমার স্বগোত্র নিয়ে এবং **আমার স্ত্রী বন্ধ্যা;** তাই আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন সন্তান দান করুন, যে ইয়াকুব বংশে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং হে আমার পালনকর্তা, তাকে করুন সন্তোষজনক। (আল্লাহ বলেন) হে জাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, যার নাম হবে ইয়াহইয়া। ইতঃপূর্বে এই নামে আমি কারও নামকরণ করিনি। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, **কেমন করে আমার পুত্র হবে, অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা আর আমিও বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে উপনীত?** তিনি বললেন, এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলে দিয়েছেন, এটা আমার পক্ষে সহজ। আমি তো ইতঃপূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, অথচ তুমি কিছুই ছিলে না।' [মারইয়াম: ২-৯]

আমাদের সমাজের নিঃসন্তান দম্পতিগুলোর জন্য জাকারিয়া আলাইহিস সালাম হতে পারেন উত্তম আদর্শ। তাবিজকবচ না ঝুলিয়ে, বিভিন্ন দরবার ও মাজারে না ঘুরে,

নিয়মিত চিকিৎসা ও দোয়া অব্যাহত রাখলে আশি বছর বয়সে, শূন্যগর্ভ নারীকেও আল্লাহ সন্তান দিতে পারেন, কারণ এটা তাঁর জন্য সহজ।

পাঁচ. সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় দোয়া করা। এমন যেন না হয় যে, কেবল দুঃখের সময় দোয়া করব আর সুখের সময় তাকে ভুলে যাব। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সুখের সময় আল্লাহর সঙ্গে পরিচিত থাকো (তার বিধান মানার মধ্য দিয়ে), তা হলে দুঃখের সময় তিনি তোমাকে চিনবেন।[১]

ছয়. আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণের উসিলায় দোয়া করা। যেমন: হে রহমান, আপনি পরম করুণাময় দয়ালু মালিক। আমাদের দয়া করুন। কুরআনে আল্লাহ তার নামগুলোর মাধ্যমে দোয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

'আর আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম, তোমরা সেসব নামে তাকে ডাকো।' [আরাফ: ১৮০]

সাত. কিবলামুখী হয়ে পবিত্রাবস্থায় দোয়া করা, হাত উঠিয়ে দোয়া করা, আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে দোয়া শুরু করা, রাসুলুল্লাহর উপর সালাম পাঠ করা। সেসব সময়ে দোয়া করা, যেগুলোতে দোয়া কবুলের বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন: রাতের শেষ তৃতীয়াংশে, সাহরি ও ইফতারের সময়, বৃষ্টি বর্ষণের সময়, আজান ও ইকামতের মাঝে, সিজদার মাঝে, জুমার দিন শেষ বিকেলে, প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে ইত্যাদি। পাশাপাশি রোজাদার, মজলুম ব্যক্তির দোয়া, অন্যের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দোয়া করা, সন্তানের জন্য পিতামাতার দোয়া কবুলের বিশেষ ওয়াদা রয়েছে।[২] ফলে সেসব অবস্থায় দোয়া করা। পাশাপাশি সেসব স্থানে দোয়ার চেষ্টা করা, যেখানে দোয়া কবুলের বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন: মসজিদে দোয়া করা। আল্লাহর নাম ও গুণাবলি, নেক আমল, নবি-রাসুল ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের উসিলা দিয়েও আল্লাহর কাছে দোয়া করা যেতে পারে। পিছনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: মুমিনের কোনো দোয়া বৃথা যায় না। তাই অন্তরকে সর্বদা আল্লাহমুখী করে রাখা এবং সবসময়, বিশেষত প্রত্যেক নামাজের পরে, আল্লাহর কাছে কিছু-না-কিছু চাওয়া উচিত। কারণ, মানুষ যা-কিছু চাচ্ছে, সেগুলো লিপিবদ্ধ হয়ে

---

১. মুসতাদরাকে হাকেম (৬৩৫৯); মুসনাদে আহমদ (২৮৩১)।
২. তিরমিজি (১৯০৫, ৩৪৪৮); আবু দাউদ (১৫৩৬) সুনানে কুবরা, নাসায়ি (৯৮৫৬)।

যাচ্ছে। বৃথা যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অতঃপর আল্লাহর সিদ্ধান্ত তিনি কীভাবে কবুল করবেন। কখনও কখনও মুমিন যা চায়, আল্লাহ দ্রুত **সেটাই** তাকে দিয়ে দেন। এই একটি ক্ষেত্রে মানুষ বুঝতে পারে যে, তার দোয়া কবুল হয়েছে। অথচ দোয়া কবুল শুধু এই একভাবে হয় না, বরং আল্লাহ অনেক সময় একটি দোয়া করলে সেটার পরিবর্তে অন্য দোয়া কবুল করেন। অর্থাৎ তার মঙ্গলের জন্য তাকে প্রত্যাশিত বস্তু না দিয়ে এমন বস্তু দেন যা সে দোয়াই করেনি। কখনও কখনও দোয়ার মাঝে সরাসরি প্রার্থিত বস্তু না দিয়ে তাকে বিভিন্ন বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন। কখনও তার চেয়েও উত্তম বস্তু দান করেন, কখনও তার গুনাহ ক্ষমা করেন, কখনও দোয়াগুলো পরকালের জন্য সংরক্ষণ করেন; অথচ এগুলো সম্পর্কে বান্দার কোনো ধারণাই থাকে না। ফলে দেখা যায়, জীবনের অধিকাংশ সময় সে এমন অনেক বস্তু পেয়ে যায়, যার জন্য কখনও দোয়াই করেনি। সে ভাবে এমনিতেই চলে এসেছে; অথচ হতে পারে আল্লাহ তার ভিন্ন কোনো দোয়ার কারণে সেটা দিয়েছেন। মোট কথা, মুমিনের কোনো দোয়া বিফলে যায় না। তাই দোয়া যত বেশি করা যায়, তত উত্তম। এখানে বিরক্তি কিংবা হতাশা বৈধ নয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তির দোয়া কবুল করা হয়—হয়তো তাকে দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়, নয়তো পরকালের জন্য রেখে দেওয়া হয়, অথবা তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়...।'[১] এ জন্য ইমাম তহাবিও লিখেছেন, **'এক মুহূর্তও তাঁর অমুখাপেক্ষী হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি নিজেকে এক মুহূর্তও আল্লাহ থেকে অমুখাপেক্ষী ভাববে, সে কাফের এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'**

প্রশ্ন আসতে পারে, মসজিদে মসজিদে জুমার দিন ও বিভিন্ন নামাজের পরে মুসলিম উম্মাহর জন্য কোটি কোটি মানুষ দোয়া করে, কিন্তু তাদের দোয়া কোথায় যায়? কোনো দোয়া তো কবুল হতে দেখা যায় না। এর পূর্ণ উত্তর লম্বা আলোচনাসাপেক্ষ। তবে আমাদের মূলনীতি মনে রাখতে হবে। সেটা হলো, দোয়ার শর্তসমূহ পূর্ণ করা। আজ আমাদের সমাজের কতজন মুসলিম নিজের মাঝে এসব শর্ত পূরণের ভ্রুক্ষেপ করেন? তা হলে দোয়া কবুল হবে কী করে? তা ছাড়া দোয়া কবুল হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত হলো হতাশ না হওয়া। অনেক মুসলিম এসব দোয়াকে অর্থহীন মনে করে সামাজিকতা কিংবা নিছক লোক দেখানোর জন্য হাত তোলেন। এমন দোয়াও কবুল হওয়ার নয়। অনেকে হাত তুলে গাফেল থাকেন। এমন দোয়াও

---

১. তিরমিজি (৩৬০৪); মুসনাদে আবু ইয়ালা (১০১৯); দেখুন: আত-তামহিদ, ইবনে আবদুল বার (১০/২৯৭); কাশফুল মুশকিল, ইবনুল জাওজি (৩/৪০১)।

কবুল হওয়ার নয়। যিনি দোয়া করছেন, তিনি অনেক সময় লৌকিকতায় আক্রান্ত থাকেন। ফলে এমন দোয়াও কবুলের আশা করা যায় না। এমন বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতায় মুসলিমদের দোয়া আটকে যাচ্ছে। তা ছাড়া দোয়ার পাশাপাশি দাওয়া তথা কর্মও জরুরি। মুসলমানরা অহর্নিশ দুনিয়ার জন্য কাফেরদের চেয়েও অধিকতর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকবে, কেবল শুক্রবার কিংবা ঈদের দিন মসজিদে এসে মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করবে, আর সাথে সাথে মুসলানদের বিজয় চলে আসবে—এটা একধরনের উপহাস। এমন হলে সাহাবাগণ মসজিদে নববি ছেড়ে পুরা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়তেন না। পৃথিবীর পথে পথে বেরিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শুষ্ক মাটি নিজেদের ঘাম ও খুনে রঙিন করতেন না। সবাই মসজিদে নববির রিয়াজুল জান্নাহতে বসে দিনরাত মানুষের হিদায়াত ও উম্মাহর বিজয় কামনা করে নিরাপদেই জীবন কাটাতেন। তা ছাড়া সকল শর্ত পূরণের পরেও বাহ্যিকভাবে সরাসরি দোয়া কবুল হওয়া শর্ত নয়; বরং আল্লাহ এসব দোয়ার পরিবর্তে তাদের অন্যভাবেও সহায়তা করতে পারেন, যা পিছনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মোট কথা, কোনো যুক্তিতেই দোয়ার গুরুত্বকে হালকা করা যাবে না। নিরবচ্ছিন্নভাবে দোয়া অব্যাহত রাখতে হবে, পাশাপাশি কাজও করতে হবে। বাহ্যিকভাব দোয়া কবুল না হলে মনে কোনো হতাশার স্থান দেওয়া যাবে না। কারণ, দোয়া কবুল না হলে বান্দার কিছু করার আছে? আল্লাহ ছাড়া সে অন্য কারও কাছে যেতে পারবে? আল্লাহর গড়া পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো পৃথিবীতে যেতে পারবে? ইমাম তহাবি বলেন, **'এক মুহূর্তও তাঁর অমুখাপেক্ষী হওয়া যায় না। যে ব্যক্তি নিজেকে এক মুহূর্তও আল্লাহ থেকে অমুখাপেক্ষী ভাববে, সে কাফের এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'** ফলে দোয়া কবুল হোক বা না হোক, চালিয়েই যেতে হবে। একদিন-না-একদিন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাড়া আসবে, ইনশাআল্লাহ।

মুসতাজাবুদ দাওয়াহ কে? 'মুসতাজাবুদ দাওয়াহ' শব্দের অর্থ হলো এমন মানুষ যার দোয়া কবুল করা হয়। আমাদের সমাজে বিভিন্ন বুজুর্গকে 'মুসতাজাবুদ দাওয়াহ' বলা হয় এবং তাদের বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা হয়। এর ভিত্তি কী? প্রথম কথা হলো, মুসতাজাবুদ দাওয়াহ কোনো বিশেষ পদ কিংবা বৈশিষ্ট্য নয়। আল্লাহ তায়ালা সকল মুমিনের দোয়া কবুল করেন। যার মাঝেই উপরে বর্ণিত দোয়া কবুলের শর্তগুলো বিদ্যমান থাকবে এবং প্রতিবন্ধকতাগুলো অবিদ্যমান থাকবে, তার দোয়াই কবুল হবে। **সে হিসেবে সকল মুমিনই মুসতাজাবুদ দাওয়াহ হতে পারবে।** রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসকে লক্ষ্য করে বলেন—সাদ, পবিত্র খাবার খাও। তুমি মুসতাজাবুদ দাওয়াহ হয়ে যাবে।[১]

তবে কিছু কিছু মানুষকে বিশেষ কিছু আমলের বিনিময়ে আল্লাহ একটু ভিন্ন মর্যাদা দেন। তারা যেকোনো দোয়া করলে আল্লাহ কবুল করেন। এসব মানুষ 'মুসতাজাবুদ দাওয়াহ' হিসেবে পরিচিত হন। এ কারণে আমরা দেখি, সকল নবি ও সাহাবি পুণ্যবান হওয়া সত্ত্বেও, তাদের দোয়া কবুল হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো নবি ও সাহাবি মুসতাজাবুদ দাওয়াহ নামেই পরিচিত ছিলেন। যেমন: নবিদের মাঝে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম মুসতাজাবুদ দাওয়াহ ছিলেন। কুরআনে তার অনেকগুলো দোয়া কবুলের কথা এসেছে। সাহাবাদের মাঝে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাজি. মুসতাজাবুদ দাওয়াহ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। উপরে তার ব্যাপারে হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত হাদিসের বিভিন্ন কিতাবে তার বিভিন্ন দোয়া কবুলের অনেক ঘটনা রয়েছে। আরেকজন মুসতাজাবুদ দাওয়াহ সাহাবি হলেন আনাস ইবনে মালেক রাজি.। তৃতীয় আরেকজন হলেন বারা বিন মালেক রাজি.; স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুসতাজাবুদ দাওয়াহ হওয়ার ঘোষণা করেছেন।[২] সাহাবাদের পরেও এমন ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান ছিলেন; তাদের একজন হলেন তাবেয়ি ওয়াইস আল-করনি রাহি.। খোদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মুসতাজাবুদ দাওয়াহ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।[৩] পরবর্তীকালেও এমন অনেক মানুষ বিদ্যমান ছিলেন।[৪]

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে; সেটা হচ্ছে, মুসতাজাবুদ দাওয়াহ হওয়া ব্যক্তির কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নয়, বরং তার বিশেষ আমলের কারণে তার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। ফলে তিনি সকল দিক থেকে অন্যদের চেয়ে উত্তম হবেন জরুরি নয়। এ কারণে সাহাবাদের মাঝে সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, আনাস ও বারা প্রমুখ মুসতাজাবুদ দাওয়াহ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। আবু বকর, উমর, উসমান, আলি রাজি. এই বৈশিষ্ট্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন না; অথচ তারা সর্বসম্মতিক্রমে সাদ, আনাস ও বারার চেয়ে উত্তম।

---

১. আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি (৬৪৯৫)।
২. তিরমিজি (৩৮৫৪); মুসনাদে আবু ইয়ালা (৩৯৮৭)।
৩. মুসলিম (২৫৪২); মুসতাদরাকে হাকেম (৫৭৬৮)।
৪. বিস্তারিত দেখতে পারেন ইবনে আবিদ দুনইয়ার 'মুজাবুদ দাওয়াহ' গ্রন্থে।

وَاللهُ يَغْضَبُ وَيَرْضَى لاَ كَأَحَدٍ مِنْ الوَرَى

আল্লাহ তায়ালা রাগ করেন, সন্তুষ্ট হন; কিন্তু তাঁর রাগ ও সন্তুষ্টি সৃষ্টিজীবের মতো নয়।

ব্যাখ্যা

সন্তুষ্টি ও ক্রোধ আল্লাহর দুটো সিফাত (গুণ)

ইমাম তহাবি রাহি. দোয়া-সম্পর্কিত আলোচনার পরে আবারও আল্লাহর দুটো সিফাত উল্লেখ করেছেন। পিছনে সিফাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে। ফলে এখানে সেগুলোর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে মূল গ্রন্থের অনুসরণে আমরা এখানে আল্লাহর শুধু এ দুটো সিফাত নিয়ে আলোচনা করব।

'সন্তুষ্টি' ও 'ক্রোধ' আল্লাহর দুটি সিফাত। ইমাম তহাবি বলেন: '**আল্লাহ তায়ালা রাগ করেন, সন্তুষ্ট হন; কিন্তু তাঁর রাগ ও সন্তুষ্টি সৃষ্টিজীবের মতো নয়।**' ফলে আমরা বিশ্বাস করব, আল্লাহ রাগ করেন। আমরা বলব না, 'না, তিনি রাগ করেন না।' কারণ, কুরআন-সুন্নাহে তাঁর ক্রোধের কথা এসেছে। আল্লাহ বলেন,

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ.

অর্থ: 'তাদের উপর আরোপ করা হল লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা। তারা আল্লাহর **ক্রোধে** নিপতিত হয়ে ঘুরতে থাকল। কারণ, তারা আল্লাহর বিধান অস্বীকার করত এবং নবিগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তার কারণ, তারা ছিল নাফরমান সীমালঙ্ঘনকারী।' [বাকারা: ৬১] অন্যত্র বলেন,

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا.

অর্থ: 'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি **ক্রুদ্ধ** হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।' [নিসা: ৯৩] আরেক জায়গায় বলেন,

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَ عَبَدَ الطَّاغُوْتَ أُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَّ أَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ.

অর্থ: 'বলুন: আমি কি তোমাদের বলব, তাদের মধ্যে কার প্রতিফল আল্লাহর কাছে আরও বেশি মন্দ? যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি তিনি **ক্রুদ্ধ** হয়েছেন, যাদের কতককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন এবং যারা তাগুতের পূজা করেছে, তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্য পথ থেকেও অনেক দূরে।' [মায়িদা: ৬০]

হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহ বলেন, আমার রহমত **ক্রোধের** উপর প্রবল হয়েছে।'[১] শাফায়াতসংক্রান্ত লম্বা হাদিসে বিভিন্ন নবির বক্তব্য এসেছে, 'আল্লাহ তায়ালা সেদিন এতটা **ক্রুদ্ধ** হয়েছিলেন, যতটা ক্রুদ্ধ তিনি আগে কখনও হননি, পরেও কখনও হবেন না।'[২]

একইভাবে আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। আমরা বলব না, 'তিনি সন্তুষ্ট হন না।' কারণ, কুরআন-সুন্নাহে তার সন্তুষ্ট হওয়ার কথা এসেছে। আল্লাহ বলেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ وَّ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

অর্থ: 'আল্লাহ ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ। তারা তথায় চিরকাল অবস্থান করবে। আর (প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) বসবাসের জান্নাতে পবিত্র ঘরের। বস্তুত: এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হলো আল্লাহর **সন্তুষ্টি।** এটিই হলো বিশাল সাফল্য।' [তাওবা: ৭২] আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

---

১. বুখারি (৩১৯৪); সুনানে কুবরা, নাসায়ি (৭৭০৩)।
২. বুখারি (৩৩৪০); মুসলিম (১৯৪)।

وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

অর্থ: 'আর মুহাজির ও আনসারদের মাঝে যারা ইসলামে প্রথম ও অগ্রসর, আর যারা তাদের সত্যের সঙ্গে অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি **সন্তুষ্ট** হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হলো সবচেয়ে বড় সাফল্য।' [তাওবা: ১০০] আরেক জায়গায় আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ اَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا.

অর্থ: 'আল্লাহ মুমিনদের প্রতি **সন্তুষ্ট** হলেন যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে বাইয়াত নিয়েছিল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাদের আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন।' [ফাতহ: ১৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে দোয়ায় বলতেন,

اللَّهُمَّ أَعُوذُ **بِرِضَاكَ** مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ . وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ, আমি আপনার অসন্তোষ থেকে সন্তুষ্টির আশ্রয় চাচ্ছি। আপনার শাস্তি থেকে নিরাপত্তার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আপনার কাছ থেকে আপনার আশ্রয় চাচ্ছি। আমি আপনার প্রশংসা করে শেষ করতে পারি না। আপনি তেমন যেমন নিজেকে বলেছেন।'[১] অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় **পছন্দ** করেন, আর তিনটি বিষয় অপছন্দ করেন। পছন্দের তিনটি বিষয় হলো, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করবে না; তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক হয়ে ধারণ করবে, বিচ্ছিন্ন-

১. মুসলিম (৪৮৬); আবু দাউদ (৮৭৯); তিরমিজি (৩৪৯৩)।

বিভক্ত হবে না; আল্লাহ তোমাদের উপর যাদের নিযুক্ত করেছেন (শাসক), তাদের কল্যাণ কামনা করবে। আর তিনি অপছন্দ করেন অর্থহীন কথাবার্তা, অতিরিক্ত প্রশ্ন ও সম্পদ বিনষ্ট করা।'[১]

সিফাত দুটোর তাবিল নিষিদ্ধ: এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি মনে রাখতে হবে; তা হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ক্রোধ সৃষ্টির মতো নয়। এগুলো তাঁর স্বরূপহীন গুণাবলি। ফলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন-ক্রুদ্ধ হন বলার সময় আল্লাহকে সৃষ্টির মতো কল্পনা করব না। একইভাবে আমরা এগুলোর তাবিলও করব না, যেমনটা খালাফ তথা পরবর্তী যুগের একদল আলিম করেছেন। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকে 'পুরস্কারের ইচ্ছা' দিয়ে এবং ক্রোধকে 'প্রতিশোধের ইচ্ছা' দিয়ে তাবিল করেছেন।[২] কিন্তু আমাদের ইমাম আজম-সহ সালাফের ইমামগণ এ দুটোর তাবিল করেননি। ইমাম আবু হানিফা রাহি. বলেন, **'তাঁর ক্রোধ ও সন্তুষ্টি তাঁর দুটো সিফাত। এগুলোর স্বরূপ নেই।'**[৩] আল-ফিকহুল আবসাতে এসেছে, 'আল্লাহকে মাখলুকের বিশেষণে বিশেষিত করা যাবে না। **রাগ ও সন্তুষ্টি তার দুটো সিফাত, স্বরূপহীন। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বক্তব্য। আল্লাহ রাগ করেন, সন্তুষ্ট হন। তার রাগকে 'শাস্তি' আর সন্তুষ্টিকে 'পুরস্কার' বলা যাবে না। বরং তিনি যেমন নিজেকে বলেছেন, আমরাও তা-ই বলব।'**[৪] মোল্লা আলি কারি উক্ত ব্যাখ্যায় বলেন, এই দুটো আল্লাহর সিফাতে মুতাশাবিহাত। এটাই জমহুর সালাফের মত। সুতরাং এগুলোকে পুরস্কার বা প্রতিশোধের ইচ্ছা দিয়ে তাবিল করা যাবে না।'[৫]

ইমাম তহাবিও এগুলোকে তাবিল করেননি। ত্বহাবিয়্যাহর হানাফি ব্যাখ্যাতাগণ—যেমন কাজি ইসমাইল শাইবানি ও আকহাসারি—লিখেন, আল্লাহকে সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে পবিত্র ঘোষণা করে এগুলো মেনে নিতে হবে। কারণ, কুরআন-সুন্নাহে এগুলো এসেছে। তাই আমরা বলব, 'আল্লাহ সন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হন। যেভাবে তার জন্য শোভনীয়।'[৬] হানাফি ব্যাখ্যাতা গুনাইমিও উক্ত সিফাতগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবে সাব্যস্ত

---

১. মুসলিম (১৭১৫); ইবনে হিব্বান (৩৩৮৮); মুসনাদে আহমদ (৮৯২১)।
২. গজনবি (১৫০); সাইদ ফুদাহ (১২৪৯)।
৩. আল-ফিকহুল আকবার (২৭)।
৪. আল-ফিকহুল আবসাত (৫৮)।
৫. শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (১২৪)।
৬. শাইবানি (৪৩); আকহাসারি (২৩৭)।

করার কথা বলেছেন এবং তাবিলকে সুস্পষ্ট ভাষায় নাকচ করেছেন।[১] এটাই সালাফের মানহাজ এবং হক ও নিরাপদ মানহাজ।

বরাবরের মতো এখানেও স্পষ্টভাষী কারি মুহাম্মাদ তৈয়ব সাহেব। তিনি লিখেন, 'এ ব্যাপারে হক মাজহাব হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি, ক্রোধ, শত্রুতা (আদাওত), বন্ধুত্ব (বেলায়াত), পছন্দ, অপছন্দ ইত্যাদি সেভাবে মেনে নিতে হবে যেভাবে শ্রবণ, দর্শন, জীবন (হায়াত), ক্ষমতা (কুদরত), ইলম, কালাম ও অন্যান্য সিফাত মেনে নেওয়া হয়। **এগুলো সব হাকিকত, মাজাজ নয়**। হ্যাঁ, আমরা এগুলোর স্বরূপ জানি না। কিন্তু তাই বলে **এগুলোকে তাবিল করা যাবে না** যা হাকিকি অর্থকে নাকচ করে দেয়। ক্রোধ ও রহমত ইত্যাদি মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলেও সাদৃশ্য কেবল শব্দের ক্ষেত্রে। অর্থের ক্ষেত্রে কোনো সাদৃশ্য নেই। তাই আল্লাহর জন্য সন্তুষ্টি, ক্রোধ ইত্যাদি সিফাত তার শোভা অনুযায়ী প্রযোজ্য। জাহান্নামের ফেরেশতা মালেক-সহ অন্যান্য ফেরেশতাও রাগ করেন। তাই বলে তাদের রাগ কি মানুষের মতো? তাদেরও কি শরীরে রক্ত গরম হয়ে যেতে হয়, যেমন মানুষের হয়? তা হলে আল্লাহর কেন হতে হবে, যিনি সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পবিত্র?[২]

---

১. গুনাইমি (১৩৩)।

২. কারি মুহাম্মাদ তৈয়ব (১৩৬)।

وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَلاَ نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، وَلاَ نَذْكُرُهُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ، وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ.

আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবাকে ভালোবাসি। তাদের কারও ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করি না। কারও থেকে নিজেদের মুক্ত ঘোষণা করি না। যারা তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে, তাদের মন্দ আলোচনা করে, আমরা তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখি। আমরা সাহাবাদের কেবল উত্তম পন্থায় স্মরণ করি। তাদের ভালোবাসাকে দ্বীন, ঈমান, ইহসান এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখাকে কুফর, নিফাক ও সীমালঙ্ঘন মনে করি।

ব্যাখ্যা
সাহাবাবিষয়ক আকিদা

সাহাবাদের পরিচয়: সাহাবি শব্দের অর্থ হলো সঙ্গী, সহচর, বন্ধু ইত্যাদি। ইসলামের পরিভাষায় সাহাবি বলা হয়, যিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাকে মুমিন অবস্থায় দেখেছেন এবং ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন। লম্বা সময় দেখা জরুরি নয়, এক পলক দেখাও যথেষ্ট। রাসুলুল্লাহর সঙ্গে সফর কিংবা জিহাদ করা জরুরি নয়; তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করা জরুরি নয়। বরং ঈমান অবস্থায় তাকে কেবল দেখে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করলেই তিনি সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এমনকি যিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, কিন্তু কোনো কারণে তাকে দেখতে পাননি, তিনিও সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত। যেমন: আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম-সহ অন্যান্য অন্ধ সাহাবি। উক্ত সংজ্ঞার আলোকে কেবল মানুষ নয়, যেসব জিন রাসুলুল্লাহকে মুমিন অবস্থায় দেখেছেন, তারাও সাহাবি।[১]

---

১. আল-ইসাবা, ইবনে হাজার (১/১৫৮)।

সুতরাং যারা ইসলাম অবস্থায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার পরে মুরতাদ হয়ে গিয়েছে এবং মুরতাদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তারা সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন: উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, আবুল্লাহ ইবনে খাতাল, মিকইয়াস ইবনে সুবাবা, রবিয়া ইবনে উমাইয়্যাহ ইবনে খালাফ, আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারাহ (সাহাবি নন, বরং এক খ্রিষ্টান) এবং যেসব লোক রিদ্দাহর ঘটনার সময় মুরতাদ হয়ে গিয়ে মুরতাদ অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পরে মুরতাদ হয়ে আবারও ইসলাম গ্রহণ করে, তবে নির্ভরযোগ্য বর্ণনামতে তিনিও সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন, যেমন আশআস ইবনে কায়স রাজি.।[1] আর যদি কেউ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরে কিন্তু দাফনের আগে দেখে, তার ব্যাপারটি মতভেদপূর্ণ। নির্ভরযোগ্য বক্তব্য অনুযায়ী তিনি সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। যেমন: আবু জুআইব হুজালি রাহি. রাসুলুল্লাহর ওফাতের পরে গোসলের আগে তাকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন; কিন্তু তিনি তাবেয়ি, সাহাবি নন।[২]

সাহাবাদের শ্রেষ্ঠত্ব: সাহাবাগণ নবিদের পরে গোটা মানব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজেদের চোখে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অতঃপর তারা তাঁর উপর ঈমান এনেছেন, তাঁর সঙ্গে দাওয়াত দিয়েছেন, জিহাদ করেছেন। তারা পৃথিবীর সবার চেয়ে রাসুলুল্লাহকে বেশি ভালোবেসেছেন। রাসুলুল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের জন্য তারা তাদের জানমাল সবকিছু বিসর্জন দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদায়ের পরে তাঁর দ্বীন ও দাওয়াত নিয়ে গোটা পৃথিবীতে তারা ছড়িয়ে পড়েছেন। কুরআন তারাই সংরক্ষণ করেছেন। রাসুলুল্লাহর বাণী তারাই আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ, রাসুল, নামাজ, রোজা, হজ, আখিরাত—সবকিছু আমরা তাদের মাধ্যমেই জেনেছি। ফলে গোটা মুসলিম উম্মাহ কিয়ামত পর্যন্ত তাদের কাছে ঋণী থাকবে।

সাহাবাগণ ছিলেন এমন এক প্রজন্ম, পৃথিবীতে যেমন প্রজন্মের মানুষ আর নেই। তাদের ঈমান, তাদের নিষ্ঠা, তাদের ভালোবাসা, তাদের আত্মত্যাগ, তাদের সরলতা ও পবিত্রতা, তাদের আমল ও আধ্যাত্মিকতা—এক কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে তারা

---

১. প্রাগুক্ত (১/১৫৯)।
২. প্রাগুক্ত (১/ ১৫৯) (৭/১১১)।

পূর্ণাঙ্গতা ও শ্রেষ্ঠত্বের এমন স্বাক্ষর রেখেছেন, যা মানব ইতিহাসে কেউ পারেনি, আর পারবেও না।

কুরআনের একাধিক জায়গায় আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ. وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ: '(এই ধন-সম্পদ) হিজরতকারী (মুহাজির) দরিদ্রদের জন্য যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিলাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী। যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদিনায় বসবাস করছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে, মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে সেজন্য তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না; বরং তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের অগ্রাধিকার দান করে। বস্তুত যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই প্রকৃত সফলকাম। আর যারা তাদের পরে আগমন করেছে, তারা বলে—হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের এবং আমাদের আগে যারা ঈমান এনেছে সেসব ভাইকে ক্ষমা করুন এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।' [হাশর: ৮-১০]

বরং আল্লাহ তায়ালা তাওরাত-ইনজিলের মতো পূর্ববর্তী আসমানি গ্রন্থগুলোতেও সাহাবাদের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন,

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ

يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.

অর্থ: 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদের রুকু ও সিজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন। তাওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ। আর ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারাগাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়। অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয়, কাণ্ডের উপর মজবুত হয়ে দাঁড়ায় এবং তা কৃষককে আনন্দিত করে। (এটা এ জন্য) যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের মনে আগুন জ্বালিয়ে দেন। আর তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।' [ফাতহ: ২৯]

কুরআনের একাধিক জায়গাতে উম্মতে মুহাম্মাদিকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলা হয়েছে; আগেকার সকল জাতির উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ

অর্থ: 'তোমরা হলে সর্বোত্তম জাতি যাদের মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর আল্লাহর উপর ঈমান আনবে।' [আলে ইমরান: ১১০] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ

অর্থ: 'এমনিভাবে আমি তোমাদের মধ্যপন্থি সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানুষের জন্য এবং যাতে রাসুল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য...।' [বাকারা: ১৪৩]

এসব আয়াতে যদিও উম্মত বলতে গোটা উম্মত বোঝানো হয়েছে, তথাপি প্রথম সম্বোধিত প্রজন্ম হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরাম। যেহেতু উম্মতে মুহাম্মাদি সকল নবির উম্মতের মাঝে শ্রেষ্ঠ উম্মত, আর সাহাবাগণ উম্মতে মুহাম্মাদির মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ জামায়াত, সুতরাং সাহাবাগণ নবি-রাসুলদের পরে গোটা মানবজাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ দল। এখানে প্রথমোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের মাধ্যমে সত্তরটি উম্মাহ পরিপূর্ণ হলো। তাদের মাঝে সর্বোত্তম আর

আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মর্যাদাময় হলে তোমরা।'[১] একবার তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কারা সর্বোত্তম মানুষ? তিনি বললেন, 'আমার যুগের লোকজন।'[২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসংখ্য হাদিসে আপন সাহাবাদের শ্রেষ্ঠত্ব বলে গিয়েছেন। আবু বুরদা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে মাগরিবের নামাজ আদায় করলাম। নামাজের পরে আমরা ভাবলাম ইশার নামাজও রাসুলের সঙ্গে পড়ি। ইশার সময় আল্লাহর রাসুল বের হয়ে আমাদের দেখে বললেন, 'তোমরা এখনও এখানে?' আমরা বললাম, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার সঙ্গে মাগরিবের নামাজ আদায়ের পরে চিন্তা করলাম ইশাও পড়ে যাই।' আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ভালো করেছ।' অতঃপর তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আকাশের তারকাগুলো তার সুরক্ষা। যখন এগুলো থাকবে না, তখন আকাশ সুরক্ষিত থাকবে না। আমি আমার সাহাবাদের জন্য সুরক্ষা। আমি যখন চলে যাব, আমার সাহাবারা বিপদে আক্রান্ত হবে। আর আমার সাহাবারা আমার উম্মতের জন্য রক্ষাকবচ। তারা যখন চলে যাবে, তখন আমার উম্মত মুসিবতে আক্রান্ত হবে।'[৩]

ইমরান ইবনে হুসাইন, আয়েশা, আবু হুরাইরা রাজি.-সহ অন্য অনেক সাহাবি থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদিসে আল্লাহর রাসুল বলেন, 'আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম হচ্ছে যাদের মাঝে আমি প্রেরিত হয়েছি (অর্থাৎ সাহাবাগণ); এরপর তাদের পরে যারা আসবে (তাবেয়িগণ); এরপর তাদের পরে যারা আসবে (তাবে তাবেয়িগণ)। তাদের পরে আসবে এমন এক প্রজন্ম, যাদের কাছে সাক্ষ্য চাওয়ার আগেই সাক্ষ্য দেবে; যাদের কাছে আমানত রাখা হলে খেয়ানত করবে; যারা মানত করবে, কিন্তু সেটা পূরণ করবে না; যাদের মাঝে স্থূলতা প্রকাশ পাবে।'[৪]

সাহাবাদের ভালোবাসা ঈমান: যেহেতু কুরআন, সুন্নাহ ও সুস্থ বিবেক দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত, তাই মুসলিম উম্মাহর সকল আলিমের সর্বসম্মত মত হলো, সাহাবায়ে কেরাম সকলে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। মর্যাদার দিক থেকে সর্বকনিষ্ঠ সাহাবিও তাদের পরে উম্মাহর সকল মুমিন-মুসলিম, ওলি-আউলিয়া, গাউস-কুতুব, পির-মাশায়েখ সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। উম্মাহর কেউ যদি

---

১. তিরমিজি (৩০০১); মুসতাদরাকে হাকেম (৭০৭৯)।
২. বুখারি (৩৬৭১, ৬৬৫৮); মুসলিম (২৫৩৩)।
৩. মুসলিম (২৫৩১); ইবনে হিব্বান (৭২৪৯)।
৪. বুখারি (২৬৫১, ৬৬৯৫); মুসলিম (২৫৩৪, ২৫৩৫)।

বালেগ হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সারা জীবন সিজদায় পড়ে থাকে, সারাজীবন যদি ঘোড়ার পিঠে জিহাদের ময়দানে কাটিয়ে দেন, সারাজীবন যদি দাওয়াত ও তালিমের কাজে ব্যস্ত থাকে, জীবনের সবকিছু যদি আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দেয়, তবুও সে সেই সাহাবির ধারেকাছেও পৌঁছতে পারবে না যিনি রাসুলুল্লাহকে তাঁর জীবদ্দশায় একবার দূর থেকেও একনজর দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এ এমন সৌভাগ্য, কিয়ামত পর্যন্ত সাধনা করেও যা লাভ করা সম্ভব নয়।

এটা মুসলমানদের আবেগী কথা নয়, বরং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত দ্বীন ও ঈমানের দাবি। আমাদের দ্বীন, আমাদের কুরআন, সুন্নাহ, শরিয়ত—সবকিছু সাহাবাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত। ফলে আমরা যত ইবাদত করি, সবগুলো সাহাবাদের আমলনামায় যোগ হয়। এমনকি যে সাহাবি আল্লাহর রাসুলের কোনো হাদিস বর্ণনা করেননি, দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমাদের জানা উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান রাখেননি, তিনিও পরবর্তী উম্মতের সকল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ, রাসুলুল্লাহর দিদার তাদের অন্তরে যে ঈমান তৈরি করে দিয়েছিল, তাদের অন্তরে ইয়াকিনের যে নুর ঢেলে দিয়েছিল, সেই ঈমান আর সেই ইয়াকিনের কাছে স্রেফ আমল দ্বারা পৌঁছানো সম্ভব নয়। রাসুলুল্লাহকে তাঁর প্রত্যেক সাহাবি যতটা ভালোবেসেছিলেন, তেমন ভালোবাসা উম্মাহর আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। বস্তুত সাহাবায়ে কেরামকে স্বয়ং আল্লাহ রাসুলুল্লাহর জন্য মনোনীত করেছিলেন। আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে এমন একটি শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়কে তাঁর রাসুলের জন্য বাছাই করেছিলেন, পৃথিবীতে তাদের আগে কিংবা পরে তাদের মতো আর কেউ আসবে না।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজি. বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয়কে সর্বোত্তম পান। ফলে তিনি তাকে নিজের জন্য মনোনীত করেন এবং তাকে রাসুল করে পাঠান। অতঃপর তিনি আবারও তার বান্দাদের হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি দেন। তখন তাঁর সাহাবাদের হৃদয়কে সর্বোত্তম হৃদয় পান। ফলে আল্লাহ তাদের তাঁর সহযোগী হিসেবে মনোনীত করেন। তারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য জিহাদ করেন। তারা যেটাকে ভালো মনে করেন, আল্লাহর কাছে সেটাই ভালো; আর তারা যেটাকে মন্দ মনে করেন, আল্লাহর কাছে সেটাই মন্দ।'[১]

---

১. মুসনাদে আহমদ (৩৬৭০); তয়ালিসি (২৪৩); বাজ্জার (১৭০১); আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (৮৫৮৩)।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাজি. বলেন, 'যদি কেউ কারও অনুসরণ করতে চায়, তবে যেন মৃতদের অনুসরণ করে। তারা আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি। তারা এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সবচেয়ে পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী, সর্বাপেক্ষা গভীর জ্ঞানের অধিকারী, লৌকিকতা থেকে সবার চেয়ে দূরে। তারা এমন এক সম্প্রদায়, আল্লাহ তায়ালা যাদের তাঁর নবির সোহবতের জন্য এবং তাঁর দ্বীনের সুরক্ষা ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমরা তাদের চরিত্রে চরিত্রবান হও। তাদের পথে অবিচল থাকো। কাবার রবের শপথ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।'[১] ইবনে উমর রাজি. আরও বলতেন, 'তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের গালি দিয়ো না। রাসুলের সান্নিধ্যে তাদের এক মুহূর্তের অবস্থান তোমাদের পুরো জীবনের আমলের চেয়ে উত্তম।'[২]

বিখ্যাত তাবেয়ি হাসান বসরি রাহি.-কে কেউ জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহর রাসুলের সাহাবাদের সম্পর্কে কিছু বলুন। তখন তিনি কাঁদলেন। অতঃপর বললেন, 'তারা ছিলেন এমন সম্প্রদায় যাদের বাহ্যিক আকার-আকৃতি, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, আখলাক-চরিত্র কথাবার্তা—সবকিছুতে কল্যাণের নিদর্শন সুস্পষ্ট ছিল। তারা শক্ত কাপড় পরিধান করতেন, বিনয়ের সঙ্গে পথ চলতেন, কথা অনুযায়ী কাজ করতেন; তারা হালাল ভক্ষণ করতেন, হালাল পান করতেন; তাদের রবের আনুগত্যের সামনে তারা সদা অবনতশির ছিলেন; পছন্দ-অপছন্দ সর্বক্ষেত্রে তারা সত্যের অনুসারী ছিলেন; সত্যের পথে তারা তৃষ্ণার্ত থেকেছেন, ক্ষুধার্ত থেকেছেন; তাদের দেহ জীর্ণশীর্ণ হয়ে গিয়েছে; আল্লাহর সন্তুষ্টির সামনে মাখলুকের সন্তুষ্টিকে তারা তুচ্ছজ্ঞান করেছেন; তারা ক্রোধান্বিত হলে সীমালঙ্ঘন করতেন না, কারও উপর জুলুম করতেন না; আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে কুরআনের বাইরে যেতেন না; তারা তাদের জবানকে আল্লাহর জিকির দ্বারা মশগুল রাখতেন; আল্লাহর পথে আল্লাহর দ্বীনের জন্য তারা বুকের খুন বইয়ে দিয়েছেন; দ্বীনের প্রয়োজনে তারা তাদের ধন-সম্পদ উৎসর্গ করেছেন; সৃষ্টির ভয় কখনও তাদের উপর জেঁকে বসতে পারেনি; তাদের চরিত্র ছিল সর্বোত্তম চরিত্র; অথচ তাদের জীবন ছিল সবচেয়ে সাধারণ। তারা এই পৃথিবী থেকে সামান্যই গ্রহণ করেছেন; বাকিটা তারা আখিরাতের জন্য রেখে দিয়েছেন।'[৩]

---

১. হিলইয়াতুল আউলিয়া, আবু নুআইম (১/৩০৫)।
২. সুনানে ইবনে মাজা (১৬২); সিন্ধি এটার সনদকে সহিহ বলেছেন। মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩৩০৮২)।
৩. হিলইয়াতুল আউলিয়া, আবু নুআইম (২/১৫০)।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ হাসান বসরিকে অনুগ্রহ করুন। তিনি রাসুলুল্লাহর সাহাবাদের দেখেছেন। তারা যেমন ছিলেন তেমনই তাদের চিত্র এঁকেছেন।

ইমাম শাফেয়ি রাহি. বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা কুরআন, তাওরাত ও ইঞ্জিলে রাসুলুল্লাহর সাহাবাদের প্রশংসা করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মুখে তাদের সম্পর্কে যে ভালো আলোচনা করেছেন, তা তাদের পরে উম্মতের আর কারও পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। তাদের তিনি সিদ্দিকিন, শুহাদা ও সালেহিনের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করেছেন। তারা আমাদের কাছে রাসুলুল্লাহর সুন্নাত পৌঁছে দিয়েছেন। তারা রাসুলুল্লাহর উপর ওহি অবতীর্ণ হতে দেখেছেন। ফলে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী বলতে চেয়েছেন, কী বুঝিয়েছেন—সবকিছু জেনেছেন। তারা আল্লাহর রাসুলের সুন্নাতকে যতটা জেনেছেন আমরা তার কিছুই জানি না। তাই জ্ঞানের সকল শাস্ত্রে তারা আমাদের উর্ধ্বে। ইলম, ইজতিহাদ, তাকওয়া, জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা—কোনোকিছুতে তাদের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়; বরং আমাদের দ্বীনের ক্ষেত্রেও তাদের পথে চলা নিরাপদ। আমাদের নিজেদের মতামতের চেয়ে তাদের মতামতের অনুসরণ উত্তম।'[১]

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহি. বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মাঝে সবচেয়ে কম সোহবত যিনি পেয়েছেন, তিনিও পরবর্তী প্রজন্ম যারা রাসুলুল্লাহকে দেখেননি তাদের সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যদি তারা পৃথিবীর সকল আমল নিয়ে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হয়, তবুও। তারা সেই সম্প্রদায় যারা আল্লাহর রাসুলের সান্নিধ্য পেয়েছেন, তাকে দেখেছেন, তার কথা শুনেছেন। আর যিনি তাকে দেখেছেন, তাঁর উপর ঈমান এনেছেন, এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর রাসুলের সান্নিধ্যে থেকেছেন, তিনি সকল তাবেয়ির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সকল ভালো কাজ করলেও তারা সাহাবির মর্যাদায় পৌঁছতে পারবে না।'[২]

সুতরাং এই মহান জামাতকে ভালোবাসা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অপরিহার্য। সাহাবায়ে কেরামকে ভালোবাসা মূলত আল্লাহ, রাসুল, কুরআন, সুন্নাহ তথা ইসলামের সবকিছু ভালোবাসা। আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং ইসলামি 'ওয়ালা'র সর্বোচ্চ প্রকাশ সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালোবাসা, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন

---

১. মানাকিবুশ শাফেয়ি, বাইহাকি (১/৪৪২)।
২. উসুলুস সুন্নাহ (৪); শরহুস সুন্নাহ, লালাকায়ি (১/১৭৫)।

করা। বস্তুত সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালোবাসা একজন মুমিনের হৃদয়ে প্রাকৃতিকভাবেই প্রোথিত হয়ে থাকার কথা। যারা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে মুসলমান হয়েছেন, তাঁকে দেখেছেন, তাঁর পুরো জীবনে ঘরে বাইরে, যুদ্ধে সফরে তাঁর সঙ্গ দিয়েছেন, তাঁকে পৃথিবীর সবার চেয়ে বেশি ভালোবেসেছেন, তাঁর জন্য জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন, তাঁকে এত ভালোবেসেছেন যা পৃথিবীর কোনো মানুষ কোনো মানুষকে পারে না, কোনো গোলামও তার মনিবকে পারে না, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পরে তার আনীত কুরআন ও সুন্নাহ সংরক্ষণ করেছেন, নিজেদের আরাম ও সংসার পিছনে ফেলে গোটা পৃথিবীতে সেই দ্বীনের প্রচারে ছড়িয়ে পড়েছেন, আটলান্টিকের কূল থেকে শুরু করে ভারত মহাসাগরের তীর পর্যন্ত সর্বত্র পৌঁছে গিয়েছেন আল্লাহর দ্বীন নিয়ে, পৃথিবীর নানা পরিচিত-অপরিচিত ময়দানে বইয়েছেন নিজেদের তপ্ত লোহিত। সাহাবাগণ না থাকলে আমাদের কাছে কুরআন-সুন্নাহ আসত না, আমরা আল্লাহকে জানতাম না; ফরজ-ওয়াজিব, সুন্নাহ-নফল, হালাল-হারাম—কিছুই বুঝতাম না। তা হলে একজন মুমিন তাদের ভালো না বেসে পারে কী করে? তাই আমরা সকল সাহাবিকে ভালোবাসি। তাদের নাম নিলে 'রাজিয়াল্লাহু আনহুম' (আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন) বলে দোয়া করি। সামগ্রিকভাবে ও জামাতবদ্ধভাবে সাহাবায়ে কেরামের দলকে মাসুম মনে করি। অর্থাৎ তাদের ব্যক্তিবিশেষ ভুল করতে পারেন, কিন্তু সকল সাহাবি একসঙ্গে ভুল করতে পারেন না। ফলে সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তাদের পথকেই হকের পথ অভিহিত করেছেন।[১] সামনে এ সম্পর্কে আরও সবিস্তার আলোচনা আসবে, ইনশাআল্লাহ।

বস্তুত সকল মুমিনই সাহাবাদের ভালোবাসে। সাহাবা-বিদ্বেষী শিয়াদের উত্থানের আগ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর জানাই ছিল না যে, সাহাবাদের প্রতিও বিদ্বেষ রাখা যায়, তাদের সমালোচনা করা যায়, তাদের ঘৃণা করা যায়। শিয়া ও শিয়াদের সমমনা বিভিন্ন সাহাবা-বিদ্বেষী সম্প্রদায়ের প্ররোচনা-প্রোপাগাণ্ডার ফলে ধীরে ধীরে মুসলমানদের মাঝেও সাহাবাবিদ্বেষের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। অনেক মুসলমান সাহাবাদের শানে জবান দরাজিতে লিপ্ত হয়, নিজেদের অতি পণ্ডিত মনে করে সাহাবাদের ব্যাপারে কলম ধরে হিদায়াতের পথ থেকে ছিটকে পড়ে। এ কারণে যুগে যুগে আহলে সুন্নাতের ইমামগণ যখন আকিদার কিতাব লিখেছেন, তাতে সাহাবাদের ভালোবাসা ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে উক্ত আলোচনার অবতারণা করেছেন।

---

১. তিরমিজি (২৬৪১); মুসতাদরাকে হাকেম (৪৪৩)।

সাহাবাদের পারস্পরিক মর্যাদার তারতম্য: সাহাবাদের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। সকল সাহাবিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়াও প্রত্যেক মুমিনের উপর অপরিহার্য। তবে সকল সাহাবির প্রতি সমান ভালোবাসা ও আকর্ষণ থাকা জরুরি নয়। কারণ, সকল সাহাবির মর্যাদা সমস্তরে নয়। পিছনে নবি-রাসুলদের ক্ষেত্রে আমরা যা উল্লেখ করেছি, এখানেও একই মূলনীতি প্রযোজ্য। অর্থাৎ সাহাবি হিসেবে প্রত্যেক সাহাবি আমাদের সম্মান, মর্যাদা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পাবার উপযুক্ত। কিন্তু তাদের সবাই সমস্তরে নয়। বরং প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিষ্ঠা, কুরবানি, রাসুলের ভালোবাসা ও সান্নিধ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত।

স্বয়ং কুরআনেও আল্লাহ তায়ালা তাদের মর্যাদার মাঝে পার্থক্য করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

অর্থ: 'তোমরা আল্লাহর পথে কেন ব্যয় করছ না যখন আল্লাহর জন্যই আকাশসমূহ ও জমিনের উত্তরাধিকার? তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করেছে, সে (পরবর্তী লোকদের সঙ্গে) সমান নয়। তাদের মর্যাদা অনেক বেশি তাদের অপেক্ষা যারা (বিজয়ের) পরে ব্যয় করেছে এবং জিহাদ করেছে। **তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।** তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।' [হাদিদ: ১০] উক্ত আয়াতে আল্লাহ হুদাইবিয়ার সন্ধি অথবা মক্কা বিজয়ের ঘটনার আগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাদের হুদাইবিয়া/মক্কা বিজয়ের পরে ইসলামগ্রহণকারীদের থেকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। তবে মনে রাখতে হবে, আয়াতের শেষাংশে সবার জন্য আল্লাহ কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অর্থাৎ তাদের মাঝে কারও মর্যাদা কারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেও সার্বিকভাবে সকল সাহাবি অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। অন্য আয়াতে আল্লাহ প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারী মুজাহির ও আনসার সাহাবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে বলেন,

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

অর্থ: 'আর মুহাজির ও আনসারদের মাঝে যারা ইসলামে প্রথম ও অগ্রসর, আর যারা তাদের সত্যের সঙ্গে অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হলো সবচেয়ে বড় সাফল্য।' [তাওবা: ১০০]

অসংখ্য হাদিসে অনেক সাহাবির শ্রেষ্ঠত্বের কথা এসেছে, যা অন্যদের ব্যাপারে আসেনি। তা ছাড়া ইসলামের জন্য সবার ত্যাগ সমান নয়, রাসুলুল্লাহর সঙ্গে সবার সম্পর্ক সমান গভীর নয়, তাঁর সঙ্গে কাটানো সময় সবার জন্য সমান নয়। কেউ রাসুলুল্লাহর হাতে সর্বপ্রথম মুসলমান হয়েছেন, সারা জীবন তাঁর সঙ্গে সকল দাওয়াত ও জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন, রক্ত ঝরিয়েছেন, সম্পদ বিসর্জন দিয়েছেন, রাসুলুল্লাহর ইন্তিকালের পরেও তার দাওয়াত ও উম্মতের পিছনে জীবন ব্যয় করেছেন, তা হলে বিদায় হজ কিংবা অন্য যেকোনো সময় রাসুলুল্লাহকে এক নজর দেখা সাহাবি তার সমান হতে পারেন? কখনোই নয়।

রাসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হচ্ছেন আবু বকর, অতঃপর উমর, অতঃপর উসমান, অতঃপর আলি। তাদের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন আশারায়ে মুবাশশারা তথা জান্নাতের সুসংসবাদপ্রাপ্ত দশজনের বাকি ছয়জন সাহাবা। তারা উম্মতের বাকি সবার চেয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ। অতঃপর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাগণ। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ক্ষমার সুসংবাদ দিয়েছেন।[১] অতঃপর হুদাইবিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণকারী সাহাবাগণ। স্বয়ং আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্টির সনদ দিয়ে ঘোষণা করেন,

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا.

অর্থ: 'আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের উপর সাকিনা (প্রশান্তি) অবতীর্ণ করলেন এবং তাদের আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন।' [ফাতহ: ১৮] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের

---

১. বুখারি (৩০০৭, ৬২৫৯); মুসলিম (২৪৯৪)।

শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিয়ে বলেন, বৃক্ষের নিচে যারা বাইয়াত গ্রহণ করেছে, তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, ইনশাআল্লাহ।[1] অতঃপর যারা হুদাইবিয়ার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং জিহাদ করেছেন। [হাদিদ: ১০] অতঃপর সাধারণ মুহাজির। [তাওবা: ১০০] অতঃপর সাধারণ আনসার। [হাশর: ৯]

বুখারিতে ইবনে উমর রাজি.-এর সুস্পষ্ট বক্তব্য এসেছে এভাবে: নবিজির যুগে আমরা মানুষের মাঝে উত্তম কারা কারা সেটা বলতাম। আমরা সর্বোত্তম বলতাম আবু বকর রাজি.-কে, অতঃপর উমর ইবনুল খাত্তাব রাজি.-কে, অতঃপর উসমান ইবনে আফফান রাজি.-কে।[2] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো শুনতেন, কিন্তু আমাদের নিষেধ করতেন না।[3] অন্য বর্ণনায় ইবনে উমর রাজি. থেকেই উক্ত তিনজনের পরে আলি রাজি.-এর নাম এসেছে।[4]

উপরের বক্তব্য ইবনে উমর রাজি.-এর। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো শুনতেন, কিন্তু নিষেধ করতেন না, কিংবা তিনি নিজেও কোনো বিশেষ সাহাবিকে সরাসরি অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলতেন না। এটা রাসুলুল্লাহর জন্য শোভনীয়ও নয়। কারণ তাতে অন্যদের মনে কষ্ট লাগতে পারে। কিন্তু তিনি বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে দিতেন যে, তারা অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এটা হচ্ছে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার ক্ষেত্রে। কিন্তু জামাতগত শ্রেষ্ঠত্ব তিনি সুস্পষ্টভাবেই বিভিন্ন হাদিসে বলেছেন, যেমনটা উপরের কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে। দশজন সাহাবিকে তিনি জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। সবার ক্ষেত্রে এই সুসংবাদ থাকলেও সুনির্ধারিতভাবে নেই। ফলে তারা অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আহলে বদর ও আহলে হুদাইবিয়ার জন্য তিনি বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিয়েছেন, যা অন্যদের ক্ষেত্রে দেননি। ফলে অন্যদের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। এটাই পরবর্তীকালে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বসম্মত আকিদায় পরিণত হয়। বাগদাদি লিখেন এবং এটা আহলে সুন্নাতের সকল ইমামের মত, আমরা সবাই এ ব্যাপারে একমত

---

১. মুসলিম (২৪৯৬); সুনানে কুবরা, নাসায়ি (১১২৫৯)।
২. বুখারি (৩৬৫৫); ইবনে হিব্বান (৭২৫০); আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (১৩১৩২)।
৩. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (১৩১৩২); মুসনাদে আবু ইয়ালা (৫৬০১)।
৪. মুসনাদে আবু ইয়ালা (৫৬০১); শরহু মুশকিলিল আসার (৩৫৫৯)। খাত্তাবি লেখেন, ইবনে উমর বয়োবৃদ্ধ তিনজনের নাম উল্লেখ করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের সঙ্গে তাঁর জীবদ্দশায় পরামর্শ করতেন। আলি রাজি. তাঁর জীবদ্দশায় যুবক ছিলেন। বিদ্বেষ কিংবা অবজ্ঞার কারণে উল্লেখ করেননি এমন নয় (ফাতহুল বারি ৭/৫৮)। তবে অন্যান্য বর্ণনায় আমরা যেমনটা দেখিয়েছি, আলি রাজি.-এর নামও আছে।

যে, সাহাবাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন চার খলিফা, অতঃপর জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত বাকি ছয়জন। তারা হলেন: তালহা, জুবাইর, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, সাইদ ইবনে জায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, অতঃপর বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাগণ, অতঃপর হুদাইবিয়ার বাইআতুর রিজওয়ানে অংশগ্রহণকারীগণ।[১] ইবনে হাজার আসকালানি লিখেন: উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলি, অতঃপর জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জন, অতঃপর বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাগণ।[২]

নারী সাহাবাদের মর্যাদার তারতম্য: নারী সাহাবাদের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের (স্ত্রী-কন্যা) মর্যাদা অন্য সকল নারীর উপরে। এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহর পরিবারকে অন্য সকল নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করে বলেন,

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا.

অর্থ: 'হে নবিপত্নীগণ, তোমরা অন্য নারীদের মতো নও যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাই পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না। তাতে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। বরং তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে।' [আহজাব: ৩২] ইবনে আব্বাস রাজি. উক্ত আয়াতের তাফসিরে বলেন, 'অর্থাৎ আমার কাছে তোমাদের মর্যাদা অন্য পুণ্যবতী নারীদের মতো নয়; তোমরা আমার কাছে তাদের চেয়ে অধিকতর মর্যাদাময় এবং অধিকতর পুণ্যের অধিকারী।'[৩]

তাই আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মতিক্রমে রাসুলের পরিবারবর্গ সাধারণভাবে সকল নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাদের মাঝে খাদিজা, আয়েশা ও ফাতিমা রাজি. সর্বশ্রেষ্ঠ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নারীদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ। নারীদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে মারইয়াম বিনতে ইমরান (ঈসা আলাইহিস সালামের মাতা)।[৪] উক্ত হাদিসটিতে খাদিজা রাজি.-এর মর্যাদা সুস্পষ্ট।

---

১. উসুলুদ্দিন, বাগদাদি (৩০৪)।
২. ফাতহুল বারি (৭/৫৮)।
৩. তাফসিরে বাগাবি (৩/৫৩৫)।
৪. বুখারি (৩৪৩২); মুসলিম (২৪৩০); তিরমিজি (৩৮৭৭)।

বুখারির এই হাদিসটির বর্ণনাকারী হচ্ছেন আলি রাজি.। অপর বর্ণনায় এসেছে, আমার উম্মতের সকল নারীর মাঝে খাদিজাকে শ্রেষ্ঠ নির্ধারণ করা হয়েছে।[১] আয়েশা রাজি.-এর ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সারিদ যেমন সকল খাবারের মাঝে শ্রেষ্ঠ, আয়েশা রাজি. তেমন সকল নারীর মাঝে শ্রেষ্ঠ।[২] অন্য হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে? তিনি বললেন, আয়েশা।[৩] এগুলো ছাড়াও অসংখ্য হাদিসে আয়েশা রাজি.-এর মর্যাদা ফুটে ওঠে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের শেষ দিনগুলো তাঁর এই প্রিয়তমা স্ত্রীর ঘরেই কাটিয়েছেন। তাঁর বুকে মাথা রেখেই রাসুলুল্লাহ স্বীয় বন্ধুর পানে যাত্রা শুরু করেন।[৪] অপরদিকে ফাতিমার শ্রেষ্ঠত্বও অনেক হাদিসের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। ফাতিমা রাজি.-কে লক্ষ্য করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি কি জান্নাতে নারীদের সর্দার হতে চাও না? অথবা এই উম্মতের নারীদের সর্দার হতে চাও না?[৫] এর মাধ্যমে ফাতিমা রাজি.-এর শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট হয়। অপর বর্ণনায় এসেছে, জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নারীরা হলো খাদিজা, ফাতিমা, মারইয়াম ও আসিয়া।[6] সুতরাং এসব হাদিসে একদিকে যেমন খাদিজা রাজি. ও তার মেয়ে ফাতিমা রাজি.-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়, অপরদিকে আয়েশা এবং পূর্ববর্তী উম্মতের মাঝে ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া ও ঈসা আলাইহিস সালামের মাতা মারইয়ামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়।

তবে প্রথম তিনজনের মাঝে খাদিজা এবং ফাতিমা শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ সর্বপ্রথম খাদিজা রাজি., অতঃপর তার মেয়ে ফাতিমা রাজি., অতঃপর আয়েশা রাজি.। কারণ, খাদিজা ও ফাতিমার শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহর বক্তব্য সুস্পষ্ট। বিপরীতে আয়েশাকে নারীদের মাঝে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে তুলনার ভিত্তিতে, সার্বিকভাবে নয়। ইবনে হাজার আসকালানি এটাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[৭] বাগদাদি এটাকে ইমাম শাফেয়ি ও আবুল হাসান আশআরি-সহ অন্যান্য ইমামের মত হিসেবে অভিহিত করেছেন। অতঃপর বাগদাদি লিখেন: খাদিজা, ফাতিমা ও আয়েশার পরে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন উম্মে সালামা, অতঃপর হাফসা বিনতে উমর, অতঃপর অন্য স্ত্রীগণ। কারও কারও মতে,

---

১. মুসনাদে বাজ্জার (১৪২৭)।
২. বুখারি (৩৪১১); মুসলিম (২৪৩১); তিরমিজি (৩৮৮৭)।
৩. বুখারি (৩৬৬২); মুসলিম (২৩৮৪); তিরমিজি (৩৮৮৫)।
৪. বুখারি (১৩৮৯); মুসলিম (২৪৪৩)।
৫. বুখারি (৬২৮৫); মুসলিম (২৪৫০); ইবনে মাজা (১৬২১)।
৬. ইবনে হিব্বান (৭০১০); হাকেম (৩৮৫৭); মুসনাদে আবদ ইবনে হুমাইদ (৫৯৭); মুসনাদে আহমদ (২৭১২)।
৭. ফাতহুল বারি, ইবনে হাজার (৭/১০৭)।

নবিদের কন্যাগণ তাদের স্ত্রীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।[১] কিন্তু সেটা সঠিক হওয়া জরুরি নয়। খাদিজা রাজি. নবির স্ত্রী; অথচ তিনি তার মেয়ে ফাতিমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আয়েশা রাজি. নবিজির অন্যান্য কন্যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তবে এগুলো একান্তই ইজতিহাদি বক্তব্য, সুনিশ্চিত নয়। কিংবা এগুলোর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দ্বীনের কোনো মৌলিক বিষয়ও নয়। তাই এ ব্যাপারে নীরব থাকাই উত্তম।[২]

বিশেষ কোনো সাহাবির ভালোবাসায় বাড়াবাড়ি না করা: ইমাম তহাবির উক্ত বক্তব্য শিয়াদের খণ্ডনে।[৩] যেহেতু সাহাবায়ে কেরামের স্তরভেদ সুস্পষ্ট এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাও বিভিন্ন পর্যায়ে, ফলে সাহাবাদের প্রতি ভালোবাসায়ও তারতম্য হবে—এটাই স্বাভাবিক। উদাহরণস্বরূপ আবু বকর, উমর, উসমান, আলি রাজি.-এর প্রতি যে ভালোবাসা ও সম্মান থাকবে, সেটা অন্যদের প্রতি নাও থাকতে পারে। কারণ, ইসলামে তাদের অবদান সবচেয়ে বেশি। একইভাবে আহলে বাইত তথা রাসুলুল্লাহর পরিবার, স্ত্রী-কন্যা ও দৌহিত্রদের প্রতি যতটা আগ্রহ থাকবে, অন্যান্য সাহাবার পরিবারের প্রতি ততটা আগ্রহ থাকবে না—এটা স্বাভাবিক। এটা প্রাকৃতিক এবং শরিয়তবিরুদ্ধ নয়। তবে শরিয়তবিরুদ্ধ হলো বিশেষ কেনো সাহাবির ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা, বিশেষ কাউকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করা। কারণ, সেটা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ যারা তাদের অবমাননার শামিল, কুরআন-সন্নাহর আলোকে সাহাবাদের মর্যাদাগত তফাতকে অস্বীকারের অন্তর্ভুক্ত। বরং এটাই যুগে যুগে ফিরকাবাজির জন্ম দিয়েছে; দু-একজন সাহাবি বাদ দিয়ে অন্য সকলের প্রতি বিদ্বেষ রাখার পথ সুগম করেছে। এটা ভয়ংকর ফাঁদ। শিয়ারা এ ফাঁদেই আটকে গেছে। বাহ্যিকভাবে মনে হবে বিশেষ কোনো কারণে কোনো বিশেষ সাহাবির প্রতি একটু বেশি ভালোবাসা থাকতেই পারে, তাতে সমস্যা কোথায়? কিন্তু ভিতরে এটা অত্যন্ত ভয়ংকর ব্যাপার। কারণ, এই একজনের ভালোবাসায় সীমালঙ্ঘন অন্যদের প্রতি বিদ্বেষ রাখার পথে ঠেলে দেবে। তাঁর সঙ্গে যদি অন্য কোনো সাহাবির সামান্য মনোমালিন্যও তৈরি হয়, কখনও যা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার, সেগুলো তার অনুসারী দাবিদারদের মাঝে নতুন আগুনের মতো দ্বিগুন শক্তি নিয়ে প্রজ্বলিত হবে। ফলে তারা সেই সাহাবির প্রতিও বিদ্বেষ রাখা শুরু করবে। এভাবে ধীরে ধীরে বিদ্বেষ বাড়বে। একসময় একজনের প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন তাকে সকল সাহাবার প্রতি বিদ্বেষের দিকে

১. উসূলুদ্দিন, বাগদাদি (৩০৬)।
২. ফাতহুল বারি (৭/১৩৯); শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (৩৪৮)।
৩. তুর্কিস্তানি (১৭০); আকহাসারি (২৩৯)।

ঠেলে দেবে। এ কারণে ইমাম তহাবি শক্তভাবে বলেছেন, '**আমরা রাসুলুল্লাহর সকল সাহাবাকে ভালোবাসি। কারও ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করি না। তাদের কারও থেকে নিজেদের মুক্ত ঘোষণা করি না।**' কারণ, একজনের ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি অন্যদের বিদ্বেষের দিকে নিয়ে যায়। এটা সেই চোরাগলি, যেখানে হাজার বছর আগে ভ্রান্ত শিয়া ও তাদের প্রভাবে প্রভাবিত অনেক সুফি দাবিদার ভ্রান্ত সম্প্রদায় হারিয়ে গেছে।

মর্যাদার দিক থেকে আলি রাজি.-এর অবস্থান উম্মতের **সর্বসম্মতিক্রমে** আবু বকর ও উমর রাজি.-এর পরে। আর সংখ্যারিষ্ঠ সালাফের মত অনুসারে তৃতীয় স্থানে উসমান রাজি., চতুর্থ স্থানে আলি রাজি.। তবে কিছু কিছু সালাফ উসমান এবং আলি রাজি.-এর মাঝে **কে উত্তম** সেটা নির্ধারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামের চেয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তারা আলি রাজি.-কে উসমান রাজি.-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেছেন। যেমন সুফিয়ান সাওরি[১] প্রমুখ থেকে উক্ত মাজহাব প্রসিদ্ধ। তবে সুফিয়ান সাওরি থেকে তার প্রথমোক্ত বক্তব্য প্রত্যাহার করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সালাফের বক্তব্যের দিকে ফিরে যাওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়।[২] আর এভাবে আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী উসমান রাজি. তৃতীয় এবং চুতর্থ স্থানে থাকেন আলি রাজি.; কিন্তু তারা সবাই মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র।

প্রশ্ন হতে পারে, কেউ যদি আলি রাজি.-কে উসমান রাজি.-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তবেই কি সে শিয়া কিংবা বিদআতি? আমরা বলব, উম্মাহর সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের মতে, উসমান রাজি. আলি রাজি.-এর চেয়ে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। সুতরাং কেউ যদি আলি রাজি.-কে উসমান রাজি.-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে, তবে সে সংখ্যাগরিষ্ঠ সালাফের বিরোধিতা করল। কিন্তু এ জন্য তাকে আমরা বিদআতি বা শিয়া বলব না, যেহেতু সালাফের কারও কারও থেকে এমন বক্তব্য পাওয়া যায়। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি এমন বক্তব্য ঘৃণা করতেন, তথাপি এমন ব্যক্তিকে বিদআতি বলতেন না। হ্যাঁ, তার বক্তব্য থেকে বোঝা যায়—যেমনটা খাল্লাল বলেন—কেউ যদি এমন ব্যক্তিকে বিদআতি বলে, তার বিরোধিতাও করা হবে না।[৩] জাহাবি লিখেন, আলি রাজি.-কে উসমান রাজি.-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বললে সে বিদআতি বা রাফেজি হবে না।

---

১. ফাতহুল বারি, ইবনে হাজার (৭/১৬)।
২. ফাতহুল বারি, ইবনে হাজার (৭/১৬); মাজমুউল ফাতাওয়া (৪/৪২৬)।
৩. আস-সুন্নাহ, খাল্লাল (২/৩৮১)।

কারণ, অনেকে এমন কথা বলেছেন। তারা দুজনই সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। ইলম ও মর্যাদার ক্ষেত্রে দুজন কাছাকাছি। হতে পারে আখিরাতে তারা দুজন বরাবর থাকবেন। দুজনেই শহিদদের প্রথম সারিতে থাকবেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সালাফ উসমান রাজি.-কে আলি রাজি.-এর চেয়ে অগ্রে রাখেন; আমরাও তা-ই করি। এটা কোনো বড় বিষয় নয়। কিন্তু তাদের দুজনের চেয়ে আবু বকর ও উমর নিঃসন্দেহে উত্তম। এক্ষেত্রে যে বিরোধিতা করবে, সে চরমপন্থি রাফেজি গণ্য হবে।[১]

সুতরাং কেউ যদি আলি রাজি.-এর ভালোবাসায় তাকে উসমান রাজি.-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তবে সেটা নিন্দনীয় নয়। এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জন বরং নিন্দনীয়। এই বাড়াবাড়ি অনেক যুগে ছিল। যেমন: ইবরাহিম ইবনে আবদুল আজিজ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি উসমান ও আলি রাজি.-এর মাঝে সম্ভবত কে উত্তম সেটা বলতেন না; বরং এ ব্যাপারে নীরব থাকতেন। এ কারণে মানুষ তাকে রাফেজি বলে গালি দেয়। ইবনে হাজার বলেন, এটা সুস্পষ্ট জুলুম। কারণ, সালাফের কেউ কেউ এমন করেছেন।[২]

কিন্তু তিন খলিফাকে এড়িয়ে সারা দিন আলিকে নিয়ে পড়ে থাকা, আবু বকর ও উমরের নাম দায়সারাভাবে উচ্চারণ করে আলির নামের শুরুতে 'মাওলা' লাগানো, শেষে 'আলাইহিস সালাম' লাগানো, সারা দিন 'মাওলা আলি', 'আলি মাওলা' জপা আর 'ইয়া আলি' লেখা টুপি পরে ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি আহলে সুন্নাতের আকিদা ও রীতি নয়। এগুলো হচ্ছে দ্বীনের নামে বাড়াবাড়ি। এগুলো ভ্রান্ত শিয়া সম্প্রদায়ের আকিদা ও প্রথা, যারা কুরআন-সুন্নাহ ছুড়ে ফেলে তাদের প্রবৃত্তিকে দ্বীন বানিয়ে নিয়েছে। ফলে প্রবৃত্তি যা করতে বলে তা-ই করে, কুরআন-সুন্নাহ যা বলে তা নয়। কারণ, তাদের প্রকৃত ভালোবাসা যদি আল্লাহর রাসুল, তাঁর সাহাবি এবং পরিবারকেন্দ্রিক হতো, তবে প্রথম তিনজন বাদ দিয়ে চতুর্থ জনকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করত না; নবিপরিবারের সকল স্ত্রী ও অন্য কন্যাদের বাদ দিয়ে কেবল ফাতিমা ও হুসাইন রাজি.-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করত না। আমরা পিছনে বলে এসেছি, কোনো সাহাবিকে বিশেষভাবে ভালোবাসা নিষেধ নয়, কিন্তু বাড়াবাড়ি নিষেধ। আহলে সুন্নাতের চৌদ্দশো বছরের ইতিহাসে কেউ আলি রাজি., ফাতিমা ও হুসাইন রাজি.-কে নিয়ে এভাবে বাড়াবাড়ি করেনি যা শিয়ারা করেছে। দুঃখজনকভাবে এখন আহলে

১. সিয়ারু আলামিন নুবালা (১/৭৬)।
২. লিসানুল মিজান, ইবনে হাজার (১/৭৮)।

সুন্নাতের অনেকের মাঝেও তাদের নিয়ে বাড়াবাড়ি একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। আমরা কি তাদের শিয়া বলছি? না, এগুলোর কারণে তাদের শিয়া বলা যায় না। তবে এই বাড়াবাড়ির পরিণতি শিয়াদের ফাঁদে ফেঁসে যাওয়া। কেবল আলি কিংবা আহলে বাইত নয়, নবি-রাসুলকেন্দ্রিক বাড়াবাড়িও পরিত্যাজ্য।

প্রত্যেক মুমিনের জন্য আলি রাজি. এবং আহলে বাইতকে ভালোবাসা অপরিহার্য। তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা কুফর ও নিফাক। যে ব্যক্তি আলির নাম উচ্চারণ করে 'রাজিয়াল্লাহু আনহু' বলে, তাতেই তো স্পষ্ট যে, সে আলিকে ভালোবাসে। কিন্তু তাদের কাছে এটুকুতে হবে না; বরং আপনাকে মাওলা আলি জিকির করতে হবে, সকল সাহাবাকে এড়িয়ে কেবল ফাতিমা রাজি.-এর নামে পোস্টার সাঁটাতে হবে। ভুলেও তাঁর মা খাদিজা, তাঁর বোন রুকাইয়্যাহ, উম্মে কুলসুম-সহ নবিজির অন্যান্য স্ত্রী ও কন্যার কথা মুখে আনা হবে না। আবু বকর, উমর, উসমান, আয়েশা রাজি.-সহ সকল সাহাবার ব্যাপারে নীরব কিংবা দায়সারা ভূমিকা পালন করে বরং মুআবিয়া রাজি.-সহ অনেক সাহাবির প্রতি বিদ্বেষ রেখে নিরানব্বই ভাগ দাওয়াতি কার্যক্রম আলি ও আহলে বাইতকেন্দ্রিক করা আহলে সুন্নাতের মানহাজ নয়; এটা শিয়াদের ধর্ম।

এক শ্রেণির সুফি দাবিদারদের কাছে ইসলাম মানে কেবল ১২ই রবিউল আউয়াল। শিয়া এবং শিয়া-ঘেঁষা রেজাখানি-বেরেলভি ও বিদআতপন্থি লোকদের কাছেও ইসলাম মানেই আলি, ফাতিমা ও হাসান-হুসাইনের (রাজিয়াল্লাহু আনহুম) নাম জপা। 'ইয়া আলি', 'ইয়া হুসাইন'-এর জিকির করা। এর বাইরে দ্বীন বলতে আর কিছু নেই। এগুলো দ্বীনের সস্তা সংস্করণ। আহলে বাইতের নাম জপে পৃথিবীতে ইসলাম প্রচারিত হয়নি, আহলে বাইত-সহ সকল সাহাবার কুরবানি ও ত্যাগের মাধ্যমে হয়েছে।

নবি-পরিবারের ভালোবাসার নামে প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে, দ্বীনকে যাচ্ছেতাই ব্যাখ্যা করবে, আহলে সুন্নাতের লেভেল লাগিয়ে কথাবার্তা ও বিশ্বাসে পুরো শিয়াদের অনুসরণ করবে, অতঃপর তাদের বিদআতের বিরুদ্ধে বললেই আহলে-বাইতের শত্রু হয়ে যেতে হবে; আল্লাহর শপথ! কখনোই নয়। আহলে বাইতের ভালোবাসা আমাদের ঈমানের অঙ্গ; তবে সেই ভালোবাসা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে হতে হবে। শিয়া ও ভ্রান্ত সুফিদের বানানো প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানোর পথে নয়। তবে এটাও অনস্বীকার্য যে, শিয়াদের মুকাবিলা করতে গিয়ে আহলে বাইতের ভালোবাসার ক্ষেত্রে আমাদের সম্ভবত ত্রুটি রয়েছে। যদিও সেটা তিক্ত বাস্তবতা, পরিকল্পিত নয়। তবে আহলে বাইতের প্রতি সালাফের ভালোবাসা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। বরং ইমাম

শাফেয়ি রাহি.-এর আহলে বাইতের প্রতি অত্যধিক ভালোবাসার কারণে কেউ কেউ তার সমালোচনা করে এবং তাকে রাফেজি বানিয়ে দেয়। তখন তিনি তার বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি লিখেন, 'মুহাম্মাদের পরিবারকে ভালোবাসা যদি 'রাফেজি হওয়া' হয়, তবে গোটা জিন ও ইনসান সাক্ষী থাকুক, আমি রাফেজি।'[১] তাই শিয়াদের খণ্ডন করতে গিয়ে আহলে বাইতের প্রতি যেন বিন্দুপরিমাণ বিদ্বেষ বা দূরত্ব না এসে যায়, সে খেয়াল রাখতে হবে।

আহলে বাইতের ভালোবাসার নামে বাড়াবাড়ি শিয়াদের কীভাবে সাহাবা বিদ্বেষী বানিয়ে দিয়েছে এবং আহলে বাইতের ভালোবাসার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাতের ভারসাম্যপূর্ণ মানহাজ সামনে আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

সাহাবাবিদ্বেষ কুফর ও নিফাক: আহলে বাইতকে নিয়ে শিয়াদের অতিরঞ্জনের স্বাভাবিক ফলাফল ছিল রাসুলুল্লাহর অন্যান্য সাহাবির প্রতি বিদ্বেষ রাখা। এ কারণে শিয়াদের অসংখ্য সম্প্রদায় কয়েকজন সাহাবি বাদ দিয়ে বাকি সবাইকে কাফের মনে করে। অনেকে কাফের মনে না করলেও নিশ্চিতভাবে ফাসেক মনে করে। সাহাবাদের মাঝে নবিপরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যাদের রাজনীতিক জটিলতা ও বিভিন্ন কারণে মনোমালিন্য তৈরি হয়েছিল, সেসব সাহাবাকে তারা নিকৃষ্ট পর্যায়ের মুরতাদ মনে করে। এ কারণেই আহলে সুন্নাতের ইমামগণ সাহাবাবিদ্বেষকে কুফর ও নিফাক আখ্যা দিয়েছেন। এটা দ্বারা তারা খারেজি-নাসেবি-সহ অনেক সম্প্রদায় উদ্দেশ্য নিলেও মূলত শিয়ারাই প্রধান উদ্দেশ্য। তারাই আহলে বাইতের ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে অন্যান্য সাহাবার প্রতি বিদ্বেষ রাখে।

ইমাম তহাবি যেন এখানে ভ্রান্ত শিয়াদেরই খণ্ডন করেছেন। তার বক্তব্য দেখুন: **'আমরা রাসুলুল্লাহর সকল সাহাবাকে ভালোবাসি। কারও ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করি না। কারও থেকে নিজেদের মুক্ত ঘোষণা করি না। যারা তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে, তাদের মন্দ আলোচনা করে, আমরা তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখি। আমরা তাদের কেবল উত্তম পন্থায় স্মরণ করি। তাদের ভালোবাসাকে দ্বীন, ঈমান ও ইহসান আর তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখাকে কুফর, নিফাক ও সীমালঙ্ঘন মনে করি।'** ইমাম তহাবি রাহি. বেশ সচেতনভাবেই সাহাবাদের ভালোবাসার পরে কারও প্রতি ভালোবাসায় বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন, যা শিয়ারা আহলে বাইতের ক্ষেত্রে করে। এর পরই অন্য

১. দিওয়ানুশ শাফেয়ি (৭৩); হিলইয়াতুল আউলিয়া, আবু নুআইম (৯/১৫২)।

কোনো সাহাবি থেকে নিজেদের মুক্ত ঘোষণা করতে, তাদের মন্দ আলোচনা করতে এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখতে নিষেধ করেছেন, যা শিয়া মতবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। এর পর সাহাবাদের কেবল উত্তম পন্থায় স্মরণ করতে বলেছেন। এর অর্থ হলো, সাহাবাদের নিজেদের মাঝে যেসব মতবিরোধ ও দুর্ঘটনা ঘটেছে, আমরা সেগুলো আলোচনা করব না, বরং সেগুলো ভুলে থাকব। কারণ, সেগুলোর আলোচনা আমাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে ক্ষতি বৈ কোনো উপকার বয়ে আনবে না। তাই এক্ষেত্রে আহলে সুন্নাতের মানহাজ হলো সাহাবাদের কেবল উত্তমরূপে স্মরণ করা; অথচ শিয়াদের মানহাজ হলো সাহাবাদের সেসব দোষ খুঁড়ে বের করা এবং সেগুলোর মাধ্যমে সাহাবাবিদ্বেষকে হালাল বানানো। সর্বশেষে ইমাম বলেছেন, কেবল কিছু সাহাবার ভালোবাসার নাম করে অন্যান্য সাহাবার প্রতি বিদ্বেষ রাখা কুফর, নিফাক ও সীমালঙ্ঘন। এটাও শিয়াধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি; অথচ এটা রাসুলুল্লাহর আনীত দ্বীনের সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সাহাবাকে ভালোবাসতে ও তাদের কারও সমালোচনা করতে নিষেধ করেছেন। ভালোবাসার ক্ষেত্রে তারতম্য হতে পারে, যা আমরা পিছনে উল্লেখ করেছি; কিন্তু যখন অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির ফলে সেটা কারও ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন এবং কারও ক্ষেত্রে বিদ্বেষের পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, তখন বিচ্যুতি হিসেবে গণ্য হবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যখন আমার সাহাবাদের আলোচনা আসে, তখন (তাদের সমালোচনা থেকে) বিরত থাকো।’[১] আরেক হাদিসে বলেছেন, ‘আনসারদের কেবল মুমিনরাই ভালোবাসে, আর তাদের কেবল মুনাফিকরাই ঘৃণা করে। যে ব্যক্তি তাদের ভালোবাসবে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসবেন। যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে, আল্লাহ তার প্রতি বিদ্বেষ রাখবেন।’[২] অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি আমার সাহাবাদের গালি দেবে, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিশাপ।’[৩]

আনাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমাকে মনোনীত করেছেন। আর আমার সাহাবাদের মনোনীত করেছেন। তাদের আমার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ

---

১. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (১৪২৭, ১০৪৪৮)।
২. বুখারি (৩৭৮৩); মুসলিম (৭৫)।
৩. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩৩০৮৬); আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (১২৭০৯); বাজ্জার (৫৭৫৩)।

করেছেন এবং তাদের আমার সহযোগী করেছেন। শেষ যুগে এমন একটি সম্প্রদায় আসবে, যারা তাদের খাটো করবে। সাবধান! তোমরা তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হবে না। তাদের সঙ্গে নামাজ পড়বে না। তারা মারা গেলে তাদের জানাজা পড়বে না। তাদের উপর অভিসম্পাত।'[১]

আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা আমার সাহাবাদের গালি দিয়ো না। আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! যদি তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তবে তাদের এক মুষ্টি কিংবা অর্ধেক মুষ্টি সমান পুণ্যও লাভ করতে পারবে না।'[২] ইমাম নববি উক্ত অধ্যায়ের শিরোনাম লিখেছেন, 'সাহাবাদের গালি দেওয়া হারাম'।

আরেক হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সাবধান! আমি আমার সাহাবাদের ব্যাপারে তোমাদের সাবধান করছি। আমার পরে তাদের তোমরা (আক্রমণের) লক্ষ্যস্থল হিসেবে স্থির করো না। যে তাদের ভালোবাসবে, সে আমার ভালোবাসার কারণেই তাদের ভালোবাসবে; আর যে তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে, আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণেই সে তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে; আর যে তাদের কষ্ট দিলো, সে যেন আমাকে কষ্ট দিলো; আর যে আমাকে কষ্ট দিলো, সে যেন আল্লাহকে কষ্ট দিলো; আর যে আল্লাহ কষ্ট দেবে, আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন।'[৩]

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষের বিধান কী? এ ব্যাপারে ইমামগণ লম্বা আলোচনা করেছেন। আমরা এখানে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা তুলে ধরছি। প্রথমেই আমাদের একটা মূলিনীতি মনে রাখতে হবে। সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনার অনেকগুলো পর্যায় রয়েছে। সবগুলোর বিধান ভিন্ন ভিন্ন। সংক্ষেপে যাদি কয়েক লাইনে বলা হয়, তবে সেটার নির্যাস দাঁড়াবে এমন: **যদি কেউ কোনো বিশেষ সাহাবির প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে সমালোচনা করে, তবে সে ফাসেক, কাফের নয়; কিন্তু কেউ যদি সকল বা অধিকাংশ সাহাবিকে কাফের কিংবা ফাসেক মনে করে, অথবা কোনো সাহাবিকে সাহাবি হওয়ার কারণে গালি দেয়, কিংবা এমন বিষয়ে গালি দেয় যা কুরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক, তবে সে কাফের।**[৪]

---

১. আল-কিফায়াহ, খতিবে বাগদাদি (৪৮)। তবে হাদিসটির সনদের উপর আপত্তি রয়েছে।
২. বুখারি (৩৬৭৩); মুসলিম (২৫৪০); তিরমিজি (৩৮৬১); আবু দাউদ (৪৬৫৮)।
৩. তিরমিজি (৩৮৬২); ইবনে হিব্বান (৭২৫৬); মুসনাদে আহমদ (২০৮৭৯)।
৪. বিভিন্ন কিতাবে ইমামগণ এসব বিধান বর্ণনা করেছেন। দেখুন: কাজি ইয়াজের শিফা (২/২৮৬); ইবনে হাজামের আল-ফাসল (৩/১৪৩)।

সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ কুফর কেন? এক. সাহাবাগণ কুরআন সংরক্ষণ করে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। সাহাবাগণ সুন্নাহ সংরক্ষণ করে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। ফলে সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা মূলত কুরআন-সুন্নাহর প্রতি বিদ্বেষ রাখা; তাদের সন্দেহ করা মূলত কুরআন-সুন্নাহর মাঝে সন্দেহ করা। কারণ, তারাই কুরআন-সুন্নাহর ধারক-বাহক। তাদের প্রতি বিদ্বেষ রেখে কুরআন-সুন্নাহকে ভালোবাসা যায় না। **দুই.** তারা রাসুলুল্লাহর সঙ্গী, তাঁর মেহনত ও মুজাহাদার প্রথম ফল ও ফসল। ফলে তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা মূলত রাসুলুল্লাহ ও তাঁর দাওয়াতের প্রতি বিদ্বেষ রাখা। স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিন আনসারদের ভালোবাসে, কেবল মুনাফিক তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে।[১] **তিন.** কুরআন-সুন্নাহে সাহাবায়ে কেরামের সকলের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির ঘোষণা এসেছে। সুতরাং সকল সাহাবার প্রতি বিদ্বেষ রাখা মানে কুরআনের সেসব আয়াত এবং সেসব সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করা। আর এটা সুস্পষ্ট কুফর। **চার.** সাহাবাদের ত্যাগ, কুরবানি এবং কুরআন-সুন্নাহে তাদের এত প্রশংসা দেখার পরে কোনো মুমিন সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখতে পারে না। ফলে যে ব্যক্তি সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে, বোঝা যায়, সে মূলত ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ রাখে, রাসুলুল্লাহর প্রতি বিদ্বেষ রাখে। কিন্তু ইসলাম বা রাসুলুল্লাহর প্রতি বিদ্বেষ যেহেতু মুখে প্রকাশ করার সাহস পায় না, তাই সাহাবাদের সমালোচনা করে, যাতে স্বয়ং কুরআন-সুন্নাহর সমালোচনার পথ উন্মুক্ত হয়। কারণ, সাহাবায়ে কেরামের 'আদালত' নষ্ট হয়ে গেলে কুরআন-সুন্নাহ প্রশ্নবিদ্ধ হয়, ইসলামি শরিয়াহর ভিত ভেঙে যায়। আর এমন হলে তখন কুরআন-সুন্নাহ নিয়ে যা ইচ্ছা তা-ই বলা সম্ভব হয়। ফলে সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা একদিকে কুফর, অন্যদিকে নিফাক। কুফর কারণ সে মনে মনে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ রাখে। নিফাক এ জন্য যে, মুখে সেটা প্রকাশ করে না। এ জন্য ইমাম তহাবি সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষকে কুফর ও নিফাক দুটোই বলেছেন।

কেবল ইমাম তহাবি নয়, অনেক ইমামই তাদের শক্তভাবে খণ্ডন করেছেন। ইমাম আবু জরআ বলেন, 'যখন কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহর রাসুলের কোনো সাহাবির সমালোচনা করতে দেখবে, **তখন বুঝবে সে একটা জিন্দিক।** কারণ, আল্লাহর রাসুল আমাদের কাছে সত্য, কুরআন সত্য; কিন্তু তা আমাদের কাছে পৌঁছেছে সাহাবাদের মাধ্যমে। তারা আল্লাহর রাসুলের সাহাবাদের সমালোচনা করে মূলত কুরআন ও

---

১. বুখারি (৩৭৮৩); মুসলিম (৭৫)।

সুন্নাহকে বাতিল করার জন্য; অথচ সেসব সমালোচক অধিক সমালোচনার উপযুক্ত। তারা জিন্দিক।'[১] ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন, 'যদি কাউকে রাসুলের কোনো সাহাবির সমালোচনা করতে দেখো, তবে তার ইসলাম নিয়ে প্রশ্ন করার অধিকার আছে তোমার।'[২] খাল্লাল বর্ণনা করেন, ইমাম আহমদকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কেউ যদি আবু বকর, উমর, আয়েশা রাজি.-কে গালি দেয়, তার বিধান কী? তিনি বললেন, 'আমি তাকে মুসলিম মনে করি না।' ইমাম মালেকও বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নবিজির সাহাবাদের গালি দেয়, ইসলামে তার কোনো অংশ নেই।'[৩] কাজি ইয়াজ ইমাম মালেক থেকে বর্ণনা করেন, 'কেউ যদি আবু বকর, উমর, উসমান, মুআবিয়া, আমর ইবনুল আস প্রমুখকে **গোমরাহ ও কাফের মনে করে** গালি দেয়, তবে তাকে হত্যা করা হবে।'[৪]

ইমাম সুবকি বলেন, 'কেউ যদি সকল সাহাবিকে গালি দেয়, তবে সে নিঃসন্দেহে কাফের। আর যদি নির্ধারিত কাউকে সাহাবি হওয়ার কারণে গালি দেয়, তবে সেও কাফের। কেননা তার গালিটা রাসুলুল্লাহর গায়ে লাগবে। ইমাম তহাবির বক্তব্য 'সাহাবাবিদ্বেষ কুফর' এই আলোকেই বুঝতে হবে। কারণ, সকল সাহাবার প্রতি বিদ্বেষ নিঃসন্দেহে কুফর। তবে যদি বিশেষ কোনো সাহাবিকে ভিন্ন কোনো কারণে গালি দেয়, তবে ফাসেক হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু সোহবতের কারণে গালি দিলে কাফের বিবেচিত হবে। রাফেজিরা আবু বকর ও উমরকে গালি দেয়। তাদের ধারণা—শাইখাইন আলির উপর জুলুম করেছেন। ফলে তাদের নিয়ে ইমামদের মতবিরোধ রয়েছে। অনেকে তাদের কাফের বলেছেন, অনেকে ফাসেক বলেছেন। তবে সবার সম্মতিক্রমে তাদের পিছনে নামাজ জায়েজ হবে না।'[৫]

ফাতাওয়ায়ে আলমগিরিতে এসেছে: 'যদি কোনো রাফেজি আবু বকর ও উমর রাজি.-কে গালি দেয়, তাদের অভিশাপ দেয়, তবে সে কাফের। যদি আলি রাজি.-কে আবু বকরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তবে কাফের হবে না, কিন্তু বিদআতি হিসেবে গণ্য হবে। যদি আয়েশা রাজি.-কে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তবে সে কাফের...। তবে অন্য স্ত্রীদের এমন অপবাদ দিলে কাফের হবে না। যে ব্যক্তি আবু বকর সিদ্দিকের

১. আল-কিফায়াহ, খতিবে বাগদাদি (৪৯)।
২. শরহুস সুন্নাহ, লালাকায়ি (৭/১৩২৬)।
৩. আস-সুন্নাহ, খাল্লাল (৩/৪৯৩)।
৪. শিফা, কাজি ইয়াজ (২/৩০৮)।
৫. ফাতাওয়ায়ে সুবকি (২/৫৭৫-৫৭৬)।

খেলাফতকে অস্বীকার করবে, সে কাফের; কারও কারও মতে বিদআতি; কিন্তু বিশুদ্ধ মত হলো সে কাফের। একইভাবে উমরের খেলাফতকে অস্বীকার করলেও বিশুদ্ধ মতে কাফের। উসমান, আলি, তালহা, জুবাইর, আয়েশা রাজি.-কে কাফের বললে সেও কাফের...।'[১]

ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি ছাড়াও হানাফি মাজহাবের অনেক কিতাবে শাইখাইনকে গালি দেওয়া কুফর বলা হয়েছে। তবে এগুলো উন্মুক্তভাবে গৃহীত হবে না, বরং পূর্বের মূলনীতি অনুযায়ী গৃহীত হবে। অর্থাৎ আয়েশা রাজি.-কে ব্যভিচারের অপবাদ দিলে কাফের হওয়ার কারণ কুরআন অস্বীকার করা। আবু বকর ও উমর রাজি.-এর স্রেফ খেলাফত অস্বীকার করলে কিংবা তাদের স্বাভাবিকভাবে গালি দিলে কাফের হবে না। তবে যদি রাসুলুল্লাহর সাহাবি হওয়ায় তাদের গালিগালাজ হালাল মনে করে, তাদের সোহবতকে অস্বীকার করে, তবে কাফের হয়ে যাবে। একইভাবে আলি রাজি.-এর খেলাফতের দাবি করে কেবল তাদের খেলাফতকে অস্বীকার করলে কাফের হবে না। তবে যদি খেলাফত অস্বীকারের মধ্য দিয়ে তাদের জালেম বলা, গালিগালাজ করা এবং তাদের সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত তাজকিয়াকে অস্বীকার করা হয়, তবে সেটা কুফর। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবাদের কাফের বললে কাফের বলার কারণ কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধানকে অস্বীকার করা।[২]

মোট কথা, সাহাবাদের গালি দেওয়া (ফি নাফসিহি) কুফর নয়, বরং তাদের গালি যদি কুরআন-সুন্নাহ, ইসলামি শরিয়ার উসুল ও জরুরিয়্যাতে দ্বীনের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো বিষয়ের মাঝে ঢুকে যায়, তবে সেটা কুফর। এ জন্য ইমাম মালেক থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আবু বকর রাজি.-কে গালি দেবে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে। আর যে আয়েশা রাজি.-কে গালি দেবে তাকে হত্যা করা হবে। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, **কারণ যে আয়েশা রাজি.-কে অপবাদ দিলো, সে মূলত কুরআন অস্বীকার করল।**[৩]

মোট কথা, সাহাবাদের গালি দেওয়া এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখার বিধান বেশ জটিল ও শর্তসাপেক্ষ। পাইকারিভাবে কাফের-মুরতাদ বলার সুযোগ নেই; বরং অবস্থাভেদে ফাসেক, মুনাফিক, কাফের বলা হবে, যেসব অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য

---

১. ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি (২/২৬৪)।
২. এ সম্পর্কে দেখতে পারেন রদ্দুল মুহতার (৪/২৩৬-২৩৭)।
৩. শিফা, কাজি ইয়াজ (২/৩০৯)।

ফিকহ এবং বাসিরাহ দরকার। তাই ব্যক্তিবিশেষকে কাফের বলার ক্ষেত্রে, চাই সে কট্টর রাফেজি হোক, অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা চাই। সাধারণ মানুষের জন্য এগুলোতে জড়ানো বৈধ নয়, যেমনটা আমরা আগেও বলেছি। এগুলো বিজ্ঞ ফকিহদের কাজ। আমাদের ইমামগণ শিয়া-রাফেজিদের (বাতেনি নয়) সাধারণভাবে ভ্রান্ত বলেছেন, কাফের বলেননি।[১] তাদের মাঝে আবার নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিবর্গ এবং সাধারণ (মুকাল্লিদ) মানুষদের মাঝে বিধানগত পার্থক্য রয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের উচিত হবে শিয়াদের পাইকারিভাবে কাফের না বলা।

---

১. আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়িম (১৪৬)।

وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَوَّلاً لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، تَفْضِيلًا لَهُ وَتَقْدِيمًا عَلَى جَمِيعِ الأُمَّةِ. ثُمَّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ثُمَّ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ثُمَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالأَئِمَّةُ الْمُهْتَدُونَ.

আমরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে সর্বপ্রথম আবু বকর রাজি.-এর জন্য খেলাফত সাব্যস্ত করি। কারণ, তিনি গোটা উম্মাহর শ্রেষ্ঠ এবং অগ্রগামী। অতঃপর খেলাফত সাব্যস্ত করি উমর ইবনুল খাত্তাব রাজি., অতঃপর উসমান রাজি., অতঃপর আলি ইবনে আবি তালিব রাজি.-এর জন্য। তারা সুপথপ্রাপ্ত খলিফা, হিদায়াতপ্রাপ্ত শাসক।

ব্যাখ্যা

খুলাফায়ে রাশেদিনের শ্রেষ্ঠত্ব: খলিফা অর্থ স্থলাভিষিক্ত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরে যেসব সাহাবা মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের জন্য তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন, তাদের খুলাফায়ে রাশেদুন বা পথপ্রাপ্ত খলিফা বলা হয়। তারা হলেন: আবু বকর সিদ্দিক, উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনে আফফান এবং আলি ইবনে আবু তালিব রাজি.। তাদের শ্রেষ্ঠত্ব নাম ও কালের ধারাবাহিকতা অনুক্রমেই। তারা সকলে নবি-রাসুলদের পরে মুসলিম উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। মাত্র ত্রিশ বছরে তারা রাসুলুল্লাহর রেখে যাওয়া দ্বীনকে অর্ধ পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেন, মদিনার ছোট্ট রাষ্ট্রটিকে তৎকালীন বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করেন। নিষ্ঠা, তাকওয়া, ন্যায়-ইনসাফ, পরোপকারিতা, জনহিতৈষণা, রাষ্ট্রশৃঙ্খলা, জ্ঞানগত বিকাশ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি—মোট কথা, জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তারা পূর্ণাঙ্গতা ও শ্রেষ্ঠত্বের যে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন, তা মানব ইতিহাসে বিরল। ফলে ইসলামের চৌদ্দশো বছরের মাঝে আজও খেলাফতে রাশেদার ত্রিশ বছর সর্বশ্রেষ্ঠ সোনালি যুগ,

মুসলমানদের স্বপ্নের যুগ, অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় যুগ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক হাদিসে উক্ত যুগের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের মাঝে খেলাফত থাকবে ত্রিশ বছর; অতঃপর আসবে রাজতন্ত্র।'[১] আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, 'নবুওতের খেলাফত অব্যাহত থাকবে ত্রিশ বছর; অতঃপর আল্লাহ যাকে চান রাজত্ব দান করবেন।'[২]

ওফাতের আগে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেলাফতে রাশেদার আদর্শকে আঁকড়ে ধরার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। ইরবাজ ইবনে সারিয়া রাজি. বলেন, 'একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত গুরুগম্ভীর নসিহত পেশ করলেন। তাতে আমাদের হৃদয় গলে গেল, চোখ অশ্রুসিক্ত হলো। কেউ একজন বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি আমাদের বিদায়ি ব্যক্তির মতো নসিহত করেছেন। ফলে এখন আমাদের কিছু ওসিয়ত করুন। তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে। দায়িত্বশীল যদি একজন হাবশি দাসও হয়, তার আনুগত্য করবে। তোমরা আমার পরে প্রচণ্ড মতানৈক্য দেখতে পাবে। তাই আমার সুন্নাহ এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরো। দাঁতে কামড়ে সেগুলো ধরে রাখো। সকল সব-উদ্ভাবিত বিষয় থেকে সাবধান থাকো। কারণ, প্রত্যেকটা বিদআত গোমরাহি।'[৩] আরেক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার পরে তোমরা আবু বকর ও উমরের আনুগত্য করো।'[৪] সুতরাং খুলাফায়ে রাশেদিনের অনুসরণীয় হওয়া কুরআন-সুন্নাহ দ্বারাই প্রমাণিত। খুলাফায়ে রাশেদুন মূলত চারজন। মুহাক্কিক আলিমদের মতে, তাদের সঙ্গে হাসান ইবনে আবু তালিব রাজি.-এর স্বল্প সময়কালও খেলাফত হিসেবেই বিবেচিত হবে। ফলে তিনি পঞ্চম খলিফা। অতঃপর তিনি রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব সন্ধির ভিত্তিতে মুআবিয়া রাজি.-এর হাতে সঁপে দেন। এভাবে খেলাফতের সমাপ্তি ঘটে, রাজতন্ত্র শুরু হয়, যেমনটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। মুআবিয়া রাজি. ইসলামের প্রথম রাজা (ও খলিফা)। তিনি একজন বড় মাপের সাহাবি এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠ শাসকদের একজন। এটাও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন।[৫]

---

১. তিরমিজি (২২২৬)।
২. আবু দাউদ (৪৬৪৬)।
৩. ইবনে মাজা (৪২)।
৪. তিরমিজি (৩৬৬২); মুসনাদে হুমাইদি (৪৫৪); বাজ্জার (২৮২৭); হাকেম (৪৪৮১)।
৫. দারেমি (২১৪৬); তয়ালিসি (২২৫)।

চার খলিফার বিস্তারিত জীবনচরিতের আলোচনা এই গ্রন্থে অসম্ভব। তাদের ব্যাপারে বিস্তৃত পরিসরে জানতে আবদুস সাত্তার শাইখ লিখিত চার খলিফার জীবনী-সহ প্রাচীন ও সমকালীন অন্য লেখকদের গ্রন্থ দেখা যেতে পারে। এখানে আমরা একেবারে সংক্ষেপে কেবল তাদের পরিচয়টুকু তুলে ধরব।

আবু বকর সিদ্দিক রাজি. (মৃ. ১৩ হি.): আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বসম্মত আকিদা অনুযায়ী ইসলামের প্রথম খলিফা ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন আবু বকর রাজি.। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে প্রায় দুই বছরের ছোট ছিলেন, জীবনের শুরু থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাসুলুল্লাহর প্রাণপ্রিয় বন্ধু ছিলেন, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মাঝে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাঁর দাওয়াতে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের কমপক্ষে পাঁচজন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি রাসুলের সঙ্গে হিজরত করেছেন। [তাওবা: ৪০] সকল যুদ্ধে, সুখে ও দুঃখে তাঁর পাশে পরম বন্ধু হয়ে থেকেছেন।[১] তাঁর কন্যা আয়েশা রাজি.-কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করার মাধ্যমে তিনি রাসুলের শ্বশুর হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। রাসুলের জীবদ্দশায় ইমাম হয়ে নামাজ পড়িয়েছেন। বিভিন্ন ইঙ্গিতের মাধ্যমে রাসুলও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিয়েছেন।[২] এ জন্য রাসুলের ওফাতের পরে সাহাবাদের সর্বসম্মত পরামর্শক্রমে তিনি মুসলিম উম্মাহর খলিফা নিযুক্ত হন। প্রায় দুই বছর খেলাফতের দায়িত্ব পালন করে হিজরি ১৩ সনে স্বাভাবিকভাবে ওফাত লাভ করেন। ছিপছিপে গড়নের এই মানুষটি একদিকে দৃঢ় ঈমান, গভীর তাকওয়া, অসীম ইখলাস এবং বিনয়ের সমুদ্র ছিলেন, অপরদিকে মুরতাদ ও মিথ্যা নবুওতের দাবিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, ইরাক ও শামে ইসলামের বিজয়াভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে ছিলেন সাহসী ও দৃঢ়সংকল্প। রাসুলুল্লাহর পরে ইসলামকে সুসংহতকরণ, শক্তিশালী ইসলামি কল্যাণকর রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন, মুসলিম উম্মাহকে বিশ্বমঞ্চে একটি অপরাজেয় জাতি হিসেবে উপস্থাপন, আল্লাহর কুরআন সংকলন ইত্যাদি-সহ অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের কারণে আজও তিনি ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে আছেন। তাঁর দুই বছর কয়েক মাসের খেলাফত শত বছরের চেয়ে বেশি বরকতপূর্ণ ছিল।[৩]

---

১. বুখারি (৩৬৫৬); মুসলিম (২৩৮৩)।
২. বুখারি (৩৬৫৯, ৩৬৬২, ৩৯০৪); মুসলিম (২৩৮২, ২৩৮৪); তিরমিজি (৩৬৭৬)।
৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসির (৭/৩৮)।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাজি. (মৃ. ২৩ হি.): আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বসম্মত আকিদা অনুযায়ী ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে দ্বিতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন উমর ইবনুল খাত্তাব রাজি.। আবু বকর রাজি.-এর পরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।[১] তিনি রাসুলুল্লাহর প্রায় বারো বছরের ছোট ছিলেন। কুরাইশের হাতেগোনা সাহসী ও বীরপুরুষদের একজন তিনি। তাঁর ইসলামগ্রহণ ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য বিশাল অর্জন।[২] হিজরতের অনুমতি এলে হিজরত করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মেয়ে হাফসাকে বিবাহ করায় তিনি তাঁর শ্বশুর হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। আবু বকর রাজি.-এর যুগে তাঁর সর্বপ্রধান উপদেষ্টা ও সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। আবু বকর রাজি. মৃত্যুর সময় তাকে খলিফা নিযুক্ত করে যান। দশ বছর খেলাফত পরিচালনা করেন। ইসলামি রাষ্ট্রের বিস্তৃতি, ইরাক, খোরাসান, আজারবাইজান, মকরান, শাম, মিশর, লিবিয়া, রোম ও পারস্যের বড় বড় বিজয়াভিযান, ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি সংহতকরণ, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সংস্কার, সুশাসন, ন্যায়-ভিত্তিক বিচার-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন, ইসলামি আইন বাস্তবায়ন ও সুদৃঢ়করণ, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, আমির-উমারা ও রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের তদারকি, জ্ঞানের বিস্তার, প্রজাপালন, ইসলামি সমাজ ও সভ্যতার বিনির্মাণ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি গুণে উমর রাজি. চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। উমর রাজি. আমাদের বাইতুল মাকদিস বিজেতাও। অমুসলিমরাও উমরের এসব গুণে মুগ্ধ হয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে। ২৩ হিজরিতে এক অগ্নিপূজারীর ছুরিকাঘাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন যে, কোনো মুসলিমের হাত তার রক্তে রঞ্জিত হয়নি।[৩] রাফেজিদের কাছে উমর রাজি.-এর হত্যাকারী এই নিকৃষ্ট একজন আল্লাহর ওলি হিসেবে বরিত।

উসমান ইবনে আফফান রাজি. (মৃ. ৩৫ হি.): আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা অনুযায়ী ইসলামের তৃতীয় খলিফা ও রাসুলুল্লাহর পরে তৃতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন উসমান ইবনে আফফান রাজি.। তাঁকে জুন-নুরাইন বলা হয়; কারণ, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই কন্যা রুকাইয়্যা এবং তাঁর মৃত্যুর পরে

---

১. ইবনে হিব্বান (৬৮৮৫)।
২. মুসতাদরাকে হাকেম (৪৫১৩); আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (৮৮০৬)।
৩. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩৮২২৯); আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি (৫৭৯)।

উম্মে কুলসুমকে বিবাহ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। ইসলামের প্রথম দিনগুলোতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, হিজরত করেন, রাসুলুল্লাহর সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উমর রাজি.-এর শাহাদাতের পরে আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত শীর্ষস্থানীয় সাহাবাদের পরামর্শক্রমে তিনি মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফা নিযুক্ত হন। প্রায় বারো বছর খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। ইসলামি রাষ্ট্রের বিস্তৃতি, আর্মেনিয়া, খোরাসান, আফ্রিকা, সাইপ্রাস বিজয়, ইসলামি নৌবহন তৈরি, অর্থনৈতিক সংস্কার-সহ বিভিন্ন অবদানে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাঁর অন্যতম ঋণ হলো কুরআন সংকলন চূড়ান্তকরণ। উসমান রাজি. ছিলেন শীর্ষস্থানীয় ধনী সাহাবাদের একজন। আল্লাহ তার সম্পদকে ইসলামের কাজে ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এবং তাঁর চলে যাওয়ার পরে মুসলিম উম্মাহ উসমানের সম্পদ দিয়ে যারপরনাই উপকৃত হয়েছে; বরং ১৪০০ বছরের বেশি সময় ধরে উপকৃত হয়ে যাচ্ছে। আজও মদিনাতে উসমান রাজি.-এর হোটেল-সহ অন্যান্য সম্পদ রয়েছে, যেগুলোর আয় আল্লাহর বান্দাদের জন্য ব্যয় করা হয়। উসমান রাজি.-এর স্বভাব-প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত শান্ত, লাজুক, বিনয়ী ও ভদ্র। কিছু অসৎ লোক সেটার সুযোগ নেয়, রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে। ৩৫ হিজরিতে একদল বিভ্রান্ত বিদ্রোহী এই বিনয়ী, ন্যায়নিষ্ঠ, জনদরদি শাসককে জুলুমের মাধ্যমে শহিদ করে দেয়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগেই যা ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন।[১]

আলি ইবনে আবু তালিব রাজি. (মৃ. ৪০ হি.): আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বসম্মত আকিদা অনুযায়ী ইসলামের চতুর্থ খলিফা ও রাসুলুল্লাহর পরে চতুর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ আলি ইবনে আবু তালিব রাজি.; কিশোর হিসেবে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। ইসলাম গ্রহণের সময় তার বয়স ছিল দশ বছর। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই এবং তাঁর কলিজার টুকরা কন্যা ফাতিমার স্বামী, সাহসী বীরপুরুষ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন, হিজরত করেন, রাসুলুল্লাহর সঙ্গে অসংখ্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। তাকে বলেন, 'আলি, মুসার কাছে হারুন যেমন, আমার কাছে তুমি তেমন। তবে আমার পরে কোনো নবি নেই।'[২] উসমান রাজি.-এর শাহাদাতের পরে তিনি সর্বসম্মতভাবে মুসলিম জাহানের খলিফা নিযুক্ত হন। প্রায় পাঁচ বছর খেলাফত

---

১. মুসতাদরাকে হাকেম (৪৫৬৯); মুসনাদে আহমদ (২৪৮৯১)।

২. বুখারি (৩৭০৬); মুসলিম (২৪০৪)।

পরিচালনা করেন। উসমান রাজি.-এর শাহাদাতের মাধ্যমে মুসলিম জাহানে যে অস্থিরতার সূচনা হয়েছিল, আলি রাজি.-এর শাসনামলে তা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে এবং আরও বৃদ্ধি পায়। ফলাফলে সাহাবায়ে কেরামের নিজেদের মাঝে ভুল-বোঝাবুঝিকে কেন্দ্র করে একাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিদ্রোহী খারেজিদের বিরুদ্ধেও তিনি যুদ্ধ করে তাদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেন। চরম অস্থিরতাপূর্ণ সময়ে মুসলিম জাহানের দায়িত্ব নেওয়া সত্ত্বেও আলি রাজি. মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন। বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন, জেল ও পুলিশ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো-সহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্কার ও সমৃদ্ধি সাধন করেন। তা ছাড়া তিনি ছিলেন অত্যন্ত উঁচু মানের আলিম, ফকিহ ও কাজি (বিচারক)। ফলে কাজা, ফিকহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখেন। অবশেষে ৪০ হিজরিতে খারেজি ইবনে মুলজামের ছুরিকাঘাতে শাহাদাত বরণ করেন। নাসেবি খারেজিদের কাছে এই নিকৃষ্ট হত্যাকারী আল্লাহর ওলি হিসেবে বরিত।[১]

ইসলামের চার খলিফা মুসলিম উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। দ্বীনদারি, খোদাভীরুতা, আত্মশুদ্ধি, নিষ্ঠা, ন্যায্যতা, বিনয়, জুহদ ও দুনিয়াবিমুখতা, চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতা ও শোভা-সৌন্দর্য, ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ত্যাগ ও বিসর্জন ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে তারা এতটা উচ্চ পর্যায়ের ছিলেন, কিয়ামত পর্যন্ত কোনো সাধক সারা জীবন সাধনা করেও সেখানে পৌঁছতে পারবে না। রাসুলুল্লাহর পরে তারা সকল মানুষের সর্বোত্তম আদর্শ। শাসক হয়েও তাদের জীবন ছিল এতটাই আড়ম্বরহীন, যা পৃথিবীর মানুষ তাদের আগে কল্পনাও করতে পারেনি। তাদের প্রহরী ছিল না, রক্ষীবাহিনী ছিল না। তাদের কাছে পৌঁছতে কারও অনুমতি লাগত না। আর এ কারণেই তাদের চারজনের মাঝে তিনজনই বিভ্রান্ত লোকদের হাতে শহিদ হন। পৃথিবীর সকল মুসলিম কিয়ামত পর্যন্ত যত আমল করবে, সব আমল তাদের আমলনামায় যুক্ত হতে থাকবে। কারণ, মুসলিম উম্মাহর উপর তাদের ঋণ অপরিশোধ্য।

খেলাফত: ইতিহাস না বাস্তবতা? অনেকে মনে করেন, খেলাফত মুসলমানদের বাস্তব জীবনের ময়দান থেকে চিরতরে হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের একটি অংশমাত্র। ফলে ইতিহাসের বই থেকে এ সম্পর্কে কিছু জেনে নেওয়াই যথেষ্ট। অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ বিপরীত। খেলাফত ইতিহাসের বিষয় নয়, খেলাফত মুসলিম উম্মাহর আকিদা এবং তাদের জীবনের অনিবার্য বাস্তবতা। আর এ কারণেই সালাফের অধিকাংশ

১. তারিখে তাবারি (৫/১৪৩); আস-সিরাহ নববিয়্যাহ, ইবনে কাসির (২/৫৪৪)।

আকিদার বইয়েই খেলাফত সম্পর্কে আলোচনা থাকে। কিন্তু সময় যত গড়িয়েছে, মুসলিম উম্মাহর কাছে খেলাফতের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা তত কমেছে। দুঃখজনক বিষয় হলো, আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহর এতগুলো প্রাচীন ও সমকালীন ব্যাখ্যাগ্রন্থের মাঝে কোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থে খেলাফত নিয়ে কোনো আলোচনা অধমের চোখে পড়েনি। কেবল কারি মুহাম্মাদ তৈয়ব কিছু আলোচনা করেছেন। এর মাধ্যমেই উম্মাহর জীবনে খেলাফতের গুরুত্ব কতটা লঘু হয়ে গেছে সেটা অনুভব করা যায়। এ তো গেল আলিম-উলামাদের অবস্থা। আর সাধারণ মুসলমান তো খেলাফত কী তাও জানে না। যারা খানিকটা শিক্ষিত, তারা গণতন্ত্র, সেকুলারিজম, পুঁজিবাদ, সাম্যবাদ, প্রাচ্যবাদ-সহ ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমা মিডিয়ার অবিরাম প্রোপাগান্ডা ইত্যাদির ফলে খেলাফত-ফোবিয়ায় ভোগে, খেলাফতের বিরোধিতা করে। ইসলামে খেলাফতের স্বর্ণযুগকে ইউরোপীয় মধ্যযুগের অন্ধকারের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে। যারা খেলাফত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে, তাদের সন্ত্রাসী, জঙ্গি ও উগ্র ভাবে। অথচ তাদের খবর নেই খেলাফত তার ঈমান ও আকিদার অংশ, তাওহিদের অংশ, তাকে খলিফা হিসেবেই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। কারণ, পশ্চিম ও ইসলামের শত্রুরা তাদের তাওহিদ ভুলিয়ে দিতে পেরেছে। তাদের শেখাতে পেরেছে দ্বীন হলো যা তুমি ঘরে ও মসজিদে পালন করবে। জীবনের ময়দানের সঙ্গে দ্বীনের কোনো সম্পর্ক নেই। এভাবেই মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ সদস্য দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের একটা খণ্ডিত চিত্র ধারণ করে। ফলে নিজের অজান্তেই ইসলামের বিভিন্ন আকিদার বিরোধিতা করে। বর্তমান গ্রন্থে খেলাফত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। তাই আমরা সংক্ষেপে খেলাফত-সম্পর্কিত জরুরি কিছু কথা তুলে ধরছি।

খেলাফতের অপরিহার্যতা: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে গত শতাব্দের প্রথম ভাগ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর অভিভাবক ছিলেন খলিফা। মুসলমানরা খলিফার অধীনে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলাম বাস্তবায়ন করতেন। তাওহিদের গৌরব নিয়ে বিশ্বের সর্বত্র পতপত করে উড়ত খেলাফতের পতাকা। খলিফা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সুরক্ষা নিশ্চিত করতেন। ইসলামের শত্রুদের থেকে উম্মাহকে হিফাজত করতেন। কিন্তু আজ এক শতাব্দের বেশি সময় মুসলিম জাতি খেলাফতবিহীন। ফলে অভিভাবকহীন, রাষ্ট্রহীন, ঠিকানাবিহীন। বরং মুসলিম উম্মাহর আজকের অবস্থা দেখলে মনে হয় খেলাফতকে তারা চেনেই না, খেলাফত কখনও ছিলই না; কিংবা খেলাফত তাদের ইতিহাস ও অস্তিত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।

আজকের মুসলিমরা খেলাফত ভুলে গেলেও ইহুদি-খ্রিষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ, শিয়া-রাফেজি-সহ ইসলামের কোনো শত্রু সেটা ভোলেনি। ১৯৪৮ সালে ইহুদি কর্তৃক ফিলিস্তিন দখল, ১৯৬৭ সালে বাইতুল মাকদিস দখল, আফগানিস্তান-ইরাক-সিরিয়া-সহ বিভিন্ন ভূখণ্ডে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টানদের সামরিক আগ্রাসন—এগুলো সবই ক্রুসেড যুদ্ধ। একসময় সেগুলো খেলাফতের বিরুদ্ধে ছিল, আর এখন শতধাবিচ্ছিন্ন, বহুধাবিভক্ত খেলাফতহীন, খলিফাহীন, ইমামবিহীন ইয়াতিম মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে চলছে। কাশ্মীরে মুসলিমদের উপর হিন্দু আগ্রাসন, বাবরি মসজিদ ধ্বংস, মুসলমানদের ভারত থেকে বিতাড়ন, ভারতের ইতিহাস থেকে মুসলিম শাসকদের মুছে ফেলা—এই সবকিছু হিন্দুদের রামরাজ্যের মিশন বাস্তবায়ন। আরাকানে মুসলিম নিধন, রোহিঙ্গা মুসলিমদের সেখান থেকে বিতাড়ন, চীন কর্তৃক উইঘুরকে জীবন্ত জাহান্নামে পরিণতকরণ ক্রুসেডের বৌদ্ধ ও নাস্তিক্যবাদী ভার্শন। ইউরোপ তো ক্রুসেডার ফ্রান্সকে তাদের নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে রীতিমতো প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডে অবতীর্ণ হয়েছে। এভাবে গোটা দুনিয়াতে ইসলাম ও মুসলমানদের মুছে ফেলার কাজ চলছে। আর মুসলমানরা মুস্তাহাব, নফল, ধর্মীয় ও রাজনীতিক মতাদর্শ এবং ভৌগোলিক সীমানা নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও হানাহানিতে ব্যস্ত।

অথচ গোটা মুসলিম উম্মাহ এক পরিবার। আমেরিকা থেকে চীন পর্যন্ত, আফ্রিকা থেকে রাশিয়া পর্যন্ত গোটা দুনিয়ার মুসলিম ভাই ভাই। মুসলিমরা এক উম্মাহ—এক খেলাফত, এক ইমাম ও এক পতাকার উম্মাহ। যতদিন মুসলিমদের খেলাফত ছিল, ইমাম ছিল, পতাকা ছিল, মুসলমানদের গৌরব ছিল, পৃথিবীতে ইসলামের প্রভাব ছিল, আল্লাহর দুশমনের অন্তরে ইসলামের ভয় ছিল, সম্ভ্রম ছিল। আজ মুসলিমরা সংখ্যায় প্রায় দুইশো কোটির কাছাকাছি হওয়ার পরেও পৃথিবীর সবচেয়ে ইয়াতিম ও অসহায় জাতি। ইসলামের শত্রুরা তাদের মশা-মাছির মতো গোনায় ধরে না। খেলাফত ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর রক্ষাকবচ। ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইসলামকে জোড়াতালি দিয়ে রাখা যায়, কিন্তু ইসলাম ও মুসলিমদের স্বাভাবিক গৌরব, আল্লাহর দ্বীনের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ব্যক্তিগত উদ্যোগে নামাজ পড়া যায়, কিন্তু সর্বোচ্চ ও কাঙ্ক্ষিতরূপে কায়েম করা যায় না। ইসলাম প্রচার করা যায়, কিন্তু ইসলামকে গালেব ও জাহের করা যায় না।

অমুসলিমদের কাছে রাষ্ট্র ও জগৎ পরিচালনার কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি নেই। ফলে কখনও এরিস্টটল, কখনও প্লেটো, কখনও চাণক্য, কখনও লেলিন কিংবা কার্ল মার্ক্স,

কখনও টমাস মুর-সহ এমন অগণিত লোকের বানানো নীতিতে তাদের দুনিয়া চালাতে হয়। কখনও পুঁজিবাদ, কখনও সাম্যবাদ, কখনও গণতন্ত্র, কখনও রাজতন্ত্র, কখনও স্বৈরতন্ত্র, কখনও একনায়কতন্ত্র—এমন অসংখ্য তন্ত্রমন্ত্রের অংসলগ্ন জোড়াতালি সত্ত্বেও সচেতনতা, দূরদর্শিতা ও কূটকৌশলে তারা গোটা পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। বিপরীতে মুসলিমরা খেলাফতের মতো রব্বানি তথা আল্লাহ-প্রদত্ত, সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত, ভারসাম্যপূর্ণ, ন্যায় ও ইনসাফের মূর্ত প্রতীক, দ্বীন ও মনুষ্যত্বের সুরক্ষা-প্রাচীর, শতাব্দের পর শতাব্দ প্রয়োগকৃত ইসলামের স্বর্ণযুগের সেই শাসনব্যবস্থার মালিক হওয়া সত্ত্বেও ভেড়ার পালের মতো অমুসলিমদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে, অমুসলিমদের দাসানুদাস হয়ে জীবনযাপন করছে। এর চেয়ে দুঃখজনক বাস্তবতা আর নেই।

তাই মুসলমানদের জন্য খেলাফতের মতো একটি রব্বানি ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা ততটা প্রয়োজন, যতটা তাদের বেঁচে থাকতে অক্সিজেনের প্রয়োজন। নাম যা-ই দেওয়া হোক, কিন্তু তা যেন গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের এক প্লাটফর্মে এনে দাঁড় করায়। এক দাবি ও অভিন্ন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণে সবাইকে এক কাতারে নিয়ে আসে। প্রাচ্য ও পশ্চিমের সকল মুসলমান ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক, ভাষিক ও সাংস্কৃতিক শত বৈচিত্র্য নিয়েও যেন দ্বীন ও ঈমানের প্রশ্নে, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব, কল্যাণ ও সুরক্ষার প্রশ্নে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করতে সক্ষম হয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো ইমামের হাতে বাইয়াতবিহীন অবস্থায় মারা গেল, সে জাহেলি মৃত্যুবরণ করল।'[১] অপর হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি আমিরের আনুগত্য করল, সে যেন আমার আনুগত্য করল। আর যে আমিরের অবাধ্য হলো, সে আমার অবাধ্য হলো। ইমাম হচ্ছে ঢালস্বরূপ, যার পিছনে থেকে যুদ্ধ করা হয়, যার মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকা যায়...।'[২] যদি ইমামই না থাকে, তবে যুদ্ধ করবে কার পিছনে? কে উম্মাহর বুকের দিকে দুশমনের ধেয়ে আসা বুলেটের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়াবে? উসমান ইবনে আফফান থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তায়ালা অনেক সময় শাসকের মাধ্যমে মানুষকে যতটা সোজা করেন, কুরআন দিয়েও ততটা সোজা করেন না।[৩] যদি খলিফাই না

---

১. ইবনে হিব্বান (৪৫৭৩); হাকেম (৪০২); মুসনাদে আবু ইয়ালা (৭৩৭৫); বাজ্জার (৩৮১৭)।
২. বুখারি (২৯৫৭); মুসলিম (১৮৪১)।
৩. তারিখুল মাদিনাহ, ইবনে শাব্বাহ (৩/৯৮৮)।

থাকে, তবে কে মানুষকে ইসলামের আলোকে ঠিক করবে? আল্লাহ কুরআনের পাশাপাশি রাসুল পাঠিয়েছেন। রাসুল কুরআনের আইন বাস্তবায়ন করেছেন পৃথিবীতে। ফলে যতদিন কুরআন থাকবে, কুরআনের একজন বাস্তবায়নকারী লাগবে। কুরআন এবং সুলতান (খলিফা) দুটোই পাশাপাশি থাকতে হবে। একটা ছাড়া অপরটা অপূর্ণ থাকবে। যদি হালাল-হারাম প্রয়োগকারী খলিফাই না থাকে, তবে গিলাফবদ্ধ কুরআনে লিখিত হালাল-হারাম কে বাস্তবায়ন করবে? এ কারণে ইমাম নববি লিখেছেন, 'আলিমদের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী, সকল মুসলমানের উপর একজন খলিফা নিয়োগ দেওয়া ওয়াজিব। যুক্তি নয়, শরিয়তের মাধ্যমে এই ওয়াজিব প্রমাণিত।'[১] শাইখ কারি তৈয়ব লিখেন, 'সর্বাবস্থায় মুসলমানদের একজন ইমাম নিযুক্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে, যাতে মুসলিম উম্মাহ বিশৃঙ্খলার শিকার না হয়।'[২] আহমদ ইবনে হাম্বল বলতেন, 'মুসলমানদের একজন ইমাম না থাকা ফিতনা।'[৩] আজ মুসলিম উম্মাহর সকল ফিতনার উৎপত্তি তো এই ফিতনা থেকেই।

কারি তৈয়ব সাহেব আরও লিখেন, 'খেলাফত ইসলামের অন্যতম ভিত্তি, ইসলামের রাজনীতি ও সামাজিকতার খুঁটি। ইসলামে এর গুরুত্ব অপরিসীম। যতদিন খেলাফত থাকবে, ইসলামের প্রভাব ও প্রতিপত্তি থাকবে, ইসলাম সুরক্ষিত থাকবে, হক বিজয়ী থাকবে। যদি খেলাফত না থাকে, তবে যার যা মন চায় ইসলামের সঙ্গে তা-ই করবে। প্রতিহত করার কেউ থাকবে না। ...পৃথিবীতে খেলাফত না থাকলে মুসলিম উম্মাহ বিশৃঙ্খল থাকবে, ইসলামের পূর্ণাঙ্গতাও বাস্তবায়িত হবে না...। সুতরাং খেলাফত কায়েমের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু হতে পারে না।[৪]

যতদিন খেলাফত ছিল—যে রূপেই থাকুক—পৃথিবীতে ইসলামের মর্যাদা ছিল, মুসলমানদের ওজন ছিল। জায়নবাদীরা কুদস দখল করেছে উসমানি খেলাফতের লাশ মাড়িয়েই। উসমানি খেলাফত পৃথিবীর মানচিত্র থেকে বিলুপ্ত হওয়ার পরেই এ মানচিত্রে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, পশ্চিমাদের সেবাদাস হওয়া ছাড়া যাদের আর কোনো কাজ নেই। মুসলমানদের বুকের উপর দাঁড়িয়েছে কাঁটাতার। মুসলমানরা লিপ্ত হয়েছে এক আত্মঘাতী ও ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে, যা সেদিন পর্যন্ত দূর হবে না যেদিন তারা আবার এক ইমামের পিছনে ইকতিদা করবে।

---

১. শরহে মুসলিম, নববি (১২/২০৫)।
২. মাবানিল খিলাফাহ (১৫৯)।
৩. তাবাকাতুল হানাবিলাহ, ইবনে আবু ইয়ালা (১/৩১১)।
৪. কারি মুহাম্মাদ তৈয়ব (১৩৯-১৪০)।

وَإِنَّ العَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَبَشَّرَهُمْ بِالجَنَّةِ، نَشْهَدُ لَهُمْ بِالجَنَّةِ، عَلَى مَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَوْلُهُ الحَقُّ، وَهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَسَعْدٌ، وَسَعِيدٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ وَهُوَ أَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

দশজন সাহাবি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের নাম নিয়েছেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, তাঁর সুসংবাদের ভিত্তিতে আমরাও তাদের জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য দিই। কারণ তাঁর কথা সত্য। তারা হলেন: আবু বকর, উমর, উসমান, আলি, তালহা, জুবাইর, সাদ, সাইদ, আবদুর রহমান ইবনে আউফ এবং এই উম্মতের আমিন আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাজিয়াল্লাহু আনহুম)।

ব্যাখ্যা

আশারায়ে মুবাশশারার শ্রেষ্ঠত্ব: আশারায়ে মুবাশশারা শব্দের অর্থ হলো সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন। তারা সেই সৌভাগ্যবান দশজন মানুষ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে থেকেই যাদের জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। এমন বিরল সৌভাগ্য খুব কম মানুষের ভাগ্যেই জুটেছে। ইসলামের সাধারণ নিয়ম হলো নির্ধারিত কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে জান্নাত ও জাহান্নামের সাক্ষ্য না দেওয়া। কারণ, প্রত্যেকের শেষ পরিণতি ও ভিতরের খবর আল্লাহ ভালো জানেন। ফলে বাহ্যিক অবস্থার উপর পরকালের পরিণতি নাও হতে পারে। কিন্তু তারা এর ব্যতিক্রম। স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য দিয়েছেন। এ ব্যাপারে একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। আবদুর রহমান ইবনে আউফ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আবু বকর জান্নাতে, উমর জান্নাতে, উসমান জান্নাতে, আলি জান্নাতে, তালহা জান্নাতে, জুবাইর জান্নাতে, আবদুর রহমান ইবনে আউফ জান্নাতে, সাদ জান্নাতে, সাইদ জান্নাতে, আবু উবাইদা

ইবনুল জাররাহ জান্নাতে।'[১] আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা অনিবার্য সত্য। ফলে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ বিশ্বাস করে, উক্ত দশজন সাহাবি পরকালে সুনিশ্চিতভাবে জান্নাতি। আর এ কারণে তারা উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। ঘৃণ্য রাফেজিদের দুর্ভাগ্য যে, তারা উক্ত দশজনের মাঝে কেবল আলি রাজি. বাদে বাকি সবাইকে কাফের-ফাসেক মনে করে। যা-ই হোক, উপর্যুক্ত দশজনের চারজন খুলাফায়ে রাশিদুন। খলিফাদের আলোচনা পিছনে অতিক্রান্ত হয়েছে। এখানে বাকি ছয়জনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হচ্ছে:

তালহা বিন উবাইদুল্লাহ রাজি. (মৃ. ৩৬ হি.): জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবির একজন। ইসলামের একেবারে শুরুর দিকে আবু বকর রাজি.-এর দাওয়াতে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করেন, হিজরত করেন, আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে অধিকাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে গিয়ে কাফেরদের তিরের আঘাতে তার হাত প্যারালাইজড হয়ে যায় এবং আমৃত্যু তেমন থাকে। কাফেরদের আঘাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়ে গেলে তিনি তাঁর সামনে পিঠ পেতে দেন। রাসুল তার পিঠে আরোহণ করে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছান। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে বলেন, 'যার কোনো জীবিত শহিদ দেখতে মনে চায় সে যেন তালহাকে দেখে।'[২] তালহা রাজি. ছিলেন অঢেল সম্পদের অধিকারী, কিন্তু তিনি তা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য বিলিয়ে দেন। এ কারণে রাসুলুল্লাহ তার নাম রেখেছিলেন 'দাতা তালহা' (তালহা আল ফাইয়াজ, তালহা আল-জাওয়াদ)।[৩] উমর রাজি. ওফাতের সময় যখন শীর্ষস্থানীয় সাহাবাদের নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন, তিনি ছিলেন পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। উসমান রাজি.-এর শাহাদাতের পরে সৃষ্ট জটিলতায় তিনিও জড়িয়ে পড়েন এবং উসমান রাজি.-এর হত্যার বিচারের দাবিতে আলি রাজি.-এর সঙ্গে জামাল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। সেখানেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[৪]

জুবাইর ইবনুল আউয়াম রাজি. (মৃ. ৩৬ হি.): তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফাতো ভাই, প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। আলি

১. তিরমিজি (৩৭৪৭); আবু দাউদ উক্ত হাদিস সাইদ বিন জায়দ রাজি. থেকে বর্ণিনা করেন (৪৬৪৯); ইবনে মাজা (১৩৩)।
২. বুখারি (৩৭২৪); তিরমিজি (৩৭৩৯); ইবনে মাজা (১২৫); মুসনাদে আহমদ (১৪৩৪)।
৩. হাকেম (৫৬৫০); আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (১৯৭)।
৪. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসির (৭/২৭৩)।

রাজি.-এর মতো তিনিও কিশোর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে ইসলামের জন্য নির্যাতনের মুখোমুখি হন, কিন্তু সবর করেন।[১] প্রথমে হাবশায় হিজরত করেন, পরে দ্বিতীয়বার মদিনাতে হিজরত করেন। তিনি আসমা বিনতে আবু বকর রাজি.-এর স্বামী এবং আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাজি.-এর পিতা। আবদুল্লাহ বিন জুবাইর ছিলেন মদিনায় মুসলমানদের প্রথম সন্তান।[২] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুবাইর রাজি.-এর ব্যাপারে বলেছেন, 'প্রত্যেক নবির একজন হাওয়ারি (সাহায্যকারী বন্ধু) থাকে; আর আমার হাওয়ারি জুবাইর।'[৩] তিনি সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। রাসুলুল্লাহর সঙ্গে সকল জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। রাসুলুল্লাহর পরে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, ইয়ারমুকের যুদ্ধ, মিশর বিজয়-সহ বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি উমর রাজি.-এর উপদেষ্টা পরিষদের একজন। তালহা রাজি.-এর মতো তিনিও উসমানের রক্তের দাবিতে জামাল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের পরে কয়েকজন গাদ্দার তাকে পিছনের দিক থেকে আক্রমণ করে শহিদ করে দেয়।[৪]

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাজি. (মৃ. ৫৫ হি.): প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। তরুণ বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং কাফেরদের নির্যাতনের সম্মুখীন হন। সম্পর্কে তিনি রাসুলুল্লাহর (চাচাতো) মামা ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিয়ে গর্ব করে বলতেন, 'এই আমার মামা। কার এমন মামা আছে?'[৫] তিনি ছিলেন বীর যোদ্ধা। ইসলামে তিনিই প্রথম তির নিক্ষেপ করেন। রাসুলুল্লাহর সঙ্গে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তাঁর সুরক্ষা নিশ্চিত করতেন। উহুদ যুদ্ধের দিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উদ্বুদ্ধ করে বলেন, 'তুমি তির ছোড়ো। আমার পিতা-মাতা তোমার উপর কুরবান।'[৬] এমন বিরল সৌভাগ্য সাদ ছাড়া আর কেউ অর্জন করেননি। তার বীরত্ব ও নিষ্ঠা পরবর্তীকালে তাকে ইসলামের প্রথম সারির সমরাধিনায়কে পরিণত করে। রাসুলুল্লাহর পরে পারস্যদের বিরুদ্ধে বিখ্যাত কাদেসিয়্যার যুদ্ধে তিনি সর্বাধিনায়কের ভূমিকা পালন করেন, মাদায়েন ও ইরাক জয় করেন, পারস্যদের দম্ভ চুর্ণ-বিচুর্ণ করে দেন। উমর রাজি.-এর গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের তিনি ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। সাহাবাদের মাঝে সৃষ্ট জটিলতার সময় তিনি

---

১. হাকেম (৫৫৯৩); আল-মুজামুল কাবির; তাবারানি (২৩৯)।
২. বুখারি (৩৯০৯); মুসলিম (২১৪৬)।
৩. বুখারি (৩৭১৯); মুসলিম (২৪১৫)।
৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা (৩/৪৫)।
৫. তিরমিজি (৩৭৫২)।
৬. বুখারি (২৯০৫); মুসলিম (২৪১১)।

নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন। ৫৫ হিজরিতে ওফাত লাভ করেন।[১] রাসুলুল্লাহর দোয়ার বরকতে তিনি 'মুস্তাজাবুদ-দাওয়াহ' হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[২]

সাইদ বিন জায়দ রাজি. (মৃ. ৫১ হি.): প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবাদের একজন। তার পিতা জায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল জাহেলি যুগেও একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কখনও মূর্তিপূজা করেননি। ফলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে বলেছেন, 'তিনি একাই এক উম্মত হিসেবে পুনরুত্থিত হবেন।'[৩] সাইদ রাজি. ছিলেন উমর রাজি.-এর ভগিনীপতি। উমরের আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হিজরতের আদেশ এলে তিনি হিজরত করেন। রাসুলুল্লাহর সঙ্গে অধিকাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাসুলুল্লাহর পরেও জিহাদ অব্যাহত রাখেন। রোমানদের বিপক্ষে ইয়ারমুকের ময়দানে যুদ্ধ করেন এবং ঐতিহাসিক বীরত্ব প্রদর্শন করেন। শামের দামেশক অবরোধে অংশ নেন এবং বিজয় লাভ করেন। সাইদ বিন জায়দ রাজি. 'মুসতাজাবুদ দাওয়াহ' এবং দুনিয়াবিমুখ সাহাবি ছিলেন।[৪] ৫১ হিজরিতে তিনি ওফাত লাভ করেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাজি. তার জানাজা আদায় করেন।

আবদুর রহমান বিন আউফ রাজি. (মৃ. ৩২ হি.): প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। আবু বকর রাজি.-এর দাওয়াতে তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারুল আরকামে প্রবেশের আগেই ইসলামে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করেন। কাফেরদের নির্যাতনের মুখে জন্মভূমি ছেড়ে প্রথমে হাবশায় এবং পরে মদিনায় হিজরত করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধে তার পিছনে মুক্তাদি হয়ে ফজরের নামাজ পড়েন। আর এভাবে তিনি রাসুলের ইমাম হয়ে নামাজ আদায়ের বিরল সৌভাগ্য লাভ করেন।[৫] মদিনায় মুহাজির হিসেবে গেলে তখন দীনহীন নিঃস্ব ছিলেন, কিন্তু ব্যাবসায় মনোযোগী হন। আল্লাহ তার ব্যবসায় বরকত দেন। একসময় তিনি শীর্ষ ধনী সাহাবাদের মাঝে গণ্য হন। তিনি সেই সম্পদ ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ব্যয় করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও দুনিয়াত্যাগী ছিলেন। অধিক সম্পদের কারণে আখিরাত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় থাকতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং প্রথম যুগের সাহাবাদের অভাবের কথা মনে করে

---

১. হিলইয়াতুল আউলিয়া, আবু নুআইম (১/৯২)।
২. তিরমিজি (৩৭৫১); ইবনে হিব্বান (৬৯৯০)।
৩. সুনানে কুবরা, নাসায়ি (৮১৩১); বাজ্জার (১৩৩১)।
৪. মুসলিম (১৬১০)।
৫. আবু দাউদ (১৪৯)।

কাঁদতেন। আর এ কারণে ব্যয় করতেন অকাতরে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি তার পুরা সম্পদের অর্ধেক দান করে দেন। পরবর্তীকালেও এমন উন্মুক্ত দান অব্যাহত রাখেন। রাসুলুল্লাহর ওফাতের পরে তাঁর স্ত্রীদের জন্য ব্যয় করতেন। মৃত্যুর আগেও সকল বদরি সাহাবি, রাসুলুল্লাহর স্ত্রী-পরিবার সবাইকে মোটা অঙ্কের অর্থ প্রদান করেন। এত বদান্য হওয়ার পরেও তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন, 'ইয়া আল্লাহ, নফসের কৃপণতা থেকে আমাকে রক্ষা করুন।' তিনি ৩২ হিজরিতে উসমান রাজি.-এর খেলাফতের আমলে ইন্তেকাল করেন।[১]

আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাজি. (মৃ. ১৮): ইসলামের প্রথম সারির মুসলমানদের একজন, পবিত্র শাম-বিজেতা ইসলামের সাহসী সিপাহসালার। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই উম্মতের 'আমিন' (নির্ভরতা ও আস্থার প্রতীক) লকব দিয়েছেন।[২] আয়েশা রাজি.-এর বর্ণনা অনুযায়ী, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর ও উমরের পরে সকল মানুষের চেয়ে আবু উবাইদাকে বেশি ভালোবাসতেন।[৩] তিনি হাবশা ও মদিনা দুই হিজরতেই অংশ নিয়েছেন। বদর, উহুদ-সহ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। উহুদের যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গালে শিরস্ত্রাণ ভেঙে ঢুকে গেলে আবু উবাইদা রাজি. নিজের দাঁত দিয়ে তা টেনে বের করেন। এতে তাঁর সামনের দুটো দাঁত পড়ে গিয়েছিল। তার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম বলতেন, সম্মুখ-দন্তবিহীন আবু উবাইদার মতো এত সুন্দর মানুষ আর নেই![৪] খেলাফতে রাশেদার যুগে তিনি মুসলিম বাহিনীর সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং শাম ও ইরাকে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেছেন। তারই নেতৃত্বে মুসলিমরা দিমাশকে ইসলামের বিজয় নিশান উড়িয়েছে। পবিত্র বাইতুল মাকদিস বিজয়েও তার অবদান রয়েছে। এতকিছুর পরও তার জীবন ছিল নিতান্ত সাধারণ। উমর রাজি. একবার শামে তার ঘরে গিয়ে ঢাল-তলোয়ার ছাড়া কিছুই দেখতে পাননি। উমর রাজি. তাকে বললেন, কিছু জিনিস যদি রাখতেন? তিনি বললেন, আমার জন্য এগুলোই যথেষ্ট।[৫] ১৮ হিজরিতে শামে ছড়িয়ে-পড়া আমওয়াস মহামারিতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। এভাবে ইসলামের জন্য তিনি মদিনার পরিবর্তে আজও জর্দানের মাটিতে শুয়ে আছেন।

---

১. আল-ইসতিআব, ইবনে আবদুল বার (২/৮৪৬-৮৪৭); সিয়ারু আলামিন নুবালা (৩/৫৪-৬০)।
২. বুখারি (৩৭৪৪); মুসলিম (২৪১৯)।
৩. তিরমিজি (৩৬৫৭)।
৪. হাকেম (৫১৯৫); বাজ্জার (৬৩)।
৫. মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক (২০৬২৮)।

وَمَنْ أَحْسَنَ القَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَذُرِّيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ.

যে ব্যক্তি রাসুলের সাহাবি, তাঁর পবিত্র সহধর্মিনী এবং তাঁর নিষ্কলুষ সন্তানদের ক্ষেত্রে উত্তম কথা বলে, সে মুনাফিকি থেকে মুক্ত।

ব্যাখ্যা

সাহাবাগণ সত্যের মাপকাঠি: আমাদের দেশে আলিম-সমাজের মাঝে উক্ত কথাটি বেশ প্রচলিত। কিন্তু কথাটির মর্ম কী? এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ ও উম্মাহর ইমামদের মতামত কী?

'সত্যের মাপকাঠি' শব্দটি খুব সম্ভব উর্দু শব্দ 'মি'ইয়ারে হক'-এর বাংলা অনুবাদ। পাক-ভারতের উলামায়ে কেরাম সাহাবায়ে কেরামের শানে উক্ত শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাদের থেকে বাংলাদেশি উলামায়ে কেরাম গ্রহণ করেছেন। ফলে শব্দটি আরবিতে হুবহু পাওয়ার সুযোগ নেই। প্রশ্ন হয়, 'সাহাবায়ে কেরাম সত্যের মাপকাঠি' কথাটি কি তা হলে ভারতবর্ষের আলিমদের বানানো বস্তু?

কখনোই নয়; বরং উক্ত পরিভাষাটি যুগযুগ ধরে সালাফ ও খালাফের আলিমদের মাঝে ব্যবহৃত পরিভাষার উর্দু ও বাংলা অনুবাদ। আর সেই পরিভাষাটি হচ্ছে 'আদালত' বা 'আদালাতুস সাহাবাহ'। আদালত-এর সাধারণ বাংলা করলে অর্থ দাঁড়াবে ন্যায়, ন্যায্যতা ইত্যাদি। কিন্তু এই অর্থে 'আদালত' শব্দে যে গভীর মর্ম রয়েছে বাংলায় তা একেবারেই ফুটে ওঠে না। ইমাম গাজালি রাহি. 'আদালত'-এর লম্বা সংজ্ঞা লিখেছেন। সেটার নির্যাস অনেকটা এমন: দ্বীন ও চারিত্রিক বিশুদ্ধতা, যার বলে একজন মানুষ তাকওয়া ও আত্মমর্যাদার অধিকারী হয়, দ্বীন ও ব্যক্তিত্বের জন্য হানিকারক সকল মন্দ বিষয় থেকে দূরে থাকে।[১] ইবনে হাজার আসকালানি বলেন, এটা এমন

---

১. আল-মুসতাসফা, গাজালি (১২৫)।

এক বৈশিষ্ট্য যার মাধ্যমে মানুষ তাকওয়া ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়; শিরক, ফিসক ও বিদআত-সহ সকল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে।[১] সুয়ুতি রাহি. এর সংজ্ঞায় বলেন, আদালত মানে কেবল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা নয়, বরং এমন এক আধ্যাত্মিক শক্তি যার বলে একজন মানুষ কেবল গুনাহ নয়, বরং চারিত্রিক স্খলন ও বিচ্যুতি, ব্যক্তিত্বের জন্য হানিকর সকল বিষয় থেকে বেঁচে থাকে।[২]

উপরের সবগুলো সংজ্ঞা একত্র করলে সেটাকে কখনোই 'আদালত'-এর বাংলা অর্থ 'ন্যায়' বা 'ন্যায্যতা' দিয়ে অনুবাদ করা যাবে না। কারণ, এই সবগুলো অর্থ দিয়ে এমন একজন মানুষ বোঝানো হয়, যাকে আমাদের পরিভাষায় কখনো কখনো ইনসানে কামেল বলা হয়; অন্য কথায়, যিনি শরিয়তের সম্পূর্ণ পাবন্দ হবেন, সব ধরনের গুনাহ ও চারিত্রিক স্খলন থেকে বেঁচে থাকবেন, কুরআন-সুন্নাহর জীবন্ত উদাহরণ এবং সাধারণ মুমিনদের আদর্শ হবেন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি মুসলিম-সমাজের প্রত্যেকের অনুসরণীয় হবেন। অর্থাৎ একজন আদর্শ মানব। ফলে সাহাবাদের ক্ষেত্রে যখন 'আদালত' শব্দটা ব্যবহার করা হয়, তখন বাংলাতে এর সর্বাধিক যথাযথ অনুবাদ 'হকের কষ্টিপাথর' বা 'সত্যের মাপকাঠি'ই হয়। কারণ, উম্মাহর ইমামদের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী, সাধারণভাবে সকল সাহাবি সব ধরনের কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেন, সগিরা গুনাহের উপর অবিচল থাকেন না, চারিত্রিক স্খলনের শিকার হন না। হ্যাঁ, তারা নবি-রাসুলের মতো নিষ্পাপ নন, ফলে তারা কবিরা-সগিরা গুনাহ করে ফেলেন। কিন্তু তারা গুনাহ করে ফেললে দ্রুততম সময়ে তাওবা করে আগের চেয়েও আল্লাহর কাছাকাছি চলে যান। ফলে সেই সময়টুকু ও সেই ব্যতিক্রম কাজটুকু ছাড়া সামগ্রিকভাবে সাহাবাদের প্রত্যেকেই সকল মুমিনের জন্য অনুসরণীয়। যেমন: কোনো সাহাবি ব্যভিচার করে ফেলেছিলেন, ফলে সেই সময়ে তিনি আদর্শ নন। কোনো সাহাবি মদ পান করে ফেলেছিলেন, এক্ষেত্রে তিনি অনুসরণীয় নন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে সাহাবাদের নিজেদের মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়, এক্ষেত্রেও তারা অনুসরণীয় নন। অর্থাৎ মুসলমানরা নিজেরা যুদ্ধ করে বলবে না যে, সাহাবাদের অনুসরণ করছি। তবে যুদ্ধ লেগে গেলে সেক্ষেত্রে যুদ্ধের নীতি-নৈতিকতা ও শান্তি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সাহাবাগণ আদর্শ হবেন।

---

১. নুজহাতুন নাজার, ইবনে হাজার (৬৯)।
২. আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, সুয়ুতি (৩৮৪)।

এটা হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে, বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং এগুলো একেবারেই ব্যতিক্রম ও বিরল ঘটনা। সামগ্রিকভাবে সকল সাহাবি সর্বোতভাবে সত্যের মাপকাঠি; **বরং একমাত্র তারাই হকের কষ্টিপাথর। তারা যেটাকে হক বলবেন সেটাই হক, তারা যেটাকে বাতিল বলবেন সেটাই বাতিল। কুরআন-সুন্নাহও তাদের বুঝমতো বুঝতে হবে। কেউ যদি কুরআন-সুন্নাহর এমন ব্যাখ্যা করে যা সাহাবাগণ করেননি, তবে তার কুরআন-সুন্নাহর এই ব্যাখ্যাও পরিত্যাজ্য।**

স্বয়ং কুরআনের একাধিক জায়গায় সাহাবাদের 'শ্রেষ্ঠ উম্মত' [আল ইমরান: ১১০] ও 'মধ্যপন্থি উম্মত' [বাকারা: ১৪৩] হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 'হকের মানদণ্ড' ধরে তাদের ঈমানের মতো ঈমান আনতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ

অর্থ: 'অন্যান্য মানুষ যেভাবে ঈমান এনেছে, তোমরাও সেভাবে ঈমান আনো।' [বাকারা: ১৩] এখানে 'মানুষ' বলতে সাহাবায়ে কেরাম উদ্দেশ্য। সাহাবাদের ঈমানকে আদর্শ ঈমানের কষ্টিপাথর সাব্যস্ত করে এটাকেই হিদায়াতপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিয়ে আল্লাহ বলেন,

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا

অর্থ: 'অতএব, তারা যদি ঈমান আনে তোমাদের ঈমান আনার মতো, তবে তারা সুপথ পাবে।' [বাকারা: ১৩৭] স্রেফ এটুকু নয়, বরং সাহাবাদের মত ও পথের বিরোধিতাকে বিচ্যুতি ও পরকালে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.

অর্থ: 'যে ব্যক্তি রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মুসলমানদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ওই দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব; আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থল।' [নিসা: ১১৫]

এসব নসের কারণেই মুসলিম উম্মাহর সকল আলেম সাহাবাদের 'আদালত' (সত্যনিষ্ঠা)-এর ব্যাপারে একমত। আহলে সুন্নাতের সকলের সর্বসম্মতিক্রমে

সাহাবাগণ সত্যের মাপকাঠি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজি. বলেছেন, 'সাহাবাগণ যেটাকে ভালো মনে করেন, আল্লাহর কাছে সেটাই ভালো; তারা যেটাকে মন্দ মনে করেন, আল্লাহর কাছে সেটাই মন্দ।'[১] আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাজি. বলেছেন, 'যদি কেউ কারও অনুসরণ করতে চায়, তবে যেন মৃতদের (সাহাবাদের) অনুসরণ করে। তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি, এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সবচেয়ে পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী, সর্বাপেক্ষা গভীর জ্ঞানের অধিকারী, লৌকিকতা থেকে সবার চেয়ে দূরে। তারা এমন এক সম্প্রদায় আল্লাহ তায়ালা যাদের তাঁর নবির সোহবতের জন্য এবং তাঁর দ্বীনের সুরক্ষা ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মনোনীত করেছেন। **সুতরাং তোমরা তাদের চরিত্রে চরিত্রবান হও। তাদের পথে অবিচল থাকো।** কাবার রবের শপথ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।'[২]

ইমাম ইবনে আবু হাতেম রাহি. লিখেন, 'আল্লাহর রাসুলের সাহাবাগণ তাঁর উপর ওহি ও কুরআন অবতীর্ণ হতে দেখেছেন। তারা কুরআনের তাফসির এবং তাবিল জেনেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের তাঁর নবির উম্মতের মধ্য থেকে সোহবত ও নুসরতের জন্য মনোনীত করেছেন, তাঁর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও সত্যকে বিজয়ের জন্য নির্বাচন করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের রাসুলুল্লাহর সঙ্গী হিসেবে পছন্দ করেছেন, তাদের আমাদের জন্য আদর্শ বানিয়েছেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে যা জানিয়েছেন তারা সেগুলো আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তারা দ্বীন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানতেন, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ এবং তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত ছিলেন। কারণ, তারা আল্লাহর রাসুলকে সেগুলোর উপর আমল করতে দেখেছেন, কুরআনকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে দেখেছেন। ফলে তারা সেভাবেই সেগুলোকে গ্রহণ করেছেন এবং আমলে পরিণত করেছেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্মানিত করেছেন এবং পরবর্তী সকলের জন্য আদর্শ বানিয়েছেন। তাদের তিনি সন্দেহ, মিথ্যা, ভুল, পারস্পরিক সমালোচনা ইত্যাদি থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাদের এই উম্মাহর সর্বোচ্চ ন্যায়নিষ্ঠ প্রজন্ম হিসেবে অভিহিত করেছেন। [বাকারা: ১৪৩] আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী

---

১. মুসনাদে আহমদ (১২৮৩); তয়ালিসি (২৪৩); বাজ্জার (১৭০১); আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (৮৫৮৩)।
২. হিলইয়াতুল আউলিয়া, আবু নুআইম (১/৩০৫)।

লোকদের তাদের অনুসরণ করতে, তাদের পথে চলতে এবং তাদের হিদায়াতকে আঁকড়ে ধরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।' [নিসা: ১১৫][১]

ইবনে আবদুল বার লিখেন, 'সাহাবায়ে কেরামের প্রজন্ম সর্বোত্তম প্রজন্ম। তারা এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষ, যাদের মানুষের কল্যাণের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রশংসার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে সকল সাহাবা ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যের মাপকাঠি (উদুল)। কারণ, কুরআনে আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থেকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। আর আল্লাহ তাঁর রাসুলের সোহবত ও নুসরতের জন্য যাদের মনোনীত করেছেন, তাদের জন্য এরচেয়ে উত্তম চারিত্রিক সনদ দরকার হয় না। আল্লাহ যাদের প্রশংসা করেছেন, তাদের আর কোনো প্রশংসা লাগে না। আল্লাহ বলেন,

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ.

অর্থ: 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদের রুকু ও সিজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন।' [ফাতহ: ২৯] সুতরাং এগুলো হচ্ছে সেসব সাহাবার বৈশিষ্ট্য যারা আল্লাহর রাসুলকে সত্যায়ন করেছেন, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন, তাঁকে সাহায্য করেছেন, তাঁর সান্নিধ্যে থেকেছেন।'[২]

সাহাবাদের সমালোচনা নিষিদ্ধ: সাহাবাদের ভালোবাসা প্রত্যেক মুমিনের উপর ওয়াজিব। আর সাহাবাদের ভালোবাসার গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হচ্ছে তাদের কেবল উত্তম দিকগুলো আলোচনা করা; তাদের মাঝে যেসব বিবাদ, বিভেদ ও লড়াই হয়েছে, সেসব ব্যাপারে নীরব থাকা। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বসম্মত মতামত।

সাহাবায়ে কেরামের মাঝে জটিলতা দেখা দিয়েছে, বিভিন্ন কারণে মতভেদ তৈরি হয়েছে। এমনকি তাদের মতভেদ যুদ্ধ পর্যন্ত গড়িয়েছে। কিন্তু সেগুলো তারা দুনিয়ার জন্য করেননি, প্রবৃত্তির অনুসরণে করেননি; ভুল বোঝাবুঝির কারণে হয়েছে।

---

১. আল-জারহ ওয়াত তাদিল, ইবনে আবি হাতেম (১/৭)।
২. আল-ইসতিআব, ইবনে আবদুল বার (১/২)।

উম্মাহর সকল ইমামের মতে প্রত্যেক মুসলিমের উপর সেসব ঘটনা নিয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব এবং সাহাবায়ে কেরামকে পরম সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করা আবশ্যক। কারণ, সেসব দুর্ঘটনা তাদের সম্মানকে মোটেও খাটো করে না, আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা কমায় না। সেগুলো সত্ত্বেও তারা উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। সেগুলোর মাঝে একমাত্র সে-ই পড়ে থাকে, আল্লাহ যাকে কপালপোড়াদের তালিকায় স্থান দিয়েছেন। এ কারণেই ইমাম তহাবি লিখেছেন, **'আমরা তাদের কেবল উত্তম পন্থায় স্মরণ করি।'**

ইবনে আব্বাস রাজি. বলেন, 'তোমরা রাসুলের সাহাবাদের গালি দিয়ো না; কারণ আল্লাহ আমাদের তাদের জন্য ইসতিগফারের নির্দেশ দিয়েছেন, অথচ তিনি জানতেন যে, তারা নিজেরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।'[১] আল্লাহ কুরআনে বলেন,

وَ الَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ: "আর যারা তাদের পরে আগমন করেছে, তারা বলে, 'হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের এবং ভ্রাতাদের যারা আমাদের অগ্রে ঈমান এনেছে, ক্ষমা করুন। আর ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়'।" [হাশর: ১০]

তাবেয়ি মুহাম্মাদ বিন কাব আল-কুরাজিকে (১০৮ হি.) একবার সাহাবাদের মাঝে সংঘটিত বিবাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, আর তাদের সকলের জন্য তাঁর কিতাবে জান্নাত ওয়াজিব করেছেন। কেউ বলল, আল্লাহ কোথায় তাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন? তিনি তাকে বললেন, সুবহানাল্লাহ! তুমি কি এই আয়াত কখনো পড়োনি?

وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

অর্থ: 'আর মুহাজির ও আনসারদের মাঝে যারা ইসলামে প্রথম ও অগ্রসর, আর যারা তাদের সত্যের সঙ্গে অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন

---

১. শরহুস সুন্নাহ, লালাকায়ি (৭/১৩১৮)।

এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হলো সবচেয়ে বড় সাফল্য।' [তাওবা: ১০০] আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন, আর তাদের অনুসারীদের জান্নাতের শর্ত করেছেন 'সত্যের সঙ্গে অনুসরণ'। সুতরাং তাবেয়িদের কর্তব্য হলো সাহাবাদের ভালো কাজে তাদের অনুসরণ, **আর যেসব বিষয়ে তাদের মাঝে জটিলতা তৈরি হয়েছে, সেগুলোর অনুসরণ থেকে বিরত থাকা। তাদের ভালোটা আলোচনা করা, তাদের সমালোচনা থেকে বিরত থাকা।**[১]

বাকিল্লানি (৪০৩ হি.) লিখেন, 'সাহাবায়ে কেরামের মাঝে যা ঘটেছে, আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকব। তাদের সকলের জন্য দোয়া করব, সবার প্রশংসা করব, সবার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি, ক্ষমা, সাফল্য ও জান্নাত চাইব। আমরা বিশ্বাস করি, আলি রাজি. যা করেছেন সঠিক করেছেন। ফলে তিনি দুটি পুণ্য পাবেন। আর যারা তার বিপক্ষে ছিলেন, তারাও ইজতিহাদ করেছেন। ফলে তারা ইজতিহাদের জন্য একটি পুণ্য পাবেন। তাদের কাউকে ফাসেক কিংবা বিদআতি বলা যাবে না।'[২]

ইবনুস সালাহ (৬৪৩ হি.) লিখেন, 'সকল সাহাবির একটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর তা হলো, তাদের কারও আদালত (সততা ও সত্যের উপর অবিচলতা) নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না। এটা তাদের ব্যাপারে একটি মীমাংসিত সিদ্ধান্ত। কারণ, তারা কুরআন, সুন্নাহ ও গোটা উম্মাহর ইজমার দ্বারা সত্যের মানদণ্ড হিসেবে প্রমাণিত...। সকল সাহাবির ব্যাপারে উক্ত মূলনীতি প্রযোজ্য। এমনকি যেসব সাহাবি পরবর্তীকালে বিভিন্ন জটিলতায় পড়েছেন (অর্থাৎ পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িয়ে গিয়েছেন), **তারাও উম্মাহর গ্রহণযোগ্য সকল আলিমের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।** কারণ তারা রাসুলের সাহাবি। উম্মাহর জন্য তারা যা করেছেন, তাতে তারা এটুকু পাওয়ার যোগ্য। সম্ভবত আল্লাহই চেয়েছেন মুসলিম উম্মাহ এই বিষয়ে একমত হোক।'[৩]

ইমাম নববি (৬৭৪ হি.) লিখেন, 'রাসুলের সাহাবাগণ গোটা উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তাদের পরে যারা আসবে, সবার চেয়ে উত্তম। তাদের সবাই উদুল (সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত)। তারা আদর্শ।'[৪] ইমাম নববি অন্যত্র লিখেন, 'আলি ও মুআবিয়া রাজি.-

---

১. আত-তাফসিরুল কাবির, রাজি (১৬/১২৯)।
২. আল-ইনসাফ, বাকিল্লানি (২২)।
৩. মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ (২৯৫)।
৪. শরহে মুসলিম, নববি (১২/২১৬)।

এর মাঝে যে দ্বন্দ্ব হয়েছিল, সেখানে আলি রাজি.-এর খেলাফত ছিল বিশুদ্ধ। অপরদিকে মুআবিয়াও আদেল (সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত) সম্মানিত ও মর্যাদাময় সাহাবি। তাদের মাঝে যে যুদ্ধ হয়েছে, সেটা বিভিন্ন সন্দেহ-সংশয়ের ফলে হয়েছে। এমন বিষয়ে ইজতিহাদের কারণে হয়েছে যেখানে ইজতিহাদ বৈধ। ফলে সেখানে তাদের ব্যাখ্যা ছিল, উজর ছিল। তাই তারা সকলেই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এসবের কারণে তাদের এই সত্যপন্থা (আদালত) বিনষ্ট হবে না। ...তারা সকলে মাজুর (রাজিয়াল্লাহু আনহুম)। এ কারণে আহলে সুন্নাতের নির্ভরযোগ্য ইমামদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই দ্বন্দ্বের পরও তাদের সবার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, তাদের বর্ণনা গৃহীত এবং তারা পূর্ণ সত্য ও আদালতের উপর প্রতিষ্ঠিত।'[১]

ইবনে কাসির (৭৭৪ হি.) লিখেন, 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কাছে সকল সাহাবি উদুল (সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত)। কারণ, আল্লাহ কুরআনে তাদের প্রশংসা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের চরিত্র ও কর্মের প্রশংসা করেছেন। তারা রাসুলুল্লাহর সামনে তাদের জানমাল সবকিছু সঁপে দিয়েছেন। ...আর তাদের মাঝে যা হয়েছে, কিছু ছিল অনিচ্ছাকৃত, যেমন জামালের দিন যা হয়েছে। আর কিছু ছিল ইজতিহাদকৃত, যেমন সিফফিনের দিন যা হয়েছে। আর ইজতিহাদের মাঝে ভুলশুদ্ধ দুটোই হয়। যদি ঠিক হয়, তবে তার জন্য দুটি পুণ্য; আর যদি ভুল হয়, তবে তিনি মাজুর এবং তার জন্য একটি পুণ্য। আলি ও মুআবিয়া রাজি.-এর মাঝে আলি রাজি. এবং তাঁর সঙ্গীগণ মুআবিয়া রাজি.-এর তুলনায় হকের অধিক নিকটবর্তী ছিলেন।'[২]

তাই আহলে সুন্নাতের সকল ইমামের সর্বসম্মতিক্রমে সাহাবা-পরবর্তী তথা তাবেয়িদের যুগ থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুসলিমের জন্য সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ঘটে যাওয়া যুদ্ধ-বিগ্রহে নাক গলানো নিষিদ্ধ।

একটি সংশয় নিরসন: প্রশ্ন হতে পারে, কেন সাহাবাদের মাঝে ঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দ্বন্দ্বের আলোচনা থেকে বিরত থাকতে হবে? এটা কি তাদের দোষ লুকানো নয়? তারা নিজেরা যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে পেরেছেন, আমাদের একটু আলোচনা করলে দোষ কী? এটাকে কেন নিষেধ করা হয়?

স্রেফ লুকানোর জন্য কখনোই নয়। কারণ, ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে এগুলো লিপিবদ্ধ। যেসব ইতিহাসের গ্রন্থে এগুলো সংরক্ষিত করা হয়েছে, সেগুলো আসমান

---

১. শরহে মুসলিম, নববি (১৫/১৪৯)।
২. আল-বায়িসুল হাসিস, ইবনে কাসির (১৮১-১৮২)।

থেকে অবতীর্ণ হয়নি, ইহুদি-খ্রিষ্টান কিংবা ইসলামের শত্রুরা লিখেনি; বরং আমাদের ইমামগণই লিখেছেন। যদি স্রেফ লুকানোই উদ্দেশ্য হতো, তবে তারা সেগুলো কখনোই লিখতেন না। আর তারা না লিখলে আজ আমাদের সেগুলো জানাও সম্ভব হতো না। এভাবে একদিকে তারা এগুলোর উপর বড় বড় বই লিখেছেন, অপরদিকে আমাদের এগুলোতে ঢুকতে নিষেধ করেছেন—এর মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয়ে যায়, তাদের উদ্দেশ্য এগুলো লুকানো নয়, সাহাবাদের দোষ ঢেকে তাদের বড় করে দেখানো নয়; বরং আমাদের ইমামদের উদ্দেশ্য মুসলমানদের ঈমান বাঁচানো, দুর্ভাগাদের তালিকায় নাম লেখানো থেকে রক্ষা করা। কারণ, সাহাবাগণ গোটা উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তাদের মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হওয়ার পরেও তাদের ঈমান ও ইয়াকিন, তাদের তাকওয়া ও ইখলাস এত বেশি ছিল যে, উম্মাহর কোনো ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত সাধনা করেও তাদের ধারেকাছেও পৌঁছতে পারবে না। ফলে সেসব যুদ্ধের আলোচনা হলেও তাদের মর্যাদা একবিন্দু কমবে না; আলোচনা না হলে তাদের মর্যাদা বাড়বেও না। কারণ, স্বয়ং কুরআন তাদের চারিত্রিক সনদ দিয়েছে এভাবে: 'আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট'। আর কুরআনের ঘোষণা চিরস্থায়ী। ফলে তাদের ব্যাপারে আমাদের কী বিশ্বাস তাতে সাহাবাদের কিচ্ছু আসে-যায় না।

বোঝা যায়, আহলে সুন্নাতের ইমামগণ সাহাবাদের মাঝে সংঘটিত এসব ব্যাপারে দূরে থাকতে বলেন আমদের নিজেদের জন্য, আমাদের ঈমান ঠিক রাখার স্বার্থে, মুনাফিকদের তালিকায় নাম উঠে যাওয়া থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে। কারণ, সাধারণ একজন মুসলমান যখন আজ সেসব ঘটনা পড়বে, বিভিন্ন সূত্র থেকে বিভিন্ন জনের কলমে সত্য-মিথ্যা-সহ সেসব ইতিহাস গিলবে, নিজের অজান্তেই সে সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ধীরে ধীরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। বিভিন্ন বিষয়ে তাদের উপর তার আপত্তি আসবে। একপর্যায়ে স্বয়ং আল্লাহ, কুরআন, রাসুলুল্লাহ, সুন্নাহ—এগুলোর প্রতিও অশ্রদ্ধা তৈরি হবে। কারণ, সাহাবাদের মাধ্যমেই এগুলো আমাদের কাছে এসেছে। তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতেই বেড়ে উঠেছেন। কুরআন তাদের শ্রেষ্ঠ উম্মাহ বলেছে। [আলে ইমরান: ১১০] রাসুলও তাদের শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১] তখন তার মনে হবে, যাদের জন্য আল্লাহ সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন তাদের এই অবস্থা! কুরআন-সুন্নাহে যাদের শ্রেষ্ঠ মানুষ বলা হয়েছে, তারা রাজনীতি ও ক্ষমতার জন্য একে অপরকে খুন করছেন, হত্যা করছেন!

---

১. বুখারি (৩৬৭১, ৬৬৫৮); মুসলিম (২৫৩৩)।

ইত্যাদি। এভাবে ধীরে ধীরে সেটা কাউকে কুফর ও নাস্তিকতা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। অথচ সাহাবায়ে কেরাম তার এসব অপবিত্র ধারণা থেকে পবিত্র। কারণ, আমরা পিছনে বলেছি, সাহাবাগণ হলেন উম্মাহর সর্বাপেক্ষা পবিত্র মানুষ। তারা প্রবৃত্তির অনুসরণে, ক্ষমতার লোভে যুদ্ধ করেননি, বরং কিছু বিষয়ে তাদের ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। প্রত্যেক পক্ষ নিজেদের মতকে সঠিক ও ইনসাফভিত্তিক মনে করেছেন। আর সেই ইনসাফকে জয়ী করার জন্য লড়াই করেছেন। কিন্তু ভুল তো ভুলই। এ ধরনের ভুল তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে মোটেই খর্ব করে না, তাদের মর্যাদা নষ্ট করে না; বরং এসব ঘটনার পরে তারা আবার পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গিয়েছেন; একে অন্যের জন্য কেঁদেছেন, ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন, দোয়া করেছেন।

এভাবে সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের নিতান্তই অনিচ্ছা সত্ত্বেও এসব বিষয়ে জড়িয়েছেন, আবার এগুলো থেকে নিজেদের পূর্ণ পবিত্র করে ফেলেছেন। ভূপৃষ্ঠ ও সাহাবাদের আমলনামা থেকে সেগুলো মুছে গেছে। রয়ে গেছে কেবল ইতিহাসের পাতায়। আমাদের সালাফ সেসব ইতিহাস সংরক্ষণ করেছেন ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে দলিল হিসেবে। কারণ, যুগে যুগে ইসলামের শত্রু কর্তৃক এসব দুর্ঘটনাকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সমূহ আশঙ্কা ছিল। তাই সত্য লিপিবদ্ধ না থাকলে তারা ইসলামের মিথ্যা ইতিহাস লিখত। সালাফ সত্য লিখে সেই দরজা আজীবনের জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে যে উদ্দেশ্যে এগুলো লেখা হয়েছে, সে উদ্দেশ্যের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকা চাই। প্রয়োজনে ইসলাম ও সাহাবাদের দুশমনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা চাই। কিন্তু উলটো যদি সেগুলোকে সাহাবাদের দিকে আঙুল তোলার কাজে ব্যবহার করা হয়, তবে এরচেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কিছু নেই। সালাফ এগুলো সব জানতেন। পূর্ণ বিস্তারিত জানতেন। না জেনে তারা সাহাবাদের মহব্বত করতেন এমন নয়। বরং তারা জেনেই তাদের মহব্বত করতেন। বরং তারাই এগুলো লিখেছেন। তবুও তারা কখনও সাহাবাবিদ্বেষী হননি। কারণ, তারা সেসব ঘটনার প্রেক্ষাপট বুঝতেন। তারা বুঝতেন—এগুলো নিয়ে আলোচনা কল্যাণকর হবে না। ফলে তারা লিখে এসব ঘটনা সংরক্ষণের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিলেন, গবেষণার নামে ভালোমন্দ খুঁজতে যাননি। ফলে আল্লাহ তাদের ঈমানকে সুরক্ষিত রেখেছেন। আজ তাদের লেখা পড়ে যদি আপনি সাহাবাবিদ্বেষী হন, তবে সেটা আপনার দুর্ভাগ্য।

আমাদের সালাফের কর্মপদ্ধতির ফলাফল আজ আপনার চোখের সামনে। সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আহলে সুন্নাত ও শিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিতুলনা করে দেখুন।

আহলে সুন্নাতের একজন আলিম থেকে শুরু করে সমাজের একজন কৃষক কিংবা সাধারণ দিনমজুরকে আবু বকর রাজি. সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। দেখুন কত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সিদ্দিক রাজি.-এর নাম উচ্চারণ করে! কত গর্বভরে চার খলিফার কথা বলে! বিপরীতে একজন রাফেজির দিকে তাকান। দেখুন ইসলামের তিন খলিফার প্রতি তাদের কী জঘন্য বিদ্বেষ! রাসুলুল্লাহর প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা রাজি.-এর ব্যাপারে দেখবেন তাদের কী ঘৃণ্য ও কুৎসিত বক্তব্য! তালহা, জুবাইর, মুআবিয়া, আমর ইবনুল আস রাজি.-এর মতো বড় বড় সাহাবার ব্যাপারে দেখবেন তাদের কী ভয়ংকর মন্তব্য! তাতে কার ক্ষতি? জীবনের সর্বক্ষেত্রে অধঃপতিত কিংবা কোনোরকমে টেনেটুনে মুসলিম দাবিদার একটা লোক যদি আবু বকর বা আয়েশা রাজি.-এর সমালোচনা করে, তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে, তাতে সিদ্দিক কিংবা সিদ্দিকার কী আসে যায়? তাতে কার কপাল পোড়ে? কার ক্ষতি হয়? এভাবেই সালাফের কথা মেনে আহলে সুন্নাত আজ প্রায় ১৪০০ বছর পরেও হকের পথে অবিচল। আর সালাফের কথা না মেনে শিয়া সম্প্রদায় আজ হক থেকে অনেক দূরে। সুতরাং আপনিই সিদ্ধান্ত নিন কোন পথে হাঁটবেন।

উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহি.-কে বলা হলো, জামাল ও সিফফিনের যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আপনার মতামত চাওয়া হয়, তবে কী বলবেন? তিনি বললেন, 'যে যুদ্ধে আমার হাত ডোবাইনি, তাতে আমার মুখ কেন ডোবাব?'[১] ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে আলি ও মুআবিয়ার মধ্যকার যুদ্ধের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন। কিছু বলার অনুরোধ করলে কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করেন:

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ

অর্থ: 'তারা এক সম্প্রদায় যারা অতীত হয়ে গেছে। তারা যা কামাই করেছে তা তাদের জন্য এবং তোমরা যা কামাই করেছ তা তোমাদের জন্য।' [বাকারা: ১৩৪][২] একবার খলিফার কিছু দূত ইমাম আহমদকে আলি ও মুআবিয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল, 'তাদের ব্যাপারে আপনি কী বলেন?' তিনি বললেন, 'আমি তাদের ব্যাপারে কেবল ভালো কথা বলি।'[৩]

কুরতুবি লিখেন, 'কোনো সাহাবির প্রতি কোনো সুনিশ্চিত গুনাহকে সম্পৃক্ত করা যাবে না। কারণ, তারা সকলে ইজতিহাদ করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ

---

১. আল-হুজ্জাহ ফি বায়ানিল মাহাজ্জাহ, কিওয়ামুস সুন্নাহ (২/৫৬৩)।
২. মানাকিবুল ইমাম আহমদ, ইবনুল জাওজি (২২১)।
৩. মানাকিবুল ইমাম আহমদ (২২১)।

করেছেন। তারা সকলে আমাদের ইমাম। তাদের মধ্যকার জটিলতায় নাগ গলানো থেকে বিরত থাকাকে আমরা ইবাদত মনে করি। আমরা কেবল তাদের উত্তম দিকগুলো আলোচনা করি। কারণ, তারা নবিজির সান্নিধ্যের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। নবিজি তাদের গালি দিতে এবং সমালোচনা করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্টির ঘোষণা করেছেন।'[১]

সাহাবাদের মধ্যকার মতভেদ সম্পর্কে নীরব থাকার ব্যাপারে যদি ইমামদের মত উল্লেখ করা হয়, তবে কয়েক ভলিউম লেখা সম্ভব, যা এই গ্রন্থে সম্ভব নয়। তাই এবার আপনার সিদ্ধান্ত—উমর ইবনে আবদুল আজিজ, আবু হানিফা, মালেক, আহমদ, ইবনে আবু হাতেম, মুহাম্মাদ ইবনে কাব, নববি, ইবনে কাসির, ইবনে হাজার ও কুরতুবিদের পথে হাঁটবেন, নাকি সাহাবাদের মাঝে নাক ঢুকিয়ে নিজেকে বরবাদ করবেন। সকল পাঠকের প্রতি পরামর্শ থাকবে দ্বীনের জরুরি কাজ এবং নিজের দায়িত্বগুলো পূর্ণ করার, এসব ঘটনার পিছনে নিজেকে না লাগানোর। যদি একান্ত পড়তেই হয়, তবে যেকোনো বিজ্ঞ আলিমের পরামর্শক্রমে কেবল সালাফের গ্রন্থগুলো থেকে এগুলো পড়া যেতে পারে, তাও সীমিত পরিসরে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ঘরানার সমকালীন পণ্ডিতের লেখা পড়া কিংবা সালাফের কিতাবগুলোতেও এগুলো অতিরিক্ত পড়া অত্যন্ত খতরনাক। কারণ, বিষয়গুলো এত জটিল ও এলোমেলো যে, কেউ এগুলো পড়লে নিজের অজান্তেই তার মন বিষিয়ে উঠতে থাকবে। নিদেনপক্ষে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে, সন্দেহ ও সংশয় বাড়বে। তাই এগুলো থেকে যত দূরে থাকা যাবে, ঈমান তত নিরাপদ থাকবে, ঠিক তাকদিরের মতো।

শিয়াদের সাহাবাবিদ্বেষ: আলি রাজি. ও আহলে বাইতের কেবল ফারসি সিলসিলার প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি থেকে শিয়াদের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেটা শেষ হয় হাতেগোনা তিন-চারজন সাহাবি বাদ দিয়ে অধিকাংশ সাহাবিকে কাফের-ফাসেক, হামান-ফেরাউন-কারুন ফাতাওয়া দেওয়ার মাধ্যমে। শিয়াদের এই বিভ্রান্তির ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ আজ সজাগ নয়; ফলে তাদের ফিতনা আরও প্রশস্ত হচ্ছে। এখন অনেক ভুঁইফোঁড় বুদ্ধিজীবীও সাহাবাদের শানে জবান-দরাজি করে। সাহাবাদের একরকম বোঝা মনে করে ইসলামের জন্য। তাদের ভাবখানা এমন যে, সাহাবাদের ছাড়াও ইসলাম চলে। অথচ সাহাবায়ে কেরাম ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য অপরিহার্য। তারা না থাকলে ইসলামও থাকবে না। কেউ কেউ শিয়া-সুন্নির

---

১. তাফসিরে কুরতুবি (১৬/৩২১)।

তথাকথিত ভ্রাতৃত্বের স্বপ্নে আজও বিভোর। যারা শিয়াদের গোমরাহির ব্যাপারে সতর্ক করে, তাদের সংকীর্ণমনা ও কুয়োর ব্যাং মনে করে। শিয়া মতবাদ সম্পর্কে এগুলো স্রেফ তাদের করুণ অজ্ঞতারই পরিচায়ক। আমরা নিচে সাহাবাদের সম্পর্কে শিয়াদের কিছু প্রতিষ্ঠিত মতামত বর্ণনা করছি, যাতে বিজ্ঞ ও সচেতন পাঠক তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের হাকিকত পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ পান।

- কাশশি আবু জাফর থেকে বর্ণনা করে, 'রাসুলুল্লাহর পরে সকল মানুষ মুরতাদ হয়ে যায়। মাত্র তিনজন থাকে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনজন কে? সে বলল, মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ, আবু জর গিফারি ও সালমান ফারসি।'[১]

- শিয়ারা তাদের সকল দোয়ার সময় চার মূর্তি (আওসান) এবং তাদের সকল অনুসারী থেকে পানাহ চায়, কিন্তু তাদের নাম উচ্চারণ করে না। চার মূর্তি বলতে তারা আবু বকর, উমর, উসমান ও মুআবিয়া রাজি.-কে উদ্দেশ্য করে; আর তাদের অনুসারী বলতে গোটা আহলে সুন্নাতকে বোঝায়।[২]

- দাউদ ইবনে নুমান থেকে বর্ণিত, বাকের বলেন, 'ইসলামে যত রক্তপাত হয়েছে, অন্যের সম্পদকে হালাল করা হয়েছে, নারীকে অবৈধভাবে গ্রহণ করা হয়েছে, তার সবকিছুর দায়ভার কিয়ামতের দিন তাদের দুজনের (অর্থা আবু বকর ও উমরের) কাঁধে বর্তাবে। **আমরা আমাদের বড়-ছোট সবাইকে তাদের দুজনকে গালি দেওয়ার নির্দেশ দিই এবং তাদের থেকে নিজেদের মুক্ত ঘোষণা করি।**'[৩]

- শিয়াদের বিখ্যাত ইমাম বাকের মজলিসি তার কিতাবে তাদের আকিদা বর্ণনা করে এভাবে:

واعتقاد ما در برائت آن است کہ باید بیزاری جویند از بتهای چہارگانہ یعنی ابو بکر و عمر و عثمان و معاویہ، وزنان چہارگانہ یعنی عایشہ و حفصہ و ہند و ام الحکم واز جمیع اشیاع واتباع ایشان، **وآنکہ ایشان بدترین خلق خداین** دو آنکہ تمام نمی شود اقرار بہ خدا و رسول و ائمہ مگر بہ بیزاری از دشمنان ایشان

অর্থ: আমাদের আকিদা হলো, চার পুরুষ মূর্তি তথা আবু বকর, উমর, উসমান ও মুআবিয়া এবং চার নারী মূর্তি তথা আয়েশা, হাফসা, হিন্দ ও উম্মুল হাকাম এবং তাদের

---

১. রিজালুল কাশশি (১৮)।
২. দেখুন তাদের দোয়া মাফাতিহুল জিনান, আব্বাস কুমমি (৩০৪)।
৩. রিজালুল কাশশি (১৮০)।

সকল দলবল-অনুসারী থেকে নিজেদের মুক্ত ঘোষণা করা। আমাদের আরও আকিদা হলো, **তারা আল্লাহর সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি।** আর আল্লাহ, রাসুল ও ইমামদের প্রতি ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না তাদের দুশমন থেকে নিজেদের মুক্ত ঘোষণা করা হয়।[১]

- মজলিসি তাকরিবুল মাআরিফ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখে,

در تقریب المعارف روایت کرده است که آزاد کرده حضرت علی بن الحسین علیه السلام از آن حضرت پرسید که: مرا بر تو حق خدمتی هست، مرا خبر ده از حال ابو بکر و عمر، حضرت فرمود: **هر دو کافر بودند، و هر که ایشان را دوست دارد کافر است**

অর্থাৎ আলি ইবনুল হুসাইন রাহি.-এর একজন আজাদকৃত দাসকে আবু বকর ও উমর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দেন, **তারা দুজন কাফের। যারা তাদের মহব্বত করবে, তারাও কাফের।**[২] হুসাইন রাজি.-এর কলিজার টুকরার উপর কী নিদারুণ অপবাদ! মজলিসির বিহারুল আনওয়ার গ্রন্থ এমন সব কুফরি বর্ণনায় ভরপুর।

- বাকের মজলিসি বিহারুল আনওয়ারের এক জায়গায় লিখেছে, 'আবু বকর, উমর ও তাদের মতো যারা আছে তাদের কাফের বলা, তাদের অভিশাপ দিলে পুণ্য মেলা, তাদের থেকে নিজেদের মুক্ত ঘোষণা এবং তাদের বিদআত-সম্পর্কিত বর্ণনা এত বেশি যে, এক কিংবা দুই ভলিউমে সেগুলো লেখা সম্ভব নয়।'[৩]

- তাদের আরেক শাইখ আলি শাহরুদি কুরআনের আয়াত وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُۥ وَٱلْمُؤْتَفِكَٰتُ بِٱلْخَاطِئَةِ অর্থ: ফেরাউন তাঁর পূর্ববর্তী লোকেরা এবং উলটে যাওয়া বস্তিবাসীরা গুরুতর পাপ করেছিল। [সুরা হাক্কাহ: ৯] এর ব্যাখ্যায় লেখে, 'বাকের থেকে বর্ণিত, এখানে ফেরাউন বলতে উদ্দেশ্য হলো তৃতীয় (অর্থাৎ উসমান) এবং 'খাতিয়াহ' বলতে উদ্দেশ্য হলো আয়েশা। হাদিসে (!) এসেছে, প্রত্যেক উম্মতের ফেরাউন থাকে, আর উসমান হলো এই উম্মতের ফেরাউন। আর আল্লাহর বাণী:

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ.

অর্থ: (আমি ইচ্ছা করলাম) ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্য-বাহিনীকে তা দেখিয়ে দেওয়ার, যা তারা সেই দুর্বল দলের তরফ থেকে আশঙ্কা করত। [কাসাস: ৬]

---

১. হাক্কুল ইয়াকিন, বাকের মজলিসি (৮৩১-৮৩২)।
২. হাক্কুল ইয়াকিন, বাকের মজলিসি (৮৩৬-৮৩৭)।
৩. বিহারুল আনওয়ার, বাকের মজলিসি (দারুর রিজা) (৩০/৩৯৯)।

এখানে ফেরাউন ও হামান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রথম ও দ্বিতীয় (অর্থাৎ প্রথম খলিফা আবু বকর ও দ্বিতীয় খলিফা উমর)।'[১]

- শিয়াদের ইমাম রজিউদ্দিন ইবনে তাউসের সূত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত (!), আল্লাহর রাসুল বলেন, 'যদি তোমরা মুআবিয়াকে মিম্বরের উপর দেখতে পাও, তবে হত্যা করে ফেলো। প্রত্যেক উম্মতের ফেরাউন থাকে, মুআবিয়া এই উম্মতের ফেরাউন। আর আমর ইবনুল আস এই উম্মতের হামান।'[২]

- শিয়াদের প্রসিদ্ধ আলিম মুহাম্মাদ তাহের শিরাজি আয়েশা ও হাফসা রাজি.-এর ব্যাপারে যেসব জঘন্য কথা লিখেছে, তা কোনো কাফেরের পক্ষেও লেখা সম্ভব নয়। সে লেখে, 'কুরআনে নুহ ও লুত আলাইহিস সালামের স্ত্রীদ্বয়ের কথা বলে মূলত আয়েশা ও হাফসাকে সতর্ক করা হয়েছে। আয়েশা রাসুলুল্লাহর নবুওতে বিশ্বাস করত না, সন্দেহ করত। সে রাসুলুল্লাহর উপর একাধিকবার অপবাদ দিয়েছে।' এই শিরাজি তাদের ব্যাপারে আরও লেখে, 'তাদের কুফর কুরআন দ্বারা প্রমাণিত।' একটু পরে সে কুরআনের আয়াত يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَعْتَذِرُوا۟ ٱلْيَوْمَ অর্থ: 'হে কাফেররা, আজকে আর তোমরা ওজর পেশ করো না।' [তাহরিম: ৭] উল্লেখ করে বলে, 'এটা আবু বকর, উমর, আয়েশা ও হাফসার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।' আরও একটু পরে সে মুআবিয়া রাজি.-কে জিন্দিকদের সর্দার আখ্যা দিয়ে লেখে, 'মুআবিয়া, আমর ইবনুল আস, তালহা ও জুবাইরের কুফরির ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।'[৩]

উপরে আমরা সাহাবাদের ব্যাপারে যেসব আকিদা উল্লেখ করলাম, সেগুলো একটাও আহলে সুন্নাতের বই থেকে নয়, বরং সবগুলো শিয়াদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, যাতে কেউ অস্বীকার কিংবা সন্দেহ করার সুযোগ না পায়; আমরা বাড়াবাড়ি করছি—এমন অপবাদ না দেয়। বাস্তবতা হলো, তাদের সাহাবাবিদ্বেষ সূর্যালোকের মতো স্পষ্ট। তারা সাহাবাদের মুসলমানই মনে করে না; কাফের ও মুরতাদ মনে করে। এমন সম্প্রদায়কে কীভাবে মুসলমান বলা যায়? উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ আবু বকর ও উমর তাদের কাছে কাফের। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয়

---

১. মুসতাদরাকে সাফিনাতিল বিহার, শাহরুদি (৮/১৮৫)।
২. আল-ফিতান ওয়াল মালাহিম, ইবনে তাউস (১১১); এটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নির্লজ্জ ও নির্জলা মিথ্যা অপবাদ।
৩. আল-আরবাঈন, তাহের শিরাজি (৬২৬-৬২৭)।

মানুষ আয়েশা ও আবু বকরকে তারা ভূপৃষ্ঠের সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি মনে করে। এর পরেও তারা মুসলমান? যারা জীবনের সবকিছু ইসলামের জন্য বিলিয়ে দিলেন, তাদের থেকে নিজেদের মুক্ত না করলে নাকি ঈমানই পরিপূর্ণ হবে না! তা হলে এটা কোন ঈমান? কোন ধর্ম? এ কারণেই ইমাম মালেক বলেছেন, কেউ যদি আবু বকর, উমর, উসমান, মুআবিয়া, আমর ইবনুল আস প্রমুখকে **গোমরা ও কাফের মনে করে** গালি দেয়, তবে তাকে হত্যা করা হবে।[১] ইমাম আহমদকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কেউ যদি আবু বকর, উমর, আয়েশা রাজি.-কে গালি দেয়, তার বিধান কী? তিনি বললেন, 'আমি তাকে মুসলিম মনে করি না।'[২] ফাতাওয়ায়ে আলমগিরিতে এসেছে, 'যে ব্যক্তি উসমান, আলি, তালহা, জুবাইর, আয়েশা রাজি.-কে কাফের বলবে, সে কাফের...।'[৩]

ইমাম শাবি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবিদের সাহাবাদের ভালোবাসার ক্ষেত্রে ইহুদি-নাসারারাও রাফেজিদের চেয়ে ভালো। ইহুদিরা মনে করে মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গীরা সর্বশ্রেষ্ঠ ইহুদি। খ্রিষ্টানরা মনে করে ঈসা আলাইহিস সালামের হাওয়ারিরা সর্বশ্রেষ্ঠ খ্রিষ্টান। আর রাফেজিরা মনে করে, রাসুলের সাহাবাগণ সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রজন্ম। তাদের রাসুলের সাহাবাদের জন্য ইসতিগফারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেটা না করে তারা তাদের গালি দেওয়াকে বেছে নিয়েছে।'[৪] ইমাম মালেক রাহি. থেকে বর্ণিত, 'সালাফ তাদের সন্তাদের যেমন কুরআন শেখাতেন, তেমন আবু বকর ও উমরের প্রতি ভালোবাসা শেখাতেন।'[৫] তা হলে তাদের কাফের-জালেম গালি দেওয়া কতটা জঘন্য মানহাজ হতে পারে? এ কারণেই ইমাম তহাবি রাহি. লিখেছেন, **'যে ব্যক্তি রাসুলের সাহাবি, তাঁর পবিত্র সহধর্মিনী এবং তাঁর নিষ্পকলুষ সন্তানদের ক্ষেত্রে উত্তম কথা বলে, সে মুনাফিকি থেকে মুক্ত।'** ফলে রাফেজিরা মুনাফিক নয়তো কী? এক আলি ও ফাতিমা রাজি.-এর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে তারা রাসুলের সকল স্ত্রী ও পরিবারকে কাফের-মুরতাদ বানিয়ে ফেলেছে।

আফসোস! তার পরেও কিছু মানুষ তাদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন দেখে, পুরোনো দিনের কথা ভুলে নতুন দিনের স্বপ্ন দেখে। তাদের মতে, পুরোনো এসব কথা তুলে মুসলিম উম্মাহর মাঝে সংঘাত বাড়ানো কী দরকার? মুসলিম উম্মাহকে শিয়া-সুন্নি নামে

---

১. শিফা, কাজি ইয়াজ (২/৩০৮)।
২. আস-সুন্নাহ, খাল্লাল (৩/৪৯৩)।
৩. ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি (২/২৬৪)।
৪. মিনহাজুস সুন্নাহ, ইবনে তাইমিয়া (১/২৭)।
৫. শরহুস সুন্নাহ, লালাকায়ি (৭/১৩১৩)।

ভাগ করা কী দরকার? সবাই মুসলিম ভাই ভাই হয়ে গেলে হয় না? আপাতসুন্দর এসব স্বপ্ন আকাশকুসুম কল্পনা, যার কেনো বাস্তবতা নেই। আমরা অবশ্যই চাই সকল মুসলমান এক হোক, ভাই ভাই হয়ে থাকুক। কিন্তু কীভাবে? আবু বকর, উমর ও উসমান কি আমাদের পুরোনো দিন? তাদের ছাড়া আমাদের ইসলাম চলবে? শিয়ারা কি এগুলো ভুলেছে? ছেড়েছে? হ্যাঁ, তাদের মাঝে কেউ যদি আহলে সুন্নাতের আকিদাকে সম্মান করে, সাহাবায়ে কেরামকে ভালোবাসে, তবে তাকে কাছে টানতে, ভালোবাসতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমাদের মূল বিদ্বেষ শিয়াদের সঙ্গে নয়, শিয়াদের আকিদার সঙ্গে। কুফরি আকিদা বর্জন করলে তারা আমাদের ভাই। কিন্তু শিয়াবাদ নামক ধর্ম দাঁড়িয়েই আছে সাহাবাবিদ্বেষের উপর, কুফর ও নিফাকের উপর।

শিয়াদের প্রকারভেদ: বর্তমান সময়ে মুসলমানদের ঐক্যের স্বপ্নে বিভোর কিছু ভাই সাহাবাদের ক্ষেত্রে শিয়া-সুন্নি দৃষ্টিভঙ্গিকে কাছাকাছি এনে দেখাতে চেয়েছেন, দুই দলের দূরত্ব কমাতে চেয়েছেন। ফলে সাহাবাদের প্রতি শিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বেশ ইতিবাচকভাবে তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে স্বতন্ত্র বইও লিখেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেসব বই যতটা মানুষকে ঐক্যের দিকে নিয়ে যাবে, তারচেয়ে বেশি আহলে সুন্নাতের প্রতি ক্ষোভ সৃষ্টি করবে। কারণ, সেসব বই পড়লে পাঠক মনে করবে সাহাবাদের ব্যাপারে শিয়াদের আকিদা কত সুন্দর! তারাও তো সাহাবাদের গালি দিতে নিষেধ করে, হারাম মনে করে। সুতরাং যারা গালি দেয়, তারা বাড়াবাড়ি করে, তারা শিয়াদের প্রতিনিধিত্ব করে না। বরং শিয়াদের আদর্শ হলো সাহাবাদের গালি না দেওয়া। তা হলে আহলে সুন্নাত কেন তাদের এমন মিথ্যা অপবাদ দেয়? বরং এক্ষেত্রে শিয়াদের সূত্র থেকে এমন সুন্দর সুন্দর রেফারেন্স পাঠককে যুগপৎ মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত করে বৈ কি।

অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ, যেমনটা সবার জানা আছে, **শিয়ারা একটা ফিরকা নয়, বরং অসংখ্য ফিরকায় বিভক্ত। তাদের অধিকাংশ ফিরকা কুফরের মাঝে ডুবে আছে; কিছু ফিরকা কুফরে গলা পর্যন্ত ডুবে আছে, কিছু ফিরকা হাঁটু পর্যন্ত; আবার কিছু ফিরকা কুফরের খাদের কিনারায়; আবার দু-একটি ফিরকা আহলে সুন্নাতের বেশ কাছাকাছি।** যেমন: বাতেনি (ইসমাইলি, নুসাইরি, কারামতি) সম্প্রদায়গুলো পুরোপুরি কুফরির মাঝে নিমজ্জিত। ইমামিয়্যাহ ইসনা আশারিয়্যাহ (রাফেজা) সম্প্রদায়ও কুফরিতে ডুবে আছে এবং **অধিকাংশ শিয়া জনগোষ্ঠী এসব দলেরই অন্তর্ভুক্ত**। সামান্য পরিমাণ শিয়া আছে যারা জায়দিয়্যাহ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। আর এই জায়দিয়্যাহরা আহলে সুন্নাতের বেশ কাছাকাছি। সাহাবাদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আহলে সুন্নাতের

দৃষ্টিভঙ্গির বেশ কাছাকাছি এবং অনেকটা ইনসাফপূর্ণ। তারা আহলে বাইতের ভালোবাসার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনে লিপ্ত থাকলেও (যেমন আলি রাজি.-কে উসমান রাজি.-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা ইত্যাদি) অন্য সাহাবাদের গালিগালাজ করা বৈধ মনে করে না।[১] সুতরাং এখন কেউ যদি সাহাবাদের সম্পর্কে কোনো জায়দি লেখকের বক্তব্য এনে সেটাকে শিয়াদের বক্তব্য বলে, তা সঠিক হবে? অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়া জায়দিয়্যাহদেরও মুসলিম মনে করে না। শিয়াদের ভ্রান্ত আকিদা না রাখার কারণে তাদেরও কাফের মনে করে। শিয়াদের পবিত্র গ্রন্থ 'বিহারুল আনওয়ার'-এ সুস্পষ্টভাবে এসেছে, **'জায়দিয়্যাহরা কাফের, বিদআতি ও গোমরাহ।** তাদের সাহায্য করা যাবে না। তাদের জাকাত-সদকা দেওয়া যাবে না।'[২]

অথচ ঐক্যপ্রয়াসী লেখকগণ সেটাই করেছেন। তারা মূলধারা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়াদের বক্তব্য বাদ দিয়ে সংখ্যালঘু জায়দিয়্যাহদের বক্তব্যকে শিয়াদের বক্তব্য এবং শিয়াদের মতাদর্শ বলে চালিয়ে দিয়েছেন, যা আহলে সুন্নাত কিংবা শিয়া কারও কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে তাদের ঐক্যের স্বপ্ন প্রশংসনীয়; কিন্তু তারা সেটা বাস্তবায়নের জন্য যে পথে হেটেঁছেন সেটা নিঃসন্দেহে সততার পথ নয়। কারণ, বাস্তবতা সামনে এলে আরও বেশি ভাঙন ও বেশি দূরত্ব তৈরি হওয়া অপরিহার্য। আহলে সুন্নাত কারও উপর জুলুম করে না, একজনের দায় অন্যজনের উপর চাপায় না। জায়দিয়্যাহ ও ইমামিয়্যাহ-বাতেনিদের তারা এক পাল্লায় রেখে সকল শিয়াকে কাফের বলে না; বরং প্রত্যেককে প্রত্যেকের আকিদা অনুযায়ী বিধান দেয়। জায়দিয়্যাহদের আহলে সুন্নাতের বেশি কাছাকাছি মনে করে। আহলে সুন্নাতের কেউ জায়দিয়্যাহদের কাফের বলেননি। কারণ তারা কাফের নয়। সুতরাং কেবল জায়দিয়্যাহ নয়; যদি অন্যান্য শিয়াও তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ছেড়ে দেয়, আহলে সুন্নাত এমনিতেই তাদের আপন করে নেবে, ভাই মনে করবে। এর জন্য শঠতা বা লুকোচুরির আশ্রয় নেওয়া বরং অন্যায়; হিতে বিপরীত হবে। রাফেজিরা যদি বাস্তবেই তাদের কুফরি আকিদা পরিত্যাগ করে আমাদের দিকে আসে, আমরাও তাদের দিকে ভ্রাতৃত্বের হাত বাড়িয়ে দেবো। এই একটি পথেই শিয়া-সুন্নি ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব সম্ভব।

কিন্তু আসলেই কি সেটা সম্ভব? তারা তো মনে করে আল্লাহ, নবি, দ্বীন—কোনো ক্ষেত্রেই আমাদের মিল নেই। তা হলে ভাই ভাই হওয়া কীভাবে সম্ভব? শিয়াদের প্রসিদ্ধ আলিম নিয়ামাতুল্লাহ জাজায়েরি লেখে: **মোট কথা—আল্লাহ, নবি, ইমাম**

---

১. আল-ইজাহ, ইয়াহইয়া ইবনুল হুসাইন জাইদি (২৩৪)।

২. বিহারুল আনওয়ার, মজলিসি (৩৭/৩৪)।

কোনো ক্ষেত্রেই তাদের সঙ্গে আমাদের মিল নেই। তারা এমন আল্লাহর ইবাদত করে যার নবি মুহাম্মাদ এবং যে নবির খলিফা আবু বকর; কিন্তু আমরা সেই রব ও সেই নবিকে মানি না; বরং আমরা বলি, যে রবের নবির খলিফা আবু বকর, সে রব আমাদের রব নয়, সে নবি আমাদের নবি নয়।[১] এর পরেও তারা আমাদের মুসলিম ভাই?

কেউ বলতে পারেন এগুলো আগের কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ শিয়া আজও সাম্প্রদায়িক উগ্রতার রোগে চরমভাবে আক্রান্ত, বরং আগের চেয়েও বেশি। তারা দিবানিশি মুসলমানদের শেষ করে দেওয়ার কূটকচালে মগ্ন—আহলে সুন্নাতকে ধ্বংস করে গোটা পৃথিবীতে পারসিক শিয়াধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর। রাফেজা-ইমামিয়্যাহ ইসনা আশারিয়্যাহ (খোমেনি/জাফরি), নুসাইরি (বাশার আল-আসাদ), ইসমাইলি-বাতেনি সম্প্রদায় মুসলিমদের প্রতি কাফেরদের চেয়েও বেশি বিদ্বেষ রাখে—মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকে। তাদের রক্ত, সম্পদ ও নারীদের হালাল মনে করে। ফলে তাদের তাদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের সপ্ন দেখা হবে চরম নির্বুদ্ধিতা। বরং জায়দিয়্যাহরাও তাদের অতীতের উদারতার পথ ছেড়ে বর্তমানে উগ্রতার দিকে হাঁটছে। অন্যদের মতো সাহাবাদের গালিগালাজ ও কাফের বলা শুরু করেছে।[২] বরং বর্তমানে সকল শিয়া অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে অধিক উগ্র। ইসলামকে তারা 'বকরি ধর্ম' নামে অভিহিত করে। আবু বকর ও উমরকে গালিগালাজ ও অভিসম্পাত এখন গোপন কিছু নয়। প্রকাশ্যেই তারা এগুলো করে। ফলে ভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন এখানে অবান্তর। যে তাওহিদ ও ঈমানের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব, সেখানেই একমত না হতে পারলে এমন ভ্রাতৃত্বের মূল্য কী? তাই শিয়াদের থেকে মুসলিম উম্মাহকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে। তাদের বিভ্রান্তির জালে পা দেওয়া যাবে না। পাশাপাশি সাধারণ মুসলিমগণ যেন তাদের ফাঁদে পা না দেয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহর ব্যাখ্যাগ্রন্থ হিসেবে এখানে এরচেয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। সাহাবাদের ব্যাপারে রাফেজিদের কুফরি বক্তব্য উল্লেখ করতে গেলে কয়েক ভলিউমের বই লিখতে হবে। অধম আকিদা সিরিজে তাদের উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার সংকল্প রাখি। আল্লাহ বাস্তবায়নের মালিক।

সংক্ষেপে এতটুকুই বলা জরুরি মনে করছি এবং পিছনেও বলে এসেছি, যেসব চরমপন্থি রাফেজি সাহাবাদের ব্যাপারে এমন আকিদা রাখে, তারা কাফের। তাদের

---

১. আল-আনওয়ারুল নুমানিয়্যাহ, নিয়ামাতুল্লাহ জাজায়েরি (২/২৪৩)।
২. দেখুন: মুহাম্মাদ ইবনে আকিল কৃত 'আন-নাসায়িহুল কাফিয়াহ লিমান ইয়াতাওয়াল্লা মুআবিয়াহ'।

উদ্দেশ্য মূলত সাহাবাগণ নয়, বরং ইসলাম। কিন্তু সাহাবাগণ হলেন ইসলামের রক্ষাকবচ। তাদের গুঁড়িয়ে দিতে পারলে ইসলামকেও গুঁড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। আর সাহাবাদের বিরুদ্ধে তাদের এত বিদ্বেষের কারণ সাহাবাগণ তাদের পূর্বপুরুষদের পারসিক অগ্নিপূজারী সাম্রাজ্যেকে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন। হাজার বছরের সেই প্রতিশোধের নেশা আজও তাদের বুকে দাউদাউ করে জ্বলছে। ইসলাম তাদের কাছে একটা খেলনামাত্র। আমাদের কথা কারও কাছে বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে। সে জন্য ইমাম গাজালির 'ফাজাইহুল বাতিনিয়্যাহ' পড়ার আহ্বান রইল।

আহলে বাইতকে ভালোবাসার মূলনীতি: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ হচ্ছে তাঁর আহলে বাইত তথা পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে ভালোবাসা। এটা কেবল ভালোবাসাই নয়, বরং মুমিনের ইবাদত। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রাসুলুল্লাহর পরিবারকে ভালোবাসা আবশ্যক। কুরআন ও হাদিসের একাধিক বর্ণনা দ্বারা আহলে বাইতকে ভালোবাসার আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তায়ালার বাণী:

قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَىٰ ۗ

অর্থ: 'আপনি বলুন, আমি আমার দাওয়াতের বিনিময়ে কোনোকিছু চাই না। তবে কেবল আত্মীয়তাজনিত সৌহার্দ চাই।' [শুরা: ২৩] সাইদ ইবনে জুবাইর প্রমুখ সূত্রে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় এসেছে, অর্থাৎ **তোমরা আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে, তাদের প্রতি ইহসান করবে, তাদের সঙ্গে সদাচারণ করবে।**[১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশার শেষের দিকেও আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা ও সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দেন। সহিহ মুসলিমে জায়দ ইবনে আরকাম থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'হে লোকসকল, আমি তো একজন মানুষ। যেকোনো সময় আল্লাহর দূত চলে আসতে পারে। ফলে আমাকে তার ডাকে সাড়া দিতে হবে। আমি তোমাদের কাছে দুটি বোঝা রেখে যাচ্ছি—**এক**. আল্লাহর কিতাব। তাতে রয়েছে হিদায়াত ও নুর। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাবকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো। **আর আমি রেখে যাচ্ছি আমার আহলে বাইত। আমার পরিবারের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমার পরিবারের ব্যাপারে তোমাদের আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমার পরিবারের ব্যাপারে**

---

১. তাফসিরে ইবনে কাসির (৭/১৮৩); তাফসিরে তাবারি (২১/৫৩০)।

তোমাদের আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।' (তিনবার বললেন) হুসাইন ইবনে সাবরাহ জায়দ বিন আরকামকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাসুলুল্লাহর আহলে বাইত কারা? তারা তাঁর স্ত্রীগণ নয়?' জায়দ ইবনে আরকাম বললেন, 'স্ত্রীগণ আহলে বাইত। কিন্তু এখানে তিনি তাদের কথা বলেছেন যারা তার মৃত্যুর পরে সদকা থেকে বঞ্চিত থাকবে।' জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তারা কারা?' তিনি বললেন, 'আলি, আকিল, জাফর ও আব্বাসের পরিবার-পরিজন। তারা সকলে সদকা থেকে বঞ্চিত থাকবে।'[১]

জাবের রাজি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **'আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তা আঁকড়ে ধরবে, তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না—আল্লাহর কিতাব এবং আমার পরিবার।'**[২] তাবারানিতে ইবনে উমর রাজি. থেকে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সর্বশেষ কথা ছিল, 'আমার পরে আমার পরিবারকে দেখে রেখো।'[৩] আলি রাজি. বলেন, স্বয়ং আল্লাহর রাসুল আমাকে বলেছেন, 'আমাকে ভালোবাসবে কেবল মুমিনরা; আর আমার প্রতি বিদ্বেষ রাখবে কেবল মুনাফিকরা।'[৪]

সালাফের আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসার উদাহরণ: সাহাবায়ে কেরাম সেটাই করেছেন—তারা আহলে বাইতকে সর্বোচ্চ সম্মান ও ভালোবাসা দিয়েছেন। মিথ্যুক শিয়ারা যেমনটা বলে, সেটা সঠিক নয়। তারা আবু বকরকে আহলে বাইতের দুশমন হিসেবে আখ্যা দেয়; অথচ সহিহ বুখারিতে ইবনে উমর রাজি. থেকে বর্ণিত, আবু বকর রাজি. বলেন, 'হে লোকসকল, তোমরা রাসুলুল্লাহর পরিবারের ক্ষেত্রে তাঁকে

---

১. মুসলিম (২৪০৮)।

২. তিরমিজি (৩৭৮৬, ৩৭৮৮); আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি (৪৭৫৭)। উক্ত হাদিসটি শিয়া ও শিয়াঘেঁষা বিদআতি সুফিদের মুখে প্রচুর শোনা যায়। অথচ তারা হাদিসটি বিশুদ্ধভাব না বুঝে অপব্যাখ্যা করে। আহলে বাইতকে আঁকড়ে ধরা মানে কী? তাদের পূজা দেওয়া? তাদের কবরে সিজদা দেওয়া? নাকি তাদের ভালোবাসা, তাদের অনুসরণ করা? আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত সেটাই করছে—তারা সকল আহলে বাইতকে ভালোবাসে, তাদের মানহাজে আল্লাহর দ্বীনকে বোঝে। বিপরীতে শিয়ারা কেবল মুখে তাদের ভালোবাসা ও অনুসরণের দাবি করে। বাস্তবে তারা আহলে বাইতের মানহাজ থেকে অনেক দূরে। কেবল জিকির ও দাবির মাধ্যমে কখনোই বাস্তব ভালোবাসা ও অনুসরণ হয় না। এর বড় উদাহরণ খ্রিষ্টান সম্প্রদায়। তারা ঈসা আলাইহিস সালামকে ভালোবাসা ও অনুসরণের দাবি করে; অথচ তারা ঈসা আলাইহিস সালামের ভালোবাসা ও অনুসরণ থেকে সবচেয়ে দূরে। মুখে দিনরাত ঈসার নাম জপে তার দ্বীনকে বিকৃত করা যেমন গর্হিত অপরাধ, একইভাবে মুখে আহলে বাইতের ভালোবাসার দাবি করে তাদের ইতিহাস বিকৃত করা এবং তাদের মানহাজের বিরোধিতা করা কখনোই ভালোবাসা নয়, বরং ভালোবাসার নামে ব্যাবসা।

৩. আল-মুজামুল আওসাত (৩৮৬০)।

৪. মুসলিম (৭৮); ইবনে মাজা (১১৪)।

মনে রেখো।'[১] বুখারিতে এসেছে, আবু বকর বলেন, **'আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! আমার নিজের আত্মীয়দের চেয়ে রাসুলুল্লাহর আত্মীয়গণ আমার কাছে বেশি প্রিয়।'**[২] অপর হাদিসে এসেছে, আবু বকর রাজি. রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন। হঠাৎ তিনি হাসানকে অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করতে দেখতে পান। তাকে তিনি নিজ কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে বলেন, 'তুমি রাসুলুল্লাহর মতো হয়েছ, আলির মতো নও।' আলি রাজি. তখন হাসছিলেন।[৩]

উমর রাজি. যখন খলিফা হলেন, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়-স্বজন তথা আহলে বাইতকে সর্বপ্রথম ভাতা দেওয়া শুরু করলেন। রাসুলুল্লাহর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ভিত্তিতে ভাতা দিতেন।[৪] উমর রাজি. তাঁর শাসনামলে যখন বৃষ্টির জন্য ইস্তিসকার নামাজ পড়তেন, আব্বাস রাজি.-কে সঙ্গে নিয়ে বের হতেন এবং তার উসিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন। বলতেন, 'হে আল্লাহ, আমরা রাসুলের যুগে তাঁর উসিলায় আপনার কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করতাম। এখন রাসুলের চাচার উসিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করছি। সুতরাং আমাদের বৃষ্টি দিন।' আব্বাসকে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আহলে বাইতের প্রতি উমর রাজি.-এর সম্মান ও ভালোবাসা ফুটে ওঠে।[৫] আব্বাস রাজি. যখন উমর কিংবা উসমানের পাশ দিয়ে যেতেন আর তারা যদি কোনো বাহনের পিঠে থাকতেন, তবে রাসুলুল্লাহর চাচার সম্মানে নেমে যেতেন।[৬] একদিন কথাপ্রসঙ্গে উমর আব্বাসকে বলেন, 'আল্লাহর শপথ! আপনার ইসলামগ্রহণ আমার কাছে (পিতা) খাত্তাবের ইসলামগ্রহণের চেয়ে প্রিয়। কারণ, আমি জানতাম আপনার ইসলামগ্রহণ রাসুলুল্লাহর কাছে খাত্তাবের ইসলামগ্রহণের চেয়ে প্রিয়।'[৭] উমর রাজি. তাঁর সন্তাদেরও গড়ে তুলেছেন আহলে বাইতের ভালোবাসার উপর। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাজি.-এর কাছে এক ব্যক্তি শরীরে মশার রক্ত লাগলে সেটার বিধান কী জিজ্ঞাসা করেছিল। তিনি বললেন, 'তুমি কোত্থেকে এসেছ?' সে বলল, 'ইরাক।' ইবনে উমর বললেন, 'একে দেখো, মশার রক্তের বিধান জিজ্ঞাসা করছে; অথচ তার দেশের লোকেরা রাসুলুল্লাহর নাতিকে

---

১. বুখারি (৩৭১৩); মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩২৮০৩)।
২. বুখারি (৩৭১১)।
৩. বুখারি (৩৫৪২, ৩৭৫০)।
৪. ইকতিজাউস সিরাতিল মুস্তাকিম (১/৪৪৬)।
৫. বুখারি (১০১০); সুনানে কুবরা, বাইহাকি (৬৫২০)।
৬. সিয়ারু আলামিন নুবালা (৩/৩৯৯)।
৭. আল-মুজামুল কাবির (৭২৬৪); শরহু মাআনিল আসার (৫৪৫০)।

হত্যা করেছে, যাদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ বলেছেন তারা দুনিয়াতে আমার দুটি ফুল।'[১] উমর রাজি.-এর পুরো খেলাফতকালে আলি রাজি. ছিলেন তাঁর প্রধান উপদেষ্টা। ছোট-বড় সকল কাজে তিনি আলির সঙ্গে পরামর্শ করতেন।[২]

শিয়ারা আহলে বাইতের সঙ্গে যেসব সাহাবার মতানৈক্য ও জটিলতা হয়েছিল, তাদের চরমভাবে ঘৃণা করে। মুআবিয়া রাজি.-এর প্রতি তারা যতটা বিদ্বেষ রাখে, সম্ভবত পৃথিবীর আর কোনো মানুষের প্রতি এত বিদ্বেষ রাখে না; অথচ মুআবিয়া রাজি. একজন সাহাবি। হাসান রাজি. একবার মুআবিয়া রাজি.-এর কাছে গেলে মুআবিয়া রাজি. তাকে বলেন, 'রাসুলুল্লাহর নাতিকে স্বাগত।' অতঃপর তিনি তাকে তিন লক্ষ অর্থ প্রদান করেন। বিপরীতে তার সঙ্গে থাকা আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাজি.-কে এক লক্ষ প্রদান করেন। আহলে বাইতের প্রতি এই ছিল মুআবিয়ার রাজি.-এর সম্মান।[৩]

হ্যাঁ, তার সঙ্গে আলি রাজি.-এর বিবাদ হয়েছিল, দুজনের মাঝে—আহলে সুন্নাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামের মতে—আলি রাজি. হকের উপর ছিলেন আর মুআবিয়া রাজি.-এর ভুল ছিল; কিন্তু সেটা তার ইজতিহাদ। এর জন্য মুআবিয়া রাজি.-এর শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট হয়নি; সাহাবা হিসেবে তার মর্যাদা কমেনি। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহি.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মুআবিয়া শ্রেষ্ঠ, নাকি উমর ইবনে আবদুল আজিজ? ইবনুল মুবারক যে জবাব দিয়েছিলেন, তা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত এবং সেটাই আহলে সুন্নাতের সবার মত। তিনি বলেছিলেন, 'মুআবিয়ার নাকে প্রবেশ করা ধুলাগুলোও উমর ইবনে আবদুল আজিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।'[৪] কারণ তিনি সাহাবি, আর উমর ইবনে আবদুল আজিজ তাবেয়ি। পিছনে আমরা ইমাম আহমদ-সহ অন্যান্য ইমামের বক্তব্য উল্লেখ করেছি যে, সাহাবাদের পরে একজন সাধারণ মানুষ যত বড় ওলি হোক, তার সারা জীবনের আমল রাসুলুল্লাহর একজন কনিষ্ঠ সাহাবির এক মুহূর্তের কাছে তুচ্ছ। সেখানে মুআবিয়া রাজি.-এর মতো কাতিবে ওহি (ওহি লেখক), রাসুলুল্লাহর শ্যালক, উম্মুল মুমিনিন উম্মে হাবিবা রাজি.-এর ভ্রাতা, মুমিনদের মামা এবং সম্মানিত সাহাবির প্রতি বিদ্বেষ রাখা যায় কীভাবে? ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের কাছে মুআবিয়া রাজি.-এর কিছু সমালোচকের কথা বলা হলে

---

১. বুখারি (৩৭৫৩); তিরমিজি (৩৭৭০)।
২. বিস্তারিত দেখুন: মুহাম্মদ উমর হাজি কৃত 'আলি ইবনে আবি তালিব: মুসতাশারুন আমিনুন লিল-খুলাফায়ির রাশিদিন'।
৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসির (৮/১৪৬)।
৪. আশ-শারিয়াহ, আজুররি (৫/২৪৬৬)।

তিনি বলেন, 'তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আবুল হাসান, যদি কাউকে রাসুলের কোনো সাহাবির সমালোচনা করতে দেখো, তবে তার ইসলাম নিয়ে প্রশ্ন করার অধিকার আছে তোমার।'[১]

আহলে সুন্নাত রাফেজি ও নাসেবিদের বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত: এভাবে আহলে সুন্নাত আহলে বাইত তথা নবি পরিবারের সবাইকে ভালোবাসে। পথভ্রষ্ট রাফেজিদের মতো নয়, যারা আহলে বাইতকে ভালোবাসার নাম করে মাত্র কয়েকজন সদস্যের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে আর বাকিদের ঘৃণা করে, বিদ্বেষ পোষণ করে। আহলে সুন্নাত নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের প্রতি সম্মান জানায়, তাদের ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে; রাফেজিদের মতো তাদের শানে অপবাদ আরোপ করে না; দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের রাসুলুল্লাহর পবিত্র স্ত্রী গণ্য করে। আহলে সুন্নাত আহলে বাইতকে সম্মান জানানোর ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে। নাসেবিদের মতো যেমন তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে না, একইভাবে তাদের নাম ও লকব ইত্যাদি উচ্চারণের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িও করে না। তাদের প্রতি এমন কোনো লকব বা তাদের এমন কোনো গুণে বিশ্বাস করে না, যা তাদের মাঝে ছিল না। আহলে সুন্নাত আহলে বাইতের সবাইকে নিষ্পাপ মনে করে না। কারণ, তারা নবি-রাসুল নন। তাদের নিষ্পাপ বলা শরিয়তের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কিন্তু রাফেজিরা তাদের নিষ্পাপ মনে করে। বিপরীতে অন্য সাহাবাদের কাফের-মুরতাদ আখ্যা দেয়। শুধু নিষ্পাপ নয়, ইমামদের ব্যাপারে তারা যেসব জঘন্য কুফরি আকিদা বানিয়েছে, তা কোনো মুসলিম দূরের কথা, সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাদের এই বাড়াবাড়িতে স্বয়ং আহলে বাইতের সদস্যরা বিরক্ত ছিলেন। আলি ইবনুল হুসাইন বলতেন, হে লোকজন, তোমরা আমাদের ইসলামের ভালোবাসা বাসো। আল্লাহর শপথ! আমাদের জন্য তোমাদের ভালোবাসা যন্ত্রণায় পরিণত হয়েছে।[২]

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত যেমন রাফেজিদের মতো আহলে বাইতের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে না, তেমনই তারা নাসেবিদের মতো আহলে বাইতের বিরুদ্ধে দুশমনিও রাখে না। নাসেবি হলো সেসব ফিরকা, যারা আহলে বাইত, বিশেষত আলি রাজি.-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তাকে গালি দেয়, তার সমালোচনা করে। **নাসেবিদের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ফিরকা হচ্ছে খারেজি সম্প্রদায়,** যারা আলি রাজি.-এর

---

১. শরহুস সুন্নাহ, লালাকায়ি (৭/১৩২৬)।
২. প্রাগুক্ত (৮/১৪৮১)।

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাকে কাফের ও ফাসেক আখ্যা দিয়েছে। ফলে আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মতিক্রমে খারেজি সম্প্রদায়ও রাফেজিদের মতো গোমরাহ। তাদের কেউ কেউ কাফেরও। নাসেবিদের আরেকটি দল হলো বনু উমাইয়ার (বনু মারওয়ান শাখার) অনেক শাসক এবং তাদের বিভিন্ন গভর্নর, আমির-উমারা। উমর ইবনে আবদুল আজিজ রাহি. ছাড়া বনু মারওয়ানের অধিকাংশ শাসকই আলি রাজি.-এর প্রতি বিদ্বেষ রাখত, মিম্বরে মিম্বরে আলি রাজি.-এর প্রতি ঘৃণা ছড়ানো হতো। উমর ইবনে আবদুল আজিজ এসে সেই প্রথা বাতিল করেন।[১] একইভাবে নাসেবিদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আলি রাজি.-এর খেলাফতকে অবৈধ কিংবা অন্যায্য মনে করা। তাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইয়াজিদ ইবনে মুআবিয়াকে অতিরিক্ত সম্মান করা। স্বয়ং ইবনে তাইমিয়া—যাকে শিয়াঘেঁষা কিংবা আহলে বাইতের মহব্বতের দাবিদার বিদআতি সুফিপন্থি অনেকে নাসেবি বলে গালি দেয়—ইয়াজিদের সম্মানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িকে নাসেবিদের বৈশিষ্ট্য বলেছেন। এমনকি তিনি—জমহুরের মতো—বলেন, আলি ও মুআবিয়া (রাজিয়াল্লাহু আনহুমা) দুজনের মাঝে আলি রাজি. হকের অধিক কাছাকাছি ছিলেন। যদি কেউ এটা স্বীকার না করে, তবে তার মাঝেও নাসেবিয়্যাতের আলামত রয়েছে।[২] আল্লাহ রহম করুন তাঁকে। তিনি সত্য বলেছেন।

আফসোসের বিষয় হলো, আহলে সুন্নাত নাসেবি-খারেজিদের গোমরাহ আখ্যা দেওয়া সত্ত্বেও আহলে বাইতের ভালোবাসার দাবিদার রাফেজিরা স্বয়ং আহলে সুন্নাতকে নাসেবি আখ্যা দিয়েছে। জগতের সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করে তাদের। ফলে শিয়াদের কিতাব, বক্তব্য বা লেখালিখিতে নাসেবি বলতে খারেজি নয়, বরং আহলে সুন্নাত উদ্দেশ্য। এ জন্য পাঠকের বিভ্রান্ত না হওয়া চাই। তাদের সমকালীন একজন লেখক নাসেবিদের একটি তালিকা করেছে। তালিকার কিছু নাম হলো: আবু বকর, উমর, উসমান, আয়েশা, আনাস ইবনে মালেক, হাস্‌সান বিন সাবেত, জুবাইর ইবনুল আওয়াম, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস, তালহা বিন উবাইদুল্লাহ, সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব, আবু হুরাইরা, ইমাম আওজায়ি, ইমাম মালেক, জাহাবি, বুখারি, জুহরি।[৩] অর্থাৎ তারা যাদের নাসেবি বলে, তাদের ছয়জন আশারায়ে মুবাশশারা। তাদের আরেকজন লিখেছে, 'বলাবাহুল্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত নামে পরিচিত দলটিই নাসেবি

১. সিয়ারু আলামিন নুবালা, জাহাবি (রিসালাহ) (৫/১১৩)।
২. মাজমুউল ফাতাওয়া (৪/৪৩৯, ২৮/৪৯৩)।
৩. বিস্তারিত দেখুন: আন-নুসবু ওয়ান নাওয়াসিব, মুহসিন মুআল্লিম।

সম্প্রদায়।'[১] শিয়াদের দ্বারা এক শ্রেণির সুফিও প্রভাবিত হয়েছে। ফলে তারা আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন ইমামকে মুআবিয়া রাজি.-এর প্রতি ইনসাফভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি রাখার 'অপরাধে' নাসেবি আখ্যা দিয়েছে। অথচ তারা নিজেরা যে রাফেজিদের পকেটে ঢুকে গেছে, সেটা খেয়াল করার ফুরসত পায়নি।

শিয়াদের শাইখাইন বিদ্বেষের কারণ ও তাদের ভ্রান্তির অপনোদন: শিয়ারা মনে করত শাইখাইন তথা আবু বকর ও উমর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারকে খেলাফত ও তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা কি তা-ই? মোটেই নয়। আবু বকর রাজি. খেলাফত দখল করেননি, বরং সাহাবাগণ সর্বসম্মতিক্রমে তাকে খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। কারণ, তিনিই ছিলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে সর্বোত্তম মানুষ। তিনি আবার উমর রাজি.-কে খলিফা নিযুক্ত করেছেন। তারা রাসুলুল্লাহর পরিবারের ক্ষেত্রে কোনো অন্যায় করেননি, বরং তারা রাসুলুল্লাহর দেখানো পথে চলেছেন। শরিয়ত ও আহলে বাইত একটার জন্য অপরটাকে নষ্ট করেননি। কিন্তু আহলে বাইতের কোনো কোনো সদস্য এক্ষেত্রে বুঝতে ভুল করেছিলেন। ফাতিমা রাজি. সম্ভবত মনে করতেন, আবু বকর রাজি. তাদের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছেন। এ জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর থেকে তার ওফাত পর্যন্ত ছয় মাস তিনি আবু বকরের সঙ্গে কথা বলেননি। আলি রাজি.-ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয় হওয়ার কারণে মনে করতেন, খেলাফতে তাদের অংশ রয়েছে। তাই তিনিও এই দীর্ঘ ছয় মাস বাইয়াত গ্রহণ করেননি। ছয় মাস পরে যখন ফাতিমা রাজি. মৃত্যুবরণ করেন, তখন আলি রাজি. আবু বকর রাজি.-এর কাছে এসে বাইয়াত গ্রহণ করেন, নিজেদের ভুল স্বীকার করেন।

সহিহ বুখারি ও মুসলিমের লম্বা হাদিসে এসেছে: 'আয়িশা রাজি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরে তাঁর কন্যা ফাতিমা আবু বকরের নিকট রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিরাস, মদিনা ও ফাদাকে অবস্থিত ফাই (বিনাযুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) এবং খায়বারের খুমুসের (পঞ্চমাংশ) অবশিষ্ট থেকে তাদের অংশ চেয়ে লোক পাঠান। আবু বকর রাজি. জানান, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন, নবিদের কোনো উত্তরাধিকার নেই। তারা যা রেখে

---

১. আশ-শিয়াহ আহলুস সুন্নাহ, মুহাম্মাদ তিজানি (১৬১)।

যান তা সদকা হিসেবে পরিগণিত হবে। অবশ্য তাঁর বংশধরগণ এ সম্পত্তি কেবল খেতে পারেন। আল্লাহর শপথ! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদকা তাঁর জীবদ্দশায় যে অবস্থায় ছিল, আমি সে অবস্থা থেকে একটুও পরিবর্তন করব না। এ ব্যাপারে তিনি যে নীতি অবলম্বন করেছেন, আমিও সে নীতিতেই কাজ করব। এ কথা বলে আবু বকর রাজি. ফাতিমা রাজি.-কে সেসব সম্পদ দিতে অস্বীকৃতি জানান। এতে ফাতিমা আবু বকরের উপর মনঃক্ষুণ্ণ হন এবং তার থেকে আমৃত্যু নিস্পৃহ থাকেন। ওফাত পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় মাস কখনও তাঁর সঙ্গে কথা বলেননি। এর পর তিনি ওফাত লাভ করলে তাঁর স্বামী আলি রাজি. আবু বকর রাজি.-কে না জানিয়েই রাতের বেলা তাঁর জানাজা ও দাফনকার্য শেষ করে নেন।'

'ফাতিমা জীবিত থাকা পর্যন্ত লোকজনের মনে আলির বেশ সম্মান ছিল। কিন্তু যখন ফাতিমা ইন্তেকাল করলেন, তখন আলি লোকজনের কাছে অচেনা হয়ে গেলেন। তিনি আবু বকর রাজি.-এর সাথে সমঝোতা এবং তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণের ইচ্ছা করলেন। কারণ, এই ছয় মাসে তিনিও বাইয়াত গ্রহণ করেননি। তিনি আবু বকরের কাছে লোক পাঠিয়ে জানালেন যে, আপনি আমার কাছে আসুন। তবে অন্য কেউ যেন আপনার সঙ্গে না আসে। কারণ, আবু বকরের সঙ্গে উমর উপস্থিত হোন সেটা তিনি চাননি। বিষয়টি শোনার পর উমর বললেন, 'আল্লাহর কসম! আপনি একা একা তাঁর কাছে যাবেন না।' আবু বকর বললেন, 'সমস্যা কী? আল্লাহর শপথ! আমি তাঁদের কাছে যাব।' আবু বকর আলির কাছে গেলেন। আলি রাজি. তাশাহহুদ পাঠ করে বললেন, আমরা আপনার মর্যাদা এবং আল্লাহ আপনাকে যা-কিছু দান করেছেন সে সম্পর্কে অবগত আছি। **আর যে কল্যাণ (অর্থাৎ খেলাফত) আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন, তাতেও আপনার প্রতি আমাদের কোনো হিংসা নেই। আমাদের মনে হতো, রাসুলুল্লাহর নিকটাত্মীয় হিসেবে আমাদের তাতে অংশ আছে। কিন্তু আমাদের ছাড়াই আপনি তা করে ফেলেছেন** (অর্থাৎ খেলাফতের ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করেননি)। এ কথা শুনে আবু বকরের দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, **সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! আমার কাছে আমার নিজের আত্মীয়-স্বজনের চেয়ে রাসুলুল্লাহর আত্মীয়বর্গ বেশি প্রিয়।** তবে যে সম্পদকে কেন্দ্র করে আমার ও আপনাদের মাঝে মতবিরোধ তৈরি হয়েছে, সে ব্যাপারে আমি কল্যাণকর পথ অনুসরণে কোনো কসুর করিনি। এক্ষেত্রে আমি সে পথে হেঁটেছি যে পথে রাসুলুল্লাহ হেঁটেছেন।'

'অতঃপর আলি আবু বকরকে বললেন, কাল জোহরের পর আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণের ওয়াদা রইল। জোহরের পর আবু বকর মিম্বরে বসে সালাত-সালাম পাঠ করলেন। তারপর আলির বর্তমান অবস্থা, বাইআত গ্রহণে তার দেরি করার কারণ এবং তাঁর কাছে পেশকৃত আপত্তিগুলো তিনি বর্ণনা করলেন। এরপর আলি ইস্তিগফার ও সালাত পাঠ করলেন। আবু বকর রাজি.-এর মর্যাদার কথা উল্লেখ করে বললেন, **তিনি আবু বকরের প্রতি হিংসা কিংবা আল্লাহ-প্রদত্ত তাঁর এ সম্মান (খেলাফত) অস্বীকারের মনোবৃত্তি নিয়ে বাইয়াতের ক্ষেত্রে বিলম্ব করেননি। তিনি বলেন, আমরা মনে করতাম এ ব্যাপারে আমাদের অংশ রয়েছে; কিন্তু তিনি আমাদের ছাড়াই তা করে ফেলেছেন। তাই আমরা মনঃকষ্টে ছিলাম।** এ কথা শুনে উপস্থিত লোকজন আনন্দিত হয়ে বললেন, আপনি ঠিকই করেছেন। উক্ত ঘটনার পরে মুসলমানগণ আবার আলি রাজি.-এর ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলেন।'[১]

উক্ত ঘটনায় দুটি বিষয় লক্ষণীয়: **এক.** ফাতিমা রাজি. মনে করেছিলেন যে, তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরাধিকার হিসেবে কিছু সম্পদ পাবেন; অথচ বাস্তবতা হলো, নবিদের কোনো উত্তরাধিকার হয় না; তাদের মিরাস থাকে না। এটা তাঁর জানা ছিল না। এ জন্য আবু বকর রাজি. তাকে মিরাস না দেওয়াতে তিনি মনে কষ্ট পান, আবু বকর রাজি.-এর সঙ্গে কথা বন্ধ রাখেন। যেহেতু তিনি নবি-রাসুল নন, তাই মানবিক দুর্বলতায় এটুকু করা বিস্ময়কর নয়। তা ছাড়া ওফাতের সময় তার বয়স ছিল মাত্র চব্বিশ বছর। ফলে এটাকে বড় করে দেখারও সুযোগ নেই। উপরন্তু সহিহাইনের বর্ণনায় আমৃত্যু কথা বন্ধের বিষয় থাকলেও অন্য কিছু বর্ণনায় দেখা যায়, ফাতিমা রাজি. অসুস্থ হলে আবু বকর রাজি. তাকে দেখতে যান এবং ফাতিমা রাজি. তাঁর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন।[২] হজরত গঙ্গুহি ও থানভিও উক্ত মত পোষণ করেন।[৩] ফাতিমা রাজি. যখন মৃত্যুবরণ করেন, আবু বকর, উমর, উসমান, জুবাইর-সহ অন্যান্য সাহাবি তার জানাজায় অংশ নেন।[৪] **দুই.** ফাতিমা, আলি ও আহলে বাইতের লোকজন নবিজির উত্তরাধিকারী হওয়ায় খেলাফতের ব্যাপারটি তাদের নিয়েই সম্পাদিত হবে বলে আশা করেছিলেন; কিন্তু তাদের ছাড়াই আবু বকরের খেলাফত সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের সঙ্গে পরামর্শ না করাতে তারা মনে কষ্ট পান। কিন্তু তারা আবু বকরকে খেলাফত দখলকারী

---

১. বুখারি (৪২৪০); মুসলিম (১৭৫৯)।
২. সুনানে কুবরা, বাইহাকি (১২৮৫৯); সিয়ারু আলামিন নুবালা, জাহাবি (২/৩৮৮)।
৩. হিদায়াতুশ শিয়াহ, রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি (৫০); ইমদাদুল ফাতাওয়া (৬/১৩১)।
৪. আর-রিয়াজুন নাজিরাহ, তাবারি (১/১৭৬)।

কিংবা খেলাফতের অনুপযুক্ত ভাবতেন না, যা উপরের বক্তব্যে স্পষ্ট। অপরদিকে খেলাফতের বিষয়ে তাদের সঙ্গে পরামর্শ না করার ক্ষেত্রেও আবু বকর, উমর ও অন্যান্য সাহাবার ওজর ছিল। রাসুলের ওফাতের পরে খেলাফতের ব্যাপারটি ছিল সবচেয়ে জটিল। সেটাকে কেন্দ্র করে মতভেদ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এ জন্য একদিকে তারা খেলাফতের কাজ করেছেন, অপরদিকে নবি পরিবারের সদস্যরা নবিজির গোসল-কাফন ইত্যাদির কাজ করেছেন। তা ছাড়া কাজটি অত্যন্ত দ্রুত এবং উপস্থিত মজলিসে হয়ে যায়, আগে থেকে পরিকল্পনা করে হয়নি। এ জন্য উমর রাজি. এটাকে 'ফালতাহ' (উপস্থিত সম্পাদিত) বলতেন।[১]

এতৎসত্ত্বেও আলি রাজি. মনে করতেন, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেই কাজটি করা দরকার ছিল। এভাবে একদিকে ফাতিমা রাজি.-এর মিরাস না পাওয়ার কষ্ট, অপরদিকে খেলাফতের ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে পরামর্শ না করার কষ্ট, উপরন্তু ফাতিমা রাজি.-এর শারীরিক অসুস্থতা—সব মিলিয়ে প্রায় ছয় মাস কেটে যায়। এই ছয় মাসে আলি রাজি. আবু বকর রাজি.-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে পারেননি। পরে ফাতিমা রাজি.-এর ওফাতের পরে আলি রাজি. যখন আবু বকর রাজি.-এর উজর এবং আহলে বাইতের প্রতি তার ভালোবাসা বুঝতে পারেন, পাশাপাশি নিজেদের মনঃকষ্ট লাঘব হয়, তখন আবু বকর রাজি.-এর সঙ্গে তাদের দূরত্ব ও মনোমালিন্য দূর করার আশু উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এখানে খেলাফতের দাবি নিয়ে কোনো মারামারি ছিল না। আবু বকরের প্রতি খেলাফত দখলকারী হিসেবে কোনো অভিযোগ ছিল না। আহলে বাইত খেলাফতের জন্য একমাত্র নিজেদের যোগ্য মনে করতেন—এমন বিষয়ও ছিল না। ফলে এই লম্বা সময়ে আহলে বাইতের কেউ আবু বকরের খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি, ষড়যন্ত্র করেননি। কারণ, তাদের সকলের হৃদয় ছিল পবিত্র। সকলে নিজ নিজ স্থানে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পরে যখন ভুল ধারণা দূর হয়ে যায়, আলি রাজি. বাইয়াত গ্রহণ করেন—কোনো চাপাচাপি-জোরজবরদস্তি ব্যতিরেকেই।[২] বরং বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি প্রথমেও একবার বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন।[৩] তা ছাড়া উক্ত হাদিসের প্রত্যেকটি শব্দে আবু বকর ও আলি রাজি.-এর পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, সম্মান, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, একে অপরকে বোঝার ও ছাড় দেওয়ার দৃশ্য সুস্পষ্ট।

---

১. বুখারি (৬৮৩০); বাজ্জার (২৮৬); মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩৩৫৩৯)।
২. ফাতহুল বারি (৭/৪৯৪); শরহে মুসলিম, নববি (১২/৭৮)।
৩. মুসতাদরাকে হাকেম (৪৪৮৩); আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৫/২৭০)।

সাহাবাদের মাঝে ব্যাপারটি এখানে শেষ হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু পরবর্তী লোকেরা শেষ হতে দেয়নি; বরং এগুলো তাদের জন্য ফিতনা ও গোমরাহির এমন এক দরজা খুলে দেয়, যা কিয়ামত পর্যন্ত হয়তো বন্ধ হবে না। ধীরে ধীরে সময় যত গড়ায়, এক শ্রেণির বিভ্রান্ত লোকজন আহলে বাইতের ভালোবাসার নামে বাড়াবাড়ির পরিমাণ বাড়িয়েই যায়। একপর্যায়ে তারা আলিকে আল্লাহ বানিয়ে দেয়। তার নামে এমন সব আকিদা গড়ে, যা খ্রিষ্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে রাখে। স্বয়ং আলি রাজি. তাদের শাস্তি দেন। সেই প্রজন্ম চলে গেলেও তাদের বিভ্রান্তি ও গোমরাহি যায়নি। তারা আহলে বাইতকে খেলাফতের একমাত্র হকদার এবং আবু বকর ও উমরকে খেলাফতের হাইজ্যাকার বানিয়ে দেয়। যুগে যুগে শিয়া-রাফেজি-বাতেনি সম্প্রদায় আহলে বাইতের ভালোবাসার নাম করে সেই গোমরাহি ধরে রাখে। তাদের মহব্বতের নাম করে কেবল ইসলাম-বিরোধী নয়, মানবতা ও নৈতিকতা-বিরোধী অনাচার ও অনিষ্টতা ছড়ায় পৃথিবীতে। ফাতেমি (উবাইদি), কারামেতি, ইসমাইলি সাম্রাজ্যের ইতিহাসের ভয়াবহতা এখনও জীবন্ত। বরং আহলে বাইতের সদস্যরাও তাদের বাড়াবাড়িতে অতিষ্ঠ ছিলেন। এমনকি শিয়াদের গ্রন্থে এসেছে, জাইনুল আবিদিন রাহি. বলেন, 'ইহুদিরা উজাইরের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে যা খুশি তা-ই বলেছে; অথচ উজাইর তাদের থেকে মুক্ত, তারাও উজাইরের কেউ নয়। খ্রিষ্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছে; ঈসা তাদের থেকে মুক্ত, তারাও ঈসার কেউ নয়; আমরাও সে পথে হাঁটছি। আমাদের অনুসারীদের অনেকে আমাদের ভালোবেসে আমাদের ব্যাপারে তা-ই বলবে যা ইহুদিরা উজাইরের ব্যাপারে বলেছে, খ্রিষ্টানরা ঈসার ব্যাপারে বলেছে; তারা আমাদের কেউ নয়, আমরাও তাদের কেউ নই।'[১] এবার রাফেজিরাই বিচার করুক তারা কাদের ভালোবাসার দাবিতে কী করছে।

বিপরীতে সাহাবা ও সালাফের মাঝে আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা সর্বদাই বিদ্যমান ছিল। মিথ্যুক রাফেজিরা আবু বকর, আয়েশা, উমর রাজি. প্রমুখ সাহাবাকে আহলে বাইতের দুশমন হিসেবে উপস্থাপন করে; অথচ আমরা আবু বকর রাজি.-এর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কিছু কথা উপরে উল্লেখ করেছি। আয়েশা রাজি. ফাতিমা রাজি.-এর ব্যাপারে বলতেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তার মতো মিল আর কাউকে দেখিনি—তার কথা রাসুলের কথার মতো ছিল। তিনি যখন রাসুলের ঘরে প্রবেশ করতেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে তাকে

---

১. রিজালুল কাশশি (১১২-১১৩)।

স্বাগত জানাতেন, চুমু খেতেন। রাসুলুল্লাহ তার ঘরে গেলে তিনিও এমন করতেন। তাঁর হাঁটাও রাসুলুল্লাহর হাঁটার মতো ছিল।'[১] ফাতিমার প্রতি বিদ্বেষ রাখলে আয়েশা এগুলো বলতে পারতেন? উমর রাজি. আহলে বাইতকে ভালোবেসে আলি রাজি.-এর কন্যা উম্মে কুলসুমকে বিবাহ করেছেন। আলি ও আহলে বাইতের সঙ্গে যদি উমরের বিদ্বেষপূর্ণ সম্পর্ক থাকত, তাদের কন্যাকে বিবাহ করতেন বা তারা বিবাহ দিতেন? বরং ইয়াকুবি উক্ত বিবাহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে উমর ইবনুল খাত্তাবের বক্তব্য নকল করেন, যেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: 'পরকালে সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, কেবল আমারটাই থাকবে।' উম্মে কুলসুম থেকে উমরের সন্তান ছিলেন জায়দ ও রুকাইয়াহ রাহি.।[২]

আহলে বাইতের সদস্যদের অনেকেই আবু বকর, উমর ও আয়েশার নামে নাম রাখতেন—আলি রাজি.-এর ছেলের নাম ছিল আবু বকর; তার আরেক ছেলের নাম ছিল উমর; হাসান ও হুসাইন রাজি.-এর ছেলেদের নাম ছিল আবু বকর ও উমর; জাইনুল আবিদিনের ছেলের নাম ছিল উমর; মুসা কাজেমের ছেলের নাম ছিল উমর; জাফর সাদেক, মুসা কাজেম ও আলি রিজা প্রত্যেকের মেয়ের নাম ছিল আয়েশা। আবু বকর ও উমর রাজি. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্বশুর। আলি রাজি. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক মেয়ের জামাই। উসমান রাজি. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই মেয়ের জামাই। এইসব কিছুই রাফেজিদের চোখে পড়ে না। আহলে বাইতের জিকির তুলে পৃথিবীর নিকৃষ্টতম এক ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত তারা। বুখারিতে এসেছে, আলি রাজি.-কে তার ছেলে মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাসুলুল্লাহর পরে সর্বোত্তম মানুষ কে? তিনি বলেছিলেন, 'আবু বকর।' জিজ্ঞাসা করলেন, অতঃপর? আলি বললেন, 'উমর।' মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ বলেন, এরপর আমার আশঙ্কা ছিল উসমানের নাম বলবেন। তাই বললাম, এরপর আপনি, হে পিতাজি? তিনি বললেন, 'আমি একজন সাধারণ মুসলমান।'[৩] উমর রাজি. যখন ইন্তিকাল করেন, আলি রাজি. তাকে দেখতে আসেন। তার দিকে তাকিয়ে কাঁদেন এবং বলেন, 'আপনার চেয়ে উত্তম কোনোকিছু নিয়ে আল্লাহর কাছে আমার যাওয়ার নেই। আল্লাহর শপথ! আমি জানতাম আপনি

---

১. সিয়ারু আলামিন নুবালা (২/৩৮৮)।
২. তারিখে ইয়াকুবি (১৭১); আল-ইসতিআব (৪/১৯৫৬) মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল বার; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৫/৩৩০); আত-তাবাকাতুল কুবরা, ইবনে সাদ (৮/৩৩৮-৩৩৯)। হিদায়াতুশ শিয়াহ (৬১)।
৩. বুখারি (৩৬৭১); আবু দাউদ (৪৬২৯)।

আপনার দুজন সঙ্গীর সাথেই (জীবনে ও মরণে) থাকবেন। কারণ, আমি সবসময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনতাম, 'আমি, আবু বকর ও উমর গিয়েছি; আমি, আবু বকর ও উমর ঢুকেছি; আমি, আবু বকর ও উমর বের হয়েছি।'[১] এই ছিল তাদের প্রতি আহলে বাইতের দৃষ্টিভঙ্গি। তা হলে পথভ্রষ্ট শিয়াদের কাজ কী এখানে?

বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে অন্যদের ছোট করা এবং অন্যদের অধিকার লঙ্ঘন করা মুসলমানদের দ্বীন নয়, বরং ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ধর্ম। মুসলমানরা ইহুদিদের নবিদের স্বীকার করে, মুসা আলাইহিস সালামকে ভালোবাসে, তার উপর অবতীর্ণ তাওরাতকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে স্বীকার করে। কিন্তু ইহুদিরা কেবল তাদের নবিদের সম্মান করে, ইসলামের নবিকে গালি দেয়। মুসলমানরা খ্রিষ্টানদের নবি ঈসা আলাইহিস সালামকে সম্মান করে, ভালোবাসে। তার উপর অবতীর্ণ ইনজিল কিতাবকে আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকৃতি দেয়। অথচ খ্রিষ্টানরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চরম ঘৃণা করে, কুরআনকে তার বানানো গ্রন্থ মনে করে। শিয়াদের অবস্থাও তেমন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আবু বকর, উমর ও উসমান রাজি.-কে যেমন ভালোবাসে, তেমন ভালোবাসে আলি, হাসান ও হুসাইন রাজি.-কে। আহলে সুন্নাত আয়েশা ও হাফসাকে যেমন ভালোবাসে, তেমন ভালোবাসে খাদিজা, ফাতিমা, জয়নব, রুকাইয়াহ ও উম্মে কুলসুম রাজি.-কে। কারণ, তারা সবাই রাসুলের কাছের মানুষ; সবাই রাসুলের পরিবার-পরিজন—রাসুলের স্ত্রী, শ্বশুর, জামাই, কন্যা, দৌহিত্র। কিন্তু শিয়ারা কেবল আলি-ফাতিমা ও হুসাইনকে ভালোবাসার জিকির করে। এটাকেই আহলে বাইতের ভালোবাসা দাবি করে। কেবল ভালোবাসা নয়, তাদের তথাকথিত ভালোবাসার ক্ষেত্রে এতটা সীমালঙ্ঘন করে যে, আবু বকর-আয়েশা, উমর-হাফসা ও উসমান—সবাইকে কাফের বলে; অন্ততপক্ষে ফাসেক ও জালেম মনে করে, তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে। এতেই তাদের বিভ্রান্তি উন্মোচিত হয়। মুসা আলাইহিস সালাম যেমন ইহুদিদের বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত, ঈসা আলাইহিস সালাম যেমন খ্রিষ্টানদের কখনও বলেননি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ রাখতে, একইভাবে আহলে বাইত শিয়াদের সকল বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত। তারা কখনোই তাদের ভালোবাসায় সীমালঙ্ঘন করে অন্য সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখতে বলেননি।

---

১. বুখারি (৩৬৮৫); ইবনে মাজা (৯৮)।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের প্রতি ভালোবাসা থেকে কেনো মুমিনের দূরে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, প্রত্যেক নামাজে সকল মুমিন-মুসলিমের নবিপরিবারের উপর সালাত-সালাম পাঠ করতে হয়। এমনকি নামাজের বাইরেও আমরা তাদের উপর সালাম পাঠ করি। বর্তমানে যদিও আওলাদে রাসুল সাইয়েদ/আশরাফ নাম ধারণ করে রাসুলের বংশের দাবিদারদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের মাঝে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করাও কঠিন, তথাপি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধারা আজও বিদ্যমান রয়েছে। ফলে বাস্তবিকপক্ষেই যদি কারও রাসুলের বংশধর হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে সকল মুসলিমের কর্তব্য হলো তাদের ভালোবাসা, সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা, তাদের যেকোনো প্রয়োজনে এগিয়ে আসা, তাদের সামনে রাখা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাজা-বাদশাহ কিংবা সে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাদের পরিবারকে ব্যতিক্রম দৃষ্টিতে দেখা হয়, রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের যত্ন-আত্তি করা হয়, তাদের বিশেষ বিশেষত্ব দান করা হয়; তা হলে দুনিয়া ও আখিরাতের সর্দার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের প্রতি মুসলমানদের কতটা দায়িত্ব তা তো সহজেই অনুমেয়।

শেষ কথা: সাহাবাদের ভালোবাসার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাতের মানহাজ হলো সবাইকে ভালোবাসা, কারও প্রতি বিদ্বেষ না রাখা, কারও ভালোবাসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন না করা। কারণ—যেমনটা পিছনে দেখানো হয়েছে—কারও ভালোবাসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করলে সেটা অন্যদের প্রতি জুলুমের দিকে ঠেলে দেয়। তাই সকল সাহাবিকে ভালোবাসতে হবে। আহলে বাইতের সাহাবাদের হৃদয়ের গভীর থেকে মহব্বত করতে হবে। তাদের প্রতি সরষেদানা পরিমাণ বিদ্বেষ রাখা যাবে না। আহলে বাইতের বাইরের সাহাবাদেরও দিলের গভীর থেকে ভালোবাসতে হবে। তাদের কারও প্রতি একবিন্দু শত্রুতা রাখা যাবে না। কারণ, তারা সবাই আল্লাহর রাসুলের সাহাবি। সবার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহে আল্লাহর সন্তুষ্টির ঘোষণা করা হয়েছে। হ্যাঁ, সকলের প্রতি ভালোবাসা ও অনুরাগ হয়তো সমান হবে না; সে হিসেবে কারও প্রতি ভালোবাসা কমবেশি হতে পারে; সেটা হৃদয়ের ব্যাপার। কিন্তু জোর করে কারও ভালোবাসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করা, তাকেই প্রচার-প্রসার করা, সবর্ত্র তার গুণগান বলে বেড়ানো—এসব নিষিদ্ধ অতিরঞ্জনের আওতায় পড়বে, ধীরে ধীরে বিচ্যুতির পথে নিয়ে যাবে। ইমাম আইউব সাখতিয়ানি রাহি.-এর কথাগুলো মনে রাখুন। এখান থেকে আহলে সুন্নাতের ভারসাম্যপূর্ণ মানহাজ শিখুন। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আবু বকর সিদ্দিক রাজি.-কে

ভালোবাসল, সে দ্বীন কায়েম করল; যে ব্যক্তি উমর রাজি.-কে ভালোবাসল, সে সুস্পষ্ট হকের উপর আছে; যে উসমান রাজি.-কে ভালোবাসল, সে দ্বীনের নুর অর্জন করল; যে আলি রাজি.-কে ভালোবাসল, সে দ্বীনকে মজবুত করে আঁকড়ে ধরল; যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের ব্যাপারে উত্তম কথা বলল, সে নিফাকি থেকে মুক্ত হয়ে গেল।'[১] একইভাবে ইমাম তহাবি রাহি.-এর বক্তব্য মনে রাখুন, **'যে ব্যক্তি রাসুলের সাহাবি, তাঁর পবিত্র সহধর্মিনী এবং তাঁর নিষ্কলুষ সন্তানদের ক্ষেত্রে উত্তম কথা বলে, সে মুনাফিকি থেকে মুক্ত।'** এভাবে রাফেজি ও নাসেবি নামক দুই প্রান্তিকতার মাঝামাঝি আহলে সুন্নাতের অবস্থান।

---

১. শরহুস সুন্নাহ, লালাকায়ি (৭/১৩১৬)।

وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنْ السَّابِقِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ أَهْلُ الْخَيْرِ وَالأَثَرِ، وَأَهْلُ الفِقْهِ وَالنَّظَرِ، لاَ يُذْكَرُونَ إِلاَّ بِالْجَمِيلِ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ.

সালাফের অগ্রগামী উলামায়ে কেরাম এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী সকল মুহাদ্দিস ও ফকিহকে কেবল উত্তমরূপেই স্মরণ করা হবে। যে ব্যক্তি তাদের ব্যাপারে মন্দ আলোচনা করবে, সে বিপথগামী।

ব্যাখ্যা

উলামা ও আউলিয়া-সম্পর্কিত আকিদা

আলিমদের ভালোবাসা আবশ্যক: যদি প্রশ্ন করা হয়, আজ আপনি যে নিজেকে মুমিন-মুসলিম হিসেবে দেখতে পাচ্ছেন, সে ইসলাম আপনার কাছে পৌঁছেছে কীভাবে? আপনি কুরআন পড়ছেন, কুরআন কারা শিখিয়েছে আপনাকে? আপনি হাদিস পড়ছেন, হাদিসের কিতাবগুলো কারা লিখেছেন? কারা শহরের পর শহর গোটা দুনিয়া চষে এই হাদিসগুলো একত্র করেছেন? কারা লক্ষ লক্ষ জাল হাদিস থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশুদ্ধ হাদিসগুলো আপনার জন্য বাছাই করে সংরক্ষণ করেছেন? কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আপনি আল্লাহর ইবাদত করছেন। কারা কুরআন-সুন্নাহর গভীর সমুদ্র থেকে এগুলো বের করে আপনার সামনে সাজিয়ে-গুছিয়ে সুবিন্যস্তভাবে পেশ করেছেন? কারা আপনাকে এবং আপনার বাপ-দাদাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে বের করার জন্য নিজেদের ঘর-সংসার ত্যাগ করে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছেন? কারা ময়দানে বুকের তাজা খুন ঢেলে যুগে যুগে ইসলামকে হেফাজত করেছেন? কারা ভ্রান্ত মতবাদগুলোর কালো থাবা থেকে ইসলামকে দীর্ঘ চৌদ্দশো বছর যাবৎ সবচেয়ে বিশুদ্ধরূপে ঠিক যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছিলেন আপনার জন্য সংরক্ষণ করেছেন,

যার ফলে আপনি বলতে পারছেন, আপনি ঠিক সেই ইসলামের উপর আছেন, যার উপর ছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবাগণ? আপনার কাছে ঠিক সেই কুরআন আছে, যা অবতীর্ণ হয়েছিল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে? আপনার আকিদা ঠিক তা-ই, যে আকিদা রাখতেন আবু বকর ও উমর রাজি.? এই সকল প্রশ্নের উত্তর একটাই: উলামায়ে কেরাম। জি হাঁ, যুগে যুগে আলিমগণ আপনার জন্য, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য নিজেদের পার্থিব সুখ-শান্তি, ভোগ-বিলাস বিসর্জন দিয়ে দ্বীন ও দাওয়াতের কাজ করে গেছেন। প্রত্যেকটি যুগে আল্লাহ তায়ালা উম্মাহর জন্য একদল আলিম তৈরি করেছেন, যারা আগের প্রজন্ম থেকে দ্বীনের বিশুদ্ধ উত্তরাধিকার পরের প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়েছেন। উলামায়ে কেরামের প্রথম কাতারে ছিলেন স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম, অতঃপর তাবেয়িন, অতঃপর তাবে তাবেয়িন, অতঃপর সালাফের একাধিক প্রজন্ম, অতঃপর খালাফ বা পরবর্তী আলিমগণ। এভাবে প্রত্যেকটি যুগে উলামায়ে কেরাম ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কাজ করে গেছেন।

ফলে মুসলিম উম্মাহ সকল যুগের হকপন্থি আলিমদের কাছে ঋণী। তাদের ধর্মীয় জীবনের পরতে পরতে উলামায়ে কেরামের ভূমিকা বিদ্যমান। এ জন্য উলামায়ে কেরাম তাদের দোয়া ও ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য; তাদের বিদ্বেষ ও ঘৃণা থেকে উর্ধ্বে থাকার উপযুক্ত। মুসলিম উম্মাহও আলিমদের এই ঋণ প্রত্যেক যুগে উপলব্ধি করেছে। ফলে সাধারণ মুসলিমগণ তাদের ভালোবেসেছে, সম্মানের চোখে দেখেছে, তাদের শ্রদ্ধা করেছে।

কুরআন-সুন্নাহে উলামায়ে কেরামের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

অর্থ: 'আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ আহলুল ইলম (জ্ঞানীগণও) সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।' [আলে ইমরান: ১৮] এখানে আল্লাহ ও ফেরেশতাদের সাক্ষ্যের সঙ্গে আলিমদের সাক্ষ্যের মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হয়েছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ

অর্থ: ‘আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলিমরাই তাঁকে ভয় করে।’ [ফাতির: ২৮] আরেক জায়গায় আল্লাহ আলিম ও জাহিলের মাঝে পার্থক্য করে বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থ: ‘বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?’ [জুমার: ৯] আলিমদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়ার ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন,

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ

অর্থ: ‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদের ইলম দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দেবেন।’ [মুজাদালা: ১১]

অসংখ্য হাদিসে উলামায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আবুদ দারদা থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ‘যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য একটি পথ অবলম্বন করবে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন। তালিবুল ইলমের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ফেরেশতারা তার জন্য তাদের ডানা বিছিয়ে দেন। একজন আলিমের জন্য আকাশমণ্ডল ও জমিনে যা-কিছু আছে, এমনকি সমুদ্রের মৎস পর্যন্ত ইস্তিগফার করে। সাধারণ একজন আবিদের তুলনায় একজন আলিমের মর্যাদা তেমন, যেমন চাঁদের মর্যাদা অন্য সকল তারার তুলনায়। নিশ্চয়ই আলিমগণ নবিদের উত্তরসূরি। আর নবিগণ দিনার-দিরহাম রেখে যাননি; তাঁরা ইলম রেখে গিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করল, সে বিপুল সম্পদ লাভ করল।’[১] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, ‘একজন আবিদের উপর একজন আলিমের মর্যাদা ঠিক ততটা, যতটা তোমাদের সর্বনিম্ন ব্যক্তির তুলনায় আমার মর্যাদা। মানুষকে যারা কল্যাণ শেখায়, তাদের উপর আল্লাহর ফেরেশতা, আকাশ ও জমিনের যা-কিছু আছে, এমনকি গর্তের পিপীলিকা ও সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত দোয়া করে।’[২] আরেকটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘যে ব্যক্তি বড়কে সম্মান করে না, ছোটকে স্নেহ করে না আর আমাদের আলিমদের অধিকার আদায় করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।’[৩] অন্য

---

১. তিরমিজি (২৬৮২); আবু দাউদ (৩৬৪১); ইবনে মাজা (২২৩)।
২. তিরমিজি (২৬৮৫); দারেমি (২৯৭); আল-মুজামুল কাবির (৭৯১১)।
৩. হাকেম (৪২০); মুসনাদে আহমদ (২৩১৩৮)।

হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'বৃদ্ধ মুসলিম, **কুরআনের বাহক** ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসককে সম্মান করা মূলত আল্লাহকেই সম্মান করা।'[১]

আলিমের পরিচয়: সাধারণ শিক্ষিত মুসলিমগণ যখন এসব হাদিস শোনেন, তখন তাদের কেউ কেউ এগুলোকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করতে চান। তাদের কথা, উক্ত আয়াত ও হাদিসগুলোতে 'ইলম' তথা জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে; আলিম তথা জ্ঞানীর কথা বলা হয়েছে। সুতরাং কেবল ইসলামি জ্ঞানের অধিকারী আলিমগণ নন, যেকোনো জ্ঞানী এসব শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হবে। আমরা বিনয়ের সঙ্গে বলব, কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসে সাধারণভাবে ইসলামে সকল ধরনের জ্ঞানের মূল্য বোঝা গেলেও এখানে আলিম বলতে সকল জ্ঞানী নয়, বরং ইসলামি জ্ঞানের অধিকারীকেই বোঝানো হয়েছে। অন্য কথায়, ইসলামে মানব কল্যাণের জন্য অর্জিত সকল জ্ঞান অর্জনই পুণ্যের কাজ। কেউ যদি মুসলমানদের সেবার জন্য চিকিৎসাবিদ্যা শেখে এবং একজন মানবসেবী চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন দেখে, তবে সে আল্লাহর কাছে মেডিকেলে পড়েও পুণ্য লাভ করবে। কেউ যদি বিজ্ঞান শেখে ইসলাম ও মুসলমানদের জীবন সহজ করার জন্য, কেউ যদি ব্যাবসা নিয়ে পড়াশোনা করে হালাল ব্যাবসার উদ্দেশ্যে, মুসলমানদের মাঝে হালাল ব্যাবসার গুরুত্ব তুলে ধরা এবং হালাল ব্যাবসা ছড়িয়ে দেওয়ার নিমিত্তে, তবে ব্যাবসা নিয়ে পড়ার মাঝেও সে পুণ্য লাভ করবে। বিপরীতে কেউ যদি কুরআন ও হাদিস শেখে মানুষ ও দুনিয়ার জন্য, তবে সে আল্লাহর কাছে কোনো পুণ্য লাভ করবে না। তা হলে দেখা যাচ্ছে, কেবল নিয়তের উপর ভিত্তি করে পার্থিব বিদ্যাগুলো শেখার মাঝেও পুণ্য থাকতে পারে, আর কুরআন-সুন্নাহ শেখাও শাস্তির কারণ হতে পারে। ফলে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ইসলামে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ।

কিন্তু এটা বিশেষ অবস্থার বর্ণনা। সাধারণ অবস্থায় পার্থিব বিদ্যাগুলো পার্থিব উদ্দেশ্যেই শেখা হয়, আর দ্বীনি ইলম দ্বীন ও আল্লাহর জন্যই শেখা হয়। তদুপরি যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিই, একজন চিকিৎসাবিদ্যা পড়ছে মুসলমানদের সেবার জন্য, আরেকজন তাফসির ও হাদিস পড়ছে দ্বীনের জন্য—দুটোর পুণ্য সমান? কখনোই নয়। কারণ, উদ্দেশ্য দুজনেরই আল্লাহকে খুশি করা। ফলে উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে দুজন বরাবর পুণ্যের অধিকারী। কিন্তু একজন আলিম তার পড়াশোনার ক্ষেত্রে কুরআনের যেসব আয়াত পড়বে, যেসব হাদিস পড়বে, যতবার আল্লাহকে স্মরণ করবে, রাসুলুল্লাহ

---

১. আবু দাউদ (৪৮৪৩); কোনো কোনো বর্ণনায় এটা মাওকুফ এসেছে। দেখুন: সুনানে কুবরা, বাইহাকি (১৬৭৫৫); মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (২২৩৫৩)।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাম পড়বে, তাকওয়া, ইখলাস, কলবের নুর ও তাজকিয়ার ক্ষেত্রে যতদূর এগিয়ে যাবে, একজন মেডিকেল শিক্ষার্থী চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইগুলোতে তার কিছুই পাবে না। ফলে দুটোকে কখনোই এক করে দেখা সঠিক নয়। বরং আমরা যদি কুরআন-হাদিসের গভীর মর্মের প্রতি লক্ষ করি, তবে দেখব, সেখানে ইলম বলতে ইলমে শরয়িই বোঝানো হয়েছে; শরিয়তের ইলমের প্রতিই উৎসাহিত করা হয়েছে, দুনিয়ার ইলম নয়। বিখ্যাত মুহাদ্দিস সহিহ ইবনে হিব্বানের সংকলক ইমাম ইবনে হিব্বান (আলিমগণ নবিদের উত্তরসূরি) হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'উক্ত হাদিসে স্পষ্ট যে, এখানে ইলম বলতে দ্বীনি ইলম উদ্দেশ্য; আর উলামা বলতে শরিয়তের ইলমের অধিকারীদের বোঝানো হয়েছে, অন্যান্য ইলম নয়। কারণ, হাদিসে আলিমদের নবিদের ইলমের উত্তরসূরি বলা হয়েছে। আর এটা অজানা নয় যে, নবিদের ইলম হচ্ছে দ্বীনি ইলম। আমাদের নবিজির ইলম হচ্ছে তাঁর সুন্নাহ (হাদিস)। সুতরাং যে এটা অর্জন করবে না, সে আলিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।'[১]

তবে উক্ত কথা শুনে সাধারণ শিক্ষিত মুসলিমদের মন খারাপ করার কিছু নেই। কারণ, ইসলাম আল্লাহর প্রেরিত ধর্ম, মানব-রচিত ধর্ম নয়। ফলে ইসলামে অন্যান্য ধর্মের মতো পৌরোহিত্য নেই। ইসলামে আলিম-সমাজ অন্যান্য ধর্মের ব্রাহ্মণ-ভিক্ষু নন। ফলে এটা কারও জন্য বংশসূত্রে পাওয়া কিংবা কেনা পদ নয়; বরং যেকোনো বয়সে যেকোনো অবস্থা থেকে উঠে এসে যে-কেউ আলিম হতে পারবে। কারও যদি মনে হয় যে, আলিমগণ দ্বীনের সঠিক ব্যাখ্যা করছেন না, তা হলে তিনি নিজে মাদ্রাসায় ভর্তি হবেন, আরবি শিখবেন, কুরআন-হাদিসের গভীর জ্ঞান অর্জন করবেন। এর পর মানুষকে দ্বীনের সঠিক ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবেন। তা হলে আর আলিমদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে হবে না; উদ্দেশ্যও পূর্ণ হবে।

উলামায়ে কেরাম ও মুসলিম উম্মাহর সম্পর্কের জটিলতা: বর্তমান সময়ে আলিম ও সাধারণ শিক্ষিত মুসলিমদের মাঝের সম্পর্ককে খুব একটা স্বস্তিদায়ক বলা যায় না। এখানে দুটি জটিলতা আছে।

এক. উম্মাহর মাঝে সকল যুগে এমন একটি শ্রেণী ছিল, যারা আলিমদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছে। আলিমদের প্রতি নিজেরা বিদ্বেষ রেখেছে এবং অন্যদের বিদ্বেষের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। এর মূল কারণ ছিল এই শ্রেণির ধমহীনতা ও বস্তুবাদিতা।

---

১. সহিহ ইবনে হিব্বান (৮৮)।

ফলে হকপন্থি আলিমগণ তাদের পথের কাঁটা ছিলেন। তারা অন্যায়ের পথ সুগম করতে, স্বেচ্ছাচারিতার পথ প্রশস্ত রাখতে আলিমদের বিদ্বেষ নিজেদের জীবনের মিশন বানিয়ে নিয়েছে। এরা মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে জিন্দিক নামে পরিচিত। বর্তমানে নাস্তিক-সেকুলার, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, বিভিন্ন ধর্মহীন দর্শনের অনুসারী রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক এবং ইসলামের নামে বাণিজ্যকারী বিভিন্ন সম্প্রদায় এই দলের প্রতিনিধিত্ব করে।

দুই. স্বয়ং আলিমদের ভিতরে তৈরি হওয়া জটিলতা। এক শ্রেণির আলিমরা স্খলনের শিকার হয়েছে। তাদের দ্বীনদারি ও নীতি-নৈতিকতা দুনিয়ার কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়েছে। দুনিয়ার জন্য তারা দ্বীনকে বিক্রি করে দিয়েছে। ফলে সাধারণ মুসলিম উম্মাহ তাদের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বিভ্রান্ত ও পথচ্যুত হয়েছে। হকপন্থি আলিমদের সঙ্গে তাদের বিবাদ হয়েছে। সাধারণ মানুষের মাঝে এটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। অনেক সময় হপকন্থি আলিমগণ নিজেদের গৌণ ও শাখাগত মতভেদের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করেছেন; নফল ও বৈধ বিষয়ের ক্ষেত্রে কুফর ও শিরকের মতো প্রচণ্ডতা নিয়ে পরস্পর লড়াই করেছেন, যা সাধারণ মানুষের আলিমদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে দিয়াশলাই হিসেবে কাজ করেছে। সমাজে একটা বিশাল সংখ্যক মুসলিম তৈরি হয়েছে, যারা দ্বীনের ক্ষেত্রে আলিমদের শত্রু ভাবা শুরু করেছে, তাদের দ্বীন ও উম্মাহর জন্য ক্ষতিকর হিসেবে দেখছে।

এভাবে সাধারণ মানুষ ও আলিমদের মাঝে যখন দূরত্ব তৈরি হয়েছে, তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কেবল ইসলাম ও মুসলমানেরা; উপকৃত হয়েছে অমুসলিমরা; ইসলামের শত্রুরা। কারণ, মানুষ যখন হক্কানি আলিমদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে, আলিম ও সাধারণ মুসলিমদের মাঝে যখন দূরত্ব তৈরি হবে, তখন সবাই ভ্রান্ত আলিমদের কাছে যাবে, তাদের কাছ থেকে দ্বীন শিখবে। যেহেতু সাধারণ মানুষের কুরআন-সুন্নাহ শেখা সম্ভব হবে না, আর হলে তো তাদের সাধারণ মানুষ বলা হতো না। ফলে তাদের আলিমদের উপর নির্ভরশীল হতেই হবে। কিন্তু যখন হকপন্থি আলিমদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হবে, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিলপন্থি আলিম, অন্য কথায় জাহিলদের প্রতি আস্থা তৈরি হবে। এভাবে সবাই বিভ্রান্তির শিকার হবে।

এটা আমাদের বক্তব্য নয়, স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গিয়েছেন। হাদিসে এসেছে, 'আল্লাহ তায়ালা ইলমকে মানুষের বুক থেকে উঠিয়ে

নেবেন না, বরং আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেবেন। একপর্যায়ে যখন কোনো আলিম থাকবে না, তখন মানুষ জাহেলদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে; তাদের কাছে ফতোয়া চাইবে। আর তারা ইলম ছাড়া ফতোয়া দেবে। ফলে নিজেরা গোমরাহ হবে, অন্যদের গোমরাহ করবে।'[১] উক্ত হাদিসটি অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। আলিমদের ভুলত্রুটি থাকা সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহর জীবনে হকপন্থি আলিমদের উপস্থিতি যে কতটা জরুরি, তা এখানে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলির সঙ্গে শত্রুতা করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি।'[২] আর হকের উপর অবিচল উলামায়ে কেরাম আল্লাহর ওলি। ইমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ি রাহি. থেকে বর্ণিত আছে, 'যদি ফুকাহায়ে কেরাম আল্লাহর ওলি না হন, তবে আল্লাহর কোনো ওলি নেই।'[৩]

আমাদের মনে রাখতে হবে, পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী কোনো আলিম নিষ্পাপ নন। ফলে আলিমগণ স্খলনের শিকার হতে পারেন, আলিমদের ভুল হতে পারে। তাদের পারস্পরিক মতভেদ কখনও কখনও মানবিক দুর্বলতার কারণে বিভেদ ও বিসংবাদে রূপ নিতে পারে। সেক্ষেত্রে তাদের মাজুর মনে করতে হবে। তাদের ভালো দিকগুলো আলোচনা করতে হবে, মন্দ দিকগুলো এড়িয়ে যেতে হবে। ভালো কাজে তাদের অনুসরণ করতে হবে। মন্দ কাজে অনুসরণ বর্জন করতে হবে। এটা করলে মুসলমানরাই উপকৃত হবেন। যতদিন ইসলাম ও মুসলমানদের থাকতে হবে, ততদিন আলিমদেরও থাকতে হবে। হকপন্থি ও খোদাভীরু আলিমগণ থেকে উম্মাহ কখনোই অমুখাপেক্ষী হতে পারবে না। অপরদিকে আলিমদেরও দায়িত্ব হলো নিজেদের মর্যাদাকে চেনা ও জানা। আল্লাহ তায়ালা তাদের যে সম্মান ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, সেটা সুরক্ষিত রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করা। এমন কোনো স্খলন থেকে দূরে থাকা, যা সাধারণ মুসলিমের চোখ থেকে তাদের ফেলে দেয়। তাদের মনে রাখতে হবে, তাদের সম্মানের মাঝেই কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফের সম্মান। তারা নবিদের উত্তরাধিকারী, সালাফের ওয়ারিশ ও প্রতিনিধি। তাদের ব্যাপারে যদি উম্মাহর কাছে ভুল বার্তা পৌঁছয়, উম্মাহ যদি তাদের নেতিবাচক চিত্রই বেশি দেখে, তবে গোটা ইসলামি শরিয়ত প্রশ্নবিদ্ধ হবে। মুসলমানদের কাছে সালাফের ভুল চিত্র পৌঁছবে।

---

১. বুখারি (১০০); মুসলিম (২৬৭৩); তিরমিজি (২৬৫২)।
২. বুখারি (৬৫০২); বাইহাকি (সুনানে কুবরা) (৬৪৮৬); মুসনাদে আবু ইয়ালা (৭০৮৭)।
৩. শরহুল মুহাজ্জাব, নববি (১/২৪)।

মোট কথা, হকপন্থি আলিমগণ হচ্ছেন একটি উম্মাহর রুহ ও আত্মাস্বরূপ। উম্মাহর সাধারণ মুসলিমগণ যখন পার্থিব জীবন, ক্যারিয়্যার, শিক্ষাদীক্ষা, চাকরি-বাকরি, ব্যাবসা-বাণিজ্য, ভোগ-বিলাস ইত্যাদি নিয়েই ব্যস্ত, নিজেকে ও পরিবারকে নিয়েই তাদের যত স্বপ্ন, উম্মাহর আলিমগণ তখন কুরআন-সুন্নাহর অধ্যয়ন ও প্রচার-প্রসার, বাতিল ফিরকার বিরুদ্ধে মুসলমানদের সতর্ককরণ, সমাজের সবধরনের অন্যায়-অনাচারের প্রতিরোধ, কাফের ও মুশরিকদের হাত থেকে দ্বীন ও উম্মাহকে বাঁচানোর ফিকিরে মগ্ন থাকেন; দুনিয়ার সামান্য পরিমাণে সন্তুষ্ট থেকে উম্মাহর জন্য, আখিরাতের জন্য কাজ করেন। ফলে তাদের বিদ্যমান থাকাটা জরুরি। উম্মাহর পক্ষ থেকে তাদের সম্মান ও মর্যাদা পাওয়া জরুরি। কোনো ভূখণ্ডে মুসলিমদের থেকে যখন হকপন্থি আলিম-সমাজ বিলুপ্ত হয়ে যান, তখন সেই ভূখণ্ডের মুসলিমগণ বেশি সময় দ্বীনের উপর টিকে থাকতে পারে না। কারণ, তাদের রক্ষাকবচ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিসে সাহাবাদের রক্ষাকবচ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বর্ণনায় এসেছে, 'এক রাতে তিনি সাহাবাদের সামনে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, আকাশের তারকাগুলো তার সুরক্ষা। যখন এগুলো থাকবে না, তখন আকাশ সুরক্ষিত থাকবে না। আমি আমার সাহাবাদের জন্য সুরক্ষা। আমি যখন চলে যাব, আমার সাহাবারা বিপদে আক্রান্ত হবে। আর আমার সাহাবারা আমার উম্মতের জন্য রক্ষাকবচ। তারা যখন চলে যাবে, তখন আমার উম্মত মুসিবতে আক্রান্ত হবে।'[১] উলামায়ে কেরাম নবিদের উত্তরসূরি। ফলে তারা সাহাবাদেরও উত্তরসূরি। সাহাবাগণ চলে যাওয়ার পরে তাবেয়িরা রক্ষাকবচ ছিলেন। তাবেয়িদের পর তাবে-তাবেয়িরা। এভাবে প্রত্যেক যুগের হকপন্থি আলিমগণ মুসলিম উম্মাহর ঈমান ও অস্তিত্বের সুরক্ষা-প্রাচীর।

আলিমদের সঙ্গে সাধারণ মুসলিমদের দূরত্ব অত্যন্ত ভয়াবহ ব্যাপার। দুঃখজনকভাবে আজ সমাজে অনেক সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতই আলিমদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে; বিপরীতে খ্রিষ্টধর্মের পোপ, হিন্দুদের পুরোহিত, বৌদ্ধদের ভিক্ষু তাদের কাছে অনেক ভালো লাগে; ধর্মীয় স্বাধীনতা, মানবতা ও শুদ্ধতার প্রতীক মনে হয়; আলিমদের দেখলে কপাল কুঁচকে যায়; কেবল সমকালীন আলিম নয়, সালাফের আলিমদের প্রতিও বিদ্বেষ রাখে; তাদের নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে; বরং দ্বীন বোঝার ক্ষেত্রে তাদের অন্তরায় মনে করে; সালাফের আলিমদের অনুসরণকে তারা

---

১. মুসলিম (২৫৩১); ইবনে হিব্বান (৭২৪৯)।

ব্যক্তিপূজা হিসেবে আখ্যা দেয়। অনেকে চরম দুঃসাহসের সঙ্গে বলে, সালাফের নামে সেই আগের যুগের লোকদের গোলামি কেন করব? আমাদের কাছে কুরআন-সুন্নাহ আছে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান রয়েছে; তা দিয়ে আমরা তাদের চেয়ে কুরআন-সুন্নাহ বেশি বুঝব। নিত্য-নতুন গবেষণা করে কুরআন-সুন্নাহর নব নব দিগন্ত আবিষ্কার করব। অথচ এসব মিসকিন জানে না কুরআন-হাদিস সালাফের বুঝে বোঝা কতটা জরুরি। যে ব্যক্তি সালাফের বুঝে কুরআন-সুন্নাহ বুঝবে না, তার পরিণতি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি। কিয়ামতের আগ পর্যন্ত সালাফের মতো কুরআন-সুন্নাহে বিশেষজ্ঞ প্রজন্ম আর আসবে না। কুরআন হাদিস তো সকল সম্প্রদায়ের কাছেই ছিল—খারেজিদের কাছে কুরআন ছিল, মুরজিয়া ও জাহমিয়্যাদের কাছে কুরআন-সুন্নাহ ছিল, মুতাজিলাদের কাছে ছিল, শিয়াদের কাছে ছিল ও আছে, কাদিয়ানিদের কাছে আছে। অর্থাৎ দুনিয়ার সকল গোমরাহ ফিরকার কাছেই কুরআন-সুন্নাহ আছে; কিন্তু আহলে সুন্নাত ও তাদের মাঝে পার্থক্য হলো আহলে সুন্নাত সালাফে সালেহিনের মানহাজে, প্রথম যুগের ইমামদের বুঝের আলোকে কুরআন-সুন্নাহকে বুঝেছে। ফলে আজ চৌদ্দশো বছর পরেও তারা সেই দ্বীনের উপর আছে, যার উপর ছিলেন স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাই যারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আলিমদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে, সালাফের বুঝে কুরআন-সুন্নাহ বোঝার গুরুত্বকে অস্বীকার করে, তাদের পরিণতি নিশ্চিত পদস্খলন। আমাদের দেশে হাদিস অস্বীকারকারী ও উলামাবিদ্বেষী এক শ্রেণির বাউল-ফকির, বিদআতি ও সুফি মতাদর্শের লোকেরা সালাফ ও খালাফের সকল আলিমকে অপছন্দ করে, আলিমদের দ্বীন বিকৃতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে। ফলাফল আমাদের সামনে—প্রতিনিয়ত গোমরাহির অতলান্তে হারিয়ে যাচ্ছে এরা।

এ কারণে উম্মাহ ও আলিমদের সম্পর্কটা হতে হবে অনেক মবজুত, অনেক গভীর। এই গভীরতা আরও বাড়ানোর জন্য কাজ করতে হবে। এই সম্পর্কের জন্য ধ্বংসাত্মক যেকোনো কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। একইভাবে আলিম ও তালিবুল ইলমদেরও নিজেদের অতীতের আলিমদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে, মুসলিম উম্মাহর সকল হকপন্থি আলিমকে ভালোবাসতে হবে, তারা যেকোনো ধারারই হোন না কেন। আলিমদের প্রতি ভালোবাসাকে কেবল মতাদর্শের মানদণ্ডে বিচার করা ঠিক হবে না। ফলে নিজ ঘরানার আলিমদের ভালোবাসব, আর অন্য ঘরানার আলিমদের কেবল ভিন্ন ঘরানার হওয়ার কারণে সমালোচনা করব কিংবা তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখব—এটা সঠিক হতে পারে না। আলিমগণ যদি আলিমদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিশীল না হন, তারা যদি একে অপরের প্রতি সহিষ্ণু না হন, সাধারণ মানুষ

তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এমন আশা করেন কীসের ভিত্তিতে? এটাকেই ইমাম তহাবি সংক্ষেপে বলেছেন, **'সালাফের অগ্রগামী উলামায়ে কেরাম এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী সকল মুহাদ্দিস ও ফকিহকে কেবল উত্তমরূপেই স্মরণ করা হবে। যে ব্যক্তি তাদের ব্যাপারে মন্দ আলোচনা করবে, সে বিপথগামী।'**

সালাফের কিতাবগুলো আলিমদের প্রতি তাদের আদব ও সমীহের বিস্ময়কর ঘটনা দিয়ে ভরপুর। সেগুলো নিয়মিত পড়লে বাস্তব জীবনে চর্চা করতে সহজ হবে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের ছেলে আবদুল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, শাফেয়ি কত উঁচু পর্যায়ের লোক ছিলেন? আপনাকে সবসময় দেখি তার জন্য দোয়া করতে। ইমাম আহমদ বলেন, 'বৎস, তিনি দুনিয়ার জন্য সূর্য ছিলেন, আর মানুষের জন্য সুস্থতা ছিলেন। এই দুটোর বিকল্প আছে?'[১] আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, 'যে ব্যক্তি আলিমদের তুচ্ছ করবে, তার আখিরাত বরবাদ হয়ে যাবে। যে শাসকদের তুচ্ছ করবে, তার দুনিয়া বরবাদ হয়ে যাবে।'[২] ইবনে আসাকির বলেন, 'যে ব্যক্তি আলিমদের বদনামে লিপ্ত হয়, তার হৃদয় মরে যায়।'[৩] ইবনে নুজাইম লিখেছেন, 'যদি কেউ বিনা কারণে কোনো আলিম বা ফকিহকে গালি দেয়, তবে তার কাফের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।'[৪]

---

১. সিয়ারু আলামিন নুবালা (৮/২৫২)।
২. প্রাগুক্ত (১৩/৪৬)।
৩. তাবয়িনু কাজিবিল মুফতারি, ইবনে আসাকির (৪২৫)।
৪. আল-বাহরুর রায়েক (৫/১৩২)।

وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَنَقُولُ نَبِيٌّ وَاحِدٌ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ. وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ، وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ.

আমরা কোনো ওলিকে নবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করি না। বরং আমরা বলি, মাত্র একজন নবি সকল ওলির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমরা তাদের থেকে প্রকাশিত কারামত এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত তাদের অন্যান্য ঘটনায় বিশ্বাস রাখি।

ব্যাখ্যা

নবিগণ ওলিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ: পিছনে আমরা বলেছি, ওলি অর্থ হলো আল্লাহর বন্ধু। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং তাঁকে ভয় করে, শরিয়ত ও সুন্নাহর উপর অবিচল থাকে, সে-ই আল্লাহর ওলি। [ইউনুস: ৬২-৬৩] সে হিসেবে যেকোনো মুমিন আল্লাহর ওলি হতে পারে। এর জন্য সদিচ্ছা, মনের দৃঢ় সংকল্প ও আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠা, তাঁর দাসত্ব ও সুন্নাহর ভালোবাসা থাকলেই যথেষ্ট। এর বিপরীতে নবুওত হলো আল্লাহর অনুগ্রহ। এটা কেউ চাইলেই অর্জন করতে পারে না; বরং আল্লাহ যাদের মনোনীত করেন, কেবল তারাই নবি ও রাসুল হতে পারেন। এর মাধ্যমেই নবিদের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে, সাধারণ মুমিনদের চেয়ে তাদের ভিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়। পিছনে আমরা আরও বলেছি, নবিগণ গোটা মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ; বিপরীতে ওলিগণ তা নন। নবিগণ মাসুম, ওলিগণ মাসুম নন। সকল নবি ওলি, কিন্তু সকল ওলি নবি নন।

প্রশ্ন আসতে পারে, তা হলে ইমাম তহাবি এখানে কাদের খণ্ডন করেছেন? এত স্পষ্ট ও সহজ বর্ণনা থাকার পরেও কারা ওলিদের নবিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেছে? অথচ নবিদের শ্রেষ্ঠত্ব সত্বঃসিদ্ধ ও প্রমাণিত বিষয়। ফলে ইসলাম সম্পর্কে অবগত ও ইসলামের বিধিবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কোনো ব্যক্তি কি কোনো ওলিকে নবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলতে পারে?

হ্যাঁ, পারে। এত সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকার পরেও অনেকে বিপরীত বক্তব্য দিয়েছে। আমরা এখানে উদাহরণস্বরূপ কিছু বক্তব্য উল্লেখ করব। অতঃপর সেগুলোর উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ পেশ করব। শাইখ মুহিউদ্দিন **ইবনে আরাবি** বলেন, 'বেলায়াত হলো প্রশস্ত প্রান্তর। নবুওত এর একটি অংশ। ...রিসালাতের অর্থ হলো আল্লাহর কাছ থেকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ফলে এটা একটা 'হাল', 'মাকাম' নয়। পৌঁছে দেওয়া সম্পন্ন হয়ে গেলে এটা অবশিষ্ট থাকে না।'[১] কিন্তু বেলায়াত অবশিষ্ট থাকে। যা তিনি অন্য গ্রন্থে বলেছেন। 'ফুসুসে' লিখেন, 'আর এটা আল্লাহ সম্পর্কে সর্বোচ্চ স্তরের ইলম। এই ইলম কেবল সর্বশেষ রাসুল (খাতামুর রুসুল) ও সর্বশেষ ওলির (খাতামুল আওলিয়া) রয়েছে। নবি ও রাসুলদের কেউ সেখানে পৌঁছতে হলে সর্বশেষ রাসুলের প্রদীপের আলোতে পৌঁছতে হয়। ওলিদের কারও সেখানে পৌঁছতে হলে সর্বশেষ ওলির আলোতে পৌঁছতে হয়। এমনকি রাসুলগণও সেখানে খাতামুল আওলিয়ার আলো ছাড়া পৌঁছতে পারেন না। কেননা তাশরিয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে রিসালাত ও নবুওত শেষ হয়ে যায়, কিন্তু বেলায়াত কখনও শেষ হয় না। ফলে রাসুলগণ ওলি হিসেবে আমরা যা উল্লেখ করেছি সেখানে খাতামুল আওলিয়ার মাধ্যম ছাড়া পৌঁছতে পারেন না। ফলে সাধারণ ওলিগণ যে পৌঁছতে পারবে না তা তো স্পষ্টই। তবে খাতামুল আউলিয়া যেহেতু খাতামুর রুসুল-এর আনীত শরিয়তের অনুসারী, তাই এটা তার মাকামের জন্য মানহানিকর নয়। কোনো দিক থেকে তিনি নিচে থাকলেও আরেক দিক থেকে ঠিকই উপরে...।'[২]

শাইখ **আবুল কাদের জিলানি** থেকে বর্ণিত আছে, 'হে নবিগণ, আপনারা লকব পেয়েছেন; কিন্তু আমরা যা পেয়েছি আপনারা তা পাননি।[৩] শাইখ আবু ইয়াজিদ (বায়েজিদ) বোস্তামি বলেন, 'আমরা এমন সাগরের গভীরে ডুব দিয়েছি, নবিগণ যার সৈকতে দাঁড়িয়ে আছেন।'[৪] উক্ত বক্তব্য শাইখ আবুল গাইস ইবনে জামিল থেকেও বর্ণিত আছে।[৫]

এসব বক্তব্য বেশ খতরনাক। নবিগণ অন্য সকল মানুষের চেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ; বরং একজন নবি সকল ওলির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যেমনটা ইমাম তহাবি লিখেছেন, **'আমরা**

---

১. আল-ফুতুহাতুল মাক্কিয়্যাহ, ইবনে আরাবি (২/২৫৬-২৫৭)।
২. ফুসুসুল হিকাম, ইবনে আরাবি (৬২-৬৩)।
৩. ইনসানে কামেল, আবদুল করিম জিলি (১/১২৫)।
৪. আল-ইবরিজ মিন কালামিদ দাব্বাগ (৩৯৪)।
৫. ইনসানে কামেল, আবদুল করিম জিলি (১/১২৫)।

কোনো ওলিকে নবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করি না; বরং আমরা বলি, মাত্র একজন নবি সকল ওলির চেয়ে শ্রেষ্ঠ।' সুতরাং নবিদের চেয়ে ওলিদের শ্রেষ্ঠ ভাবা এবং সর্বশেষ ওলিকে সকল নবি-রাসুলের চেয়ে উত্তম মনে করা সুস্পষ্ট গোমরাহি।

প্রশ্ন হতে পারে, শাইখ আবদুল কাদের জিলানি, বোস্তামি কিংবা ইবনে আরাবির মতো মানুষ এসব কথা কীভাবে বললেন? ইবনে তাইমিয়া এবং এ ধারার আলিমগণ এগুলো যেভাবে আছে বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতেই হুকুম আরোপ করেন। ফলে তারা এসব কথাকে মিথ্যা, সীমালঙ্ঘন বরং কুফর মনে করেন।[১] ইবনে আবিল ইজ এ ব্যাপারে ইবনে আরাবির কিছু বক্তব্য উল্লেখ করে লিখেছেন, ইবনে আরাবির কুফর মক্কার কাফেরদের কুফরের চেয়েও বড়; সে মুনাফিক ও জিন্দিক, জাহান্নামের সর্বনিম্ন তলদেশে।[২] শাইখ বাররাক তাকে মুলহিদ ও গোমরাহদের শিরোমণি আখ্যা দিয়েছেন।[৩] বিপরীতে তাসাওউফপন্থি আলিমগণ উক্ত বক্তব্যগুলোর তাবিল করেন। তারা মনে করেন, সুফিয়ায়ে কেরামের সকল বক্তব্যের একটা বাহ্যিক অর্থ থাকে, আরেকটা অন্তর্নিহিত অর্থ থাকে (জাহের ও বাতেন)। ফলে বাতেনকে বাদ দিয়ে কেবল জাহের ধরে তাদের বক্তব্য ব্যাখ্যা করা যাবে না। এই মানদণ্ডে তারা উপরের বক্তব্যগুলোর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এখানে সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। তবে মোটামুটি কয়েকটা প্রকারে সেগুলো সীমাবদ্ধ:

এক. এসব বক্তব্য তাদের থেকে প্রমাণিত নয়।

দুই. প্রমাণিত হলেও এগুলোর বিপরীতে তাদের শরিয়তসম্মত বক্তব্য রয়েছে। ফলে বোঝা গেল, এগুলো দ্বারা তারা ভিন্ন অর্থ নিয়েছেন, বাহ্যিক অর্থ নয়। যেমন বোস্তামির বক্তব্যের মর্ম হলো, আমরা সাগরের ভিতরে তলিয়ে গিয়েছি, আর নবিগণ এ পারে দাঁড়িয়ে নয়, বরং অপর পারে পৌঁছে দাঁড়িয়ে আছেন।

তিন. তারা ফানার অবস্থায় এগুলো বলেছেন। সুতরাং তাদের জন্য এগুলো বলা সঠিক হলেও আমাদের জন্য বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা সঠিক নয়।

আলুসি রাহি. লিখেন, 'কিছু জাহেল সুফি আমাদের শাইখ আবদুল কাদের জিলানি ও শাইখে আকবার (ইবনে আরাবি)-এর বিভিন্ন বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ ধরে মনে করে, এই উম্মতের ওলি ও সিদ্দিকিন নবিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। অথচ এটা

---

১. বিস্তারিত দেখুন: আর-রাদ্দুল আকওয়াম, ইবনে তাইমিয়া; সালেহ ফাওজান (১৮৬)।
২. ইবনে আবিল ইজ (৫০৬)।
৩. বাররাক (৩৯০)।

মুসলমানদের সর্বসম্মত আকিদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক; সকল মানুষের উপর নবিদের শ্রেষ্ঠত্বের যে সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ রয়েছে, সেগুলোর সম্পূর্ণ বিপরীত। বরং এ ধরনের কথা কুফরের মতো; বরং কুফর ফতোয়াও দেওয়া হয়েছে। তাই আমরা বলব, আবদুল কাদের জিলানি রাহি. থেকে উক্ত বক্তব্য প্রমাণিত নয়। আর শাইখে আকবারের ব্যাপারে যা বলা হয়, তাঁর এসব বক্তব্যের পূর্ণ বিপরীত বক্তব্যও রয়েছে। যেমন তিনি বলেন, 'মাকামে মুহাম্মাদি থেকে আমার উপর সুঁইয়ের ছিদ্র পরিমাণ তাজাল্লি হয়েছে। আর তাতেই আমার পুড়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়েছে।' ফলে বোঝা গেল, তিনি এসব কথার বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নেননি, কিংবা তার থেকে এগুলো প্রমাণিত নয়। আর যদি ধরাও হয় যে প্রমাণিত, তবে আমরা বলব, এসব বক্তব্য হাকিকতে মুহাম্মাদির মাঝে ফানা হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে প্রকাশিত হয়েছে। ফলে এসব বক্তব্য সেই হাকিকতে মুহাম্মাদির বক্তব্য, ব্যক্তির বক্তব্য নয়। যখন স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন, নিজের মাকামে ছিলেন, তখন এসব বক্তব্য বের হয়নি।'[১] মোল্লা আলি কারি মনে করেন, এগুলো ইবনে আরাবির উপর অপবাদ। তিনি এমন কথা বলতে পারেন না।[২]

কেউ কেউ আবার এসব বক্তব্যকে একই সত্তার মাঝে সীমাবদ্ধ রূপক হিসেবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। আমাদের কাছেও এমন বক্তব্য প্রথমে যথার্থ মনে হয়েছে। বিশেষত এসব বক্তব্যের বক্তাদের প্রতি 'হুসনে জন্ন'-এর ভিত্তিতে এমন মনে করা অন্যায় নয়। অর্থাৎ খাতামুল আম্বিয়া এবং খাতামুর রুসুল একই সত্তা, যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—তিনি আল্লাহর রাসুল ও ওলি। রিসালাতের আগে তার বেলায়াত ছিল। আবার তাশরিয়ি রিসালাত (তথা পৌঁছে দেওয়ার পরে) তার রিসালাতের দায়িত্ব শেষ হলেও বেলায়াত রয়ে গেছে। ফলে তিনি যখন মালাকুতে আলাতে পৌঁছান, বেলায়াতের আলোকে পৌঁছান।[৩] বরং ফুতুহাতে ইবনে আরাবি আরও সুস্পষ্টভাবে লিখেন, 'প্রত্যেক রাসুলই নবি, আর প্রত্যেক নবিই ওলি; ফলে প্রত্যেক রাসুলই ওলি।'[৪] বাস্তবে তাদের বক্তব্য এটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকলে জটিলতা থাকত না। কারণ, তখন মর্যাদার প্রশ্ন রিসালাত ও নবুওতের অধিকারীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে। হজরত থানভি রাহি.-এর বক্তব্য দ্বারাও সেটাই বোঝা যায়।[৫] কিন্তু

---

১. রুহুল মাআনি, আলুসি (২/৭২)।
২. শরহুল ফিকহিল আকবার, আলি কারি (১১১)।
৩. শরহুল জামি আলা ফুসুসিল হিকাম (১/৯৯)।
৪. ফুতুহাতে মাক্কিয়্যাহ, ইবনে আরাবি (২/২৫৬)।
৫. ইমদাদুল ফাতাওয়া (৫/১৬২)।

উল্লিখিত ব্যক্তিদের বিভিন্ন গ্রন্থ ও বক্তব্য দেখলে সুস্পষ্ট হয় যে, বেলায়াতের যেমন নবুওতের বাইরে অস্তিত্ব আছে, তেমনই খাতামুল আউলিয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নন, বরং তাঁর উম্মতের ওলিগণ। এখন এই খাতামুল আউলিয়া কে, সেটা তাদের মাঝেও মতভেদপূর্ণ। কিন্তু এটা সুনিশ্চিত যে, খাতামুল আউলিয়াকে তারা উম্মতে মুহাম্মাদির বৈশিষ্ট্য মনে করেন। যেমন: ইবনে আরাবি ফুসূসে লিখেন, 'রাসুলুল্লাহ সর্বশেষ নবি ও রাসুল হিসেবে সর্বশেষ ওলি। কিন্তু খাতামুল আওলিয়া তাঁর ওয়ারিশ, তাঁর থেকে গ্রহণকারী। এটা খাতামুর রুসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগ্রহ ও বৈশিষ্ট্য।'[১] বরং কোনো কোনো বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায়, শাইখ ইবনে আরাবি নিজেকেই খাতামুল আউলিয়া মনে করেন। একটি পঙ্‌ক্তিতে তিনি বলেন, 'আমি নিঃসন্দেহে খাতামুল আউলিয়া।'[২]

যদি বাস্তবেই এমন হয়, তবে সেটা অত্যন্ত ভয়ংকর বক্তব্য। কারণ, তাতে এসব কথা সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর বিরুদ্ধে চলে যায়। তবে এখানে আমরা ব্যক্তিবিশেষকে নিয়ে কথা দীর্ঘ করতে চাচ্ছি না। এই কথা উল্লিখিত ব্যক্তিগণ বলুন আর না-ই বলুন, অন্যরা বলেছে; বরং তাদের অনেক আগে থেকেই এমন কথা সমাজে প্রচলিত ছিল। ইমাম তহাবি তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দের মানুষ। বিপরীতে শাইখ আবদুল কাদের জিলানি পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দের মানুষ। ইবনে আরাবি ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দের মানুষ। অথচ ইমাম তহাবি বলছেন, **'আমরা কোনো ওলিকে নবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করি না; বরং আমরা বলি, মাত্র একজন নবি সকল ওলির চেয়ে শ্রেষ্ঠ।'** বোঝা গেল, সেই তৃতীয় শতাব্দেই মুসলিম-সমাজে এমন ভ্রান্ত বক্তব্য প্রচলিত ছিল এবং সেগুলো তাবিল নয়, বরং বাস্তবেই ভ্রান্ত ছিল। বাগদাদি লিখেছেন, শিয়ারা তাদের ইমামকে নবিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। অপরদিকে কাররামিয়্যাহ সম্প্রদায় নবিদের চেয়ে ওলিদের শ্রেষ্ঠ মনে করে।[৩] ইমাম তহাবি সেসবের খণ্ডনে আহলে সুন্নাতের উক্ত আকিদা পেশ করেছেন।

মোট কথা, উল্লিখিত বক্তব্যগুলো শাইখ জিলানি ও ইবনে আরাবি থেকে প্রমাণিত হলে এগুলোর ব্যাখ্যা কী সেটা প্রশ্নাতীত নয়। আলুসির বক্তব্য অনুযায়ী গ্রহণ করলে তারা দায়মুক্ত হন, নতুবা দায়মুক্ত হন না। আমরা যদি সুধারণাবশত উক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণও করি, এক্ষেত্রে এক শ্রেণির সুফিদের স্খলন কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারি না;

---

১. ফুসূসুল হিকাম (৬৪)।
২. ফুতুহাত (১/২৪৪)।
৩. উসূলুদ্দিন, বাগদাদি (১৬৭); আকহাসারি (২৫৩)।

বরং মুসলিম সমাজে ইসলামবিরোধী এসব আকিদা অনেক আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল এবং খুব সম্ভব পরেও রয়ে গেছে, যা আলুসির কথাতে স্পষ্ট।[১] ষষ্ঠ শতাব্দের মাওসিলের সুফি ইবনে কাজিবিল বান লিখেন, 'নবিদের যেসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, ওলিদেরও সেসব বৈশিষ্ট্য রয়েছে; বরং উম্মতে মুহম্মাদির মাঝে ওলিদের মাকাম উলুল আজমি মিনার রুসুল (তথা শ্রেষ্ঠ পাঁচজন রাসুলের) মাকাম।[২] নাউজুবিল্লাহ।

যা-ই হোক, আমাদের আলোচনা বক্তব্যকেন্দ্রিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। ফলে উক্ত বক্তব্যগুলো যে সঠিক নয়, এটুকু স্পষ্ট হওয়াই যথেষ্ট। এ কারণে নবম শতকের সুফি আলিম শাইখ আবদুল করিম জিলি লিখেন, '**এসব বক্তব্য যদিও তাবিল করা যায়, কিন্তু আমাদের মাজহাব—স্বাভাবিকভাবে একজন নবি একজন ওলির চেয়ে উত্তম।**'[৩] শাইখ আবদুল কাদের জাজায়েরিও এটাকে ফানার হালতে দেওয়া বক্তব্য হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তার মতে, 'তাদের গ্রন্থে এসব বক্তব্য পড়ে আমার লোম দাঁড়িয়ে যায়। এক্ষেত্রে ব্যাখ্যাকারীরা যেসব ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেগুলো আমার মনঃপূত নয়। পরে একদিন আল্লাহ তায়ালা আমার সামনে এর রহস্য উন্মোচন করেছেন...। এগুলো স্রেফ একটা উদাহরণ। নবিদের সঙ্গে নিজেকে মেলানো নয়। আল্লাহর পানাহ, আল্লাহর পানাহ, আল্লাহর পানাহ। নবিদের মাকাম অনেক উর্ধ্বে। তাদের হাল অনেক বেশি পরিপূর্ণ।'[৪] শারানি সুফিদের বক্তব্য: '**বারজাখে নবুওতের মাকাম রাসুলের সামান্য উপরে, ওলির নিচে**'-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে প্রত্যেক রাসুলের মাঝে নবুওত, রিসালাত ও বেলায়াত তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকার কথা বুঝবে। এমন মনে করবে না যে, কোনো সাধারণ আহলুল্লাহ বেলায়াতের মাকামকে নবুওত ও রিসালাতের চেয়ে উর্ধ্বে মনে করেন।[৫] আবু হাফস সিরাজুদ্দিন গজনবি, শুজাউদ্দিন তুর্কিস্তানি, কারি মুহাম্মাদ তৈয়ব-সহ সকল ব্যাখ্যাতা এ ধরনের বক্তব্যকে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি ও গোমরাহি বলেছেন।[৬] গুনাইমি এমন আকিদাকে কুফর আখ্যা দিয়েছেন।[৭]

এসব বক্তব্যের পরে আর কোনো সংশয় থাকে না যে, উপরের বক্তব্যগুলো সাধারণভাবে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং শরিয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ গর্হিত সাব্যস্ত

---

১. রুহুল মাআনি, আলুসি (২/৭২)।
২. আল-মাওয়াকিফুল ইলাহিয়্যাহ, ইবনে কাজিবিল বান (১৬০)।
৩. ইনসানে কামেল, আবদুল করিম জিলি (১/১২৫)।
৪. আস-সাইফুর রব্বানি, মুহাম্মাদ মক্কি (১/৪৯৮)।
৫. আত-তাবাকাতুল কুবরা, শারানি (২/৬১)।
৬. তুর্কিস্তানি (১৭৭); কারি মুহাম্মাদ তৈয়ব (১৪৫-১৪৭)।
৭. গুনাইমি (১৩৯)।

হয়। এগুলোকে বিশুদ্ধ বানানোর জন্য বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হয়। ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় এসব কথা বলা কারও জন্য বৈধ হয় না, যেমনটা স্বয়ং শাইখ জিলি, জাজায়েরি ও শারানি স্বীকার করেছেন। তা ছাড়া নবিদের পরে উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছেন খুলাফায়ে রাশেদিন এবং তাদের পরে অন্য সাহাবায়ে কেরাম। সাহাবাদের পরবর্তী কোনো পীর-আউলিয়া সারা জীবন সিজদায় পড়ে থাকলেও সাহাবাদের মর্যাদায় পৌঁছতে পারবেন না; নবিদের মর্যাদায় পৌঁছার তো প্রশ্নই ওঠে না। তাই মুসলিম উম্মাহর উচিত এসব দ্ব্যর্থক, অস্পষ্ট ও সন্দেহপূর্ণ বক্তব্যের উপর নিজেদের ঈমান ও আকিদার কুটির নির্মাণ না করে কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট ও মজবুত ভিত্তির উপর ঈমানের প্রাসাদ গড়ে তোলা, যা ফিতনার ঝড়-তুফানের সামনে উড়ে যাবে না। মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহি.-কে একবার শাইখ ইবনে আরাবির কিছু বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, **'আমাদের ইমাম মুহাম্মাদে আরাবি, ইবনে আরাবি নয়। ফুতুহাতে মাদানিয়্যাহ আমাদের ফুতুহাতে মাক্কিয়্যাহ থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছে। আমাদের কাজ হলো 'নুসুস' মানা, ফুসুস নয়।'**[১]

কারামাতুল আউলিয়া সত্য: আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত সত্য। এখানে উক্ত আলোচনা আনার কারণ হলো, যখন ইমাম তহাবি ওলিগণ নবিদের চেয়ে উত্তম কিংবা নবিদের মতো এমন ভ্রান্ত আকিদা খণ্ডন করেন, তখন কারও মনে হতে পারে যে, আউলিয়াদের নামে তা হলে যা-কিছু বলা হয়, সবই কুসংস্কার; তাদের হাতে বিভিন্ন আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটার যেসব গল্প বলা হয়, সবই বানানো। ইমাম তহাবি সেই ভুল ধারণা নাকচ করে দিয়ে বলতে চেয়েছেন, হ্যাঁ, ওলিগণ নবিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিংবা তাদের মতো—এমন বিশ্বাস সঠিক নয়; কিন্তু এর মানে আল্লাহর ওলিদের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই এমন নয়; বরং আল্লাহর ওলিগণ নবি-রাসুলদের চেয়ে নিচে হলেও সাধারণ মুমিন, যারা আল্লাহর ওলি নয়, তাদের উর্ধ্বে। তারা আল্লাহর আনুগত্য করেন, আল্লাহর ভালোবাসা ও দাসত্বের সাগরে নিমজ্জিত থাকেন। ফলে আল্লাহ তাদের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে কখনও কখনও তাদের হাতে বিভিন্ন বিস্ময়কর ও অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন, যেগুলোকে 'কারামত' বলা হয়। ফলে একটাকে অস্বীকার করতে গিয়ে আরেকটাকে অস্বীকার করা যাবে না।

আহলে সুন্নাতের মতে, **কারামত শব্দের শাব্দিক অর্থ** সম্মান, মর্যাদা, অনুগ্রহ, বদান্যতা ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে তার প্রিয় বান্দাদের মাঝে যাকে চান

---

১. তাকবিয়াতুল ঈমান (ভূমিকা) (১৩)।

তার হাতে এমন কিছু প্রকাশের মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করেন সৃষ্টির কাছে, যা স্বভাব ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ বিস্ময়কর মনে হয়, অথচ আল্লাহর কাছে তা স্বাভাবিক ও সহজ। এমন সব অলৌকিক ঘটনা বা অবস্থাকেই কারামত বলা হয়। ইমাম গাজালি লিখেন, 'ওলিদের কারামত সত্য'।[১] ইমাম তাফতাজানি লিখেন, 'জমহুর মুসলমানের মতে ওলিদের কারামত সত্য। মুতাজিলারা সেটাকে অস্বীকার করে।'[২]

কুরআন-সুন্নাহে কারামত শব্দটি নেই, বরং কুরআনে নবি ও ওলি উভয়ের হাতে সংঘটিত বিস্ময়কর ঘটনাকে 'আয়াত' তথা নিদর্শন বলা হয়েছে। যেমন: আসহাবে কাহাফের কারামতকে কুরআনে 'আয়াত' বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। [কাহাফ: ১৭] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাদের যুগে উক্ত পরিভাষাটিই প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে আলিমদের মুখে নবিদের হাতে সংঘটিত ঘটনা 'মুজিজা' আর ওলিদের হাতে সংঘটিত ঘটনা 'কারামত' শব্দে পরিচিতি পায় এবং ধীরে ধীরে এটাই প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। ফলে এদিক থেকে মুজিজা ও কারামত দুটোই 'আয়াত'। ওলিদের হাতে প্রকাশিত কারামত মূলত নবিদেরই মুজিজা। কারণ, ওলি নবির অনুসরণের সুবাদেই কারামত লাভ করেন। তবে কারামত কখনও ইসতিদরাজ (পরীক্ষা ও ফিতনার কারণ হতে পারে), অপরদিকে মুজিজা আল্লাহর পক্ষ থেকে নুসরত। ফলে দুটো এক পর্যায়ের নয়, এক মানের নয়।[৩] মুজাদ্দিদে আলফে সানি বলেন, 'বৎস, যদি তোমার হালত, মারিফাত ইত্যাদি রাসুলুল্লাহর সুন্নাহ অনুযায়ী হয়, তবে তো অনেক সুন্দর। কিন্তু তেমন যদি না হয়, তবে এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসতিদরাজ ও বরবাদি ছাড়া আর কিছু নয়।'[৪] তা ছাড়া নবিদের মুজিজা বিস্ময় ও প্রভাবের দিক থেকেও বড় থাকে, যা সাধারণ ওলির পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন: পিতা ছাড়া জন্ম নেওয়া, মৃতকে জীবিত করা, কুরআন নিয়ে আসা ইত্যাদি ওলিদের পক্ষ থেকে সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়।[৫] কুশাইরি ইসফারায়েনি থেকে বর্ণনা করেন, 'দোয়া কবুল হওয়া-সহ ওলিদের অনেক কারামত রয়েছে। কিন্তু সেগুলো নবিদের মুজিজার মতো নয়।'[৬]

---

১. আল-ইকতিসাদ (১০৭)।
২. শরহুল মাকাসিদ, তাফতাজানি (২/২০৩)।
৩. আত-তাফসিরুল কাবির, রাজি (২১/৪৩১); গজনবি (১৫৮); শাইবানি (৪৭)।
৪. মাকতুবাতে ইমামে রব্বানি (১/২৯৮)।
৫. শরহুল মাকাসিদ (২/২০৩); নবুওত, ইবনে তাইমিয়া (১/১৪২); ফাতহুল বারি, ইবনে হাজার (৭/৩৮৩)।
৬. আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ (৫৬২)।

কারামতের ব্যাপারে উম্মাহর দুটি শ্রেণি প্রান্তিকতার শিকার হয়েছে। এক. মধ্যযুগের বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিশীল দাবিদার মুতাজিলা সম্প্রদায়। তাদের কাছে মনে হয়েছে এগুলো গালগল্প ও কুসংস্কার যা যুক্তি ও বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তার সঙ্গে যায় না। ফলে তারা কারামতকে অস্বীকার করেছে। ঠিক আজকের বুদ্ধিজীবীদের মতো। তাদের আরেক যুক্তি ওলিদের কারামত সাব্যস্ত করলে তারা নবিদের মতো হয়ে যান। এটা ভ্রান্তি। তাদের এ যুক্তির পক্ষে কুরআন-সুন্নাহর কোনো দলিল নেই।[১] তবে অধমের মতে, সকল মুতাজিলা কারামত অস্বীকার করেনি। তাদের কারও কারও থেকে কারামত স্বীকার প্রমাণিত।[২]

দুই. এই দল কারামতের মাঝে ডুব দিয়েছে; এতটা বাড়াবাড়ি করেছে যে, কারামতকেই তাকওয়া ও বেলায়াতের মানদণ্ড বানিয়ে দিয়েছে। কারামতের হাজারও গল্প দিয়ে তাদের দাওয়াত, ওয়াজ-নসিহত ও বই-পুস্তক ভরিয়ে ফেলেছে; এক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যা, প্রমাণিত-অপ্রমাণিতের ধার ধারেনি। বরং কারামত ও জাদু-তেলেসমাতি ইত্যাদির মাঝেও পার্থক্য করেনি। আল্লাহর অনুগ্রহ ও শয়তানের ভেলকি দুটোকে গুলিয়ে ফেলেছে।

দুটোই প্রান্তিকতা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মানহাজ—যেমনটা ইমাম তহাবি বর্ণনা করেছেন—দুই প্রান্তিকতার মাঝে। স্বয়ং কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারাই কারামত প্রমাণিত। যেমন: মারইয়াম আলাইহিস সালাম নবি ছিলেন না। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে কারামত হিসেবে তার কাছে রিজিক আসত। [আলে ইমরান: ৩৭; মারইয়াম: ২৫] একইভাবে আসহাবে কাহাফের তিন শতাধিক বছর ঘুমিয়ে থেকে পুনরুজ্জীবিত হওয়া একটি বিশাল বিস্ময়কর কারামত। [কাহাফ: ৯-২৬] ইবরাহিম আলাইহিস সালামের স্ত্রী সারার সন্তান জন্মদানের বয়স শেষ হয়ে যাওয়ার পরও ইসহাক আলাইহিস সালামকে গর্ভে ধারণ করা কারামত। [হুদ ৭১-৭২] সালাফ তথা আমাদের সাহাবা, তাবেয়িন, তাবে-তাবেয়িন থেকেও অসংখ্য কারামত বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে। এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই; তবে কয়েকটা উদাহরণ উল্লেখ করা হচ্ছে। যেমন: জাবের রাজি.-এর পিতা আবদুল্লাহ উহুদযুদ্ধের আগের রাতেই অনুভব করছিলেন, উহুদ যুদ্ধে সর্বপ্রথম তিনি শহিদ হবেন। বাস্তবে তা-ই হয়েছিল। কোনো প্রয়োজনে ছয় মাস পরে তার কবর খনন করা হয়। মনে হচ্ছিল তাকে সবেমাত্র

---

১. তুর্কিস্তানি (১৭৮)।
২. ইতিকাদাত্থ ফিরাকিল মুসলিমিন ওয়াল মুশরিকিন, রাজি (৪৫)।

দাফন করা হয়েছে।[১] খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাজি.-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলে বিষ পান করেছিলেন। কিন্তু বিষ তার কোনো ক্ষতি করেনি।[২] আনাস রাজি.-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, প্রচণ্ড খরার সময় এক লোক এসে তার কাছে দোয়া চাইলে তিনি ওজু করে দুই রাকাত নামাজ পড়ে দোয়া করেন। সঙ্গে সঙ্গে কালো মেঘ জমে মুষলধারায় বৃষ্টি নামতে শুরু করে।[৩] উসাইদ ইবনে হুজাইর ও আব্বাদ ইবনে বিশর রাজি. এক রাতে রাসুলুল্লাহর কাছে ছিলেন। বের হওয়ার পরে রাত প্রচণ্ড অন্ধকার হয়ে আসছিল। আল্লাহ তায়ালা তাদের সঙ্গে থাকা লাঠিতে আলো তৈরি করে দেন। তারা সেটার আলোতে পথ চলে বাড়িতে পৌঁছান।[৪] এগুলো স্রেফ উদাহরণ। নতুবা বিশুদ্ধ সনদে যেসব কারামত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো লিখলেও কয়েক ভলিউম হয়ে যাবে। ফলে মুতাজিলা ও সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের কারামত অস্বীকার করা সুস্পষ্ট গোমরাহি।[৫]

অপর দল কারামতের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করে বিচ্যুত হয়েছে। তারা কারামতের ক্ষেত্রে এমন কিছু মূলনীতি তৈরি করেছে এবং কারামত বর্ণনায় এতটাই বাড়াবাড়ি করেছে, যা তাদের বিদআত ও কুসংস্কারের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাই এক্ষেত্রে আহলে সুন্নাতের ভারসাম্যপূর্ণ মানহাজ ধরে রাখতে হলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি মনে রাখতে হবে। যা অনেকেই বুঝতে ভুল করে:

এক. কারামত বেলায়াতের মানদণ্ড নয়। অর্থাৎ কেউ ওলি হতে গেলে কারামত দেখাতে হবে কিংবা তার হাতে কারামত প্রকাশিত হতে হবে—এমন জরুরি নয়। যে ব্যক্তি দ্বীনের উপর চলবে, শরিয়তের সকল বিধি-নিষেধ মেনে চলবে, হালাল-হারাম, মাকরুহ-মুস্তাহাব সবকিছুর খেয়াল রাখবে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের উপর যার জীবন প্রতিষ্ঠিত থাকবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর ওলি; কারামত থাকা শর্ত নয়।[৬] এটা ওলির ইচ্ছাধীনও নয়। অর্থাৎ ওলি চাইলেই কারামত দেখাতে পারবেন না। কিংবা একবার কারও হাতে কারামত প্রকাশিত হলে সেটা অব্যাহত থাকবে—এমনও জরুরি নয়। বরং এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর অনুগ্রহ। আল্লাহ যাকে চান, যখন চান, তার

---

১. বুখারি (১৩৫১); হাকেম (৪৯৪২); সুনানে কুবরা, বাইহাকি (৭১৭৬)।
২. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (৩৮০৯)।
৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসির (৯/১০৭)।
৪. বুখারি (৩৮০৫); ইবনে হিব্বান (২০৩২)।
৫. ইবনে আবিল ইজ (৫১২); সালেহ ফাওজান (১৮৮)।
৬. কারি মুহাম্মাদ তৈয়ব (১৪৮); ইমদাদুল আহকাম (৪৮-৪৯)।

হাতে তখন এমন কিছু কারামত প্রকাশিত হতে পারে। প্রকাশিত হওয়া-না হওয়ার সঙ্গে বেলায়াত থাকা-না থাকার কোনো সম্পর্ক নেই। শাহরাস্তানি লিখেন, পুণ্যের কাজ করতে পারা, অন্যায় থেকে দূরে থাকাই সবচেয়ে বড় কারামত।[১]

দুই. কারামত শ্রেষ্ঠত্বেরও মানদণ্ড নয়। ফলে কারামতের অধিকারী ওলি কারামতবিহীন ওলির চেয়ে শ্রেষ্ঠ—এমন নয়; বরং আল্লাহ একজনের হাতে কারামত প্রকাশ করেছেন, অন্যজনের হাতে করেননি—এটুকুই। উপরন্তু কারামতের অধিকারী ওলির চেয়ে কারামতবিহীন ওলিও শ্রেষ্ঠ হতে পারেন খুব স্বাভাবিকভাবেই। অর্থাৎ কারামতের সঙ্গে আল্লাহর কাছে মর্যাদা বুলন্দ হওয়া কিংবা শ্রেষ্ঠত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। কারামত ইসমত তথা নিষ্পাপ হওয়ারও প্রমাণ নয়, যা অনেক ভ্রান্ত লোক মনে করে থাকে। বরং কারামত কখনও কখনও আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষাও (ইসতিদরাজ) হতে পারে। এ জন্য প্রকৃত আল্লাহর ওলিগণ কারামত প্রচার নয়, বরং লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন; আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষার ভয় করেন। শয়তানের কোনো ফাঁদ না হয় সেই আশঙ্কা করেন। কুশাইরি লিখেন, 'নবিগণ মুজিজা প্রকাশের জন্য আদিষ্ট। আর ওলিদের জন্য কারামত লুকিয়ে রাখা আবশ্যক।'[২] আহমদ রিফায়ি লিখেন, 'ওলিগণ কারামতে আহ্লাদিত হন না, বরং তা এমনভাবে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন, যেমন নারীরা ঋতুস্রাবের রক্ত লুকিয়ে রাখে।'[৩]

তিন. কারামত বেলায়াতের দলিল নয়। অর্থাৎ আল্লাহর ওলিদের হাতে কারামত প্রকাশিত হতে পারে; কিন্তু কারও হাতে কারামত প্রকাশিত হলেই সে আল্লাহর ওলি হবে—এমন জরুরি নয়। কারণ, প্রত্যেক বিস্ময়কর কাজই কারামত নয়। অনেক সময় জিন ও শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। কখনও কখনও মানুষ জাদুর মাধ্যমে এগুলো করে। কখনও সাধনা ও তন্ত্রমন্ত্রের বলেও অলৌকিক ঘটনা ঘটানো যায়। আবার কখনও এগুলো স্রেফ চোখের ধোঁকা (নজরবন্দি) হয়ে থাকে, বাংলাতে অনেক সময় যেগুলো ভেলকি-তেলেসমাতি ইত্যাদি শব্দেও বোঝানো হয়। যেমন: সার্কাস ও ম্যাজিক খেলা। এগুলো স্রেফ চোখের ধুলো; এগুলোতে যা দেখানো হয়, বাস্তবে সেটা ঘটে না। বিপরীতে নবিদের মুজিজা এবং ওলিদের কারামত চোখের ধুলো বা তেলেসমাতি নয়, বরং বাস্তবেই ঘটে। ফলে কারও হাতে অদ্ভুত কিছু দেখলেই তাকে

---

১. নিহায়াতুল ইকদাম ফি ইলমিল কালাম (২৭৭)।
২. আর-রিসালাহ (৫৬৩)।
৩. আল-বুরহানুল মুআইয়াদ (৩৩)।

আল্লাহর ওলি বানিয়ে দেওয়া যাবে না। বেলায়াতের মূল নিদর্শন হচ্ছে শরিয়ত মোতাবেক চলা। যিনি শরিয়তের উপর অটল থাকবেন, কারামত ছাড়াও তিনি ওলি। আর শরিয়তের বাইরে গিয়ে পানিতে হাঁটলে, আকাশে জায়নামাজ বিছিয়ে নামাজ পড়লেও তিনি ওলি নন। ইমাম লাইস ও শাফেয়ি থেকে বর্ণিত আছে, 'কাউকে পানিতে হাঁটতে কিংবা হাওয়ায় উড়তে দেখে বিভ্রান্ত হয়ো না, যতক্ষণ না তাকে কুরআন ও সুন্নাহর মানদণ্ডে মেপে দেখো।'[১] আবু ইয়াজিদ বোস্তামি বলেন, 'আল্লাহর অনেক সৃষ্টি পানিতে হাঁটে। তাদের আল্লাহর কাছে কোনো মূল্য নেই। ফলে কাউকে আকাশে উড়তে দেখে প্রতারিত হয়ো না। শরিয়াহর আলোকে তাকে মেপে দেখো।'[২] মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহি.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কারামত ও ইসতিদরাজের মাঝে পার্থক্য কী? তিনি বললেন, 'যদি কারও হৃদয় আল্লাহমুখী হয়, তবে সে কারামতের অধিকারী। যদি কারও হৃদয় এমন না হয়, তবে সে নিছক কারামতের দাবিদার ইসতিদরাজের শিকার।'[৩] সুতরাং আল্লাহ-প্রদত্ত কারামত আর শয়তানের তেলেসমাতির মাঝে পার্থক্য হলো শরিয়াহর উপর অবিচল থাকা বা না থাকা।

চার. কারামত নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন। কেননা কারামতের নামে মুসলিম উম্মাহর বেশ কিছু সম্প্রদায় প্রচণ্ড অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ির শিকার হয়েছে। ফলে কারামতকে বেলায়াতের শর্ত ও কামালতের মানদণ্ড বানিয়ে দিয়েছে। পরিস্থিতি এমন হয়ে গেছে যে, কারামত ছাড়া কেউ ওলি হবে এটা তাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তির অনুসারীরা তাদের শাইখের কারামত বর্ণনায় সব ধরনের সীমা পেরিয়ে গিয়েছে; শাইখের নামে হাজারও গল্প বানিয়ে সমাজে প্রচার করেছে। তাদের অবস্থা 'যত কারামত তত বেলায়াত' হয়ে গিয়েছে। সেই দুরবস্থা আজও চলমান। ফলে অনেক সময় আপনি কোনো বুজুর্গের জীবনী পড়তে গিয়ে দেখবেন বইয়ের এক তৃতীয়াংশেরও কম জায়গায় জীবনের মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় আলোচনা। এর বাইরে পুরো বই 'কারামত', 'কাশফ', 'ইলহাম' নামে বিভিন্ন অদ্ভুত গল্প ও কেচ্ছা-কাহিনি দিয়ে ঠাসা। মুহাক্কিক আলিমদের মতে, কাশফ ও ইলহাম সত্য।[৪] কিন্তু পুরো জীবনই যদি কেবল কাশফ-কারামত হয়, তবে সেটা অদ্ভুত ব্যাপার। উপরন্তু কেবল পরবর্তী ওলিদের নয়, বরং তাদের লেখা সাহাবি ও তাবেয়িদের

---

১. তাফসিরে ইবনে কাসির (১/১৪০)।
২. হিলইয়াতুল আউলিয়া, আবু নুআইম (১০/৩৯); সিয়ারু আলামিন নুবালা (রিসালাহ) (১৩/৮৮)।
৩. মাকতুবাতে ইমামে রব্বানি (১/২১৫)।
৪. ইমদাদুল ফাতাওয়া, থানভি (৫/১৫৮)।

জীবনেও কারামত ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না, যেগুলোর কোনো সনদ নই, বর্ণনাকারীর নাম নেই। তাদের সততার অবস্থাও জানা নেই। আর এই অতিরঞ্জনের অন্যতম নেতিবাচক ফলাফল হচ্ছে উচ্চশিক্ষিত ও সুস্থ রুচিসম্পন্ন মানুষের কাছে কারামত এবং ইসলামের একটা নেতিবাচক চিত্র ফুটে ওঠা। কারণ, এমন কারামতভরা ইসলাম খানকা ও মাজারে চলে, অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত, দ্বীন-দুনিয়া সম্পর্কে অজ্ঞ একেবারে সাধারণ পর্যায়ের মানুষের মাঝে চলে। শিক্ষিত-সচেতন সমাজ ও বাস্তব জীবনের ময়দানে চলে না। ফলে কিছু মানুষের অতিরঞ্জনের কারণে গোটা দ্বীন ও কারামত নিয়েই তারা সংশয়ের শিকার হন। অথচ এই অতিরঞ্জন ইসলামে সমর্থিত নয়। বরং ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের মতো এখানেও ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে। একদিকে যেমন কারামতকে অস্বীকার করা যাবে না, অন্যদিকে সনদ-প্রমাণবিহীন যেকোনো গল্পকে যে-কারও নামে চালিয়ে দেওয়া যাবে না। এ জন্য ইমাম তহাবি লিখেছেন, **'আমরা তাদের থেকে প্রকাশিত কারামত এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত তাদের অন্যান্য ঘটনায় বিশ্বাস রাখি।'**

وَنُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ مِنْ خُرُوجِ الدَّجَّالِ، وَنُزُولِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ، وَنُؤْمِنُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجِ دَابَّةِ الأَرْضِ مِنْ مَوْضِعِهَا.

আমরা কিয়ামতের আলামতসমূহে বিশ্বাস রাখি। যেমন: দাজ্জালের আগমন, আকাশ থেকে ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ ইত্যাদি। আমরা আরও বিশ্বাস করি, পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্য উদিত হবে এবং 'দাব্বাতুল আরদ' তার নির্ধারিত জায়গা থেকে বের হবে।

ব্যাখ্যা

কিয়ামত-সম্পর্কিত আকিদা

কিয়ামতের আলামত: কেবল মুসলমানরা নয়, পৃথিবীর সকল মানুষ বিশ্বাস করে—একদিন এই সুন্দর পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। আধুনিক বিজ্ঞানও বলছে পৃথিবী চিরস্থায়ী নয়। কারণ, পৃথিবীর কিছুই স্থায়ী নয়, মহাবিশ্বের কোনোকিছুই অবিনশ্বর নয়। ফলে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে কারও কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে মুসলমানদের বিশ্বাসের মাঝে যেসব বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য, প্রভাব ও ফলাফল রয়েছে, তা পৃথিবীর আরও কারও বিশ্বাসে নেই। অনেক নাস্তিক ও অবিশ্বাসী মনে করে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। অনেক ধর্মের লোকজন মনে করে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে নতুন পৃথিবী তৈরি হবে। সেখানে আবার নতুন করে মানুষ পুনর্জন্ম নেবে ইত্যাদি। কিন্তু ইসলাম বলছে, পৃথিবী যেহেতু চিরকাল থাকার জন্য তৈরি হয়নি, মানুষকে যেহেতু অন্য কোথাও থাকার জন্য তৈরি করা হয়েছে, সুতরাং পৃথিবী একসময় ধ্বংস হয়ে যাবে, সৃষ্টির সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু এই ধ্বংস শেষ হওয়ার জন্য নয়, বরং প্রকৃত যাত্রা শুরুর জন্য। এই ধ্বংস বিলয়ের জন্য নয়, বরং গোটা জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের পূর্ণতার জন্য। পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার মাধ্যমেই পরকালের

যাত্রা শুরু হবে। গোটা সৃষ্টিকে আল্লাহ ধ্বংস করার মাধ্যমে পুনরুত্থানের কাজ শুরু করবেন। এর পর জগতের সবার তাঁর কাছে হাশরের দিন হিসাব দিতে হবে। সবশেষে জায়গা হবে স্থায়ী নিবাস—হয়তো জান্নাতে নয়তো জাহান্নামে।

জগৎসংসার ধ্বংসের সেই প্রক্রিয়াকে ইসলামে 'সাআহ' বলা হয়। 'সাআহ' অর্থ সময়, ক্ষণ, মুহূর্ত। যেহেতু এক মুহূর্তে আল্লাহ জগতের সবকিছু ধ্বংস করে দেবেন, তাই এটাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হয়েছে। বাংলায় আমরা এটাকে কিয়ামত, মহাপ্রলয় ইত্যাদি নামে জানি। যেহেতু এটা পৃথিবীর সর্বশেষ দিন, এর পর মহাবিশ্বের কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, তাই এই দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মহাবিশ্ব কবে ধ্বংস হবে? মহাপ্রলয় কবে আসবে? এটা সেসব নিগূঢ় অদৃশ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যেসব আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না; এমনকি ফেরেশতারাও জানেন না; কোনো নবি-রাসুল-ওলি কেউ জানেন না। আল্লাহ বলেন,

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّیْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَاۤ اِلَّا هُوَ ؕۘ ثَقُلَتْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ؕ يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِیٌّ عَنْهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ: 'তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত কবে আসবে? বলে দিন, **এর জ্ঞান কেবল আমার পালনকর্তার কাছে**। তিনিই তা উন্মোচিত করবেন নির্ধারিত সময়ে। আসমান ও জমিনের জন্য তা অতি কঠিন বিষয়। তা তোমাদের উপর আসবে হঠাৎ করেই। তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে যেন আপনি তার অনুসন্ধানে লেগে আছেন। বলে দিন, এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকটই রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই সেটা বোঝে না।' [আরাফ: ১৮৭] প্রসিদ্ধ হাদিসে জিবরিলে ফেরেশতা জিবরাইল আলাইহিস সালাম যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি বলেন, 'জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে অধিক অবগত নয়।' অর্থাৎ এ ব্যাপারে জিবরাইল যেমন জানেন না, তেমন রাসুলুল্লাহও জানেন না।[১]

তবে কিয়ামত আসবে হঠাৎ। পৃথিবীর মানুষ যে যার কাজে ব্যস্ত থাকবে। এমন সময় আচমকা কিয়ামত এসে তাদের পাকড়াও করবে। কারণ, পৃথিবীতে মানুষকে

---

১. বুখারি (৫০); মুসলিম (৮)।

পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। ফলে কিয়ামত কবে হবে সেটা দিনক্ষণ বলে দিলে আর পরীক্ষা থাকে না। কুরআন ও হাদিসে অসংখ্য বর্ণনায় এটাকে নিশ্চিত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَآءِ اللّٰهِ ۗ حَتّٰۤى اِذَا جَآءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا.

অর্থ: 'নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে; এমনকি **যখন হঠাৎ তাদের কাছে কিয়ামত এসে যাবে**, তারা বলবে, হায় আফসোস! এক্ষেত্রে আমরা ত্রুটি করেছি।' [আনআম: ৩১] অন্য আয়াতে বলেন,

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ

অর্থ: 'কাফেররা (কিয়ামতের ব্যাপারে) সন্দেহ পোষণ অব্যাহত রাখবে যতক্ষণ না সেটা তাদের কাছে **আকস্মিকভাবে** এসে পড়ে; অথবা এসে পড়ে এমন দিবসের শাস্তি যা থেকে রক্ষার উপায় নেই।' [হজ: ৫৫] মহাপ্রলয় এমনভাবে এসে পড়বে যে, মানুষ টেরই পাবে না। আল্লাহ বলেন,

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

অর্থ: 'তারা কেবল কেয়ামতেরই অপেক্ষা করছে; **আচমকা** সেটা তাদের কাছে এসে যাবে এবং তারা বুঝেই উঠতে পারবে না।' [জুখরুখ: ৬৬] হাদিসে এসেছে, কেনাবেচার জন্য দোকানে ক্রেতা ও বিক্রেতা ভাঁজ-করা কাপড় খুলে দেখবে, সে সময়ে কিয়ামত হয়ে যাবে, কেনাবেচার সুযোগ পাবে না; কেউ দুধ দোহন করার পরে ঘরে আসবে, কিন্তু পানের সুযোগ পাবে না; বরং কেউ খাওয়ার জন্য লোকমা মুখে তুলবে, কিন্তু মুখে দেওয়ার আগেই কিয়ামত এসে যাবে।[১]

তবে মানুষ যেন সেই দিনের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে, পরকালে যেন অভিযোগ না করে যে, হে আল্লাহ, আমরা সময় পাইনি; তাই আল্লাহ তায়ালা সেই দিনের অনেকগুলো আলামত ও লক্ষণ জানিয়েছেন আমাদের, আরবিতে যাকে বলা হয় 'আশরাতুস সাআহ'; বাংলায় আমরা বলি, 'কিয়ামতের আলামত'। এসব লক্ষণ যখন একটার পর একটা প্রকাশ পাওয়া শুরু করবে, তখনই অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে সেই

---

১. বুখারি (৬৫০৬)।

দিনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতে হবে। একসময় যখন সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়ে যাবে, আচমকা একদিন সেই মুহূর্ত উপস্থিত হবে। এক বিকট নিনাদের সঙ্গে সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন,

فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ.

অর্থ: 'তারা কি এই অপেক্ষাই করছে যে, কিয়ামত আচমকা তাদের কাছে এসে পড়ুক? বস্তুত কিয়ামতের **আলামতসমূহ** তো এসেই পড়েছে। যদি তা এসেই পড়ে, তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?' [মুহাম্মাদ: ১৮]

কিয়ামতের আলামতের প্রকারভেদ: আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক জাতিকে তাদের নবি-রাসুলের মাধ্যমে মহাপ্রলয় দিবস সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। সকল নবি এ ব্যাপারে তাদের উম্মতকে জানিয়ে গিয়েছেন যাতে সবাই প্রস্তুতি নিতে পারে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়ে গিয়েছেন সবার চেয়ে বিস্তারিতভাবে। ফলে কুরআন ও সুন্নাহে এ দিন সম্পর্কে বেশ সুদীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। এ দিন ঘনিয়ে আসার আলামতগুলো সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমরা জানতে পারি, কিয়ামতের আলামতগুলো দুই ধরনের। **এক. ছোট আলামত, দুই. বড় আলামত।**

ছোট আলামতগুলো প্রকাশিত হলে নির্ধারিত মুহূর্তটি বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে মনে করতে হবে; আর বড় বড় আলামত প্রকাশিত হলে সেই মুহূর্তের জন্য ক্ষণ গণনা করতে হবে। কিয়ামতের ছোট আলামতগুলো সংখ্যায় অনেক। ফলে ইমাম তহাবি সেগুলো একেবারেই উল্লেখ করেননি। বড় আলামতগুলো সংখ্যায় সীমিত হলেও ইমাম সবগুলো উল্লেখ করেননি, বরং সবচেয়ে বড় এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চারটি আলামত উল্লেখ করেছেন। কিয়ামতের আলামতের উপর আলিমগণ যুগে যুগে বড় বড় স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখেছেন, সংক্ষিপ্ত এই ব্যাখ্যাগ্রন্থে যা বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই আমরা এখানে কিয়ামতের ছোট-বড় আলামত সংক্ষেপে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি-সহ উল্লেখ করব, যাতে সাধারণ পাঠকের এতৎসংশ্লিষ্ট আকিদার প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো জানা হয়ে যায়।

কিয়ামতের ছোট আলামত: এসব আলামতের সংখ্যা অনেক এবং এগুলো কয়েক ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে কিছু রয়েছে ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, আবার কিছু বাকি আছে এবং প্রকাশিত হবে। এসব আলামতের মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো:

এক. আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক হাদিসে বলেছেন, তিনি কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে প্রেরিত হয়েছেন।[১] যদিও আজ প্রায় চৌদ্দশো বছরের বেশি হয়ে গেছে, তবুও কিয়ামত আসেনি; তথাপি পৃথিবীর বয়সের তুলনায় এক-দুই হাজার বছর নিতান্তই ক্ষুদ্র। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন শেষ নবি। তাঁর পরে আর কোনো নবি আসবেন না। তাঁর উম্মতই সর্বশেষ উম্মত। এর মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় পৃথিবী পূর্ণতায় পৌঁছে গেছে। আর কোনো নতুন পয়গাম, নতুন উম্মত আসবে না। আর কিছুর অপেক্ষা নেই।

দুই. চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া। সকল মুহাক্কিক আলিমের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের ইশারায় আকাশের চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল। এটা ছিল রাসুলুল্লাহর অন্যতম শক্তিশালী একটি মুজিজা, পাশাপাশি কিয়ামত সন্নিকটে আসার নিদর্শন। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

অর্থ: 'কিয়ামত আসন্ন। চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।' [কামার: ১]

মধ্যযুগের মুসলিম দার্শনিক নামে পরিচিত অতিবুদ্ধিজীবী ও বর্তমানের যুক্তিবাদীরা চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাকে অস্বীকার করে। কারণ, এটা যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোকে সম্ভব নয়। যাদের ঈমান যুক্তি ও বিজ্ঞানের কাছে বন্ধক থাকে, তারা কখনোই প্রকৃত মুমিন হতে পারে না। অপরদিকে কিছু মুসলিম চন্দ্রপৃষ্ঠে বিদীর্ণ হওয়ার দাগ দেখতে চায়, নিল আর্মস্ট্রংয়ের মুখে শুনতে চায় যে, তিনি সেখানে ফাটা দাগ দেখেছেন কিংবা আজান শুনেছেন ইত্যাদি। এগুলোর কোনোকিছুই মুমিনদের প্রয়োজন নেই। কুরআন ও সুন্নাহই মুমিনদের বিশ্বাসের জন্য যথেষ্ট। চন্দ্র বিদীর্ণসংক্রান্ত কুরআনের আয়াত উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। বুখারি ও মুসলিম-সহ হাদিসের বিভিন্ন কিতাবে একাধিক বিশুদ্ধ সনদে এটা প্রমাণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আনাস ইবনে মালেক, ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, আলি, হুজাইফা-সহ অন্যান্য সাহাবা চন্দ্র বিদীর্ণের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তারা এই ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী। ফলে এটাকে অস্বীকার করা দুঃসাহসিকতা ও সত্য অস্বীকার। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন, 'রাসুলুল্লাহর যুগে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল। তখন আমরা তাঁর সঙ্গে মিনাতে ছিলাম। তিনি

---

১. বুখারি (৫৩০১); মুসলিম (৮৬৭)।

বললেন, তোমরা দেখো। আমরা দেখলাম চাঁদের একটি টুকরো (হেরা) পাহাড়ের একদিকে, অন্য টুকরো আরেক দিকে।'[১]

এত সুস্পষ্ট বর্ণনা অস্বীকারের কোনো সুযোগ আছে? কারও আপত্তি—চাঁদ বিদীর্ণ হলে পৃথিবীর অন্যান্য মানুষও দেখত; ফলে অন্যান্য জাতি ও সভ্যতার ইতিহাসেও তা পাওয়া যেত। অথচ এটা জরুরি নয়। কারণ, তখনকার পৃথিবী আজকের পৃথিবীর মতো ছিল না। বর্তমান সময়ে রাত দিনের মতো হয়ে গেছে। অথচ বিশ বছর আগেও সন্ধ্যার পরে মানুষ ঘরের বাইরে যেত না। রাত সাতটা/আটটার পরে কেউ সজাগ থাকত না। ফলে উক্ত ঘটনার রাতে মক্কাবাসী ছাড়া আর সবাই ঘুমিয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক ছিল। পাশাপাশি মক্কার রাতের প্রথম অংশ প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোতে মধ্যরাত কিংবা শেষ রাত ছিল। আর তখন কেউ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে না। বিপরীতে মক্কার পশ্চিমের ভূখণ্ডগুলোতে তখন দিন, ফলে তারা দেখতে পাবে না এটাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া চন্দ্র বিদীর্ণের ঘটনা আগে থেকে তারিখ দেওয়া ছিল না। বরং কুরাইশরা দেখতে চেয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়ে দিয়েছেন। ঘটনাটি মাত্র কয়েক মুহূর্তের ছিল। ফলে কেউ না দেখলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তা ছাড়া, তখনকার যুগে আজকের মতো আধুনিক যোগাযোগ-ব্যবস্থা কিংবা প্রযুক্তির সমৃদ্ধি ছিল না। ফলে দূরের কেউ দেখে থাকলেও ভাইরাল হওয়ার সুযোগ ছিল না। বরং কেউ দেখলে নিজের দৃষ্টিভ্রম মনে করাই স্বাভাবিক ছিল; কিংবা অন্যকে বললে তাকে পাগল বলাই যৌক্তিক ছিল। ফলে কেউ কেউ হয়তো দেখেও থাকবে এবং লিখেও থাকবে, কিন্তু পরবর্তী লোকেরা তার কথায় বিশ্বাস করেনি। ফলে সেসব লেখা হারিয়ে গেছে। বরং আজকের যুগেও চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণের ঘটনা ঘটে, যা বিদীর্ণ হওয়ার চেয়ে আরও স্পষ্ট, অথচ ক-জন মানুষ এগুলোর খোঁজ রাখে? ফলে এমন ক্ষণস্থায়ী ঘটনা অন্যান্য সভ্যতার ইতিহাসে না পাওয়া গেলেই সেটা মিথ্যা হয়ে যায় না। চন্দ্র বিদীর্ণের ঘটনা দূরের কথা, স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাও তার সমকালীন অন্যান্য জাতির ইতিহাসে কতখানি পাওয়া যায়? এতে তাঁর অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হয়ে যায়?

তিন. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন—কিয়ামতের আগে হিজাজ থেকে একটি আগুন বের হবে, যার আলোতে (শামের)

---

১. বুখারি (৩৬৩৬, ৩৮৬৯, ৪৮৬৪); মুসলিম (২৮০১); তিরমিজি (৩২৮৭)।

বুসরা শহরের লোকেরা তাদের উটের ঘাড় দেখতে পাবে।[১] এটা সপ্তম শতাব্দে (৬৫৪ হিজরিতে) ঘটেছে। ইতিহাসবিদগণ নিজেদের চোখে দেখে সেই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে উক্ত ঘটনা প্রসিদ্ধ।[২]

চার. বাইতুল মাকদিস বিজয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের আগে বাইতুল মাকদিস বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন।[৩] উমর রাজি.-এর যুগে ১৬ হিজরিতে মুসলমানগণ বাইতুল মাকদিস বিজয় করেন। স্বয়ং উমর রাজি. বাইতুল মাকদিসে গমন করেন এবং সেখানকার অধিবাসীদের নিরাপত্তা প্রদান করেন। আজ বাইতুল মাকদিস মুসলমানদের হাতছাড়া। কিয়ামতের আগে হস্তগত হবে, ইনশাআল্লাহ।

পাঁচ. ফিতনা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হত্যা ও রক্তপাত বৃদ্ধি পাবে।[৪] **ছয়.** মিথ্যা নবুওতের দাবিদারদের প্রকাশ ঘটবে।[৫] বিভিন্ন সময়ে একাধিক মিথ্যা নবি দাবিদারের আবির্ভাব ঘটেছে। তাদের সর্বশেষ ছিল ভারতের গোলাম আহমদ কাদিয়ানি। তার অনুসারীরা বর্তমানে ধোঁকার আশ্রয় নিয়ে আহমদিয়া জামাত নামে নিজেদের পরিচয় দেয়। কাদিয়ানিরা উম্মাহর সর্বসম্মতিক্রমে কাফের। **সাত.** দাসীর গর্ভে মনিব জন্ম নেবে। **আট.** ভুখা-নাঙ্গা ছাগলের রাখালরা অভ্রভেদী অট্টালিকা গড়ে গর্ব করবে।[৬] **নয়.** ইলম উঠে যাবে এবং মূর্খতার প্রসার ঘটবে।[৭] সভ্যতা যত অগ্রসর হয়, জ্ঞানের তত বিস্তার ঘটে। সেখানে একজন মরু আরবের উম্মি মানুষের এমন আপাত-অসম্ভব চ্যালেঞ্জিং ভবিষ্যদ্বাণীই বলে দেয় তিনি সত্য নবি। **দশ.** মদ্যপান ও ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে।[৮] **এগারো.** আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে খারাপ আচরণ বাড়বে। অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়বে।[৯] **বারো.** অধিক হারে ভূমিকম্প ও ভূমিধ্বস হবে। মানুষের আকার বিকৃত হবে।[১০]

---

১. বুখারি (৭১১৮); মুসলিম (২৯০২)।
২. বিস্তারিত দেখুন: ফাতহুল বারি (১৩/৭৯)।
৩. বুখারি (৩১৭৬); ইবনে মাজা (৪০৪২)।
৪. বুখারি (৭০৬২)।
৫. বুখারি (৩৬০৯); মুসলিম (১৫৭)।
৬. মুসলিম (৮); আবু দাউদ (৪৬৯৫)।
৭. বুখারি (৭০৬২)।
৮. মুসলিম (২৬৭১)।
৯. মুসনাদে আহমদ (৬৬২৫)।
১০. তিরমিজি (২১৮৫); ইবনে মাজা (৪০৬০)।

কিয়ামতের বড় আলামত: ছোট আলামতের মতো কিয়ামতের বড় বড় কিছু আলামত রয়েছে। ইমাম তহাবি তন্মধ্যে মাত্র চারটি উল্লেখ করেছেন। আমরা উপর্যুক্ত চারটির সঙ্গে আরও কিছু আলামত যোগ করে সংক্ষেপে সেগুলো উল্লেখ করছি:

এক. মাহদির আগমন। কিয়ামতের আগমুহূর্তে পৃথিবীতে একজন মুজাদ্দিদ আগমন করবেন। তার নাম হবে মুহাম্মাদ। তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের হবেন। তাঁর উপাধি হবে মাহদি (তথা হিদায়াতপ্রাপ্ত)। তিনি পৃথিবীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা কায়েম করবেন। পৃথিবীকে ইনসাফ দ্বারা পূর্ণ করবেন। মাহদির আগমন-সম্পর্কিত হাদিসগুলো অর্থগত মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে।[১] সুতরাং বিভিন্ন অজুহাতে এগুলো প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। বরং মাহদির ব্যাপারে ঈমান রাখা ওয়াজিব। দুটি শ্রেণি তার ব্যাপারে বিভ্রান্তিতে লিপ্ত। একটি হলো যুক্তির দোহাই দিয়ে যারা তার আগমনকে অস্বীকার করে এবং এটাকে রাফেজিদের গালগল্প মনে করে। অতীত ও বর্তমানের কিছু সুশীল ও বুদ্ধিজীবী দাবিদার হাদিস অস্বীকারকারী এ দলের অন্তর্ভুক্ত। আরেকটি খোদ রাফেজিরা যারা ইমামতির কুসংস্কারে নিমজ্জিত থেকে মাহদিকেও নিজেদের ইমাম মনে করে তার অপেক্ষায় আছে। তবে তাদের মাহদি প্রকৃত মাহদি নয়, বরং তাদেরই একজন যে এক কথিত সুড়ঙ্গে গায়েব হয়ে গিয়েছিল, অদ্যাবধি সেখান থেকে বের হয়নি। মাহদির ব্যাপারে শিয়ারা অসংখ্য উদ্ভট গালগল্প রচনা করেছে, শরিয়ত ও বাস্তবতার সঙ্গে যেগুলোর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। ফলে সেগুলো পরিত্যাজ্য।

ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন সময় একাধিক ব্যক্তি মাহদি হওয়ার দাবি করেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও এমন ঘটনা বারবার ঘটেছে, আজও ঘটছে। ফলে বিষয়টি নিয়ে আবেগের পরিবর্তে কুরআন-সুন্নাহনির্ভর বাস্তবোচিত আকিদা রাখতে হবে। মাহদি কবে আসবেন আমরা জানি না। তাই তাঁর অপেক্ষায় না থেকে প্রত্যেকের নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকা, নিজেদের কর্তব্য পালন করা জরুরি।

দুই. দাজ্জালের আবির্ভাব: কিয়ামতের আগমুহূর্তে কানা দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। মানুষকে ঈমানহারা করার জন্য সে চল্লিশ দিন পৃথিবীতে থাকবে। তার হাতে জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। সে যেটাকে জান্নাত বলবে সেটা হবে জাহান্নাম, আর

---

১. আবু দাউদ (৪২৮২); তিরমিজি (২২৩০, ২২৩১); ইবনে মাজা (২৭৭৯); মুসনাদে আহমদ (৭৮৪); মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক (২০৭৭৬); ইবনে হিব্বান (৬৮২৩); হাকেম (৮৫২৮); মুসনাদে আবু ইয়ালা (৯৮৭); মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩৮৭৯৩); আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (১০২৩০); বাজ্জার (৩৩২৩)।

সে যেটাকে জাহান্নাম বলবে সেটা হবে জান্নাত। সে সময়ে দাজ্জালের ফিতনাই হবে সবচেয়ে বড় ফিতনা। তার ফিতনার ভয়াবহতা এভাবে অনুধাবন করা যায় যে, নুহ আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে দুনিয়ার সকল নবি-রাসুল তাদের উম্মতকে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তার এক চোখ কানা থাকবে। দুই চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে 'কাফের'।[১] সে মক্কা-মদিনা ছাড়া পৃথিবীর সকল শহরে ঢুকতে পারবে।[২]

দাজ্জাল কি ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতা? আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, দাজ্জাল একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি। আল্লাহ তাকে মানুষের পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ জন্য তাকে বিশেষ কিছু ক্ষমতা দান করবেন। যেমন: তার হাতে নিহত ব্যক্তিকে জীবিত করা, বৃষ্টি বর্ষণ করা, পৃথিবীর সকল ধনভান্ডার তার হস্তগত হওয়া, তার নির্দেশে ফসল উদ্‌গত হওয়া ইত্যাদি। এগুলো আল্লাহ তাকে দান করবেন। ফলে সে এর বাইরে যেতে পারবে না। আবার এগুলোও সাময়িকভাবে দান করবেন। ফলে পরবর্তী সময়ে সে এগুলো আর করতে পারবে না। একপর্যায়ে ঈসা আলাইহিস সালাম তাকে হত্যা করবেন।

কিন্তু অসংখ্য লোক দাজ্জালের ব্যাপারে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে খারেজি, জাহমিয়্যাহ ও কিছু মুতাজিলা দাজ্জালের আগমনকে অস্বীকার করেছে।[৩] আবার অনেকে এটাকে রূপক অর্থে মনে করেছে। তাদের কাছে দাজ্জাল হলো ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতা। বাংলাদেশে বিদ্যমান কিছু ভ্রান্ত সম্প্রদায়ও অন্যদের কাছ থেকে ধার করা এই ভ্রান্ত আকিদা প্রচার করছে। অনেকে দাজ্জালকে জিন-শয়তান-সহ বিভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা বলেছে। কিন্তু এগুলো সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়। তার হাকিকত (স্বরূপ) কেমন সে সম্পর্কে আল্লাহ ভালো জানেন। আমরা কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহে যতটুকু এসেছে ততটুকুর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকব।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক হাদিসে দাজ্জাল থেকে পানাহ চাওয়ার দোয়া করেছেন, উম্মতকেও সেই দুআর নির্দেশ দিয়েছেন।[৪] আরেকটি

---

১. বুখারি (১৫৫৫, ৬১৭৫); মুসলিম (২৯৩১, ২৯৩৬); তিরমিজি (২২৩৫)।
২. বুখারি (১৮৮১); মুসলিম (২৯৪৩)।
৩. শরহে মুসলিম, নববি (১৮-৫৮-৫৯)।
৪. বুখারি (৮৩২, ৬৩৬৮); মুসলিম (৫৮৮, ৫৮৯, ৫৯০); তিরমিজি (৩৪৯৪); আবু দাউদ (৮৮০)।

হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি সুরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত (অন্য বর্ণনায় শেষ দশ আয়াত) মুখস্থ করবে, আল্লাহ তাকে দাজ্জালের হাত থেকে নিষ্কৃতি দেবেন।[১]

দাজ্জাল কোথায়? দাজ্জাল নিয়ে সকল যুগেই মুসলিম উম্মাহর, বিশেষত তরুণদের, আগ্রহ ছিল অনেক বেশি। এটা অর্থহীন আবেগ নয়, বরং এটা স্বাভাবিক এবং এটাই কাম্য। আমরা সাহাবাদের মাঝেও দাজ্জালের ব্যাপারে ব্যাপক কৌতূহল ও সতর্কতা প্রত্যক্ষ করি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আবদুল্লাহ ইবনে সইয়াদ নামে এক ইহুদি কিশোরের মাঝে দাজ্জালের অনেক আলামত প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবাগণ তাকে দাজ্জাল মনে করতেন। কিন্তু তখনও যেহেতু তার কাজ শুরু করেনি, এ জন্য নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। পরে অবশ্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চিত হন যে, সে দাজ্জাল নয়।[২] কিন্তু তার ব্যাপারটি আহলে সুন্নাতের মাঝে একটা 'জটিল ইসু' হয়ে থেকে যায়। আলিমগণ তার ব্যাপারে মতভেদ করেন। অনেকে তাকে দাজ্জাল মনে করেন। এক্ষত্রে নির্ভরযোগ্য মতামত হলো, ইবনে সইয়াদ সেসব ছোট দাজ্জালের অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদের আল্লাহ তায়ালা বড় দাজ্জালের আগমনের আগে পাঠাবেন। ফলে সে বড় দাজ্জাল নয়। বড় দাজ্জালের আবির্ভাব এখনও ঘটেনি।[৩]

তিন. ঈসা আলাইহিস সালামের আগমন: কিয়ামতের একটি বৃহৎ আলামত হলো ঈসা আলাইহিস সালামের আগমন। এটা অতীতের কিছু বিভ্রান্ত দার্শনিক ও মালাহিদা এবং সমকালীন কাদিয়ানি সম্প্রদায় এবং কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ছাড়া সকল মুসলমানের সর্বসম্মত আকিদা।[৪] এমনকি মুসলিমদের বাইরে ইহুদি-খ্রিষ্টানরাও এমন আকিদা রাখে। তবে তাদের আকিদা অনুমানভিত্তিক এবং প্রচণ্ড বিভ্রান্তিকর। খ্রিষ্টানরা প্রকৃত অর্থেই ঈসা আলাইহিস সালামের আগমনের ব্যাপারে বিশ্বাস করে। কিন্তু

---

১. মুসলিম (৮০৯); আবু দাউদ (৪৩২৩); সুনানে কুবরা, নাসায়ি (১০৭২১); মুসনাদে আহমদ (২২১২৬)।

২. বুখারি (১৩৫৪, ৩০৫৫); মুসলিম (২৯৩১); আবু দাউদ (৪৩২৯)।

৩. ফাতহুল বারি (১৩/৩২৬-৩২৭); মুসলিম (১৮/৪৬); আন-নিহায়া ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম, ইবনে কাসির (১/১৭১)।

৪. মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন, আশআরি (২৯৫); তাফসিরে ইবনে কাসির (৭/১৩৬); আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি রাহি.-এর এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রয়েছে, যা আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহি.-এর তাহকিকে ছাপা হয়েছে। আরও দেখুন: আউনুল মাবুদ, আজিমাবাদি (১১/৩০২); ইকফারুল মুলহিদিন গ্রন্থে কাশ্মীরি ঈসা আলাইহিস সালামের আগমন অস্বীকারকারীকে কাফের বলেছেন (৩৩)। কিন্তু সেটা হুজ্জত কায়েম হওয়ার পরেও যদি অতিরঞ্জন করে, তখন। স্বাভাবিকভাবে যদি শুবহাত/তাবিলাতের কারণে অস্বীকার করে, তবে সে গোমরাহ। সরাসরি কাফের বলা কঠিন।

বিস্তারিত আকিদার ক্ষেত্রে তারা অসংখ্য বিভ্রান্তির শিকার। বিপরীতে ইহুদিরা মূলত দাজ্জালের অপেক্ষা করছে। দাজ্জালকেই তাদের নেতা ভাববে এবং তার অনুসরণ করবে। ইহুদি-খ্রিষ্টানরা এমন আকিদা রাখে, তাই মুসলমানরা তাদের কাছ থেকে এটা গ্রহণ করেছে এমন নয়, যেমন কিছু মানুষ দাবি করে থাকে; বরং এটা আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মত আকিদা।

কুরআনে সরাসরি ঈসা আলাইহিস সালামের পুনরাগমনের বিষয়টি উল্লেখ না থাকলেও অনেক আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে, [নিসা ১৫৯, জুখরুফ: ৬১, মুহাম্মাদ ৪] যেগুলোর ভিত্তিতে উলামায়ে কেরাম কুরআনের মাধ্যমে তার পুনরাগমনের বিষয়টি প্রমাণ করেছেন। অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা ঈসা আলাইহিস সালামের পুনরাগমনের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। কিয়ামতের আগে তিনি শামের দামেশকে আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! অতি শীঘ্রই তোমাদের মাঝে ঈসা আলাইহিস সালাম ন্যায়নিষ্ঠ শাসক হিসেবে আগমন করবেন। তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিজয়া বাতিল করবেন। সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, কেউ কারও কাছ থেকে গ্রহণ করবে না।'[১] তিনি জিজয়া বাতিল করবেন, কারণ সে যুগে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম থাকবে না। ফলে হয়তো ইসলাম, নতুবা হত্যা—এই দুটো পথ থাকবে। দাজ্জাল ও তার বাহিনীর লোকজন সবাই নিহত হবে। ঈসা আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে নিজ হাতে হত্যা করবেন। যারা ইসলাম গ্রহণ করবে না, তারাও নিহত হবে। বাকি সবাই মুসলিম হয়ে যাবে। এভাবে পৃথিবীতে তখন মুসলমান ছাড়া আর কেউ থাকবে না। পৃথিবী তখন নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা পড়বে। বাঘ ও বকরি একসঙ্গে চলাফেরা করবে। শিশুরা সাপের সঙ্গে খেলা করবে। কেউ কারও কোনো ক্ষতি করবে না। পৃথিবীর সম্পদ ও খাবারে অনেক বরকত হবে।[২]

ঈসা আলাইহিস সালাম নবি হিসেবেই আগমন করবেন। তবে তিনি ইসলামি শরিয়ত বাস্তবায়ন করবেন, আগের শরিয়ত নয়। দুঃখের বিষয়, অনেক মুসলিম তার মাজহাব নিয়েও কথা বলেন। কারও দাবি তিনি হানাফি হবেন; আবার কেউ দাবি করেন তিনি সালাফি হবেন। মুসলিম উম্মাহর চিন্তাধারা কতটা সংকীর্ণ হয়ে গেছে এসব আলোচনায় তা স্পষ্ট। **ঈসা আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে আসবেন নবি হিসেবে, উম্মত**

---

১. বুখারি (২২২২, ২৪৭৬, ৩৪৪৮); মুসলিম (১৫৫, ১৫৬, ২৯৩৭); তিরমিজি (২২৩৩)।
২. মুসলিম (২৮৯৭); ইবনে মাজা (৪০৭৫, ৪০৭৭); ইবনে হিব্বান (৬৮১৪); হাকেম (৪৮১৫, ৮৬০৩)।

হিসেবে নয়; যেহেতু রাসুলুল্লাহর পরে আর কোনো নবি নেই, ফলে তিনি নতুন শরিয়ত নয়, বরং রাসুলুল্লাহর শরিয়তের অনুসরণ করবেন। কুরআন, সুন্নাহ ও ওহির ভিত্তিতে তিনি ফয়সালা করবেন। একাধিক হাদিসে এসেছে, তাঁর কাছে বিভিন্ন বিষয়ে ওহি আসা অব্যাহত থাকবে।[১] ফলে তাকে মাজহাবি-লামাজহাবির খাপে ঢোকানো নিষ্প্রয়োজন।[২]

চার. ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাদুর্ভাব: ইয়াজুজ ও মাজুজ দুটো সম্প্রদায়। তাদের উৎপত্তি, বংশ-পরিচয়, স্বরূপ, অবস্থানস্থল ইত্যাদি কুরআন-সুন্নাহে স্পষ্ট করা হয়নি। ফলে এগুলো নিয়ে আলিমদের লম্বা আলোচনা ও মতপার্থক্য রয়েছে। তাদের ব্যাপারে অনেক অদ্ভুত বিশ্বাস প্রচলিত আছে। সেগুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমরা সংক্ষেপে তাদের ব্যাপারে কিছু মৌলিক আলোচনা তুলে ধরব।

ইয়াজুজ-মাজুজ মানুষের অন্তর্ভুক্ত দুটো সম্প্রদায়।[৩] কিয়ামতের আগমুহূর্তে তাদের আবির্ভাব ঘটবে। কুরআন ও সুন্নাহে তাদের আবির্ভাবের কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন,

حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا . قَالُوْا يٰذَاالْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَ مَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰٓى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا .قَالَ مَا مَكَّنِّيْ فِيْهِ رَبِّيْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْمًا .اٰتُوْنِيْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ حَتّٰٓى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا حَتّٰٓى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا قَالَ اٰتُوْنِيْٓ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا .فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا .قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا .وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا.

অর্থ: 'অবশেষে যখন তিনি দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌছলেন, তখন তিনি সেখানে এক জাতিকে পেলেন, যারা তাঁর কথা বুঝতে পারছিল না। তারা বলল, হে জুলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্য কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মাঝে

১. মুসলিম (২৯৩৭); ইবনে মাজা (৪০৭৫)।
২. বিস্তারিত দেখুন: ফাতাওয়ায়ে সুবকি (১/৪১); আল-হাবি লিল-ফাতাওয়া, সুয়ুতি (২/১৮৯-১৯৬)।
৩. ফাতহুল বারি (৬/৩৮৬)।

একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন? তিনি বললেন, আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন সেটাই যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য করো। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেবো। তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন, তোমরা দম দিতে থাকো। অবশেষে যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন তিনি বললেন, তোমরা গলিত তামা নিয়ে আসো, আমি তা এর উপরে ঢেলে দিই। অতঃপর ইয়াজুজ ও মাজুজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতে সক্ষম হলো না। জুলকারনাইন বললেন, এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন তিনি একে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য। আমি সেদিন তাদের দলে দলে তরঙ্গের আকারে ছেড়ে দেবো এবং শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে একত্র করে আনব।' [কাহাফ: ৯৩-৯৯] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

حَتّٰۤى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ . وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۗ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ.

অর্থ: 'যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধন মুক্ত করে দেওয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে, আমোঘ প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হলে কাফেরদের চক্ষু উর্ধ্বে স্থির হয়ে যাবে। (বলবে) হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরা এ বিষয়ে গাফেল ছিলাম; বরং আমরা অত্যাচারী ছিলাম।' [আম্বিয়া: ৯৬-৯৭] একাধিক হাদিসে তাদের প্রাদুর্ভাবের বিষয়টি প্রমাণিত। জয়নব বিনতে জাহাশ রাজি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন তার ঘরে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রবেশ করে বললেন, আরব জাতির সর্বনাশ! এক অনিষ্ট তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। অতঃপর তিনি বৃদ্ধা ও শাহাদাত আঙুল মিলিয়ে বৃত্ত বানিয়ে বললেন, **আজ ইয়াজুজ-মাজুজের দেওয়ালে এটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে।** জয়নব বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের মাঝে নেককার মানুষ থাকা সত্ত্বেও আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, যখন অশ্লীলতা ও নোংরামি বৃদ্ধি পাবে।'[১]

---

১. বুখারি (৩৩৪৬, ৩৫৯৮); মুসলিম (২৮৮০)।

তবে ইয়াজুজ-মাজুজের মূল আবির্ভাব এখনও ঘটেনি, বরং ঈসা আলাইহিস সালাম আকাশ থেকে অবতরণের পরে প্রথমে দাজ্জালের মুখামুখি হয়ে তাকে ও তার বাহিনীকে হত্যা করবেন, অতঃপর ইয়াজুজ-মাজুজ আসবে। মুসলিমের লম্বা হাদিসে তাদের প্রাদুর্ভাব ও ধ্বংস সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে ওহি পাঠাবেন, আমি আমার একদল সৃষ্টিকে বের করব; তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারও নেই। সুতরাং তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে তুর পাহাড়ে চলে যাও। তখন আল্লাহ তায়ালা ইয়াজুজ-মাজুজকে প্রেরণ করবেন। তারা প্রত্যেক উপত্যকা থেকে ঢলের মতো নেমে আসবে। তাদের প্রথম দল যখন তাবারিয়্যাহ (গ্যালিলি) হ্রদ পার হবে, এর পানি পুরোটা নিঃশেষ করে ফেলবে। পরের দল এসে মনে করবে এখানে কখনও পানি ছিলই না। অতঃপর তারা ঈসা ও তার সাথীদের ঘেরাও করে ফেলবে। তারা কষ্টে পতিত হবেন। ইয়াজুজ-মাজুজ বাহিনী বলবে, আমরা পৃথিবীবাসীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, এবার আসমানবাসীকে ধ্বংস করব। তখন তারা আকাশের দিকে তির ছুড়বে। তাদের তির রক্তাক্ত অবস্থায় ফিরে আসবে। তখন আল্লাহ তায়ালা ইয়াজুজ মাজুজের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। পৃথিবীর সর্বত্র তাদের মৃতদেহ ছড়িয়েছিটিয়ে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা একদল পাখি প্রেরণ করে তাদের লাশগুলো ভূপৃষ্ঠ থেকে সরিয়ে নেবেন। অতঃপর মুষলধারে গোটা পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। তাতে গোটা ভূপৃষ্ঠ ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাবে। গোটা পৃথিবী নিয়ামতে ভরপুর হয়ে যাবে।'[১]

পাঁচ. পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হওয়া: কিয়ামতের একটি বড় আলামত হলো, পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হওয়া। পৃথিবীতে সবসময় পূব আকাশে সূর্য উদিত হয়। কিন্তু কিয়ামতের আগে আল্লাহ সূর্যকে পশ্চিম আকাশ থেকে উদিত করবেন। এটা পৃথিবীর সর্বশেষ মুহূর্তে হবে। তখন সকল কাফের মুমিন হবে, কিন্তু তাদের ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না। এটা একাধিক বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। বুখারিতে আবু হুরাইরা রাজি. থেকে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম আকাশ থেকে উদিত হবে। এটা দেখার পরে সবাই ঈমান আনবে। কিন্তু তাদের ঈমানের ব্যাপারে কুরআন বলেছে,

يَوْمَ يَأْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ

---

১. মুসলিম (২৯৩৭); তিরমিজি (২২৪০); ইবনে মাজা (৪০৭৫); হাকেম (৮৬০৩); মুসনাদে আহমদ (১৭৯০৪)।

অর্থ: সেদিন এমন কাউকে তার ঈমান উপকার করবে না যে আগে ঈমান আনেনি।' [আনআম: ১৫৮][১]

আরেক হাদিসে আবু জর থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা কি জানো এই সূর্য কোথায় যায়? সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভালো জানেন। তিনি বললেন, সূর্য চলতে থাকে। একপর্যায়ে আরশের নিচে তার নির্ধারিত স্থলে গিয়ে আল্লাহর জন্য সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। তখন তাকে বলা হয়, 'তুমি ওঠো। যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও।' তখন সে ফিরে যায় এবং উদয়াচল থেকে ভোরে উদিত হয়। সারা দিন পথ চলে আবার তার নির্ধারিত স্থলে গিয়ে সিজদায় পড়ে। একপর্যায়ে তাকে বলা হয়, 'ওঠো। তুমি যেখান থেকে এসেছ সেখানেই ফিরে যাও।' সে ফিরে যায় এবং উদয়াচল থেকে সকালে উদিত হয়। এরপর পথ চলতে থাকে। একদিন এভাবে সে পথ চলে আরশের নিচে তার নির্ধারিত স্থানে গিয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। তখন তাকে বলা হবে, 'ওঠো। অস্তাচল থেকে উদিত হও।' তখন সে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে।"[২]

ছয়. দাব্বাতুল আরদ বের হওয়া: কিয়ামতের আরেকটি বড় আলামত হলো, ভূগর্ভ থেকে একটি বিশেষ প্রাণী বের হবে, যা মানুষের সঙ্গে কথা বলবে। কে মুমিন আর কে কাফের সেটা বলে দেবে। সেই প্রাণীটিকে 'দাব্বাতুল আরদ' বলা হয়। কুরআন ও সুন্নাহ উভয় সূত্রেই এটা প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ.

অর্থ: 'যখন নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি (তথা কিয়ামত) সমাগত হবে, তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জন্তু নির্গত করব। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। এ কারণে যে, মানুষ আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করত না।' [নামল: ৮২] আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাজি. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি হাদিস মুখস্থ করেছি, যা আমি কখনও ভুলিনি। কিয়ামতের (চূড়ান্ত ধ্বংসের) সর্বপ্রথম আলামত হলো সূর্য পশ্চিম আকাশে উদিত হওয়া। অতঃপর জুহার সময় ভূগর্ভ থেকে একটি প্রাণী বের হবে। এই দুটো ঘটনা একটা অপরটার অব্যবহিত পরেই ঘটবে।[৩]

---

১. বুখারি (৪৬৩৫); মুসলিম (১৫৭); আবু দাউদ (৪৩১২); ইবনে মাজা (৪০৬৮)।

২. মুসলিম (১৫৯); ইবনে হিব্বান (৬১৫৩); আল-মুজামুল আওসাত (৪৪৭০)।

৩. মুসলিম (২৯৪১); মুসনাদে আহমদ (৭০০০)।

তবে উক্ত জন্তুর স্বরূপ কী হবে, কোত্থেকে বের হবে সেটা কুরআন-সুন্নাহে বলা হয়নি। ফলে এটা নিয়ে আলিমদের দীর্ঘ আলোচনা ও মতভেদ রয়েছে, যা এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া এটার নির্ধারিত স্বরূপ জানা ঈমানের জন্য আবশ্যকও নয়। বরং 'দাব্বাতুল আরদ' বের হবে এটুকুতে বিশ্বাস রাখাই যথেষ্ট। এটা পৃথিবীতে এসে কাফের ও মুমিনের চেহারায় দাগ দেবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, মানুষের চেহারায় মুমিন ও কাফের লিখে দেবে।[১] ফলে চেহারা দেখে মানুষ তাদের চিনতে পারবে। এই দাগ দেওয়ার রহস্য ও স্বরূপ আমাদের জানা নেই, প্রয়োজনও নেই। আমরা কুরআন ও সুন্নাহে আল্লাহ যেভাবে বলেছেন, যা বোঝাতে চেয়েছেন, সবগুলোতে ঈমান রাখি।

সাত. প্রকাণ্ড ধোঁয়া নির্গত হওয়া: কিয়ামতের আগে পৃথিবীতে একটা প্রকাণ্ড ধোঁয়া দেখা যাবে। কুরআনে 'ধোঁয়া' (দুখান) নামে একটি সুরাও রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে,

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ. يَغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ. رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ. اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ.

অর্থ: 'অতএব, আপনি সেদিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে, যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে। এটা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (তারা বলবে) হে আমাদের রব, আমাদের উপর থেকে শাস্তি দূর করুন; আমরা আপনার প্রতি ঈমান রাখি। এখন তাদের ঈমান কী কাজে আসবে? কারণ, তাদের কাছে এসেছিলেন স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসুল।' [দুখান: ১০-১৩] একাধিক হাদিসে কিয়ামতের আলামত হিসেবে ধোঁয়া নির্গমনের কথা বলা হয়েছে।[২]

আট. ভূমিধস হওয়া: ভূমিধস পৃথিবীর প্রাকৃতিক ঘটনা, সচরাচরই আমরা বিভিন্ন জায়গায় প্রত্যক্ষ করে থাকি। তবে কিয়ামতের আগে পৃথিবীতে তিনটি বিশাল ভূমিধসের ঘটনা ঘটবে—একটি পূর্বে, একটি পশ্চিমে, আরেকটি জাজিরাতুল আরবে, যা আগে কখনও ঘটেনি। একাধিক বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত।[৩]

পৃথিবীর শেষ দিনগুলো: সহিহ মুসলিমের একটি লম্বা হাদিসে কিয়ামতের বিভিন্ন আলামত-সহ পৃথিবীর শেষ দিনগুলোর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কিয়ামতের

---

১. আন-নিহায়া ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম (১/২০৮)।
২. মুসলিম (২৯০১, ২৯৪৭); আবু দাউদ (৪৩১১); ইবনে মাজা (৪০৪১)।
৩. মুসলিম (২৯০১); তিরমিজি (২১৮৩); ইবনে মাজা (৪০৫৫)।

আলামতগুলো বর্ণনার পরে পুরো ঘটনাক্রম সহজে বোঝার ক্ষেত্রে হাদিসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানে আমরা সর্বশেষে হাদিসটি তুলে ধরছি:

নাওয়াস ইবনে সামআন রাজি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ভোরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জালের ব্যাপারে আলোচনা করলেন। সে সময় তিনি কখনও আওয়াজ ছোট করলেন, আবার কখনও বড় করলেন। তাঁকে দেখে আমাদের মনে হলো, খেজুর গাছের আড়ালেই দাজ্জাল লুকিয়ে আছে। আমরা সন্ধ্যায় তাঁর কাছে গেলে তিনি আমাদের দেখতে পেয়ে বললেন, 'তোমাদের কী খবর?' আমরা বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি ভোরে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং কখনও উচ্চস্বরে, আবার কখনও নিম্নস্বরে কথা বলেছেন। তাতে আমরা মনে করেছি যে, দাজ্জাল খেজুর গাছের আড়ালে বিদ্যমান। আমাদের কথা শুনে তিনি বললেন, 'দাজ্জাল নয়, বরং আমার ভয় তোমাদের অন্যান্য বিষয় নিয়ে। আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যদি দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটে, তবে আমি তোমাদের সামনে থেকে তাকে প্রতিহত করব। আর যদি আমি তোমাদের মাঝে না থাকা অবস্থায় দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটে, তবে প্রত্যেকের দায়িত্ব তার নিজের কাঁধে। আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের দেখে রাখবেন। দাজ্জাল যুবক এবং কোঁকড়া চুলবিশিষ্ট হবে। তার চক্ষু হবে স্ফীত। আমি তাকে আবদুল উজ্জা ইবনে কুতনের মতো মনে করছি। **তোমাদের মধ্যে কেউ দাজ্জালের সম্মুখীন হয়ে গেলে সে যেন তখন সুরা কাহাফের শুরুর আয়াতগুলো পাঠ করে।** সে ইরাক ও শামের মাঝামাঝি জায়গা থেকে বের হবে, ডানেবামে সর্বত্র বিপর্যয় সৃষ্টি করবে; হে আল্লাহর বান্দাগণ, অবিচল থাকবে।' আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সে পৃথিবীতে কত দিন অবস্থান করবে? রাসুলুল্লাহ বললেন, 'চল্লিশ দিন। তন্মধ্যে প্রথম দিনটি হবে এক বছরের সমান, দ্বিতীয় দিন এক মাসের সমান, তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান; অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের দিনসমূহের মতো হবে।'

আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, যে দিনটা এক বছরের সমান হবে, সেদিন কি আমাদের একদিনের নামাজই যথেষ্ট হবে?[১] তিনি বললেন, 'না, বরং

---

১. রাসুলের সাহাবাদের হৃদয়ের স্বচ্ছতা, ঈমানের গভীরতা ও আখিরাতমুখিতা দেখুন। তারা রাসুলুল্লাহর মুখে দিন লম্বা হয়ে যাওয়ার কথা শুনে আবহাওয়া, ভূগোল, সূর্য ও প্রকৃতি ইত্যাদি নিয়ে অমূলক প্রশ্নের পরিবর্তে নামাজ পড়বেন কীভাবে সেটা জিজ্ঞাসা করছেন। কারণ, ইসলামকে তারা আচরিত জীবনসংবিধান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, গবেষণা-বিলাসের বিষয়বস্তু হিসেবে নয়। ফলে তারা উপলব্ধি করেছিলেন, দাজ্জাল যখন আসার আসবেই; তাই সে কখন আসবে সে গবেষণায় নিজেদের ব্যাপৃত না করে সেসময়ে কীভাবে নামাজ আদায় করা যাবে, সেটা জানাই মূল কর্তব্য।

তোমরা স্বাভাবিক দিন হিসেবে নামাজ পড়বে।' আমরা বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, পৃথিবীতে তার গতি কেমন হবে? তিনি বললেন, "বাতাসে ভাসা মেঘের মতো। সে কোনো জনপদে এসে তাদের কুফরের দিকে আহ্বান করবে। তারা তার উপর ঈমান আনবে এবং তার ডাকে সাড়া দেবে। সে আকাশকে নির্দেশ দেবে, আর আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে; মাটিকে নির্দেশ দেবে, মাটি গাছপালা ও শস্য উদ্‌গত করবে। সন্ধ্যায় তাদের গবাদি পশুগুলো পূর্বের তুলনায় অধিক সুস্থ-সবল, অধিক দুধেল ও উদরপূর্ণ অবস্থায় তাদের নিকট ফিরে আসবে। সে আরেক সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে তাদেরও কুফরের প্রতি আহবান করবে, কিন্তু তারা সাড়া দেবে না। সে চলে যাবে। তাদের মাঝে দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি ছড়িয়ে পড়বে। তাদের হাতে তাদের ধনসম্পদ থাকবে না। সে কোনো পতিত স্থানকে যদি বলে 'তুমি তোমার গুপ্তধন বের করে দাও', তবে সেই স্থানের সকল ধনসম্পদ বের হয়ে তার পিছনে সেভাবে ছুটতে থাকবে যেভাবে মৌমাছি দলনেতার পিছনে ছোটে। দাজ্জাল কোনো যুবক ব্যক্তিকে ডেকে আনবে এবং তাকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে। অতঃপর সে পুনরায় তাকে ডাকবে। (মৃত) যুবক (জীবিত হয়ে) দীপ্তিমান হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তার দিকে এগিয়ে আসবে।"

'ঠিক এ সময় আল্লাহ ঈসা ইবনে মারইয়ামকে প্রেরণ করবেন। তিনি দুই ফেরেশতার ডানায় ভর করে জাফরানি রঙের কাপড় পরিহিত অবস্থায় পূর্ব দামেশকের শ্বেত মিনারের উপর অবতরণ করবেন। যখন তিনি তাঁর মাথা ঝোঁকাবেন, তখন বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটা তাঁর শরীর থেকে গড়িয়ে পড়বে। আর যখন মাথা উঁচু করবেন, তখন যেন মুক্তোর ঢল নামবে। তিনি যেকোনো কাফেরের কাছ দিয়ে গেলে তাঁর শ্বাসে কাফেররা ধ্বংস হয়ে যাবে। আর তাঁর শ্বাসের প্রভাব থাকবে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত। তিনি দাজ্জালকে তালাশ করতে থাকবেন। অবশেষে তাকে 'লুদ' নামক স্থানে পেয়ে যাবেন এবং হত্যা করবেন। অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম ওই সম্প্রদায়ের নিকট যাবেন, যাদের আল্লাহ তায়ালা দাজ্জালের ফিতনা থেকে হিফাজত করেছেন। তাদের নিকট গিয়ে তিনি তাদের চেহারায় হাত বুলিয়ে জান্নাতে তাদের স্তর ও মর্যাদা সম্পর্কে সংবাদ দেবেন।'

'এমন সময় আল্লাহ তায়ালা ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি এ ওহি নাজিল করবেন যে, আমি আমার এমন কিছু বিশেষ সৃষ্টি প্রকাশ করছি যাদের সাথে কারও যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই। সুতরাং তুমি আমার বান্দাদের তুর পর্বতে নিয়ে যাও। তখন

আল্লাহ তায়ালা ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায়কে প্রেরণ করবেন। তারা প্রতি উঁচু ভূমি থেকে ঢলের মতো নামবে। তাদের প্রথম দলটি তাবারিয়্যাহ (গ্যালিলি) হ্রদের সমুদয় পানি পান করে নিঃশেষ করে দেবে। অতঃপর তাদের সর্বশেষ দলটি এ স্থান দিয়ে যাত্রাকালে বলবে, এখানে সম্ভবত একসময় পানি ছিল। তারা আল্লাহর নবি ঈসা এবং তাঁর সঙ্গীদের অবরোধ করে রাখবে। একপর্যায়ে তাদের নিকট একটি ষাঁড়ের মাথা বর্তমানে তোমাদের নিকট একশো দিনারের মূল্যের চেয়েও অধিক দামি হয়ে যাবে (অর্থাৎ প্রচণ্ড খাদ্যকষ্ট তৈরি হবে)।'

'তখন ঈসা এবং তাঁর সঙ্গীগণ আল্লাহর নিকট মুক্তি প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ তায়ালা ইয়াজুজ-মাজুজ সম্প্রদায়ের প্রতি আজাব প্রেরণ করবেন। তাদের ঘাড়ে একপ্রকার পোকা হবে। এতে তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর ঈসা ও তাঁর সঙ্গীগণ পাহাড় থেকে নিচে নেমে আসবেন। কিন্তু পৃথিবীর কোথাও একবিঘত জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে ইয়াজুজ-মাজুজের গলিত লাশ ও গন্ধ না থাকবে। তখন ঈসা এবং তাঁর সঙ্গীগণ পুনরায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবেন। আল্লাহ তায়ালা উটের ঘাড়ের মতো লম্বা একধরনের পাখি প্রেরণ করবেন। তারা তাদের বহন করে আল্লাহর ইচ্ছা মাফিক স্থানে নিয়ে ফেলবে। অতঃপর আল্লাহ মুষলধারে প্রচণ্ড বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। কাঁচাপাকা কোনো ঘরই বৃষ্টির বাইরে থাকবে না। এতে মাটি বিধৌত হয়ে পরিচ্ছন্ন পিচ্ছিল মৃত্তিকায় পরিণত হবে। তখন মাটিকে এ মর্মে নির্দেশ দেওয়া হবে যে, হে মাটি, তুমি শস্য উৎপন্ন করো এবং তোমার বরকত ফিরিয়ে দাও। (এত পরিমাণ বরকত হবে যে) একদল মানুষ একটি ডালিম ভক্ষণ করবে এবং এর খোসার নিচে ছায়া গ্রহণ করবে। দুধের মধ্যে বরকত হবে। ফলে দুগ্ধবতী একটি উট ছোট ছোট অনেক গোত্রের জন্য যথেষ্ট হবে; দুগ্ধবতী একটি গাভি একটি কবিলার মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে; দুগ্ধবতী একটি ছাগল পুরো একটি যৌথ পরিবারের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। এ সময় আল্লাহ পবিত্র বাতাস প্রেরণ করবেন। এ বাতাস সকল মুমিনের বগল ছুঁয়ে যাবে, আর এতে প্রত্যেক মুমিন-মুসলিমের মৃত্যু হবে; একমাত্র মন্দ লোকেরাই পৃথিবীতে বাকি থাকবে। তারা গাধার মতো পরস্পর যৌনকর্মে লিপ্ত হবে। তাদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।'[১]

কিয়ামতের আলামত-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ দুটো মূলনীতি: কিয়ামতের আলামতগুলো বোঝার দুটো গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি রয়েছে। সেই মূলনীতি দুটো উল্লেখ

---

১. মুসলিম (২৯৩৭); ইবনে মাজা (৪০৭৫); হাকেম (৮৬০৩); মুসনাদে আহমদ (১৭৯০৪)।

না করা হলে পিছনের আলোচনা অনেকের জন্যই বিভ্রান্তির কারণ হবে; এগুলো থেকে উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে। একটি মূলনীতি এগুলো গ্রহণ সম্পর্কে, আরেকটি মূলনীতি বাস্তব ময়দানে প্রয়োগ সম্পর্কে।

প্রথম মূলনীতি: কুরআন-সুন্নাহে এগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবে বিশ্বাস করতে হবে—আপত্তি করা যাবে না, যুক্তির লাঙল ঠ্যালা যাবে না। কারণ, এগুলো সব অদৃশ্যের বিষয়; যুক্তিতে ধরা আবশ্যক নয়। হ্যাঁ, যুক্তি ও বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট বাস্তবতা (ফ্যাক্ট; থিওরি নয়)-এর আলোকে যদি এগুলোকে আরও অধিক বিশ্বাসযোগ্য করানো যায়, সেটা ভালো। কিন্তু যুক্তি ও বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে এগুলো অস্বীকার করা কিংবা অপব্যাখ্যা করা অবৈধ, গোমরাহি ও ভ্রষ্টতার পথ। এই কারণে আমরা দেখি, অতীত ও বর্তমানে এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবী, অন্য কথায় প্রাচীন ও আধুনিক মুতাজিলা সম্প্রদায়, কিয়ামতের আলামত-সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ আকিদা অস্বীকার করেছে। দাজ্জাল, ইয়াজুজ-মাজুজ, মাহদি, ঈসা আলাইহিস সালামের আগমন—সবকিছুকে তারা হয়তো পুরোপুরি অস্বীকার করেছে, অথবা অপব্যাখ্যা করেছে। এক্ষেত্রে তাদের দলিল একটাই—যুক্তি। অথচ কেবল যুক্তি দিয়ে ইসলামকে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। ইসলামের নাম আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ। কেবল তথাকথিত যুক্তির উপর ভিত্তি করে এতগুলো আয়াত ও হাদিস অস্বীকার করা বৈধ হয় কোন যুক্তিতে?

তারা কেবল অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং এসব হাদিস এবং হাদিসের কিতাবগুলোকে ইসলামের জন্য ক্ষতিকর মনে করেছে, শিক্ষিত অমুসলিমদের ইসলামের পথে প্রতিবন্ধক মনে করেছে। কারণ, এসব কুসংস্কার দেখলে অনেক পণ্ডিত নাকি ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। অথচ বাস্তবতা হলো, তারাই ইসলামের জন্য বেশি ক্ষতিকর। তাদের যুক্তিই তাদের নিজেদের ও সকলের ঈমানের জন্য বিষতুল্য। ইসলামের অনেক বিধানই যুক্তির আলোকে প্রমাণ করা যায় না। তা হলে কি সবগুলোকে অস্বীকার করতে হবে? সত্য ও বাস্তব হওয়ার জন্য সবকিছুকেই যদি মানুষের যুক্তি ও বুদ্ধির মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হয়, তা হলে মানুষ ও স্রষ্টার মাঝে পার্থক্য কী? মুমিন ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য কী? মানুষকে পরীক্ষার যুক্তি কী? তাই দুর্বল মানুষের উচিত নিজেদের দিকে তাকানো, তার দেহের মাঝে আল্লাহর কত অনাবিষ্কৃত রহস্য রয়ে গেছে, সেগুলো আবিষ্কার করা; আর এগুলো কুরআন-সুন্নাহে যেভাবে এসেছে, সেভাবে বিশ্বাস করা। বুঝে আসুক না আসুক, যুক্তিতে ধরুক না ধরুক তাতে দৃঢ় ইয়াকিন রাখা। এটাই মুমিন ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য।

একইভাবে আরশের নিচে সূর্যের সিজদা দেওয়া, কিয়ামতের আগে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া নিয়েও অনেক নাস্তিক উপহাস করে। ফলে মুসলমানরাও এগুলো নিয়ে সন্দেহে পড়ে যায়। অনেকে এসব হাদিস জাল মনে করে; যেসব ইমাম এসব হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাদের দোষারোপ করে; অথচ তারা নিজেদের ক্ষুদ্রতা বোঝে না। আল্লাহর মহাবিশ্বে সে কতটা তুচ্ছ, আল্লাহর জ্ঞানের সামনে সে কতটা মূর্খ—এটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না। মানুষের চোখে একটু টুকরো বালু গেলে সে অস্থির হয়ে যায়; তার মাথায় বিদ্যমান শিরাগুলো একবিন্দু এদিক-সেদিক হয়ে গেলে তার ব্রেইন কাজ করা বন্ধ করে দেয়, তাকে হয়তো পাগলাগারদে নয়তো কবরে রেখে আসতে হয়; এটুকু ব্রেইন দিয়ে সে মহাবিশ্বের অজানা এসব রহস্যের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর বর্ণনা নিয়ে উপহাস করে। আজ বিজ্ঞান আমাদের মহাবিশ্ব, সূর্য, ছায়াপথ, নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ সম্পর্কে যেসব ধারণা দেয়, কয়েকশো বছর আগে এগুলো মানুষের কল্পনারও বাইরে ছিল। আজ আমরা যা কল্পনা করতে পারছি না, কয়েকশো বছর পরে হয়তো সেগুলোই বাস্তব হয়ে ধরা দেবে। তা হলে চিরন্তন বাস্তবতার ক্ষেত্রে কি গোটা বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহর উপর নির্ভর করা উচিত, নাকি দুর্বল মানুষের যুক্তির কাছে ছেড়ে দেওয়া উচিত?

বরং কুরআনে আল্লাহ তায়ালা একাধিক আয়াতে মহাবিশ্বের অনেককিছু কর্তৃক আল্লাহকে সিজদা দেওয়ার কথা বলেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُوْمُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَآبُّ وَ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَ كَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَ مَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ.

অর্থ: 'আপনি কি দেখেননি, নভোমণ্ডলে যারা আছে আর যা আছে ভূমণ্ডলে আর সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতমালা, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ সবাই আল্লাহকে সিজদা করে। আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন।' [হজ: ১৮] অন্য আয়াতে বলেন,

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ الشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَ هُمْ دٰخِرُوْنَ. وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ هُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ.

অর্থ: 'তারা কি আল্লাহর সৃজিত বস্তু দেখে না, যার ছায়া আল্লাহর প্রতি বিনীতভাবে সিজদাবনত থেকে ডান ও বাম দিকে ঝুঁকে পড়ে? আল্লাহকে সিজদা করে যা-কিছু নভোমণ্ডলে আছে, যা-কিছু ভূমণ্ডলে আছে এবং ফেরেশতাগণ; তারা অহংকার করে না। [নাহল: ৪৮-৪৯] কিন্তু আমরা কারও সিজদা দেখতে পাই না। সূর্য, চন্দ্র, আকাশ-জমিনের তো মাথা, হাত-পা নেই, তা হলে তারা সিজদা দেয় কী করে? কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বিশ্বের সকল বস্তুর তাঁর তাসবিহ পাঠের কথা বলেছেন। আল্লাহ বলেন,

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَ الْاَرْضُ وَ مَنْ فِيْهِنَّ ؕ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَ لٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا.

অর্থ: 'সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা-কিছু আছে, সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এমন কিছু নেই যা তার প্রশংসা ও তাসবিহ পাঠ করে না। কিন্তু তাদের তাসবিহ পাঠ তোমরা অনুধাবন করতে পারো না। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।' [ইসরা: ৪৪] জড়বস্তু তাসবিহ পাঠ করে কী করে?

মোট কথা: কুরআন-সুন্নাহর উপর অসুস্থ যুক্তির হাল চালাতে গেলে বিভ্রান্তি অনিবার্য। অনেক মুসলিম দাবিদারও সেসব হাদিসকে অস্বীকার করে যেগুলো যুক্তিতে ধরে না। তাদের যুক্তি—এগুলোতে অযথা মানুষ ঈমানহারা হবে, নাস্তিকরা ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা করবে; সুতরাং এগুলো অস্বীকার করাই নিরাপদ; তা হলে নাস্তিকরা এগুলো নিয়ে উপহাস করতে পারবে না। এটাকে বলা হয় মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি। আল্লাহ এই দ্বীন পাঠিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দ্বীন নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন। কোনটা বলতে হবে, কোনটা বলতে হবে না—সেটা তারা জানতেন না? এমন অসুস্থ যুক্তি আমলে নিতে গেলে ইসলামের অনেককিছুই লুকোতে হবে। উপরের আয়াতগুলোকে অস্বীকার করতে হবে। শেষে আল্লাহর দ্বীন থাকবে না; থাকবে প্রবৃত্তি।

তাই মুমিনগণই সফল; মুমিনগণই বিজ্ঞানমনস্ক ও সুস্থ যুক্তির অধিকারী। তারা নিজেদের সীমাবদ্ধতা বোঝে। সূর্য-সহ সব ধরনের অদৃশ্য সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, বুঝে আসুক না আসুক, তাতে দৃঢ় ঈমান রাখে। যেন তারা সেগুলো নিজের চোখে দেখেছে। কারণ, তাদের সুস্থ যুক্তি—যিনি গোটা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন, বিশ্বের বিলিয়ন বিলিয়ন গ্রহ-নক্ষত্র তৈরি করেছেন,

সূর্যের চেয়েও হাজার গুণ বড় বড় তারকা তৈরি করেছেন, সেখানে আমাদের সৌরজগতের ছোট্ট একটি সূর্যকে আরশের নিচে সিজদা দেওয়ানো তার পক্ষে অসম্ভব হতে পারে না। **আল্লাহ যা বলেছেন, তার উপর আমরা দৃঢ় ঈমান রাখি। এই সিজদার কাইফিয়্যাত (ধরন ও স্বরূপ) আল্লাহর কাছে সঁপে দিই। তিনি যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন সেটাই সঠিক। এগুলোকে আমরা অস্বীকার কিংবা অপব্যাখ্যা কোনোটাই করি না।** এটাই সুস্থ যুক্তিবাদিতা ও প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্কতা। যে মানুষ তার পায়ের নিচে কিংবা মাথার পিছনে কী আছে বলতে পারে না, সামান্য অন্ধকারে যার দুটো চোখ দিব্যি খুলে রাখার পরও পথ হাতড়ে বেড়ায়, সে আল্লাহ ও রাসুলের কথা নিয়ে উপহাস করে। এরচেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কী হতে পারে? আল্লাহ বলেন,

اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ . قَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَ كُنَّا قَوْمًا ضَآلِّيْنَ . رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ . قَالَ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَ لَا تُكَلِّمُوْنِ . اِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ . فَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰۤى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيْ وَ كُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ . اِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْۤا ۙ اَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ.

অর্থ: ‘তোমাদের সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হতো না আর তোমরা সেগুলোকে মিথ্যা বলতে না? তারা বলবে, হে আমাদের রব, আমরা দুর্ভাগ্যের সামনে অসহায় ছিলাম এবং আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়। হে আমাদের রব, এখান (জাহান্নাম) থেকে আমাদের বের করুন; আমরা যদি পুনরায় (কুফরের দিকে) ফিরে যাই, তবে আমরা গুনাহগার হব। আল্লাহ বলবেন, তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাকো এবং আমার সাথে কোনো কথা বলো না। আমার একদল বান্দা বলত, হে আমাদের রব, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অতএব, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহশীল। কিন্তু তোমরা তাদের ঠাট্টার পাত্ররূপে গ্রহণ করতে। একপর্যায়ে তা তোমাদের আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিলো আর তোমরা তাদের দেখে পরিহাস করতে। আজ আমি তাদের সবরের কারণে প্রতিদান দিয়েছি, তাদের সফলকাম বানিয়েছি।’ [মুমিনুন: ১০৫-১১১]

মোট কথা, কিয়ামতের আলামতগুলো-সহ ইসলামে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত সকল আকিদায় আত্মসমর্পণই মুক্তির পথ। এক্ষেত্রে যে যত নিজের সীমাবদ্ধতা বুঝবে,

আত্মসমর্পণে তৎপর হবে, বিনয় ও ক্ষুদ্রতা প্রকাশ করে মেনে নেওয়ার মানসিকতা রাখবে, সে তত বড় মুমিন হতে পারবে। বিপরীতে যে যত যুক্তির পিছনে পড়বে, আল্লাহ ও দ্বীনের সঙ্গে তার দূরত্ব তত বাড়বে, বঞ্চনার তত কাছাকাছি চলে যাবে।

দ্বিতীয় মূলনীতি: কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফের সুস্পষ্ট দলিল ছাড়া **এসব আলামতকে বর্তমানের উপর প্রয়োগ না করা**। পিছনে আমরা কিয়ামতের যেসব আলামত উল্লেখ করেছি, সেগুলো প্রসিদ্ধ এবং সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। এগুলোর বাইরেও কুরআন-সুন্নাহে কিয়ামতের অসংখ্য আলামত এসেছে। যেমন: বিভিন্ন বাহিনীর আত্মপ্রকাশের ঘটনা;[১] শাম-সহ বিভিন্ন এলাকায় বিশাল বিশাল যুদ্ধ (মালহামা) সংঘটিত হওয়া ইত্যাদি।[২] কিছু সমকালীন ইসলামি গবেষককে দেখা যায় এসব হাদিস নির্ধারিত ব্যক্তি, ভূখণ্ড কিংবা সম্প্রদায়ের উপর প্রয়োগ করছেন; অথচ এমন কাজ সালাফের মানহাজ নয় এবং নিরাপদও নয়। আজ কোনো বাহিনীকে বাহ্যত ইসতিকামাতের উপর দেখে আপনি তাদের কুরআন-হাদিসে বর্ণিত কোনো এক মুবারক বাহিনী বানিয়ে দিলেন; আগামীকাল যদি তাদের গোমরাহি প্রকাশিত হয়, তখন কুরআন-হাদিসের ইসমত কোথায় যাবে? আল্লাহ বলেন,

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الْاِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ اَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ: 'আপনি বলুন, আমার পালনকর্তা কেবল অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গুনাহ, অন্যায়-অত্যাচার। আর (হারাম করেছেন) আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি। আর (হারাম করেছেন) **আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জানো না।'** [আরাফ: ৩৩] অন্য আয়াতে বলেন,

وَ لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا

অর্থ: **'যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, সেটার পিছনে পড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয় এগুলোর প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।'** [ইসরা: ৩৬]

---

১. উদাহরণস্বরূপ দেখুন: কানজুল উম্মাল (৩৫১৫৫)।
২. আবু দাউদ (৪২৯৪); মুসনাদে আহমদ (২২৪৪৬)।

আর এ কারণেই এসব ক্ষেত্রে সালাফের মানহাজ ছিল এসব নসের কাছাকাছি কোনো তাফসির খোঁজা, সম্ভাব্য ব্যাখ্যা পেশ করা, নির্ধারিত কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের উপর কুরআন-সুন্নাহকে সুনিশ্চিতভাবে প্রয়োগ না করা, এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত থাকা, প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহর কাছে সঁপে দেওয়া। সালাফের তাফসির ও হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থে উক্ত কর্মপদ্ধতি সুস্পষ্টভাবেই চোখে পড়বে। তাদের কিতাবে আপনি ফজিলত, আহকাম ও প্রাচীন আখবার-সম্পর্কিত নসগুলোর ক্ষেত্রে তফসিলি আলোচনা পাবেন। বিপরীতে কিয়ামতের আলামত-সংক্রান্ত বর্ণনায় দেখবেন তারা সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছেন; সংশ্লিষ্ট নসে ব্যবহৃত কঠিন ও অস্পষ্ট কোনো শব্দ থাকলে সেটার অর্থ স্পষ্ট করছেন। প্রাসঙ্গিক আরও কিছু জরুরি বিষয় আলোচনা করেই নীরব হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের যুগে এসে সালাফের মানহাজ পুরোটা উলটে দিয়েছে মানুষ—মাহদি ও দাজ্জাল থেকে শুরু করে কিয়ামতের আলামত-সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি আয়াত কিংবা হাদিসের লম্বা লম্বা ব্যাখ্যা পেশ করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন সাগর, ট্রায়াঙ্গল ও দ্বীপকে দাজ্জালের আবাসস্থল হিসেবে আখ্যা দিচ্ছে। পশ্চিমা সভ্যতাকে দাজ্জাল বলছে। আধুনিক বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্রকে দাজ্জালের অস্ত্র আখ্যা দিচ্ছে। কোথাও কালো পতাকা দেখলেই সেটাকে মাহদির পতাকা মনে করছে। কোথাও ভূমিকম্প হলেই সেটাকে হাদিসে বর্ণিত 'ভূমিধস' হিসেবে ব্যাখ্যা দিচ্ছে। কখনো চীনের প্রাচীরকে ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীর আখ্যা দিচ্ছে। মোট কথা, পৃথিবীর যেকোনো ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা দুর্যোগকে এসব হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, যা সালাফের মানহাজ নয়। মানুষকে কিয়ামতের আলামতগুলো জানানো, দরস, ইলমি মজলিস ও মাহফিলগুলোতে এসব বিষয়ের আলোচনা দূষণীয় তো নয়ই, বরং প্রয়োজনীয়। কিন্তু সমকালীন বিভিন্ন ঘটনার উপর এগুলোকে প্রয়োগ করা সঠিক নয়।

وَلاَ نُصَدِّقُ كَاهِنًا وَلاَ عَرَّافًا وَلاَ مَنْ يَدَّعِي شَيْئًا يُخَالِفُ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ الأُمَّةِ.

আমরা কোনো গণক কিংবা জ্যোতিষীকে বিশ্বাস করি না। কুরআন, সুন্নাহ এবং উম্মাহর সর্বসম্মত মতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো দাবি-দাওয়া সত্য বলে স্বীকার করি না।

ব্যাখ্যা

গায়েব-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আকিদা

গণক ও জ্যোতিষীকে বিশ্বাস করা নিষিদ্ধ: আরবিতে 'কাহিন' শব্দের অর্থ হলো গণক, ভবিষ্যদ্‌বক্তা, গায়েব জানার দাবিদার। আর 'আররাফ' শব্দের অর্থও গোপন বিষয় জানার দাবিদার। ইবনুল আসির লিখেন, প্রাচীন আরবদের মাঝে এগুলোর ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন ছিল। জিন কিংবা অন্য কোনো উপায়ে ভবিষ্যৎ জানার দাবিদারকে 'কাহিন' বলা হতো। চুরি কিংবা হারিয়ে যাওয়া বস্তু বিভিন্ন অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উদ্ধার করে দেওয়ার দাবিদারকে বলা হতো 'আররাফ'। আর আকাশের তারকার সাহায্যে গায়েব জানার দাবিদারকে বলা হতো 'মুনাজ্জিম' তথা জ্যোতিষী। কিন্তু হাদিসে 'কাহিন' বলতে উপরের তিনটিকেই অন্তর্ভুক্ত করে।[১] হরবি বলেন, 'কাহিন' হলো যে ব্যক্তি অনুমান-নির্ভর ভবিষ্যতের সংবাদ দেয়।[২] বাংলাতে আমরা ভাগ্য গণনাকারী বা গণক বলতে পারি। জাকারিয়া আল-আনসারি 'কাহিন' এবং 'আররাফ'-এর মাঝে পার্থক্য করে বলেন, 'কাহিন' হলো যে তারকার মাধ্যমে ভবিষ্যতের কথা বলে, আর 'আররাফ' হলো বর্তমানে (তারকার সাহায্য ছাড়া অনুমানভিত্তিক) কোনো অদৃশ্য কিছুর সংবাদ দেয়, যেমন চুরি হয়ে যাওয়া বস্তু ইত্যাদি।[৩] দেখা যাচ্ছে—কর্মপদ্ধতি ও উপকরণের ক্ষেত্রে 'কাহিন', 'আররাফ' ও 'মুনাজ্জিম' প্রভৃতির মাঝে পার্থক্য

---

১. আন-নিহায়া, ইবনুল আসির (৩/২১৮, ৬/৭৫২)।
২. গরিবুল হাদিস, হরবি (২/৫৯৪)।
৩. শরহু রাওজিত তালিব, জাকারিয়া আল-আনাসারি (৪/৮২)।

থাকলেও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে অভিন্ন। তাদের প্রত্যেকেই বর্তমানের অজ্ঞাত বিষয় ও ভবিষ্যৎ জানার দাবিদার।[১]

ইসলামে ভাগ্যগণনা, হস্তরেখাবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, রাশিচক্র—সবগুলো নিষিদ্ধ। কারণ, এগুলোর ভিত্তি মিথ্যার উপর। সবগুলোই দ্বীন ও দুনিয়া, সমাজ ও মানুষের জন্য সমান ক্ষতিকর। বিপরীতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া, আলট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে গর্ভের সন্তানের অবস্থা ও লিঙ্গ জানা-সহ এ-জাতীয় সকল বিষয়, যা বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক বিদ্যার উপর নির্ভরশীল, সেগুলো নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না।

ইসলামে গণক ও জ্যোতিষীদের কাছে যেতে কঠোরভাবে বারণ করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক হাদিসে তার উম্মতকে তাদের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন। যারা যাবে, তাদের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। আবু হুরাইরা রাজি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে এলো এবং তার কথাকে সত্যায়ন করল, সে যেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ (দ্বীনকে) অস্বীকার করল।'[২] সাফিয়্যাহ রাজি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো গণক (আররাফ)-এর কাছে আসবে এবং তার কথা সত্যায়ন করবে, চল্লিশ দিন তার নামাজ কবুল করা হবে না।'[৩] আনাস ইবনে মালেক থেকে আরেকটি ব্যখ্যা-সহ এমন হাদিস এসেছে, 'যদি কোনো ব্যক্তি গণকের কাছে আসে এবং তার কথা সত্যায়ন করে, তবে সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ দ্বীন থেকে মুক্ত। আর যে ব্যক্তি তার কাছে আসে, কিন্তু তাকে সত্যায়ন করে না, তবে চল্লিশ দিন তার নামাজ কবুল করা হবে না।'[৪]

প্রশ্ন হতে পারে, গণকের কাছে যাওয়া এবং তাদের সত্যায়ন করা কি বাস্তবেই কুফর? অন্য কথায়, কেউ যদি গণকদের সত্যায়ন করে, তবে কি সে কাফের হয়ে যাবে? প্রথম কথা হলো, হাদিসের বাহ্যিক ভাষ্য যদিও তা-ই বলে, কিন্তু বাস্তবে বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয়; বরং হাদিসে মূলত ভয়াবহতা এবং গুনাহের প্রচণ্ডতা বোঝাতে এটা বলা হয়েছে। কারণ, যেসব হাদিসে গণকের কাছে আসা ব্যক্তির

---

১. শরহে মুসলিম, নববি (৫/২২); রদ্দুল মুহতার, ইবনে আবিদিন (১/৪৫); আকহাসারি (২৬০); ফাওজান (১৯৪)।
২. আবু দাউদ (৩৯০৪); তিরমিজি (১৩৫); ইবনে মাজা (৬৩৯); হাকেম (১৫); দারেমি (১১৭৬)।
৩. মুসলিম (২২৩০); মুসনাদে আহমদ (১৬৯০৬)।
৪. আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি (৬৬৭০)।

কুফরের কথা বলা হয়েছে, সেসব হাদিসে আরও কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেগুলোও কুফরের আওতায় পড়ে, অথচ আলিমদের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী সেগুলো কুফর নয়। যেমন: আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, 'যদি কেউ গণকের কাছে যায় এবং তাকে সত্যায়ন করে, অথবা তার স্ত্রীর হায়েজ অবস্থায় তার সঙ্গে সহবাস করে, অথবা স্ত্রীর পিছনের দিক থেকে সহবাস করে, তবে সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যা-কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তা থেকে মুক্ত।'[১] এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বাহ্যত কাফের বলা হয়েছে; অথচ স্ত্রীর সঙ্গে উক্ত পন্থায় যারা সহবাস করবে, তারা অপরাধী হলেও আহলে সুন্নাতের আলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে কাফের হবে না। সুতরাং গণকের কাছে গেলে এবং তাকে সত্যায়ন করলেই কাফের হয়ে যাবে—এমন নয়। তবে কাজটি অত্যন্ত জঘন্য এবং বড় ধরনের কবিরা গুনাহ।[২]

তবে কিছু কিছু অবস্থায় বাস্তবিক অর্থেই কাফের হয়ে যাবে। কারণ, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েব জানে না। আল্লাহ তায়ালা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে বলেন,

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ؕ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ.

অর্থ: 'আপনি বলুন, আকাশ ও জমিনে যারা আছে, তাদের কেউ গায়েব জানে না। গায়েব জানেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা।' [নামল: ৬৫] ফলে গণকও গায়েব জানে না। যদি গণকের কথা এই বিশ্বাস রেখে সত্যায়ন করে যে, সে হয়তো জিন, শয়তান কিংবা অন্য কোনো উপায়ে এগুলো জেনেছে, অথবা অনুমান করে বলছে, তাতে সে কাফের হবে না। উপরের বক্তব্য এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু যদি কেউ এটা মনে করে যে, গণক গায়েব জানে, জগতের সকল রহস্য তার সামনে উদ্ভাসিত, অতীত ও বর্তমানের সবকিছু তার নখদর্পণে, তবে এমন ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। কারণ, সে দ্বীনের মৌলিক একটা বিষয় অস্বীকার করেছে; আল্লাহর বিশেষ একটি গুণে সৃষ্টিকে শরিক করেছে। ফলে এটা বড় ধরনের শিরকের পর্যায়ে পড়বে এবং সে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বেরিয়ে মুশরিক হয়ে যাবে।

ইসলামের মানবিকতা: এটা মূলত ইসলাম যে কতটা মানবিক, বাস্তববাদী ও কল্যাণকর জীবনবিধান তার প্রমাণ। কারণ গণক-জ্যোতিষী মানব সমাজের জন্য ক্ষতিকর। এরা প্রতারণার মাধ্যমে মানুষের সম্পদ লুটে নেয়, মিথ্যা আশ্বাসের মাধ্যমে

---

১. আবু দাউদ (৩৯০৪); সুনানে কুবরা, বাইহাকি (১৪২৩৫); বাজ্জার (৯৫০২)।
২. আল-ইবানাহ-আল কুবরা, ইবনে বাত্তাহ (২/৭২৮); আল-ফুরু, ইবনে মুফলিহ (১০/২১১)।

মানুষকে ঠকায়। পাশাপাশি হতাশাগ্রস্ত মানুষকে হতাশার প্রকৃত চিকিৎসা না দিয়ে, হতাশা থেকে উত্তরণের পথ না বলে উলটো হতাশা ও নিরাশার অথই সাগরে ভাসিয়ে দেয়। কেউ তাদের উপর ভরসা করে আকাশ-কুসুম ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর থাকে। অনেকে তাদের কথার ভিত্তিতে পরিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন করে; বরং গণক ও জ্যোতিষী অনেক সময় সমাজে বিভিন্ন হানাহানি ও খুনোখুনির পিছনে থাকে। অনেক ফৌজদারি মামলার নথিপত্রে এমন বিবরণ দেখা গেছে। এগুলো পার্থিব ক্ষতি। পরকালীন ক্ষতি আরও বেশি। তাদের কাছে যারা নিয়মিত আসা-যাওয়া করে, ধীরে ধীরে তাদের ঈমানহারা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কারণ, তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাবিজ-কবচ কিংবা গণক-জ্যোতিষীদের মিথ্যা আশ্বাসের উপর ভরসা করা শুরু করে, বিপদে-আপদে বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা সর্বক্ষমতার অধিকারী আল্লাহর কাছে মনোযোগী হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর তুচ্ছ সৃষ্টি পাথর কিংবা আংটির প্রতি মনোযোগী হয়, তাকদিরের পরিবর্তে এগুলোকে সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের উপকরণ মনে করে। এভাবে যারা তাদের কাছে যায়, একসময় দ্বীন ও দুনিয়া দুটোকেই হারিয়ে ফেলে।

বর্তমান সময়ে শিক্ষিত শ্রেণির মাঝেও পাথর, আংটি ও ধাতুর অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসী, জ্যোতিষী ও রাশিচক্রের প্রতি বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। অথচ মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে নক্ষত্রের কোনো সম্পর্ক নেই। রাশির সঙ্গে মানুষের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের বিন্দুমাত্র যোগসূত্র নেই। জন্ম ও মৃত্যুতারিখের সঙ্গে সৌভাগ্য-দুভার্গ্যের কোনো সংযোগ নেই। কল্যাণ-অকল্যাণের সঙ্গে পাথরের সম্পর্ক নেই। এগুলো সব তাওহিদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক পৌত্তলিক বিশ্বাস। তা হলে শিক্ষিত, স্মার্ট ও সেলিব্রিটিরা এদিকে ঝুঁকছে কেন? মূলত মুসলমানদের উপর হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবের অন্যতম ক্ষতিকর দিক এটি। হিন্দুদের কুণ্ডলী কুসংস্কার থেকে এদেশের মুসলমানদের মাঝে এগুলো ছড়িয়েছে। মিডিয়া ও প্রচারমাধ্যমে অত্যধিক এবং প্রতারণাপূর্ণ প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে মানুষকে এদিকে টানা হচ্ছে। এটি একদিক থেকে বেশ উদ্বেগজনক ও দুঃখজনক বিষয় হলেও বিস্ময়কর নয়; বরং দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা ও কুরআন-সুন্নাহকে অবহেলার স্বাভাবিক পরিণতি। যে ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহর আলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, অন্ধকার ছাড়া তার গতি কী? যারা আল্লাহকে ভুলে যায়, আল্লাহ তাদের ধাপ্পাবাজদের দরজায় দাঁড় করিয়ে লাঞ্ছিত করেন। এ জন্য ইমাম তহাবি তার কথা কেবল গণক ও জ্যোতিষীদের উপর সীমাবদ্ধ করেননি, বরং যে-কেউ কুরআন-সুন্নাহর বাইরে কিছু করার দাবি করবে, তাদের প্রত্যাখ্যান করতে বলেছেন:

'আমরা কুরআন, সুন্নাহ এবং উম্মাহর সর্বসম্মত মতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো দাবি-দাওয়া সত্য বলে স্বীকার করি না।'

প্রশ্ন আসতে পারে, অনেক সময় জ্যোতিষীদের কথা সত্য হয়ে যায়। তা হলে কি এটা প্রমাণ করে না যে, তাদের জ্ঞান ভিত্তিহীন নয়? হ্যাঁ, অনকে সময় তাদের কথা সত্য হয়। কিন্তু সেটা দুই প্রকারের:

এক. কাকতালীয়। অর্থাৎ একান্তই আকস্মিকভাবে কথায় কথা মিলে যায়। বাস্তবে তার নিজেরও জানা থাকে না যে, এটা ঘটতে পারে। **দুই**. জিন ও জাদুবিদ্যার সহায়তা। [আনআম: ১১২-১১৩][১] আয়েশা রাজি. থেকে বর্ণিত, একদল লোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গণক (কাহিন) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তারা কিছুই না' (ভুয়া)। তখন তাকে বলা হলো, ইয়া রাসুলাল্লাহ, অনেক সময় তো তাদের কথা সত্য হয়ে যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, 'সেটা জিন (আকাশ থেকে শুনে) তাদের শোনায়। তারা সেটার সঙ্গে আরও একশো মিথ্যা মিশ্রিত করে।'[২] উক্ত হাদিসের প্রথম অংশ প্রথম প্রকার; অর্থাৎ তারা কিছুই জানে না; যা বলার আন্দাজে বলে। আর দ্বিতীয় অংশ দ্বিতীয় প্রকার। ফলে অনেক সময় জিন ও নক্ষত্র ইত্যাদির সঙ্গে জাদুবিদ্যার সমন্বয় করে জ্যোতিষীরা জাদুর আশ্রয় নেয়।

আর জাদুবিদ্যা বাস্তবেই বিদ্যমান। দুষ্ট জিন ও বিভিন্ন পন্থায় এর মাধ্যমে মানুষকে অসুস্থ করা যায়, হত্যা করা যায়, মানসিকভাবে ধ্বংস করে দেওয়া যায়, পাগল বানানো যায়, স্বামী-স্ত্রী ও পরিবারের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো যায়। অর্থাৎ জগতের অনেক ক্ষতিকর কর্ম এই জাদুর মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায়।[৩] কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সেগুলো আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া হয়, বরং আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া জাদু কোনো ক্ষতি করতে পারে না। [বাকারা: ১০২] কিন্তু আল্লাহ পৃথিবীতে যেসব শৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন, জাদুবিদ্যার মাধ্যমে প্রভাব তৈরি হওয়া সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত। তবে জাদুবিদ্যা যেহেতু একটি অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বিদ্যা, এ জন্য ইসলামে এটা সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ হারাম এবং ক্ষেত্রবিশেষে (কুফরির উপাদান থাকলে) কুফর। বিস্তারিত আলোচনায় মতপার্থক্য ও বিধানের ভিন্নতা থাকলেও জাদুকরকে হত্যার বৈধতার ব্যাপারে সকল আলিম একমত।[৪]

---

১. তাফসিরে ইবনে কাসির (৬/১৫৬)।
২. বুখারি (৬২১৩); মুসলিম (২২২৮)।
৩. আল-ফুরুক, কারাফি (৪/১৪৯); ফাতহুল কাদির, ইবনুল হুমাম (৬/৯৯)।
৪. রদ্দুল মুহতার (১/৪৪-৪৫); ফাতহুল কাদির, ইবনুল হুমাম (৬/৯৯); ইলাউস সুনান (১২/৬৩৮)।

মোট কথা, অনেক সময় জ্যোতিষীরা জাদুবিদ্যার আশ্রয় নিয়ে কাজগুলো করে। ফলে যদি কখনও তারা আপনাকে কোনো সাহায্য করতেও পারে, সেটা সম্পূর্ণ হারাম ও অবৈধ পন্থায় করা হয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **যে ব্যক্তি নক্ষত্র থেকে জ্ঞান আহরণ করল, সে জাদুবিদ্যা গ্রহণ করল।**[১] তাই এসব হারাম পথে কোনো বরকত বা সুখ-সৌভাগ্য আসতে পারে না। হ্যাঁ, যদি কেউ কারও দ্বারা ক্ষতির শিকার হয়, কাউকে জাদু-টোনা করা হয়, সেক্ষেত্রে শরয়ি রুকইয়া, জাদু নষ্টের জন্য বিভিন্ন আমল করা যেতে পারে। **কারও কিছু চুরি হয়ে গেলে সেক্ষেত্রে শরিয়ত-অনুমোদিত পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে; কিন্তু জিনদের সহায়তা নেওয়া, জাদুকর ও জ্যোতিষী-গণকদের কাছে যাওয়া বৈধ নয়।**[২] **এক্ষেত্রে অনেক দ্বীনদার পরিবারকেও শিথিলতা করতে দেখা যায়। তাই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।**

একজন মুসলিম হিসেবে আপনার মনে রাখা উচিত, বিশ্বজগতের কোনোকিছু আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া হয় না। আল্লাহ ছাড়া কেউ আপনার লাভ-ক্ষতি, উপকার-অপকারের ক্ষমতা রাখে না। অমুসলিমদের কাছে আল্লাহ নেই, ফলে তারা মানুষের দরবার, মাজার ও আস্তানায় পড়ে থাকে। আপনি কেন তাদের মতো মানুষের কাছে যাবেন? আপনার চাকুরি প্রয়োজন? বিপদে আছেন? স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা হয় না? সন্তান হয় না? ঋণগ্রস্ত? কেউ আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে? চোরাই মাল ফেরত পেতে চান? রাস্তায় এমন চটকদার সস্তা বিজ্ঞাপন দেখে কোনো মানুষের দরজায় কড়া নাড়ানোর প্রয়োজন নেই। তারা আপনাকে ঠকানো ছাড়া আর কিছু করতে পারবে না। ওজু করে দুই রাকাআত নামাজ পড়ুন। আল্লাহর কাছে মিনতি করুন। তিনি আপনার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন, ইনশাআল্লাহ।[৩] দোয়ার আদব, দোয়া কবুলের শর্ত ও সময় ইত্যাদি নিয়ে পিছনে আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো দেখুন।

---

১. আবু দাউদ (৩৯০৫); ইবনে মাজা (৩৭২৬)।
২. আস-সুনান ওয়াল মুবতাদাআত, শুকাইরি (১২৮)।
৩. রদ্দুল মুহতার (২/২৮)।

وَنَرَى الـجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا، وَالفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا.

আমরা মুসলমানদের জামাতবদ্ধ থাকাকে সত্য ও সঠিক মনে করি। বিভেদকে বিভ্রান্তি ও আজাব মনে করি।

ব্যাখ্যা

ইসলামি ঐক্য: প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি

মুসলমানদের ঐক্য অপরিহার্য: যেসব বৈশিষ্ট্য ইসলামকে জগতের অন্য সকল ধর্ম থেকে আলাদা করেছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এর অনুসারীদের ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য ও সুদৃঢ় বন্ধনের উপর গুরুত্ব। ইসলাম তার অনুসারীদের ঐক্যের উপর যতটা জোর দিয়েছে, জগতের অন্য কোনো ধর্ম এতটা জোর দেয়নি। তবুও দুঃখজনকভাবে আজ মুসলিমরাই সম্ভবত সকল ধর্মের অনুসারীদের চেয়ে সবচেয়ে বেশি বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন এবং সবচেয়ে বেশি অনৈক্যের শিকার; অন্ততপক্ষে বেশি ক্ষতির শিকার। অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা নিজেদের মাঝে অসংখ্য মৌলিক বিষয়ে মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও অভিন্ন প্রতিপক্ষের ব্যাপারে সবাই এক। বিপরীতে সকল মুসলমান মৌলিক বিষয়ে একমত হলেও শাখাগত বিষয়ের মতবিরোধকে তারা মৌলিক দ্বন্দ্বের বিষয়বস্তুতে পরিণত করে আজ শতধাবিচ্ছিন্ন। বরং মুসলিমদের আজ মুসলিমদের তুলনায় অমুসলিমদের সঙ্গে সখ্য বেশি। ফলাফলও সামনে। মুসলিম উম্মাহর মতো দুর্বল, নিরীহ, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অক্ষম ও নিপীড়িত জাতিগোষ্ঠী সম্ভবত বর্তমান পৃথিবীতে আর নেই। অথচ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য কোনো নফল বিষয় নয় যে, মন চাইলে এক হলাম, মন না চাইলে হলাম না। বরং এটা মুসলমানদের ওয়াজিব আমল, মুসলমানদের আকিদার অংশ। আর এ কারণেই ইমাম তহাবি রাহি. তার আকীদাহ গ্রন্থের শেষ পর্যায়ে এসে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ইমাম তহাবির বক্তব্যের ব্যাখ্যায় আমরা প্রথমে কুরআন-সুন্নাহ থেকে মুসলমানদের ঐক্যের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা নিয়ে কিছু দলিল পেশ করব, অতঃপর সেগুলো বর্তমানের আলোকে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

কুরআন-সুন্নাহর অসংখ্য স্থানে মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে, তাদের এক থাকতে বলা হয়েছে; মতভেদ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন: আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۪ وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا.

অর্থ: 'আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ করো; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেছ।' [আলে ইমরান: ১০৩] অনৈক্যের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۭ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا.

অর্থ: 'যে ব্যক্তি সরল পথ স্পষ্ট হওয়ার পরও রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের অনুসৃত পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে, আমি তাকে ওই দিকেই ফেরাব, যে দিকে সে গিয়েছে (অর্থাৎ বক্র করে দেবো)। আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব; সেটা কতই না নিকৃষ্টতর গন্তব্য!' [নিসা: ১১৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহে বিষয়গুলো আরও স্পষ্ট। ফলে আমরা অধিকাংশ হাদিসের কিতাবে 'মুসলিম উম্মাহর ঐক্য'-শীর্ষক স্বতন্ত্র অধ্যায়ের শিরোনাম এবং এ ব্যাপারে সেগুলোর অধীনে একাধিক হাদিস দেখতে পাই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদিসে একদিকে উম্মাহর মতানৈক্য হবে সেই বাস্তবতা তুলে ধরেছেন, অপরদিকে তাদের ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। একটি হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ইহুদিরা একাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়েছে; খ্রিষ্টানরা বাহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়েছে; আমার উম্মত তিয়াত্তর ফিরকায় বিভক্ত হবে। সবগুলো ফিরকা জাহান্নামে যাবে, কেবল একটি জান্নাতে যাবে।' জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তারা কারা, হে আল্লাহর রাসুল?' তিনি বললেন, 'আমি ও আমার সাহাবাদের পথে যারা থাকবে।'[১] ফলে

---

১. তিরমিজি (২৬৪১); ইবনে মাজা (৩৯৯২); আবু দাউদ (৪৫৯৬)।

সবাইকে তিনি সেই পথে অবিচল থাকতে বলেছেন। অন্য কথায়, সেই পথই মুসলমানদের ঐক্যের মূল ভিত্তি। সেই সাহাবাওয়ালা পথকে কেন্দ্র করেই মুসলিম উম্মাহ এক হবে। অন্য হাদিসে বলেন, 'তোমাদের ভিতর যারা বেঁচে থাকবে, তারা অতি শীঘ্রই অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমাদের কর্তব্য হলো আমার সুন্নাহ এবং সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা। এগুলোকে তোমরা মজবুতভাবে ধরে রেখো, এগুলোর সঙ্গে দাঁত কামড়ে পড়ে থেকো। আর তোমরা নব-উদ্ভাবিত বিষয় থেকে সাবধান থেকো। কারণ, প্রত্যেক নব-উদ্ভাবিত বিষয় বিদআত; আর প্রত্যেক বিদআত গোমরাহি; আর প্রত্যেক গোমরাহির পরিণতি জাহান্নাম।'[১]

আরেকটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করেন আর তিনটি বিষয় অপছন্দ করেন। পছন্দের তিনটি বিষয় হলো, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে তার সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করবে না। **তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে এক হয়ে ধারণ করবে, বিচ্ছিন্ন-বিভক্ত হবে না।** আল্লাহ তোমাদের উপর যাদের নিযুক্ত করেছেন (শাসক) তাদের কল্যাণ কামনা করবে। আর তিনি অপছন্দ করেন অর্থহীন কথাবার্তা, অতিরিক্ত প্রশ্ন এবং সম্পদ বিনষ্ট করা।'[২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান প্রণয়ন করেন, সেখানেও মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। সংবিধানের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়, 'কুরাইশ ও ইয়াসরিবের মুসলিম এবং যারা তাদের সঙ্গে এসে নতুন যোগ দেবে, তাদের সঙ্গে জিহাদ করবে তারা এক জাতি। তাদের মাঝে অন্যরা অন্তর্ভুক্ত হবে না।'[৩]

কুরআন-হাদিসে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের গুরুত্ব সাহাবায়ে কেরাম তাদের জীবনে ধারণ করেছেন বেশ দৃঢ়ভাবে। এ জন্য আমরা দেখি, যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত লাভ করেন, তাঁর দাফনের আগে সাহাবায়ে কেরাম খলিফা নিযুক্তির কাজ সম্পন্ন করেন যাতে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য বজায় থাকে, ভেদাভেদ ও হানাহানি শুরু না হয়। বরং সাহাবায়ে কেরাম রাজি. রাসুলুল্লাহর ওফাতের পরও এক দেহের মতো ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন গোমরাহ

---

১. আবু দাউদ (৪৬০৭); তিরমিজি (২৬৭৬); ইবন মাজা (৪৩); ইবনে হিব্বান (৫)।
২. মুসলিম (১৭১৫); ইবনে হিব্বান (৩৩৮৮); মুসনাদে আহমদ (৮৯২১)।
৩. আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ, ইবনে কাসির (২/৩২১)।

সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। তারা ইসলামে অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেয়। ফলে স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন।

ইসলামের বিভিন্ন ইবাদত ও বিধানের মাঝেও ইসলামের এই চিরন্তন শিক্ষা, উম্মাহগত ঐক্যের চিত্র সুস্পষ্ট। মুসলমানরা যখন নামাজ পড়বে, তখন তাদের বলা হয়েছে জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়তে। ফলে প্রতিদিন প্রত্যেক সমাজের মুসলিমরা পাঁচবার একে অপরের পাশে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহর ইবাদত করে, সালাম বিনিময় করে, হালপুরসি করে; অতঃপর সপ্তাহে এক দিন শুক্রবার আরও বৃহৎ পরিসরে একত্র হয়, ইমামের বক্তব্য শোনে, একে অপরকে দেখে, জানে এবং ভালোবাসা বিনিময় করে। যদি বলা হতো, প্রত্যেকে তোমরা ঘরে নামাজ পড়ো, তবে মুসলিম উম্মাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। একইভাবে জাকাতের বিধান তো সরাসরি মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের গভীরে প্রোথিত। একে অপরের পাশে দাঁড়ানো, হাতে হাত ধরে সবাই মিলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার চিরন্তন শিক্ষা রয়েছে জাকাতে। ফলে দু-একজন বাদে সকল ইমামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, জাকাত কেবল মুসলিমদেরই দিতে হবে, অমুসলিমকে জাকাত দেওয়া যাবে না। কারণ, এটা একদিকে যেমন আল্লাহর নির্দেশ ও সম্পদের হক আদায়, অন্যদিকে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের বিশাল নিয়ামক। মুসলমানদের সম্পদ উম্মাহর মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে, মুসলিমরাই মুসলিমদের ধনসম্পদ থেকে উপকৃত হবে—এটাই যেন জাকাতের শিক্ষা। এভাবে ইসলাম এমন এক আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধান ও সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে দিয়েছে, অর্থনৈতিক বাস্তবতার পাশাপাশি ভারসাম্য রক্ষার পদ্ধতি বাতলে দিয়েছে, পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী দুনিয়ার প্রান্তিকতা থেকে যা সম্পূর্ণ মুক্ত। নামাজ যেখানে মহল্লাকেন্দ্রিক ঐক্যের পথ সুগম করে, জাকাত যেখানে সমাজকেন্দ্রিক ঐক্যের ঝান্ডা তুলে ধরে, হজ সেখানে বিশ্বমুসলিম উম্মাহর ঐক্যের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন—আরব-অনারব, আফ্রিকান-ইউরোপিয়ান, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, সাদা-কালো, ধনী-গরিব সকল মুসলিম একই পোশাকে, একই দোয়া ও জিকিরে, এক আল্লাহর এক ঘরে এক আত্মায় লীন হয়ে যায়; মুসলিম উম্মাহর বৈশ্বিক ঐক্য সমহিমায় ফুটে ওঠে।

অনৈক্য ধ্বংসের কারণ: ঐক্য মুসলিমদের অস্তিত্বের রক্ষাকবচ, অনৈক্য ধ্বংসের কারণ। পিছনের আয়াত ও হাদিসগুলোর মাধ্যমে সেটা স্পষ্ট হয়েছে। এখানে আরও কিছু নস যোগ করা হচ্ছে, যেগুলোর মাধ্যমে অনৈক্যের ভয়াবহতা ফুটে ওঠে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ

অর্থ: 'আর তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের নির্দেশ মান্য করো। পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হয়ো না; তাতে তোমরা ব্যর্থ হবে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে।' [আনফাল: ৪৬] ইমাম রাজি লিখেন, উক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, অনৈক্য মুসলমানদের মাঝে দুটো ফলাফল বয়ে আনে—এক. দুর্বলতা, দুই. পরাজয় ও ব্যর্থতা।[১] আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাজি. বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে কুরআন শিখিয়েছেন তারচেয়ে ভিন্নভাবে কুরআন পড়তে দেখে তাঁর কাছে নিয়ে এলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পড়া শুনে বললেন, 'দুজনেরটাই ঠিক আছে। তোমরা মতভেদ করো না; কারণ তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো মতভেদ করেছে, ফলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।'[২]

তিন দিনের বেশি কোনো মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন রাখাও জায়েজ নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ রেখো না; তোমরা পরস্পর হিংসা করো না; একে অন্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো না। বরং সকলে আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও। কোনো মুসলিমের জন্য তার (মুসলিম) ভাইয়ের সঙ্গে তিন রাতের অধিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হালাল নয়। এমন যেন না হয় যে, তাদের দেখা হবে, অথচ একজন আরেকজন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাদের মাঝে উত্তম সেই ব্যক্তি যে প্রথমে সালাম দেয়।'[৩] আবু হুরাইরা রাজি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে শরিক করে না এমন সবাইকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। তবে সে ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না যার মাঝে ও যার (মুসলিম) ভাইয়ের মাঝে শত্রুতা রয়েছে। ফেরেশতাদের বলা হয়, তাদের এভাবে রেখে দাও যতক্ষণ না তারা পরস্পরে মিলে যায়।'[৪]

কুরআনে সকল মুমিনকে ভাই ভাই বলা হয়েছে। [হুজুরাত: ১০] অনৈক্যকে কাফেরদের নিদর্শন আখ্যা দিয়ে রাসুলুল্লাহকে সেটা থেকে মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

---

১. আত-তাফসিরুল কাবির, রাজি (১৫/৪৮৯)।
২. বুখারি (২৪১০); সুনানে কুবরা, নাসায়ি (৮০৪০)।
৩. বুখারি (৬০৭৬); মুসলিম (২৫৬০)।
৪. মুসলিম (২৫৬৫); আবু দাউদ (৪৯১৬)।

إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ؕ

অর্থ: 'নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দলে পরিণত হয়েছে, তাদের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই।' [আনআম: ১৫৯] অন্য আয়াতে কাফেরদের মতো বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করে বলেন,

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ۔

অর্থ: 'আর তাদের মতো হয়ো না যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তাদের কাছে নিদর্শনসমূহ আসার পরও বিরোধিতা করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর শাস্তি।' [আলে ইমরান: ১০৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, অনুগ্রহ ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে মুমিনদের উদাহরণ হচ্ছে এক দেহের মতো, যার কোনো অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা শরীর ব্যথায় ভোগে, বিনিদ্র রাত কাটায়।'[১] আরেক বর্ণনায় এসেছে, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুমিনদের অবস্থা হচ্ছে একটি ঘরের মতো—অতঃপর তিনি তার আঙুল মাটিতে ঢুকিয়ে বললেন—যার একাংশ অন্য অংশকে এভাবে জড়িয়ে ধরে রাখে।'[২] অপর হাদিসে এসেছে, তিনি হাতের আঙুলগুলো একটি অপরটির মাঝে ঢুকিয়ে বললেন, 'মুমিনগণ ঘরের মতো, যার এক অংশ অন্য অংশকে এভাবে ধরে রাখে।'[৩]

মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবিরোধী যেকোনো সাম্প্রদায়িক আহ্বানকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহেলিয়্যাত বলেছেন; সেটাকে দূষিত ও দুর্গন্ধময় বস্তু হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।[৪] একবার সাহাবায়ে কেরাম এক যুদ্ধে কেবল বিশ্রামের জন্য ভিন্ন ভিন্ন জায়গা বেছে নেওয়াতেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটাকে শয়তানের কাজ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।[৫] আরেক যুদ্ধে সাহাবাদের মাঝে কিছু মতবিরোধ তৈরি হলে তিনি বললেন, 'তোমরা ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় গিয়েছ আর

---

১. বুখারি (৬০১১); মুসলিম (২৫৮৬)।
২. ইবনে হিব্বান (২৩২)।
৩. বুখারি (২৪৪৬); মুসলিম (২৫৮৫)।
৪. বুখারি (৪৯০৫); মুসলিম (২৫৮৪)।
৫. সুনানে কুবরা, নাসায়ি (৮৮০৫); মুসনাদে আহমদ (১৮০১৩)।

অনৈক্য নিয়ে ফিরে এলে। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা অনৈক্যের কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।'[১] বরং অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলাকে তিনি কুফর এবং কাফেরদের স্বভাব আখ্যা দিয়ে জীবনের শেষ লগ্নে বিদায় হজে বলেন, 'তোমরা আমার পরে কাফেরদের মতো একে অন্যের ঘাড়ে তরবারি ধরো না।'[২] বরং মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ থাকার পরে কেউ যদি তাদের সেই ঐক্য নষ্ট করতে চায় এবং বিদ্রোহ করে (বাগি হয়), তবে তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩]

ঐক্যের প্রতি এত উৎসাহ আর অনৈক্য থেকে এত এত সতর্ক করার পরও আজ মুসলিম উম্মাহ পৃথিবীর সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন ও শতধাবিভক্ত জাতি। মুসলিম উম্মাহর জীবনের সর্বক্ষেত্রে কেবল অনৈক্য, অসহিষ্ণুতা, বিচ্ছিন্নতা, বিভক্তি, দূরত্ব ও বিদ্বেষ লক্ষণীয়। মুসলমানদের পরিবার শতধাবিচ্ছিন্ন—আত্মীয়-স্বজন পরস্পর থেকে আলাদা; তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মা ও ভাই-বোন বিচ্ছিন্ন; প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর বিদ্বেষমূলক আচরণ; সমাজ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, রাজনীতি, সংস্কৃতি—সর্বত্র মুসলিম উম্মাহ শত নামে ও শত কায়দায় বিচ্ছিন্ন। কোথাও ঐক্যের ন্যূনতম সুতা অবশিষ্ট নেই। সব জায়গাতে ঐক্যের বড় বড় সুতা কেটে দেওয়া হচ্ছে, বড় বড় উপলক্ষ্য মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বড় বড় পয়েন্ট চেপে রাখা হচ্ছে। বিপরীতে অনৈক্যের তুচ্ছ কারণগুলোও বড় করে দেখানো হচ্ছে; ছোট ছোট ইসুকে বাঁচা-মরার ইসু বানানো হচ্ছে। নফল ও মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে মুসলমানদের মতভেদকে ঈমান ও কুফরের মতো মতভেদ বানিয়ে ফেলা হচ্ছে। এভাবে যেকোনো ছুতায় মুসলিম উম্মাহর দেহে অনবরত ছুরি চালানোর কাজ অব্যাহত রাখা হচ্ছে। ফলে এক আল্লাহ, এক রাসুল, এক দ্বীন এবং এক কুরআন হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহ শতাধিক উম্মতে বিভক্ত।

কালিমা ঐক্যের চাবিকাঠি: আল্লাহর অনুগ্রহ যে, এই শতধাবিভক্ত উম্মতের জন্য আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দরজা উন্মুক্ত রেখেছেন। অনৈক্য ও বিশৃঙ্খলার সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে গিয়েও চাইলে মুহূর্তেই আবার এক কাতারে দাঁড়ানোর একটি পথ খোলা রেখেছেন। এটা এমন পথ যা ঐক্যের সর্বজনীন আদর্শ, যে পথে মুসলিম উম্মাহ যেকোনো সময় যেকোনো ভূখণ্ডে ভাই ভাই হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারে। এ এমন এক মূলমন্ত্র যা মুসলমানদের সকল বিভেদ না ভুলিয়েও

---

১. মুসনাদে আহমদ (১৫৫৮)।
২. বুখারি (১৭৩৯); মুসলিম (৬৫)।
৩. মুসলিম (১৮৫২); ইবনে হিব্বান (৪৪০৬); হাকেম (২৬৮০)।

ঐক্যের সুতায় গাঁথতে পারে, শত বৈচিত্র্যের মাঝেও তাদের একতার গজল শোনাতে পারে। সেই মূলমন্ত্র হলো 'কালিমা' লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। সালাফের মানহাজে এই কালিমার অর্থ বোঝা ও মানার ক্ষেত্রে উম্মাহ একমত হতে পারলেই কাঙ্ক্ষিত ঐক্যের স্বপ্ন পূর্ণ হবে। অন্য কথায়, ঈমানের ভিত্তিতে মুসলমানরা একমত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেই শতধাবিভক্ত মুসলিম উম্মাহর পক্ষে আল্লাহর রজ্জুকে এক হয়ে আঁকড়ে ধরা সম্ভব। এর বাইরে কোনোকিছুই মুসলিম উম্মাহকে এক করতে পারবে না। **মুসলিম উম্মাহর ভাষা, ভূখণ্ড, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক মতাদর্শ, ধর্মীয় মাজহাব, তাজকিয়ার তরিকা, আকিদার মানহাজ, চিন্তাধারা, জীবন ও জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি সবকিছু ভিন্ন ভিন্ন। এসব ভিন্নতা কখনোই সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়; আবার এসব ভিন্নতাকে ঐক্যের মানদণ্ড বানালে ঐক্য বাস্তবায়ন করাও সম্ভব নয়।** ফলে এমন একটা মঞ্চ লাগবে, যেক্ষেত্রে সকল মুসলিম তাদের ভিন্নতা সহকারেই দাঁড়াতে পারবে; এমন একটা গজল লাগবে, মুসলিম উম্মাহর সবাই তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা সহকারেই দরাজ গলায় যা গাইতে পারবে। আর সেটা হচ্ছে 'কালিমা', কুরআনে যেটিকে 'আল্লাহর রজ্জু' বলা হয়েছে। [আলে ইমরান: ১০৩]

ফলে ফিকহে চার মাজহাবের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহ একে অন্যের ভাই ভাই হবে। কারণ, চার মাজহাব কালিমার উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাদের মাঝে যেসব বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা রয়েছে, সেগুলো ইসলামের সৌন্দর্য ও বহুমাত্রিক প্রকাশমাত্র। তাই এই ভিন্নতাকে বিভেদের হাতিয়ার বানানো যাবে না। একইভাবে কালিমার সুবাদে মুসলিম উম্মাহ অসংখ্য রাজনীতিক মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভক্ত হওয়ার পরও এক অভিন্ন প্ল্যাটফরমে দাঁড়াতে পারবে; কারণ সেসব দৃষ্টিভঙ্গি কালিমার ভিত্তিতেই তৈরি। এই মূলমন্ত্র মেনে নিলে আকিদার তফসিলি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একাধিক মানহাজে বিভক্ত থাকলেও মূল ঈমানের ক্ষেত্রে আশআরি-মাতুরিদি-সালাফি-জিহাদি-সুফি—সকল মুসলমান পরস্পরকে ভাই মনে করতে পারবে, পাশে দাঁড়াতে পারবে, বিপদে হাত বাড়িয়ে দিতে পারবে। অর্থাৎ ফিকহ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের মতানৈক্য থাকলেও ঈমান ও তাওহিদের মৌলিক উসুলের ক্ষেত্রে তারা ঐক্যবদ্ধ থাকবে। এই ঐক্যের জন্য সকল মাজহাব-মাশরাব মিটিয়ে দিতে হবে না। কারণ, সেগুলো ঐক্যের আদৌ অন্তরায় নয় এবং সেটা সম্ভবও নয়। স্বয়ং সাহাবাদের মাঝেও এমন মতপার্থক্য ছিল। ফলে এসব মতপার্থক্য নিয়েই তাওহিদের ভিত্তিতে সকল হকপন্থি মুসলমানের এক হওয়া খুব সম্ভব এবং সহজ। আমাদের মনে রাখতে

হবে, গোটা মুসলিম উম্মাহ এক পরিবার। আমেরিকা থেকে চীন পর্যন্ত, আফ্রিকা থেকে রাশিয়া পর্যন্ত গোটা দুনিয়ার মুসলিম ভাই ভাই; মুসলিমরা এক উম্মাহ।

ফলে কালিমার ভিত্তিতে ঐক্যের চিন্তাই সবচেয়ে বাস্তবসম্মত চিন্তা। কারণ, একদিকে এই কালিমা না থাকলে যেমন ঐক্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্ধন থাকে না, ফলে কোথাও মুসলমানদের এই কালিমা ছাড়া অন্য কোনো বিন্দুতে সম্পূর্ণভাবে এবং শক্তিশালীভাবে একমত হওয়া সম্ভব নয়; একইভাবে এই কালিমার জায়গায় যাদের সঙ্গে দ্বিমত রয়েছে, তাদের সঙ্গে ঐক্যের অর্থহীন ও অবাস্তব স্বপ্ন দেখাও বন্ধ হবে। কারণ, যাদের সঙ্গে এই কালিমার বিন্দুতেই একত্র হওয়া যাবে না, তাদের সঙ্গে কখনোই কোনো সফল ঐক্য গড়া সম্ভব নয় এবং গড়া হলেও সেই ঐক্য কোনো সুফল বয়ে আনবে না। হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে কৌশলগত সন্ধি করা যায় এবং সেটা অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গেও করা যায়। ফলে দ্বীনের ভিত্তিতে যে ঐক্যের কথা কুরআন ও সুন্নাহে বলা হয়েছে, তা যেমন কালিমাকে কেন্দ্র করেই হতে হবে, তেমনই কালিমার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেই হতে হবে। ঐক্যের জন্য কালিমার দাবিকে বিসর্জন দেওয়ার অর্থ হলো গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি ঢালা।

কিন্তু আজ মুসলিমরা কালিমার পরিবর্তে নিজেদের বানানো বিভিন্ন তুচ্ছ বিষয়কে ঐক্যের মানদণ্ড স্থির করেছে। ভাষা, বর্ণ, সংস্কৃতি, ক্ষুদ্র ভৌগোলিক সীমানা, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, মানবরচিত রাজনীতিক ও সামাজিক মতাদর্শ ইত্যাদি মুসলমানদের ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। পার্থিব স্বার্থপূরণই তাদের ঐক্যের মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে মুসলিমদের ঐক্যে আজ কোনো বরকত নেই, কল্যাণ নেই, পরকালীন মুক্তি ও সাফল্যের কথা নেই। ইহকালীন সমৃদ্ধি, নিঃস্বার্থ সুখ ও প্রকৃত সৌভাগ্যও নেই; পারস্পরিক কল্যাণকামনা নেই; বরং সকলেই নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির পিছনে ছুটে চলছে। তুচ্ছ স্বার্থের জন্য জীবনের সব ধরনের নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শ বিসর্জন দিচ্ছে। সমাজে হানাহানি ও খুন-খারাবি বাড়ছে, মানুষের সংখ্যা কমছে।

وَدِينُ اللهِ فِي الأرضِ وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ، وَهُوَ دِينُ الإسْلَامِ، قال اللهُ تَعَالَى: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ}.

وَقَالَ تَعَالَى: {وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا} وَهُوَ بَيْنَ الغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ، وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ، وَبَيْنَ الجَبْرِ وَالقَدَرِ، وَبَيْنَ الأَمْنِ وَالإِيَاسِ.

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহর মনোনীত দ্বীন একটিই—ইসলাম। যেমন: আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন চাইবে, সেটা কখনোই তার কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে না।' তিনি আরও বলেছেন, 'আর আমি ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।' এই দ্বীন সব ধরনের বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি, 'তাশবিহ'-'তাতিল', 'জাবর'-'কদর' এবং উচ্চাশা-হতাশার মাঝামাঝি মধ্যপন্থি দ্বীন।

ব্যাখ্যা

ইসলাম আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীন: আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর সবার জন্য একটি জীবনব্যবস্থা মনোনীত করেছেন। তার নাম ইসলাম। আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত সকল নবি-রাসুল, জিন-মানুষ, সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর নির্বাচিত ও তার কাছে গ্রহণযোগ্য জীবনবিধান কেবল ইসলাম। সকল নবি-রাসুলের দ্বীন ও দাওয়াত ছিল ইসলাম। তারা তাদের উম্মতকে ইসলামের দিকে ডেকেছেন। ফলে নুহ আলাইহিস সালামের অনুসারী, মুসা আলাইহিস সালামের অনুসারী এবং ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারী এ অর্থে সবাই মুসলিম ছিলেন। হ্যাঁ, তাদের শরিয়ত ভিন্ন ভিন্ন ছিল, কিন্তু দ্বীন একটিই—ইসলাম। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের মাধ্যমে অতীতের সকল শরিয়ত রহিত হয়ে গিয়েছে। ফলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওতপ্রাপ্তির পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্ম গ্রহণ করবেন

না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পরে অতীতের কোনো নবির অনুসরণ বিশুদ্ধ নয়। ফলে গোটা মানবজাতি মুক্তির জন্য ইসলামের মুখাপেক্ষী।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ إِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ
الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ . فَإِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ
أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْأُمِّيّٖنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوْا
فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَّإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ.

অর্থ: 'নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে প্রকৃত জ্ঞান আসার পরেই তারা পরস্পর বিদ্বেষবশত মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। যারা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করে (তাদের জানা উচিত যে), নিঃসেন্দহে আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। যদি তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চায়, তবে বলে দিন, 'আমি এবং আমার অনুসরণকারীগণ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি।' আর আপনি আহলে কিতাব এবং উম্মিদের বলুন, তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করেছ? যদি তারা ইসলামে প্রবেশ করে, তবে সরল পথ প্রাপ্ত হলো। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনার দায়িত্ব কেবল পৌঁছে দেওয়া। আল্লাহ বান্দাদের দেখেন।' [আলে ইমরান: ১৯-২০]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلٰٓى إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَمَآ أُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ
وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

অর্থ: 'বলুন, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা-কিছু অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের উপর, ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের সন্তানবর্গের উপর, আর যা-কিছু দেওয়া হয়েছে মুসা, ঈসা এবং অন্য নবি রাসুলগণকে তাঁদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আমরা তাঁদের কারও মধ্যে পার্থক্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত। যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম চায়, কখনোই তা গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' [আলে ইমরান: ৮৪-৮৫]

আরেক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আহলে কিতাব (ইহুদি-খ্রিষ্টান)-সহ সবাইকে মৃত্যুর আগে মুসলমান হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ. قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ. وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ۗ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ. يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

অর্থ: 'আপনি বলুন—হে আহলে কিতাব, কেন তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করছ? অথচ তোমরা যা-কিছু করো সবকিছু আল্লাহ দেখছেন। আপনি বলুন—হে আহলে কিতাব, কেন তোমরা মুমিনদের আল্লাহর পথ থেকে বাধা দাও এবং তাদের দ্বীনের মাঝে বক্রতা ঢোকাতে চাও? অথচ তোমরা দেখছ (এটা সত্য)। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে গাফিল নন। হে ঈমানদারগণ, তোমরা যদি আহলে কিতাবের কোনো সম্প্রদায়ের কথা মানো, তা হলে ঈমান আনার পর তারা তোমাদের কাফের বানিয়ে ফেলবে। হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো এবং মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।' [আলে ইমরান: ৯৮-১০২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।' [মায়িদা: ৩] রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যেকোনো ইহুদি কিংবা খ্রিষ্টান যদি আমার কথা শুনতে পায়, তদুপরি আমার উপর ঈমান না আনে, তবে সে জাহান্নামে যাবে।'[১] জগতের সকল নবি-রাসুল তাদের উম্মতকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন, যা আমরা পিছনে বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। সুতরাং অমুসলিমদের প্রতি উদারতা দেখাতে গিয়ে তাদের ধর্মকেও সত্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া এবং সকল ধর্মকে খোদাপ্রাপ্তির পথ মনে করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ; বরং এমন বিশ্বাস কুফর।

---

১. মুসলিম (১৫৩); সুনানে সাঈদ ইবনে মানসুর (১০৮৪); বাজ্জার (৩০৫০); তয়ালিসি (৫১১)।

ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা: যেসব শোভা-সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যের কারণে ইসলাম জগতের অন্য সকল ধর্ম থেকে আলাদা, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ দিক। ইসলাম ব্যতীত জগতের সকল ধর্ম, সব ধরনের তন্ত্রমন্ত্র বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা ও প্রান্তিকতার শিকার। কোনো ধর্ম পরকালকে বড় করতে গিয়ে ইহকালকে একেবারে অর্থহীন করে দিয়েছে, আবার কোনো মতবাদ ইহকালকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে পরকাল বরবাদ করে দিয়েছে। আল্লাহ-সংশ্লিষ্ট আকিদার ক্ষেত্রে অনেক ধর্ম বাড়াবাড়ি করে আল্লাহকে মানুষের মতো বানিয়ে দিয়েছে; আবার অনেক ধর্ম ছাড়াছাড়ি করতে গিয়ে আল্লাহকে 'মাদুম' তথা অস্তিত্বহীন বানিয়ে দিয়েছে; অনেক ধর্ম এক আল্লাহর পরিবর্তে দুই, তিন ও একাধিক খোদা বেছে নিয়েছে।

এভাবে ঈমান, আকিদা ও আমল তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলাম জগতের সকল ধর্ম ও মতবাদ থেকে ব্যতিক্রম—পরম ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যপন্থি একটি দ্বীন। কুরআনে এই ভারসাম্যকে জগতের সকল ধর্মের অনুসারীদের মাঝে মুসলমানদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

অর্থ: 'আর এভাবে আমি তোমাদের মধ্যপন্থি উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলের জন্য এবং যাতে রাসুল সাক্ষী হন তোমাদের জন্য।' [বাকারা: ১৪৩] ফলে সকল ডানবাম ও বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ির মাঝে ইসলামের অবস্থান। সকল প্রান্তিকতার মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামের বিধিবিধান। এটা ইনসাফ, কল্যাণ, আলো, মঙ্গল, বিনির্মাণ, ইতিবাচক ও বিকাশের ধর্ম। সকল অন্যায়, অনাচার, নিপীড়ন, ঠগবাজি, প্রতারণা, অনিষ্ট ও মন্দ দূরীভূতকারী ধর্ম। এখানে সবাইকে সবার অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে; মানুষকে তার সামগ্রিক অধিকার দেওয়া হয়েছে; মানুষের চরিত্রকে চরিত্রের অধিকার বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে; আত্মাকে তার অধিকার দেওয়া হয়েছে; প্রবৃত্তিকে সীমার ভিতরে থেকে চাহিদা পূর্ণ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে; চিন্তা ও মেধাকেও অধিকার ও স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে; যুক্তির দরজা বন্ধ করা হয়নি, আবার বেলাগামও করে দেওয়া হয়নি। এখানে একদিকে তাওহিদ-সহ দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়কে অপরিবর্তনশীল ও চিরন্তন করে দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে বিভিন্ন বিধিবিধান সময়, পরিস্থিতি, ভূখণ্ড, মানুষের অবস্থা ও সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে পরিবর্তনের সুযোগ রাখা হয়েছে। এখানে মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেও তার

প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে; তুচ্ছ প্রাণী ও চতুষ্পদ জন্তুকেও ইসলাম তাদের পাওনা বুঝিয়ে দিয়েছে; মাটিকে মাটির অধিকার দেওয়া হয়েছে; মাটির উপর দম্ভভরে হাঁটতে নিষেধ করেছে; জোরে চিৎকার করতে নিষেধ করেছে; ব্যয়ের ক্ষেত্রে অপচয় ও কৃপণতার মাঝামাঝি থাকতে বলেছে। নামাজ-রোজার মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের ক্ষেত্রেও বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছে। ইসলামের অধিকার ও ভারসাম্যের এই মূলনীতি দুনিয়া ও আখিরাত সকল ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। পুঁজিবাদ-সাম্যবাদ, স্বৈরতন্ত্র-গণতন্ত্র, ভোগবাদ-বৈরাগ্যবাদ,বস্তুবাদ-অধিবাদ, বুর্জোয়া-সর্বহারা—সকল প্রান্তিকতার মাঝে ইসলামের অবস্থান জীবন ও জগতের সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ ভিত্তির উপর, ইহকাল ও পরকালীন কল্যাণের উপর। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'হে লোকসকল, তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি (গুলু) করো না। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে ধ্বংস হয়েছে।'[১] অন্য প্রসিদ্ধ হাদিসে বলেন, 'তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না। সুসংবাদ দাও, ঘৃণা ছড়িয়ো না।'[২] আরেক হাদিসে বলেছেন, (দ্বীনের ক্ষেত্রে) 'তোমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করো। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো। তোমাদের আমল কিন্তু তোমাদের জান্নাতে নেবে না।'[৩] হুজাইফা রাজি. বলেন, 'হে কারিগণ, তোমরা অবিচল থাকো; তাতে তোমরা সকলের আগে চলে যাবে। তবে ডানেবামে যেয়ো না; তাতে সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তির শিকার হবে।'[৪]

উদারতার প্রকৃত অর্থ কী? উদারতা মানে আলো-অন্ধকার সবকিছুকে সমানভাবে গ্রহণ করা নয়। ভারসাম্যের অর্থ সবকিছু গ্রহণ করা, সবকিছুর সঙ্গে গলে যাওয়া নয়, সবার মাঝে দ্রবীভূত হওয়া নয়। সহিষ্ণুতা মানে জগতের সকল বাদ-মতবাদকে সত্য বলে মেনে নেওয়া নয়। মন্দকে ভালো বলা এবং মিথ্যাকে সত্য বলা কি ইনসাফ? বরং তা ভালো ও সত্যের প্রতি জুলুম। ইসলাম ও অন্য ধর্মকে এক জায়গায় রাখার নাম ন্যায় নয়, বরং ইসলামকে হক এবং অন্যান্য ধর্মকে বাতিল বলাই ন্যায়। সুন্নাহ ও বিদআতের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকা ভারসাম্য নয়, বরং সুন্নাহকে গ্রহণ করে বিদআত বর্জন করাই ইনসাফ। মুমিন ও মুরতাদের ক্ষেত্রে নীরব থাকা ইনসাফ নয়, বরং

---

১. ইবনে মাজা (৩০২৯); মুসনাদে আহমদ (৩৩১০); ইবনে আবি শাইবা (১৪০৯৭); আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি (৭৪২)।
২. বুখারি (৬৯); মুসলিম (১৭৩৪)।
৩. বুখারি (৬৪৬৩); মুসলিম (২৮১৮); তিরমিজি (২১৪১)।
৪. বুখারি (৭২৮২); বাজ্জার (২৯৫৬); আল মুজামুল কাবির, তাবারানি (৮৬৩৩)।

মুরতাদের বিরুদ্ধে সজাগ হওয়া এবং ব্যবস্থা নেওয়াই ভারসাম্য। হকপন্থি তাসাওউফ ও বাতিল তাসাওউফকে এক পাল্লায় মেপে দুটোকেই গ্রহণ কিংবা দুটোকেই বর্জন মধ্যপন্থা নয়, বরং হকটাকে গ্রহণ করে বাতিলটাকে বর্জন করাই মধ্যপন্থা। শিয়া-সুন্নি, তাওহিদপন্থি-মাজারপন্থি সবাইকে এক বানিয়ে নিজেকে কেবল মুসলিম দাবি করা ইনসাফ নয়, বরং আহলে সুন্নাতকে হক বলে শিয়াদের বাতিল ঘোষণা করাই ইনসাফ। বিশুদ্ধ তাওহিদপন্থিদের সঙ্গে থেকে মাজার ও কবরপূজারী, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ওলিদের নিয়ে শিরকের পর্যায়ে বাড়াবাড়িতে লিপ্তদের ভ্রান্ত ঘোষণা করাই ইনসাফ। কাফেরদের বিপক্ষে ময়দানে নিহত আর গণতন্ত্রের মিছিলে নিহত উভয়কে শহিদ বলা উদারতা নয়, বরং একজনকে শহিদ এবং অপরজনকে নিহত বলাই উদারতা। রাফেজি-বাতেনি-কাদিয়ানি আর বিদআতিদের এক পাল্লায় মাপা উদারতা নয়, বরং তাদের মাঝে যারা কাফের তাদের কাফের বলা আর যারা মুসলিম তাদের মুসলিম বলাই উদারতা। তাদের প্রত্যেকে যে যতটুকু হকের কাছাকাছি তাকে ততটুকু হক বলা এবং যে যত দূরে তাকে তত বড় গোমরাহ মনে করাই ইনসাফ। উদারতা মানে ভুলকে ভুল বলা, শুদ্ধকে শুদ্ধ বলা; হককে গ্রহণ করা, বাতিলকে বর্জন করা। মধ্যমপন্থা অর্থ মহব্বত ও ভালোবাসার সঙ্গে সকলকে সত্যের পথে ডাকা। মিথ্যা ও সত্যকে গুলিয়ে ফেলে, শরিয়তের সীমানা লঙ্ঘন করে আলুর মতো সবার সঙ্গে ভাই-ভাই হয়ে থাকার নাম সুবিধাবাদ। যে ভারসাম্য ও মধ্যপন্থাকে ইসলামের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে সেগুলোর সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই।

ইমাম তহাবি রাহি. তাওহিদ ও আকিদার ক্ষেত্রে ইসলামের উদারতার উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, '**এই দ্বীন সব ধরনের বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি, 'তাশবিহ'-'তাতিল', 'জবর'-'কদর' এবং অতি আশা-হতাশার মাঝামাঝি মধ্যমপন্থি দ্বীন।**' 'তাশবিহ' ও 'তাতিল' মূলত তাওহিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত দুই প্রান্তিকতা। 'তাশবিহ' হচ্ছে আল্লাহকে সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা, আল্লাহর সিফাত বর্ণনার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে আল্লাহকে সৃষ্টির মতো বানিয়ে ফেলা। আর 'তাতিল' হচ্ছে আল্লাহর সিফাতকে (গুণ) নাকচ করে দেওয়া, আল্লাহকে সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে বাঁচাতে কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত আল্লাহর সিফাত অস্বীকার করা। আহলে সুন্নাত এই দুই প্রান্তিকতার মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ আকিদা রাখে। তারা কুরআন-হাদিসে বর্ণিত আল্লাহর সিফাতকে সৃষ্টির সাদৃশ্যের ভয়ে প্রত্যাখ্যান করে না, আবার এগুলো সাব্যস্ত করতে গিয়ে আল্লাহকে সৃষ্টির মতো কল্পনা করে না। 'জবর'-'কদর' মূলত তাকদিরের সঙ্গে সম্পৃক্ত দুই প্রান্তিকতা। 'জবর' হচ্ছে

তাকদির স্বীকারের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে মানুষকে সম্পূর্ণ পরাধীন ও পুতুল মনে করা, আর 'কদর' হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতা ও সামর্থ্যের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে মানুষকেই সর্বক্ষমতার অধিকারী ভেবে আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির অস্বীকার করা। আহলে সুন্নাতের অবস্থান হলো এই দুই প্রান্তিকতার মাঝামাঝি। তারা তাকদিরকে অস্বীকার করেন না, আবার মানুষকে পুতুল মনে করেন না; বরং মানুষ স্বাধীন, কিন্তু মানুষের স্বাধীনতা আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার অধীন। পিছনে এ-সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

'আশা' ও 'হতাশা'-কেন্দ্রিক আল্লাহর সিফাত, শরিয়ত, ঈমান, দ্বীন ও দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তিনটি প্রান্তিকতা জন্ম নিয়েছে। খারেজি ও মুতাজিলারা হতাশা বেছে নিয়েছে। তারা কবিরা গুনাহকারীকে জাহান্নামি আখ্যা দিয়েছে, তার জান্নাতপ্রাপ্তির ব্যাপারে হতাশ হয়ে গিয়েছে। কারণ, তাদের মতে, কবিরা গুনাহকারী আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত কাফের। মুরজিয়ারা আশার ক্ষেত্রে প্রান্তিকতার শিকার হয়েছে। ঈমান আনার পরে কেউ যত গুনাহই করুক, কোনো অসুবিধা নেই মনে করেছে। এভাবে তারা আল্লাহর ভয়ের বিষয়টি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে কেবল তার অনুগ্রহের দিকেই তাকিয়েছে। তাসাওউফপন্থি **কিছু** সম্প্রদায় দুটোকেই অস্বীকার করেছে। তাদের মতে, ভয়-আশা কিছুই দরকার নেই। এগুলো বস্তুবাদ। দ্বীনকে তারা স্রেফ ভালোবাসার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছে। কিন্তু আহলে সুন্নাতের মতে, ঈমান আশা-নিরাশা-ভয়-ভালোবাসা সবকিছু নিয়ে। কেউ গুনাহ করে ফেললে যেমন আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে চিরতরে বঞ্চিত হবে না, আবার একইভাবে গুনাহ করলেও আল্লাহ নাখোশ হবেন না—এমনও নয়। আল্লাহকে ভালোবাসলেই তার ভয় কিংবা প্রতিদানপ্রাপ্তির কথাকে বর্জন করতে হবে এমন নয়; বরং ভালোবাসা-ভয়-আশা সবগুলো একত্রে নিয়ে পথ চলতে হবে। এটাই প্রকৃত ভারসাম্য। পিছনে আমরা ইসলামি ঐক্যের ভারসাম্যপূর্ণ যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, ইমাম তহাবির বক্তব্যের মূল মর্ম সেটাই। তিনি ইনসাফ দেখাতে গিয়ে ইসলামের সকল সম্প্রদায়কে বিশুদ্ধ ও হকপন্থি বলেননি; বরং যারা বাতিল তাদের বাতিল বলাকেই ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা বলেছেন। সামনের আলোচনায় এটা আরও স্পষ্ট হবে।

فَهَذَا دِينُنَا وَاعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَنَحْنُ بُرَءَاءُ إِلَى اللهِ مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ. وَنَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَى الإِيمَانِ وَيَخْتِمَ لَنَا بِهِ، وَيَعْصِمَنَا مِنَ الأَهْوَاءِ الـمُخْتَلِفَةِ وَالآرَاءِ الـمُتَفَرِّقَةِ وَالـمَذَاهِبِ الرَّدِيَّةِ مِثْلِ الـمُشَبِّهَةِ وَالـمُعْتَزِلَةِ وَالـجَهْمِيَّةِ وَالـجَبْرِيَّةِ وَالقَدَرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الَّذِينَ خَالَفُوا السُّنَّةَ وَالـجَمَاعَةَ وَحَالَفُوا الضَّلالَةَ، وَنَحْنُ مِنْهُمْ بَرَاء وَهُمْ عِنْدَنَا ضُلَّالٌ وَأَرْدِيَاء، وَبِاللهِ العِصْمَةُ وَالتَّوْفِيقِ.

এই আমাদের দ্বীন, আমাদের ভিতরের ও বাইরের আকিদা। যারা এর বিপরীত আকিদা লালন করবে, আমরা আল্লাহর কাছে তাদের থেকে নিজেদের মুক্ত ঘোষণা করছি। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন আমাদের ঈমানের উপর অবিচল রাখেন, ঈমানের উপর মৃত্যু দান করেন এবং আমাদের ‘মুশাববিহাহ’, ‘মুতাজিলাহ’, ‘জাহমিয়্যাহ’, ‘জাবরিয়্যাহ’, ‘কাদারিয়্যাহ’-সহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতবিরোধী, বিদআত এবং গোমরাহপন্থি সব ধরনের প্রবৃত্তিপূজা, মনগড়া ধ্যানধারণা ও বাতিল মতবাদ থেকে সুরক্ষিত রাখেন। তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা আমাদের দৃষ্টিতে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত। আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও তাওফিক প্রার্থনা করছি।

ব্যাখ্যা

আল-ওয়ালা ওয়াল বারা

(বাতিলপন্থিদের সঙ্গে আহলে সুন্নাতের সম্পর্কের স্বরূপ)

আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহ গ্রন্থের সর্বশেষ বক্তব্যে এসে ইমাম তহাবি রাহি. সকল বাতিলপন্থির কাছ থেকে নিজেদের ও নিজেদের আকিদাকে মুক্ত ঘোষণা করছেন। প্রশ্ন আসতে পারে, পুরো বইয়ে তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত তথা ইসলামের

বিশুদ্ধ আকিদা বর্ণনা করেছেন। এতটুকুতে ক্ষান্তি দিলেই তো হতো। যার বিশুদ্ধ আকিদা গ্রহণ করতে মন চায়, সে বিশুদ্ধ আকিদা গ্রহণ করে নেবে। অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে নিজেদের মুক্ত ঘোষণা এবং তাদের গোমরাহ আখ্যা দেওয়ার কী দরকার? এতে মুসলমানদের ভিতরে কি হানাহানি-দলাদলি বাড়বে না?

এই প্রশ্নের জবাবে আমরা পিছনে কিছু কথা স্পষ্ট করে এসেছি। তা হলো, ইসলামের নামে উদারতা ও সহিষ্ণুতার অর্থ এই নয় যে, হক-বাতিল, সত্য-মিথ্যা সবার সঙ্গে থাকা, আলো ও কালো দুটোকেই ভালো বলা। বরং সত্যকে সত্য বলা, মিথ্যাকে মিথ্যা বলাই ন্যায়। হককে হক আর বাতিলকে বাতিল বলাই ইনসাফ। তা ছাড়া, বাতিল না চিনলে হক স্পষ্ট হয় না; অন্ধকার না চিনলে আলো চেনা যায় না। ফলে হক ও আলোকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাতিল ও অন্ধকারকে দূরীভূত করা প্রয়োজন। এ কারণেই ইমাম তহাবি রাহি. পুরো গ্রন্থে আহলে সুন্নাতের আকিদা বর্ণনা করার পরে, মুসলমানদের ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরার পরে, বাতিলদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, কার সঙ্গে মুসলমানদের কতটুকু সম্পর্ক থাকবে সেটা নির্ধারণ করছেন। এটাই ইসলামে 'ওয়ালা-বারা' নীতি হিসেবে প্রসিদ্ধ। এটাই একজন মুমিনকে সকল বাতিল ও বাতিলপন্থি থেকে সুরক্ষিত রেখে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা প্রথমে অমুসলিমদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের সীমারেখা বর্ণনা করব, অতঃপর ভ্রান্ত ইসলামি মতবাদগুলোর ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, সালাফের কর্মপন্থা এবং আমাদের কর্তব্য স্পষ্ট করব।

'ওয়ালা-বারা'র পরিচয় ও প্রকারভেদ: 'ওয়ালা' শব্দের অর্থ হলো: বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, দেখাশোনা করা, পাশে থাকা, মৈত্রীবদ্ধ হওয়া, সহায়তা করা, দায়িত্ব নেওয়া, অনুসরণ করা, তত্ত্বাবধান করা, সুখে-দুঃখে পাশে থাকা। এখান থেকে 'ওলি' শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ—বন্ধু, অভিভাবক ইত্যাদি। প্রথম অর্থে কুরআনে মুমিনদের আল্লাহর 'ওলি' বলা হয়েছে। [ইউনুস: ৬২] আবার দ্বিতীয় অর্থে আল্লাহকে মুমিনদের 'ওলি' বলা হয়েছে। [বাকারা: ২৫৭] মাওলা শব্দটিও উক্ত শব্দ থেকে নির্গত, যার অর্থ—বন্ধু, প্রতিপালক, অভিভাবক, মিত্র ইত্যাদি। বিপরীতে 'বারা' শব্দের অর্থ হলো: দূরত্ব, দায়মুক্তি, সম্পর্ক ছিন্ন করা, শত্রুতা রাখা।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বসম্মতিক্রমে একজন মুমিনের বন্ধুত্ব ও দূরত্ব, ভালোবাসা ও শত্রুতা, মৈত্রী ও সম্পর্কচ্ছেদ—মোট কথা, পৃথিবীর সকলের সঙ্গে তার

সম্পর্কের মানদণ্ড হবে শরিয়ত। সে কাউকে ভালোবাসলে আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে, কাউকে ঘৃণা করলে আল্লাহর জন্য করবে, কাউকে সাহায্য করলে আল্লাহর জন্য করবে, আবার কারও সঙ্গে শত্রুতা রাখলে আল্লাহর জন্য রাখবে, কারও সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে আল্লাহর জন্য করবে। অর্থাৎ তার ভালোবাসা ও শত্রুতা কেবল আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দ্বীনের জন্য হবে, নিজের পার্থিব ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য নয়। নিজের স্বার্থ ও মনোমতো হলে কাউকে ভালোবাসবে আর স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে কারও সঙ্গে শত্রুরা রাখবে—এমন নয়। বরং কারও সঙ্গে ব্যক্তিগত দূরত্ব থাকলেও আল্লাহ ও দ্বীনের স্বার্থে সে তাকে ভালোবাসবে, তার পাশে দাঁড়াবে। আবার আল্লাহ ও দ্বীনের ক্ষতি হলে কারও সঙ্গে গলায় গলায় বন্ধুত্ব ও খাতির থাকার পরেও সে তার থেকে দূরে যাবে, দ্বীনের প্রয়োজনে তাকে পরিত্যাগ করবে। এটাই ঈমান; এটাই ইহসান। যে এটা করতে পারবে, কেবল সে ব্যক্তিই আল্লাহর ওলি তথা প্রকৃত বন্ধু হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে।

ওয়ালা-বারার ক্ষেত্রে মুসলমানরা সকল মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করবে:

এক. শুধু ওয়ালা, তাদের সঙ্গে বারা নেই। তারা হচ্ছে হকের উপর অবিচল মুসলমান তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। তাদের সর্বোতভাবে এবং নিঃশর্তে ভালোবাসবে; তাদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ রাখবে না। [মায়িদা: ৫৫-৫৬, তাওবা: ৭১]

দুই. ওয়ালা এবং বারার সমন্বয় করবে। তারা গুনাহগার মুসলমান ও আহলে বিদআত। তাদের ইসলাম, ঈমান ও পুণ্যের কারণে তাদের ভালোবাসবে। যেসব ক্ষেত্রে তারা হকের উপর, সেসব ক্ষেত্রে তাদের মহব্বত করবে, সহায়তা করবে, তাদের পাশে দাঁড়াবে; আর যেসব ক্ষেত্রে তারা ভুলভ্রান্তির শিকার, সেসব ক্ষেত্রে তাদের সতর্ক করবে, দাওয়াত দেবে, প্রয়োজনে সেক্ষেত্রে বারার পথে হাঁটবে; তবে সামগ্রিক বারা নয়। [সাদ: ২৮, হুজুরাত: ৯]

তিন. স্রেফ বারা, কোনো ওয়ালা নেই। কাফের, মুশরিক, মুরতাদ, নাস্তিক এবং ইসলামের সকল বিরোধী শক্তি। তাদের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে বারা বাস্তবায়ন করবে, সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করবে, শত্রুতা পোষণ করবে; তাদের সঙ্গে কোনো বন্ধুত্ব রাখবে না, তাদের সঙ্গে বসবে না, চলাফেরা করবে না। [তাওবা: ২৩-২৪, কাহাফ: ৫০, মুজাদালা: ২২] মুসলমানদের উপর কোনোকিছুতে তাদের প্রাধান্য দেবে না। মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে তাদের বসাবে না। তবে বারার স্তরভেদ রয়েছে—

কিছু রয়েছে বিশ্বাস ও হৃদয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আর কিছু হচ্ছে বাস্তবিক ও প্রায়োগিক। সুতরাং কাফেরদের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অন্তরের শত্রুতা সবসময় অব্যাহত থাকবে। কারণ সেটা সবার দ্বারা সম্ভব। বিপরীতে বাস্তব কাজের ময়দানে তাদের সঙ্গে সম্পর্কছিন্ন, তাদের দায়িত্ব না দেওয়া ইত্যাদি প্রত্যেকের সাধ্যমতো হবে, যে যতটুকু পারে ততটুকু করবে। [আলে ইমরান: ২৮][১]

কাফেরদের সঙ্গে বারা: আল্লাহ তায়ালা কুরআনে নিজেকে মুমিনদের বন্ধু বলেছেন, বিপরীতে কাফেরদের বন্ধু বলেছেন তাগুত শয়তানকে। আল্লাহ বলেন,

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

অর্থ: 'যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের বন্ধু ও অভিভাবক। তাদের তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে; আর যারা কুফরি করে তাদের বন্ধু ও অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদের আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।' [বাকারা: ২৫৭] ফলে আল্লাহ আর শয়তানের মাঝে যেমন বন্ধুত্ব হতে পারে না, তেমনই মুমিন ও কাফেরের মাঝে বন্ধুত্ব হতে পারে না। ইসলামে এটা কোনো গোপন বিষয় নয়। কাফেররা রাগ করবে, তাই তথাকথিত ভদ্রতা দেখাতে গিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়নি—এমন নয়; বরং এটা চিরন্তন বাস্তবতা। ফলে এটাকে কুরআনে রাখঢাক ছাড়া দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠেই বলা হয়েছে। কুরআনের অনেকগুলো আয়াতে মুসলমানদের পরস্পর ভাই-বন্ধু হয়ে থাকতে এবং কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

অর্থ: 'তারা চায় তোমরাও তাদের মতো কুফরি করো, যাতে তোমরা এবং তারা সমান হয়ে যাও। অতএব, তাদের কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে।' [নিসা: ৮৯] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

---

১. বুখারি (৬৭৮০); বিস্তারিত দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া (২৮/২২৮-২৩০); ইরশাদুদ তালিব, ইবনে সাহমান (৮-২০)।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ

অর্থ: 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা মুমিনদের বাদ দিয়ে কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না।' [নিসা: ১৪৪] অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّ لَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

অর্থ: 'হে মুমিনগণ, আহলে কিতাবদের যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদের এবং অন্য কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় করো যদি তোমরা ঈমানদার হও।' [মায়িদা: ৫৭] কাফেরদের আল্লাহ নিজেদের ও মুমিনদের শত্রু আখ্যা দিয়ে বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَ عَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ

অর্থ: 'হে মুমিনগণ, তোমরা আমার এবং তোমাদের শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে তারা তা অস্বীকার করছে।' [মুমতাহিনা: ১]

কাফেরকে মুমিনদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা নিষেধ; কারণ সকল কাফের-মুশরিক পরস্পরের বন্ধু। মুমিনদের বিরুদ্ধে তারা একজোট। ফলে তাদের কীভাবে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যায়? তাই যেসব মুমিন কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, তারাও তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ ؔۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থ: 'হে মুমিণগণ, তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদের পথ প্রদর্শন করেন না।' [মায়িদা: ৫১]

কাফেররা মুমিনদের প্রতি কেমন বন্ধুত্ব (!) রাখে সেটার গোমর ফাঁস করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ۗ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۖ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ۗ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ.

অর্থ: 'হে মুমিনগণ, তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোনো ত্রুটি করে না। তোমরা বিপদে পড়লে তারা আনন্দ পায়। শত্রুতা ও বিদ্বেষ তো তাদের মুখেই ফুটে উঠেছে। তবে যা তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে তা আরও বেশি জঘন্য। তোমাদের জন্য আমার আয়াতসমূহ বিস্তারিত বলে দিলাম। যদি তোমরা বুঝতে।' [আলে ইমরান: ১১৮]

তাই কেবল কাফেরদের বন্ধুত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখা নয়, বরং তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা ও তাদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করাই ইসলামের নীতি। আল্লাহ এটাকে আদর্শ মুমিনের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهٗۤ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ.

অর্থ: 'হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্য থেকে যে তার ধর্ম থেকে বেরিয়ে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি সদয় হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় পাবে না।' [মায়িদা: ৫৪]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদিসে ওয়ালা ও বারার কথা বলা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ঈমানের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা।'[১] জারির রাজি. যখন রাসুলুল্লাহর হাতে বাইয়াত নিতে আসেন, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর বাইয়াত করান: 'আল্লাহর ইবাদত করবে। নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে। জাকাত প্রদান করবে। মুসলমানদের জন্য কল্যাণ কামনা করবে। মুশরিকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে।'[২]

---

১. মুসনাদে আহমদ (১৮৮২১); তয়ালিসি (৭৮৩); মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (৩১০৬০)।
২. নাসায়ী (৪১৮৮)।

সালাফ কুরআন ও সুন্নাহ সর্বাধিক বুঝতেন এবং তাদের জীবনে সেটা সর্বোত্তমরূপে বাস্তবায়ন করতেন। এ জন্য আমরা তাদের মুমিনদের প্রতি সবচেয়ে সদয় আর কাফেরদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠোর দেখি। বরং কুরআনে সাহাবাদের এ গুণের প্রশংসা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

অর্থ: 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের পরস্পরের প্রতি সদয়।' [ফাতহ: ২৯] কাব রাজি. বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে, আল্লাহর জন্য শত্রুতা রাখবে, আল্লাহর জন্য দান করবে এবং আল্লাহর জন্য দান থেকে বিরত থাকবে, সে ব্যক্তির ঈমান পরিপূর্ণ হবে যাবে।'[১]

ইবনে আব্বাস রাজি.-এর বক্তব্য আরও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করবে, আল্লাহর জন্য সুসম্পর্ক রাখবে, আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করবে, সে আল্লাহর বেলায়াত লাভ করবে। এটা না করা পর্যন্ত কেউ যতই নামাজ-রোজা করুক, ঈমানের স্বাদ পাবে না। দুঃখজনকভাবে আজ অধিকাংশ মানুষের সম্পর্ক দুনিয়ার জন্য হয়ে গেছে। ফলে এগুলো তাদের কোনো কাজে আসবে না।'[২] ইবনে আব্বাস রাজি.-এর বক্তব্যটি খেয়াল করে দেখুন। সাহাবা ও তাবেয়িদের যুগ সম্পর্কে যদি তার এই মন্তব্য থাকে, তবে আজকের অবস্থা দেখলে কী বলতেন? আজ তো মুসলিম উম্মাহর দোস্ত-দুশমন ও শত্রুমিত্রের মানদণ্ড উলটে গেছে। আজ মুসলমানদের যত শত্রুতা সব একই দ্বীনের অনুসারী মুসলমানদের সাথে, যত সখ্য সব কাফের-মুশরিকদের সাথে। আজকের মুসলমানরা মুসলমানদের দেশ ভালোবাসে না, কাফেরদের দেশ ভালোবাসে; মুসলমানদের সংস্কৃতি ভালো লাগে না, কাফেরদের সংস্কৃতি ভালো লাগে। নিজেদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো কোনোরকম দায়সারাভাবে পালন করে, মুশরিকদের সংস্কৃতি পূর্ণ উদ্যম ও পরম আগ্রহে উদ্‌যাপন করে। অথচ তাদের অনুষ্ঠান নিজেরা উদ্‌যাপন তো দূরের কথা সেখানে যাওয়াই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। [ফুরকান: ৭২] মুসলমানদের বাড়িতে মুসলমানদের যতটা দেখা যায়, তারচেয়ে কাফেরদের বাড়িতে তাদের বেশি দেখা যায়। অনেকে বাজার করলে কাফেরদের দোকান থেকে বাজার করে, অফিস কিংবা কর্মক্ষেত্রে মুসলমানদের

---

১. জুহদ, ওয়াকি (৬০৯); আস-সুন্নাহ, খাল্লাল (৫/৬৩); আদ-দুররুল মানসুর, সুয়ুতি (৮/৮৭); বরং তাবারানি এটা আওসাতে আবু উমামা রাজি.-এর সূত্রে মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন (আল-মুজামুল আওসাত ৯০৮৩)।

২. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, ইবনে রজব (১/১২৫)।

পরিবর্তে অমুসলিম বন্ধুদের ভালো লাগে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মুসলমানের সন্তানরা মুসলিম বন্ধুদের চেয়ে অমুসলিমদের সঙ্গে বন্ধুত্বে বেশি আগ্রহী, কাফের-মুশরিকদের নামে নাম রাখে, তাদের দেশে ঘুরতে ও বিনোদন করতে যায়, তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, তাদের চরিত্র ও তাদের গুণগানে বেহুঁশ হয়ে থাকে; তারা মারা গেলে তাদের জন্য পরকালে শান্তি ও জান্নাতের দোয়া করে! বরং দুনিয়ার লাজ-শরম এবং আখিরাত সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে জীবন-সাথি হিসেবে বেছে নিচ্ছে মুশরিকদের; সারা জীবন ব্যভিচারে লিপ্ত থাকছে। মুসলিমদের বাদ দিয়ে বাণিজ্য করছে অমুসলিমদের সঙ্গে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অমুসলিমদের সাহায্য করছে। মুসলিমদের হত্যার জন্য অমুসলিমকে অর্থ দিচ্ছে, অস্ত্র দিচ্ছে। এভাবেই আজ গোটা বিশ্বে এগিয়ে চলছে মুসলমানদের ওয়ালা-বারার উলটো খেলা।

এ কারণেই আজ মুসলিম উম্মাহ পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল ও নিরীহ জাতি। সংখ্যায় কোটি কোটি হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর সকল ভূখণ্ডে আজ তারা কাফের-মুশরিকদের লাথি-গুঁতো খেয়েই বেঁচে আছে। অনেক ভূখণ্ডে কাফেরদের ড্রোনের নিচে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তাই মুসলিমদের ঈমানের দিকে ফিরে আসতে হবে, ঈমানি ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ঈমানের ভিত্তিতে আল-ওয়ালা ওয়াল বারার এই গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করতে হবে।

আল্লাহ ইসলামের দুশমনদের সঙ্গে বারার আবশ্যকতা ঘোষণা করে বলেন,

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِى الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ. وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِىِّ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ.

অর্থ: 'আপনি তাদের অনেককে দেখবেন তারা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য যা (আখিরাতে) পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা চিরকাল শাস্তির মাঝে থাকবে। যদি তারা আল্লাহ ও রাসুলের উপর অবতীর্ণ বিষয়ে ঈমান রাখত, তবে কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই পাপাচারী।' [মায়িদা: ৮০-৮১] কাফেরদের সঙ্গে বারার ক্ষেত্রে উক্ত আয়াতের চেয়ে স্পষ্ট ভাষ্য আর হতে পারে না। এখানে বরং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে ঈমানের শর্ত বলা হয়েছে। অর্থাৎ কেউ মুমিন হলে কাফেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। সুতরাং যে কাফেরকে বন্ধু হিসেবে

গ্রহণ করে, সে মুমিন হতে পারে না। এটা সামগ্রিকভাবে। ফলে কেউ যদি তাদের সঙ্গে সামাজিক, রাজনীতিক ও পার্থিব স্বার্থের কারণে বন্ধুত্ব রাখে, তবে সে কুরআন-সুন্নাহর অবাধ্য ও ফাসিক হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু কেউ যদি কাফেরদের ধর্মের প্রতি ভালোবাসা ও অনুরাগ লালন করে এবং সেই ভালোবাসা থেকে তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তবে সে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ.

অর্থ: 'মুমিনগন যেন মুমিনকে ছেড়ে কোনো কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না।' [আলে ইমরান: ২৮]

'ওয়ালা' এবং 'ইহসান'-এর মাঝে পার্থক্য আবশ্যক: প্রশ্ন হতে পারে, কারও প্রতিবেশী, শিক্ষক, সহপাঠী এমনকি যদি আত্মীয়-স্বজন অমুসলিম হয়, তা হলে উপরের মূলনীতি অনুযায়ী তাদেরও কি ঘৃণা করবে? তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে? তাদের সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করবে? সংক্ষেপে উত্তর হলো, না। অমুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা রাখা হবে তাদের কুফরের কারণে, আল্লাহকে অবিশ্বাসের কারণে, আল্লাহর দ্বীনকে প্রত্যাখ্যানের কারণে; আর সে বিদ্বেষ হবে সমষ্টিগত ও সামগ্রিককভাবে। কিন্তু কারও আত্মীয়-স্বজন যদি অমুসলিম হয়, তবে সে তাদের সঙ্গে তাদের অধিকার প্রদান ও সদাচরণ অব্যাহত রাখবে। [লুকমান: ১৫][১] ক্লাসের সহপাঠী, শিক্ষক অথবা অফিসের সহকর্মী যদি অমুসলিম হয়, তবে সে তাদের সঙ্গে মানবিক সৌজন্যবোধ প্রদর্শন করবে, ভদ্র আচরণ করবে। প্রয়োজনে তাদের সহযোগিতা করবে। তাদের কেউ বিপদে পড়লে পাশে দাঁড়াবে। [মুমতাহিনা: ৮] এটা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং দাওয়াহর নিয়তে, যাতে তারা ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে। তাদের কুফরি বিশ্বাস ও কার্যক্রমকে ভালোবেসে নয়, তাদের ধর্মের কারণে নয়। ফলে অন্তরে তাদের ধর্মকে ঘৃণা করবে। কিন্তু যার যা অধিকার রয়েছে সেটা আদায় করবে। একইভাবে তাদের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয়ও করা যাবে, কিন্তু প্রয়োজনে; মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ রেখে নয়। বরং ইসলামের উদারতার এক বিস্ময়কর উদাহরণ হচ্ছে কাফের-মুশরিকরা অসুস্থ হলে তাদের দেখতে যাওয়া যাবে[২] তাদের সঙ্গে উপহার বিনিময় করা যাবে, অমুসলিম

১. বুখারি (২৬২০); মুসলিম (১০০৩)।
২. বুখারি (১৩৫৬); হাকেম (১৩৪৬)।

প্রতিবেশী/আত্মীয়দের পার্থিব সুখ-দুঃখে অংশগ্রহণ করা যাবে। তারা দাওয়াত দিলে (শর্তসাপেক্ষে) সাড়া দেবে। তাদের সাফল্যে তাদের অভিবাদন জানাবে। তাদের দুঃখ বা বিপদে দুঃখপ্রকাশ করবে, পাশে দাঁড়াবে। তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সম্পদ ও ঘর-বাড়ির দেখাশোনা করবে। ক্ষুধার্ত অমুসলিমকে খাবার দেবে, ঋণগ্রস্তের ঋণ আদায় করবে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেবে। তাদের সঙ্গে সুন্দর ও উত্তমরূপে কথা বলবে। অর্থাৎ (হরবি নয় এমন) সাধারণ অমুসলিমদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার ও সদাচরণ করবে এই নিয়তে যে, হয়তো এগুলো তাদের অন্তরে ইসলামের প্রতি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।[১]

বরং ইসলাম তো মুসলিম পুরুষদের জন্য আহলে কিতাব নারীদের বিয়ের অনুমতিও দিয়েছে, [মায়িদা: ৫] যদিও সেটা শর্তসাপেক্ষে, উন্মুক্তভাবে নয়। ইসলাম তাতে উৎসাহিত করেনি, স্রেফ অনুমতি দিয়েছে। তথাপি বিয়ে হলে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মহব্বত-ভালোবাসা থাকা অপরিহার্য। তা হলে এটা কি 'ওয়ালা'? না, এটা 'ওয়ালা' নয়। কারণ প্রাকৃতিক ভালোবাসা এবং ধর্মীয় ভালোবাসা আলাদা বস্তু। ফলে কাফের-মুশরিকদের সঙ্গে পার্থিব কারণে ভালোবাসা, সদাচরণ বৈধ। কিন্তু তাদের ধর্মীয় কারণে ভালোবাসা 'অবৈধ' এবং 'ওয়ালা'। একইভাবে ইসলাম 'আহলে জিম্মা'র যেসব অধিকার ঘোষণা করেছে, তা অন্য ধর্মে বিরল। ফলে (মুহারিব ব্যতীত) কাফের-মুশরিক মানেই তাদের হত্যা করা কিংবা তাদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করা নয়, বরং তাদের বিশ্বাসের কারণে, ধর্মের কারণে তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখতে হবে। বিপরীতে মানবিক ও অন্যান্য দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সঙ্গে যথোচিত আচরণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ. اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

অর্থ: 'দ্বীনের ক্ষেত্রে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের

---

১. আল-ফুরুক, কারাফি (৩/১৫); আহকামু আহলিজ জিম্মাহ, ইবনুল কাইয়িম (১/৬০২); ইমদাদুল ফাতাওয়া, থানভি (৪/২৭০-২৭১)।

সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিয়েছে এবং বের করার কাজে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই জালিম।' [মুমতাহিনাহ: ৮-৯]

কিন্তু মুসলিম উম্মাহ আজ এক্ষেত্রে বিচ্যুতির শিকার। 'বারা' এবং 'মুআমালা বিল হুসনা' দুটোকে তারা গুলিয়ে ফেলে; মুহারিব কাফের ও সাধারণ অমুসলিমের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। প্রয়োজন ও অতিরঞ্জন দুটোর ফারাক বোঝে না। ফলে মানবিক ও দাওয়াতি সীমানা পার করে তাদের সঙ্গে খাতির করে; তাদের শিরকি অনুষ্ঠানে যোগদান করে, তাদের স্বম্ভাষণ জানায়। অথচ এগুলো মানবিক ও সামাজিক কোনো দৃষ্টিতেই প্রয়োজনীয় নয়। তাদের ধর্মকর্মে যোগ না দেওয়া অভদ্রতাও নয়। যোগ দেওয়াটাই বরং নিজের বিশ্বাসের দেউলিয়াত্বের প্রমাণ। এক শ্রেণির প্রগতিশীল দাবিদার এখানেও সন্তুষ্ট থাকে না। নিজেদের ভুল ও বিচ্যুতি স্বীকার করবে তো দূরের কথা উলটো 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার' নামক ইসলামবিরোধী শ্লোগান দিয়ে হারামকে হালাল করতে চায়, অন্যায়কে পুণ্য বানাতে চায়। এরচেয়ে দুঃখজনক বাস্তবতা আর নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও ধর্ম-বিসর্জন এক বিষয় নয়। বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ইসলামে নিষিদ্ধ নয়, বরং এটিই স্বাভাবিক এবং কাম্য। রাসুলুল্লাহর যুগে মদিনা থেকে শুরু করে খেলাফতে রাশেদা এবং ইসলামি ইতিহাসের চৌদ্দশো বছরের ইতিহাস ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সহাবস্থানের ইতিহাস। কিন্তু ধর্মীয় সহিষ্ণুতার মানে যদি হয় নিজেদের ঈমান ও তাওহিদকে বিসর্জন দিয়ে অন্যের সঙ্গে থাকা, নিজেদের সংস্কৃতি ও স্বকীয়তা ছুড়ে ফেলে কাফেরদের সংস্কৃতির গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে চলা, এমন দেউলিয়াপনা ও ভুয়া সহিষ্ণুতার স্থান নেই ইসলামে।

ভ্রান্ত মুসলিম সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে ওয়ালা-বারা: উপরে আমরা ওয়ালা-বারার ক্ষেত্রে সকল মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করেছি। মুসলিম ভ্রান্ত সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে ওয়ালা-বারার বিষয় উক্ত ভাগ থেকেই সুস্পষ্ট হওয়ার কথা। তদুপরি বিষয়টির গুরুত্বের কারণে আরও কিছু কথা যোগ করা হচ্ছে। প্রথমত আমরা সবাই জানি, ইসলামের অন্তর্ভুক্ত কিংবা ইসলামি দাবিদার সকল সম্প্রদায় সমান স্তরে নয়—তাদের কেউ সামান্য বিদআতের মাঝে নিপতিত, কেউ বিদআতের গভীরে নিমজ্জিত, কেউ আকিদার ক্ষেত্রে ভয়াবহ রকমের বিচ্যুতির শিকার; আবার কেউ নিজেদের মুসলিম দাবি করলেও আদতে ইসলাম থেকে খারিজ। ফলে সকল মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে

ওয়ালা-বারার সমান নীতি প্রয়োগ করা যাবে না; বরং তাদের উপরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্যাটাগরিতে ফেলে দুই ভাগ করা হবে।

এক. যারা দ্বিতীয় ক্যাটাগরি তথা আমলি বিদআতের শিকার, কিংবা কিছু মাসআলায় এমন আকিদাগত বিদআতের (গাইরে মুকাফফিরাহ) শিকার যার মাধ্যমে তারা গোমরাহ হিসেবে গণ্য হয় এবং সেসব মাসআলায় আহলে সুন্নাতের বাইরে চলে যায়, কিন্তু কাফের হয় না। তাদের সঙ্গে ওয়ালা এবং বারা দুই নীতিতেই কাজ করতে হবে। যেমন: 'খারেজি',[১] 'মুতাজিলা',[২] 'কাদারিয়্যাহ',[৩] 'জাবরিয়্যাহ',[৪] 'মুশাববিহাহ',[৫] 'জাহমিয়্যাহ',[৬] শিয়া-সহ উপমহাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন ভ্রান্ত

---

১. ইসলামের ইতিহাসের প্রাচীনতম ভ্রান্ত সম্প্রদায়। তারা আলি রাজি. ও ইসলামি শরিয়তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণে 'খারেজি' (বিদ্রোহী) নামে পরিচিতি পায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধিক হাদিসে তাদের বিরুদ্ধে সতর্ক করে গিয়েছেন। সাহাবাগণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। পরবর্তীকালে তারা একাধিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দ্বীনের ক্ষেত্রে গর্হিত বাড়াবাড়ি ও উগ্রতা তাদের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য। কবিরা গুনাহকারী তাদের মতে কাফের। ফলে মুসলমানদের কাফের আখ্যা দিয়ে তাদের রক্তপাতের দ্বারা তাদের ইতিহাস ভরপুর। বরং তারা উসমান, আলি, তালহা, জুবাইর রাজি.-এর মতো সাহাবাদের কাফের বলত। শাসকের প্রতি বিদ্রোহী দৃষ্টিভঙ্গি-সহ আকিদার বিভিন্ন বিষয়ে তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত থেকে বিচ্যুত। বরং তাদের কোনো কোনো ফিরকা অসংখ্য কুফরি এবং ইসলামের সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক আকিদায় বিশ্বাসী। ফলে সেসব ফিরকা কাফের।

২. হিজরি দ্বিতীয় শতকের শুরুতে হাসান বসরি রাহি.-এর শাগরিদ ওয়াসেল ইবনে আতা ও আমর ইবনে উবাইদের হাত ধরে উক্ত মতাদর্শের সূচনা। পরবর্তীকালে, বিশেষত খলিফা মামুনের যুগে, তারা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রথমে কবিরা গুনাহের মাসআলাকে কেন্দ্র করে আহলুস সুন্নাহ থেকে তারা বিচ্যুত হয়। অতঃপর সিফাত অস্বীকার, তাকদির অস্বীকার (কাদারিয়্যাহ), খালকে কুরআনের বক্তব্য, জালিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অনুমোদন, কুরআন-সুন্নাহর উপর 'আকল' ও 'যুক্তি'কে প্রাধান্য দিয়ে গাইবিয়্যাতের অনেক বিষয় অস্বীকার-সহ ভ্রান্ত বুদ্ধিজীবীদের আখড়ায় পরিণত হয় উক্ত সম্প্রদায়টি।

৩. তাকদির অস্বীকারকারী সম্প্রদায়। তারা মনে করে, মানুষই তার সকল কাজের সৃষ্টিকর্তা। মানুষ যা ইচ্ছা তা-ই করে। এতে আল্লাহর কোনো হাত নেই। অনেক সম্প্রদায় কাদারিয়্যাহদের ভ্রান্ত আকিদা গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে মুতাজিলা সম্প্রদায়। পিছনে তাদের মতাদর্শের খণ্ডনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪. তাকদির স্বীকারের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জনকারী সম্প্রদায়। তারা তাকদিরের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করে মানুষকে সম্পূর্ণ পরাধীন বানিয়ে দিয়েছে। ফলে তাদের মতে, মানুষ পুতুলের মতো। আল্লাহ যেভাবে চান সেভাবে করে, তার কিছু করার সামর্থ্য নেই। অনেক ভ্রান্ত সুফি সম্প্রদায় তাদের উক্ত আকিদা গ্রহণ করেছে। উক্ত আকিদা গ্রহণকারী প্রসিদ্ধ সম্প্রদায় হচ্ছে 'জাহমিয়্যাহ'। পিছনে তাদের ভ্রান্ত আকিদা খণ্ডন করা হয়েছে।

৫. আল্লাহকে সৃষ্টির মতো সাদৃশ্যকারী সম্প্রদায়। তারা কুরআন-সুন্নাহে আল্লাহর যেসব সিফাত তথা গুণ বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে সৃষ্টির মতো কল্পনা করেছে। আল্লাহর হাত-পা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করে তাকে মানুষের মতো বানিয়ে দিয়েছে। আহলে সুন্নাতের সর্বসম্মতিক্রমে তারা একটি ভ্রান্ত সম্প্রদায়। ইহুদিদের থেকে শিয়াদের হাত ধরে তাদের মাঝে এই বিচ্যুতি প্রবেশ করেছে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সম্প্রদায় তাদের উক্ত ভ্রান্ত মতবাদ গ্রহণ করেছে, যার কিছু প্রভাব বর্তমানেও বিভিন্ন সম্প্রদায় জ্ঞাতসারে/অজ্ঞাতসারে বহন করে চলেছে।

৬. জাদ ইবনে দিরহাম এবং পরবর্তীকালে তার শাগরিদ জাহম ইবনে সাফওয়ানের হাতে গড়া একটি ভ্রান্ত মতবাদ। তারা তাদের মতাদর্শ সম্ভবত ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের থেকে গ্রহণ করে। সকল ভ্রান্তির আখড়া এই মতবাদ। তারা সকল সিফাত অস্বীকার (তাতিল) করে। তাকদিরের ক্ষেত্রে তারা জাবরিয়্যাহ আর ঈমানের ক্ষেত্রে মুরজিয়া। কিয়ামত-সংশ্লিষ্ট অনেক গায়েবি বিষয় অস্বীকার করে তারা। সালাফের সকল ইমামের ঐকমত্যে তারা চরম ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট একটি দল। বরং কারও কারও মতে, তারা ইসলাম থেকে খারিজ।

সম্প্রদায়।[১] তাদের ঈমান, আমল, দ্বীনের জন্য তাদের মেহনত ইত্যাদির কারণে তাদের ভালোবাসবে, তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করবে, বিপদে পাশে দাঁড়াবে, প্রয়োজন পূর্ণ করবে। ইসলাম-প্রদত্ত অন্যান্য অধিকার প্রদানে কুণ্ঠিত হবে না। আর যেসব ক্ষেত্রে তারা ভ্রান্তির শিকার, সেসব ক্ষেত্রে তাদের বিরোধিতা করবে, তাদের বিচ্যুতি মুসলমানদের সামনে তুলে ধরবে। ভ্রান্তির ক্ষেত্রে তাদের কোনোরকম সহযোগিতা করবে না; তাদের বিদআতি কাজকর্মে অংশ নেবে না। নিখাদ আহলে সুন্নাতের অনুসারীদের উপর সেসব আহলে বিদআতকে অগ্রাধিকার দেবে না। বরং ক্ষেত্রবিশেষে এবং যথাযথ (মাসলাহাত) মনে হলে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে।[২] এ কারণেই ইমাম তহাবি রাহি. উপরের দলগুলোকে **'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতবিরোধী, বিদআত এবং গোমরাহপন্থি সব ধরনের প্রবৃত্তিপূজা, মনগড়া ধ্যানধারণা ও বাতিল মতবাদ'... 'পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত'** বলেছেন, কাফের বলেননি।

তবে সম্পর্ক ছিন্নটা (বারা) দু-রকম। অর্থাৎ বিদআত ও আহলে বিদআতের মাঝে পার্থক্য করতে হবে। আহলে বিদআত হলেই সে ইসলামে প্রত্যাখ্যাত নয়, ঘৃণ্য নয়। অনেক সময় ভুল ইজতিহাদ, জাহালত, শুবহাত, তাবিলাত ইত্যাদির কারণে মানুষ বিদআতে লিপ্ত থাকে, যা আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করে দেবেন বরং ক্ষেত্রবিশেষে চাইলে সেটার পুণ্যও দিতে পারেন। যেমন: কেউ মিলাদ পড়লে বা রাসুলের জন্মদিন পালন করলে রাসুলের মহব্বতের কারণে আল্লাহ তাকে পুণ্যও দিতে পারেন (বিদআতের কারণে নয়)।[৩] কেউ সিফাতের তাবিলের ক্ষেত্রে গুলু (তাতিল) করলে আল্লাহ চাইলে তাঁর তানজিহের মহৎ উদ্দেশ্য থাকার কারণে তাকে সওয়াব দিতে পারেন। আবার কেউ ইসবাতের ক্ষেত্রে গুলু (তাশবিহ) করলে কুরআন-সুন্নাহর প্রতি তাজিমের

---

১. এ দেশে বিদআতপন্থিরা একটা অভিন্ন নাম বহন করলেও তারা অসংখ্য দল-উপদলে বিভক্ত এবং তাদের আকিদাগত উসুল ও কর্মপন্থা ভিন্ন ভিন্ন। তাদের কোনো কোনো সম্প্রদায় আহলে সুন্নাতের খুব কাছাকাছি, আবার কতক সম্প্রদায় শিরকের সাগরে নিমজ্জিত। ফলে এক বাক্যে তাদের উপর অভিন্ন হুকুম দেওয়া যাবে না। বরং প্রত্যেকের আকিদা অনুযায়ী তাদের সঙ্গে আমাদের কর্মপন্থা নির্ধারিত হবে।

২. আত-তামহিদ (৪/৮৭); আল-ইসতিজকার (৮/২৬৮); মাজমুউল ফাতাওয়া (২৮/২০৯)।

৩. হজরত থানভি লিখেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম নিয়ে আলোচনা-সভা, অন্য কথায় মিলাদ মাহফিল, (الاحتفال بذكر الولادة) যদি বিদআতমুক্ত হয়, তবে কেবল বৈধ নয়, বরং মুস্তাহাব। কারণ, তা অন্যান্য দরুদের মতোই।' (ইমদাদুল ফাতাওয়া ৬/৩১২); তবে প্রচলিত মিলাদ মাহফিল যেহেতু বিভিন্ন বিদআতমিশ্রিত হয়ে থাকে, ফলে এটা বৈধ নয়। হজরত রশিদ আহমদ গঙ্গুহি রাহি. লিখেন, 'প্রচলিত মিলাদের মজলিস বিদআত।' (ফাতাওয়ায়ে রশিদিয়া ১৭৪); মাহমুদ হাসান গঙ্গুহি রাহি. লিখেছেন, 'প্রচলিত মিলাদ বিদআত ও অবৈধ। কারণ, এটা ভিত্তিহীন একটা অনুষ্ঠান, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন ও ইমামদের যুগে ছিল না। এর বৈধতার পক্ষে কোনো দলিলও নেই।' (ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ৩/১৬৯); জফর আহমদ উসমানিও মিলাদের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র মজলিসকে বিদআত বলেছেন। (ইমদাদুল আহকাম ১/১৮৭) ফলে এ ধরনের অনুষ্ঠান বর্জনীয়।

কারণে তাকে পুরস্কৃত করতে পারেন। কিন্তু সেটা ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, জামাতের ক্ষেত্রে নয়। ফলে এক্ষেত্রে বিপরীত পক্ষের (চাই সুস্পষ্ট আহলে বিদআত হোক কিংবা আহলে বিদআত মনে করা হোক) আফরাদ তথা ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা, তাদের দরদের সঙ্গে বোঝানো, তাদের ইসলামপ্রদত্ত হকগুলো দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু একই সময়ে তাদের দলগত বিদআতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। সেক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করবে না। বরং তাদের বিদআত খণ্ডন করবে। প্রয়োজনে মুনাযারা করবে। তাদের ভ্রান্তি মুসলমানদের সামনে উন্মোচিত করবে। মুসলমানদের ঐক্যের ক্ষেত্রে নির্ভেজাল আহলে সুন্নাতকে অগ্রাধিকার দেবে।[১]

কিন্তু যখন গোটা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রয়োজন কিংবা যেসব বিষয়ে তারা আহলে সুন্নাতের অনুসারী, সেসব বিষয়ে উম্মাহর সামগ্রিক ঐক্য গড়তে যাবে, সেক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত এবং আহলে বিদআত সবাইকে নিয়ে কাজ করবে। যেমন কুফর, শিরক, নাস্তিক্যবাদ, স্বৈরতন্ত্র, খ্রিষ্টান মিশনারি, কাদিয়ানি, বাতেনি-সহ ইসলাম ও উম্মাহ-বিরোধী সকল ফিতনার বিরুদ্ধে সকল আহলে কিবলা একযোগে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে। এক্ষেত্রে তাদের বিদআতের প্রতি সমর্থন দেবে না, আবার এগুলো সামনে এনে উম্মাহর ক্ষত বাড়াবে না, বরং সাময়িকভাবে ভুলে থাকবে। অস্থায়ীভাবে সেগুলোকে পিছনে রেখে দ্বীনের সুরক্ষা এবং উম্মাহর প্রতিরক্ষায় সবাই এক কাতারে দাঁড়িয়ে যাবে। মোট কথা, এ প্রকারের আহলে বিদআতের সঙ্গে (এক) বিদআতের পরিমাণ ও পর্যায় (দুই) বিদআতের ক্ষেত্রে ব্যক্তির পর্যায় (দাঈ অথবা মুকাল্লিদ) এবং (তিন) দ্বীন ও উম্মাহর মাসলাহাতের ভিত্তিতে ওয়ালা-বারার স্তর নির্ধারণ করবে।

দুই. ইসলামের দাবিদার যেসব ভ্রান্ত ফিরকা সুস্পষ্ট কুফর ও শিরকের মাঝে নিমজ্জিত, উসুলুদ্দিনের ক্ষেত্রে যাদের সঙ্গে সরাসরি বিরোধ রয়েছে, যারা কেবল আহলে সুন্নাতের বাইরে নয়, বরং ইসলাম থেকে খারিজ, যেমন মুলহিদ-জিন্দিক, কাদিয়ানি ও বাতেনি (ইসমাইলি, নুসাইরি, কারামেতা ইত্যাদি) সম্প্রদায়, তাদের সঙ্গে কেবলই বারা। কারণ, তারা নামে মুসলিম হলেও সামগ্রিকভাবে মূলত ইসলাম থেকে খারিজ। ফলে তাদের সঙ্গে কোনো ওয়ালা নেই। আহলে সুন্নাতের মূলনীতি হলো, আহলে বিদআত (মুকাফফিরাহ) সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে বারা ঘোষণা ওয়াজিব।[২] বরং

---

১. দেখুন: ইকতিজাউস সিরাতিল মুস্তাকিম (২/১২৬); সিয়ারু আলামিন নুবালা (রিসালাহ) (৫/২৭১); আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়িম (১৪৬)।

২. শরহুস সুন্নাহ, বাগাবি (১/২২৭); তাফসিরে ইবনে কাসির (৭/৩৩৮); তাফসিরে কুরতুবি (১৬/২৯৭); আল-ফাসল, ইবন হাজাম (২/৬৫)।

তারা কাফের-মুশরিকদের চেয়েও জঘন্য, শরিয়তের পরিভাষায় যাদের মুনাফিক বলা হয়। তারা ভিতর থেকে ইসলামের গোড়া কেটে দেয়। ইবনে আবিদিন লিখেছেন, 'এ কারণে অনেক ইমাম কঠোরতা করে বলেছেন, তারা তাওবা করলেও কবুল করা হবে না। কারণ, তাওবার আড়ালে তারা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে যাবে। মুসলিম রাষ্ট্রে জিজয়া কিংবা যেকোনো বিনিময়ে তাদের বসবাস করতে দেওয়া হবে না। তাদের সঙ্গে বিয়েশাদি বৈধ হবে না। তাদের জবাই করা প্রাণী খাওয়া যাবে না। কারও কারও মতে, তাদের হত্যা করা এবং সমূলে উপড়ে ফেলা ফরজ।'[1] ফলে তাদের সঙ্গে কোনো ওয়ালা নেই; ভ্রাতৃত্ব তো দূরের কথা। উম্মাহকেন্দ্রিক ঐক্যের স্বপ্নে তারা অন্তর্ভুক্ত হবে না।

কিন্তু তাদের 'আফরাদ' তথা ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে সৌজন্য ও সদাচরণ নিষিদ্ধ নয়। কারণ কাদিয়ানি, বাতেনি ও তাদের মতো অন্যান্য কাফের সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সদস্য ইসলাম থেকে খারিজ এমন নয়। বরং তাদের মাঝে এমন অনেক নারী-শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও সাধারণ মানুষ রয়েছে, যারা তাদের আকিদা সম্পর্কে কিছুই জানে না। আবার কেউ কেউ স্রেফ জাহালত, শুবুহাত (সন্দেহ) বা তাবিলাত (ব্যাখ্যা)-এর কারণে তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু বাস্তবে তারা ইসলামের উসূল ও ফিতরাতের উপর অবিচল। ফলে হুজ্জত কায়েমের আগপর্যন্ত তারা কাফের নয়, বরং মাজুর হিসেবে গণ্য হবে। যেহেতু মাজুর গণ্য হবে, তাই তাদের সঙ্গে বারা নয়, বরং ওয়ালা। এ কারণে এসব সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে সম্পর্ক, সদাচরণ ও সদ্ব্যবহার বৈধ। আর যদি দাওয়াতের নিয়তে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা হয়, তাদের কাছে যাওয়া হয়, তবে সেটা উত্তম ও পুণ্যের কাজ। কিন্তু সেটা সবার কাজ নয়।[২]

আকিদা সম্পর্কে কিছু অজ্ঞ লোক দুনিয়ার সবার সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যে বিশ্বাসী। তাদের কাছে আহলে সুন্নাত, আহলে বিদআত, মুমিন-মুনাফিক-জিন্দিক কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। কেউ ইসলামি নাম ধারণ করলেই যথেষ্ট। এটাকেই তারা উদারতা মনে করে এবং আলিমদের গোঁড়া আখ্যা দেয়। অথচ তারা নিজেরা অজ্ঞতার মাঝে নিমজ্জিত, আকাশ-কুসুম কল্পনায় বিভোর। এই শ্রেণির মানুষ মনে করে ইসলামই যথেষ্ট; সকল মুসলিম ভাই ভাই; ইসলামের নামে ভেদাভেদ বৈধ নয়।

---

১. রদ্দুল মুহতার (৪/১৯৯, ৪/২৪৪)।

২. মাজমুউল ফাতাওয়া (৩/৩৫৩-৩৫৪); দেখুন: আল-ইনসাফ, মারদাভি (১২/৪৮); কিফায়াতুল মুফতি (৯/৩১৪)।

তাদের কথা আপাতদৃষ্টিতে মধুর হলেও সঠিক নয়। আমরাও একমত—ইসলামই যথেষ্ট; সকল মুসলিম ভাই ভাই। কিন্তু কেউ যদি ইসলামের উপরই না থাকে, নামে মুসলিম দাবিদার হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, সে কীভাবে মুসলমানদের ভাই হয়? এই অর্থহীন ঐক্যের ফাঁপা স্লোগান ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কোনো কাজে আসবে না। উপরে উল্লেখ করা দ্বিতীয় প্রকারের (কাফের) সম্প্রদায়গুলো মুসলমানদের কেবল শত্রু নয়; বরং ইহুদি-খ্রিষ্টানদের চেয়েও তারা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য অধিকতর ক্ষতিকর। ইহুদি-খ্রিষ্টানরা আসে সামনের দিক থেকে, আর এরা পিছনে থেকে মুসলমানদের পিঠে ছুরি বসায়। ফলে একদিকে যেমন নিজেদের ঐক্য বিনির্মাণ করতে হবে, অপরদিকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকেও সতর্ক থাকতে হবে। তাই কেবল নিজে মুসলিম হলেই হবে না, বরং ভ্রান্ত মাজহাবগুলো থেকে নিজেদের মুক্ত ঘোষণা করতে হবে। এ কারণে ইমাম তহাবি বলেন, '**তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।**'

শেষ কথা

ইমাম তহাবি এই গ্রন্থে ফুকাহায়ে মিল্লাত ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের যেসব আকিদা বর্ণনা করেছেন এবং যে আকিদা রাখতেন ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ি, ইমাম আহমদ-সহ সালাফ ও খালাফের সকল আহলে হাদিস ও আহলে ফিকহ আয়িম্মাহ, আমরা তাদের সকল আকিদায় দৃঢ় বিশ্বাস রাখি। তাদের মানহাজের আলোকে আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখি এবং তাঁর ইবাদত করি। আল্লাহ আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সরল পথে অটল রাখুন। কুফর, শিরক ও বিদআত থেকে হিফাজত করুন। আমিন।

ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ। ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন।

[সকল প্রশংসা আল্লাহর, যার অনুগ্রহে সৎকর্মগুলো সম্পাদিত হয়]

তথ্যসূত্র

১. আলামুস সুন্নাহ আল-মানশুরাহ, হাফেজ হাকামি, সৌদি ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২য় প্রকাশ, ১৪২২ হি.
২. আউনুল মাবুদ শরহু সুনানি আবি দাউদ, শরফুল হক সিদ্দিকি আজিমাবাদি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ২য় প্রকাশ, ১৪১৫ হি.
৩. আকিদাতুত ত্বহাবী, কারি মুহাম্মাদ তৈয়ব, ইয়াসের নাদিম এন্ড কোম্পানি, দেওবন্দ, ১৯৯৯ খ্রি.
৪. আখবারু আবি হানিফা ওয়া আসহাবিহি, কাজি হুসাইন ইবনে আলি সাইমারি, আলামুল কুতুব, ২য় প্রকাশ, ১৪০৫ হি.
৫. আত-তালিকাতুল মুখতাসারাহ আলা মাতনিল আকীদাহ আত-ত্বহাবিয়্যাহ, সালেহ ফাওজান, দার ইবনুল জাওজি, ১ম প্রকাশ, দাম্মাম, ১৪৩৯ হি.
৬. আত-তালিকাতুস সুন্নিয়্যাহ আলা মাতনিল আকীদাহ আত-ত্বহাবিয়্যাহ, আহমাদ জাবের জুবরান।
৭. আত-তাওজিহ ফি শরহিল মুখাতাসার আল ফারইয়ি, খলিল ইবনে ইসহাক মালেকি, মারকাজু নাজিবওয়াইহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৯ হি.
৮. আত-তাওজিহাতুল জালিয়্যাহ আলা শরহিল আকীদাহ আত-ত্বহাবিয়্যাহ, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান আল-খুমাইয়িস, দার ইবনুল জাওজি, ১ম প্রকাশ, রিয়াদ, ১৪২৯ হি.
৯. আত-তাওয়াসসুল আনওয়াউহু ওয়া আহকামুহু, নাসিরুদ্দিন আলবানি, মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি.
১০. আত-তাওহিদ, আবু মনসুর আল মাতুরিদি, দারুল জামিআতিল মিসরিয়্যাহ, আলেক্সান্দ্রিয়া
১১. আত-তানকিল, আবদুর রহমান মুআল্লিমি, আল-মাকতাবুল ইসলামি, ২য় প্রকাশ, ১৪০৬ হি.
১২. আত-তাফহিমাতুল ইলাহিয়্যাহ, ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি, আল-মাজলিসুল ইলমি, ডাভেল, ১৩৫৫ হি.
১৩. আত-তাবসিরাহ, ইবনুল জাওজি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি.
১৪. আত-তাবসির ফি মাআলিমিদ্দিন, মুহাম্মাদ ইবনে জারির তাবারি, দারুল আসিমাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৬ হি.
১৫. আত-তাবাকাতুল কুবরা, আবদুল ওয়াহহাব শারানি, মাকতাবাতু মুহাম্মাদ মুলাইজি, মিশর, ১৩১৫ হি.
১৬. আত-তাবাকাতুল কুবরা, মুহাম্মাদ ইবনে সাদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি.

১৭. আত-তামহিদ, ইবনে আবদুল বার, উইজারাতু উমুমিল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, মাগরিব, ১৩৮৭ হি.
১৮. আত-তাম্বিহাতুস সালাফিয়্যাহ আলা আওহামিল আকীদাহ আত-ত্বহাবিয়্যাহ, আবু মালেক মুহাম্মাদ ইবনে হামেদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব।
১৯. আত-তারগিব ওয়াত তারহিব, ইসমাইল আস্বাহানি কিওয়ামুস সুন্নাহ, দারুল হাদিস, কায়রো, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি.
২০. আত-তারিখুল কাবির, বুখারি, দায়িরাতুল মাআরিফ আল-উসমানিয়্যাহ, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য
২১. আত-তাহরির ওয়াত তানবির, মুহাম্মাদ তাহের ইবনে আশুর, আদ-দারুত তিউনিসিয়্যাহ, তিউনিস, ১৯৮৪ খ্রি.
২২. আত-তিসইনিয়্যাহ, ইবনে তাইমিয়া, মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি.
২৩. আদ-দুররাতুল বাহিয়্যাহ ফি হাল্লি আলফাজিল আকীদাহ আত-ত্বহাবিয়্যাহ, আবদুল্লাহ হারারি, দারুল মাশারি, ১ম প্রকাশ, বৈরুত, ১৪১৯ হি.
২৪. আদ-দুররুল মানসুর ফিত-তাফসির বিল-মাসুর, জালালুদ্দিন সুয়ুতি, দারুল ফিকর, বৈরুত,
২৫. আদ-দুরারুল কামেনাহ ফি আইয়ানিল মিয়াহ আস-সামিনাহ, ইবনে হাজার আসকালানি, দায়িরাতুল মাআরিফ আল উসমানিয়্যাহ, হায়দ্রাবাদ, ২য় প্রকাশ, ১৩৯২ হি.
২৬. আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ ফিল আজউইবাহ আন-নজদিয়্যাহ, সংকলন: আবদুর রহমান ইবনে কাসেম, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৪১৭ হি.
২৭. আনওয়ারুত তানজিল ওয়া আসরারুত তাবিল (তাফসিরে বাইজাবি), নাসিরুদ্দিন বাইজাবি, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি.
২৮. আন-নিহায়াহ ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম, ইবনে কাসির, দারুল জিল, বৈরুত, ১৪০৮ হি.
২৯. আন-নিহায়াহ ফি গরিবিল হাদিস ওয়াল আসার, ইবনুল আসির, আল মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৩৯৯ হি.
৩০. আন-নুরুল লামি ওয়াল বুরহানুস সাতি, নাজমুদ্দিন মানকুবারস তুর্কি (মৃ. ৬৫২ হি.), হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি
৩১. আনসাবুল আশরাফ, বালাজুরি, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি.
৩২. আজওয়াউল বায়ান ফি ইজাহিল কুরআন বিল কুরআন, মুহাম্মাদ আল-আমিন শানকিতি, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪১৫ হি.
৩৩. আজ-জুহদ, ওয়াকি ইবনুল জাররাহ, মাকতাবাতুদ দার, মদিনা মুনাওয়ারা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৪ হি.
৩৪. আর-রাদ্দু আলা বিশর আল-মারিসি, উসমান ইবনে সাইদ দারেমি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৩৫৮ হি.

৩৫. আর-রিয়াজুন নাজিরাহ ফি মানাকিবিল আশারাহ, মুহিব্বুদ্দিন তাবারি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ২য় প্রকাশ
৩৬. আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ, আবদুল কারিম ইবনে হাওয়াজিন কুশাইরি, মুআসসাসাতু দারিশ শাব, কায়রো
৩৭. আর-রিসালাহ তাদমুরিয়্যাহ, ইবনে তাইমিয়া, আল-মাতবাহাতুস সালাফিয়্যাহ, কায়রো, ২য় প্রকাশ, ১৩৯৭ হি.
৩৮. আর-রিসালাহ, মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিস শাফেয়ি, মাকতাবাতুল হলবি, মিশর, ১ম প্রকাশ, ১৩৫৮ হি.
৩৯. আল আওয়াসিমু ওয়াল কাওয়াসিম ফিজ-জাব্বি আন সুন্নাতি আবিল কাসিম, ইবনুল উজির, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৫ হি.
৪০. আল-আকিদাহ আন-নিজামিয়্যাহ ফিল আরকানিল ইসলামিয়্যাহ, ইমামুল হারামাইন জুয়াইনি, দারু সাবিলির রাশাদ।
৪১. আল-ইখতিলাফ ফিল লাফজ, ইবনে কুতাইবা, দারুর রায়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১২ হি.
৪২. আল-ইনসাফ, আবু বকর বাকিল্লানি
৪৩. আল-ইবানাতুল কুবরা, ইবনে বাত্তাহ, দারুর রায়াহ, রিয়াদ
৪৪. আল-উলু লিল আলিয়্যিল গাফফার, শামসুদ্দিন জাহাবি, মাকাতাবাতু আজওয়ায়িস সালাম, রিয়াদ, ১ প্রকাশ, ১৪১৬ হি.
৪৫. আল-কাওয়াইদুল মুসলা, ইবনে উসাইমিন, জামিয়া ইসলামিয়া, মদিনা, ৩য় প্রকাশ, ১৪২১ হি.
৪৬. আল-গারিবাইন ফিল কুরআন ওয়াল হাদিস, আবু উবাইদ হারাবি, মাকতাবাতু নিজার, সৌদি আরব, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি.
৪৭. আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, ইবনে তাইমিয়া, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, বৈরুত, ১৪০৮ হি.
৪৮. আল-ফিকহুল আকবার, মাকতাবাতুল ফুরকান, আরব আমিরাত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি.
৪৯. আল-বুরহান ফি উলুমিল কুরআন, বদরুদ্দিন জারকাশি, দার ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৩৭৬ হি.
৫০. আল-মাওজুআত, ইবনুল জাওজি, আল-মাকাতাবাতুস সালাফিয়্যাহ, মদিনা, ১ম প্রকাশ, ১৩৮৬ হি.
৫১. আল-মিনহাজ ফি শুআবিল ঈমান, আবু আবদুল্লাহ হালিমি, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৯ হি.
৫২. আল-মিনহাতুল ইলাহিয়্যাহ ফি শরহি তাহজিবিত তহাবিয়্যাহ, আবদুল আখের গুনাইমি, দার ইবনুল জাওজি, ২য় প্রকাশ, রিয়াদ, ১৪৩৭ হি.
৫৩. আল মুগনি, ইবনে কুদামা, মাকতাবাতুল কাহিরাহ, ১৩৮৮ হি.
৫৪. আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ, খলিল আহমদ সাহারানপুরি, দারুল ফাতহ, আম্মান, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি.
৫৫. আল-আকিদাতুল হাসানাহ, ওয়ালি উল্লাহ দেহলভি

৫৬. আল-আকিদাহ (রিওয়ায়াতু খাল্লাল), দারু কুতাইবা, দিমাশক, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি.
৫৭. আল-আনওয়ারুন নুমানিয়্যাহ, সাইয়েদ নিয়ামাতুল্লাহ জাজায়েরি, মুআসসাসাতুল আলামি, বৈরুত, ১৪৩১ (**শিয়াসূত্র**)
৫৮. আল-আরবাইন ফি ইমামাতিল আইম্মাতিত তাহিরিন, মুহাম্মাদ তাহের শিরাজি, মাতবাআতুল আমির, কুম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ (**শিয়াসূত্র**)
৫৯. আল-আরাফুশ শাজি শরহে সুনানিত তিরমিজি, আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি, দারুত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি.
৬০. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম, আবু হানিফা, মাকতাবাতুল খানজি, তাহকিক: জাহেদ কাওসারি, ১৩৬৮ হি.
৬১. আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ির, জালালুদ্দিন সুয়ুতি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হি.
৬২. আল-আসনা ফি শরহি আসমাইল্লাহিল হুসনা ওয়া সিফাতিহি, মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ কুরতুবি, আল-মাকতাবাহ আল-আসরিয়্যাহ, বৈরুত
৬৩. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, আবু বকর বাইহাকি, মাকতাবাতুস সাওয়াদি, জেদ্দা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৩ হি.
৬৪. আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ, আবুল হাসান মাওয়ারদি, দারুল হাদিস, কায়রো
৬৫. আল-ইতিকাদ, সাইয়েদ ইবনে মুহাম্মাদ নিশাপুরি
৬৬. আল-ইতিসাম, ইবরাহিম ইবনে মুসা শাতেবি, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যাহ আল কুবরা, মিশর
৬৭. আল-ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ, আবু হামেদ গাজালি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি.
৬৮. আল-ইনতিকা, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল বার, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত
৬৯. আল-ইনতিসার ফির রাদ্দি আলাল মুতাজিলা আল-কাদারিয়্যাহ আল-আশরার, ইয়াহইয়া ইবনে আবিল খাইর উমরানি, আজওয়াউস সালাফ, রিয়াদ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি.
৭০. আল-ইনসানুল কামিল, আবদুল করিম ইবনে ইবরাহিম জিলি, মুআসসাসাতুত তারিখিল আরাবি, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি.
৭১. আল-ইনসাফ ফি মারিফাতির রাজিহ মিনাল খিলাফ, আলাউদ্দিন মারদাভি, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, ২য় প্রকাশ
৭২. আল-ইবানা আন উসুলিদ দিয়ানাহ, আবুল হাসান আশআরি, দারুল আনসার, কায়রো, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৭ হি.
৭৩. আল-ইরশাদ ইলা সহিহিল ইতিকাদ, সালেহ ফাওজান, দার ইবনুল জাওজি, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪২০ হি.
৭৪. আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল, আহমদ ইবনে হাম্বল (রিওয়াইয়াতু ইবনিহি আবদুল্লাহ)। দারুল খানি, রিয়াদ, ২য় প্রকাশ, ১৪২২ হি.
৭৫. আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ, ইবনুল জাওজি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৩ হি.

৭৬. আল-ইসতিআব, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল বার, দারুল জিল, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১২হি.
৭৭. আল-ইসতিজকার, ইবনে আবদুল বার, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি.
৭৮. আল-ইসাবা ফি তাময়িজিস সাহাবা, ইবনে হাজার আসকালানি, দার হিজর, মিশর, ১ম প্রকাশ, ১৪২৯ হি.
৭৯. আল-ইস্তিগাসা ফির রাদ্দি আলাল বাকরি, ইবনে তাইমিয়া, তাহকিক: আবদুল্লাহ ইবনে দুজাইন আস-সাহলি, দারুল মিনহাজ, রিয়াদ, ১৪২৫ হি.
৮০. আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম, সাইফুদ্দিন আমেদি, আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত
৮১. আল-ঈমানুল কাবির, ইবনে তাইমিয়া
৮২. আল-ইজাহ লিমা খাফা মিনাল ইত্তিফাক আলা তাজিমি সাহাবাতিল মুস্তফা, ইয়াহইয়া ইবনে হুসাইন, মাকতাবাতুস সাহাবা, শারজা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ **(শিয়াসূত্র)**
৮৩. আল-কালায়িদ ফি শারহিল আকাইদ, মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ কওনভি (মৃ. ৭৭৭ হি.), হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, মাকতাবাতুল হারামিল মক্কি আশ-শরিফ
৮৪. আল-কাসিদাতুন নুনিয়্যা, ইবনুল কাইয়িম, মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়া, কায়রো, ২য় প্রকাশ, ১৪১৭ হি.
৮৫. আল-কিফায়াহ ফি ইলমির রিওয়ায়াহ, আবু বকর আল-খতিব-আল-বাগদাদি, আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, মদিনা
৮৬. আল-কুবল ওয়াল মুআনাকাহ ওয়াল মুসাফাহাহ, ইবনুল আরাবি, মাকতাবাতু ইবনি তাইমিয়া, কায়রো, ১ম প্রকাশ, ১৪১৬ হি.
৮৭. আল-খারাজ, ইমাম কাজি আবু ইউসুফ, আল মাকাতাবাতুল আজহারিয়্যা লিত তুরাস
৮৮. আল-গুনইয়া লিতালিবি তরিকিল হাক, আবদুল কাদের জিলানি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি.
৮৯. আল-জামি লি আখলাকির রাবি ওয়া আদাবিস সামি, আবু বকর আহমদ ইবনে আলি (খতিবে বাগদাদি), মাকতাবাতুল মাআরিফ, রিয়াদ
৯০. আল-জারহু ওয়াত তাদিল, ইবনে আবি হাতেম, দাইরাতুল মাআরিফিল উসমানিয়্যা, হায়দ্রাবাদ, পুনঃপ্রকাশ: দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, ১ম প্রকাশ, ১২৭১ হি.
৯১. আল-ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়্যা (ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি), দারুল ফিকর, ২য় প্রকাশ, ১৩১০ হি.
৯২. আল-ফাসল ফিল মিলালি ওয়াল আহওয়াই ওয়ান নিহাল, ইবনে হাজাম, মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো
৯৩. আল-ফিকহুল আবসাত, আবু হানিফা, মাকতাবাতুল ফুরকান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি.
৯৪. আল-ফিতান ওয়াল মালাহিম ফি জুহুরিল গাইবিল মুনতাজার, রজিউদ্দিন ইবনে তাউস, মানশুরাতুর রজি, কুম, ৫ম প্রকাশ, ১৩৯৮ **(শিয়াসূত্র)**

৯৫. আল-ফিহরিসত, আবুল ফারাজ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে নাদিম, দারুল মারিফাহ, বৈরুত, ২য় প্রকাশ, ১৪১৭ হি.
৯৬. আল-ফুতুহাতুল মাক্কিয়্যা, মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবি, দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যা কুবরা, কায়রো, ১ম প্রকাশ, ১২৭০ হি.
৯৭. আল-ফুরু, মুহাম্মাদ ইবনে মুফলিহ, মুআসসাসাতুর রিসালা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি.
৯৮. আল-ফুরুক, শিহাবুদ্দিন কারাফি, আলামুল কুতুব
৯৯. আল-বাইসুল হাসিস ইলা ইখতিসারি উলুমিল হাদিস, ইবনে কাসির, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত
১০০. আল-বালাগুল মুবিন (উর্দু), ওয়ালি উল্লাহ দেহলভি, অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মাদ আলি মুজাফফরি, কুরআন আসান তাহরিক, ২০০২ খ্রি.
১০১. আল-বাহরুর রায়েক শরহে কানজিদ দাকায়েক, যাজায়নুদ্দিন ইবনে নুজাইম, দারুল কিতাবিল ইসলামি, ২য় প্রকাশ
১০২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসির, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি.
১০৩. আল-বুরহানুল মুআইয়াদ, আহমদ রিফায়ি, তাহকিক: আবদুল গনি
১০৪. আল-মাউজুআত, ইবনুল জাওজি, আল-মাকতাবাতুস সালাফিয়্যা, মদিনা, ১ম প্রকাশ, ১৩৮৮ হি.
১০৫. আল-মাওয়াকিফ ফি ইলমিল কালাম, আজুদুদ্দিন ইজি, আলামুল কুতুব, বৈরুত
১০৬. আল-মাকাসিদুল হাসানা, শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ সাখাবি, দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি.
১০৭. আল-মাগাজি, মুহাম্মাদ ইবনে উমর আল-ওয়াকেদি, দারুল আলামি, বৈরুত, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৯ হি.
১০৮. আল-মাজমু শরহুল মুহাজ্জাব, ইয়াহইয়া ইবনে শরফ নববি, দারুল ফিকর
১০৯. আল-মাতালিবুল আলিয়াহ মিনাল ইলমিল ইলাহি, ফখরুদ্দিন রাজি, দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭ হি.
১১০. আল-মানারুল মুনিফ ফিস সহিহ ওয়াজ জয়িফ, ইবনুল কাইয়িম, তাহকিক: আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, মাকতাবাতুল মাতবুআতিল ইসলামিয়্যা, হলব, ১ম প্রকাশ, ১৩৯০ হি.
১১১. আল-মাবসুত, শামসুল আয়িম্মাহ সারাখসি, দারুল মারিফাহ, বৈরুত, ১৪১৪ হি.
১১২. আল-মিনহাজ ফি শুআবিল ঈমান, আবু আবদুল্লাহ হালিমি, দারুল ফিকর, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৯ হি.
১১৩. আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, আবদুল করিম শাহরাস্তানি, মুআসসাসাতুল হালাবি
১১৪. আল-মুওয়াফাকাত, ইবরাহিম ইবনে মুসা শাতেবি, দার ইবনে আফফা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি.
১১৫. আল-মুনতাকা মিন মিনহাজিল ইতিদাল, শামসুদ্দিন জাহাবি, তাহকিক: মুহিউদ্দিন খতিব

১১৬. আল-মুনতাজাম ফি তারিখিল মুলুকি ওয়াল উমাম, জামালুদ্দিন ইবনুল জাওজি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৪১২ হি.
১১৭. আল-মুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখিসি কিতাবি মুসলিম, আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে উমর কুরতুবি, দার ইবনে কাসির, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি.
১১৮. আল-মুস্তাসফা, আবু হামেদ গাজালি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৩ হি.
১১৯. আল-মুহাররার আল-ওজিজ ফি তাফসিরিল কিতাবিল আজিজ, ইবনে আতিয়্যা আল-আন্দালুসি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি.
১২০. আল-মুহাল্লা বিল-আসার, ইবনে হাজাম, দারুল ফিকর, বৈরুত
১২১. আল-শিফা বিতাআররুফি হুকুকিল মুস্তফা, কাজি ইয়াজ, দারুল ফিকর, ১৪০৯ হি.
১২২. আল-হাবি লিল-ফাতাওয়া, জালালুদ্দিন সুয়ুতি, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১৪২৪ হি.
১২৩. আল-হাবিল কাবির, আবুল হাসান মাওয়ারদি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি.
১২৪. আল-হিদায়া, বুরহানুদ্দিন আল-মারগিনানি, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত
১২৫. আল-হুজ্জাহ ফি বায়ানিল মাহাজ্জাহ, কিওয়ামুস সুন্নাহ, দারুর রায়াহ, রিয়াদ, ২য় প্রকাশ, ১৪১৯ হি.
১২৬. আশ-শারহুল কাবির আলাল আকীদাহ আত-ত্বহাবিয়্যাহ, সাইদ ফুদাহ, দারুজ জাখায়েন, বৈরুত
১২৭. আশ-শারিয়াহ, আবু বকর আল-আজুররি, দারুল ওয়াতন, রিয়াদ, ২য় প্রকাশ, ১৪২০ হি.
১২৮. আশ-শিয়াহ আহলে সুন্নাত, মুহাম্মাদ তিজানি, মুআসসাসাতুল ফাজর, লন্ডন **(শিয়াসূত্র)**
১২৯. আসনাল মাতালিব ফি শরহি রাওজিত তালিব, জাকারিয়া আল-আনসারি, দারুল কিতাবিল ইসলামি
১৩০. আস-সাইফুর রব্বানি (সিররুল আসরার গ্রন্থের সঙ্গে প্রকাশিত), মুহাম্মাদ মাক্কি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ২য় প্রকাশ, ১৪২৮ হি.
১৩১. আস-সাইফুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসুল, তাকিউদ্দীন সুবকি, দারুল ফাতাহ, আম্মান, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি.
১৩২. আস-সাফাদিয়্যাহ, ইবনে তাইমিয়া, মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়া, কায়রো, ২য় প্রকাশ, ১৪০৬ হি.
১৩৩. আস-সারিমুল মাসলুল আলা শাতিমির রাসুল, ইবনে তাইমিয়া, আল-হারাসুল ওয়াতানি, সৌদি আরব
১৩৪. আস-সিকাত, ইবনে হিব্বান বুসতি, দাইরাতুল মাআরিফিল উসমানিয়্যা, হায়দ্রাবাদ, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৩ হি.
১৩৫. আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ, ইবনে কাসির, দারুল মারিফাহ, বৈরুত, ১৩৯৫ হি.
১৩৬. আস-সুনান ওয়াল মুবতাদাআত, মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ শুকাইরি, দারুল ফিকর
১৩৭. আস-সুন্নাহ, আবদুল্লাহ ইবনে ইমাম আহমদ, দার ইবনুল কাইয়িম, দাম্মাম, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি.
১৩৮. আস-সুন্নাহ, আহমদ ইবনে খাল্লাল, দারুর রায়াহ, রিয়াদ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি.

১৩৯. আস-সুন্নাহ, ইবনে আবি আসেম, দারুস সুমাইয়ি, রিয়াদ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি.
১৪০. আস-সুন্নাহ, মুহাম্মাদ ইবন নসর মারওয়াজি, মুআসসাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যা, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি.
১৪১. আসাসুত তাকদিস ফি ইলমিল কালাম, ফখরুদ্দিন রাজি, মুআসসাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যা, বৈরুত, ১৪১৫ হি.
১৪২. আহকামু আহলিজ জিম্মা, ইবনুল কাইয়িম, রামাদা প্রকাশনি, দাম্মাম, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি.
১৪৩. আহকামুল কুরআন, আবু বকর আল-জাসসাস, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি.
১৪৪. আহসানুল ফাতাওয়া, রশিদ আহমদ লুধিয়ানভি, সাইদ কোম্পানি, করাচি, ১১শ প্রকাশ, ১৪৩৫ হি.
১৪৫. ইতিকাদাতু ফিরাকিল মুসলিমিন ওয়াল মুশরিকিন, ফখরুদ্দিন রাজি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত
১৪৬. ইলাউস সুনান, জফর আহমদ উসমানি, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমিল ইসলামিয়্যা, করাচি, ২য় প্রকাশ, ১৪০৫ হি.
১৪৭. ইকতিজাউস সিরাতিল মুস্তাকিম, ইবনে তাইমিয়া, দারু আলামিল কুতুব, বৈরুত, ৭ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি.
১৪৮. ইকফারুল মুলহিদিন ফি জরুরিয়্যাতিদ-দ্বীন, আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি, আল-মাজলিসুল ইলমি, পাকিস্তান, ৩য় প্রকাশ, ১৪২৪ হি.
১৪৯. ইখতিয়ারু মারিফাতির রিজাল (রিজালুল কাশশি), আবু জাফর তুসি, মুআসসাসাতুন নাশরিল ইসলামি, কুম (ইরান), ১ম প্রকাশ, ১৪২৭ **(শিয়াসূত্র)**
১৫০. ইখতিলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকিম, ইউসুফ লুধিয়ানভি, মাকতাবায়ে লুধিয়ানভি
১৫১. ইগাসাতুল লাহফান ফি মাসাইদিশ শাইতান, ইবনুল কাইয়িম, দারু আলামিল ফাওয়ায়িদ, মক্কা, ১ম প্রকাশ, ১৪৩২ হি.
১৫২. ইজতিমাউল জুয়ুশিল ইসলামিয়্যা, মাতাবিউল ফারাজদাক, রিয়াদ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি.
১৫৩. ইবতালুত তাবিলাত, আবু ইয়ালা, দারু ইলা দাউলিয়্যা, কুয়েত
১৫৪. ইমদাদুল আহকাম, জফর আহমদ উসমানি, মাকতাবায়ে দারুল উলুম, করাচি, ১৪৩০ হি.
১৫৫. ইমদাদুল ফাতাওয়া, আশরাফ আলি থানভি, তারতিব: মুহাম্মাদ শফি, মাকতাবায়ে দারুল উলুম, করাচি, ১৪৩১ হি.
১৫৬. ইজহারুল আকিদাহ আস-সুন্নিয়্যাহ বিশারহিল আকীদাহ আত-ত্বহাবিয়্যাহ, আবদুল্লাহ হারাই, দারুল মাশারি, ১ম প্রকাশ, বৈরুত, ১৪১২ হি.
১৫৭. ইরশাদুল ফুহুল, মুহাম্মাদ ইবনে আলি আশ-শাওকানি, দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি.

১৫৮. ইসবাতুল হদ লিল্লাহি তায়ালা, মাহমুদ দাশতি
১৫৯. ইসমাতুল আম্বিয়া, ফখরুদ্দিন রাজি, মাকতাবাতুস সাকাফা দ্বীনিয়্যা, কায়রো, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি.
১৬০. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, আবু হামেদ গাজালি, দারুল মারিফাহ, বৈরুত
১৬১. ঈজাহুদ দলিল ফি কাতয়ি হুজাজি আহলিত তাবিল, বদরুদ্দিন ইবনে জামাআ, দারুস সালাম, মিশর, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি.
১৬২. উমদাতুল কারি শরহু সহিহিল বুখারি, বদরুদ্দিন আইনি, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত
১৬৩. উম্মুল বারাহিন, মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ সানুসি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ২য় প্রকাশ, ২০০৯ ঈ.
১৬৪. উসুলুদ্দিন, আবুল ইউসর বাজদাবি, আল-মাকতাবা আল-আজহারিয়্যা লিত-তুরাস, কায়রো, ১৪২৪ হি.
১৬৫. উসুলুদ্দিন, শামসুল আইম্মাহ সারাখসি, দারুল মারিফা, বৈরুত
১৬৬. উসুলিদ্দিন, আবদুল কাহের বাগদাদি, দারুল ফুনুন, ইস্তাম্বুল, ১৩৪৬ হি.
১৬৭. ওয়াফাইয়াতুল আইয়ান ওয়া আম্বাউ আবনাইজ জামান, ইবনে খাল্লিকান, দারু সাদির, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৯৭১ খ্রি.
১৬৮. ওয়াফাউল ওয়াফা, বিআখবারি দারিল মুস্তফা, নুরুদ্দিন সামহুদি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি.
১৬৯. ওয়াসিয়্যাতুল ইমাম আবু হানিফা, দারু ইবনে হাজাম, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি.
১৭০. কানজুল ওসুল ইলা মারিফাতিল উসুল (উলুসুল বাজদাবি), জাভেদ প্রেস করাচি
১৭১. কাশফুজ জুনুন আন আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনুন, হাজি খলিফা, মাকতাবাতুল মুসান্না, বাগদাদ, ১৯৪১ খ্রি.
১৭২. কাশফুল আসরার শরহু উসুলিল বাজদাবি, আলাউদ্দিন বুখারি, দারুল কিতাবিল ইসলামি
১৭৩. কাশফুল মুশকিল মিন হাদিসিস সাহিহাইন, আবুল ফারাজ ইবনুল জাওজি, দারুল ওয়াতান, রিয়াদ
১৭৪. কাশশাফ (তাফসিরে জামাখশারি), জারুল্লাহ জামাখশারি, দারুল কিতাব আল-আরাবি, বৈরুত, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৭
১৭৫. কাশশাফুল কিনা আন মাতনিল ইকনা, মানসুর ইবনে ইউনুস আল-বাহুতি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা
১৭৬. কাশেফ আন হাকাইকিস সুনান (শরহে মিশকাত), শরফুদ্দিন তিবি, মাকতাবাতু নিজার, রিয়াদ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি.
১৭৭. কিফায়াতুল মুফতি, মুহাম্মাদ কিফায়াতুল্লাহ দেহলভি, দারুল ইশাআত, করাচি
১৭৮. খালকু আফআলিল ইবাদ, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল বুখারি, দারুল মাআরিফিস সাউদিয়্যা, রিয়াদ
১৭৯. খুলাসাতুল ওয়াফা বিআখবারি দারিল মুস্তফা, নুরুদ্দিন আলি ইবনে আবদুল্লাহ সামহুদি

১৮০. গারিবুল হাদিস, ইবরাহিম ইবনে ইসহাক হরবি, জামিআতু উম্মিল কুরা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৫ হি.
১৮১. গায়াতুল আমানি ফির রাদ্দি আলান নাবহানি, মাহমুদ শুকরি আলুসি
১৮২. গায়াতুল বায়ান, শামসুদ্দিন রমলি, দারুল মারিফা, বৈরুত
১৮৩. গিয়াসুল উমাম, ইমামুল হারামাইন জুয়াইনি, মাকতাবাতু ইমামিল হারামাইন, ২য় প্রকাশ, ১৪০১ হি.
১৮৪. জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহি, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল বার, মুআসসাসাতুর রাইয়্যান, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি.
১৮৫. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, ইবনে রজব হাম্বলি, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৭ম প্রকাশ, ১৪২২ হি.
১৮৬. জামিউল বায়ান ফি তাবিলিল কুরআন (তাফসিরে তাবারি), মুহাম্মাদ ইবনে জারির আত-তাবারি, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি.
১৮৭. তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ (তাফসিরে মাতুরিদি), আবু মানসুর আল-মাতুরিদি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি.
১৮৮. তারিফুন আম বিদিনিল ইসলাম, আলি তানতাবি, দারুল মানারা, জেদ্দা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯ হি.
১৮৯. তালিকুশ শাইখ ইবনে বাজ আলাল আকীদাহ আত-ত্বহাবিয়্যাহ, আর-রিয়াসাতুল আম্মাহ লিল ইফতা, রিয়াদ
১৯০. তাসিসুত তাকদিস, ফখরুদ্দিন রাজি, দারু নুরিস সাবাহ, লেবানন, ১ম প্রকাশ, ২০১১ খ্রি.
১৯১. তাইসিরুল আজিজিল হামিদ ফি শরহি কিতাবিদ তাওহিদ, সুলাইমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব, আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি.
১৯২. তাফসিরুল কুরআনিল আজিম, ইবনে কাসির, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, বৈরুত, ১৪১৯ হি.
১৯৩. তাফসিরে ইবনে আবু হাতিম, ইবনে আবু হাতিম, মাকতাবাতু নিজার, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৯ হি.
১৯৪. তাফসিরে কুরতুবি (আল জামে লিআহকামিল কুরআন), মুহাম্মাদ আল কুরতুবি, দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা, কায়রো, ২য় প্রকাশ, ১৩৮৪ হি.
১৯৫. তাফসিরে বাগাবি (মাআলিমুত তানজিল ফি তাফসিরিল কুরআন), দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি.
১৯৬. তাফসিরে মুজাহিদ, মুজাহিদ ইবনে জবর, দারুল ফিকরিল ইসলামি আল-হাদিসাহ, মিশর, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি.
১৯৭. তাফসিরে সুফিয়ান সাওরি, সুফিয়ান সাওরি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪০৩ হি.
১৯৮. তাবয়িনু কাজিবিল মুফতারি, ইবনে আসাকির, দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৪ হি.

১৯৯. তাবয়িনুল হাকায়িক শরহে কানজুদ দাকায়িক, ফখরুদ্দিন জাইলায়ি, আল-মাতবাআতুল কুবরা আল-আমিরিয়্যা, কায়রো, ১ম প্রকাশ, ১৩১৩ হি.
২০০. তাবসিরাতুল আদিল্লা ফি উসুলিদ্দীন, আবুল মুইন নাসাফি, আল-মাকতাবাতুল আজহারিয়্যা লিত তুরাস, ১ম প্রকাশ, ২০১১ খ্রি.
২০১. তাবাকাতুল হানাবিলাহ, ইবনে আবি ইয়ালা, তাহকিক: মুহাম্মাহ হামেদ, দারুল মারিফাহ, বৈরুত
২০২. তাবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা, তাজুদ্দিন সুবকি, হিজর লিন-নাশরি, ২য় প্রকাশ, ১৪১৩ হি.
২০৩. তামহিদুল আওয়াইল ফি তালখিসিদ দালাইল, আবু বকর বাকিল্লানি, মুআসসাসাতুল কুতুবিস সাকাফিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭ হি.
২০৪. তাজকিরাতুল হুফফাজ, শামসুদ্দিন জাহাবি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি.
২০৫. তারিখুল ইসলাম, শামসুদ্দিন জাহাবি, তাহকিক: বাশার আওয়াদ মারুফ, দারুল গারব আল-ইসলামি, ১ম প্রকাশ, ২০০৩ খ্রি.
২০৬. তারিখুল মাদিনাহ, উমর ইবনে শাব্বাহ, জেদ্দা, ১৩৯৯ হি.
২০৭. তারিখে ইয়াকুবি, আহমদ ইবনে আবু ইয়াকুব, মাতবা ব্রেল, লিডেন, ১৮৮৩ খ্রি.
২০৮. তারিখে তাবারি, মুহাম্মাদ ইবনে জারির তাবারি, দারুত তুরাস, বৈরুত, ২য় প্রকাশ, ১৩৮৭ হি.
২০৯. তারিখে দিমাশক, ইবনে আসাকির, দারুল ফিকর, ১৪১৫ হি.
২১০. তারিখে বাগদাদ, খতিবে বাগদাদি, দারুল গারব আল-ইসলামি, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি.
২১১. তালবিসু ইবলিস, জামালুদ্দিন ইবনুল জাওজি, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২১ হি.
২১২. তাশনিফুল মাসামি বিজাময়িল জাওয়ামি লি-তাজুদ্দিন সুবকি, বদরুদ্দিন জারকাশি, মাকতাবাতু কুরতুবা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি.
২১৩. তাসহিলুল আকিদা আল-ইসলামিয়্যা, আবদুল্লাহ ইবনে জিবরিন, দারুল উসাইমি, ২য় প্রকাশ
২১৪. তাসহিলুস সাবিলাহ লিমুরিদি মারিফাতিল হানাবিলাহ, সালেহ ইবনে আবদুল আজিজ আলে উসাইমিন, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি.
২১৫. তাহজিবু শারহিত ত্বহাবিয়্যাহ, সলাহ সাভি, শরিয়া অ্যাকাডেমি, আমেরিকা, ১ম প্রকাশ, ২০০৯ খ্রি.
২১৬. তাহজিবুত তাহজিব, ইবনে হাজার আসকালানি, দাইরাতুল মাআরিফ নিজামিয়্যা, হিন্দ, ১ম প্রকাশ, ১৩২৬ হি.
২১৭. তাহজিবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ইয়াহইয়া ইবনে শরফ নববি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত
২১৮. তাহজিবুল আসার, মুসনাদে ইবনে আব্বাস, মাতবাআতুল মাদানি, কায়রো
২১৯. তাহজিবুল লুগাহ, আবু মানসুর আল-আজহারি, দারু ইহইয়া তুরাসিল আরাবি, ১ম প্রকাশ, ২০০১ খ্রি.
২২০. তুহফাতুজ জাকিরিন, মুহাম্মাদ ইবনে আলি আশ-শাওকানি, দারুল কলম, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪ হি.
২২১. তুহফাতুল আহওয়াজি শরহে জামে তিরমিজি, আবদুর রহমান মুবারকপুরি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত
২২২. তুহফাতুল মুরিদ, ইবরাহিম বাইজুরি, দারুস সালাম, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি.
২২৩. দরসে তিরমিজি, তাকি উসমানি, মাকতাবায়ে দারুল উলুম, করাচি, ১৪৩১ হি.
২২৪. দাফউ শুবাহি মান শাব্বাহা ওয়া তামাররাদা, তাকিউদ্দিন হিসনি, আল-মাকতাবাতুল আজহারিয়্যা লিত তুরাস, কায়রো
২২৫. দাফউ শুবাহিত তাশবিহ, ইবনুল জাওজি, তাহকিক: জাহেদ কাওসারি, আল-মাকতাবাতুল আজহারিয়্যা লিত-তুরাস,
২২৬. দারউ তাআরুজিল আকলি ওয়ান নাকল, ইবনে তাইমিয়া, জামিয়াতুল ইমাম, রিয়াদ, ২য় প্রকাশ, ১৪১১
২২৭. দালাইলুন নুবুওয়াহ, আবু বকর বাইহাকি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি.
২২৮. দিওয়ানুশ শাফেয়ি, মুহাম্মাদ ইবনে ইদরিস শাফেয়ি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ৪র্থ প্রকাশ, ২০০৬ ঈ.
২২৯. দুরারুল হুক্কাম ফি শরহি গুরারিল আহকাম, মোল্লা খসরু, দারু ইহইয়াইল কুতুবিল ইলমিয়্যা
২৩০. নবুওত, ইবনে তাইমিয়্যা, আজওয়াউস সালাফ, রিয়াদ, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি.
২৩১. নাইলুল আওতার, মুহাম্মাদ ইবনে আলি আশ-শাওকানি, দারুল হাদিস, মিশর, ১ম প্রকাশ, ১৪১৩ হি.
২৩২. নাকজুল ইমাম আবু সাইদ আলাল মারিসি আল-আনিদ, আবু সাইদ উসমান দারেমি, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি.
২৩৩. নিহায়াতুল ইকদাম ফি ইলমিল কালাম, আবদুল করিম শাহরাস্তানি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি.
২৩৪. নিহায়াতুল মুবতাদিয়িন ফি উসুলিদ্দিন, আহমদ ইবনে হামদান হাম্বলি, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি.
২৩৫. নুজহাতুন নাজার ফি তাওজিহি নুখবাতিল ফিকার, ইবনে হাজার আসকালানি, মাতবাআতু সাফির, রিয়াদ, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি.
২৩৬. নুরুল ইয়াকিন ফি উসুলিদ্দিন ফি শরহি আকাইদিত-তহাবি, হাসান কাফি আকহাসারি (মৃ.১০২৪ হি.), তাহকিক: জুহদি আদলোফিচ বুসনাভি, মাকতাবাতুল উবাইকান, ১ম প্রকাশ, রিয়াদ, ১৪১৮ হি.
২৩৭. ফয়জুল বারি আলা সহিহিল বুখারি, আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি, সংকলন: বদরে আলম মিরাঠি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি.

২৩৮. ফয়সালুত তাফরিকাহ বাইনাল ইসলামি ওয়াজ জানদাকাহ, আবু হামেদ গাজালি, দারুল বিরুনি, ১৪১৩ হি.
২৩৯. ফাতওয়ায়ে ইবনিস সালাহ, উসমান ইবনে আবদুর রহমান ইবনুস সালাহ, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪০৭
২৪০. ফাতহুল কাদির, কামাল ইবনুল হুমাম, দারুল ফিকর, বৈরুত
২৪১. ফাতহুল কাদির, মুহাম্মাদ ইবনে আলি আশ-শাওকানি, দারু ইবনে কাসির, দিমাশক, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হি.
২৪২. ফাতহুল বারি শরহে সহিহিল বুখারি, ইবনে হাজার আসকালানি, দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৩৭৯ হি.
২৪৩. ফাতহুল মুলহিম বিশারহি সহিহিল ইমাম মুসলিম, শাব্বির আহমদ উসমানি, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি.
২৪৪. ফাতাওয়া ওয়া মাসাইল, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব, জামিআতুল ইমাম, রিয়াদ
২৪৫. ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া, ফরিদুদ্দিন ইন্দরপতি, মাকতাবায়ে জাকারিয়া, দেওবন্দ
২৪৬. ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া, মাহমুদ হাসান গঙ্গুহি, জামিয়া ফারুকিয়্যা, করাচি
২৪৭. ফাতাওয়ায়ে রশিদিয়া, রশিদ আহমদ গঙ্গুহি, দারুল ইশাআত, করাচি
২৪৮. ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া, আবদুর রহিম লাজপুরি, দারুল ইশাআত, করাচি, ২০০৯ খ্রি.
২৪৯. ফাতাওয়ায়ে সুবকি, তাকিউদ্দিন সুবকি, দারুল মাআরিফ
২৫০. ফাতাওয়াহ হামাবিয়াহ কুবরা, ইবনে তাইমিয়া, দারুস সুমাইয়ি, রিয়াদ, ২য় প্রকাশ, ১৪২৫ হি.
২৫১. ফুতুহুশ শাম, মুহাম্মাদ ইবনে উমর আল-ওয়াকেদি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি.
২৫২. ফুসুসুল হিকাম, মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবি। তাহকিক: আবুল আলা আফিফি। দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত
২৫৩. বাদায়েউল ফাওয়ায়িদ, ইবনুল কাইয়িম, দারুল কিতাব আল-আরাবি, বৈরুত
২৫৪. বাদায়েউস সানায়ে ফি তারতিবিশ শারায়ে, আলাউদ্দিন কাসানি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ২য় প্রকাশ, ১৪০৬ হি.
২৫৫. বাজলুল মাজহুদ ফি হাল্লি আবি দাউদ, খলিল আহমদ সাহারানপুরি, মারকাজুশ শাইখ আবিল হাসান নদভি, হিন্দ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৭ হি.
২৫৬. বায়ানু তালবিসিল জাহমিয়া, ইবনে তাইমিয়া, মুজাম্মাউল মালিক ফাহাদ, মদিনা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হি.
২৫৭. বাহরুল উলুম, আবুল লাইস সমরকন্দি
২৫৮. বাহরুল ফাওয়ায়িদ, আবু বকর মুহাম্মাদ কালাবাজি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২০ হি.
২৫৯. বিহারুল আনওয়ার, মুহাম্মাদ বাকের মাজলিসি, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, ৩য় প্রকাশ (**শিয়াসূত্র**)

২৬০. বিহারুল আনওয়ার, মুহাম্মাদ বাকের মাজলিসি, মুআসসাসাতুল ওয়াফা, বৈরুত, এবং দারুর রিজা।
২৬১. বুলুগুল মুনা, ফি হুকমিল ইসতিমনা, মুহাম্মাদ ইবনে আলি আশ-শাওকানি, দারুল আসার, সানআ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি.
২৬২. মারিফাতু আনওয়ায়ি উলুমিল হাদিস (মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ), তাহকিক: নুরুদ্দিন ইতর, উসমান ইবনে আব্দুর রহমান আস-সালাহ, দারুল ফিকর, সিরিয়া, ১৪০৬ হি.
২৬৩. মাআরিজুল কবুল ফি শরহি সুল্লামিল উসুল, হাফেজ হাকামি, দারু ইবনিল কাইয়িম, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হি.
২৬৪. মাআরিফুস সুনান শরহু সুনানিত তিরমিজি, ইউসুফ বানুরি, এইচএম সাইদ কোম্পানি, করাচি, ১৪১৩ হি.
২৬৫. মাকতুবাতে ইমামে রব্বানি (মুজাদ্দিদে আলফে সানি রাহি.-এর পত্র সংকলন), মাকতাবাতুল হাকিকাহ, ইস্তাম্বুল, ১৩৯৭ হি.
২৬৬. মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন ওয়াখতিলাফুল মুসাল্লিন, আবুল হাসান আশআরি, দার ফ্রাঞ্জ, জার্মানি, ৩য় প্রকাশ, ১৪০০ হি.
২৬৭. মাকালাতে উসমানি, জফর আহমদ উসমানি, বাইতুল উলুম, লাহোর
২৬৮. মাজমাউল আনহুর ফি শরহি মুলতাকাল আবহুর, আবদুর রহমান দামাদ আফেন্দি, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি
২৬৯. মাজমু রাসায়িলি ইবনে রজব, ইবনে রজব হাম্বলি, আল-ফারুক আল-হাদিসাহ, ১৪২৪-১৪২৫ হি.
২৭০. মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলু ইবনে উসাইমিন, সংকলন, ফাহাদ সুলাইমান, দারুল ওয়াতান, ১৪১৩ হি.
২৭১. মাজমুউল ফাতাওয়া, আহমদ ইবনে আবদুল হালিম ইবনে তাইমিয়া, সংকলন: আবদুর রহমান ইবনে কাসিম, মুজাম্মাউল মালিক ফাহাদ, মদিনা মুনাওয়ারা, ১৪১৬ হি.
২৭২. মাদরিকুন তানজিল ওয়া হাকাইকুত তাবিল (তাফসিরে নাসাফি), আবু বারাকাত নাসাফি, দারুল কালিম আত-তাইয়িব, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি.
২৭৩. মাদারিজুস সালেকিন, ইবনুল কাইয়িম, দারুল কিতাবিল আরাবি, বৈরুত, ৩য় প্রকাশ, ১৪১৬ হি.
২৭৪. মানাকিবু আবি হানিফাহ ওয়া সাহিবাইহি, শামসুদ্দিন জাহাবি, লাজনাতু ইহইয়াইল মাআরিফিন নুমানিয়া, হায়দ্রাবাদ, দাকান, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৮ হি.
২৭৫. মানাকিবুল ইমাম আহমদ, ইবনুল জাওজি, দারু হিজর, ২য় প্রকাশ, ১৪০৯ হি.
২৭৬. মানাকিবুশ শাফেয়ি, আবু বকর বাইহাকি, মাকতাবাতু দারিত তুরাস, কায়রো, ১ম প্রকাশ, ১৩৯০
২৭৭. মাফাতিহুল গাইব (তাফসিরে কাবির), ফখরুদ্দিন রাজি, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, ৩য় প্রকাশ, ১৪২০ হি.
২৭৮. মাফাতিহুল জিনান, আব্বাস কুম্মি, দারুল আজওয়া, ৩য় প্রকাশ, ১৪৩৫ (**শিয়াসূত্র**)

২৭৯. মাবানিল খিলাফাহ ওয়াস সিয়াসাহ আদ-দ্বীনিয়া, মুহাম্মাদ তৈয়ব (আকীদাহ ত্বহাবিয়্যাহর হাশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত)
২৮০. মারাতিবুল ইজমা ফিল ইবাদাত ওয়াল মুআমালাত ওয়াল ইতিকাদাত, ইবনে হাজাম, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত
২৮১. মাসাইলু আহমদ ইবনে হাম্বল রিওয়ায়াতু ইবনিহি আবদুল্লাহ, আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪০১ হি.
২৮২. মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নববিয়্যাহ, ইবনে তাইমিয়া, জামিয়াতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ আল ইসলামিয়া, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি.
২৮৩. মিনাহুর রাওজিল আজহার ফি শরহিল ফিকহিল আকবার, মোল্লা আলি কারি, দারুল বাশায়ের আল-ইসলামিয়া, ১ম প্রকাশ, ১৪১৯ হি.
২৮৪. মিরকাতুল মাফাতিহ শরহু মিশকাতিল মাসাবিহ, মোল্লা আলি কারি, দারুল ফিকর, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি.
২৮৫. মুজামুশ শুয়ুখ আল-কাবির, শামসুদ্দিন জাহাবি, মাকতাবাতুস সিদ্দিক, তায়েফ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হি.
২৮৬. মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা, আবু জাফর তহাবি, দারুল বাশায়ের, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হি.
২৮৭. মুখতাসারু শরহিল আকীদাহ আত-ত্বহাবিয়্যাহ, উমর আবদুল্লাহ কামেল, দার গারিব, কায়রো, ২০০৩ ঈ.
২৮৮. মুখতাসারুস সাওয়াইকিল মুরসালাহ, ইবনুল কাইয়িম, দারুল হাদিস, কায়রো, ১ম প্রকাশ, ১৪২২ হি.
২৮৯. মুসতাদরাকে সাফিনাতিল বিহার, আলি শাহরুদি, মুআসসাসাতুন নাশরিল ইসলামি, কুম, ১৪১৯ (**শিয়াসূত্র**)
২৯০. জাদুল মাআদ, ইবনুল কাইয়িম, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ২৭ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি.
২৯১. জাম্মুত তাবিল, ইবনে কুদামা, আদ-দারুস সালাফিয়া, কুয়েত, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬ হি.
২৯২. জাম্মুল কালামি ওয়া আহলিহি, আবু ইসমাইল হারাভি, মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদিনা, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি.
২৯৩. রদ্দুল মুহতার, ইবনে আবিদিন, দারুল ফিকর, বৈরুত, ২য় প্রকাশ, ১৪১২ হি.
২৯৪. রুইয়াতুল্লাহ ওয়া তাহকিকুল কালাম ফিহা, আহমদ আলে হামাদ, থিসিস, উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়
২৯৫. রুহুল মাআনি, শিহাবুদ্দিন মাহমুদ আলুসি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হি.
২৯৬. লাওয়ামিউল আনওয়ার আল-বাহিয়্যাহ, শামসুদ্দিন সাফারিনি, মুআসসাসাতুল খাফিকাইন, দিমাশক, ২য় প্রকাশ, ১৪০২ হি.
২৯৭. লাতাইফুল মাআরিফ, ইবনে রজব হাম্বলি, দারু ইবনে হাজাম, ১ম প্রকাশ, ১৪২৪ হি.
২৯৮. লিসানুল মিজান, ইবনে হাজার আসকালানি, তাহকিক: আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, দারুল বাশায়ের আল-ইসলামিয়া, ১ম প্রকাশ, ২০০২ খ্রি.

২৯৯. লিসানুল মিজান, ইবনে হাজার আসকালানি, মুআসসাসাতুল আলামি, বৈরুত, ২য় প্রকাশ, ১৩৯০ হি.
৩০০. লুমআতুল ইতিকাদ, ইবনে কুদামা, উইজারাতুশ শুউনিল ইসলামিয়া, সৌদি আরব, ২য় প্রকাশ, ১৪২০ হি.
৩০১. শরহু আকিদাতিল ইমাম আত-তহাবি, সিরাজুদ্দিন গজনবি হিন্দি, তাহকিক: হাজেম কিলানি, দারাতুল কারাজ, ১ম প্রকাশ, কায়রো, ২০০৯ খ্রি.
৩০২. শরহু জাওহারাতিত তাওহিদ, ইবরাহিম আল-বাইজুরি,
৩০৩. শরহু মুখতাসারিত তহাবি, আবু বকর জাসসাস, দারুল বাশায়ের, ১ম প্রকাশ, ১৪৩১ হি.
৩০৪. শরহু মুখাতাসারি খলিল, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ খারাশি, দারুল ফিকর, বৈরুত
৩০৫. শরহু সহিহিল বুখারি, ইবনু বাত্তাল, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি.
৩০৬. শরহুত তহাবিয়্যাহ ফিল আকিদাহ আস-সালাফিয়া, মুহাম্মাদ ইবনে আবিল ইজ, তাহকিক: আহমদ শাকের, ইসলামবিষয়ক মন্ত্রণালয়, রিয়াদ, ১৪১৮ হি.
৩০৭. শরহুল আকাইদিন নাসাফিয়া, সাদ উদ্দিন তাফতাজানি, মাকতাবাতুল কুল্লিয়্যাতিল আজহারিয়া, কায়রো, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৭ ঈ.
৩০৮. শরহুল আকীদাহ আত-ত্বহাবিয়্যাহ, আবদুর রহমান ইবনে নাসের আল-বাররাক, ২য় প্রকাশ, ১৪২৯ হি.
৩০৯. শরহুল আকীদাহ আত-ত্বহাবিয়্যাহ, আবদুল গনি আল-গুনাইমি (মৃ. ১২৯৮হি.), দারুল ফিকর, ৩য় প্রকাশ, দিমাশক, ১৪১৫ হি.
৩১০. শরহুল আকীদাহ আত-ত্বহাবিয়্যাহ, শুজাউদ্দিন হিবাতুল্লাহ তুর্কিস্তানি (মৃ.৭৩৩ হি.), তাহকিক: জাদুল্লাহ বাস্সাম সালেহ, দারুন নুরিল মুবিন, ১ম প্রকাশ, আম্মান, ২০১৪ খ্রি.
৩১১. শরহুল আকিদাহ আল-ওয়াসিতিয়া, ইবনে উসাইমিন, দার ইবনুল জাওজি, সৌদি আরব, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, ১৪২১ হি.
৩১২. শরহুল কাসিদাহ আদ-দালিয়্যাহ, আবদুর রহমান নাসের আল-বাররাক, দার ইবনুল জাওজি, ১ম প্রকাশ, ১৪৩০ হি.
৩১৩. শরহুল জামি আলা ফুসুসিল হিকাম, আবদুর রহমান ইবনে আহমদ নুরুদ্দিন জামি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৪২৫ হি.
৩১৪. শরহুল মাকাসিদ, সাদ উদ্দিন মাসউদ তাফতাজানি, দারুল মাআরিফিন নুমানিয়া, পাকিস্তান, ১৪০১ হি.
৩১৫. শরহুল মুকাদ্দিমাত, মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ সানুসি, মাকতাবাতুল মাআরিফ, ২০০৯ খ্রি.
৩১৬. শরহুস সিয়ারিল কাবির লিল ইমাম মুহাম্মাদ, শামসুল আইম্মাহ সারাখসি, আশ-শারিকাহ আশ-শারকিয়্যাহ লিল ইলানাত, ১৯৭১ খ্রি.
৩১৭. শরহুস সুন্নাহ, মুহাম্মাদ বাগাবি, আল-মাকতাবুল ইসলামি, বৈরুত, ২য় প্রকাশ, ১৪০৩ হি.
৩১৮. শরহে নুখবাতুল ফিকার, মোল্লা আলি কারি, দারুল আরকাম, বৈরুত
৩১৯. শরহে বুখারি, ইবনে বাত্তাল, মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ, ২য় প্রকাশ, ১৪২৩ হি.
৩২০. শরহে মুসলিম (আল-মিনহাজ শরহু সহিহ মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ), ইমাম নববি, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, ২য় প্রকাশ, ১৩৯২ হি.

৩২১. শাওয়াহিদুল হক ফিল ইস্তিগাসা বিসাইয়িদিল খালক, কাজি ইউসুফ ইবনে ইসমাইল নাবহানি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ৩য় প্রকাশ, ২০০৭ খ্রি.
৩২২. শারহু উসুলি ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, হিবাতুল্লাহ লালাকায়ি, দার তাইবা, সৌদি আরব, ৮ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি.
৩২৩. শারহুল আকীদাহ আত-ত্বহাবিয়্যাহ, ইসমাইল ইবনে ইবরাহিম আশ-শাইবানি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত
৩২৪. শারহুল আকীদাহ আত-ত্বহাবিয়্যাহ, আবদুর রহমান ইবনে নাসের আল-বাররাক, ২য় প্রকাশ, ১৪২৯হি.
৩২৫. শারহুল আকীদাহ আত-ত্বহাবিয়্যাহ, হামুদ ইবনে উকলা শুআইবি, মাকতাবাতুর রকিম, ১ম প্রকাশ, রাক্কাহ
৩২৬. শিফাউল আলিল, ইবনুল কাইয়িম, দারুল মারিফা, বৈরুত, ১৩৯৮ হি.
৩২৭. শিফাউস সিকাম ফি জিয়ারাতি খাইরিল আনাম, তকিউদ্দিন সুবকি, লাজনাতুত তুরাসিল আরাবি, বৈরুত, ১৯৫১ খ্রি.
৩২৮. শুআবুল ঈমান, আবু বকর বাইহাকি, মাকতাবাতুর রুশদ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৩ হি.
৩২৯. সহিহু শারহিল আকীদাহ আত-ত্বহাবিয়্যাহ, হাসান ইবনে আলি আস-সাক্কাফ, দারুল ইমাম আর-রাওয়াস, ৪র্থ প্রকাশ, বৈরুত, ১৪২৮ হি.
৩৩০. সাওনুল মানতিক ওয়াল কালাম, জালালুদ্দিন সুয়ুতি, মাজমাউল বুহুসিল ইসলামিয়া
৩৩১. সিফাতুল জান্নাহ, আবু নুআইম আস্ফাহানি, দারুল মামুন লিত-তুরাস, দিমাশক
৩৩২. সিয়ারু আলামিন নুবালা, শামসুদ্দিন জাহাবি, দারুল হাদিস, কায়রো, ১৪২৭ হি. এবং মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৫ হি.
৩৩৩. সিরাতে ইবনে হিশাম, আবদুল মালিক ইবনে হিশাম, দারুল জিল, বৈরুত, ১৪১১ হি.
৩৩৪. হাদিল আরওয়াহ ইলা বিলাদিল আফরাহ, ইবনুল কাইয়িম, মাতবাআতুল মাদানি, কায়রো
৩৩৫. হাশিয়াতুদ দুসুকি আলা উম্মিল বারাহিন, মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ দুসুকি, মাতবাআতু ঈসা
৩৩৬. হাশিয়াতুস সাবি আলাশ শারহিস সাগির, আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ সাবি মালেকি, মাকতাবাতু মুসতাফা বাবি হলবি, ১৩৭২ হি.
৩৩৭. হিদায়াতুশ শিয়াহ, রশিদ আহমদ গঙ্গুহি, দারুল ইশাআত, করাচি
৩৩৮. হিফজুল ঈমান, আশরাফ আলি থানভি, দারুল কিতাব, দেওবন্দ
৩৩৯. হিলইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া, আবু নুআইম আল-আস্ফাহানি, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৪০৯ হি.
৩৪০. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি, দার ইহইয়াইল উলুম, বৈরুত, ২য় প্রকাশ, ১৪১৩ হি.।